মহর্ষি বাল্মীকি-প্রণীত

যোগবাশিষ্ঠ-রামায়ণ

নির্ব্বাণ-প্রকরণ।

স্বর্গীয় চন্দ্রনাথ বসু কর্ত্তৃক

মূল সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালাভাষায় অনুবাদিত।

প্রকাশক

জি, পি, বসু।

শ্যামপুকুর—২ নং, অভয়চরণ ঘোষের লেন, রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট

কলিকাতা;

মহাভারত কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

নূতন সংস্করণ।

এস, এন, প্রেস,—২৪, রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট।

শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ দাস দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩১৮ সাল।

নির্বাণ-প্রকরণ পূর্ব্বভাগের সূচীপত্র।

নির্ব্বাণ-প্রকরণ পূর্ব্বভাগের সূচীপত্র সমাপ্ত।

ওঁতৎসৎ

শ্রীশ্রীরামচন্দ্রায় নমঃ।

যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ।

নির্ব্বাণ-প্রকরণ।

পূর্ব্ব-ভাগ।

—:*:—

প্রথম সর্গ।

—০০—

বাল্মীকি বলিলেন,—ভরদ্বাজ! উপশম প্রকরণ শুনিয়াছ; অনন্তর এই নির্ব্বাণ প্রকরণ শ্রবণ কর। এই প্রকরণের বিষয় বিদিত হইতে পারিলে নির্ব্বাণ-প্রাপ্তি হয়।

মুনিনায়ক বশিষ্ঠ এবম্বিধ উদার উপদেশাবলী প্রদান করিতে থাকিলে, রাজকুমার রাম স্থিরমনে মৌনী হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। তাঁহার সর্ব্বেন্দ্রিয়-ব্যাপার নিরুদ্ধ হইয়া গেল। তিনি কেবল একমনে মুনিবরের উপদেশবাণীই শুনিতে লাগিলেন। কেবল কি রামচন্দ্রই এই ভাবে রহিলেন? সভাস্থ সভ্যমণ্ডলী সকলেই সে সময় স্থিরচিত্ত ও নিস্পন্দ। কি রাজা, কি প্রজা, সভাগত সকল লোকেরই মন এ দিন বশিষ্ঠ-বাক্যের গভীর ভাবার্থ গ্রহণে ব্যাপৃত। সকলেই অদ্য তন্ময়; কাহারও মন বাহ্যার্থের আলোচনায় উন্মুখ নহে, শারীরিক চেষ্টাও কাহারও কিছুই নাই। মনে হইল, সে সভা যেন একখানি

চিত্রপটের ন্যায় বিরাজমান। নানা স্থান হইতে যে সকল মুনি আসিয়া সেই সভার শোভা সম্পাদন করিয়াছিলেন, তাঁহারাও অদ্য সাদরে সেই বশিষ্ঠবাক্যের উদার অর্থ মনে মনে বিচার করিতেছিলেন। তাঁহারা কেহই কোন বাক্যব্যয় করিতে ছিলেন না; মাঝে মাঝে ভ্রূভঙ্গী করিয়া আপনা আপনি তত্ত্বার্থ সকল বুঝিয়া লইতে ছিলেন, আর সকলেই এক একবার ধীরে ধীরে স্বীয় স্বীয় তর্জ্জনী সঞ্চালন করিতেছিলেন। বশিষ্ঠ-দেবের এমনই অপূর্ব্ব উপদেশবাক্য, তাহাতে অদ্য অন্তঃপুর-চারিণী মহিলাগণও যেন পরমাশ্চর্য্যরূপ পরমাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করিতে লাগিলেন; উল্লাসে তাঁহাদের মুখমণ্ডল প্রফুল্ল, শরীর রোমাঞ্চিত, ও ভ্রমর-সুন্দর বিলোচন বিস্ফারিত। নয়নে নিমেষ নাই, দেহে স্পন্দ নাই, যেন সেই পুরন্ধ্রি-বর্গ নিবাত-নিষ্কম্প তরুমঞ্জরীর ন্যায় বিভাত।

ক্রমে দিবা অবসান হইল। দিনকর এখন বশিষ্ঠের বাণী শুনিবার জন্যই যেন আকাশের এমন এক প্রান্ত-দেশে বসিয়া পড়িলেন যে, যথায় থাকিয়া তাঁহারই কৃত বাসরের শেষ দশা তাঁহাকে লক্ষ্য করিতে হইল। রবিদেব বশিষ্ঠ-বাক্য নিশ্চয়ই কিছু শুনিয়া ছিলেন, তাই তাঁহার কিঞ্চিৎ জ্ঞানোদয় হইল। জ্ঞানোদয় হইল বলিয়াই তিনি এই বার সৌম্যমূর্ত্তি হইয়া সকলের দৃষ্টিপ্রিয় হইলেন। তাঁহার তীব্র তাপ কমিয়া গেল। তাপোপশমে তিনি যেন কিঞ্চিৎ শান্তি পাইলেন। দেখিতে দেখিতে ক্রমে সন্ধ্যার ছায়া দেখা দিল। ধীরে সান্ধ্য সমীর বহিয়া চলিল। বশিষ্ঠ-বাণী শুনিবার জন্যই সে যেন ধীরে শান্তগতি অবলম্বন করিল। সভাস্থ পুষ্প-বিতানের স্পন্দনে মারুত যেন মাল্য পরিল এবং সভাভূমির সর্ব্বত্র মন্দারের মধুর আমোদ প্রদান করিতে লাগিল। সে সভায় মারুতও মৌনাবলম্বন করিল। ভ্রমরেরা শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দলে দলে পুষ্প-দামসমূহে নিলীন ও নিদ্রিত হইয়া রহিল। বশিষ্ঠ-দেবের উপদেশে তাহারাও যেন জ্ঞেয় পদার্থ সম্যক্ বুঝিয়াছিল; তাই বুঝি সকলে যেন তখন ধ্যানমগ্ন হইয়া রহিল। সভা-ভূমির অদূর দেশে ক্রীড়াবাপী বিরাজিত। উহার জল মুক্তাময় জালমালায় আবৃত। ঐ জলও যেন অদ্য মুনিমুখ-নিঃসৃত মধুর উপদেশ শুনিবার জন্যই চন্দ্রপ্রভায় স্বতই বিমল হইয়া অচঞ্চলভাবে অবস্থিত। মুনিবরের উদার

মধুর উপদেশ পাইয়া সকলেই এখন প্রকৃত শান্তি পাইবার প্রয়াসী। অধিক কি, দিনকরের কিরণপুঞ্জ দীর্ঘকাল অসীম আকাশপথে ঘুরিয়াছে,—ঘুরিয়া ঘুরিয়া শ্রান্ত হইয়াছে; তাই এক্ষণে শান্তি পাইবার জন্য যেন গবাক্ষপথ ধরিয়া সেই শীতল সভাগৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। প্রশান্তপ্রায় বাসর তাহার মধুরোজ্জ্বল সান্ধ্য সৌর করের দেহ লইয়া এবং মুক্তাপঙ্ক্তির শুভ্র আভায় আপনার সর্ব্বাঙ্গ যেন ভস্মভূষায় ভূষিত করিয়া তপস্বীর প্রায় সর্ব্বত্র যেন শান্তির বার্ত্তা প্রচার করিয়া বেড়াইতে লাগিল। রাজগণের হস্তে ও মস্তকে যে সকল লীলাকমল ছিল, মহর্ষির তৎকালিক সুরস বচনাবলী শ্রবণ করিয়া তাহারাও যেন আনন্দভরে নিমীলিতপ্রায় হইল। বালক, মূর্খ ও পঞ্জরস্থ শুক-পক্ষিগণ তৎকালে ভোজনার্থ বধূগণকে ত্বরান্বিত করিতে লাগিল। সন্ধ্যা-সমাগম দেখিয়া কুমুদকুসুম-সকল ঈষৎ ঈষৎ ফুটিয়া উঠিল। তাহাদের রজোরাজি বা পরাগপুঞ্জ চারিদিকে বিচ্ছুরিত হইয়া ভ্রমমাণ ভ্রমরকুলের পক্ষ-পবনে তিরোহিত হইতে লাগিল। রজোরাজি অপনীত হওয়ায় রজোবিলসিত অশান্তিরও অবসান হইল। তাহাদেরও শান্তি হইল। তাহারা বিশ্রামসুখ পাইতে লাগিল। সভাস্থ রাজগণের বাহ্য চৈতন্য নাই; তাই চামরের ব্যজনকার্য্য বিরত হইল। সকলেরই চক্ষু একই ভাবে বিভোর হইয়া স্থিরভাবে অবস্থিত; কাজেই মনে হইল, অক্ষির পক্ষ্মও যেন বিশ্রাম-সুখ লাভ করিল। প্রভাকরের প্রখর প্রতাপে তমস্তোম গিরি-গুহার মধ্যে লুকায়িত ছিল, এক্ষণে সন্ধ্যা-সমাগমে অবসর বুঝিয়া ক্ষীণবল সৌর করপুঞ্জ আক্রমণ করিল। কাজেই নিরুপায় রবিকরনিকর গবাক্ষ পথ দ্বারা পলায়নপূর্ব্বক গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল।

ইত্যবসরে সহসা ভেরী, পটহ ও শঙ্খসমূহের এক মহান্ শব্দ প্রাদুর্ভূত হইল, সেই শব্দে দিঙ্মণ্ডল আচ্ছন্ন হইয়া গেল। সকলে বুঝিল, দিন প্রায় শেষ হইয়াছে। দিনের চতুর্থ ভাগ মাত্র এক্ষণে অবশিষ্ট আছে। মেঘের গুরু গম্ভীর নাদে কেকারব যেমন ঢাকিয়া যায়, তেমনি সেই মহাশব্দে মহর্ষির উচ্চ কণ্ঠস্বরও তিরোহিত হইয়া গেল। সহসা ভূকম্পন প্রাদুর্ভূত হইলে তাল-পল্লবময়ী বনাবলী যেমন কম্পিত হয়, পঞ্জরস্থ পক্ষিশ্রেণী তেমনি

চলিত-গাত্র হইয়া পড়িল। বর্ষার বারিদবৃন্দ যেমন গর্জ্জন সহকারে অত্যুন্নত গিরিশৃঙ্গদ্বয়ের অভ্যন্তরে আশ্রয় লয়, তেমনি সেই সহসোত্থিত মহাশব্দে বালকেরা তখন ভয়-চকিতনেত্রে কাঁদিয়া কাঁদিয়া ধাত্রীর উভয় কুচতটের অন্তরালে লুকায়িত হইল। সরিৎপ্রবাহ বায়ুভরে ক্ষুব্ধ হইলে তদীয় বিন্দু বিন্দু জল যেমন চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়ে, রাজগণের মস্তকস্থ পুষ্পমালায় যে সকল ভ্রমর ছিল, তাহারাও তেমনি তৎকালে সেই বিষম শব্দে বিচলিত হইয়া চারিদিকে উড়িয়া যাইতে লাগিল।

এইরূপে নরপতি দশরথের সভামণ্ডপ সংক্ষুব্ধ করিয়া সন্ধ্যাকাল-সূচক শঙ্খাদি শব্দ ধীরে ধীরে প্রশান্ত হইয়া গেল। বাসর প্রায় শেষ হইয়া আসিল। সন্ধ্যা সমাগত হইল দেখিয়া মহর্ষি বশিষ্ঠ তাঁহার প্রস্তাবিত উপদেশ-বাক্যের উপসংহার করিলেন এবং পরে সেই সভামধ্যে রাজকুমার রামচন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া মধুর বচনে বলিলেন,—হে অনঘ রঘুনায়ক! আমি এতকাল যাবৎ এই যে বাগ্‌জাল প্রসারিত করিলাম, তোমার চিত্তরূপ বিহঙ্গমকে তুমি ইহার মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখ। তোমায় জিজ্ঞাসা করি, হংস যেরূপ জলমিশ্রিত দুগ্ধ হইতে সার দুগ্ধ-ভাগটুকু তুলিয়া লয়, তুমিও তেমনি অনায়াসে মদীয় দুর্ব্বোধ বাক্যপরম্পরা হইতে সরল সারার্থটুকু গ্রহণ করিতে পারিয়াছ ত? হে সাধো! আমি উপদেশ দ্বারা তোমায় যে পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিলাম, তুমি স্বীয় বুদ্ধিবলে বারম্বার বিশেষ বিচার করিয়া সেই পথেই এখন গমন কর। হে রাম! তুমি আপনার বুদ্ধি দ্বারা এই বাসনাক্ষয়, মনোবিনাশ, প্রাণ-নিরোধ ও জ্ঞানাভ্যাসের পথে গমন কর। এইরূপ করিলে তোমাকে আর কখন কুপথে পদার্পণ করিতে হইবে না। ইহার অন্যথা করিলে বলা বাহুল্য, বিন্ধ্যখাত-মগ্ন গজের ন্যায় সত্বর তোমার অধঃপতন ঘটিবে। তুমি যদি নিজের বুদ্ধিবলে আমার এই উপদেশ বাক্যের ভাবার্থ নিজ হৃদয়ে ধারণা করিয়া না রাখ, তাহা হইলে তোমাকে অন্ধের ন্যায় অথবা তমসাচ্ছন্ন নিশাকালে দীপালোক-হীন মানুষের ন্যায় গভীর গর্ত্তে পতিত হইতে হইবে। শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই যে, আসক্তিহীন হইয়া যদৃচ্ছাগত যাবতীয় লোক-ব্যবহারই সমাধা করিবে। আমার বাক্যের মর্ম্মার্থ ইহাই। তুমি ইহা অবধারণ করিয়া উদার হও। হে সভ্যগণ!

হে মহারাজ দশরথ! হে রাম! হে লক্ষ্মণ! হে অন্যান্য নরপতিবৃন্দ! এক্ষণে দিনমান প্রায় অবসান হইয়াছে। সকলেরই এখন সায়ংকৃত্য নির্ব্বাহ করিবার সময় আসিয়াছে; সুতরাং এ সময় সকলেই আমরা সায়ন্তন বিধি সমাধা করিতে যাই। অতঃপর যাহা বিচার্য্য রহিল, আগামী দিবস প্রভাতে তাহার বিচারালোচনা করিব।

মুনিবর বশিষ্ঠ এই কথা কহিবা মাত্র সভাসদ্‌গণ সকলেই প্রফুল্ল-বদনে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। রাজগণ মহারাজ দশরথের প্রশংসা এবং রঘুনন্দন রামচন্দ্রের বন্দনা করিলেন। চারিদিক্ হইতে সকলেই বশিষ্ঠ-দেবকে প্রণাম করিয়া স্তুতিবাদ করিতে লাগিলেন। অনন্তর সভাসদ্‌গণ সকলেই ক্রমে ক্রমে স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট স্থানে প্রস্থান করিলেন। শ্রীমান্ বশিষ্ঠ তখন দেবগণকে নমস্কার করিয়া বিশ্বামিত্র মুনির সহিত স্বীয় আশ্রমে যাইবার জন্য আসন হইতে উত্থিত হইলেন। দশরথপ্রমুখ নরপতিগণ এবং অপরাপর মুনিগণ সকলেই আশ্রম পর্য্যন্ত সেই তত্ত্বোপদেষ্টা বশিষ্ঠ মুনির অনুগমন করিলেন। ক্রমে বশিষ্ঠ মুনি আপন আশ্রমে আসিয়া উপনীত হইলেন। তখন বশিষ্ঠ মুনির সম্মতি লইয়া অনুগামী মুনি ও রাজগণের মধ্যে কেহ কেহ গগনে গমন করিলেন, কেহ কেহ বন মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন এবং কেহ কেহ রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিলেন। তাহাদিগকে দেখিয়া পদ্মোত্থিত ভৃঙ্গবৃন্দ বলিয়াই বোধ হইতে লাগিল।

এই সময় রাজা দশরথ বশিষ্ঠদেবের পাদপদ্মে নির্ম্মল পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া পরিজনবর্গ সহ গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন ইঁহারা ভক্তিভরে আশ্রমাগত গুরুদেবের চরণদ্বয় পূজা করিয়া রাজভবনে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। অন্যান্য শ্রোতৃবর্গ স্ব স্ব গৃহে উপস্থিত হইয়া সায়ং স্নান সমাধা করিলেন, দেব ও পিতৃগণের অর্চ্চনা করিলেন এবং অভ্যাগত অতিথি ব্রাহ্মণদিগকে প্রত্যুদ্‌গমন করিয়া আনিলেন। অনন্তর বর্ণধর্ম্মানুসারে ব্রাহ্মণাদি গৃহাগত জনগণকে সমান আদরে ভোজন করাইলেন। দৈনিক কর্ম্মপরম্পরার সহিত দিবাকর অস্তমিত হইলেন। নৈশ কর্ম্মসমূহের সহিত ক্রমশ চন্দ্রোদয় হইল। ভূতলস্থ মুনি, ঋষি, রাজা ও রাজপুত্রগণ বশিষ্ঠদেবের মুখে এ দিন

সংসার-হর উপায়-উপদেশ শ্রবণ করিয়া এতই তন্ময়চিত্ত হইয়াছেন যে, রাজগণ মহার্হশয়নে, মুনিবৃন্দ তৃণশয্যায় এবং ঋষিগণ যোগাসনে অবস্থান করিয়াও সতত সমাদর সহকারে একাগ্রভাবে কেবল তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। পরে ভাবিতে ভাবিতে তাঁহারা নিমীলিত-নেত্রে প্রহর মাত্র নিদ্রিত হইয়া রহিলেন। মনে হইল, পদ্মদল যেন দিবসাগমের প্রতীক্ষায় মুদ্রিত হইল। তাঁহারা বশিষ্ঠ মুনির উপদেশ মত নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্ন দেখিলেন,—'আমিই সব' বাস্তবিক এই জ্ঞানই বটে ব্রহ্মজ্ঞান। ইহা স্বপ্ন-যোগে সন্দর্শন করাও সৌভাগ্যেরই ফল। বশিষ্ঠকৃপায় এ দিন তাঁহাদের এইরূপ দর্শনও ঘটিল। বলা বাহুল্য রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন ইহাঁরা সকলে প্রায় সমস্ত রাত্রিই ঋষিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠের উপদেশবাণী একমনে চিন্তা করিলেন। অনন্তর প্রহরার্দ্ধ রাত্রি মাত্র তাঁহারা নয়ন নিমীলনপূর্ব্বক নিদ্রিত হইয়া রহিলেন। এ নিদ্রায় কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহাদের শ্রান্তিও দূর হইল। তাঁহারাও পূর্ব্ববৎ সৌভাগ্যসূচক স্বপ্ন দর্শন করিলেন।

এইরূপে আত্মজ্ঞানের অভ্যুদয়ে রামলক্ষ্মণাদি শ্রোতৃবর্গের মন বিমল হইল, অন্তরে বিবেকজ্যোতি বিকাশ পাইল। তখন ত্রিযামার অবসান হইল। তাহার মুখচন্দ্রও মলিন হইয়া উঠিল।

প্রথম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় সর্গ।

বাল্মীকি কহিলেন,—ভরদ্বাজ! বিবেক-বিকাশে বাসনা যেমন ক্ষীণ হইয়া যায়, অরুণোদয়ে যামিনীও তেমনি ক্ষীণ হইয়া গেল। যামিনীর ইন্দুবদন ম্লান হইল। যামিনী আর দাঁড়াইতে পারিল না; তাহার তমোময় পদযুগল পর্য্যাকুল হইয়া পড়িল। রবিদেব স্বীয় করনিকর প্রসারিত করিয়া উদয়াচলে উদিত হইলেন। লোকে দেখিল,—পূর্ব্বদিকে

উদয়গিরির উচ্চ উচ্চ শিখরের মধ্য দিয়া রবিদেব কত হস্তেই না ঐ গিরিকে ধারণ করিলেন। লোকে মুখ ফিরাইয়া দেখিল,—পশ্চিম দিকের অচলশিরেও সৌর করের শোভা অবতংসের ন্যায় দেখা যাইতেছে; কিন্তু মিথ্যা সে অবতংস, মিথ্যা তাহার শোভা! প্রভাতে মৃদুল বায়ু বহিতে লাগিল। সে বায়ুর দেহ সৌর কর স্পর্শ করিল। মন্দ মারুত সৌর কর-তাপ উপশমের জন্য সর্ব্বাঙ্গে শীতল হিমকণা মাখিয়া লইল। রবিকর-তাপে সে যেন বড় দুর্ব্বল—বড়ই ক্ষুৎপিপাসাকুল; তাই কান্তিহীন ইন্দুমণ্ডলের শেষ জ্যোৎস্নাটুকুও সে পান করিয়া ফেলিল। রাত্রি গেল, প্রভাত হইল, রামলক্ষ্মণাদি রাজকুমারগণ শয্যা হইতে উঠিলেন, প্রাতঃকৃত্য সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাধা করিলেন; পরে অনুচরবর্গ সহ পবিত্র বশিষ্ঠাশ্রমে গমন করিলেন। এ দিকে বশিষ্ঠমুনিও সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপন করিয়া স্বীয় আশ্রম হইতে বহির্গত হইলেন। কত লোক কত দিক্ হইতে তাঁহার পাদপদ্মে অর্ঘ্য প্রদানপূর্ব্বক তাঁহাকে বন্দনা করিতে লাগিল। মুনিবর রাজসভায় আসিবার জন্য উদ্যত হইলেন। কত মুনি, কত রাজা, কত ব্রাহ্মণ তাঁহার আশ্রমে উপস্থিত; কত হস্তী, কত রথ, কত অশ্ব, রাজগণের সঙ্গে সমাগত, তাহাতে সেই ঋষির আশ্রম ক্রমেই নীরন্ধ্র হইল।

অতঃপর মুনিবর বশিষ্ঠ যথাকালে দশরথসভায় প্রস্থান করিলেন। রাম, লক্ষ্মণ প্রমুখ রাজকুমারগণ তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিলেন। সেনা ও অনুচরগণ তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আগমন করিতে লাগিল। মহীপতি দশরথও সন্ধ্যা-বন্দনাদি প্রাতঃকৃত্য সকল সমাধা করিয়া মহর্ষি বশিষ্ঠকে অভ্যর্থনা করিয়া লইবার জন্য স্বীয় রাজপুরী হইতে অনেক দূরে আগমন করিলেন। মহর্ষির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। তিনি সাদরে মহর্ষিকে বন্দনা করিলেন।

অনন্তর সকলেই আসিয়া সভাগৃহে প্রবেশ করিলেন এবং স্ব স্ব পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট বিষ্টরাসনে উপবিষ্ট হইলেন। এ দিন সভাগৃহ নানা পুষ্প-মালায় ও বিবিধ মণিমুক্তায় অত্যধিক সুসজ্জিত হইয়াছিল। গত পূর্ব্ব দিন যে সকল নভশ্চর ও ভূচর শ্রোতা সভায় আসিয়া যোগদান করিয়া-ছিলেন, অদ্যকার সভাক্ষেত্রেও তাঁহারা আসিয়া উপবেশন করিলেন।

শ্রোতৃবর্গ সভাগৃহে উপস্থিত হইয়া পরস্পর পরস্পরকে অভিবাদনপুরঃসর সকলেই নীরবে বসিয়া রহিলেন। কাহারও মুখে অন্য বাক্যস্ফূর্ত্তি নাই। সুন্দর সভাভূমি তখন নিবাত-নিষ্কম্প পদ্মিনীর ন্যায় প্রতিভাত হইল। ব্রাহ্মণগণ, মুনি-ঋষি ও রাজগণ সকলেই যথাযোগ্য স্থানে স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট আসনে যথাসুখে সমাসীন হইলেন; সভাসদ্‌গণ পরস্পর পরস্পরের প্রতি মৃদু ভাষায় স্বাগত প্রশ্ন করিতেছিলেন, এতক্ষণে তাহাও ক্রমশঃ সমাপ্ত হইল। বন্দিগণ স্তুতিগাথা গান করিয়া সভার কোন এক প্রান্তে নীরবে বসিয়া রহিল। এইরূপে সভাভূমি একেবারেই নিঃশব্দ হইল। মহর্ষির মুখনিঃসৃত মধুর উপদেশবাক্য শুনিবার জন্যই যেন সৌরকর-নিকর সহসা বাতায়ন-পথে সভাগৃহে আসিয়া প্রবেশ করিল। সমাগত বহু শ্রোতা একসঙ্গে সত্বর সভাগৃহে প্রবেশ করিলেন, অথচ পরস্পরের হস্তস্পর্শে বা অঙ্গ-সঙ্ঘর্ষণে মুক্তা বা অন্যান্য ভূষণাদির কোনই শব্দ পরিশ্রুত হইল না। সভা সম্পূর্ণই নিস্তব্ধ হইল।

এই সময় শঙ্করসম্মুখে ষড়াননের ন্যায়, বৃহস্পতির নিকট কচের ন্যায়, দৈত্যগুরু-সমীপে প্রহ্লাদের ন্যায় এবং বিষ্ণুর সম্মুখে বৈনতেয়ের ন্যায় রঘুনন্দন রাম বশিষ্ঠ-সমীপে উপবিষ্ট হইলেন। তদীয় দৃষ্টি তখন বশিষ্ঠের মুখের দিকে নিবিষ্ট হইলে মনে হইল, ভ্রমরী যেন শূন্যপথে ঘুরিয়া ঘুরিয়া অবশেষে প্রফুল্ল পদ্মোপরি বসিয়া পড়িল।

অনন্তর বাক্যবিদ্ বশিষ্ঠ মুনি রামচন্দ্রের হৃদয়নিহিত অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে পূর্ব্ব পূর্ব্ব ক্রমানুসারেই বলিতে আরম্ভ করিলেন।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রঘুনন্দন! গত দিবস তোমায় যাহা যাহা উপদেশ দিয়াছি, সে সকল তোমার স্মরণ আছে ত? আমি যে যে কথা কহিয়াছি, তাহার অর্থ অত্যন্ত গভীরতম এবং তাহা পরমার্থ জ্ঞানের উপযোগী। হে শত্রুসূদন! এক্ষণে তোমার জ্ঞানোদয়ের জন্য অন্য কথাও কহিতেছি, তুমি তাহা শ্রবণ কর। এই কথা শ্রবণ করিলে তোমার সিদ্ধি লাভ নিশ্চিতই ঘটিবে। এই যে সংসার—এই যে নানা বস্তুময় জগৎ, যাহাতে জীবগণ নিয়তিক্রমে অনবরত ঘুরিতেছে, ফিরিতেছে, ইহা হইতে উদ্ধার

পাইতে হইলে অগ্রে বৈরাগ্য অভ্যাস করিয়া ইহার প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইতে হয়। অতএব হে রামচন্দ্র! তুমিও তত্ত্বজ্ঞান ও আসক্তি পরিত্যাগ অভ্যাস কর। যদি সংসারে প্রকৃত তত্ত্ব সম্যক্ সম্পরিজ্ঞাত হওয়া যায়, তাহা হইলে সাংসারিক অজ্ঞান অপগত হয়। অজ্ঞানবশেই বাসনার আবেশ হয়; যখন জ্ঞানোদয় হয়, তখন তাহা আপনা হইতেই বিলয় পায়। তখন দুঃখ-শোক কিছুই থাকে না, চিরশান্তি সমুদিত হয়, যথায় কোন শোকসম্ভাবনা নাই, তাদৃশ পদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। হে রাম! ভাবিয়া দেখ, এ অনন্ত জগতের আদি অন্ত কিছুই দেখা যায় না। দিক্ ও কালাদি দ্বারা ইহা পরিচ্ছিন্ন নহে। ইহার বিস্তৃতি এত যে, কোন দিকেরই ইয়ত্তা করা যায় না। এ জগৎ একাদ্বয় ব্রহ্মরূপেই অবস্থিত। জগৎ ও ব্রহ্ম এ দুইই অভিন্ন। এ সংসারে যাহারই সত্তা বা বিদ্যমানতা, তাহাই সেই ব্রহ্ম। ব্রহ্ম ভিন্ন এ সংসার আর কিছুই নহে। সেই ব্রহ্ম-প্রশান্ত; সর্ব্বসাধারণ্যেই তাঁহার তুল্য সত্তা। সুতরাং ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কোন বস্তুর অস্তিত্ব আছে কোথায়? তুমি সংসারের এই প্রকৃত রহস্য বুঝিতে পারিয়া অহঙ্কার পরিহার কর, আপনার যে একটা পৃথক্ সত্তা, তাহা একেবারেই বিস্মৃত হও। তাহা হইলেই দেখিবে,—তোমার এই যে দেহ, ইহা মুক্তদেহ হইয়াছে; অজ্ঞান-বিলসিত সুখ-দুঃখ ইহাতে দেখা যাইতেছে না। এইরূপে তুমি একরূপ প্রশান্ত ও সাক্ষাৎ আত্মসুখময় হইবে। কর্ম্মফলের তীব্র বেগে এ সংসারে আর তোমাকে ভ্রমণ করিতে হইবে না। তুমি আকাশবৎ স্বচ্ছ সুন্দর আনন্দময় সাক্ষাৎ ব্রহ্ম হইয়া বিরাজ করিতে থাকিবে।

হে রঘুনাথ! এ সংসারে না চিত্ত, না অবিদ্যা, না মন, না জীব, কিছুই নাই, তবে যে চিত্ত প্রভৃতির উপলব্ধি হয়, তাহা কেবল অজ্ঞানেরই বিলাস বৈ আর কিছুই নয়। সুতরাং যখন জ্ঞানোদয় হইবে, তখনই বুঝিতে পারিবে যে, উহারা কেবল সেই একাদ্বয় ব্রহ্মেরই কল্পনা মাত্র। বুঝিয়া রাখ, অজ্ঞানাপগমেই পরমার্থ প্রাপ্তি হয়; কিন্তু দেখ, কি ভোগ, কি ভোগ্য, কি ভোগবাসনা, কি ভোগকর্ত্তা, সমস্তই সেই ব্রহ্মের ন্যায় অনাদি ও অনন্ত। সংসারে এই অজ্ঞান-বিকাশ সাগরের ন্যায় সুবিশাল

এই অসীম অজ্ঞান বিকাশ অতিক্রম করিতে হইলে, কি স্বর্গ, কি মর্ত্ত্য, কি পাতাল, কি প্রাণিপুঞ্জ, কি তৃণসমুদায়, কি শূন্যাকাশ, সর্ব্বত্রই সেই এক ব্রহ্মকেই দেখিতে হইবে। বুঝিতে হইবে, এ সংসারে—এ বিশাল বিশ্বপ্রপঞ্চে সেই একমাত্র ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই বিদ্যমান নাই। সংসারে যাহাকে হেয় জ্ঞানে উপেক্ষা করিতেছি, যাহার প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করিতেছি, যাহাকে উপাদেয় বোধে বরিয়া লইতেছি, যাহাকে বন্ধুজ্ঞানে আদর করিতেছি, যাহাকে সম্পদ ভাবিয়া আনন্দিত হইতেছি, যাহাকে দেহ আখ্যা প্রদান করিতেছি, ভাবিতে হইবে—সকলই সেই অনাদি অনন্ত ব্রহ্ম। সেই ব্রহ্ম ভিন্ন কুত্রাপি কিছুই নাই। ব্রহ্মই সাগরের ন্যায় অনন্তাকারে বিলসিত হইতেছেন। কিন্তু যতক্ষণ অজ্ঞানের কার্য্য, যতক্ষণ সর্ব্বত্র অব্রহ্মভাবনা, যতক্ষণ এই বিশ্বপ্রপঞ্চে আস্থা বা সত্য বিশ্বাস, ততদিনই জীবের এই সকল চিত্তভ্রান্তি-কল্পনা। যতদিন এই দৃশ্য দেহে 'অহং' ভাব, যতক্ষণ এ সংসারে আমার বলিয়া অসত্য আত্মবোধ, যত দিন 'আমার ইহা' এরূপ আস্থা, ততদিনই চিত্ত-বিভ্রম। যত দিনে না চিত্তের উদারতা বা মহত্ত্ব ঘটিবে, যতদিনে না তাহার সাধু-সঙ্গ সঙ্ঘটিত হইবে, যতক্ষণে না তদীয় মূর্খতা ঘুচিয়া যাইবে, ততক্ষণ তাহার ক্ষুদ্রতা বা সঙ্কীর্ণতা নষ্ট হইবে না। যতদিনে না সম্যক্ জ্ঞানোদয় হয়,—যত দিনে না এই অসত্য সংসারের অসত্য ভাবনা শিথিল হইয়া যায়, ততদিনই চিত্তাদির কার্য্য দর্শনে তাহাদের প্রকাশ প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। যত দিন জীবের অজ্ঞত্ব, যত দিন অজ্ঞতা-জনিত অন্ধত্ব, যতক্ষণ বিষয় বাসনায় পরবশত্ব, যতদিন মূর্খতা বশত মহামোহ, ততদিনই কল্পিত চিত্তাদির কল্পনা পরিস্ফুট; তবে কিসে ইহাদের বিলয় হয়? বিলয়ের একমাত্র কারণ বিবেকোদয়। কিন্তু কথা এই যে, বনে বিষগন্ধ পাইলে চকোর যেমন সে বনে প্রবেশ করে না, তেমনি বিষয়-বিষের গন্ধ থাকিলেও বিবেক কখন বিষয়ীর অন্তরে প্রবেশ করিবে না। যাহার মন ভোগজালে আস্থাসম্পন্ন নহে, যাহার আশাপাশ বিচ্ছিন্ন হইয়াছে, তাহারই অন্তর পরম নির্ম্মল স্নিগ্ধ সুখে নির্ব্বৃতি পায় এবং তাহারই চিত্তবিভ্রম কাটিয়া যায়। তৃষ্ণা ও মোহ পরিত্যাগ বশত নিত্য যিনি বিশুদ্ধ জ্ঞানের অধিকারী, তথাবিধ প্রশান্তচিত্ত পুরুষেরই আস্থাহীন চিত্তভূমি

প্রবোধ-ফলবতী। এই ভ্রান্তিময় চিত্তের উদয় না হইবার পক্ষে ত্যাগই একমাত্র কারণ। যদি ত্যাগ অভ্যাস হয়, তাহা হইলেই ভ্রান্তি পূর্ণ চিত্তের উপলব্ধি হয় না। বুঝিয়া দেখ—এই দেহ—এই বিশ্বপ্রপঞ্চ, কিছুই নহে; এই ভাবে যদি ইহা দেখিতে, শুনিতে ও বুঝিতে পারা যায়, যাহার নিকট ইহা যেন একেবারেই অপরিচিতের স্থায় থাকে, যিনি ইহাতে কিছু মাত্র আস্থা রাখেন না, এবং যাহার নিকট এত দূরে অবস্থিত যে, ইহার যেন একটা সত্তা কিছুই নাই, এইরূপই ধারণা হয়, বল দেখি,—তাহার এই অজ্ঞানময় চিত্তের উদয় হইবে কিরূপে? শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনাদি দ্বারা যিনি অনন্ত চিৎতত্ত্ব সাক্ষাৎ করিয়াছেন, যাঁহার মনে এই দৃশ্য বিশ্ব লয় পাইয়াছে, 'আমি জীব' এই বিভ্রম তাঁহার নিশ্চয়ই প্রশান্ত হইয়াছে। অজ্ঞান বা সম্যক্ দর্শন নিবৃত্তি পাইলেই মিথ্যা ভ্রমজনক স্বভাব বিনষ্ট হইয়া যায়। তৎকালে এমন এক তেজের অভ্যুদয় ঘটে যে, তাহা তেজোরাশি সূর্য্য হইতেও অধিক তেজঃশালী। সেই তেজোময় পদার্থের তীব্র তেজে অজ্ঞানাতিমির অপ কৃত হয়, পরমার্থ দর্শন ঘটে এবং শুষ্ক পত্রের স্থায় এই ভ্রমময় চিত্ত চিরতরে দগ্ধ হইয়া যায়। অগ্নিতে ঘৃতকণা পড়িলে তাহা যেমন পুড়িয়া কোথায় অদৃশ্য হইয়া যায়; জানিবে,—এই চিত্তের দশাও সেইরূপই ঘটিয়া থাকে। চিত্ত এই উপায়ে নষ্ট হয়। এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, চিত্ত যদি না থাকে, তবে লোক-ব্যবহার নিষ্পন্ন হয় কিরূপে? উত্তরে বক্তব্য এই যে, যাঁহারা বিবেকের প্রসাদে জীবন্মুক্ত হইয়াছেন,যাঁহারা পরাবরদর্শী মহাত্মপদে বিরাজমান রহিয়াছেন, তাঁহাদের যে চিত্তপদবী, তাহা 'সত্ত্ব' আখ্যায় অভিহিত। জীবন্মুক্ত ব্যক্তিবর্গের শরীরগত বাসনা নামে মাত্র ব্যবহারিণী, পরন্তু তাহা চিত্ত নামে পরিচিতা নহে; 'সত্ত্ব'পদেই অধিষ্ঠিতা। এ সংসারের প্রকৃত তত্ত্বে যাঁহারা অভিজ্ঞ, চিত্ত তাঁহাদের লোপ পায়। নিত্য তাঁহারা সমপদে বিরাজ করেন; সুতরাং বাসনা বলিতে যাহা বুঝায়, তাহা তাঁহাদের থাকে না। তাঁহারা সত্ত্ববলে হেলাক্রমে অনায়াসেই সংসারে ভ্রমণ করেন এবং সংসার ব্যাপার নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। যাঁহাদের দ্বৈত জ্ঞান তিরোহিত হইয়াছে, সংসার ও ব্রহ্ম উভয়ত্রই যাঁহাদের সমজ্ঞান; তাঁহাদের বাসনা নাই; এই সংসার যাত্রা তাঁহারা যদিও নির্ব্বাহ করিতে থাকেন, তথাপি একমাত্র

সত্ত্বেই তাঁহাদের অবস্থান; তাই তাঁহারা শান্ত ও সংযতেন্দ্রিয়। সংসারে তাঁহারা সকল কার্য্যই করেন, অথচ সর্ব্ব সময়ের জন্যই সেই পরম জ্যোতিঃ প্রত্যক্ষ করিতে থাকেন। চিত্ত যখন পরিশুদ্ধ হইয়া বহ্নির ন্যায় প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠে, তখন তাহার নিকট এই জগত্রয় তৃণের ন্যায় দগ্ধ হইয়া যায়। যখন জ্বলন্ত চিত্তের মধ্যে ফেলিয়া জ্ঞানী ব্যক্তি বিশ্বপ্রপঞ্চকে দগ্ধ করিতে থাকেন, তখন এই চিত্তাদি বিভ্রমও নিবর্ত্তিত হয়। এক্ষণে 'সত্ত্ব' কি, তাহা বলিতেছি; যে চিত্ত বিবেকবশে বিশদ হইয়াছে, তাহারই নাম সত্ত্ব। চিত্ত যখন 'সত্ত্ব' হইয়া উঠে, তখন আর মোহের উদয় হয় না। এ পক্ষে দৃষ্টান্ত-স্বরূপ দগ্ধ বীজে অঙ্কুরোৎপত্তি না হইবার কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। অজ্ঞানীর অন্তঃকরণ যত দিন 'চিত্ত' নাম ধারণ করিবে, ততদিন এ সংসারে তাহাকে বারবার জন্ম লইতে হইবে। আর চিত্ত যে মুহূর্ত্তে 'সত্ত্ব' রূপে পরিণত হইবে, অমনি মুক্তি আসিয়া উপস্থিত হইবে; তখন আর এ ভবচক্রে ভ্রমণ করিতে হইবে না। জ্ঞানাগ্নি দ্বারা চিত্তকে এমন করিয়া দগ্ধ করিতে হইবে, যেন তাহার আর প্ররোহ জন্মিতে না পারে। চিত্তের প্ররোহ কি প্রকার; যথা—আমার পুত্র, আমার বিত্ত, আমার ভৃত্য, এই প্রকার মমতাবেশের নাম ঈষণা বা দুরাকাঙ্ক্ষা; এতাদৃশ দুরাকাঙ্ক্ষাই চিত্তের প্ররোহ। এইরূপ প্ররোহোদ্গমের সহিত ঐ চিত্তকে যদি দগ্ধ করা যায়, তাহা হইলে আর কস্মিন্ কালেও উহার অস্তিত্ব সম্ভব হইবে না। নতুবা উহারও ঐ পুনরুদ্গম নিশ্চিত। দেখ, মূলোৎপাটন না করিয়া পরশু-ছিন্ন তৃণকে যদি দগ্ধও করা হয়, তথাচ ক্রমশঃ আবার তাহার অঙ্কুরোদ্গম অসম্ভব নহে। এই জন্যই বলিয়াছি, যাহাতে পুনঃ প্ররোহোদ্গম না হইতে পারে, এমন করিয়াই চিত্তকে দগ্ধ করিতে হয়। চিত্তের যদি চিত্তরূপে বিকাশ হইল, তাহা হইলেই বিশ্বের বিকাশ ঘটিল, আর ঐ চিত্তকে দগ্ধ কর,—নষ্ট কর; দেখিবে—তখন আর তোমার নিকট বিশ্ববিকাশ মোটেই হইবে না। চিত্তের অসত্তায় জগতের অসত্তা কেমন করিয়া ঘটে দেখ,—ব্রহ্ম ও জগৎ একই কথা; যিনি ব্রহ্ম, তিনিই জগৎ। এ জগৎকে ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই বলা হয় না। যেমন জ্ঞানময় উজ্জ্বল চিত্ত আর ব্রহ্ম, এ উভয়ই

এক,তেমনি ব্রহ্ম ও জগৎও অভিন্ন বা একই পদার্থ; এ উভয়ের ভেদ কিছুই নাই। এ দিকে ত্রিজগতের যে সত্তা, তাহা অজ্ঞানাবৃত চিত্তমধ্যেই আছে। চিত্ত ভিন্ন ত্রিজগতের আর স্বতন্ত্র সত্তা নাই। মরীচে যেমন তীক্ষ্ণতা, তেমনি চিত্ত মধ্যেই জগৎসত্তা; সুতরাং তত্ত্বদৃষ্টিতে চিত্ত ও জগৎ একই কথা। কাজেই 'আছে' ও 'নাই' এই দুইটা কথা সংসারে সম্পূর্ণ ই মিথ্যা, অর্থাৎ মায়াপ্রযুক্ত ভ্রান্তি-মাত্র। ফলে, জগৎ বলিয়া পৃথক্ উদ্ভব কিছুই নাই এবং পৃথক্ বিলয়ও কিছুই নাই। এখন বুঝিয়া দেখ, চিত্ত যতক্ষণ, এই জগৎও ততক্ষণ, আর চিত্তের যে নাশ,তাহাই জগতের নাশ। এখন আলোচ্য এই যে, 'আছে' ও 'নাই' এ দুইটা কথার মিথ্যাত্ব হয় কেমন করিয়া? শ্রুতি বলেন,—অগ্রে কিছুই ছিল না, পরে সমস্তই হয়। অপিচ লোক-ব্যবহারেও 'ইহা নাই' 'তাহা আছে' এই দুইটা কথার প্রচলন দেখা যায়। পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিবাক্য ও শেষোক্ত লৌকিক বাক্য কি নিরর্থক? না,—তাহা নহে। এ সংসার অনন্ত অপরিমেয় আকাশবৎ মহান্ অবিচ্ছিন্ন। কিন্তু অতত্ত্বজ্ঞ লোক বুঝে না, তাই ভ্রমান্ধ হইয়া ইহাকে কত ভাগে বিচ্ছিন্ন করে, কত খণ্ড খণ্ডাকারে বিভক্ত করিয়া নানা নাম প্রদান করে, কত কল্পিত অর্থ করিয়া বুঝে—বুঝাইবার জন্য কত প্রকার কত সঙ্কেত করিয়া থাকে। তাহাদের জ্ঞান এমনি বাসনা-বিজড়িত যে, ব্রহ্ম ও বিশ্বপ্রপঞ্চ এই উভয়কে পৃথক্ অবলোকন করে। দ্বৈত জ্ঞানমূলক লৌকিক ব্যবহার কেবল অজ্ঞানেরই পরিণাম; শাস্ত্রেরও ইহা সমাধান। অতএব বিচার করিয়া সংশয় পরিহার কর,—করিয়া সদসদ্ বুদ্ধি বিদূরিত করিয়া দাও।

রামচন্দ্র! একাদ্বয় ব্রহ্ম ব্যতীত এ জগতের যখন আর কিছুই নাই, বা ছিল না,তখন যাহাকে এই হস্ত-পদাদি-ময় দেহ বলিয়া তুমি অবধারণ কর, সেই তুমিও অজ্ঞানাবৃত চিত্তের বিকার বৈ আর কিছুই নহ; অতএব বিশুদ্ধ চিন্ময় নও বলিয়াই মিথ্যা; কাজেই যে পর্য্যন্ত তোমার ভ্রান্তি রহিবে, তত-কাল আত্মা বা ব্রহ্মময় হইবার যোগ্য নহ। সুতরাং কেনই বা বৃথা রোদন করিতেছ? শুদ্ধ চিন্ময় নহে বলিয়াই এই সকল জগতেরই যখন মিথ্যাত্ব প্রতিপন্ন, তখন সে জগতের অভাবে তোমার আর পৃথক্ অস্তিত্ব রহিবে কোথা হইতে? এই সমস্ত সংসারকে যদি চিন্ময় বলিয়া অবধারিত

করিয়া লও, তবে বিচারে বুঝিবে—তোমার চিত্ত শুদ্ধ, সত্যরূপে পরিণত এবং তখন সদসদ্ বুদ্ধির অপায়ে অনাদি ও অনন্ত হইয়া পড়িয়াছে। সে সময়ে সৎ ও অসদ্ বুদ্ধিমূলক মিথ্যা কল্পনার উপস্থিতি আর কোথা হইতে হইবে? তখন বুঝিতে পারিবে,—তুমি চিদাত্মা হইয়াছ, নিরংশ হইয়াছ, এবং অনাদি অনন্ত মহান্ বিরাট আকারে পরিণত হইয়াছ। এই আকারই তোমার প্রকৃত আকার; তোমার এই প্রকৃত আকার তুমি স্মরণ কর। কস্মিন্ কালেও বিস্মৃত হইও না। নিজের বাস্তব বিরাট আকার বিস্মৃত হইয়া কদাচ আপনাকে পরিমিত ক্ষুদ্রাকারে বুঝিও না। এ সংসারের সত্তা একাদ্বয় বিরাটাকারেই পর্য্যবসিত। সেই সত্তাকে তুমি বুঝিয়া লও—বিরাটাকারে পরিণত হও,—সর্ব্বদা আনন্দময়ভাবে পরিচ্ছিন্ন সংসারকে অপরিচ্ছিন্নরূপে অবলোকন করিতে থাক। দেখিতে পাইবে,—তুমিই কেবল এ সংসারের রূপ, তুমিই কেবল শান্তি ও চৈতন্যস্বরূপ এবং তুমিই কেবল সেই ব্রহ্ম।

বৎস! তুমি স্ফটিকোদরের ন্যায় স্বচ্ছ শুভ্র চিন্ময়াকার; তোমার অন্তর অবলোকন করিয়া দেখ, এই যে নানাভাবময় মোহ-বিলাস বিনশ্বর সংসার, ইহা তুমি বৈ আর কিছুই নয়। অপর দিকে তুমি নানা ভাব-ময় নহ, অথচ তুমিই সকলের পরিশেষ। তুমি এমনই এক পদার্থ, তাহা বাক্য দ্বারা অবর্ণনীয়। তোমার স্বরূপ ব্যক্ত করিতে হইলে এই মাত্র বলিতে হয় যে, তুমি যাহা, তাহাই; তবে কি তুমি একান্তই পরোক্ষ বস্তু? বলিব,—তাহাও নহ। কেন না, তুমি স্বপ্রকাশ। ফলে যাহা দেখা যায়, অথবা যাহা দেখিতে না পাই, সকলই যখন তুমি, তখন তোমা ব্যতীত 'আছে' বা 'না আছে' ব্যবহার আর কুত্রাপি নাই। এই তরুলতাদি মিথ্যা-ব্যবচ্ছিন্ন সাঙ্কেতিক পদার্থ সকল রহিয়াছে, ইহারাও তুমি নহ; আর তোমারও ইহারা কেহই নহে। তুমিই ব্রহ্ম; ব্রহ্ম ভিন্ন তুমি কিছুই নহ। সুতরাং বলিতেছি, ওহে চিদ্‌ঘনময় আত্মদেব! তোমাকে আমার নমস্কার।

হে রাম! তোমার আদি মধ্য বা অন্ত নাই, তুমি অতি নির্ম্মল বিশাল স্ফটিক শিলার অন্তরালের ন্যায় অন্তরে বাহিরে সর্ব্বত্র নিবিড়

চিদ্ঘন-স্বভাব; অতএব তুমি যে দুঃখাদি কোন বিক্রিয়ারই ভাজন নহ, ইহা মনে করিয়া স্বস্থ হও। তোমার অতি বিস্তৃত চৈতন্যের উদরে এই মায়ার রেখা বা বিশ্বসংসার, বীজ-মধ্যগত সূক্ষ্ম পল্লবের ন্যায় বিকাশ পাইতেছে। তাই বলিতেছি,—হে বিশ্বময় রঘুবর! তুমি জয়যুক্ত হও; এ হেন রূপধারী তোমাকে আমিও নমস্কার করি।

দ্বিতীয় সর্গ সমাপ্ত। ॥ ২ ॥

তৃতীয় সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে অনঘ রঘুবর! অসীম অনন্ত সাগর; সে সাগরে কতই না তরঙ্গ উত্থিত হয়। কিন্তু যদি একবার তলাইয়া দেখ, দেখিবে,—সাগরের ঐ অনন্ত তরঙ্গশ্রেণী কেবল রাশি রাশি জল বৈ আর কিছুই নয়। এই উপমানুসারে বলা যায়, এই নিখিল ভব-বাসনা-জনিত কল্পনাময় বিশ্বপ্রপঞ্চ যে চিৎসামান্য হইতে উত্থিত, সেই চিন্ময় ব্রহ্মই তুমি; তুমি সেই চিন্ময় হইতে স্বতন্ত্র কিছুই নহ। হে চিদাত্মরূপিন্! যদি বিচার করিয়া বুঝিয়া দেখা যায়, যদি ভব-ভাবনা দূরে পরিহার করা হয়, যদি একমাত্র সেই একাদ্বয় তত্ত্বের সম্ভাবধারণায় অন্যান্য অলীক প্রপঞ্চের সদসৎ জ্ঞান পর্য্যন্ত বিদূরিত করিতে পারা যায়, তাহা হইলে চিরতরে সেই সংসারজনিকা বাসনাদি তিরোহিত হইবার সম্ভাবনা। ফলে ঐ অবস্থায় তাহারা কোথায় থাকিবে বল দেখি? তাহাদের নামও লুপ্ত হইয়া যায়। চিৎ হইতেই জীব-বাসনাদি জগদ্বিভাগ স্বতই পরিস্ফুরিত হয়। চিতের এই কচন ভেদ-কল্পনা স্বতন্ত্র নাই, ইহা অনুভব করিতেও পারা যায়। পরন্তু হে রাম! চিৎকল্পিত বস্তু ভিন্ন অপর বস্তু কোথায় আছে, কে বলিতে পারে? চিৎ যেন অতি গভীর সাগর, আর সংসার তাহার তরঙ্গ; ঐ সাগর যদি নিবাত-নিষ্কম্পবৎ প্রশান্ত হয়, তাহা হইলে আর তরঙ্গ থাকিবে কোথায়? ফলে প্রশান্ত চিত্তে সংসারভাব নাই। রাম! তুমিই সেই

চিদর্ণব; আকাশবৎ তোমার সর্ব্বত্র সমত্ব ও প্রশান্তভাব। যেমন অনল হইতে উষ্ণতা, অম্বুজ হইতে সৌরভ্য, কজ্জল হইতে কৃষ্ণতা, হিম হইতে শুভ্রতা, ইক্ষু হইতে মাধুর্য্য, তেজ হইতে আলোকচ্ছটা; চিৎ বা চিত্ত হইতে অনুভবকারিণী শক্তি এবং জল হইতে জলতরঙ্গ অভিন্ন, তেমনি এই জগৎও চিৎ বা চিত্ত হইতে চির দিনের জন্য অপৃথক্। অনুভব চিৎ হইতে ভিন্ন নহে এবং যাহাকে 'অহং' বা আমি বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়, তাহাও অনুভব ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। যাহাকে 'অহং' বা 'আমি' বলিয়া থাকি, তাহাও জীব হইতে পৃথক্ নহে। আবার জীবও মন হইতে স্বতন্ত্র নহে। এইরূপে দেখিতে গেলে মনও ইন্দ্রিয়াতিরিক্ত নয় এবং দেহও ইন্দ্রিয় হইতে ভিন্ন নহে। আবার দেখ, দেহ হইতেও জগৎ স্বতন্ত্র নহে; ফলে যে দিকে যত দেখিবে, সকলই জগৎ; জগৎ ব্যতীত আর কিছুই কোথাও নাই। এখন বুঝিয়া দেখ, এ সংসারে চিত্তই সমস্ত; চিত্তের প্রতি দৃষ্টিপাত কর,—দেখিবে, সকলই তোমার দৃষ্ট হইবে। এই সংসারচক্র এমনি-ভাবে চিরদিন ঘুরিয়া আসিতেছে; আবার জ্ঞাননেত্র উন্মীলন করিয়া দেখ,—দেখিবে ইহা স্থির, ইহা কখনই ঘূর্ণমান হইতেছে না। চিরকাল ইহা একইভাবে সমান রহিয়াছে। আত্মজ্ঞান যদি অনন্ত বা অবিচ্ছিন্ন হয়, তাহা হইলে দেখিতে পাইবে, সকলই অখণ্ডিতভাবে চিরকালের জন্য সমানই আছে। আকাশে যেমন আকাশ বিরাজিত, তেমনি সংসারে সংসার অবস্থিত। কোন কিছুই কিছুতে বিদ্যমান নাই। চিত্ত যদি নির্লিপ্ত হইয়া উঠে, তাহা হইলেই নিখিল বিশ্বই নির্লিপ্ত বলিয়া প্রতীতিগোচর হয়—যাহার যাহা প্রকৃত স্বরূপ, তাহাকে তাহাই প্রত্যয় করা হয়। ঐ অবস্থায় চিত্ত দেখে,—শূন্যেই শূন্য অবস্থিত, ব্রহ্মেই ব্রহ্ম বিরাজিত, সত্যেই সত্য প্রকাশিত, আর পূর্ণতাতেই পূর্ণতা প্রতিষ্ঠিত; জ্ঞানোদয়ে জ্ঞানী জন রূপ দেখেন, তাঁহার মনের ক্রিয়া হয়, তিনি সমস্ত কার্য্যই করেন, তাঁহার না হয় এমন কিছুই থাকে না; পরন্তু জ্ঞানোদয়ে তিনি যে রূপ দর্শন করেন, তাহা তাঁহার উপাদেয় বোধ হয় না, তিনি তাহা নিজস্ব বলিয়া ধরিয়া লয়েন না; কাজেই তাদৃশ দর্শনাদি-ব্যাপারে তাঁহার জ্ঞানের কর্ত্তৃত্বাভিমান কিছুই নাই। জ্ঞানী কোন সময়ের জন্যই ভাবেন না যে, এই প্রত্যক্ষ বস্তু

আমারই; যাহা হউক দেখ, এ সংসারে যাহা উপাদেয় বলিয়া ধরিয়া লইবে, আপাততঃ তাহা সুখের হইলেও পরিণামে তাহাই দুঃখের হইয়া উঠিবে। এ সংসারে কোন বস্তু অনুপাদেয় জ্ঞানে ধরিয়া লওয়া বড় কঠিন কার্য্য; পরন্তু যদি কেহ ঐরূপ কার্য্য করিয়া উঠিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে তাদৃশরূপে বিষয়গ্রহণ—সুখ বা দুঃখ, এই উভয়ের কোনটারই কারণ হয় না। বলিতে পার, এই নানারূপে প্রতীয়মান ভাব-সমূহের অনুপাদেয়তা-বোধ কিরূপে হইবে? উত্তরে বলা যায়, বুঝিতে হইবে—ব্রহ্ম ও জগৎ যেন একটা বিশাল অনন্ত আকাশ। লোকে যেমন এই এক মহাকাশকে নানা খণ্ডে বিভক্ত বলিয়া অনুভব করিয়া থাকে, বাস্তব পক্ষে কিন্তু ইহা নানা নহে—একই; তেমনি সেই বিরাট দেহ ব্রহ্মকে নানাকারে অবলোকন করা হয় বলিয়া জগতের উপলব্ধি হয়। পরন্তু সে জগৎ প্রকৃত কিছুই নহে। যাহা প্রকৃত, তাহা সেই একাদ্বয় ব্রহ্ম। এইরূপ স্থির ধারণা হইলেই এই যে নানা বস্তুময় সংসার, ইহাকে একরূপ বলিয়া বুঝা যায়। এইরূপ বোধের উদয়েই জ্ঞানীর চক্ষে নানা বস্তু দর্শন অনুপাদেয় হইয়া উঠে; কাজেই সেরূপভাবে বস্তুর দর্শন বা গ্রহণাদি হইতে সুখ বা দুঃখ কিছুরই উদয় হয় না। এ হেন জ্ঞানী জনের অন্তর অম্বরের ন্যায় নির্ম্মল হইবে। বাহিরে কোন আড়ম্বর থাকিবে না, যে কিছু লৌকিক আচার, সকলই তিনি সুচারু ভাবে নির্ব্বাহ করিবেন। এ সংসারে কত সময় কত হর্ষ, কত অমর্ষ, কত কি দোষ আসিয়া উপস্থিত হইবে, কিন্তু কোনও বিকারেই তিনি বিচলিত হইবেন না; সর্ব্বদা কাষ্ঠ কিম্বা লোষ্টের ন্যায় অবিকৃত অচেতন অবস্থায় অবস্থান করিবেন। এ হেন অবস্থাপন্ন জ্ঞানীর নিকট কোন ঘোর শত্রু তাঁহাকে প্রহার করিতে উদ্যত হইলেও তিনি তাহাকে অকৃত্রিম মিত্রভাবে অবলোকন করেন। বস্তুতঃ ইহাই বটে, প্রকৃত জ্ঞানীর আচরণ। দেখ, নদী যেমন স্বীয় তটস্থ তরুলতা প্রভৃতিকে ভাসাইয়া লইয়া যায়, তেমনি যিনি সৌহৃদ্য ও মাৎসর্য্যাদিকে সমূলে উন্মূলিত করিয়া ফেলেন, তাঁহার—সেই মহাপুরুষের চিত্ত কদাচ হর্ষ বা অমর্ষদোষে দূষিত হইতে পারে না।

রামচন্দ্র! রাগ বল, দ্বেষ বল, বা রাগ-দ্বেষ হইতে উৎপন্ন চিত্ত-বিকার বল, এ সমুদায়ের তত্ত্ব যদি যথাযথ বিচার করিয়া না দেখা যায়,

তাহা হইলে যাঁহারা রাগ-দ্বেষ-বিরহিত সৎ পুরুষ বলিয়া বিখ্যাত, তাঁহারাও অসৎস্বরূপ এবং সেবিত হইলেও অসেবিত হইয়া থাকেন। যাঁহার 'অহং' ভাব নাই, বুদ্ধি যাঁহার কোন কিছুতেই লিপ্ত হইবার নহে, এই সমুদায় লোককে তিনি যদি বধও করেন, তথাপি তাঁহার হত্যাপরাধ হয় না এবং নিজেও তিনি নিহত হইবার নহেন। সংসারে যাহার অস্তিত্ব নাই, তাহাকে 'আছে' বলিয়া ভাবিয়া লওয়াই মায়া। যখন বিমল জ্ঞানের অভ্যুদয় হয়, তখন সেই মায়া অবশ্যই আপনা হইতে বিলয় পাইয়া যায়। তৈল-পরিহীন প্রদীপের ন্যায় যাহার অন্তরের বাসনারাশি শান্ত বা নির্ব্বাপিত হয়, চিত্রার্পিত ক্রিয়াবিরহিত শত্রুদলের ন্যায় নিষ্ক্রিয় নির্জীব সংসারকে তিনিই আপন অবিকৃত প্রজ্ঞার প্রভাবে জয় করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। যিনি মহাপুরুষ—যাঁহার নিকট এই জাগতিক পদার্থপরম্পরা অনুপাদেয় বলিয়া প্রতীত, যদীয় দৃষ্টিপথে এ সকল পতিত হইলেও সুখের, বা বিলীন হইয়া গেলেও দুঃখের নহে, দুঃখ-দাহ বা সুখ, এ সমুদায়ের কোন কিছুই তাঁহার বিদ্যমান নাই, এ সংসারে তিনিই বটে জীবন্মুক্ত পুরুষ।

তৃতীয় সর্গ সমাপ্ত। ॥ ৩ ॥

চতুর্থ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে অনঘ! এই যে মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, ইন্দ্রিয়াদি বা জীবাদি, ইহারা সকলেই সেই একমাত্র চিতের প্রকাশ; চিন্ময়কে অতিক্রম করিয়া ইহাদের আর থাকিবার স্থান কোথায়? বস্তুতঃ একমাত্র বিরাট-দেহ আত্মাই ঐ সমুদায়ে সত্তা সমর্পণ করিয়াছেন। এই নানা বস্তুময় সংসারের নানাত্ব সেই পরমাত্মারই প্রদত্ত। একমাত্র তিনিই আছেন, তাঁহার সত্তাতেই সকলের সত্তা; তাই বলা যায়, সকলই সেই এক; তিনি ব্যতীত আর কিছুই নাই। যেমন নেত্ররোগে বা দর্পণ-দর্শনে একই ব্যক্তিকে অনেকাকারে দেখা যায়, তেমনি ভ্রমের ঘোরেই আত্মাকে নানাকারে সংসারে প্রত্যক্ষ করা হয়। অন্ধকারের বিনাশ হইলে অন্ধকার-জনিত যে

একটা অন্ধতা, তাহাও যেমন নষ্ট হয়, তেমনি বিষাবেশবৎ বিষয়-বাসনার তিরোধান ঘটিলেই অজ্ঞানেরও অবসান হইয়া থাকে। শারদাগমে মিহিকা যেমন বিলয় পায়, তেমনি অন্তরালোচিত অধ্যাত্মরূপ মন্ত্রশক্তি-যোগে তৃষ্ণারূপিণী বিষ-বিসূচিকাও বিনষ্ট হইয়া থাকে।

রামচন্দ্র! অধ্যাত্ম-শাস্ত্রের আলোচনায় মূর্খতা যখন ক্ষীণ হইয়া যায়, জানিও,—চিত্ত তখন নিশ্চয়ই বাসনা প্রভৃতি আত্মীয় স্বজনসহ একেবারেই লয় প্রাপ্ত হয়। দৃষ্টান্ত দেখ, ঐ যে আকাশ দেখা যায়, উহা হইতে যদি জলদজাল চলিয়া যায়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই উহার জড়তা অবাধে উপশান্ত হইয়া থাকে। হে অনঘ! মুক্তাহারের সূত্র যদি ছিন্ন হয়, তাহা হইলে তাহার মুক্তাগুলি যেমন এক একটী করিয়া খসিয়া পড়ে, তেমনি চিত্তের যখন চিত্তনাম তিরোহিত হইয়া যায়, তখন তাহার ভ্রান্তিময় নিখিল বাসনাই একে একে বিলয় প্রাপ্ত হয়।

হে রঘুনাথ! সৎশাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম না বুঝিয়া যাহারা তাহার বিপরীত অর্থ ভাবনা করে, তাহাদের চিত্তনৈর্ম্মল্য মোটেই হয় না; পরন্তু তাহাদের চিত্ত এমন একরূপ দুষ্ট হইয়া থাকে, যাহার জন্য তাহাদিগকে কৃমিকীটোচিত পাপ-ভাগী হইতে হয়। যেমন সমীরণ শান্ত হইলে সাগরের চঞ্চলতা চলিয়া যায়, তেমনি মূর্খতা বা অজ্ঞান তিরোহিত হইলে যাহা নব-বিকসিত তামরসের ন্যায় কমনীয়, তথাবিধ অক্ষির কটাক্ষপাতও জ্ঞানীর কাছে একটা কোনই সৌন্দর্য্যময় বলিয়া প্রতীত হয় না। জ্ঞানী তেমন দৃষ্টি-সৌষ্ঠব দেখিয়াও অটল ও অবিকৃত থাকিতে পারেন। বায়ুর নিরোধ হইলে নিসর্গচঞ্চল কমল যেমন নিস্পন্দ হইয়া পড়ে এবং অম্বরে পবন যেমন স্থির ধীর-ভাবে অবস্থান করে, তেমনি তুমিও ইদানীং আমার এই সকল উপদেশ শ্রবণে ভাবাভাব-বিরহিত হইয়া সেই পরম বিস্তৃত পদে স্থিরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছ।

হে রঘূদ্বহ! পটহধ্বনি শুনিয়া নরপতি যেমন নিদ্রা ত্যাগ করিয়া জাগরিত হন, আমি মনে করি, তুমিও তেমনি মদীয় ঈদৃশ বচন-বিন্যাসে অজ্ঞাননিদ্রা পরিহারপূর্ব্বক অন্তরে বোধ প্রাপ্ত হইয়াছ। বলা বাহুল্য, কেনই বা না তুমি জ্ঞান প্রাপ্ত হইতে পারিবে? যখন দেখা যায়,

কুলগুরুর উপদেশ পাইয়া সাধারণ লোকেরও অন্তরে জ্ঞানোদয় হয়, তখন তোমা হেন অতি উদারধী সাধু পুরুষের অন্তরে আমার উপদেশে কেনই বা না জ্ঞানসঞ্চার হইবে? আমি যে সকল উপদেশ বাক্য বলিয়াছি, তাহা তুমি উপাদেয় জ্ঞানে অন্তরে অবধারণ করিয়া লইয়াছ; কাজেই সে সকল উপদেশবাক্য সহজেই তোমার অন্তরভ্যন্তরে প্রবেশ লাভ করিবেই। দৃষ্টান্ত দেখ, সৌর কর-তপ্ত ভূখণ্ডে যদি জল পতিত হয়, তবে তাহাতে তাহা শুষ্ক হইয়াই যায়।

হে মহানুভব! আমরা চিরকাল হইতেই ভবাদৃশ রঘুবংশাবতংস-দিগের কুলগুরুর পদে অধিষ্ঠিত রহিয়াছি; সুতরাং হে আর্য্য! মদুপদিষ্ট এই শুভ বাক্য তুমি হারের ন্যায় হৃদয়ে ধারণ করিয়া রাখ।

চতুর্থ সর্গ সমাপ্ত। ॥ ৪ ॥

পঞ্চম সর্গ।

রমচন্দ্র কহিলেন,—হে প্রভো! ভবদীয় বাক্যার্থ আমি অবধারণ করিয়াছি। বুঝিয়াছি,—আমাতে এখন আর আমি বা 'অহং' ভাব নাই, আমি চিন্ময় হইয়া গিয়াছি। আমার দৃষ্টিতে এই অখিল জগজ্জাল তিরোহিত হইয়া গিয়াছে; এ সংসারে সকলই আমি চিন্ময় দেখিতেছি। অনেক প্রতিবন্ধকতার পর ধরাতলে বারি বর্ষণ হইলে যেরূপ সুখোদয় হয়, তেমনি অদ্য আপনার উপদেশ শ্রবণে অন্তর আমার পরমাত্মার পরম পদে নির্ব্বৃতি প্রাপ্ত হইল। আমি অধুনা দ্বন্দ্ব-মোহ-বর্জ্জিত হইলাম। আমার অন্তর শীতল হইল। আমি সুস্থদেহে এক্ষণে শান্তি সুখ প্রাপ্ত হইলাম। এখন আর আমার কোনই জ্বালা-যন্ত্রণা নাই। আমি কেবল সুখময় হইয়াই রহিয়াছি। যাহার ক্ষুব্ধতা নাই, চাঞ্চল্য নাই, এ হেন অনাবিল-জল জলাশয়ের ন্যায় আমি প্রসন্নতা অনুভব করিতেছি।

হে মুনিবর! এই দিঙ্মণ্ডল এখন আমার দৃষ্টিতে সুপ্রসন্ন বলিয়া প্রতীত হইতেছে। বুঝিতেছি, যেন ইহাতে কণামাত্র নীহার এখন নাই। ইহার সম্যক্ প্রসন্নতা দর্শনে ইহার যথাযথভাব যে ব্রহ্মস্বরূপতা, তাহা আমি বুঝিতে পারিয়াছি। আমার যে কিছু সন্দেহ ছিল, তাহা এক্ষণে তিরোহিত হইল। আমার আশা-মরীচিকা শান্ত হইল। আমাতে রাগ নাই, নীরাগ নাই, কোন বৃত্তিই নাই। আমি যেন নীহার-বিরহিত ধূলি-বর্জ্জিত শান্ত সৌম্য জঙ্গলের ন্যায় শীতল হইয়াছি। অধুনা আমি আপনা হইতেই এমন আনন্দ প্রাপ্ত হইতেছি যে, তাহা অনন্ত ও সীমা-পরিশূন্য। হে বিভো! আমার সে আনন্দের নিকট সুধাস্বাদও তৃণবৎ তুচ্ছ বলিয়া ধারণা হইতেছে। প্রকৃত পক্ষে আজই আমি স্বস্থ হইয়াছি, প্রকৃতিস্থ হইয়াছি ও মুদিত হইয়াছি। অদ্য আমি লোকারাম হইয়াছি; অদ্য রাম নামের যোগ্য হইয়াছি। আমার অদ্য অপার আনন্দ; আমিই পরব্রহ্ম। আমি আমাকেই নমস্কার করি। অপিচ আপনাকেও আমার ভূয়োভূয়ঃ নমস্কার। কেন না, আপনার প্রসন্নতাই আমার এ সম্পদের মূল। রবির উদয়ে নিশার যখন অবসান ঘটে, তখন বালকদিগের মন হইতে যেমন নিশাকালীন প্রেতাদি-ভীতি চলিয়া যায়, তেমনি অদ্য আমারও সমস্ত সংশয়, সমস্ত ভ্রান্তি অস্তগত হইয়াছে। আজ আর আমার হৃদয়ে কোনই মালিন্য নাই, মদীয় হৃদয় বিশদ ও বিস্ফারিত হইয়াছে। সর্ব্ব সন্তাপ বিদূরিত হইয়াছে; তাই অন্তর আমার হিমের ন্যায় শীতল হইল। শরতের সরসী যেমন শান্ত মূর্ত্তি ধারণ করে, মদীয় মনও তেমনি অদ্য প্রশান্তভাব অবলম্বন করিল। আত্মা স্বভাবতই চিন্ময়; তাঁহার অজ্ঞানাদিরূপ কলঙ্ক কোথা হইতে কিরূপে হয়, ইত্যাদি সংশয় আমার অধুনা চন্দ্রোদয়ে অন্ধকারবৎ একেবারেই অপগত হইয়াছে। বুঝিলাম,—পরমাত্মাই সব; তিনিই সর্ব্বত্র অবস্থিত এবং সর্ব্বদা সর্ব্বত্র তিনি সমভাবেই বিরাজিত। বুঝিলাম,—"ইহা অন্য, উহা পৃথক্" এই প্রকার মিথ্যা কল্পনার অস্তিত্ব এ সংসারে থাকিতেই পারে না। আমার তত্ত্ববোধ হইয়াছে; আমি এখন এক অপূর্ব্ব জ্যোতিতে দেদীপ্যমান হইয়াছি। ইতিপূর্ব্বে আমি তৃষ্ণাজালে জড়িত ছিলাম; না জানি, তখন আমার কি এক অপূর্ব্বত্বই ছিল। কিন্তু এখন আমি আমার এই

বর্ত্তমান দশায় সেই পূর্ব্বতন আত্ম-দুর্ব্বুদ্ধি স্মরণ করি, আর আপনা আপনি হাসিয়া ফেলি। অহো! অদ্য আমি যথাযথরূপে ভাবিয়া দেখিতেছি, এই সকল সংসারই আমি। ভবদীয় বচন-পীযূষরসে আমি পরিস্নাত হইয়া প্রকৃত তত্ত্ব বুঝিতে পারিয়াছি; তাই এখন আমার এই দিব্য জ্ঞান উপস্থিত হইয়াছে। শ্রুতির নির্দ্দেশ—যথায় সূর্য্য নাই, চন্দ্র নাই, তারকা নাই, সে দেশ স্বতই আলোকময়, বাক্য-মনের অতীত ও পুণ্য-পূত। আমি ভবদীয় অনুগ্রহ-গুণে এই সংসারস্থ হইয়াও অদ্য সেই পুণ্য দেশে পৌঁছিয়াছি। সত্যই যেন দেখিতেছি, এ আলোকময় দেশের কুত্রাপি সূর্য্য নাই এবং ইহার অতি দূরগত অধোভাগেও সূর্য্যের অভাব, অথচ এ দেশ স্বতই সমুজ্জ্বল। এ সংসার, সাগরের ন্যায় সুবিশাল; ইহা নিত্যই ভাবাভাবময়। আমি ইহা উত্তীর্ণ হইয়া ইহার অধিষ্ঠান সন্মাত্রতা প্রাপ্ত হইয়াছি। বুঝিয়াছি, এ সংসারে আমারই সত্তা, আমিই নমস্য, আমিই মহান্; অতএব আমাকেই আমার নমস্কার। আমি আপনা আপনি স্বীয় মহিমায় সর্ব্বোৎকর্ষে বর্ত্তমান রহিয়াছি।

হে ভগবন্! ভবদীয় উদার বাক্য মদীয় হৃদয়-পদ্মের অভ্যন্তরে অলির ন্যায় স্থির হইয়া আছে। আমি এখন এই স্থানে থাকিয়া স্বীয় অনুভব বশতঃ ঈদৃশ জীবন্মুক্ত দশা প্রাপ্ত হইয়াছি যে, ইহাতে আর কস্মিন্ কালেও শোকের সম্পর্ক নাই।

পঞ্চম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে মহাভুজ! তুমি আমার উপদেশের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিয়াছ,—করিয়া নিরতিশয় আনন্দময় পরমাত্মার অনুভবরূপ প্রীতিভাজন হইয়াছ, তথাপি সর্ব্ব সাধারণের হিতের নিমিত্ত পুনরপি তোমায় এই পরম বাক্য বলিতেছি, শ্রবণ কর। এই সংসারের ও ব্রহ্মের

ভেদ-ভিন্নতা যে কি, তাহা তোমার এখন অবিদিত নাই। তথাচ তোমার বোধ বৃদ্ধির নিমিত্ত আবার তোমায় বলিতেছি। অপিচ যাঁহারা বিশেষ করিয়া এ তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারেন নাই, আমার পুনরুক্তি শ্রবণে তাঁহাদেরও বোধ-সুবিধা হউক; বুঝিলাম না বলিয়া কাহারও মনে যেন কোন ক্ষোভ থাকে না।

রাম! যে অজ্ঞানী ব্যক্তি এই নশ্বর দেহকেই আত্মভাবে অবলোকন করে, ইহাকেই সার সত্য বলিয়া বুঝিয়া থাকে, প্রবল শত্রুর ন্যায় তাহার ইন্দ্রিয়বর্গই তাহাকে অভিভূত করিয়া ফেলে; অর্থাৎ তাহার যে কিছু প্রভাব-প্রতিপত্তি নষ্ট করে,—করিয়া তাহাকে আপনাদিগের অধীন করিয়া লয়। পরন্তু যিনি জ্ঞানবান্; যিনি এ সংসারকে অসার ও অসত্য বলিয়া বিবেচনা করেন, এবং সেই একাদ্বয় পরব্রহ্মকেই সত্যজ্ঞানে অন্তরে অপার শান্তি সুখ অনুভব করিতে থাকেন, সেই জ্ঞানী ব্যক্তি প্রকৃতই প্রশংসার্হ; তদীয় ইন্দ্রিয়বর্গ তাঁহার প্রতি সুহৃদ্‌ভাব প্রকাশ করে, এবং সতত সন্তোষ-সহকারে তাঁহাকে রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকে। যে পুরুষ ব্যবহারে নিরত রহিলেও সতত ভোগ্য পদার্থের দোষ দর্শনে তাহাদিগের নিন্দা ব্যতীত কখন স্তুতিকার্য্যে প্রবৃত্ত হন না, সে পুরুষ কিজন্য এই দুঃখদায়ী দেহকে আপনার বলিয়া গ্রহণ করিবেন? বুঝিয়া দেখ, দেহের সহিত আত্মার কোনই সম্পর্ক নাই, আবার আত্মার সহিতও দেহের কোন সম্বন্ধ নাই; কাজেই আলোক ও অন্ধকারের ন্যায় আত্মার ও দেহের পরস্পর বিভিন্নতা স্পষ্টতই প্রতিপন্ন। আত্মা যিনি, তাঁহার কোনই বিকার নাই, সমগ্র সংসারের বিকারেও তিনি অবিকৃত; সংসারের সহিত তাঁহার যে কোন সম্বন্ধ আছে, তাহাও নহে। তিনি নিত্য নিরাবরণ; তাঁহার অস্ত নাই, উদয় নাই, অথচ তিনি সদাই সমুদিত, সদাই ঐশ্বর্য্যশালী। এ দেহ উপলখণ্ডের ন্যায় জড়, অজ্ঞ, তুচ্ছ, কৃতঘ্ন ও বিনশ্বর; ইহা কোথায় চলিয়া যায়! ইহার কৃতাকৃত কর্ম্মের ফল ভোগ করিতে থাকেন—আত্মা; কাজেই ইহার কৃতঘ্ন বিশেষণ সঙ্গতই বটে। এ কৃতঘ্ন দেহের যাহা হইবার হউক, ইহাতে কাহার কি মঙ্গলামঙ্গল হইতে পারে? এ দেহ যদি চিন্ময় হইত, নিশ্চিন্ত হইতে পারিতাম; কিন্তু দেহের ধর্ম্ম তো চিন্ময়ত্ব নহে।

এ দেহ জড় নশ্বর; সেই নিত্য ভাস্বর অবিনশ্বর চিন্ময়ের স্নিগ্ধোজ্জ্বল ধর্ম্ম এ দেহ কেমন করিয়া ধারণ করিবে? এই দেহ আর সেই চিন্ময়, এই উভয়কে একই সময়ে ভাবিতে যাও, চিন্ময়ের ভাবনায় একমাত্র জ্ঞান আসিয়া সমুদিত হয়; পরন্তু দেহকে ভাবিলে কেবল জড়তার স্মৃতিই আসিয়া পড়িবে। লৌকিক ব্যবহারে বলি বটে আমরা যে, আত্মার মানস দুঃখে দেহ কৃশ হয়, দেহে কোন্ আঘাত পাইলে আত্মার দুঃখ ভোগ হইয়া থাকে; কিন্তু তাই বলিয়া অর্থাৎ তুল্য সুখ-দুঃখতা দেখিয়া দেহ ও আত্মার একত্ব কিছুতেই সিদ্ধান্ত করা যায় না। ফলে আপাততঃ সুখ-দুঃখ দেহ ও আত্মা উভয়ত্র দেখা গেলেও বুঝা উচিত যে, একের সহিত অপরের সে সম্বন্ধ অধ্যাসমূলক। যেমন লৌহপিণ্ড বহ্নির স্বারূপ্য প্রাপ্ত হইয়া তদীয় উষ্ণতাদি গুণে অম্বিত হয়, তেমনি সুখ-দুঃখাতীত আত্মাও দেহ-তাদাত্ম্য উপগত হইয়া সুখ-দুঃখের ভাজন হইয়া থাকেন; সুতরাং আত্মা যদি দেহাধ্যাস হইতে বিমুক্ত হইয়া পড়েন, তাহা হইলে তখন আর তাঁহার সুখ-দুঃখ প্রসঙ্গ থাকে না। আরও একটা ভাবিবার বিষয় এই যে, আত্মা যৎপরোনাস্তি সূক্ষ্ম ও অসঙ্গস্বভাব; স্থূলতম দেহের সহিত তাঁহার বাস্তব ঐক্য-সম্বন্ধেরই বা সম্ভাবনা হইবে কিরূপে? ফলে সূক্ষ্মধর্ম্মী কখন স্থূল ধর্ম্মী এবং স্থূলধর্ম্মী কখন সূক্ষ্মধর্ম্মী হইতে পারে না। রাত্রি ও দিন এই উভয়ের মধ্যে যেমন একের উদয়ে অপরের সত্তা থাকে না, অর্থাৎ রাত্রি আসিলে যেমন দিন থাকে না, এবং দিনের উদয়ে যেমন রাত্রি থাকিতে পারে না, তেমনি দেহ ও আত্মা, এ উভয়ের মধ্যে একের অভ্যুদয়ে অপরের সত্তার স্থায়িত্ব সম্ভব হয় না। ফলে জ্ঞান কখন অজ্ঞান হয় না এবং ছায়া কখনই আলোকাকারে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে না। যেমন করিয়া যে দিক্ দিয়াই দেখ, ব্রহ্ম সৎ; তিনি কখনই অসৎ হইবার নহেন। অপিচ সর্ব্বগামী আত্মার কদাচ দেহের সহিত কিছু মাত্র সংশ্লেষ নাই। জলে কমল জন্মে সত্য; কিন্তু সে জলের সহিত কমলের যেমন কোনই সম্পর্ক দেখা যায় না, তেমনি সাধারণতঃ দেহের সহিত দেহীরও কোন সম্বন্ধ-ঘটনা নাই। সাধারণ ভাবে দেখিলে দেখা যায় বটে যে, আত্মা যেন দেহের আশ্রয়ে অবস্থিত; বস্তুতঃ কিন্তু সর্ব্বদা আকাশস্থ বায়ু যেমন

স্বয়ং ধূলি-ধূসরিত বা রুক্ষ-দেহ হইয়াও স্বীয় অধিষ্ঠান আকাশকে কদাচ ধূলায় মলিন বা শুষ্ক করিতে পারে না, তেমনি দেহ জরাজীর্ণ হউক, নাশ পাইয়া যাউক, বিপন্ন হউক বা সুখ-দুঃখভাগীই হউক, তদীয় দশা-বিপর্য্যয় আত্মাকে ঈষৎ মাত্রও স্পর্শ করিতে অক্ষম। আত্মা দেহ লইয়া থাকেন বটে; কিন্তু দেহের স্বভাবের সহিত তিনি কোনই সম্বন্ধ রাখেন না।

রামচন্দ্র! এই জন্যই তোমায় বলিতেছি, তুমি এইরূপ আত্মতত্ত্ব অবগত হইয়া নির্ব্বৃত হও। ভাবিয়া লও,—এ দৃশ্য বিশ্ব সমস্তই সেই আত্মময়। যৎকালে ভ্রমের ঘোরে দেহাদি দর্শন হয়, তখনই আত্মার জনন-মরণাদির কথা মনোমধ্যে উদিত হইয়া থাকে। জলে তরঙ্গ দেখা যায়, সে তরঙ্গের উৎপত্তি, স্থিতি ও নিবৃত্তিও প্রত্যক্ষ হয়; পরন্তু ভাবিয়া দেখিলে ঐ তরঙ্গ যেমন জল ব্যতীত আর কিছুই নয়, তেমনি দেহাদি যে কিছু, ব্রহ্মেই বিলোকিত হয়; ব্রহ্ম ব্যতীত সে সমুদায় আর কিছুই নয়। সুতরাং বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে, দেহাদির আর পৃথক্ সত্তা কিছুই নাই, আত্মার সত্তাতেই উহাদের সত্তা নিশ্চিত। আত্মাই আত্মসত্তার অনুভাবক। যেমন জলের সত্তাই তরঙ্গের সত্তা; তদ্ব্যতীত তাহার আর পৃথক্ সত্তা নাই, তেমনি আত্মার সত্তাতেই এই কৃত্রিম দেহযন্ত্রের সত্তা, তদ্ব্যতীত অন্য সত্তা ইহার নাই। হস্তে একখানি দর্পণ লইয়া সূর্য্যাদির প্রতিবিম্ব দেখিবার প্রয়াস পাও, প্রতিবিম্ব দেখিতে পাইবে; এবং ঐ দর্পণখানি যেরূপে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া লইবে, দেখিবে,—সেইরূপেই সূর্য্যের প্রতিবিম্ব পতিত হইতেছে। পরন্তু অম্বরস্থ প্রকৃত সূর্য্য যথাযথভাবেই অবস্থান করিতেছেন। এইরূপ এই দেহ,—দেহীর প্রতিবিম্বসম ভ্রান্তি-বিলসিত। এ দেহ চলুক, ফিরুক গতায়াত করুক, তাহাতে দেহীর কিছুই আসিয়া যায় না, তিনি স্থির ধীর ও অচঞ্চল ভাবেই অবস্থান করেন। এই ভাবে এ সংসারে বস্তুর যথাযথ তত্ত্ব সম্যক্‌রূপে অবলোকন করিতে থাক, দেখিতে পাইবে,—বস্তু অনিত্য, বস্তুর যাহা প্রকৃত তত্ত্ব, স্থিরভাবেই বিরাজিত। এইরূপে দেহ-দেহীর প্রকৃত তত্ত্ব অন্বেষণ করিলেই দেখা যাইবে, দেহী যিনি—তিনি নিত্য ও অবিনাশস্বভাব।

এই যে অজ্ঞান-বিলসিত দেহ, ইহাই মাত্র বিনাশশীল। কোন কারণ বিশেষে আলোকের আবরণ ঘটিলেই অন্ধকার হয়, আর অন্ধকারের সঙ্কোচ-সঙ্ঘটনই আলোক-বিস্তার; কাজেই যদি নিপুণভাবে যথাযথরূপে বুঝিয়া দেখা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে, আলোক এবং অন্ধকার এই দুইটী কখন পৃথক্ বস্তু হইতে পারে না। উহারা একই বস্তু, অথচ উহাদিগকে দুইটী বস্তু বলিয়া ধারণা হয়; আর উহাদের যে বিভিন্ন সত্তা প্রতীতিগোচর হইতে থাকে, তাহা কেবল অযথা দৃষ্টি বা অজ্ঞানবিলাস বৈ আর কিছুই নহে। এই অজ্ঞানে আবৃত হইয়াই আমাদিগকে আলোক ও অন্ধকারের একাদ্বয় সত্তাকে বিভিন্ন সত্তা বলিয়া বুঝিয়া লইতে হয়। এইরূপ এই দেহী ও দেহের যথাযথ তত্ত্ব সম্যক্ উপলব্ধি করা যায় না বলিয়াই দেহের দশাবিপর্য্যয় বোধ হয় এবং এই জন্যই এই দেহসম্বন্ধে অর্জ্জুনাখ্য পাদপের ন্যায় অন্তঃসার-বিরহিত কত বিস্তৃত মোহ আসিয়া উপস্থিত হইয়া থাকে। ঐ মোহের মহিমায় আত্মার স্বারূপ্য দুর্ব্বোধ হইয়া উঠে এবং যাহা বিশুদ্ধ বিমল জ্ঞান, তাহা একেবারেই আবৃত হইয়া পড়ে। এই প্রকার মোহজালে বুদ্ধি যাহাদের বিজড়িত হইয়া থাকে, তাহারা তৃণের ন্যায় একেবারেই অচৈতন্য। বলিতে পার, যদি তাহারা অচৈতন্য হইল, তবে কিরূপে তাহারা কথা কহে? কিরূপেই বা কাষ্ঠাদি আবশ্যকীয় বস্তু আহরণ করিয়া সংসার-ব্যবহার সমাধা করে? তদুত্তরে বলা যায়, চিত্তত্ত্বের আস্বাদ প্রাপ্ত হয় নাই বলিয়া তাহারা সকলেই জড়-পদ-বাচ্য হইলেও তাহাদের মুখ-নাসিকাদির স্বাভাবিক রন্ধ্রমার্গে মারুত সঞ্চলন বশতই ঐরূপ কথন, আদান ও স্পন্দনাদি-কার্য্য হইয়া থাকে। তাহারা সেই মারুতপ্রভাবে বায়ুপূর্ণ সশব্দ কীচকাদির ন্যায় যত্র তত্র শব্দ করে ও স্পন্দিত হয়। তাহাদের আদান-বিসর্জ্জনাদি ব্যাপার বায়ুর প্রভাবেই নিষ্পন্ন হইতে থাকে; ফলে চৈতন্য সহকারে সে সমুদায় সমাহিত হয় না। সেই শব্দ, সেই স্পর্শ ও সেই দেহ, এই সকল পাইয়াই তাহারা আপনাদের কৃতার্থতা মনে করিয়া থাকে। জড় তাহারা; অথচ তরঙ্গ-তরলিত অঙ্গশালীর ন্যায় স্ফুরিত হয়। তাহাদের আন্তরিক বিষয়-বাসনা মদিরার ন্যায় তাহাদিগকে উন্মাদ করিয়া তুলে। তবে কি

বলিতে হইবে, তাহারা সেই অবিনশ্বর চিন্ময়ের অংশ নহে? না, এমন কথা কখনই হইতে পারে না। বস্তুতঃ তাহাদেরও অন্তর সেই চিন্ময় ব্রহ্মের জ্ঞানময়ী সত্তায় সমুজ্জ্বল। তবে কথা এই যে, যেমন জলের প্রবল প্রবাহ অচেতন হইয়াও কত লীলায় বিহার করে, ফিরিয়া আইসে, চলিয়া যায়, তেমনি অজ্ঞানী লোকেরাও নানা কার্য্যে ব্যাপৃত হয়, যাতায়াত করে ও বিবিধ বিহার করিতে থাকে। ফলে এই জলপ্রবাহের ন্যায় তাহারাও প্রায় অচেতন; একেবারেই যে অচেতন, তাহা নহে। তবে চেতনা থাকিলেও আত্মবোধের অভাব-নিবন্ধন সে চেতনা তাহাদের অসম্পন্ন। যেমন কর্ম্মকারের ভস্ত্রা হইতে শ্বাস নির্গত হয়, তেমনি অজ্ঞানা-দিগেরও শ্বাস-নির্গম দৃষ্ট হইয়া থাকে। পরন্তু তাহাদের সে শ্বাস-নির্গম চিৎশক্তির অজ্ঞতা নিবন্ধন প্রাণহীন বলিয়াই প্রতিভাত হয়। যেমন ধনুর্গুণের আস্ফালনে ধনুকেরও নানা ধ্বনি শুনা যায়, তেমনি বায়ুবলেই ঐ সকল অজ্ঞানীর কতই না তর্জ্জন গর্জ্জন শ্রবণগোচর হয়। এরূপ তর্জ্জন-গর্জ্জনে তাহাদের দৈহিক স্পন্দন হয় মাত্র, পরন্তু তাহারা বাস্তবিকই অচৈতন্য থাকিয়া যায়। যাহার ফলের স্বাদ কেহই কখন লয় নাই, এ হেন বন্ধ্য বৃক্ষের ফল-ভোজনে স্বতই যেমন মৃত্যুর আশঙ্কা হয়, তেমনি মূঢ়ের নিকট হইতে যে চিদ্‌বোধ-বর্জ্জিত শব্দাদি শ্রবণ, তাহা তদীয় মরণেরই পরিচায়ক। সেইরূপ চিদ্‌বোধ-বিহীন ফল লাভ করিয়া মূঢ় লোকেরা যে বিশ্রাম করে, তাহাদের সে বিশ্রাম উত্তপ্ত শিলাফলকোপরি উপবেশনাদির ন্যায় একান্তই ক্লেশকর। মাত্র তথাবিধ ফল প্রাপ্ত হইয়াই বিশ্রামসুখে যাহার অভিলাষ, সে তো অরণ্যস্থ স্থাণুর ন্যায় একেবারেই অচেতন। একটা স্থাণুর সহিত সমাগম ঘটিলেও যে ফল, তাহার সহিত সম্মিলনেও ফল সেই একই প্রকার। আকাশে শত দণ্ডাঘাত কর, তাহা যেমন নিষ্ফল হইবে, তেমনি মূঢ় জনের প্রতি অনুষ্ঠিত উপকারাদিও ব্যর্থ হইয়া যাইবে। সেই অধম ব্যক্তিকে যাহা কিছু প্রদান করা হয়, তাহা কি অনর্থক কর্দ্দমে নিক্ষেপ করা হয় না? সেই অজ্ঞানীর সহিত আলাপ আর শূন্যে একটা কুক্কুরকে আহ্বান, এ উভয়ই সমান হইয়া পড়ে; সুতরাং দেখা যায়, একমাত্র অজ্ঞানই বিবিধ বিঘ্ন-বিপদের নিষ্ঠা। বস্তুত অজ্ঞ জন কি

আপদই না প্রাপ্ত হইয়া থাকে ? অজ্ঞানীরাই এই সংসার-পথের পথিক হয়, অজ্ঞানীরাই এখানকার সুখ-দুঃখ-দশা ভোগ করিয়া থাকে এবং অজ্ঞানীদিগের নিকটই ঐ সকল সুখ-দুঃখ একান্ত সুদৃঢ় হইয়া পড়ে। অজ্ঞানীরাই দেহ পুত্র ও দারা প্রভৃতিতে আস্থা বন্ধন করিয়া অবস্থান করিতে থাকে। তাহারাই বারম্বার জনন-মরণের বশতাপন্ন হয়। এই অতি শঠপ্রকৃতি অনাত্ম-দেহে যাহারা আত্মভাব পোষণ করে, তথাবিধ অজ্ঞ মূঢ় ব্যক্তির উল্লিখিতরূপ দুঃখপ্রবাহ কিছুতেই কখন প্রশান্ত হইবার নহে। সে দুর্ম্মতি ব্যক্তি এই জাগতিক পদার্থপরম্পরার যথাযথ তত্ত্ব দর্শনে অন্ধ ; এই প্রকার অন্ধতার জন্য যদীয় বুদ্ধি সর্ব্বদাই কুভাবে পরিপূর্ণ, তাহার অসদ্‌বোধময়ী মায়া কেমন করিয়া বিনাশ প্রাপ্ত হইবে ? এই জাগতিক বস্তু মধ্যে সার কিছুই নাই। সংসারে সার বস্তু না দেখিয়া যাহারা অসার বস্তুকে সার বস্তু জ্ঞানে দর্শন করে, এবং প্রতিনিয়ত তাহাতে আসক্ত হইয়া থাকে, তাহারা সুধাকর হইতেও বিষের উৎপত্তি অবলোকন করে এবং পরিষ্কৃত ভূভাগ হইতেও দূর্ব্বাঙ্কুর-বিকাশের ন্যায় সুখস্পর্শ পাদপ হইতেও দুঃখস্পর্শ তীক্ষ্ণ কণ্টকের উৎপত্তি হইতে দেখে। যে ক্ষেত্র সম্যক্‌রূপে কর্ষণ করা হয়, তাহা হইতে যেমন অনায়াসে সুন্দর সুন্দর ধান্য বৃক্ষ সকল উৎপন্ন হয়, তেমনি অজ্ঞানী জনের অন্তঃকরণে নানা দিক্ হইতে নানা বাসনার বিকাশ হইয়া থাকে। অজ্ঞানীরা দেহ মধ্যে সেই বাসনা পোষণ করে। এই জন্য কোটর-গত বিষধরশালী শাল্মলীতরুর ন্যায় তাহারা একান্তই অগম্য। তাহাদের মনোমাতঙ্গ সেই বাসনাশৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়,—হইয়া স্বচ্ছন্দ বিহারে বঞ্চিত হইয়া থাকে। অজ্ঞানী জন দুষ্কৃতরূপ ফণি-ফণায় বেষ্টিত হয়। ময়ূরী যেমন মুদিত-মনে মেঘোদয়ের প্রতীক্ষা করে, তেমনি নারকীয় সম্পদও সেই অজ্ঞানীর জন্য সাদরে অপেক্ষা করিতে থাকে। যাহার জ্ঞান নাই, প্রকৃতপক্ষে চৈতন্যও নাই, তাহার অন্তর বাস্তবিকই অচৈতন্য জড়প্রায় থাকে। অচেতন পৃথ্বী-বক্ষে কত অগণিত বস্তু উৎপন্ন হয়, জীবনহারিণী বিষবল্লীও তাহাতে উৎপন্ন হইয়া রমণীয় ফল-কুসুমে সুশোভিত হইয়া থাকে ; তদ্দর্শনে মূর্খের মোহ জন্মে। এইরূপ বিষলতার ন্যায়

বিলাসময়ী রমণী মূর্খের মৃত্তিকাবৎ অসাড় হৃদয়েই শোভা পাইয়া থাকে। সে রমণার চঞ্চল নয়নই ঐ বিষলতাবাসিনী চঞ্চল ভ্রমরী; সে ভ্রমরীর এমনই মোহময়ী বিলাসচ্ছটা যে, তাহাতে অজ্ঞানীর চিত্তচাঞ্চল্য ক্ষণেকের জন্যও বিরত হয় না। রমণীদিগের স্ফুরিত অধরোষ্ঠই ঐ বিষ-লতার নব পল্লবদল। সে অধর দর্শনে অজ্ঞানী জনই মোহাকুল হইয়া পড়ে। দেখ, পয়োধি তাহার ঘোর তরঙ্গে সর্ব্বদাই সমাকুল ও চঞ্চল। তদুপরি তাহার অভ্যন্তর-গত বাড়বানল তাহাকে কত অশেষ দুঃখ প্রদান করিয়া থাকে। সংসারস্থ অজ্ঞ ব্যক্তিরও এই দশা—এইরূপই দুর্ভোগ দেখিতে পাওয়া যায়। কত শত জন্ম-সঞ্চিত কঠোর ক্লেশরাশি সাগর-তরঙ্গের ন্যায় অতি বিশাল হইয়া তাহাকে বিভ্রান্ত ও বিলোড়িত করিতে থাকে। তদীয় ক্লেশ-রাশি বাড়বাগ্নির ন্যায় ভীষণাকারে তাহার দেহ বেষ্টন করিয়া রাখে। মূঢ় লোক মরে, জন্ম লয়, জন্মান্তে তাহার বাল্যকাল আসিয়া উপস্থিত হয়, যৌবনান্তে জরা আসিয়া তাহাকে আক্রমণ করে, এইরূপে আবার মরে, আবার জন্মে; এবম্বিধ বহু পরিবর্ত্তন তাহার বহুবার ঘটিয়া থাকে। সে নিত্যকাল এইরূপেই ঘূর্ণমান হয়। কূপের উপরিস্থিত ঘটীযন্ত্রে রজ্জুবদ্ধ কলশ যেমন প্রতিনিয়তই কূপমধ্যে পতিত ও উত্থিত হইতে থাকে, তেমনি এই জগদাকার অতি প্রাচীন ঘটীযন্ত্রে সংসাররূপ রজ্জুনিবদ্ধ মূঢ় লোকেরও প্রতিনিয়ত উত্থান-পতন ঘটিতেছে। অর্থাৎ তাহার জন্ম-মৃত্যু চিরদিনই আছে। জ্ঞানী দেখেন,—এ জগৎ অতি কোমল, অতি শোভন, গোষ্পদবৎ অল্প-জলশালী, অতি ক্ষুদ্র ও সহজেই উত্তীর্ণ হইবার উপযুক্ত; আবার অজ্ঞ জনের চক্ষে এই জগৎই অগাধ অনন্ত জলশালী এবং ইহা একেবারেই দুষ্পার। পক্ষিণী পিঞ্জরে আবদ্ধ হইয়া যেমন একপদও অন্যত্র কুত্রাপি গতিবিধি করিতে সক্ষম হয় না, এবং দর্শনশক্তিহীন অন্ধের নয়ন যেমন কোটর মধ্যেই নিবদ্ধ, তেমনি বিবেক-বিরহিত মূঢ় লোকেরও অত্যল্প মাত্র বুদ্ধিবৃত্তি তদীয় স্বীয় উদর-পূরণ-কার্য্যেই ব্যাপৃত; তদ্ব্যতীত সুদীর্ঘ সংসারাব্ধির অন্য কোন পার-গমনেই সে সমর্থ হয় না। একমাত্র উদরপূর্ত্তিই তাহার কার্য্য; তাহা ছাড়া আর কিছুই সে করিতে পারে না। মূঢ় লোকের মুক্ত হইবার শক্তি নাই; তাই জনন-মরণাদিরূপ

দশাবিপর্য্যয় সর্ব্বদাই তাহাকে ভোগ করিতে হয়। তাহাদের জন্ম-চক্রের নেমি একটুকু কালের জন্যও ঘূর্ণন হইতে বিরত নহে। মূঢ়দিগের বাসনা-ভারাক্রান্ত হৃদয়ই ঐ চক্রের নাভি এবং ইন্দ্রিয়গণই উহার নেমিস্থানীয়; উহারা সর্ব্বসময়ের জন্যই বিষয়-পঙ্কে মগ্ন। উহাদিগকে ঐ পঙ্ক হইতে উদ্ধার করিয়া শোধন করিবার শক্তি মূঢ়দিগের নাই। তাহারা চিরদিনই মোহে পড়িয়া অপরিষ্কার হইয়া থাকে। এই জন্যই সংসারের প্রকৃত তত্ত্ব যে কি, তাহারা একেবারেই তাহা বুঝিতে অক্ষম। মৃগয়াশীল ব্যাধ যেমন শ্যেনাদি পক্ষী ধরিবার জন্য দূরে বনমধ্যে মাংসখণ্ড রাখিয়া আইসে, মূঢ় লোকেরাও তেমনি এই বিশাল ভবাটবী মধ্যে তাহাদের ইন্দ্রিয়বর্গকে প্রলোভিত করিবার জন্য স্ব স্ব দেহ বিস্তার করিয়া রাখে। তাহারা মনে মনে স্থির করিয়া লয়, এমনই ভাবে দেহ রাখিয়া ইন্দ্রিয়বর্গকে আনন্দ অর্পণ করিলেই বুঝি পরম পুরুষার্থ সাধিত হইবে। বলা বাহুল্য, এ সংসার কি, আমার ইন্দ্রিয়বর্গই বা কি, এ তত্ত্ব তাহারা একেবারেই বুঝে না; বুঝিবার শক্তিও তাহাদের নাই, কি করিতেছি, কাহার সেবায়—কাহার পরিচর্য্যায় কাল কাটাইতেছি, কি লইয়া আনন্দে মাতোয়ারা হইতেছি, কোথায়—কাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছি, এই যে গো, অশ্ব, পুরুষ, পশু প্রভৃতি অসংখ্য জন্তু, এই যে বিন্ধ্য, সিংহাদ্রি প্রভৃতি বড় বড় গিরিশ্রেণী, কে ইহারা? ইহাদের প্রকৃত স্বরূপ কি? ইহারা যে কিয়ৎপরিমিত মাংস ও মৃৎপিণ্ড বৈ আর কিছুই নয়, এ তত্ত্ব তাহারা বুঝে না; বুঝিবার শক্তি নাই বলিয়াই তাহাদের দৃষ্টিতে এ সকল—গো, অশ্ব, মনুষ্য, পিতা, মাতা, ভ্রাতা এবং হিমালয় মলয় ইত্যাদি অশেষ কল্পনায় লক্ষিত হয়। এই যে বিচিত্র শব্দে, বিচিত্র শব্দার্থে, অনন্ত বৈচিত্র্যময় অনুরঞ্জনায় ও নানা কল্পিত বস্তুর কল্পনায় এ সংসার আশ্চর্য্য কল্পতরুর ন্যায় সুশোভিত হইতেছে, এই সংসার-শোভার মূল একমাত্র মোহ; মোহবশেই মানুষ এ সংসারকে এমনই বৈচিত্র্যপূর্ণ অবলোকন করে। একমাত্র অজ্ঞান হইতেই এই সংসাররূপ কল্পতরুর জগদাকার অসংখ্য পল্লবপারম্পরা প্রাদুর্ভূত হয়,—হইয়া তাহাতেই অবস্থান করে এবং তাহাতেই শোভা পায়, বাস করে ও বিলসিত হইতে থাকে। এ তরুর এতই মহত্ত্ব, এতই

ঔন্নত্য যে, সে একক হইলেও যেন সে একটা বহু বিস্তৃত বিচিত্র বনখণ্ডের ন্যায় প্রতিভাত। বহুবিধ ভোগাসক্ত জীবগণই ঐ আশ্চর্য্য ভবাটবীর বিহঙ্গম; এ অটবীর কতদিকে কত প্রকারেই না তাহারা উড়িয়া বেড়ায়? কত প্রদেশে কত কুলায়ই না তাহারা প্রস্তুত করিয়া লয়? এই যে নিয়ত পরিদৃশ্যমান নানা জন্ম-পরম্পরা, ইহাই তাহার পত্র-পঙক্তি, আর যে কিছু শুভাশুভ কর্ম্ম, তাহাই তাহার কোরকাবলী। বিবিধ পাপ-পুণ্য ঐ অটবীর ফল-সম্পত্তি এবং যে কিছু সম্পৎসমৃদ্ধি, সে সকল উহার মঞ্জরী। এ বনে যোষিৎরূপ ওষধি আছে; অজ্ঞানরূপ চন্দ্রের উদয়েই তাহার প্রকাশ হইয়া থাকে। এই যোষিৎসকলই এ বনের বিশেষ শোভার সামগ্রী। অজ্ঞানকে চন্দ্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিলাম এই জন্য যে, অজ্ঞানের বিলাসবশেই এ সংসারের উৎপত্তি; এই উৎপত্তি-জ্ঞানই অজ্ঞা-নাখ্যায় অভিহিত। কাজেই কলানিধি চন্দ্রের ন্যায় জন্ম-পরম্পরাতেই এই অজ্ঞান পূর্ণমূর্ত্তি; অন্যদিকে সূর্য্যাস্ত হইবার পরই অন্ধকারে চন্দ্র যেমন সমুদিত হন, বিবেক-বিনাশার্থ অজ্ঞানও তেমনি তমস্তোমে প্রকাশ-মান। আবার চন্দ্রের যেমন শূন্য অবলম্বন, তেমনি অজ্ঞানেরও অবলম্বন শূন্য অর্থাৎ নিষ্প্রপঞ্চ ব্রহ্ম। অপিচ নাম-সাদৃশ্যও বিলক্ষণ দেখা যায়, চন্দ্রের নামান্তর দোষেশ অর্থাৎ নিশানাথ এবং অজ্ঞানও দোষেশ অর্থাৎ সর্ব্বদোষের আশ্রয়। মূর্খের পক্ষে অর্থানর্থ অবধারণ করা অসাধ্য; তাই তাহার নিকট অজ্ঞানই চন্দ্রবৎ নয়ন-মনের আহ্লাদ-জনক হইয়া সর্ব্ব-প্রকর্ষে বিরাজমান। বাসনাকেই এ অজ্ঞান-সুধাকরের সুধা বলা যায়। মূঢ় লোকদিগের আশা-চকোর নিয়ত এই সুধা পান করিয়াই আত্মবিস্মৃত হয়। তাহারা এই অজ্ঞান-চন্দ্রের শুভ্র জ্যোৎস্নায় স্নিগ্ধ সৌম্য রমণীমূর্ত্তি অবলোকন করে আর মনে মনে ভাবিতে থাকে, অহো! এ যে দেখিতেছি—কত নিশাকর-করোজ্জ্বল স্নিগ্ধ মুগ্ধ পূর্ণিমারাত্রি! সুন্দরীরা চরণ চালন করে, আর মূঢ়েরা ভাবে, কৌমুদী-স্নাত নিশাযোগে কত রাজহংসই না বিচরণ করিতেছে! রমণীদিগের অঙ্গস্পর্শও তাহাদের হিমের ন্যায় শীতল বলিয়া মনে হয়। তাহাদের দেহের কমনীয়তা দেখিয়া ভাবে—আহা! কতই না মনোহর কুমুদিনী প্রস্ফুটিত আছে। রমণীর চঞ্চল নয়ন যেন

ভ্রমণশীল ভ্রমর, আর উহার মস্তকস্থ কেশপাশ যেন চন্দ্রের শুভ্র জ্যোৎস্নায় সঙ্কুচিত তিমিরোল্লাস; অজ্ঞান-হত মূঢ়দিগের মনের ভাব এইরূপই হয়। অহো! কি মূর্খতা! ইহার কিছুই যে শোভার সামগ্রী নহে, ইহা মূঢ়েরা প্রকৃতই বুঝে না।

হে রঘুনন্দন! এই সকলই যে অজ্ঞানতরুর বীজাঙ্কুর-পরম্পরায় জগদাকারে প্রকাশিত অশেষবিধ অসংখ্য ফল, আর ঐ সমস্ত ফলই যে আপাত-মধুর দুঃখ-পরিণাম, পরিমিতমাত্র ও বিনশ্বর, ইহা মূঢ়েরা ভ্রমেও একবার ভাবিয়া দেখে না। যাহা হউক, ইহা নিশ্চিতই যে অজ্ঞানই জগতের মূল; সেই মূলের উচ্ছেদ সাধন একান্তই কর্ত্তব্য।

ষষ্ঠ সর্গ সমাপ্ত। ॥ ৬ ॥

সপ্তম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রঘুরাজ! দেখা যায় বটে, সর্ব্বাঙ্গে মণিমুক্তার উজ্জ্বল আভরণ পরিয়া যোষিদ্‌গণ সুশোভিত হইয়া থাকে; কিন্তু প্রকৃত কথা বলিতে কি, উহারা কেবল অজ্ঞান-চন্দ্রের উদয়ে উদ্বেলিত কামার্ণবের তরঙ্গশ্রেণী বৈ আর কিছুই নয়। রমণীর সুন্দর মুখখানি, তাহাতে কালো কালো নয়ন দুইটী, সে নয়ন সহজ লজ্জায় জড়িত; তাই জগতের আর কিছুরই দিকে দৃষ্টি না দিয়া আপনার গণ্ডস্থলেই দোদুল্যমান; মূর্খেরা রমণীর সে নয়নশোভা দেখে আর হৈম কমল-কলিকার উপরিস্থিত চঞ্চল ভ্রমর বলিয়া ধারণা করে—অমনি মোহে মগ্ন হইয়া পড়ে। এই যে রমণী-দর্শন-জনিত মোহ, ইহা অজ্ঞানেরই বিলাস মাত্র। দেখ, বসন্তকালের সমাগমে প্রতি উদ্যানের প্রত্যেক ভূখণ্ডে এই যে মন্মথের অনুচর-সহচরের ন্যায় কামী জনের উন্মাদ-কর পুষ্পসমূহ বিরাজ করে, ইহাই সেই অজ্ঞানের বিভূতি। কি বলিব, লোকের এমনই অজ্ঞান যে, যে

কামিনী-কলেবর ক্রব্যাদ, গৃধ্র, শৃগাল ও কুক্কুরগণ অন্তে ভক্ষণ করিয়া থাকে, সেই নশ্বর কলেবরকেই লোকে আবার চন্দ্র, চন্দন ও পঙ্কজাদির সহিত উপমিত করিতে ক্ষান্ত হয় না। স্ত্রীলোকের স্তনদ্বয় রক্ত-মাংসময়; সুতরাং পরিণামে তাহা পূতিগন্ধশালী। কিন্তু লোক এমনই অজ্ঞান যে, তাহার দৃষ্টিতে সে স্তনদ্বয় হেম-কলস, কমল-কলিকা বা মাতুলঙ্গের ন্যায় লক্ষিত। রমণীর ওষ্ঠ একখণ্ড মাংস; তদ্দর্শনে মূর্খ লোকে মনে করে, উহা বিম্বফলের ন্যায় সুন্দর। আর যদি একবার চুম্বন করিতে পারে, তখন ভাবে—ইহা বুঝি সুধাকরের সুধা, কিম্বা ইহা মধু অথবা ইহা মদ্য। যদি প্রত্যেকতঃ বিভাগ করিয়া দেখা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে, রমণীর বাহু অতি ক্ষুদ্র পর্ব্বযুক্ত শঙ্কুসদৃশ বক্রাস্থিময়; কিন্তু কি আশ্চর্য্য, মানুষ-কবি তাহাকেই মহাবাহু লতা প্রভৃতি শব্দ দ্বারা বর্ণন করিয়া থাকে। ঐ যে কদলী-স্তম্ভ-নিভ বিশাল উরুদ্বয়শালী সুন্দরীগণ কুচ-কলসবৎ নেত্র-চিত্তের আহ্লাদ-জনক নিতম্ব-যুগলে কাঞ্চী-দাম দোলাইতেছে, মূর্খের ধারণায় উহা যেন মন্মথ-দেবের বাসভবনের মাল্য-মণ্ডিত তোরণশ্রেণীর ন্যায় বিরাজিত; বস্তুতঃ ইহাও একটা অজ্ঞান-বিলাস। আরও একটা আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, মানুষ সকল সময়েই দেখে যে, লক্ষ্মী আপাততই রমণীয়া; তাহাকে যতই ভোগ করা যায়, ততই সে হিংসা-দ্বেষাদি বর্দ্ধিত করিয়া থাকে। অপিচ ঐ লক্ষ্মীর অন্তর্ধান এত দ্রুত ঘটে যে, তাহা লক্ষ্যই করা যায় না। তার পর আবার দেখা যায়, সকলেই যে উহাকে পায়, তাহা নহে; বহু চেষ্টা করিয়া কচিৎ দুই দশ জন লোক মাত্র উহাকে পাইয়া থাকে। তথাচ এই দুর্লভ অথচ ক্ষয়-সুলভ লক্ষ্মী-লাভের জন্য মানুষের চেষ্টার বিরাম নাই। এরূপ লক্ষ্মীর জন্য লালায়িত হওয়া অজ্ঞানেরই মহিমা। লোকের অন্তঃকরণ দুঃখানুভব করে, শত শত শাখায় প্রসারিত হইয়া তাহাতে সুখ উপস্থিত হয়, আর তাহাদের নানা কর্ম্মের ফলস্বরূপ ঐশ্বর্য্যরাশি অবশেষে যে দুঃখশাখা বিস্তার করে, এ সকলও কেবল ভ্রান্তিরই খেলা। দেখ, কর্ম্ম করিলেই তাহার ফল ভোগ হয়; সুতরাং কর্ম্ম যে মুক্তির পরিপন্থী, তাহা বলাই বাহুল্য মাত্র। কর্ম্মকাণ্ডবিষয়িণী শ্রুতি কাম্য কর্ম্ম-বিস্তারের সহায়;

কাজেই তাদৃশ শ্রুতিবাক্যসমূহ নিবিড় বনের ন্যায় স্বচ্ছন্দ গতির বাধক। শ্রুতির ঐ কর্ম্মোপদেশক বাক্যাংশের মর্ম্ম যদি অভিনিবেশ সহকারে বুঝিয়া দেখা যায়, তবেই প্রতীত হইবে—তাহা যেন নিবিড় নীরদাবলীর অন্ধকারময় জালরচনা; দশনাদি-সমন্বিত কুৎসিত বদনবিবর যেমন দুইটী ওষ্ঠে আবৃত হইয়া সুন্দরাকারে প্রতিভাত হয়, তেমনি শ্রুতিরও কর্ম্মোপদেশক বাক্যাংশ আপাতত উপরিভাগে মনোরম; কিন্তু উহার ভিতরে প্রবেশ কর, দেখিবে,—কারাগৃহ-নিক্ষিপ্ত ব্যক্তির ন্যায় নিগড়বদ্ধ হইয়াই থাকিতে হইবে। তুষার যেমন ধারাকারে সদাই পতনোন্মুখ, তেমনি মূর্খ জনের মোহও সতত আপনা হইতেই বিবিধ কর্ম্মে প্রবৃত্তিপ্রবণ। তদুপরি আবার শাস্ত্রের নির্দেশ তাহার কাম্যকর্ম্ম-প্রবৃত্তির উত্তেজক; কাজেই সেই মূর্খের মোহ বর্ষাজল-স্ফীতা তিমিরবৎ শ্যামসলিলা কালিন্দীর ন্যায় প্রখরবেগে চিরকাল ধরিয়া প্রবাহিত হইতে থাকে।

রামচন্দ্র! জীব এমনই ভাবে অজ্ঞানে পরিবর্দ্ধিত হয়,—হইয়া ভোগ-ব্যাপারে আসক্ত হইয়া পড়ে। কাজেই কামনার তাহার বিরাম হয় না বলিয়াই সেই নিষ্কাম-লভ্য নির্ম্মল মোক্ষলাভ তাহার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। কর্ম্মফলের আবর্ত্তনে পড়িয়া সর্ব্বদাই তাহাকে জন্ম গ্রহণ করিতে হয়। তৎকালে তদীয় জন্মরূপ বিষবল্লীর রস তাহার আপাতঃ-রম্য বিবিধ সুখোৎপাদনে সক্ষম হইয়া ক্রমেই উপচিত হইতে থাকে। সে রস তাহাকে এমনই নিষ্ঠুরের ন্যায় আবৃত করিয়া রাখে যে, তাহার অন্তঃকরণ দ্বেষ, মাৎসর্য্য ও চিন্তনাদি কার্য্যে চিরদিনের তরে কলুষিত হইয়া যায়। তাহার অন্তর কখনও যে নির্ম্মোহ হইয়া সুপ্রসন্ন হইবে, সে আশাও আর থাকে না। জীব এইরূপে কর্ম্মফলের অধীন হইয়া কতই না ক্লেশ ভোগ করে। যদিও সে চেতনাবান্, তথাচ অচেতন স্থাবর তরু-প্রভৃতির ন্যায় নীরবে তাহাকে নানা যাতনা সহিতে হয়। তরুগাত্রে পত্রাবলীর ন্যায় তাহারও কত পুত্র-পৌত্র-বন্ধু-বান্ধবাদি প্রাদুর্ভূত হয়। কিন্তু স্বকর্ম্ম-ফলরূপ পবনবেগে বৃন্তচ্যুত ফলরাজির ন্যায় তাহারা কোথায় কোন্ অজ্ঞাত দেশে চলিয়া যায়। বৃক্ষের সৌগন্ধ্যময় পুষ্পরেণু যেমন পবনান্দোলনে উড়িয়া যায়, তেমনি কর্ম্মফলের আবর্ত্তনে তাহার শত শত হৃদয়-

বাসনা চিরদিনের তরে বিলয় প্রাপ্ত হয়। তৎপরে সকল আশা বিসর্জ্জন দিয়া নিরানন্দমনে তাহাকে প্রাণ পরিত্যাগ করিতে হয়। সর্ব্বগ্রাসী কাল কত অনন্তবার অনন্ত জগৎকে কালপক্ব ফলের ন্যায় গ্রাস করে, তথাচ তাহার তৃপ্তি নাই। কালের তীব্র জঠরজ্বালা চিরদিনই অতৃপ্ত। যাহাতে ত্রিবিধ তাপের লেশ মাত্র নাই, যাহা প্রশান্ত ও অচলবৎ অটল ও স্থির, সেই পরম ব্রহ্মের স্নিগ্ধোজ্জ্বল বিভা সমাচ্ছন্ন হইয়া এ সংসারে মূঢ় জীবাকারে পর্য্যবসিত হয়। এই সকল জীবকে আমি সর্প বলিয়াই মনে করি। কেন না, সর্প যেমন বায়ুভোজী, ইহারাও তেমনি মোহ-মারুতপায়ী। সর্প যেমন প্রায়শঃ নিজের পুরাণ ত্বক্ পরিত্যাগপূর্ব্বক নূতন দেহ ধারণ করে, এই সকল জীবও তেমনি কালবশে স্বীয় পূর্ব্বদেহ পরিহারপূর্ব্বক আবার নবীন দেহে আবির্ভূত হয়। সর্পের দেহ চিত্র-বিচিত্র, এই জীবগণও বিবিধ বিচিত্র দেহ ধারণপূর্ব্বক এ সংসারে বিচরণশীল। মূঢ়দিগের সর্ব্বকর্ম্ম-ক্ষম যৌবন কালের সমাগম হয় সত্য; কিন্তু তিমিরাচ্ছন্ন যামিনীর ন্যায় চিরদিনই তাহা চিন্তারূপিণী পিশাচীর প্রগল্ভতায় উপহত হয়, তাহাতে বিবেক-বিধুর উদয় নাই বলিয়াই চিরতরে তাহা নিবিড় তিমিরে নিরালোক হইয়া থাকে। পরাৎপর দেবের স্তুতিগাথা গান করিবার উপযোগী জিহ্বা তাহাদের থাকিলেও সে কার্য্যে তাহারা মনোযোগী হয় না; কমল-কোটরের কোণগত মৃণালসূত্র যেমন হিমাচ্ছন্ন হইয়া অব্যক্তভাবে অবস্থান করে, তেমনি তাহাদের সেই রসনাও সতত পুত্র-দারাদির অনুনয়-বিনয়-ব্যাপারেই সন্তপ্ত হইয়া থাকে। কেবল ইহাই নহে; অশেষ ক্লেশবহুল দারিদ্র্য এই সময় সহস্র সহস্র শাখায় প্রসারিত হইয়া মূঢ় ব্যক্তিকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। কণ্টকাকীর্ণ শাল্মলীতরুর ন্যায় সে দারিদ্র্যে মূঢ়লোক কতই না ক্লেশ অনুভব করে। তখন সর্ব্ববিধ উন্নতির প্রতিবন্ধক লোভরূপ উলূক আসিয়া তাহার চিত্ত-চৈত্যে বাস করিতে থাকে। ঐ লোভ-উলূক মায়ারূপিণী অমানিশায় অঙ্গ আবরিয়া তখন কতই না নৃত্য করে। এরূপ লোভে পড়িয়া যৌবনোন্মত্ত মূঢ় লোকের ভবিষ্যৎ একেবারেই অন্ধকারময় হইয়া পড়ে। কিন্তু এই যে যৌবনের উন্মাদনা, ইহাও বেশী দিন থাকে না; কিঞ্চিৎ কাল যাইতে না যাইতেই ক্রমে তাহার সেই যৌবনও চলিয়া

যায়। অতঃপর জরা আসিয়া উপস্থিত হয়। মার্জ্জারী যেমন কর্ণপ্রদেশে মূষিক ধরিয়া তাহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলে, তেমনি জরা আসিয়া প্রথমতঃ সেই মূঢ় লোকের কর্ণপ্রান্ত-গত কপোলদেশ আক্রমণ করে; জরাবেশে মূঢ় ব্যক্তি বিবশ হইয়া পড়ে। তখন অবসর পাইয়া জরা তাহার যৌবন শোভা হরণ করিয়া লয়। এক একটী ফেনকণার প্রাতুর্ভাবে ক্রমশঃ যেমন প্রকাণ্ড ফেনপিণ্ড প্রাতুর্ভূত হয়, তেমনি অজ্ঞানবশেই এই ধরাধর-সমুন্নত সৃষ্টি পুষ্ট হইয়া উঠে। এই সৃষ্টি যেন একটা বৃহতী লতার ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে। চৈতন্যময়ের আভাসরূপ পুষ্প-শোভায় এ লতা বিরাজিত এবং জগৎরূপ পল্লবে ইহা সুশোভিত। এ জগতের ব্যবহারিক সত্তাই ইহার সত্তা এবং ধর্ম্ম ও অর্থ নামক তুইটী ফলে ইহা ফলবতী। এইরূপে এই ত্রিজগৎকে একটা মহাগৃহ বলিয়াও ব্যাখ্যা করা যায়। সুরশৈল সকল ইহার মহাস্তম্ভ, চন্দ্র-সূর্য্য গবাক্ষ এবং গগন ইহার চারু চন্দ্রাতপ। আবার এ সংসারকে একটা মহাসরোবর বলিয়াও মনে হয়। ইহাতে প্রাণরূপ ষট্পদ-সকল শরীররূপ কমল-কোষের অভ্যন্তরে সতত চিদাকার রস পান করিয়া পরিভ্রমণ করে।

রামচন্দ্র! ঐ যে দেখা যায়, নীলকান্ত-মণিময় ভূভাগের ন্যায় সুনীল সুরম্য সুবিশাল আকাশপথ রহিয়াছে, আর উহার প্রদেশবিশেষে বসিয়া ঐ যে দীপিকার ন্যায় ভুবনভাস্বর ভাস্কর দেব দীপ্তি পাইতেছেন, উহা কি? বস্তুতঃ উহা অবিদ্যারই বিলাস বৈ আর কিছুই নহে। ঐ যে জরাজীর্ণ বিহঙ্গিনীর ন্যায় জগতের অগণিত জীব পরস্পর স্ব স্ব আশাজালে আবদ্ধ হইয়া স্ব স্ব বাসনারূপ শলাকানির্ম্মিত ইন্দ্রিয়পিঞ্জরের মধ্যভাগে নিবদ্ধ আছে; ঐ যে সংসারব্রততি কাল-পবনে পরিচালিত হইয়া নিয়ত নিজ দেহ হইতে রাশি রাশি জীবরূপ পত্রপুঞ্জ পাতিত করত চিরদিন স্পন্দিত হইতেছে, ঐ যে বিধাতৃ-বিহিত ভয়ঙ্কর নরকপঙ্কে পড়িবার শঙ্কা পরিহার করিয়া তুরভিমানী অভিজাতগণ এ জগতে কিঞ্চিৎ কালের জন্য আনন্দানুভব করিতেছে, ঐ চন্দ্রখণ্ড গ্রাস করিয়া নীল নীরদমালা যদীয় শৈবালবৎ বিভাত হইতেছে, সেই আকাশপথস্থ স্বর্গরূপ সরোবরে থাকিয়া ঐ যে সুররূপী সারসেরা কেলি করিতেছে, ঐ যে বিবিধ বৈধকর্ম্মরূপিণী

সরোজিনী নানা কর্ম্মফলরূপ অলিমালায় মলিনাঙ্গ ও বাসনাজালে বেষ্টিত হইয়া ঈষৎ ঈষৎ অঙ্গ-স্পন্দনে সর্ব্বত্র সৌরভ্য বিস্তার করিতে করিতে স্ফীত-ভাবে বিকাশ পাইতেছে, এ সকলই অবিদ্যা-বিলাস। এই ভব-পল্বলে সৃষ্টি যেন একটী ক্ষুদ্র শফরী; এ শফরী কিয়ৎদিন পরেই প্রতারণাকুশল কৃতান্তরূপ বৃদ্ধ গৃধ্রের হস্তে নিগ্রহ ভোগ করে। এই সৃষ্টি তরঙ্গোত্থিত ফেনমালার ন্যায় ভঙ্গুরস্বভাব; চন্দ্রলেখার ন্যায় প্রতিদিন ইহার বিচিত্রতা সমুদিত হইতেছে। কালরূপ কুলাল প্রত্যহ এ সংসারে প্রভূত ভূতবৃন্দরূপ ক্ষণভঙ্গুর শরাব সকল প্রস্তুত করিতেছে। সে নিরন্তর এমনই ভাবে এই সংসারচক্র পরিচালিত করিতেছে। পরম পদ-প্রান্তে এইরূপে কত বিবিধ ব্যবহার-ক্ষম অনন্ত জগজ্জাল-জঙ্গল জন্মিতেছে; আবার যুগান্ত অনলে সকলই দগ্ধ হইতেছে। এই জাগতী স্থিতি শত শত সুখ-দুঃখ-দশায় অজস্র বিপরিণাম প্রাপ্ত হইতেছে। এই প্রকার অনর্থ-পরম্পরা দর্শন করিয়াও অজ্ঞদিগের নির্ব্বেদোদয় নাই। কেন না, তাহাদের বুদ্ধি বাসনা-নিগড়ে এমনি আবদ্ধ যে, কিছুতেই তাহা ভগ্ন হইবার নহে। শত শত যুগ চলিয়া যাউক, তাহাদের সেই বুদ্ধির উপর বজ্রপাত হউক, তথাচ সে বাসনা-বদ্ধ বুদ্ধি অটল ও অক্ষুণ্ণভাবেই থাকিয়া যায়।' বস্তুতঃ বুঝিয়া দেখ, জ্ঞানপ্রভাবে অজ্ঞানের বাধ-ঘটনা হইলেও প্রারব্ধবশে যে বাসনা মন্বন্তরকাল পর্য্যন্ত ইন্দ্রাদি দেহ ধারণ করিয়া রাখে, অন্য কাহার প্রভাবে সে বাসনার ভঙ্গ-প্রসক্তি হইতে পারে? এই কাল মহাসর্পের ন্যায় দণ্ডায়মান; এই অসার সৃষ্টিপরম্পরা ধূলিশ্রেণীর ন্যায় অথবা বাত্যার ন্যায় নিয়তিবেগে নিয়ত ইহার গলান্তরে প্রবেশ করিতেছে। অভাব বা ধ্বংস যেন একরূপ বাড়বাগ্নি; এই বাড়বাগ্নির মুখে এই যে সকলই অনবরত ভস্মীভূত হইতেছে, এই যে সহসা সমুৎপন্ন সত্তামাত্রা-কৃতি বিচিত্র দ্রব্যশক্তি সকল চঞ্চল জলের চঞ্চল শ্রীর ন্যায় বিকশিত হইতেছে ও লোপ পাইয়া যাইতেছে, এই সকলই অজ্ঞান-বিলসিত। এই যে ভূত ও ভৌতিক পদার্থ-পরম্পরায় পরিপূর্ণ জগৎ, ইহা যেন একটা বৃহৎ হস্তী; উদ্রিক্ত কৃতান্ত যেন উদ্রিক্ত সিংহ। এই সিংহের কবলেই জগৎ-হস্তী নিয়ত পতিত হইতেছে। এই বিবিধ জগৎ যেন বিহঙ্গমশ্রেণী; মহেন্দ্রাদি

কুলাচল উহাদের উপভোগ্য ফল; মেঘদল পক্ষসমূহ, উহারা বাসনার বেগে সতত ফলাকাঙ্ক্ষী হইয়া জন্মিতেছে, মরিয়া যাইতেছে, আবার কিয়দ্দিনের জন্য এই সংসারেও অবস্থান করিতেছে। বিধাতা চিত্রকরের ন্যায় জীবগণের স্পন্দ-শুভ্র চিত্ত-ভিত্তিভাগে পঞ্চেন্দ্রিয়রূপ রঙ্গ দ্বারা সংসার-চিত্র সকল উন্মীলিত করিতেছেন। এই যে স্থাবরসমূহ দেখা যাইতেছে, ইহারা যেন নিরন্তর ধ্যানযোগে ধীর স্থিরভাবে সতত সূক্ষ্ম কালগতি অনুভব করিয়া রহিয়াছে। ভাবিতেছে, এই কালগতি স্বয়ং অতি চঞ্চল, আবার অন্যে যে অচঞ্চলভাবে থাকিবে, তাহার উপায় নাই। এ নিজেও ভ্রমণ করিতেছে এবং অপর সকলকেও ভ্রমণ করাইতেছে। ইহার গতি যেন শতভাগ-ভিন্ন নিমেষবৎ সূক্ষ্ম। ইহার এমনই প্রভাব যে, যাহার অস্তিত্ব এখন নাই, তাহারও অঙ্কুর যেন চক্ষুর সমক্ষে দেদীপ্যমান। মনে হয়, স্থাবর যেন তাহার আপনার দিকে চাহিয়াও ভাবিতেছে, এই কাল আমাকেও উদ্ভাবিত করিয়াছে। এই সমগ্র স্থাবর জাতি যেন এইরূপ ভাবনাতেই বিভোর আছে। স্থাবরের কথা ছাড়িয়া জঙ্গমের কথা বলি। সমগ্র জঙ্গম জাতি স্ব স্ব দোষে রাগ-দ্বেষ-জনিত অন্তর্দাহকর দুঃখ ভোগ করিতেছে, সতত প্রিয় বস্তুর বিয়োগে ভয়ে শোকে বিহ্বল হইয়া পড়িতেছে, রোগাক্রান্ত হইতেছে, কাল-পর্য্যায়ে নিয়ত জরাক্রান্ত ও মৃত্যুগ্রস্ত হইতেছে, এইরূপ হইয়া-হইয়া যৎপরোনাস্তি জর্জ্জর হইয়া পড়িতেছে। ছাড়িয়া দিই জঙ্গমের কথা। এই যে কীট-পতঙ্গাদি তির্য্যগ্‌জাতি, ইহারা এই ধরা-পৃষ্ঠে আসিয়া পূর্ব্বজন্মসঞ্চিত স্ব স্ব দুষ্কৃতির ফল ভোগ করিয়া ভ্রমণ করিতেছে, আর প্রতিনিয়ত নিয়তির হস্তে নিপীড়িত হইতেছে। কাল যেন বিশাল ফণামণ্ডল-বিস্তারী বিপুল-কলেবর বিষধরের ন্যায় দণ্ডায়মান। সে তাহার বিশাল কলেবর জগতের সমক্ষে এমনই ভাবে অদৃশ্য করিয়া রাখিয়াছে যে, পৃথিবীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে খুঁজিয়া দেখ, তাহার অবস্থান-স্থান কুত্রাপি কাহারও লক্ষ্যীভূত হইবার নহে। অথচ কাল অনায়াসে একটুকু সময়ের মধ্যেই এই চরাচর সমগ্র বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড গ্রাস করিয়া ফেলিতেছে। সংসারে কালবশেই সকলের আবির্ভাব হইতেছে। এই যে দেখিতেছ, বৃক্ষাদি স্থাবর বস্তু পৃথ্বীগাত্র ভেদ করিয়া রন্ধ্র হইতে উত্থানপূর্ব্বক অবস্থান করিতেছে;

ইহারা সকলেই কালের অধীনতায় এমনই ভাবে স্থির হইয়া দণ্ডায়মান। কালের মাহাত্ম্যেই ইহাদের অঙ্গে এমন ভাবে রসাদি সঞ্চার হইতেছে যে, তাহারই আশায় অনেক জীব ইহাদের দেহভাগ বেষ্টন করিয়া বিরাজ করিতেছে। ইহারা কালের প্রভাবে জড়ের ন্যায় যাবতীয় যাতনা সহিতেছে। কত শীত-বাত ও আতপতাপ মস্তকে বহিতেছে, আবার কালের প্রসাদে এক এক সময় প্রফুল্ল পুষ্প-স্তবকে কতই না শোভা ধারণ করিতেছে এবং কতই না ফল প্রসব করিতেছে।

রামচন্দ্র! এই যে স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতাল বা ত্রৈলোক্য স্থান, ইহা যেন একটী পদ্ম; কালবশে জলের উপরই ইহা ভাসমান। প্রভূত ভ্রমরবৃন্দের ন্যায় এ পদ্মের অভ্যন্তরে অগণিত প্রাণী আমরা, কেবলই বৃথা গুন গুন ধ্বনি করিতেছি। কেবলই ভাবিতেছি, জীবনের একমাত্র প্রয়োজন বুঝি উদর-ভরণ; তাই এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডখণ্ডকে আমাদের ভৈক্ষ ভাণ্ড বা ভিক্ষার স্থান বলিয়াই বুঝিয়া লই। ভগবতী কালশক্তি অনন্ত কাল ধরিয়া কেবলই আমাদের ভিক্ষা বিধান করিতেছেন। অহো, কি মোহাবেশ! আমরা ইহার কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না যে, তিনি আমাদের ভিক্ষা বিধান করেন বটে, কিন্তু ভগবান্ কালের করে ভিক্ষা দান করিবার নিমিত্ত আমাদিগকেই আবার ভিক্ষার বস্তু বলিয়া গ্রহণ করিতেছেন। ভগবতী কালী আপন ভর্ত্তা কালের করে পুনঃপুন কত শত ভূতভিক্ষা দান করিতেছেন, আবার অন্যান্য ভূতভিক্ষা গ্রহণ কবিবার জন্য ব্যগ্র হইতেছেন। এই ত্রিলোকী ভিক্ষাফল; ইহা একটা বৃদ্ধ কামিনীর ন্যায় প্রতীয়মান। রজনীর তিমিরপুঞ্জ ইহার করবীভার, চন্দ্র-সূর্য্য ইহার চপল চক্ষুযুগল; ইহার অন্তরের চৈতন্য এক চমৎকার বস্তু। ব্রহ্মলোকবাসী ব্রহ্মা, বৈকুণ্ঠস্থ উপেন্দ্র ও বৈজন্তপুরের মহেন্দ্র, ইহাঁরাই এই ত্রিলোকীরূপিণী বৃদ্ধ রমণীর আনন্দ ও ঐশ্বর্য্যময় মূর্ত্তিমান্ চৈতন্য। এই ধরা ও এই ধরাধরবর্গ ইহার সুবিশাল ও কমনীয় কলেবর। এ রমণীর কত ঐশ্বর্য্য কত মহত্ত্ব, তাহা বুঝিবার উপায় নাই। ইহার প্রতি অঙ্গে সেই একাদ্বয় পরব্রহ্ম তত্ত্ব নিগূঢ়ভাবে নিহিত। বিলম্বিত অম্বুদমালাই ইহার পয়োধর-যুগল। মাতার ন্যায় বিচ্ছশক্তি ইহার পালয়িত্রী; তাই

এ রমণী স্থূলা, তরলা ও চপলা। ঐ অম্বরোদ্ভাসিত নক্ষত্ররাজি ইহার দন্তপঙিক্ত,সন্ধ্যাকালীন স্নিগ্ধোজ্জ্বল রক্তিমাভা ইহার অধরশ্রী, প্রফুল্ল কমল-দল ইহার হস্ত। মহেন্দ্রের রম্যবান বৈজন্তপুরী- ইহার মুখ-মণ্ডল। পৃথিবীস্থ সপ্ত সমুদ্র ইহার গল বিলম্বিত মুক্তামালা। ঐ যে নীলাকাশ, উহাই ইহার উত্তরীয় বসন ; ঐ বসনে উহার সর্ব্বাঙ্গ সমাবৃত। এই সমগ্র জম্বুদ্বীপ ঐ ত্রিলোকী-কামিনীর বিপুল নাভিমণ্ডল এবং পৃথিবীস্থ সমস্ত বনসম্পত্তি উহার রোমরাজি। এই ত্রিলোকী-রমণীর বারম্বার আবির্ভাব ও বারম্বার তিরোভাব ঘটিতেছে। এইরূপে অনাদি অনন্তকাল ধরিয়া কতই না ইহার বিলাস বিভ্রম হইয়া আসিতেছে। কালের মহিমা অসীম ; তাহার মাহাত্ম্য বুঝে, এমন শক্তি কাহার ? কাল যেন এক মহাসাগরের ন্যায় বিরাজমান ; তাহার ঘোর বিবর্ত্তে পড়িয়া এই সমগ্র সংসার একবার উন্মগ্ন হইতেছে, আবার নিমগ্ন হইতেছে। এই কাল-সাগর অগাধ রস-নিষ্যন্দময় ; ইহাতে এই ব্রহ্মাণ্ড বুদ্বুদবৎ নিরন্তর উত্থিত হয়, আবার ক্ষণ পরেই কোথায় কোন্ অজ্ঞাত দেশে বিলয় পাইয়া যায়। এই সৃষ্টির নিমিত্তীভূত হিরণ্য-গর্ভগণ যেন সারস পক্ষী ; তাঁহারা কল্পমাত্র-রূপ নিমেষ-পরেই কোথায় উড্ডীন হইয়া যাইতেছে। সৃষ্টি যেন ক্ষণপ্রভা ; সে জন্মিয়া জন্মিয়া বারম্বার সন্তপ্তহৃদয়ে নাশ পাইতেছে। মহাকালরূপ মহামেঘের অঙ্গে সৃষ্টিরূপিণী ক্ষণপ্রভা ক্ষণমাত্র প্রকাশ পাইয়া থাকে। তাহার সে প্রকাশশক্তি ক্ষণব্যাপিনী হইলেও তাহা সেই চিদানন্দময়েরই অংশস্বরূপিণী। এই অত্যুন্নত কালরূপ তালতরু হইতে বিহঙ্গমদলের ন্যায় অনবরত প্রাণিপুঞ্জ প্রস্থান করিতেছে! আর তাহাদের গতিবিধির সঙ্গে সঙ্গে এই ব্রহ্মাণ্ডরূপ ফল-রাজিও অনবরত ঘুরিয়া ঘুরিয়া কাকতালীয়বৎ আপনা হইতে পতিত হইতেছে। ব্রহ্মাণ্ডের এরূপ আকাস্মিক পতনে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই। এ ব্রহ্মাণ্ডের কোনও স্থানে বিষ্ণু, রুদ্র, ঈশ্বর ও সদাশিব নামক দেবনেতৃগণ অবস্থান করেন। তাঁহাদের নিমেষ মধ্যেই এই সৃষ্টিপরম্পরা সংহারদশায় উপনীত হয়। সহস্র সহস্র কল্প নিমেষ ও উন্মেষবশেই ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া যায়। সৃষ্টির পরম কারণ চৈতন্যময়ের অভ্যন্তরে

কত সৃষ্টি-সংহারক রুদ্র অবস্থান করিতেছেন। এই সকল রুদ্র যদীয় নিমেষমাত্রেই আবির্ভূত ও তিরোভূত হইতেছেন, ঈদৃশ সর্ব্বশক্তিমান্ দেবাধিপতিও বিরাজ করিতেছেন। কিন্তু এ সকল সংবাদ ক্ষুদ্র জীবের অজ্ঞাত। কেন না, এ সংসারের ক্রিয়াস্থিতি অনন্ত। সেই অনন্ত সঙ্কল্পময় শূন্যস্বরূপ ব্রহ্মপদে কতই না বিচিত্র শক্তি সমুৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা? অজ্ঞ জীব কেমন করিয়া সে তত্ত্ব বুঝিতে পারিবে?

রামচন্দ্র! এইরূপ অপরিক্ষীণ সঙ্কল্পবলে কত অনন্ত বিষয় সংগৃহীত হয়; সেই সকল সংগৃহীত বিষয়ভরে এই জাগতিক বিবিধ কল্পনা চিরদিন প্রকাশমান। এই যে কল্পনাপ্রবাহ, ইহা অজ্ঞানেরই বিলাস ব্যতীত আর কিছুই নহে। দেখ, সংসারে এই যে কিছু বিপদ-সম্পদ, এই যে বাল্য, যৌবন, জরা ও মরণ-পাত, আর এই যে কত সন্তাপ ও সুখ-দুঃখে তন্ময়ভাব, এই সকলই সেই কঠোর অজ্ঞান-তিমিরের বিভূতি ভিন্ন অন্য কিছুই নয়।

সপ্তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭ ॥

অষ্টম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র! এই সংসার-বনখণ্ডে কবে কিরূপে এই অবিদ্যাময়ী সৃষ্টি-লতা চিৎ-পর্ব্বতের পাদদেশে থাকিয়া বিকাশ প্রাপ্ত হইল, তাহা বলিতেছি, নিবিষ্ট-চিত্তে শ্রবণ কর। সুমেরু প্রভৃতি বৃহৎ বৃহৎ পর্ব্বতমালা এই সৃষ্টিলতার পর্ব্বস্থান, প্রতি অঙ্গে পত্রাঙ্কুরবৎ জীবনিবহ-ধারিণী এই ত্রিলোকী ইহার দেহযষ্টি, এই ব্রহ্মাণ্ড ইহার ত্বগাবরণ এবং সুখ, দুঃখ, জন্ম, স্থিতি, জ্ঞান ও অজ্ঞান, এই সকলই এ লতার মূল ও ফল। এ লতা প্রতিদিনই বর্দ্ধনশীলা। সুখ হইতে অবিদ্যার জন্ম হয়; কেন না, মানুষের সুখসম্পদ যতই বর্দ্ধিত হইতে থাকে, ততই

তাহার প্রবৃত্তি সেই সুখের দিকেই ধাবিত হয়। কাজেই সুখলাভের জন্য তাহাকে সময়ে সময়ে এমন অনেক কার্য্যও করিতে হয়, যাহাতে তাহার অজ্ঞান উত্তরোত্তর উপচিত হইয়া যায়। সুতরাং এরূপ সুখ হইতে চির দিনই অবিদ্যার উৎপত্তি অবশ্যম্ভাবিনী। দুঃখ হইতেও অবিদ্যার আবির্ভাব অনিবার্য্য ; কেন না, মনুষ্যের দারিদ্র্য প্রভৃতি দুঃখ যতই আসিয়া উপস্থিত হয়, ধনাদির জন্য লালসা তাহার ততই দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ঐরূপ লালসা বা তৃষ্ণাবশে ক্রমে তাহার পাপ-বাসনা জন্মে, তাহা হইতে ক্রমশঃ চৌর্য্যাদি-ব্যাপারে প্রবৃত্তি হয় ; কাজেই পরিণাম তাহার দুঃখফলেরই প্রসূতি। অতএব বুঝা যায়, এ সংসারে এই সৃষ্টিলতা দুঃখকেই অত্যধিক পরিমাণে উৎপাদন করিয়া থাকে। এইরূপ জন্ম বা উৎপত্তি হইতেও অবিদ্যার বিকাশ হয় ; এই জন্য বলা হয়, এই মোহময়ী উৎপত্তিমতী সৃষ্টিলতা উহার প্রসূতি। স্থিতি বা প্রকাশ হইতেই নিখিল সংসারের সত্তাবোধ হয়। এই প্রকার সত্তাবধারণেই অজ্ঞানোদয় ; অজ্ঞান হইতেই সংসার। কাজেই বলা যায়, এই সৃষ্টিলতাই ভাব বা স্থিতি ফলের উৎপাদয়িত্রী। অজ্ঞানকেও এই সৃষ্টিলতার অন্যতম ফল বলা হইয়াছে।" কারণ এই যে, অজ্ঞানবশেই এ লতার বৃদ্ধি দেখা যায়। এ লতার আর একটী ফল জ্ঞান ; কেন না, জ্ঞান যদি জন্মে, তবে সৃষ্টি-বিষয়িণী পরিণতির প্রকৃত তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারা যায়। এইরূপ হইলে সৃষ্টির যে একটা ধারাবাহিক সত্তা, তাহা অনুভবগম্য হয়। তখনকার সেইরূপ জ্ঞানে সৃষ্টির সত্তাবধারণ যখন অপরিহার্য্য হইয়া উঠে, তখন সেই জ্ঞানই প্রকারান্তরে অবিদ্যাকে আনয়ন করিয়া দেয়। সুতরাং বলিতে হয়, এতাদৃশ জ্ঞানও এই ত্রিলোকীরূপিণী সৃষ্টিলতার ফলান্তর।

রামচন্দ্র! এই লতা নানাভাবে সমুল্লসিতা, যে কিছু বাসনা, তাহাতেই ইহা আমোদময়ী। ইহার অবয়ব সকল ঘন প্রবালে তরলিত হইয়া সুশোভিত। সমুজ্জ্বল দিবসরচনা এ লতার পুষ্পচ্ছটা। তিমিরময়ী কৃষ্ণযামিনী ইহার চঞ্চল ভ্রমরশ্রেণী। এ লতা নিয়তই স্পন্দমানা। রাগাদিবশে আকৃষ্ট হইয়া ইতস্তত যে সকল প্রাণী প্রধাবিত হইতেছে, তাহারাই ইহার পল্লবমালা। এ লতা কর্ম্মরূপ বায়ুবশে পুনঃপুন বিঘূর্ণিত হয়,—হইয়া

কদাচিৎ কোনও অধিকারী প্রাণিরূপ পল্লবাংশে বিবেকরূপিণী করিণীর প্রতি প্রধাবিত হয়। ঐ বিবেক-করিণী কখন তাহার বিচাররূপ শুণ্ডাগ্র যোগে বিষয়-তরুর বিশ্লেষণে উহাকে কম্পিত করিয়া থাকে। এইরূপ কম্পনে এ লতার রজঃসম্পর্ক একেবারেই ঘুচিয়া গেলেও অর্থাৎ দুর্ব্বাসনা-রূপ পরাগ-পুঞ্জ অপসারিত হইলেও দৈবাৎ আবার সেই বিষয়-তরুর সহিত প্রসক্তি ঘটনা অসম্ভব হয় না। এই যে অনবরত জীবনিবহ জন্মিতেছে, ইহারাই এ লতার পল্লবের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে। পুত্র-পৌত্রাদি অঙ্কুরসমূহে উহার মুখ যেন আনন্দে ঈষৎ হাস্যে উল্লসিত হইতেছে। সকল ঋতুজাত কুসুম-সমূহে ইহার অবয়ব আবৃত রহিয়াছে। সমুদায় রস-সঞ্চয়ে ইহা পরিপ্লুত হইতেছে। এ লতার প্রতি অঙ্গে পুষ্প-পল্লবাদির ন্যায় অনবরত উৎসবশালী জীবসমষ্টি যখন জন্ম লয়, তখন কে জানে, কোথা হইতে কুসুম-সৌরভে সমাকৃষ্ট সর্পসমূহের ন্যায় ভয়ঙ্কর দুঃখ-রোগাদি আসিয়া ইহাকে নীরন্ধ্রভাবে আবৃত করিয়া রাখে। প্রতিক্ষণে কত শত জীবপল্লব ইহার হৃদয়দেশ হইতে খসিয়া পড়িতেছে; ইহাতে জর্জ্জরিত হওয়ায় ইহার দেহে কতই না ছিদ্র প্রকট হইতেছে। এরূপ ছিদ্রে এ লতার কত ব্যাকুলতা দেখা যাইতেছে। কিন্তু তাই বলিয়া রসগ্রহণে ইহা বিরত নহে। ইহা বিষয়ানুভব-সম্বন্ধীয় রসপ্রবাহে পূর্ণ রহিয়াছে। জীব কেবলই ইহার রস-বিহ্বলতা লক্ষ্য করে; কিন্তু যে বিচার করিয়া ইহার প্রকৃত রহস্য বুঝে,সে ইহার স্নিগ্ধ রসময় প্রতি অঙ্গেই ঘুণক্ষতবৎঅবলোকন করে। এ লতাকে যে কুসুম সমূহে সমাবৃত বলিয়া বর্ণন করিয়াছি, তাহা এক্ষণে আরও বিশদ করিয়া বলিতেছি। ঐ যে আকাশে প্রত্যহ জ্যোতির্ময় চন্দ্র-সূর্য্যাদি সহ গ্রহসমূহ বিকসিত হইতেছে, উহারাই ইহার বায়ু-বিলোড়িত মনোজ্ঞ পুষ্পসম্ভার। ঐ যে আকাশস্থ তারকাস্তবক, উহারাই ইহার প্রস্ফুটিত কোরক-নিচয়। অপিচ ঐ যে উজ্জ্বলাকার চন্দ্র ও অর্ক, আর ঐ যে হুতাশনের আলোকচ্ছটা, এ সকল ইহার সর্ব্বত্র সঞ্চারী পুষ্প-পরাগ। এই পুষ্পপরাগ প্রতি অঙ্গে মাখিয়া গৌরাঙ্গী রমণীর ন্যায় এই সৃষ্টিলতিকা সকলেরই মন হরণ করিতেছে। কিন্তু মনোরূপ মাতঙ্গ ইহাকে সদাই কম্পিত করে। এ লতার উপরি সঙ্কল্প-কোকিল কলতানে

পান করিতেছে। ইন্দ্রিয়গণ বিষধরের ন্যায় চারিদিকে ইহাকে বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে। সর্ব্বাঙ্গ ইহার তৃষ্ণা-ত্বকে উপরঞ্জিত রহিয়াছে। এই নীলাকাশরূপ তমালতরুর অঙ্গ আশ্রয় করিয়াই ঐ লতা উন্নতির উচ্চ সীমায় আরোহণ করিয়াছে। ভূমি ও অন্তরীক্ষ ইহার জানুস্তম্ভ। এই ভুবনোদ্যানে এই একই মাত্র সুন্দরী লতা বিরাজিতা। অধোগত ব্রহ্মাণ্ড-খণ্ডই ইহার মূলদেশের আলবাল। নিখিল জলধিজলই এ লতার আলবাল-গত জল-সেচন। যাহারা কাম্য কর্ম্ম-কাণ্ডাত্মক বেদত্রয়ের আশ্রয় লইয়া বাসনাময় হইয়া রহিয়াছে, সেই সকল বাসনাহত চঞ্চলচেতা মূঢ় জীবই এ লতার বিলোল ভ্রমরদল, আর ঐ জীবগণের উপভোগ্য রমণী-বৃন্দই কুসুমরাজি; এই কুসুমরাজিই ভ্রমরদলের বাসস্থান। যাহাদের অন্তঃকরণ সর্ব্বদা বাসনাভরে বিলোল, তাহাদের প্রতিক্ষণের চিত্তস্পন্দনই ইহার মন্দ মারুত। সে মারুতে আহত হইয়া সর্ব্বদাই এ লতা চঞ্চলাকার। বিলাসী জীবগণের সর্ব্ব সময়ের জন্য যে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি উন্মেষিত হয়, সেই প্রবৃত্তিই এ লতার অঙ্গ-নিবিষ্ট সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অনন্ত কীট।

হে রঘুনাথ! এই ত্রিলোকীরূপিণী সৃষ্টিলতা বিচিত্র বেশে বিভূষিতা। ইহার এক দিক্ কুকর্ম্মরূপ মহাবিষধরে পরিব্যাপ্ত, আর অন্য দিক্ স্বর্গীয় শোভাসম্পন্ন পুষ্পমণ্ডপে মণ্ডিত। এ লতার প্রতি অঙ্গ জীবনিবহের বিবিধ জীবনোপায়ে সতত সমাচ্ছন্ন। ইহা নানাবিধ আনন্দ ও আমোদের জনয়িত্রী। যিনি বিবেকী, তাঁহার দৃষ্টিতে এ লতা বিবিধ শান্তি ও বৈচিত্র্যময় নানা মনোজ্ঞ কুসুমে সমুদ্ভাসিত। ইহার প্রতি অঙ্গ বিবিধ ফলসমূহে পরিব্যাপ্ত। ইহা পুষ্প, ফল, মকরন্দ ও পরাগ-বর্ষণে সর্ব্বত্র বিকাশিত। এ লতা নানা আলবাল-বলয়ে বলয়িত এবং বিবিধ বিহঙ্গকুলের আশ্রয়রূপে বিভাত। ইহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কত পরাগপুঞ্জে পুরুষ এবং বিবিধ ভূধরজালে পরিবৃত। ইহার পত্রে পত্রে কত কলাকুশলতা; এই কুশলতাই যেন ইহার অসংখ্য কোরকাবলীর ন্যায় উন্মুখ হইয়া অবস্থিত। এ লতা কত মনোজ্ঞ বনরাজি দ্বারা সমুল্লসিত। কত শত ভূধরের উপর ইহার অবস্থান, এবং কত অনন্ত পল্লবদলে ইহা সুশোভন। এ বড় আশ্চর্য্যের কথা যে, এ লতা কখন জন্ম লয়, কখন জন্মিতে থাকে, কখন

ধ্বংসমুখে পতনোন্মুখ হয় এবং কখন বা একেবারেই বিধ্বস্ত হইয়া যায়। কদাচিৎ ইহা অর্দ্ধছিন্ন লক্ষিত হয়, কখন একেবারেই ছিন্ন দেখা যায়, আবার ইহা প্রবাহরূপে নিত্যই অচ্ছিন্নভাবে অবস্থান করে। অর্থাৎ জীবের দৃষ্টিতে ইহা কোন সময়ের জন্যই বিনাশিনী বলিয়া প্রতীত হয় না। কদাচ ইহা অতীত, কখন ইহা বর্ত্তমান, কখন ইহা সত্যবৎ এবং কখন ইহা অসত্য-বৎ প্রতীতিগোচর হয়। এ লতা নিত্যই পল্লবমালায় মণ্ডিত, আবার নিত্যই ইহা পরিম্লান। ইহাকে মহাবিষলতা বলিয়াও বর্ণন করা হয়। যদি না জানিয়া শুনিয়া সহসা ইহাকে আলিঙ্গন করা হয়, তাহা হইলে অচিরে ইহা সাংসারিক বিষম বিষ-মূর্চ্ছনা প্রদান করে। তবে যদি বিবেক সহকারে ইহা স্পর্শ করা যায়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ ইহা বিনাশ প্রাপ্ত হয়; কিন্তু অবিবেকিদিগের সহসা আলিঙ্গনে ঐ সৃষ্টিরূপিণী মহতী বিষ-লতা একেবারে তাহাদিগের অন্তরের অন্তস্তলে বদ্ধমূল হইয়া পড়ে। তাহাদের ক্ষুদ্র অন্তঃকরণ ঐ মহাবিষলতার পত্র-পল্লবাদি দ্বারা সম্পূর্ণই ভরিয়া যায়; সুতরাং বিষলতার আবরণে হতবুদ্ধি হইয়া তাহারা দেখে,—এই এখানে জল, এখানে শৈল, এখানে সর্প, এখানে সুর; এই এখানে ধরা, এখানে ত্রিদিব, ঐ চন্দ্র, ঐ সূর্য্য, ঐ নক্ষত্র-নিকর, এই তেজ, এই তম, ঐ আকাশ, এই এখানে শাস্ত্র, এখানে বেদ, ঐ ওখানে শাস্ত্র বা বেদ, উভয়েরই অভাব; এই এখানে কোথাও উড্ডীন বিহগাবলী, কোথাও উত্থিত দেবসম্প্রদায়, কোথাও স্থাণু, কোথাও পবন, কোথাও কেহ নরক-নিমগ্ন, কোথাও কেহ স্বর্গস্থিত; কচিৎ কেহ সুরপদ-প্রাপ্ত, কচিৎ কেহ কৃমিরূপে অবস্থিত; কোথাও ব্রহ্মা, কোথাও বিষ্ণু, কোথাও রুদ্র, কোথাও রবি, কোথাও অগ্নি, কোথাও বায়ু, কোথাও চন্দ্র, কোথাও যম।

রামচন্দ্র! জানিয়া রাখ, এ জগতে যাহা কিছু মহামহিমায় পরিব্যাপ্ত, কিম্বা যে কিছু অল্পপ্রভাব বলিয়া জীর্ণ তৃণলবের আকারে পরিণত, অথবা যে কিছু দৃশ্যের সত্তা স্ফুরিত, সেই সকলই কেবল অবিদ্যা। জানিবে,—তত্ত্বোধ হইলেই ঐ অবিদ্যার অবসান হয়। অবিদ্যার অবসান হইলেই আত্মলাভ বা মোক্ষপ্রাপ্তি হইয়া থাকে।

অষ্টম সর্গ সমাপ্ত। ॥ ৮ ॥

নবম সর্গ।

রামচন্দ্র কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! সৃষ্টির যাহা আকার প্রকার, তাহা আপনি বলিলেন; পরন্তু শুদ্ধ সত্ত্বমূর্ত্তি হরি-হরাদিও যে অবিদ্যা, ইহা শুনিয়া আমি যেন ভ্রমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িলাম। আমার এ ভ্রম এক্ষণে আপনি অপনীত করুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রঘুরাজ! শ্রবণ কর। এই যে বর্ত্তমান বিস্পষ্ট জগৎ দেখা যায়, সৃষ্টির পূর্ব্বে ইহা ছিল না। তবে ইহার অস্তিত্ব মাত্র সংস্কারের আকারেই পর্য্যবসিত ছিল। এই সংসার একটা অখণ্ডিত ভাব; আমাদের মতে উহা সর্ব্বাত্মক এবং উহা সম্বিদাভাসময়। অনন্তর সৃষ্টির প্রারম্ভে যখন ঐ সংস্কারীভূত জগতের উদ্বোধ হয়, তখন তত্রত্য চিদাভাসও উদ্বুদ্ধ ও স্ফুরিত হইয়া উঠে। জল তরঙ্গিত হইবার প্রাক্‌কালে জল হইতে যেমন প্রথমে একটা সূক্ষ্ম আবর্ত্ত রেখা আবির্ভূত হয়; তেমনি সৃষ্টির পূর্ব্বে প্রথমে মায়াভিধেয় জগৎসংস্কারের উদ্বোধ হইয়া থাকে। অনন্তর সেই সংস্কার হইতেই সূক্ষ্ম রেখার ন্যায় ভাবী জগতের আবির্ভাব হয়। এই জগৎ স্থূল, ইহা ক্রমেই বিস্পষ্ট হইয়া উঠে, যেমন একই সূর্য্য হইতে প্রখর তাপ, মন্দ তাপ ও ছায়া প্রকট হয়, এবং উল্লিখিত অবস্থাত্রয়ে সৌর তেজের আধিক্য বা অল্পতা অনুভূত হয়, তেমনি সেই একই মূলীভূত সর্ব্বাত্মক তত্ত্ব হইতে প্রথমে সূক্ষ্ম, তৎপশ্চাৎ মধ্য এবং সর্ব্বশেষে স্থূল জগৎ প্রকাশ পাইয়া থাকে। এই কারণে উহাকে সূক্ষ্ম, মধ্য, স্থূলও এই বিভাগত্রয়ে কল্পনা করা হয়। প্রথমোল্লিখিত সূক্ষ্ম বিভাগ তদাকার চিদাভাসেরই যেন অবয়ব; পরে তাহার অন্ত কল্পনা সমষ্টি-মন বা হিরণ্যগর্ভ, তদনন্তর এই স্থূল বিরাট আকার প্রত্যক্ষতই বিদ্যমান! পূর্ব্বোক্ত সূক্ষ্মাদি ত্রিবিধ অবস্থার ভেদ প্রদর্শনার্থ সত্ত্ব,

রজ ও তম, এই গুণত্রয়ের কল্পনা করা হয়, ইহারই নাম প্রকৃতি। এই ত্রিগুণধর্ম্মিণী প্রকৃতিরই এক নাম অব্যাকৃত ও অপর নাম অবিদ্যা। জানিও, —এই অবিদ্যাই সংসারপ্রবাহ ; এই প্রবাহের পরপারেই সেই চৈতন্যময়ের পরম পদ বিরাজমান। পূর্ব্বে যে সত্ত্ব, রজ ও তমোনামক গুণত্রয়ের উল্লেখ করিলাম, উহারা প্রত্যেকেই আবার সত্ত্ব, রজ ও তম এই ত্রিগুণ ভেদে ত্রিবিধ। এইরূপ গুণভেদ প্রযুক্ত এই অবিদ্যা নবধা বিভক্ত। এই যে কিছু দৃষ্টিগোচর হয়, সকলই সেই অবিদ্যার আশ্রিত। আমি অধুনা অবিদ্যার সাত্ত্বিক বিভাগের কথা কহিতেছি। হে রাঘব! ঋষি, মুনি, সিদ্ধ, নাগ, বিদ্যাধর ও সুরগণ, ইহাঁদিগকে অবিদ্যার সাত্ত্বিকভাগ বলিয়াই জানিও। এই সাত্ত্বিক বিভাগের মধ্যে বিদ্যাধর ও নাগ এই দুই জাতি কিঞ্চিদধিক তমোগুণ-বিশিষ্ট। মুনিগণ ও সিদ্ধগণের দেহ রজোগুণান্বিত এবং হরিহরাদি দেবগণ সত্ত্বগুণময়। তবেই এখন দেখ, হরিহরাদি দেববৃন্দ সচ্চিদানন্দময়ের সূক্ষ্ম কল্পনার অন্তর্ভূত ; কাজেই তাঁহারাও অবিদ্যা-বিলসিত। এই প্রকারে তাঁহাদিগকে অবিদ্যার বিলাস বলিয়া বুঝিলেও তাঁহাদের দেহ সত্ত্বগুণের অন্তর্গত শুদ্ধ সত্ত্বময় ; কেন না, যাহাতে কস্মিন্ কালেও অবিদ্যার আবরণ নাই, তথাবিধ স্বাত্মপদ তাঁহারা স্বাভাবিক বিদ্যাবলে সর্ব্বদাই সমধিগত আছেন। অর্থাৎ সত্ত্ব-সমাশ্রিত দেবজাতির মধ্যে হরিহরাদি দেবগণ অবিদ্যাময়ী প্রকৃতির গুণত্রয়ে যদিও অন্বিত, তথাচ সর্ব্বদানন্দ-স্বরূপ পরমাত্মার নির্ম্মল পদে তাঁহাদেরই একমাত্র অধিকার। ইহার কারণ এই যে, হরিহরাদি দেব কল্পিত বটেন, কিন্তু এ কল্পনা তাঁহাদের অতি সূক্ষ্ম, তাই তাঁহাদের চৈতন্য নির্ব্বিকার-প্রায়।

রামচন্দ্র! এই সাত্ত্বিক ভাগের উপাসনায় জ্ঞানপ্রাপ্তি ও পুনর্জ্জন্ম নিবৃত্তি ঘটিয়া থাকে। প্রকৃতির ঐ সাত্ত্বিক ভাগ কল্পিত হইলেও সম্যক্‌রূপে উহার উপাসনায় যদি নিরত হওয়া যায়, তাহা হইলে তথাবিধ উপাসককে আর কখনই ইহ সংসারে জন্ম লইতে হয় না। তিনি মুক্ত নামেই অভিহিত হইয়া থাকেন। হে মহামতে! এই হরি-হরাদি দেব সাক্ষাৎ সত্ত্বভাগ ; সুতরাং মুক্ত পুরুষ নামেই নিরূপিত। এই জগৎ যতদিন

থাকিবে, এ সংসারে ইঁহাদেরও অধিষ্ঠান ততদিনই রহিবে। এই মহাত্মগণ যে পর্য্যন্ত সদেহ থাকিবেন, ততদিনই ইহাঁদের জীবন্মুক্তভাবেই অবস্থান হইবে; পরন্তু যখন দেহান্ত ঘটিবে, তখন বিদেহ-মুক্ত-ভাবে পরমেশ্বরেই অর্থাৎ শুদ্ধ ব্রহ্মস্বভাবেই ইহাঁরা অবস্থান করিবেন। এই জন্য বলি, যেমন বীজ ফলের রূপ ধারণ করে, আবার ঐ ফলই বীজ হইয়া ফলের কারণ হয়, তেমনি এই অবিদ্যার ভাগও বিদ্যারূপ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যেমন জল হইতে বুদ্বুদাবলীর আবির্ভাব, তেমনি বিদ্যা হইতে অবিদ্যার উদ্ভব; আবার জলে যেমন বুদ্বুদাবলী বিলয় পাইয়া যায়, তেমনি অবিদ্যাও বিলীন হইয়া থাকে। এখন বুঝ, এই হরি-হরাদির দেহসম্বন্ধেও কথা এইরূপই। জলে জলবুদ্বুদের ন্যায় তাঁহাদের দেহ ব্রহ্মেতেই বিলয় প্রাপ্ত হয়। জলের যেমন বুদ্বুদমালা অতি আত্মীয়, তেমনি তাঁহাদের সহিতও ব্রহ্মচৈতন্যের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ সমধিক প্রতীত। তবে যে হরি-হরাদি পর-ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া প্রতীয়মান হইয়া থাকেন, তাহার কারণ কেবল দ্বিত্ব-ভাবনা। যেমন দ্বিত্ব-ভাবনায় জল ও তরঙ্গ এই উভয় বিভিন্ন বলিয়া ধারণা হয়, তেমনি বিদ্যা ও অবিদ্যা এই উভয়ের ভেদও দ্বিত্ব-ভাবনা-মূলক; কিন্তু পরমার্থ পক্ষে উহারা কি স্বতন্ত্র? একটুকু নিবিষ্ট চিত্তে দেখিলে বুঝা যাইবে, উহারা স্বতন্ত্র নহে। যেমন জল ও তরঙ্গ পরমার্থতঃ একই বস্তু, তেমনি বিদ্যা ও অবিদ্যাও অভিন্ন বৈ আর কিছুই নয়। বাস্তবিক পক্ষে বিদ্যাও নাই, অবিদ্যাও নাই, কেবল সেই একই বস্তু আছে, যাহা বিদ্যা ও অবিদ্যাকে বিসর্জ্জনপূর্ব্বক একই অপূর্ব্ব অবস্থায় অবস্থিত হইয়া থাকে। সেই এক কি? তাহা একমাত্র সেই পরম সৎ। সেই এক ও অদ্বয় পরম সৎ ভিন্ন বিভাগীভূত বিদ্যা বা অবিদ্যা কিছুই বিদ্যমান নাই। যাহা বাস্তবিক পক্ষে নাই, তাহার আর বৃথা কল্পনায় প্রয়োজন কি? যাহা আছে, হে রঘুনায়ক! তাহাতেই—সেই পরিশিষ্ট চিন্মাত্রেই তুমি মগ্ন হইয়া থাক। যাহা কোন নাম বা রূপাদির গোচর নহে, তাহাই মাত্র বিদ্যমান; যাহা আছে, তাহারই যে অবিদিত ভাব, তাহাকেই আমরা অবিদ্যা আখ্যা প্রদান করিয়া থাকি। পরন্তু তাহা বিদিত হইলে তাহার বিদ্যাভিধান প্রদান করি। এই বিদ্যা-ভাবের যদি উদয় হয়, তাহা

হইলে ঐ পূর্ব্বোক্তাকৃতি অবিদ্যার অভাব ঘটিয়া থাকে। এইরূপে অবিদ্যার অভাবসিদ্ধি-ঘটনায় তৎকালে বিদ্যা, অবিদ্যা বা জ্ঞানাজ্ঞান এ কল্পনার অবসান হইয়া যায়।

হে রাঘব! ইহা বিদ্যা, ইহা অবিদ্যা, এইরূপ কল্পনার যখন অস্তিত্ব থাকে না, তখন যাহা সেই বিদ্যালাভ পূর্ণানন্দস্বরূপ, তাহাই মাত্র অবশেষিত হয়; স্থূল কথা এই, পরিশেষে কেবল তদ্ব্যতীত অপর কিছুই থাকে না। ফলে অবিদ্যা যখন নিবৃত্তি পায়, তখন বিদ্যার বা জ্ঞানেরও বিলয় ঘটে। সুতরাং যাহা সেই একাদ্বয় পরমপদ, তাহাই মাত্র পরিশেষিত হয়। এই পরিশেষিত পরম বস্তু যে কি, তাহা কোন কিছু বলিয়া বুঝাইবার উপায় নাই। উহার জ্ঞান আখ্যাও প্রদান করা যায় না; কেন না, জ্ঞানের যে "জ্ঞান" এই নাম, ইহাও অবিদ্যা-বিজৃম্ভিত। কাজেই সর্ব্ববিধ অবিদ্যার বিলয় ঘটিলে জ্ঞানেরও বিলয় অনিবার্য্য। অতএব উহাকে কি বলা যায়? উহা "নকিঞ্চন" অর্থাৎ কিছুই নহে বলাই সঙ্গত। অথচ এ দিকে এ বিশাল সংসারে 'ন কিঞ্চন' বা 'কিছু না' বৈ আর কিছুই বিদ্যমান নাই। যাহা কিছু দেখা যায় বা যাহা কিছু জ্ঞানের অগোচর, সকলই 'ন কিঞ্চন'; এই যে 'ন কিঞ্চন' বা 'কিছু না' ইহা যে শূন্য, তাহা নহে—ইহা সর্ব্বশক্তি-সমষ্টিরূপ যে কিঞ্চনভাব তাহাকেই বুঝায়; সুতরাং 'ন কিঞ্চন' বলিয়া একটা উপাধি মাত্র প্রদত্ত হইল। এই সর্ব্বশক্তির সমষ্টিরূপ বিস্ময়টী ধারণায় কাহারও আইসে না। মনে কর, একটা পুষ্প-ফল-শালী বিশাল বটবৃক্ষ কোথাও আছে। কিন্তু সেই বৃক্ষের উৎপত্তির কারণ কি তাহা যদি অনুসন্ধান করা যায়, তাহা হইলে তাহার অতি সূক্ষ্ম বীজটীকেই কারণ বলিয়া বুঝা যাইবে; কিন্তু বীজটীকে তন্ন তন্ন করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিলেও কুত্রাপি এই বিশাল বৃক্ষের কোন চিহ্নই দেখা যাইবে না। অথচ এই যে ফল-কুসুমশালী বিশাল বৃক্ষ, ইহার যাহা কিছু, সকলই সেই অতি ক্ষুদ্র বীজটীর ভিতরে নিহিত। নতুবা সে বীজ হইতে তাহার উৎপত্তি সর্ব্বথা অসম্ভব ব্যাপার হইয়া পড়ে। এখন বিশদভাবে ভাবিয়া দেখ—ঐ বটবীজে বটবৃক্ষ উৎপাদনের সর্ব্ব-প্রকার শক্তি নিহিত রহিলেও বীজাবস্থায় তাহা এতই অস্ফুট বা অপ্রকাশ

যে, যেন তাহা 'ন কিঞ্চন' বা কিছুই না। যাহা কিছুই নয়, তাহাকে 'ন কিঞ্চন' বা 'কিছু না' বৈ আর কি বলা যায়। কিন্তু এই 'নকিঞ্চন'-ভাবের ভিতরেও যেমন একটা কিঞ্চনভাবের স্পষ্ট পরিজ্ঞান হইয়া উঠে, তেমনি ঐ 'নকিঞ্চন' ভাবেও সর্ব্বশক্তির সমষ্টিরূপ একটা 'কিঞ্চনভাব' মিলিত আছে। এই 'ন কিঞ্চন' শূন্য অপেক্ষাও শূন্য ; কিন্তু যাহা সচরাচর শূন্য বলিয়া পরিচিত, ইহা সেরূপ শূন্য নহে। ইহা শূন্য হইয়াও চিদাত্মক বা চৈতন্যময়। অন্যথা চেতন ব্যতীত জড়ের শক্তি সম্ভাবনা হইবে কিরূপে, বা কোথা হইতে ? যেমন সূর্য্যকান্ত-মণিতে অগ্নি, যেমন দুগ্ধে ঘৃত, তেমনি শূন্যে চৈতন্য একটা অস্ফুট অনালোকিত—যেন নাই, এমনই ভাবে নিত্য নিহিত। এতাবতা বুঝিতে হইবে, ঐ শূন্যে সমস্ত সংসারই সন্নিবিষ্ট। যেমন অনল হইতে স্ফুলিঙ্গনিচয় ও দিবাকর হইতে করসমষ্টি বিক্ষিপ্ত হয়, তেমনি দেশ ও কালের গতি বশতঃ অদৃষ্টানুসারে এই সকল সংসারই—সেই নিত্য বিজ্ঞানময় চৈতন্যের প্রস্ফুরণে এই যথাদৃষ্ট-ভাবেই বহির্গত হইয়া থাকে। দেখ, জলধি যেমন তরঙ্গের ও উজ্জ্বল মণি যেমন দীপ্তিপুঞ্জের আপনার বিষয়, তেমনি ঐ শূন্য—জ্ঞানময়ের বলিয়া জ্ঞানময় ও জ্যোতির্ম্ময়ের বলিয়া জ্যোতির্ম্ময় ; তথা অনন্তের নিত্য কোষ বা আধার। এই ব্রহ্মাণ্ডে যে কিছু বস্তু আছে, তাহার অন্তরে বাহিরে সেই সর্ব্বময় সদ্‌বস্তু নিত্য বিদ্যমান। দেখ, এই মহাকাশ ঘটের ভিতরে ঘটাকাশ-রূপে পরিণত হইয়া রহিলেও প্রকৃত পক্ষে তাহা যেমন মহাকাশ বলিয়াই সতত নিত্য-স্বভাব, তেমনি এই যে ব্রহ্মাণ্ডাকারে পরিণত ব্রহ্মাণ্ড, ইহাও সেই একাদ্বয় সদ্বস্তু বলিয়াই নিত্য অবিনাশস্বভাব ; আরও দেখ, অয়স্কান্ত মণি স্বস্থানে অবস্থিত, সতত অচঞ্চল ও অক্রিয় হইয়াও যেমন লৌহাকর্ষণ করিবার কর্ত্তা, তেমনি এই যে পরিদৃশ্যমান ব্রহ্মাণ্ডস্থান, ইহাতেও সেই নিত্য নিশ্চল নিষ্ক্রিয় সদ্বস্তুর কর্ত্তৃত্ব যুক্তিযুক্ত ও নিত্য সত্য। আরও দেখ, যেমন অয়স্কান্ত মণির সান্নিধ্য সংঘটন হইবা মাত্রেই জড়দেহ প্রকাণ্ড লৌহখণ্ড আপনা হইতেই চেতনবৎ পরিস্পন্দিত হইয়া উঠে, তেমনি এই যে অচেতন জড় দেহ, ইহাও সেই সদ্‌বস্তুর সত্তাবলেই চেতনাবান্ হইয়া থাকে। অন্যথা এ দেহ জড় বৈ তো আর কিছুই নহে।

হে রঘুনাথ! এই জন্যই বলিতেছি, স্বচ্ছ সলিলে যেমন চঞ্চল ঊর্ম্মিমালা, তেমনি জগৎও ব্রহ্মসত্তাতেই সতত বিচিত্রাকার। ইহা জন্ম-জন্ম-সঞ্চিত বাসনাজালে জড়িত, তাই উত্তরোত্তর কল্পনাপ্রবাহে নিত্যই সেই চিদাত্মক জগদ্বীজে নিত্য-সম্বদ্ধ। তিনি শূন্য আকাশ হইতেও শূন্যাকার; সুতরাং তাঁহাতে কিছুই থাকিবার যো নাই, অথচ তিনিই জগতের এক মাত্র বীজ।

নবম সর্গ সমাপ্ত। ॥৯॥

দশম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র! বিশেষরূপে ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝিয়া-সুঝিয়া দেখিলে দেখিবে,—এই যে একটা প্রকাণ্ড চরাচর জগৎ রহিয়াছে; ইহা ব্রহ্মতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হওয়ায় একেবারেই কিছুই নহে বলিয়া প্রতীত হইবে। জানিও,—এ জগতে ভূতাকারে পরিণত এই যে কিছু আছে, এ সকলেরও কিছুই কিছু নয়। তাই বলিতেছি,—হে রাঘবেন্দ্র! যথায় এই পরিদৃশ্যমান জীবাদির ভাব বা অভাব-বিষয়িণী কোনই কলনা নাই, সেই ব্রহ্মই সকল —তিনিই যখন সর্ব্বময়; সুতরাং সে জীবাদির মধ্যে কাহার জন্য কেন বৃথা কিসের বাসনা পোষণ করিতেছ? যাহা ধারণা করিয়া যাহার সহিত যেরূপ সম্বন্ধ স্থাপন করা হয়, যাহা হৃদভ্যন্তরে কোন না কোন কিছুর জ্ঞানময় বৃত্তি বলিয়া মনে স্থির করিয়া লওয়া হয়, সে সম্বন্ধ কিছুই নহে, তাহা তো একটা ভ্রম-মাত্র। বাস্তবিক ভ্রমান্ধ হইয়াই অজ্ঞানে লোকে জ্ঞানারোপ করত হৃদভ্যন্তরে যে একটা বৃত্তি ধারণা করিতে থাকে, মনে করে, তাহাই বুঝি জ্ঞান; প্রকৃত পক্ষে তাহা জ্ঞান নহে। দৃষ্টান্ত দেখ, রজ্জুকে যদি সর্প বলিয়া ধারণা করা হয়, তাহা হইলে অনুসন্ধানে সেই রজ্জুতে কি প্রকৃত সর্প দেখিতে পাওয়া যায়? ফলে কিরূপেইবা সেরূপ দর্শন ঘটিবে? পরন্তু জীবের যে অজ্ঞানময় আত্মা, তাহাই তো ভ্রান্ত; পরন্তু যিনি জ্ঞানময় আত্মা, তিনি সর্ব্বজ্ঞানেরই সীমান্ত-গত। তাঁহার নিকট

ভ্রমজ্ঞান থাকিতে পারে না। যাহা চেত্য-মলাশ্রিত চিৎ, তাহাই লোকে অবিদ্যা আখ্যায় অভিহিত, আর যে চিত্ত এইরূপ জীবাদি-জ্ঞান-বর্জ্জিত বলিয়া একেবারেই নিরুপাধিক, তাহাই আত্মা নামে নির্দ্দিষ্ট। অপিচ যে চিত্ত জীবাদি-জ্ঞানে ভ্রান্ত, তাহারই নাম সংসার। যদি ঐ চিত্ত নষ্ট হয়, তাহা হইলেই এই সংসারের বিনাশ হইয়া যায়। পরন্তু যে পর্য্যন্ত ঐ ভ্রান্ত চিত্তের সত্তা, তত কাল পর্য্যন্তই আত্মা সে চিত্তে জড়িত হইয়া অবস্থিত। দেখ, ঘট থাকিলেই তাহার সঙ্গে ঘটাকাশের সত্তা আছে, ইহা নিশ্চয়ই বুঝিতে হইবে। অবোধ বালক যেমন একস্থান হইতে স্থানান্তরে যাইবার কালে বুঝিয়া দেখে—যেন তাহার গমনের সঙ্গে সঙ্গে সমস্তই গমন করিতেছে, আর কোথাও সে স্থিরভাবে অবস্থিত রহিলে, মনে করে সমস্তই যেন স্থির হইয়া রহিয়াছে; তেমনি যে চিত্ত ভ্রান্ত, সে-ই আত্মাকে আকুল দেখে; বস্তুতঃ আত্মা যিনি, তিনি নির্ব্বিকার। এখন কথা এই যে, বালক ঐরূপ মনে করে কেন? বালকের ঐরূপ ভাবিবার কারণ কি? কারণ তাহার অজ্ঞতা। এই অজ্ঞতা বা অবিবেক জন্যই—কোষকার কীট যেমন স্বনির্ম্মিত তন্তুজালে নিজে নিজে জড়িত হইয়া নিজেই নিজেকে দেখিতে পায় না, তেমনি ঐ বালকের চিত্ত যাহাকে অন্তরে জ্ঞানময় বৃত্তি বলিয়া ভাবিতেছে, তাহা যে বাসনাকার তন্তুজালে অত্যন্ত জড়িত, এ রহস্য সে বুঝিয়া উঠিতে পারে না।

রামচন্দ্র কহিলেন,—প্রভো! বুঝিলাম—এই চরাচর জগৎ প্রগাঢ় অজ্ঞানতাময়; কেবল জ্ঞানাভাবের ক্রিয়া ভিন্ন ইহা আর কিছুই নয়। কিন্তু বুঝিলাম না যে, নিরতিশয় অজ্ঞান বা অবিবেকের অবধিভূত স্থাবর-সমূহের চিত্তস্থিতি কি প্রকার?

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র! সুষুপ্তি অবস্থায় মন যেমন বিলয় প্রাপ্ত হয়, তৎকালে সুখ-দুঃখ-সম্বেদনের যোগ্যতা যেমন মনের থাকে না, স্থাবরদেহে জীবচৈতন্য তেমনি মনোভাব হইতে বিচ্যুত হওয়ায় এক প্রকার মুগ্ধতারূপ আশ্রয় করিয়াই অবস্থান করে। হে বিদিত-বেদ্য-দিগের বরেণ্য! আমি মনে করি, এই অবস্থায় স্থাবর দেহের মুক্তি বহু দূরেই বিরাজ করে। চিৎ বা চৈতন্য তাহাতে নামে মাত্র থাকে; কিন্তু

সে চিদবস্থার—স্ব স্ব আত্মাকে উদ্ধার করিবার কিছুমাত্র ক্ষমতা থাকে না। উহাতে পুর্য্যষ্টক অর্থাৎ কর্ম্মেন্দ্রিয় বা জ্ঞানেন্দ্রিয় থাকে না; মনের প্রচারও *বিলুপ্ত হইয়া যায়, অর্থাৎ উহাকে এক প্রকার মূকতা, অন্ধতা বা জড়তা* বলা যায়; সুতরাং ঐ অবস্থা বহু দুঃখেরই উৎপাদিকা এবং উহা মুক্তি হইতে বহু দূরেই অবস্থিত।

রামচন্দ্র কহিলেন,—হে বেদ্যবিদ্‌গণের বরেণ্য! আমি জিজ্ঞাসা করি, জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের ব্যাপার নাই বলিয়া চিৎ যদি সত্তামাত্রেই অবস্থিত রহিল, তবে তাদৃশ চিদবস্থায় যোগিদিগের শীঘ্রই বাসনাক্ষয় ও মনোনাশের সম্ভাবনায় মুক্তির অদূরস্থিতি হওয়াই তো সমুচিত বলিয়া মনে করি; কিন্তু আপনি বলিলেন,—ঐ অবস্থায় মুক্তি বহুদূরে অবস্থিত। আপনার এরূপ বলিবার তাৎপর্য্য কি?

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র! স্বীকার করি, তোমার কথিত সত্তা-সামান্য-স্থিতি যে মোক্ষ, তাহা সত্য; কিন্তু শাস্ত্র-বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান করা চাই; তাহা হইতে চিত্তশুদ্ধি, পরে সাধন-চতুষ্টয়-সম্পত্তি, তৎসহকৃত শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন, তাহা হইতে তত্ত্বসাক্ষাৎকার, তত্ত্বসাক্ষাৎকার দ্বারা সমূলে বাসনাক্ষয় ও মনোনাশ; এই বাসনাক্ষয় ও মনোনাশ হওয়ায় যে সত্তা-সামান্য-স্থিতি, তাহাই মোক্ষ। কিন্তু এইরূপ মোক্ষ—অনন্ত দুষ্কৃতি ও দুর্ব্বা-সনাবীজ-সম্ভূত নারকি-প্রায় স্থাবরদিগের শাস্ত্রাধিকার-যোগ্য জন্ম-লাভের অসম্ভাবনাহেতু একান্তই দুর্লভ। বাসনাবিনাশের সঙ্গে সঙ্গে মনোনাশ হইলেই মোক্ষ; কিন্তু মোক্ষ বৈধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান বিনা সুসম্পন্ন হইবার যো নাই, জ্ঞানসহকারে বিচার করিবার পর যে তত্ত্ববোধের অভ্যুদয় হয়, সেই তত্ত্ববোধই সত্তাসামান্য অবস্থা। মোক্ষ এই সত্তাসামান্য অবস্থারই নামান্তর এবং ইহাই অক্ষয়, অব্যয়, অবিনাশী, ব্রহ্ম। অগ্রে জ্ঞান, পরে উত্তমরূপে বাসনার বিসর্জ্জন এবং তৎপশ্চাৎ সত্তাসামান্যরূপে অবস্থান—জ্ঞানিগণের মতে ইহাই কৈবল্যপদের অভিধান। আর্য্যগণ সহ শাস্ত্রীয় বিচারালোচনা ও নিরন্তর অধ্যাত্মভাবনার ফলে যে সত্তাসামান্য অবস্থার উদয় হয়, জ্ঞানিগণ তাহাকেই ব্রহ্মপদ বলিয়া বিদিত হইয়া থাকেন। অতএব জানিবে,—বীজে অঙ্কুরশক্তির অস্তিত্বের ন্যায় যাহাতে বাসনা-শক্তি বিদ্যমান,

সে অবস্থা সুষুপ্ত অবস্থারই অনুরূপ। সুষুপ্ত অবস্থার পর যেমন জাগ্রদবস্থা আসিয়া উপস্থিত হয়, তেমনি স্থাবর-দেহে যে চৈতন্য, তাহারও পুনরায় দেহান্তরে আবির্ভাব হইয়া থাকে। এই কারণে আমাকে বলিতে হইয়াছে যে, মুক্তি বহুদূরে বিরাজিত। দেখ, জড়-দেহের অন্তরে মনন বিলীনভাবে অবস্থান করে, এবং বাসনাও সুষুপ্তভাবে বিরাজ করিতে থাকে, এই জন্য সেই দেহের অবস্থা মুক্তিপ্রাপ্তির যোগ্য নহে; অধিকন্তু তাহা শত শত জনন-মরণ-দুঃখেরই উদ্ভাবন করিয়া থাকে। এই যে স্থাবরাদি আছে, ইহারা সকলেই জড়ধর্ম্মী; এক্ষণে ইহারা প্রসুপ্তবৎ অবস্থিত রহিলেও ভাবীকালে ইহাদিগকে বারম্বার জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে। বীজে পুষ্পাদি এবং মৃত্তিকাস্তূপে ঘটাদি যেমন অলক্ষিতভাবে অবস্থিত, তেমনি বাসনাদিও স্থাবরে অলক্ষ্যভাবেই বিরাজিত। যেখানে বাসনার বীজ লুক্কায়িত অবস্থায় অবস্থান করে, সেই প্রসুপ্তভাব মুক্তির কারণ হইতে পারে না। যোগিদিগের যে প্রসুপ্তভাব, তাহাতে বাসনাবীজ নাই, সে বীজ বিনাশ-প্রাপ্ত; সুতরাং তাদৃশ প্রসুপ্ত ভাবই মুক্তিপদের প্রদায়ক। যেমন অনলের অবশেষ, ঋণাবশেষ, রোগের শেষ ও শত্রুতার শেষ অত্যল্প মাত্র হইলেও লোকের ভাবী বহু দুঃখ-কষ্টের কারণ হয়, তেমনি বাসনার অল্পাবশেষও অনন্ত ক্লেশের উৎপাদক হইয়া থাকে। বাসনাবীজ জ্ঞানানলে দগ্ধ হইয়া গেলে ঐ অবস্থায় যে ব্যক্তি সত্তাসামান্যরূপে রূপবান্ হইয়া উঠেন, তিনি সদেহই হউন, আর বিদেহই হউন, তাঁহাকে আর কোন সময়ের জন্যই দুঃখ কষ্ট ভোগ করিতে হয় না। জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, স্থাবরাদি বস্তুবর্গে চৈতন্য কোন্ রূপে অবস্থান করে? আর অস্মাদৃশ ব্যক্তির ন্যায় তাহাদের অজ্ঞানময় চৈতন্যোদ্ভাবিত বাসনাই বা কি প্রকার? ইহার উত্তর এইরূপ যে, সর্ব্বদাই দেখা যায়—স্থাবরাদি তরুলতা প্রভৃতি ক্রমবিকাশশীল পদার্থ এক অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে উপনীত হয়। এই ক্রমবিকাশের মূলানুসন্ধানে বুঝা যায়, উহাদের অন্তরে অন্তরে একটা রসশক্তি আছে, তাহারই প্রভাবে উহারা রসধর্ম্মী। উহাদের ঐ স্বধর্ম্ম রসের প্রভাবেই উহারা এক অবস্থা হইতে অন্যাবস্থায় উপনীত হয়। আমাদের অন্তরের যে অজ্ঞানময়ী চিচ্ছক্তি, তাহারও কার্য্য এইরূপই। সে বাসনার প্রসূতি,

তাহারই প্রভাবে আমরা অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে পৌঁছিয়া থাকি। এতাবতা বুঝিয়া দেখ, স্থাবরাদি পদার্থপরম্পরার অন্তরে বাসনাঙ্কুর-স্বরূপ রসময়ী চৈতন্যশক্তি প্রতিনিয়ত রসরূপেই বিরাজিতা। এইরূপে দেখিলে দেখা যাইবে, সংসারের কোন কিছুতেই চৈতন্যশক্তির অভাব নাই। উহা উল্লাসধর্ম্মী বীজের ক্রমবিকাশশীল অঙ্কুরে উল্লাসরূপে, জাড্যধর্ম্মী জড়ে জাড্যাকারে, দ্রব্যে দ্রব্যত্বরূপে অর্থাৎ ধনরত্নাদি দ্রব্যসমূহে স্পৃহণীয়ভাবে এবং কাঠিনে কঠিন্যাকারে অবস্থিতা। এইরূপে উহা কেবল ধর্ম্মময়ী বলিয়া যদিও সূক্ষ্মরূপিণী, তথাচ কাষ্ঠ-লোষ্ট্রাদি ধ্বংসধর্ম্মী পাংশুসমূহে ধ্বংস-রূপে, মালিন্যধর্ম্মী মলিনে মালিন্যাকারে, এবং তীক্ষ্ণতাধর্ম্মী অসিধারায় তৈক্ষ্ণাকারে বিরাজমান। এই ভাবে ঘটপটাদি যে কিছু বস্তু প্রত্যক্ষ হয়, তৎসমুদায়ের অভ্যন্তরেই ঐ চৈতন্যশক্তি সত্তামাত্ররূপ আশ্রয় করিয়াই অবস্থিত। দেখ, বর্ষাঋতু অশরীরী; সে স্বীয় ধর্ম্ম মেঘমালায় আপনি আবৃত হইয়া এরূপভাবে লোকলোচনের গোচরীভূত হয় যে, তাহা লোকে দেখিয়া মনে করে—আহা! কি চমৎকার বর্ষাঋতু, আকাশমার্গে বিলম্বিত আছে! এই প্রকারে বলা যায়, এই যে অনন্ত শক্তিশালিনী চিচ্ছক্তি, ইহা যাবতীয় ঘট-পটাদি প্রত্যক্ষ বস্তুর প্রত্যক্ষত্ব ধর্ম্ম সম্পূর্ণতঃ অধিকার করিয়া অবস্থান করিতেছে। ধর্ম্ম-শালিতাই রূপবত্তা, রূপেই দর্শন এবং দর্শনেই সত্তাবোধ; এই জন্য কালকেও প্রত্যক্ষ বা চৈতন্যশালী বলিয়া দেখিয়া থাকি।

হে রাঘব! এই ত যথাযথ বিচার করিয়া চৈতন্যশক্তির স্বরূপ বলা হইল। এই চিচ্ছক্তি সর্ব্বস্বরূপিণী; এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলে যে কিছু বস্তু বিদ্যমান, সকলই ঐ চিচ্ছক্তি-যুক্ত। অথচ এই চিচ্ছক্তি সর্ব্বশূন্য বা অকিঞ্চন। এ সংসারে সেই এক চিচ্ছক্তি ব্যতীত অন্য কিছুই নাই। এই চিচ্ছক্তি এই আত্মদৃষ্টিকে যথাযথভাবে অনুসন্ধান করিয়া লইতে না পারিলেই উহা এই বিশাল সংসারভ্রমের উৎপাদন করিয়া থাকে। আবার এই চিচ্ছক্তিকেই যদি সম্যক্‌রূপে সম্পরিজ্ঞাত হওয়া যায়, তাহা হইলেই এ সংসারের যাবতীয় ক্লেশ বিলয় প্রাপ্ত হয়। এই চিচ্ছক্তির যে অদর্শন বা অসম্যক্‌জ্ঞান, পণ্ডিতেরা তাহাকেই অবিদ্যা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই অবিদ্যাবলেই সমস্ত বস্তু কল্পিত হইয়া থাকে; তাই

অবিদ্যাকেই জগতের হেতু বলা যায় এবং তাহা হইতেই সমুদায় প্রবৃত্ত হয়। এই অবিদ্যা যখন রূপ-বিরহিত-ভাবে পরিদৃষ্ট হয়, এই অবিদ্যার স্বরূপ সংসার যে কালে ভ্রম ভিন্ন আর কিছুই প্রতীত হয় না, তখন তথাবিধ জ্ঞান-বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই দিবাকর-করযোগে তুষারকণার ন্যায় অবিদ্যা বিগলিত হইয়া যায়। অল্পে অল্পে নিদ্রা যাহার বিলীন হয়, সে যখন বোধ বশতঃ ধীরে ধীরে আপনার চিত্তবৃত্তির অনুভব করিতে থাকে, তখন তদীয় নিদ্রা যেমন ক্রমশঃ অপগত হইয়া যায়, তেমনি এই সংসার যখন অবস্তু বলিয়া প্রতীত হইতে থাকে, তখন আলোক-বিকাশে অন্ধকারের ন্যায় ক্রমশঃ অবিদ্যাও অপসৃত হইতে থাকে। অন্ধকার-মগ্ন ব্যক্তি আলোক ব্যতীত অন্ধকারের পৃথক্ রূপ অনুভব করিতে পারে না; তাই অন্ধকারের প্রকৃত রূপ কি, তাহা দেখিবার জন্য কৌতুকবশতঃ কেহ যেমন দীপহস্তে অন্ধকারে আসিতে থাকে, আর তাহার আসিবার সঙ্গে সঙ্গেই যেমন অন্ধকারকে সরিয়া যাইতে দেখে, তেমনি যখন জ্ঞানের উদয় হইতে থাকে, তখন এই সকল মোহান্ধকার ক্রমশই গলিয়া যাইবার উপক্রম হয়। বলা বাহুল্য, অনলের তাপে যেমন কঠিনীভূত ঘৃত গলিতে থাকে, এই মোহান্ধ-কারের গলনপ্রণালী ও জ্ঞানোদয়ে তেমনই হইতে থাকে। অন্ধকারের যে একটা স্বতন্ত্র রূপ আছে, তাহা অবশ্য নাই, তবে যে রূপের কথা হইয়াছে, সে রূপ নহে; তাহা একটা পৃথক্ প্রতীতি মাত্র। আলোক আনয়ন করিবার কালে অন্ধকারের কোনও একটা নিশ্চিত রূপ দেখা যায় না; আলোকের অভাব যাহা দেখায়, তাহাকে রূপ বলা যায় না, তাহা কেবল অন্ধকারের বৈমল্যময় বিনাশ বৈ আর কিছুই নয়। এইরূপ দৃষ্টান্তে বলা যায়, এই অবিদ্যা যখন আলোকিত হয়, তখন সে কোথায় —কোন্ অজ্ঞাত দেশে গিয়া পলায়ন করে। এ সংসারে তখন আর ঐ অবিদ্যাকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ফলতঃ না পাইবারই কথা; কেন না, তাহার সংস্বারূপ্য নাই, সে অবস্তু—সে অকিঞ্চন, তাহার রূপের সম্ভাবনা নাই। লোকে তাহাকে বৃথাই অনুভব করে। দেখ, অন্ধকার প্রকৃত পক্ষে কোনই বস্তু নহে, আলোক আসিলে তাহাকে যেরূপ অবস্তু বলিয়া দেখা যায়, অবিদ্যাও তেমনি অসতীরূপেই প্রতীত হইয়া

থাকে। ভ্রান্তিবশেই অবিদ্যার বস্তুত্ব বিবেচিত হয়; কিন্তু প্রকৃত কথা বলিতে কি, উহা একান্তই অবস্তু। যে পর্য্যন্ত না বিশেষ বিবেচনার সহিত কোন বস্তু পর্য্যবেক্ষণ করা হয়, ততক্ষণ সে যে কি, তাহার প্রকৃত তথ্য কিছুই বুঝা যায় না; কিন্তু প্রণিধানপূর্ব্বক দেখিলে তাহার স্বরূপ যেমন দেখা যায়, তেমনি যদি বিশেষ করিয়া অবলোকন করা হয়, তাহা হইলে অবিদ্যা যে কি ও কি প্রকার, তাহা অনায়াসেই হৃদয়ঙ্গম করা যায়। এই যে রক্তমাংস ও অস্থিময় দেহ যন্ত্র, ইহাতে আমি কে? এইরূপ বিচারে যখন প্রবৃত্ত হওয়া যায়, তখনই ত অবিদ্যা এককালে তিরোহিত হয়। অবিদ্যার এ হেন তিরোধানের নামই অবিদ্যাক্ষয়। আদিতে ও অন্তে যাহারা অসৎস্বরূপ, এ হেন সমুদায় দৃশ্য বিচারনিষ্ঠ-হৃদয়ে পরে ত্যাগ করা হইলে, তাৎকালিক যে বিলীনভাব, মহাত্মগণের মতে তাহাই অবিদ্যাক্ষয়। এই যে অবিদ্যাক্ষয় বা বিলীনভাব, ইহা অকিঞ্চিৎ অথচ ইহাই কিঞ্চিৎ, ইহাই সৎ, ইহাই ব্রহ্ম, ইহাই নিত্য। এ সংসারে যদি কোন উপাদেয় বস্তু থাকে, তবে বলিব, ইহাই সেই বস্তু। এই বস্তু যে কি এক চমৎকার, তাহা বুঝাইবার উপায় নাই। কেন না, ইহা নীরূপ ও নিঃস্বভাব; ইহা যে কি, তাহা ইহার নাম-নিরুক্তি দ্বারাই নিরূপণ করিতে হয়। অন্যথা ইহাকে জানা অসম্ভব। দৃষ্টান্ত দেখ, জিহ্বা স্বাদ্য বস্তুর স্বাদ গ্রহণ করে, ঐ স্বাদ যে কি, তাহা অন্যের পক্ষে অনুভব করা সম্ভব নহে।

রাম! যাউক এ কথা; স্পষ্ট বলি শুন—এ সংসারে অবিদ্যা কোথাও নাই। এই যে কিছু দেখিতে পাইতেছ, এতৎসমস্তই সেই অখণ্ড অদ্বয় ব্রহ্ম; তদ্ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। তিনিই ঐই সৎ ও অসৎকল্পনা-বিলসিত বিশাল ব্রহ্মাণ্ডকে বিমণ্ডিত করিয়াছেন। স্থির করিতে হইবে, অবিদ্যার ক্ষয়ই সেই ব্রহ্ম। অবশ্য এরূপ নিশ্চয় করিতে নাই যে, এই পর্য্যন্তই অবিদ্যার বিলাস; অতঃপর যাহা, তাহাই ব্রহ্ম—এরূপ নিশ্চয়ে ফল এই দাঁড়াইবে যে, এই যে সকল ঘট, পট, মঠ, প্রভৃতি করিয়া পুঞ্জ পুঞ্জ পদার্থ আছে, ইহাদের অবিদ্যা-জনিত বিকাশ স্বতন্ত্র; সুতরাং ইহারা সেই ব্রহ্ম নহে। এইরূপই স্থির ধারণা হইবে। ফলে স্বাতন্ত্র্য-জ্ঞানে

পুনরপি সেই অবিদ্যাই আসিয়া দেখা দিবে। আর যদি ঐ ঘট, পট ও মঠাদির আভাসপরম্পরাকে সেই বিভু ব্রহ্ম বলিয়াই দেখা যায় আর মনে করা যায় যে, ইহারা ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র নহে; ব্রহ্মই অবিদ্যাবৃত হইয়া এই সংসারাকারে পরিণত আছেন, তাহা হইলেই দেখা যাইবে যে, এই অবিদ্যার বিনাশই সেই শুদ্ধ বুদ্ধ সত্ত্বমূর্ত্তি চিৎস্বরূপ ব্রহ্ম। যখন এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাইবে, তখনই সেই অবিদ্যার অবসান হইতেছে বলিয়া বুঝিতে পারিবে।

দশম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১০ ॥

একাদশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে সাধো! রামচন্দ্র! তোমার বোধ বৃদ্ধির জন্য পুনঃপুন তোমায় কহিতেছি যে, অভ্যাস ব্যতীত আত্মভাবনা কদাচ সমুদিত হইতে পারে না; আর যদিই বা হয়, তথাচ তাহা স্থির থাকে না। কেন না, জীবের অজ্ঞান অতি প্রবল। এই অজ্ঞানেরই নামান্তর অবিদ্যা; কত সহস্র সহস্র জন্মের অজ্ঞানরূপ মোহ নিবিড়ভাবে অন্তরে এমনই আবদ্ধ আছে যে, সর্ব্বেন্দ্রিয় দ্বারা অন্তরে বাহিরে সর্ব্বদাই তাহা অনুভব করিতে হয়। দেহ থাকুক, আর নাই থাকুক, তাহার হস্তে নিস্তার পাওয়া যায় না। এখন বুঝিয়া দেখ, ঐ অজ্ঞানমোহ কতই না নিবিড়ভাবে অন্তরে নিবিষ্ট। কিন্তু ঐ অজ্ঞানরূপ মোহকে যাহার সাহায্যে হৃদয় হইতে ফেলিয়া দেওয়া যাইবে, সেই আত্মজ্ঞান সহজলভ্য নহে। তাহা সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অগোচর; তাহাকে ধারণা করিয়া লওয়া অসম্ভব কথা। তবে সম্ভব হইতে পারে—যখন সর্ব্বেন্দ্রিয়ের বিনাশ ও মনের সত্তা ক্ষয় হয়। এই রূপ হইলেই সে আত্মার কেবল সত্তাটুকু হৃদয়ে ধারণা করিয়া লওয়া যায়। তবে কথা এই, যে সকল প্রত্যক্ষ বৃত্তি সর্ব্বেন্দ্রিয়ের অনায়াস-লভ্য, তৎসমুদায় পরিহার করিয়া যাহা কেবলই সত্তায় সমবস্থিত বলিয়া ধারণা করিতে হইবে, তাহা জীবের প্রত্যক্ষ হইবে কিরূপে? তাদৃশ সত্তাবস্থান

যে সর্ব্ব জীবেরই প্রত্যক্ষের পরপারে অবস্থিত। বহুবার বহু অনুশীলন করিতে হইবে, তবে তো তাহা হৃদয়ে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। তাই বলিতেছি, রামচন্দ্র! হৃদয়রূপ পাদপে যে অবিদ্যার লতা চিরপ্ররূঢ় রহিয়াছে, তুমি আত্মসিদ্ধি লাভ করিবার জন্য অসকৃৎ অভ্যস্ত জ্ঞানাসি-প্রহারে তাহাকে ছেদন করিয়া ফেলো। এই দেখ, মহারাজ জনক যেমন নিখিল তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইয়া বিহার করিতেছেন,—হে রাঘব! তুমিও তেমনি আত্মজ্ঞানের অনুশীলনে তৎপর হও—হইয়া পরম সুখে বিহার করিতে থাক। ভূপতি জনক বহির্ব্যাপারেই লিপ্ত থাকুন, কিম্বা সমাধি অবস্থাতেই অবস্থিত হউন, অথবা জাগিয়া থাকুন বা অন্য যে কোন অবস্থাতেই অবস্থিত হউন, তাঁহার অন্তরে সর্ব্বক্ষণের জন্যই এই আত্মানুভবশীল নিশ্চয় বা জ্ঞান বিরাজমান। বাস্তবিক এবম্বিধ অভ্যাস-ফল জ্ঞান দ্বারা অভিব্যক্ত যে স্বরূপ, তাহারই বটে সত্যতা; পরন্তু যাহা আপাতজ্ঞানে পরিস্ফুট, তাহার সত্যতা অসিদ্ধ? উল্লিখিত নিশ্চয় লইয়াই ভগবান্ হরি এ ভূতলে নানাযোনিতে অবতার গ্রহণ করেন; তথাচ তৎপ্রযুক্ত সুখ-দুঃখ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে অক্ষম। পণ্ডিতগণের মতে এ হেন নিশ্চয় জ্ঞানই সত্য জ্ঞান।

হে রাঘব! ত্রিলোচন সংসারীর ন্যায় কান্তার সহিত অবস্থিত, এবং ব্রহ্মা, সর্ব্ব কামনা বিসর্জ্জন দিয়া বিরাজিত; কিন্তু তাঁহাদের নিশ্চয় আত্মানুভবশীল। তোমায় বলি, ঐ উভয় দেবের যে নিশ্চয়, তোমারও তাহাই হউক। অধিক বলিব কি, সুরগুরু বৃহস্পতির, অসুরগুরু ভার্গবের, দিনাধিপতি সূর্য্যের, নিশাপতি চন্দ্রের এবং পবন ও অনলের যে নিশ্চয়, তোমারও সেই নিশ্চয় হউক। অপিচ নারদের, পুলস্ত্যের, প্রাচেতার, ভৃগুর, ক্রতুর, অত্রির, শুকদেবের, অন্যান্য বিপ্রর্ষির, রাজর্ষির ও জীবন্মুক্তদিগের যে নিশ্চয় বা যে জ্ঞান, হে রাঘব! তোমারও তাহাই হউক।

রামচন্দ্র কহিলেন,—ভগবন্! এই সকল মহামতি ধীরগণ যেরূপ নিশ্চয় দ্বারা সংসারের শোক-তাপ হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া অবস্থান করিয়াছেন, হে ব্রহ্মন্! আমার নিকট তাহা যথাযথ ব্যক্ত করুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে নিখিল-বেদ্য-বেদী মহাভুজ রঘুনন্দন! আমি

ঐ সকল মহাত্মার নিশ্চয়ের বিষয় স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর।

রাম! পূর্ব্বোক্ত মহাপুরুষগণের নিশ্চয় এইরূপ ;—এই যে পরিদৃশ্যমান বিশাল জগন্মণ্ডল রহিয়াছে, এতৎসমস্তই সেই একাদ্বয় বিমল ব্রহ্মরূপে বিরাজিত। যাহা জীবচৈতন্য, তাহা ব্রহ্ম। এই যে চৈতন্য-সমুল্লসিত সংসার, ইহাও ব্রহ্ম। এই যে ভূতপরম্পরা, ইহাও ব্রহ্ম। অধিক কি, আমি ব্রহ্ম, আমার যে শত্রু, সেও ব্রহ্ম, মদীয় বন্ধু-বান্ধবও ব্রহ্ম, ভূত, ভাবী ও বর্ত্তমান, এই কালত্রয় ব্রহ্ম, এবং ব্রহ্মেই তাহারা বিরাজিত। যেমন আপন তরঙ্গমালা লইয়া জলধি আপনি বিশালাকারে বিবর্দ্ধিত হয়, তেমনি এই দীর্ঘ কালত্রয় লইয়া ব্রহ্মও কত শত পদার্থপরম্পরায় সুবিস্তৃত হইতেছেন। বস্তুতঃ ব্রহ্মই সকল ; ব্রহ্মই ব্রহ্মকে ভোজন করেন, ব্রহ্মই ব্রহ্মকে গ্রহণ করিয়া থাকেন। ব্রহ্ম-শক্তির প্রভাবে ব্রহ্মই নানা বিবর্ত্ত লইয়া ব্রহ্মে বিবর্দ্ধিত হইতেছেন। যখন ব্রহ্মই সকল, তখন ব্রহ্মের অপ্রিয়া-চারী কে কোথায় থাকিতে পারে? আমিই ব্রহ্ম ; আমার যদি কেহ শত্রু থাকে, তবে সেও ব্রহ্ম। এরূপ দর্শনে ঐ সকল মহাত্মার নিকট রাগ-দ্বেষাদির প্রসক্তি কিছুই থাকিতে পারে না। কাজেই বলা যায়, ব্রহ্মে ব্রহ্মনিষ্ঠ বস্তু অন্য কাহার কি করিতে পারে? অতএব বুঝিয়া দেখ, এই যে কল্পিত রাগ-দ্বেষ প্রভৃতির অবস্থিতি, ইহা খ-পাদপের ন্যায় একান্তই তো অসম্ভব কথা। অপিচ রাগাদির কল্পনাই যখন হইতে পারে না, তখন তাহাদের যে সত্তা সম্ভাবনা, তাহাও মিথ্যা ; সুতরাং যাহারা এই প্রকারে চির-বিনষ্ট, তাহাদের কোন প্রসঙ্গ উত্থাপন হইতে পারে কি? আমাদের যে চরণ-চালনাদি ক্রিয়া, তাহাও সেই একাদ্বয় সর্ব্বস্বরূপ পূর্ণ ব্রহ্মেই বিরাজমান। ব্রহ্মই সর্ব্বত্র সর্ব্বপ্রকারে পরিস্ফুরিত হইতেছেন ; তিনিই সর্ব্বস্বরূপ ; সুতরাং সুখিত্ব বা দুঃখিত্বের সম্ভাবনা কিরূপে কোথায় হইতে পারে? তবে যে সংসারে প্রায়শঃ দেখা যায়, ভাব-জনিত তৃপ্তি হয়, আর অভাব-জনিত অতৃপ্তি আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা তো অন্য কাহারই তৃপ্তি বা অতৃপ্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না। সে তৃপ্তি-অতৃপ্তি ব্রহ্মের। ব্রহ্মেই ব্রহ্মের সংস্থান, ব্রহ্মেই ব্রহ্মের স্ফুরণ এবং ব্রহ্মেই ব্রহ্মের বিলয়।

আমিও তো অন্য নহি; আমিই ব্রহ্ম। এই ঘট ব্রহ্ম, পট ব্রহ্ম, আমি ব্রহ্ম, অন্যান্য যে কিছু বিশাল বিতত সংসার, সকলই ব্রহ্ম; যে কিছু উৎপত্তি-ধর্ম্ম, বিনাশধর্ম্ম সকলই ব্রহ্ম; সুতরাং কাহার কে? কেই বা কাহার? কোন বিষয়ে অনুরাগ বা কোন বিষয়ে বিরাগের কল্পনাই বা কি? অপিচ বৃথা ভীতিবিধায়ক রজ্জুগত সর্পভ্রমের ন্যায় আমি মরিলাম, অমুকে মরিল, বলিয়া দুঃখিতাই বা কোথায় কি প্রকার? এইরূপে দেখা যায়, যখন দেহ ব্রহ্ম, তখন সম্ভোগ-সুখও অবশ্যই ব্রহ্ম। ইহাতে আমার সুখ হইল, বা অমুকের সুখ হইল বলিয়া যে সুখ, সে সুখ-কল্পনা বৃথা। যেমন জল ও জলের তরঙ্গ অভিন্ন, তেমনি ব্রহ্ম ও ব্রহ্মবিবর্ত্ত বিশ্ব অভিন্ন বৈ ভিন্ন নহে। এই যে তোমার বা আমার ভাব বা তুমিত্ব ও আমিত্ব, ইহাও কিছুই নয়। যাহা দেহরূপী, তাহাও ব্রহ্ম, আর যাহা মরণরূপী, তাহাও ব্রহ্ম। যেমন জলের বিবর্ত্ত জলেরই রূপান্তর, তেমনি জন্ম বল, আর মরণ বল, বা অন্য যে কোন অবস্থা বল, সকলই ব্রহ্মের রূপান্তর বা বিবর্ত্তান্তর। ফল কথা, এ সংসারের ভাব বা অভাব কিছুই নয়। দেখ—জল যায়, তদুপরি ভাসিয়া ভাসিয়া অন্য কত কি চলিয়া যায়, সে জলে যদি আবর্ত্ত না উঠে, তবে যেমন তাহার কুত্রাপি কিছুই পড়িয়া নষ্ট হয় না, তেমনি উৎপত্তিধর্ম্মী ব্রহ্ম যদি মরণধর্ম্মী ব্রহ্মে মিলিত না হন, তাহা হইলে অন্যাবস্থা ঘটিতেই পারে না। জল যেরূপ প্রবাহের মুখে পতিত হইয়া কখন ভাসে, কখন কোথাও আবদ্ধ রহে, এই জন্য তাহাতে যেমন তৎকালে তুমিত্ব-আমিত্ব বলিয়া কোন সম্বন্ধই থাকে না, তেমনি এ সংসারের তোমার আমার সম্বন্ধ-জুষ্ট জড়াজড় পদার্থ সেই পরমাত্ম দেহে স্থিরভাবে রহিতে পারে না। যেমন সুবর্ণই বিকৃত হইয়া কটকরূপে প্রথিত হয়, এবং জলই যেমন রূপান্তর ধারণপূর্ব্বক আবর্ত্ত হইয়া উঠে, তেমনি আত্মার যাহা প্রকৃতি, তাহাই তো সৎ ও অসদ্ভাবময়ী হইয়া বিরাজ করে। এই জীবাকারে পরিণত আত্মাকে যে জড়রূপে ভাবনা করা, ইহা কেবল অজ্ঞানীরই মোহবিলাস; পরন্তু যিনি জ্ঞানী, তাঁহার দৃষ্টিতে এ মোহ কদাচ কোথাও স্থান পাইতে পারে না। অজ্ঞের দৃষ্টিতে জগৎ দুঃখময় হইয়া থাকে; কিন্তু যিনি জ্ঞানী, তিনি ইহাকে

আনন্দময় বলিয়াই অবলোকন করেন। যাহার দৃষ্টিশক্তি নাই, তাহার নিকট এ সংসারের সকলই যেমন অন্ধকারময়, আবার চক্ষুষ্মানের নিকট এ সংসার জ্যোতির্ম্ময়, তেমনি এ জগৎ মূর্খের দুঃখ-জনক হইলেও জ্ঞানীর দৃষ্টিতে ইহা সেই এক পরমাত্মময় বৈ আর কিছুই নয়। ঘোর অন্ধকার-ময়ী যামিনী যেমন অজ্ঞান শিশুর চক্ষে পিশাচপরীত বলিয়া প্রতীত আর যাহার মতি বালকোচিত নহে, যে বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষ, তাহার দৃষ্টিতে সেই যামিনীই যেমন আবার নিরুপদ্রব রাত্রিমাত্র বলিয়া প্রতীত হয়, তেমনি যিনি সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত ও পীযূষপূর্ণ ঘটের ন্যায় নিত্যই আনন্দজনক, সেই একাদ্বয় ব্রহ্মে নিয়তই নিরুপদ্রব ভাব বিরাজিত। দেখ, বীজের উৎপত্তি-বিনাশ উল্লাসাত্মক বিলাস বৈ আর কিছুই নহে। বীজ আপন রসপ্রকর্ষে উল্লসিত হইয়া উঠে, নিজের বীজাকার পরিহার করিয়া বৃক্ষরূপ ধারণ করে, তদ্দর্শনে অজ্ঞ লোক মনে করে, বীজ বুঝি নষ্ট হইল আর বৃক্ষ বুঝি জন্মিল; কিন্তু বলা বাহুল্য, সে বিনাশ বা উদ্ভব বীজের সেই উল্লাসাত্মক বিলাস ব্যতীত আর কি হইতে পারে? এইরূপ বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে, এ সংসারে কিছুই নাশ পায় না, কিছুই বিরাজ করে না, যাহা হয় বা না হয়, সকলই সেই একটা উল্লাসাত্মক বিলাস—এক অবস্থা হইতে অন্য একটা অবস্থায় পরিণতি মাত্র। যেমন মহাব্ধি মধ্যে ফেন, তরঙ্গ ও বুদ্বুদাদি কত কি সমুদ্ভূত হয়, তেমনি এই একমাত্র আত্মাতেই এই অগণিত ভূতবৃন্দ আবির্ভূত হইতেছে। ইহা নাই, তাহা আছে, এবম্বিধ নিশ্চয় কেবল আত্মাতেই আত্মকৃত ভ্রান্তি ব্যতীত আর কিছুই নয়। স্ফটিকোপলের কিরণরাজি যেমন আপনা হইতেই বাহিরে প্রসর্পিত হয়, তেমনি আত্মার এমনি একটা অহেতু উজ্জ্বল শক্তি আছে যে, তাহাই সকলের অন্তরে এই জগদাকারে বিকাশ প্রাপ্ত হয়। স্ফটিকোপলের কিরণ-পুঞ্জ যেমন নিজেই স্ফটিক হইয়া স্ফটিকাকারেই বিরাজমান, তেমনি আত্মার যে এই জগদাকৃতি শক্তি, তাহাও আত্মভাবে আত্মস্বরূপেই পরি-স্ফুরিত হয়। ঊর্ম্মি-উৎক্ষিপ্ত জলকণায় বুদ্বুদাদির রূপে যে এক প্রকার ঘনীভূত জল দেখা যায়, তাহা প্রকৃতপক্ষে জল বলিয়া জলেই বিলয় পায়; সুতরাং তাহার প্রকৃতি জল যেমন বিলয় পাইয়া যায় না, তেমনি কোন

এক অবিজ্ঞেয় কারণে আবির্ভূত এই ব্রহ্মস্বরূপ সংসার ধ্বংসমুখে পতিত হইয়া ব্রহ্মেই যখন বিলয় প্রাপ্ত হয়, তখন ব্রহ্মের বিনাশ ঘটিল বলিয়া জ্ঞান হইবে কিরূপে? যেমন জলপ্রকৃতি-বিরহিত তরঙ্গাদি মহার্ণবের কুত্রাপি নাই, তেমনি এ জগতেরও কুত্রাপি ব্রহ্ম ব্যতীত কোনরূপ দেহাদির সত্তা নাই। মহাব্ধিগত জলকণাকণিকা, বীচি, তরঙ্গ, ফেনপুঞ্জ ও লহরী, এ সকল যেমন কেবলই জল এবং জলেই বিরাজিত, তেমনি কি দেহ, কি কল্পনা, কি দৃশ্য, কি বস্তু, কি ভাব, কি অভাব, কি ক্ষয়, কি অক্ষয়, কি ভাব-রচনা, কি ভোগ্য বস্তুজাত, কি বিপদ, কি সম্পদ, কি পুরুষার্থভোগ, এ সকলই সেই এক ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মেতেই বিরাজিত। সুবর্ণ হইতে কটক-বলয়াদি বিবিধ অলঙ্কার নির্ম্মিত হয়; অথচ সে সকল অলঙ্কার যেমন সেই একই মাত্র সুবর্ণ বৈ আর কিছুই নয়, তেমনি এ সংসারে এই যে বিবিধ দেহ-সৃষ্টি দৃষ্ট হয়, এ সকলও সেই ব্রহ্ম হইতেই আবির্ভূত; সুতরাং ব্রহ্মস্বরূপ ব্যতীত আর কিছুই বলা যায় না। অতএব বলিতে হইবে, এ সকল বিষয়-ব্যাপারে মূর্খেরা যে দ্বৈতজ্ঞান পোষণ করে, সে জ্ঞান মিথ্যা বৈ আর কিছুই নহে। এই যে মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও ইন্দ্রিয়বর্গ, এ সকলই সেই একাদ্বয় ব্রহ্ম। এক ব্রহ্ম ভিন্ন ইহারা কখনই বিবিধাকার নয়। অতএব সংসারে নানাত্মক সুখ-দুঃখ থাকিতেই পারে না। পর্ব্বতের কোন এক প্রদেশ হইতে কখন কোন একটা শব্দ সমুত্থিত হইলে তাহা যেমন নানা স্তরে প্রতিধ্বনিত হইয়া নানাকারে দিকে দিকে প্রসর্পিত হইয়া থাকে, তেমনি সেই একই আত্মা,—ইহা, উহা, তাহা, আমি, তুমি, চিত্ত, বিত্ত, ইত্যাদি নানার্থ-বিষয়িণী বচন-রচনায় কেবল আত্মাতেই পরিস্ফুরিত হইতেছেন। এই যে অজ্ঞতা বা জীব-জগদ্ভাব, ইহা কেবল সেই অবিজ্ঞাত-স্বরূপ ব্রহ্ম; তিনিই অভ্যাগতবৎ অবস্থিত রহিয়াছেন। তাঁহাকে চিনিয়াও চিনিতে পারা যায় না। চিত্ত স্বপ্নাবস্থায় যাহা কিছু দেখে বা উপলব্ধি করে, তাহা আর পৃথক্ কিছুই নয়। সে কেবল সাক্ষাৎ আত্মাই আত্মস্বরূপ প্রত্যক্ষ করিতে থাকেন। সুবর্ণ একটা প্রসিদ্ধ বস্তু হইলেও তাহাকে যদি সুবর্ণ বলিয়া না দেখা যায়, তাহা হইলে সেই সুবর্ণও যেমন মৃত্তিকাবৎ তুচ্ছ সামগ্রী হইয়া পড়িয়া থাকে, তেমনি ব্রহ্মকে যদি ব্রহ্ম

বলিয়া না ভাবা হয়, তবে তিনিও যে মলিন অজ্ঞানরূপেই প্রতীয়মান হইবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে? যাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষ, তাঁহারা সেই ব্রহ্মকে স্বয়ম্প্রকাশ মহাত্মা বলিয়াই বিদিত হইয়া থাকেন। অজ্ঞানাবরণে ব্রহ্ম বস্তু অপরিজ্ঞাত রহেন বলিয়া যে একটা মিথ্যা বোধ, তাহা মূঢ়দিগেরই ঘটে। ইহাই সাধুগণের অভিমত। যেমন সুবর্ণকে সুবর্ণ বলিয়া জানিতে পারিলে অমনই সে সুবর্ণ, সুবর্ণরূপে বিভাত হয়, তেমনি ব্রহ্মকে যদি ব্রহ্মরূপে ভাবনা করা হয়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তিনি ব্রহ্মাকারেই প্রতিভাত হইতে থাকেন।' এ সংসারে সকলই ব্রহ্ম; সকল শক্তিই ব্রহ্মময়ী, এই ব্রহ্মময়ী সর্ব্ব শক্তিতে যে যেরূপ-ভাবে ঐকান্তিকতার সহিত ভাবনা করে, সেই অহেতুক অবিকার ব্রহ্ম তেমনিভাবে অচিরে আপনাকে সেই শক্তি ও বস্তুরূপে অবলোকন করিয়া থাকেন। যাহারা ব্রহ্মতত্ত্ব অবগত আছেন, তাঁহারা জানেন—যিনি ব্রহ্ম, তিনিই এই বিশাল বিতত সংসার। তিনি কোন কিছুর কর্ম্ম, কর্ত্তা, বা সাধক নহেন। তিনি নির্ব্বিকার, শান্ত, স্বয়ম্প্রভু ও মহাত্মা। তাঁহাকে বিদিত হইতে পারে না বলিয়াই অজ্ঞদিগের অজ্ঞান বদ্ধমূল হইয়া থাকে। আর যদি তাঁহাকে পরিজ্ঞাত হওয়া যায়, তবেই অজ্ঞাননাশক জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে। যেমন বন্ধুকে বন্ধু বলিয়া চিনিতে না পারিলেই তাহাকে অবন্ধু মধ্যে গণ্য করা হয়, আর যখন তাহাকে বন্ধু বলিয়া চিনিতে পারা যায়, তখন যেমন অবন্ধু ভ্রম তিরোহিত হওয়ায় সে বন্ধু হইয়া উঠে, এই ব্রহ্ম সম্বন্ধেও সেই কথা। অর্থাৎ ব্রহ্মকে ব্রহ্ম বলিয়া জানিতে পারিলেই ব্রহ্ম, আর না জানিতে পারিলেই তিনি অজ্ঞান হইয়া থাকেন। কিন্তু ঐ ব্রহ্মজ্ঞান সহজ-লভ্য নহে। এই জীবজগৎ অযুক্ত অর্থাৎ বিচার-সহ নহে বলিয়া যদি অন্তরে অবগত হওয়া যায়, তাহা হইলেই—যে জ্ঞানময় বৈরাগ্য-লাভে পুরুষ এ সংসারে অনুরাগ-রহিত হইতে পারে, তাদৃশী ভাবনা বা তন্ময়ী চিন্তা আসিয়া উপস্থিত হইয়া থাকে। অন্তরে যখন দ্বৈতকে অসত্য বলিয়া ধারণা করা হয়, তখনই সেই ভাবনা সমুদিত হইয়া থাকে,—যে ভাবনায় দ্বৈতবোধ অসত্য, আর ইহা সত্য, ইত্যাকার জ্ঞানেও বৈরাগ্য লাভ করিয়া পুরুষ আরও অধিক বৈরাগ্য প্রাপ্ত হয়।'

লোকে যে আমি আমি করে, ইহাও মিথ্যা; এইরূপ যখন বুঝিতে পারা যায়, তখন তাদৃশী ভাবনার উদয় হয়,—যাহার আশ্রয়ে পুরুষ সংসারের প্রতি একান্ত বিরক্ত হইয়া উঠে, তাহার নিকট অহঙ্কারভাব অসত্য বলিয়া প্রতীত হয়। অনন্তর পূর্ব্বোক্ত ভাবনায় বিভোর হইলে ক্রমশ আমিই ব্রহ্ম, এই প্রকার জ্ঞান সত্য বা সুদৃঢ় হইয়া উঠে। এই সময় এমন একটা অনির্ব্বচনীয় ভাবনা আসিয়া পড়ে যে, যাহাতে জীবের অন্তর একেবারেই সেই একাদ্বয় সত্যস্বরূপে সংলীন হইয়া যায়। অতএব যাহাকে প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান বলা হয়, সে অদ্বৈত জ্ঞান ব্রহ্মভাবনার পর পর বহু ভাবনার পরই সম্ভাব্য। এই বিবিধ জীবজন্তু-সমাকীর্ণ সংসারের বিস্তার-জ্ঞান হইতে যদি একটা জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহা যদি সেই প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞানরূপ জ্ঞানে মিশিয়া থাকে, তবে সেই অদ্বৈত জ্ঞানী আমি—'আমিই এই ব্রহ্ম' বলিয়া বুঝিতে পারি। তখন জানিতে পারি, এক অপরিচ্ছিন্ন আত্মায় এ জগৎ কল্পিত রহিয়াছে। যাহা কল্পিত, তাহা মিথ্যা বৈ আর কিছুই নহে। সুতরাং তুমি, আমি, তিনি, ইত্যাদি কল্পনাও মিথ্যা বৈ আর কি? অতএব যৎকালে তুমি আমি প্রভৃতি কল্পনার তিরোধান হইয়া থাকে, তখন জানা যায়, এই জগদ্গত যাবতীয় বস্তুই সেই এক তৎ সৎ। আমিই সত্য, আমিই সেই ব্রহ্ম পদার্থ, আর আমিই সর্ব্বপ্রকারে প্রথিত ও সর্ব্ববিধ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত। আমার না আছে দুঃখ, না আছে কর্ম্ম, না আছে মোহ, না আছে বাঞ্ছিত। আমি সর্ব্বত্র সর্ব্বদা সমানভাবেই বিরাজিত। আমি স্বস্থ, আমি শোক-বর্জ্জিত। আমি ব্রহ্ম, ইহা নিশ্চিতই। আমাতে কলাকলঙ্ক নাই, কোন কলনা নাই, আমি অকল্পিত, কাজেই আমি অকলঙ্ক; পরন্তু আমিই আবার এই সংসার। অথচ আমি নিরাময়, আমি স্বস্থচিত্ত। আমার কিছু ত্যাজ্য নাই, কিছু বাঞ্ছার বিষয়ও নাই। আর বাস্তবপক্ষে দেখ, কেনই বা আমাকে কোন বাঞ্ছা বা ত্যাগ করিতে হইবে? আমি যে একাদ্বয় ব্রহ্ম, ইহা স্থিরই; অতএব বলিব, কি রক্ত, কি মাংস, কি অস্থি, আর কি রক্তমাংস ও অস্থিময় দেহ, সকলই আমি। যখন নিশ্চিত হইল, আমিই ব্রহ্ম, তখন নিশ্চয়ই আমি চিৎ, আমি চৈতন্য। স্বর্গ বা আনন্দের আকর এই যে সূর্য্য-সমুদ্ভাসিত বিশাল আকাশ, ইহা

আমিই। আমিই মহান্ দিঙ্মণ্ডল, আর আমিই ব্রহ্ম, ইহাই যখন নিশ্চিত, তখন কি ঘট, কি পট, কি অন্য কোন বিগ্রহবান্ বস্তু, সে সমস্তই একমাত্র আমি ছাড়া বৈ কি? এই যে ক্ষুদ্র দেহ-তৃণ, ইহা আমিই, আর এই যে সুমহতী ধরিত্রী, ইহাও একমাত্র আমিই। সামান্য একটী গুল্ম আমি, আবার সুবৃহৎ বনরাজিও আমি। এই যে জলধিসকল, এই যে গিরি-মালা, এ সকলও আমি বৈ আর কেহই নহে। এ সংসারে কেবল ব্রহ্মই আছেন, আমিই ব্রহ্ম। দানাত্মিকা, আদানাত্মিকা বা সঙ্কোচাত্মিকা ইত্যাদি করিয়া যে কিছু শক্তি বা প্রাণিধর্ম্ম আছে, এ সকলই আমি। আমিই চিদাকারে ব্রহ্মে বিরাজিত হইয়া এই বিশাল সংসারের স্বরূপ ধারণ করিয়াছি। এই যাহা প্রতিক্ষণে পরিবর্ত্তনশীলরূপে প্রতিভাত হইতেছে, এই সকল লতা, গুল্ম ও অঙ্কুরাদি পদার্থনিচয়; আমিই বৈ আর কেহই নহে। ব্রহ্ম চিদাত্মার অন্তর্গত, তিনি শান্ত, তিনি পরম রসাত্মক, তিনি বাক্য ও মনের অতীত। সমস্ত তাঁহাতেই প্রতিষ্ঠিত, তাঁহা হইতে সমস্ত প্রাদুর্ভূত, তিনিই সমস্ত এবং তিনিই সর্ব্বতঃ প্রসারিত। যিনি সর্ব্ব সংসাররূপে বিরাজিত, যিনি একাত্মা—একরূপ, তিনিই পরম ব্রহ্ম বলিয়া নিশ্চিত। যিনি চিদাত্মা ব্রহ্ম, তিনিই সৎ। তিনিই সত্য, অমৃত, ঋত ও জ্ঞ ইত্যাদি বিবিধ নামে নিরূপিত হইয়া থাকেন। তিনিই সর্ব্বগামী, পরম তত্ত্ব, চেত্য-বর্জ্জিত, চিন্মাত্র; তিনি আভাস মাত্র, অমল, সর্ব্বভূতের স্বরূপবোধক ও সর্ব্বত্র বিরাজমান। মন বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়বর্গ ইত্যাদি যত কিছু কল্পনা হইয়াছে, হইতেছে ও হইবার সম্ভাবনা আছে, তিনি এই সকল কল্পনাতেই অন্বিত। ব্রহ্মবিদ্গণ তাঁহাকে শান্ত চিন্ময় ব্রহ্ম বলিয়াই উপলব্ধি করিয়া থাকেন। আমিই সেই একাদ্বয়, স্বপ্রকাশ, স্বস্থ, চিৎ-স্বরূপ ব্রহ্ম, ব্রহ্মবিদ্গণের ভাবনার ইহাই একমাত্র প্রতিপাদ্য। এই যে বহুবিধ শব্দাদি, তৎকারণ আকাশাদি ও তদ্জাত এই সংসারস্থিতি, ইহার যে সত্তামাত্র-স্বরূপ নির্ম্মল চৈতন্য, তাহা আমিই। এই যে নির-বচ্ছিন্ন সংসার ধারাবাহিকতায় বিনির্গত, অগ্নিস্ফুলিঙ্গাকারে সতত গলিত বিমল চৈতন্যধারাস্বরূপে বিভাত, ইহা—এই সংসার আমিই। যাহা যোগিদিগের অনুভূতিগোচর হইলেও বচনের অগোচর, আমিই সেই পরমা-

নন্দময় চিদ্‌ব্রহ্মরূপে বিরাজিত। সংসারের ভোগাসক্ত অহঙ্কারী জীবগণ ভোগ-ব্যাপারে যে আনন্দ-রসের আস্বাদ লইয়া থাকে, সেই অনুভূতিগম্য অমৃতস্বরূপ আনন্দ আমিই। আমিই সেই চিদ্‌ব্রহ্মরূপে বিরাজমান। আমি সুষুপ্ত-সন্নিভ শান্ত, শিব আলোকময়। যত কিছু উত্তম বিষয়ভোগ-সুখ আছে, আমি সে সমুদায় অপেক্ষা উত্তম সুখস্বরূপ। আমি সর্ব্ব দিকে সর্ব্বরূপে প্রকাশিত; আমি বাসনা হইতে বিমুক্ত—সেই চিদ্‌ব্রহ্ম। খণ্ড-শর্করাদির যে আস্বাদ, তাহা ক্ষণকাল মাত্র স্থায়ী ও অল্পপরিমিত; পরন্তু আমি যে সুখাস্বাদময়, তাহা তদপেক্ষাও পরমোত্তম। এ আস্বাদের পরিচ্ছিন্নতা নাই, ইহা ধরাকারেই প্রবহমাণ। নিশাযোগে নিশানাথের উদয় হইলে কামুকের চিত্ত যে কান্তার প্রতি আসক্ত হয়, সেই কান্তা ও গগনগত সুধাকর, এই উভয়ের অভ্যন্তরভাগে যে চিদংশ অবিচ্ছিন্নাকারে অবস্থিত, আমিই সেই চিৎ এবং আমিই সেই অবিচ্ছিন্ন সত্তাস্বরূপ নির্ব্বিষয় চিদাকার। নিম্ন-নিহিত লোক-লোচন গগন-গত সুধাকরে সুবিন্যস্ত হইলে মধ্যগগনের যে নির্ব্বিষয় চিৎশক্তি বিদ্যমান, সেই চিৎশক্তিস্বরূপ নির্ম্মল ব্রহ্ম আমিই। আমি সুখ-দুঃখাদি কল্পনার অতীত ও বিশুদ্ধ স্বরূপ। যাহা সত্য জ্ঞানময় নিত্য নির্ম্মল চিদ্ব্রহ্ম, তাহা আমিই। কোথাও উপবেশন করিয়া তাহা হইতে দূরতর প্রদেশে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবার কালে উপবেশন স্থান ও দৃষ্টিনিধান স্থানের অন্তরালে যে নির্ব্বিষয় চিৎশক্তি বিদ্যমান থাকে, সেই বিষয়-বিরহিত সর্ব্বগত চিৎস্বরূপ আমিই। ভূ, বারি, বায়ু ও বীজ এই সকলের পরস্পর সম্বন্ধ-ঘটনায় যে অঙ্কুরোৎপাদিকা চিৎশক্তি বিরাজ করে, সেই সুবিশাল চিদ্ব্রহ্ম বস্তু আমিই। খর্জ্জুর, নিম্ব ও বিম্ব প্রভৃতি ফল স্বীয় জড়ভাবেই বিরাজিত। ইহাদের অভ্যন্তরে যে আস্বাদসত্তা বিলীন আছে, আমিই সেই আস্বাদসত্তা। ইষ্ট বা অনিষ্টের লাভালাভ বশতঃ যে সম্বিত্তি—খেদ ও আনন্দবতী হইয়া প্রথিত হয়, তাহা শাস্ত্রানুযায়ী মনন দ্বারা বিশোধিত হইয়া যখন খেদ ও আনন্দ হইতে নির্ম্মুক্ত হয়, তখনকার সেই সমভাবাপন্ন চিৎশক্তি আমিই। আমি নিরাময় চিদ্‌ব্রহ্ম; লাভ বা অলাভ উভয়ত্রই আমার সমভাব। ভূপৃষ্ঠস্থ ব্যক্তি সূর্য্য-দর্শনকালে তৎপ্রতি দৃষ্টি সঞ্চালন করিলে তাহার সুপ্রসারিত

দৃষ্টির যে সূর্য্য ও নেত্র এই উভয়ত্র অসংলগ্ন অন্তরাল ভাগ, আমি তাহারই মত বিতত, শান্ত, সুনির্ম্মল চিৎস্বরূপ। আমার আদি নাই, অন্ত নাই, আমি অনাময়, তুরীয় চিদ্‌ব্রহ্মরূপেই বিরাজমান। কি জাগ্রৎ, কি স্বপ্ন, কি সুষুপ্তি, সর্ব্বকালে সমানভাবেই আমি প্রকাশমান। ক্ষেত্রজাত ইক্ষু-সমূহের আভ্যন্তরিক আস্বাদের ন্যায় আমি নিখিল প্রাণীর অন্তরে অবস্থিত। সর্ব্বত্র আমি একরূপ; সর্ব্বত্র আমার সমান ভাব; আমি সেই চিদ্ব্রহ্ম। আমি ভানুর প্রভার ন্যায় স্বচ্ছ, কান্ত, সর্ব্বত্রগ, প্রকাশশীল, চিৎশক্তি। বিষয়-ভোগে যে আনন্দকণা উৎপন্ন হয় এবং সুধার যাহা আস্বাদশক্তি আছে, আমি তাহারই মত একমাত্র স্বানুভূতিস্বরূপ অব্যয় চিদ্‌ব্রহ্ম। মৃণালসূত্র মৃণালের সর্ব্বাঙ্গে যেমন গুপ্তভাবে অবস্থান করে, তাহা ব্যক্ত-ভাবে বাহিরে দেখা যায় না, পরন্তু মৃণাল যখন ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়, তখনই তাহা পরিস্ফুট হইয়া উঠে, তেমনি যে অনাময় চিদ্‌ব্রহ্ম দেহের অভ্যন্তরে গুপ্তভাবে সর্ব্বত্র সম্বদ্ধ আছেন, যাঁহাকে বহির্দৃষ্টিতে দেখিবার উপায় নাই, এবং দেহের বিচ্ছেদ-ঘটনায় যিনি স্ফুরিতাকারে প্রতিভাত হইয়া থাকেন, আমিই সেই অনাময় চিদ্ব্রহ্ম। মেঘমালা যেমন ভুবন আক্রমণ করিয়া অবস্থান করে, তেমনি চিৎও ভুবন ব্যাপিয়া বিরাজিত; এই চিৎ একান্তই দুর্লক্ষ্য। এত সূক্ষ্ম দুর্লক্ষ্য যে, ইহার আকার কোন ইন্দ্রিয় দ্বারাই গ্রহণীয় হয় না। ফলে চিতের প্রকাশ্যই ইন্দ্রিয়; পরন্তু ইন্দ্রিয়ের প্রকাশ্য চিৎ নহে। এই চিৎ আমিই। এই স্বানুভূতিময়ী চিৎ—আমি, প্রতিদেহে স্নেহমাত্রে লক্ষিত হই। কটক, কেয়ূর ও অঙ্গদাখ্য বিবিধ কল্পিত অলঙ্কার যেমন সুবর্ণ হইলেও সুবর্ণ ভিন্নরূপে বিরাজিত, সর্ব্বত্রগ চিদ্ব্রহ্ম আমি তেমনি ভাবে সর্ব্বদেহের অভ্যন্তরে অবস্থিত। পর্ব্বতাদি নিখিল পদার্থপরম্পরার অন্তরে বাহিরে যে চিৎশক্তি সতত সত্তাসামান্যরূপে বিরাজিত, সেই নির্লিপ্ত চিৎস্বরূপ আমিই। সর্ব্ববিধ অনুভূতির অকৃত্রিম আদর্শ বলিয়া যাঁহাকে নির্দ্দেশ করা হয়, যাঁহাতে কোনই মলকণিকা সংলগ্ন নাই, সেই মহান্ চিৎতত্ত্ব আমিই। যিনি সর্ব্ব সঙ্কল্পের ফল প্রদান করেন, সকল তেজ প্রকাশ করিয়া থাকেন, যাঁহা অপেক্ষা উপাদেয় পদার্থ আর নাই, আমি সেই শুদ্ধ চিদাত্মারই

উপাসনা করি। যিনি সর্ব্বদেহে লব্ধ-বিশ্রাম, অথচ সর্ব্বাবয়বের অতীত সীমায় অবস্থিত, যদীয় রূপ সর্ব্বদেহেই সুপ্রকাশ, সেই চিদাত্মাই আমার উপাস্য। যিনি ঘটে, পটে, মঠে, কূপে ও চতুর্ব্বিধ ভূতদেহে সদাই সংস্বরূপে স্পন্দমান, এবং যিনি জাগ্রদবস্থাতেও সুষুপ্তভাবে অবস্থিত, সেই চিদাত্মাকেই আমরা উপাসনা করি। যিনি অনলে উষ্ণতা, হিমে শৈত্য, অন্নে মাধুর্য্য, ক্ষুরে নিশিততা, অন্ধকারে কৃষ্ণতা এবং চন্দ্রে শুভ্রতা-রূপে বিরাজিত, আমরা সেই চিদাত্মাকে উপাসনা করি। যিনি সর্ব্ববিধ বস্তুর অন্তরে বাহিরে প্রকাশাকারে বিরাজমান, এবং যিনি দূরস্থ হইয়াও অদূরস্থ, আমরা সেই চিদাত্মাকে উপাসনা করি। যিনি মধুরাদি পদার্থে মাধুর্য্য ও তীক্ষ্ণাদি পদার্থপরম্পরায় তীক্ষ্ণতাদিরূপে অবস্থিত, আমরা সেই চিদাত্মার উপাসনা করি। যিনি তুর্য্য ও অতুর্য্য হইতে অতীত পদে জাগ্রৎ,স্বপ্ন ও সুষুপ্তি—সকল প্রকার অবস্থাতেই সর্ব্বদা সমানভাবে অবস্থিত, সেই চিদাত্মাকেই সর্ব্বদা আমরা উপাসনা করি। যাহাতে সকল কল্পনা প্রশান্ত হইয়াছে, নিখিল কৌতুক নিবৃত্তি পাইয়াছে, কাম-ক্রোধাদির লেশ মাত্র যাহাতে নাই, সেই সর্ব্বচেষ্টা-বিরহিত চিদাত্মাকে আমরা উপাসনা করি। যিনি নিরারম্ভ, নিষ্কৌতুক, নিরাহ, নিরংশ ও নিরহঙ্কার, অথচ যিনি সর্ব্বস্বরূপ, আমরা সেই চিদাত্মাকে উপাসনা করি। সকলের অন্তরে যিনি অবস্থিত, যিনি সকলের পরপার-গত, সর্ব্বস্বরূপ, একরূপী, যাঁহার চিৎস্বরূপতার সীমা নাই, আমি এখন সেই চিদাত্মা হইয়াই রহিয়াছি। এই ত্রিলোকের অভ্যন্তরে যে সকল শরীর আছে, সেই সমস্ত শরীররূপ মুক্তাহারের সূত্ররূপে যিনি বিরাজিত এবং এ জগতের জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তির যিনি সম্পাদক, আমি অধুনা সেই সমুন্নত বিতত চিদাত্মা হইয়াছি। এ জগৎ বৃহৎ ব্যাধপাশের ন্যায় বহু বিস্তৃত; অত্রত্য জীবরূপ বিহঙ্গমদিগকে ইহার অভ্যন্তরে রাখিয়া যিনি প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করেন, আমি সেই চিদাত্মাকে লাভ করিয়াছি। যাঁহাতে এই নিখিল প্রপঞ্চ বিরাজিত, অথচ যাঁহাতে কিছুরই সত্তা নাই, যিনি এক—অদ্বিতীয়,-সৎ ও অসৎস্বরূপ, আমি সেই চিদাত্মাকে প্রাপ্ত হইয়াছি। যিনি পরম প্রত্যয় ও সর্ব্ব-সম্পদের পূর্ণ আস্পদ এবং যিনি সর্ব্ববিধ আকারে বিহারশীল, আমি সেই

চিদাত্মাকে অধিগত হইয়াছি। যিনি স্নেহের আধার, জড় বায়ু অর্থাৎ দেহাদি-গত প্রাণসমূহের অধ্যাস বা বৃষ্টি-বাতাদির অভিঘাতে যাঁহার বিনাশ নাই, ফলে যিনি দেহাদির আকারে অধ্যস্ত হন,—হইলেও যাঁহার স্বরূপ-ক্ষতি কিছুই নাই, তিনি যেমন, তেমনই থাকেন। ভ্রমদর্শনে তিনি উল্লিখিত বাতাঘাতরূপ ভ্রমসম্পন্ন এবং তত্ত্বদর্শনে তিনি তাহা হইতে পরিমুক্ত, আমি বাহিরে অন্তরে সেই চিৎপ্রদীপের উপাসনা করি। সরোবরে যেমন পদ্মিনীকন্দ, তেমনি যিনি অন্তরে গূঢ়ভাবে অবস্থিত এবং যিনি সর্ব্বাঙ্গের সুদৃঢ় বন্ধনকারী তন্তুরূপী, আমি সেই নিখিল জীবের জীবনোপায়-স্বরূপ চিদাত্মাকে প্রাপ্ত হইয়াছি। যিনি ক্ষীরাব্ধি হইতে উদ্ভূত নহেন, চন্দ্র হইতে সঞ্জাত হন নাই, এ হেন আহার্য্য পীযুষস্বরূপ সত্য চিদাত্মাকে আমরা উপাসনা করি। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধরূপে যিনি আভাস প্রাপ্ত হইয়া থাকেন এবং তৎসমস্ত হইতে যখন বিরহিত হন, তখন যিনি শান্তভাবে বিরাজ করেন, আমি সেই চিদাত্মাকে প্রাপ্ত হইয়াছি। যিনি আকাশ-কোষবৎ বিশদ ও সমুদায়ের রঞ্জন, অথচ যিনি না রঞ্জন, না আকাশ, আমি সেই চিদাত্মাকে অধিগত হইয়াছি। যিনি মহামহিমান্বিত হইয়াও সর্ব্ব প্রকার ঐশ্বর্য্য হইতে বর্জ্জিত, যাঁহার কর্ত্তৃত্ব আছে অথচ যিনি অকর্ত্তা, আমি সেই চিদাত্মাকে প্রাপ্ত হইয়াছি।

আমি বুঝিয়াছি, অধ্যাস-দৃষ্টিতে এ সকলই আমি এবং সম্বন্ধ-অধ্যাস-ক্রমে এই সমুদায়ই আমার। অপবাদ-দৃষ্টিতে আমি অনহং এবং আধ্যা-রোপ-দর্শনে 'অহং'আরোপের আস্পদ। উল্লিখিত অধ্যারোপ ও অপবাদ-বিধিবলে আমি আমার প্রকৃত তত্ত্ব কি, তাহা অবগত হইয়াছি। এখন এই জগৎ কৃত্রিম মায়াময়ই হউক, কিম্বা অকৃত্রিম আত্মাই হউক, আমার কোন কিছুতেই ক্ষতি নাই। আমি সর্ব্বথা বিগতজ্বর ও বিশোক হইয়াছি।

একাদশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১১ ॥

দ্বাদশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! জনকপ্রমুখ বীতপাপ মহাত্মা জীবন্মুক্তগণ এই প্রকার নিশ্চয় করিয়াই সর্ব্বত্র সম, শান্ত, সত্য-পদেই পরম সুখে অবস্থান করেন। 'ত্বং' পদার্থ শোধিত হওয়ায় তাঁহাদের বুদ্ধি পরিপূর্ণ; তাই সেই ধীরগণ অন্তরে বাহিরে সর্ব্বত্র সমদর্শী ও নীরাগ-চিত্ত। তাঁহারা জীবন বা মরণ এ উভয়ের কোন কিছুরই নিন্দা বা প্রশংসা করেন না। সেই সরল ও নম্রস্বভাব মহাত্মগণ সুমেরুর ন্যায় স্থিরপ্রকৃতি। ভগবান্ নারায়ণের ভুজসমূহের ন্যায় তাঁহারা অতি সূক্ষ্ম লক্ষ্য-বেধে সমর্থ। অর্থাৎ অতি দুর্লক্ষ্য ব্রহ্মপদ লক্ষ্য করিতেও তাঁহারা সক্ষম। এই সকল জীবন্মুক্ত মহাত্মা নানা বনখণ্ডে, বিবিধ দ্বীপে, নগরে, উপবনে, দেবোদ্যানে ও ভূতলস্থ নানা বনপ্রদেশে যথেচ্ছ অপ্রতিহতভাবে বিহার করিতেন। কখন তাঁহারা কুসুমময় দোলায় চড়িয়া দোল খাইতেন; কখন বিচিত্র বনভূমিতলে ভ্রমণ করিতেন এবং কখন বা সুমেরুশৈলের তুঙ্গ শৃঙ্গে যদৃচ্ছাক্রমে বিচরণ করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে শত্রু-সংহার করিয়া ছত্র-চামরাদি প্রশস্ত রাজ-লক্ষণ সকল ধারণপূর্ব্বক নিষ্কণ্টকে রাজত্ব করিতেন। সর্ব্ববিধ সদাচারে তাঁহাদিগের বিচিত্র ত্রিবর্গ সাধিত হইত। তাঁহারা শিষ্টাচারের অনুবর্ত্তী হইয়া শ্রুতি-স্মৃতি-বিহিত বিবিধ যাগ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেন। এইরূপে তাঁহাদের অশেষ ধর্ম্ম সঞ্চিত হইয়াছিল। তাঁহারা কান্তাজনের কমনীয় হাস্য-লসিত বিবিধ মধুর সুখ-সম্ভোগে লিপ্ত থাকিয়া স্বচ্ছন্দে আহার বিহার করিতেন। সেই মহাপুরুষেরা কখন সুচারু চূতবনে, কখন পারিজাত বনে এবং কখন বা মনোজ্ঞ নন্দন-কাননে প্রবেশ করিয়া অপ্সরাদিগের মধুরতর গীতরব শ্রবণ করিতেন। এমন অনেক সময় আসিত, যখন তাঁহারা চরাচর প্রাণিবৃন্দকে লইয়া নানাবিধ যাগ-যজ্ঞাদি ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করিতেন এবং নিখিল প্রাণীর সুখ-সন্বিধান করিয়া যথাক্রমে গার্হস্থ্য ধর্ম্ম-পালনে নিরত হইতেন। আবার এমন অনেক সময় উপস্থিত হইত, যখন তাঁহারা ভেরী-নিনাদ করিতে

করিতে সংগ্রাম-সাগরে প্রবেশ করিয়া বিপক্ষ-পক্ষের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মাতঙ্গ তুরঙ্গ প্রভৃতি প্রভূত সেনাদল সংহারপূর্ব্বক ভীষণাকারে বিরাজ করিতেন। তাঁহাদের সেই ভয়াবহ কৃত কর্ম্মের ফলে শিবাদল অকুতোভয়ে রণক্ষেত্রে বিচরণ করিত। কখন বা তাঁহারা নানাজাতীয় কঠোর-কর্ম্মা শত্রুদিগের সম্মুখে ক্রোধে, ক্ষোভে ও ভীষণ বিপৎপাতে বিভ্রত হইয়া পুনরপি তাহা হইতে সমুত্তীর্ণ হইতেন।

রামচন্দ্র! ঐ সকল জীবন্মুক্ত ব্যক্তি এবম্বিধ অশেষ সংসার-ব্যাপারে নিরত রহিলেও চিত্ত তাঁহাদের সর্ব্ব সময়ের জন্যই নীরাগ, আসক্তিহীন, ভ্রম-পরিহীন, নিরুপাধিক, পরম পদেই প্রলীন হইয়া রহিত। এই জন্য তাঁহারা সরোবরে কুলাচলের ন্যায় কদাচ মহাবিপদে বা অতুল বৈভবে কিছুতেই আসক্তির সহিত মগ্ন হইতেন না। অর্থাৎ তাঁহাদের দুঃখেও দুঃখ বোধ ছিল না, বা সুখেও সুখবোধ ছিল না।

হে রঘুবংশাবতংস! পূর্ণ ইন্দু উদিত হইলে জলরাশি যেমন উল্লসিত হইয়া উঠে, পরম কমনীয় বিলাসিনী রাজ্যসমৃদ্ধি-লাভেও তেমনি তাঁহারা উল্লসিত হইতেন না। নিদাঘে যেমন বনস্থলী ম্লান হয় না, তেমনি দুঃখই হউক বা সুখই হউক, কিছুতেই তাঁহারা পরিম্লান হইতেন না। হিমপাতে ওষধি যেমন হৃষ্ট হয় না, তাঁহারাও তেমনি কদাচ বিষয়-ভোগসমূহে হর্ষ লাভ করেন নাই। তাঁহারা অনাকুলভাবেই বিষয়ভোগরূপ মঞ্জরীর রসাস্বাদ লইতেন। ইষ্ট বা অনিষ্ট ফলে তাঁহাদের অভিলাষ ছিল না, বা তাঁহারা তাহা ত্যাগও করিতেন না। শত্রু-জয়াদি কার্য্য সমাধা করিয়া তাঁহারা অতি বড় গর্ব্বিত হইতেন না, কিম্বা শত্রুর সমীপে পরাজয় প্রাপ্ত হইয়াও নিজেকে হেয় জ্ঞান করিতেন না। তাঁহাদের সুখের দশায় আনন্দ বা দুঃখ-দশায় বিষাদ হইত না। তাঁহারা কখন মোহ-মুগ্ধ বা বিপৎপাতে অবসন্ন হইতেন না। শুভ-সমাগমে তাঁহাদের হর্ষ ছিল না, বা শোক উপস্থিত হইলেও তাঁহারা তোমার ন্যায় রোদন করিতেন না। এইরূপে তাঁহারা স্ব স্ব বর্ণোচিত আচার অনুষ্ঠানপূর্ব্বক স্ব স্ব কর্ত্তব্য কর্ম্ম সমাধা করিতেন। তাঁহাদের কোনই সংরম্ভ ছিল না; তাঁহারা অপর মেরুগিরির ন্যায় অবস্থান করিতেন।

হে রঘুনাথ! এক্ষণে তোমায় বলি, তুমিও তাঁহাদের ন্যায় পাপা-পহারিণী তত্ত্বদৃষ্টি অবলম্বনপূর্ব্বক অহঙ্কারপরিহীন হও,—হইয়া যাহা স্বচ্ছ শুদ্ধ চিন্মাত্র, তাহাতে 'অহং'বুদ্ধি স্থাপনান্তে যথেচ্ছ বিহার করিতে থাক। আমি যে প্রকার বলিলাম, তদনুসারে এই সৃষ্টিপ্রবাহের প্রতি লক্ষ্য করিয়া তুমি ভ্রান্তিবিহীন হও এবং সুমেরুবৎ অচল ও সমুদ্রবৎ গম্ভীর হইয়া সমভাবে অবস্থান কর। এই যে সকল দেখা যাইতেছে, ইহা এই প্রকারে আভাসদশা প্রাপ্ত একমাত্র সেই চিন্মাত্র। ইহাতে সত্য বা অসত্য কচিৎ কিছুই নাই। তুমি অনায়াসে ইহা পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মভাব অবলম্বন কর। বুদ্ধি তোমার সর্ব্বত্র অনাসক্ত হউক। এই আপাত-দর্শনে সত্যস্বরূপে প্রতীয়মান সংসারকে তুমি তোমার বুদ্ধিবলে ক্ষয় করিয়া ফেলো। হে সাধো! তুমি কেন এরূপ প্রগাঢ় উদ্বেগ-সহকারে রোদন করিতেছ? হে সৌম্য! আবর্ত্ত-পতিত তৃণের ন্যায় কেনই বা উদ্ভ্রান্তচিত্তে ঘূর্ণমান হইতেছ?

রামচন্দ্র কহিলেন,—ভগবন্! আপনার অপার অনুগ্রহ। সূর্য্য-সংসর্গে পদ্ম যেমন প্রবোধ প্রাপ্ত হয়, আমিও তেমনি ভবদীয় অনুগ্রহে অধুনা প্রবুদ্ধ হইতে পারিলাম। অহো! অদ্য আমার সকল মল সম্যক্ ক্ষয় প্রাপ্ত হইল। শরৎ-সমাগমে মিহিকার যেমন অবসান হয়, তেমনি মদীয় ভ্রান্তি একেবারেই অস্তগত হইল। আমার সমস্ত সংশয়রাশি দূরে পলায়ন করিল। এখন হইতে আপনার বাক্যই আমার শিরোধার্য্য ও প্রতিপাল্য। আমার মদ, মোহ, মান, মাৎসর্য্য সকলই এখন চলিয়া গিয়াছে। এতদিনে চিরকালের জন্য আমার শোকশান্তি হইল। অদ্য চিরদিনের তরে আমি আত্মস্বরূপে সমুদিত হইয়া রহিলাম। প্রচুরতর সুখ-স্বরূপ আত্মা—আমি আর এখন বদ্ধ নহি। আমি এ হেন নিশ্চিত বুদ্ধিযোগে এই উপদিষ্ট বিষয়ের দৃঢ়তা সাধনপূর্ব্বক আপনি যাহা যাহা কর্ত্তব্যরূপে নির্দ্দেশ করিবেন, তদনুসারে অন্যান্য রাজ্য-পালনাদি কর্ত্তব্য কর্ম্ম অশঙ্কিতভাবে সমাধা করিব।

দ্বাদশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশ সর্গ।

রামচন্দ্র কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! অধুনা আমার প্রকৃতই তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইয়াছে; তাই বাসনারও অবসান ঘটিয়াছে এবং বাসনা ক্ষয় নিবন্ধন নিশ্চয়ই আমি জীবন্মুক্ত-পদে বিশ্রান্তি লাভ করিয়াছি; কিন্তু হে বিভো! এক্ষণে আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, প্রাণস্পন্দের নিরোধ-ঘটনায় বাসনার বিনাশ হইলে তাহা হইতে কিরূপে জীবন্মুক্ত পদে বিশ্রান্তি লাভ করা যায়, তাহা আমার নিকট প্রকাশ করিয়া বলুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র! এই সংসার হইতে উদ্ধার পাইবার যে যুক্তি, তাহা যোগ নামে নিরূপিত। চিত্তের উপশম বা নিরোধই ঐ যোগ। এই যে যোগ বা উপায়, ইহা দ্বিবিধ বলিয়া জানিও। ইহার এক প্রকার—আত্মজ্ঞান; এই আত্মজ্ঞান সর্ব্বত্রই প্রথিত আছে। দ্বিতীয় প্রকার—প্রাণস্পন্দ-রোধ, ইহা এক্ষণে শ্রবণ কর।

রামচন্দ্র কহিলেন,—হে বিভো! ঐ যে দুইটী উপায় নির্দ্দিষ্ট হইল, উহাদের মধ্যে কোনটী এরূপ অল্পায়াস-সাধ্য, সুলভ ও উত্তম যে, যাহা জানিবা মাত্রই এ সংসার-দুঃখ আর প্রাপ্ত হইতে হয় না, ইহা আমার নিকট প্রকাশ করুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! যোগ শব্দ দ্বারা যদ্যপি দ্বিবিধ উপায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তথাচ প্রাণস্পন্দের নিরোধরূপ যে উপায়, তাহাতেই যোগশব্দ রূঢ় বা একান্তই প্রসিদ্ধ। সংসার হইতে উদ্ধার করিবার পক্ষে জ্ঞান ও যোগ এই দুইটী উপায়ই সমান বা একরূপ ফলের উৎপাদক। তবে কথা এই যে, কাহারও কাহারও নিকট জ্ঞান অসাধ্য হয় এবং কাহারও কাহারও নিকট যোগ অসাধ্য হইয়া উঠে। এই জন্য যিনি যাহা সাধনা করিতে সক্ষম, তিনি তাহাই গ্রহণ করেন; কিন্তু হে সাধো, রাম! আমার অভিমত এই যে, জ্ঞানরূপ উপায়ই সুসাধ্য। এ কথা বলিলাম এই জন্য যে, যাহা অজ্ঞান, বা জ্ঞানের অভাব, তাহা ত স্বপ্নেও আমাদের অসম্ভাবিত; আর যাহা জ্ঞান, তাহা সকল অবস্থায়

সতত আপনা হইতেই বিরাজমান। অর্থাৎ বিবেকের অভাবেই অজ্ঞান-স্থিতি; কিন্তু যখন বিবেক জন্মে, তখন আর অজ্ঞান কোথায়? তখন ত কেবল জ্ঞানই প্রতিভাত হয়; এই জন্যই আমার মতে জ্ঞানই সুসাধ্য উপায়। একমাত্র বিবেকোদয়েই জ্ঞান লাভ করা যায়। এই জ্ঞানাপেক্ষা যোগ দুঃসাধ্য বলিয়া মনে হয়। কেন না, যোগসাধনায় ধারণা, আসন ও উপযুক্ত দেশ প্রভৃতি বিধিমত হওয়া প্রয়োজন; নতুবা যোগ হওয়া কঠিন; যোগের দৌর্লভ্য সম্বন্ধে আরও অনেক প্রকার উক্ত আছে। যাহা হউক, জ্ঞান সহজসাধ্য আর যোগ দুঃসাধ্য এবং যোগ সহজ-সাধ্য আর জ্ঞান কষ্ট-সাধ্য, এরূপ বিকল্প কল্পনা অনুচিত; কেন না, এই প্রকার আলোচনা অলসপ্রকৃতি নিরুৎসাহ ব্যক্তিরই ভাবনা-ফল। পরন্তু যাঁহার সামর্থ্য আছে, ধৈর্য্য আছে, তাঁহার নিকট জ্ঞান ও যোগ উভয়ই সুসাধ্য হইয়া থাকে।

হে রাঘব! শাস্ত্র-বাক্যে জ্ঞান ও যোগ এই দ্বিবিধ উপায়েরই উল্লেখ দেখিতে পাই, তন্মধ্যে জ্ঞান অত্যন্ত নির্ম্মল অর্থাৎ জ্ঞেয় পদের অস্পৃষ্ট। হে সাধো! অধুনা যোগের কথা তোমায় বলিতেছি। এই যোগ প্রাণ ও অপান পবনের সমত্ব সাধকরূপে প্রসিদ্ধ, ও দেহ-গুহায় দৃঢ়-স্থিত। সিদ্ধিকামী ব্যক্তিবর্গের পক্ষে ইহা সিদ্ধিপ্রদ এবং জ্ঞানাভিলাষী ব্যক্তিবর্গের মোক্ষ-প্রদ। ফলে যাঁহারা অণিমা লঘিমা প্রভৃতি সিদ্ধি কামনা করেন, যোগানুষ্ঠানে তাঁহাদের সে সিদ্ধি করায়ত্ত হয়, আর যাঁহারা তত্ত্ব-জ্ঞান ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের সেই জ্ঞান-প্রাপ্তি হয়।

হে রাজাধিরাজ-নন্দন রাম! তুমি উদ্‌যোগ সহকারে প্রাণবায়ুর নিরোধ-কর যোগাবলম্বন কর। এইরূপ করিলেই বাসনা ক্ষয় হইবে এবং বাসনাক্ষয়ে অক্ষয় পরব্রহ্মে চিত্তবৃত্তির নিরোধ ঘটিবে। এবম্বিধ-রূপে তুমি সমাহিত হইয়া রাগাতীত নিরতিশয় আনন্দময় ব্রহ্মরূপে বিরাজ করিতে পারিবে।

ত্রয়োদশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৩ ॥

চতুর্দ্দশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! আমি পূর্ব্ব হইতেই বলিয়া আসিতেছি যে, একমাত্র আত্মতত্ত্বই বিদ্যমান আছেন। মরুভূমিতে মৃগতৃষ্ণার ন্যায় তাঁহার কোন এক অবিদ্যাবৃত অংশবিশেষে এই জগৎস্বরূপ একটী স্পন্দ বর্ত্তমান। কমলোদ্ভব ব্রহ্মা ইহার কারণ; তিনি এই ভূতবৃন্দরূপ ভ্রান্তি বিস্তার করিয়া সকলের পিতামহরূপে বিরাজ করিতেছেন। ঐ যে ধ্রুবাধার নক্ষত্র-মণ্ডল বা সপ্তর্ষিলোক, ঐ খানে আমি সৎকর্ম্মের পরিপাকে ব্রহ্মার মানস পুত্র বশিষ্ঠনামে প্রাদুর্ভূত হইয়া যুগে যুগে বাস করিয়া থাকি। সেই আমি বশিষ্ঠ, একদিন স্বর্গীয় সুরপতির সভায় নারদাদি মহর্ষিগণের মুখে সুচিরজীবীদিগের সম্বন্ধে নানা কথা শুনিতে ছিলাম। সেখানে কথা-প্রসঙ্গে শাতাতপ নামে কোন এক মিতভাষী মহামতি মানী মুনি ঐ কথার প্রস্তাব করেন। তিনি বলেন—সুমেরুগিরির ঈশান কোণে একটী শিখর আছে। ঐ শিখর পদ্মরাগমণিময়; তথায় শ্রীচূত নামে একটী প্রসিদ্ধ কল্পবৃক্ষ আছে। ঐ কল্পবৃক্ষের উপরিস্থিত দক্ষিণদিকের স্কন্ধদেশে কল-ধৌত লতাজড়িত কোন একটী কোটরে একটা বিহঙ্গকুলায় বিদ্যমান। আপনার কমলাগারে ব্রহ্মা যেমন বিরাজ করেন, তেমনি সেই বিহঙ্গালয়ে ভুশুণ্ড নামে এক বীতরাগ সুন্দর বায়স বাস করিয়া থাকে। এই জগন্মণ্ডলে সেই ভুশুণ্ড বায়সের ন্যায় চিরজীবী আর কেহই নাই। বলিতে কি, এই স্বর্গধামেও সেরূপ চিরজীবী কেহ বর্ত্তমানে নাই এবং ভবিষ্যতেও হইবে না। সেই ভুশুণ্ড বায়স দীর্ঘায়ু, তাহার বিষয়াসক্তি নাই। সে শ্রীসম্পন্ন, মহামতি, বিশ্রান্ত-বুদ্ধি, শান্ত, দান্ত, কান্ত ও কলাকুশল। সেই বায়স এ সংসারে যেরূপে জীবন ধারণ করে, যদি ঐরূপে জীবন লাভ করিতে পারা যায়, তাহা হইলে প্রকৃত পুণ্য জীবন লাভ করা হয়; এবং জীবনের চরম উন্নতি প্রাপ্ত হওয়া যায়।

আমি শাতাতপ মুনিকে ভুশুণ্ড বায়সের বিবরণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি পুনরপি তৎসম্বন্ধে ঐ রূপই বর্ণন করিলেন। বলা বাহুল্য, সেই

স্বর্গীয় দেবসভায় বসিয়াই তিনি এই সত্য ঘটনা ব্যক্ত করেন, তাঁহার বর্ণিত বিষয় কিছুমাত্র অতিরঞ্জিত নহে। যাহা হউক, যখন সকলের কথাবার্ত্তা শেষ হইল, সুরগণ স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন, তখন ভুশুণ্ড পক্ষীকে দেখিবার জন্য আমার বড়ই কৌতূহল হইল। আমি তদ্দণ্ডেই তাহাকে দেখিব বলিয়া যাত্রা করিলাম। সুমেরুর যে একটা উত্তম শৃঙ্গে ঐ বায়স বাস করে, ঐ শৃঙ্গ পদ্মরাগ-মণিময় এবং উহা অতি বৃহৎ। আমি ক্ষণকাল মধ্যেই সেই শৃঙ্গ প্রাপ্ত হইলাম। দেখিলাম,—সুমেরুর সে শিখর হইতে নানা রত্ন ও গৈরিকাদির কত জ্বলদগ্নি-সদৃশ কান্তিপুঞ্জ বিচ্ছুরিত হইয়া সর্ব্ব দিক্ যেন মধুমদ-রসে রঞ্জিত করিয়া রাখিয়াছে। তাহাতে সেই সারা পর্ব্বতটাই যেন কল্পান্ত-কালীন প্রকাণ্ড অনল-পিণ্ডবৎ প্রতিভাত হইতেছে। সে শিখরের পার্শ্বে যে সকল ইন্দ্র-নীলমণি অবস্থিত আছে, তাহাদের প্রভাপুঞ্জ ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া ধূমপটলবৎ প্রতীত হইতে লাগিল। তত্রত্য নানাবিধ রত্ন হইতে আলোকচ্ছটা উদ্গীর্ণ হইতেছে, তাহাতে গগনতল অরুণীকৃত হইয়া উঠিয়াছে। আমি মনে মনে তখন আরও একটা বিষয় চিন্তা করিতেছিলাম। ভাবিতে ছিলাম,—সুমেরু বুঝি যোগসাধনায় নিমগ্ন; তাই যোগপ্রভাবে তদীয় বাড়বানলবৎ জঠরানল যেন তাহার ইচ্ছানুসারেই সুষুম্না নাড়ীর রন্ধ্র পথে নির্গত হইয়া শিরোদেশে পুঞ্জীভূত হইয়া রহিয়াছে। অথবা সুমেরুশৈলে যে বনদেবতা বাস করেন, তিনি যেন সুধাকরকে ধরিবার জন্য সদ্য অলকরাগ-রঞ্জিত করাঙ্গুলিদল ঊর্দ্ধদিকে বিস্তার করিয়াছেন। আমার এক এক বার মনে হইতেছিল, ঐ সুমেরুশিখর যেন অগ্নিহোত্র গৃহ; উহার অগ্নি যেন অরুণবর্ণ জ্বালামালায় সশব্দে আকাশ-গমনে সমুদ্যত হইতেছে। অথবা ঐ শিখর যেন কিরণরূপ নখর-শোভিত অঙ্গুলিত্রয় উদ্যত করিয়া গগন-গত নক্ষত্র-রাজি স্পর্শ করিবার নিমিত্তই আকাশ-তল চুম্বন করিতেছে। একবার ভাবিতেছিলাম, ঐ শিখর বুঝি, ভূভৃদ্-গণের একটা মনোজ্ঞ মণ্ডপ; উহাতে জীমূতরূপ মুরজের ধ্বনি উত্থিত হইতেছে। ষট্পদকুল বৈতালিক দলের ন্যায় গান করিতেছে। প্রস্ফুটিত কুসুমগুচ্ছে উহা অন্বিত রহিয়াছে। উহার কোথাও কোথাও দশন-

পঙ্‌ক্তির ন্যায় তালতরুর পত্ররাজি পতিত হওয়ায় বোধ হইতেছিল, ঐ শিখর যেন দন্ত বিকাশ করিয়া অপর কাহাকে পরিহাস করিতেছে। দেখিলাম,—তথায় অপ্সরাগণ কত স্থানে দোলায় চড়িয়া দোল খাইতেছে। সেখানে সকলেই যেন উদার মন্মথ-মদে মত্ত রহিয়াছে। দেখিলাম,—উহার কত স্থানের কত শিলাতলে বসিয়া কত দেব বিশ্রাম করিতেছেন। কত যুবক-যুবতী উহার কন্দরে কন্দরে বাস করিতেছেন। সে গিরির প্রদেশবিশেষ বেণুদণ্ড ধারণ করিয়া—গঙ্গারূপী শুভ্র যজ্ঞোপবীতে মণ্ডিত হইয়া স্বচ্ছ আকাশরূপ অজিনাম্বর-ধর তাপসের ন্যায় বিরাজ করিতেছে। উহার কোনও প্রদেশ গঙ্গার নির্ঝর-নিপাত-জনিত নিনাদে মুখরিত হইতেছে, কোথাও কোথাও কত লতাগৃহ শোভা পাইতেছে; তাহাতে দেবগণ কেলি করিতেছেন। স্থানে স্থানে গন্ধর্ব্বগণের গীতধ্বনি শুনা যাইতেছে। তথায় সুগন্ধ গন্ধবহ মন্দ মন্দ বহিতেছে, তাহার স্থানে স্থানে হেমকমল-দল ফুটিয়া রহিয়াছে। কত স্থানে কত রত্ন নক্ষত্রস্তবকের ন্যায় সুশোভিত হইতেছে। ভুশুণ্ড বায়সের বাসভূমি—সেই পিঙ্গল বর্ণ মেরুশিখর এত উন্নত—এত উচ্চ যে, সে যেন অনন্ত আকাশ ভেদ করিয়া তাহার পরপারে পৌঁছিয়াছে। এই সুমেরুগিরি দেবযুবতীগণের ক্রীড়াভূমি; ইহার উপরিভাগে শ্বেত, পীত, হরিত, ও পাটলাদি বিবিধ বিকসিত কুসুমরাজি বিরাজ করিতেছে। দেখিয়া মনে হয়, সুমেরু যেন নানাপ্রকার রঙ্গদ্বারা গগনগাত্রে কত কি বিবিধ চিত্র অঙ্কন করিতেছে।

চতুর্দ্দশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৪ ॥

পঞ্চদশ সর্গ

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! সুমেরুর সেই শিরোদেশে কুসুম-সমুল্লাসিত কল্পাভ্র সকল কুন্তলের ন্যায় বিরাজ করিতেছে। দেখিলাম,—শাতাতপ যেরূপ বর্ণন করিয়াছিলেন, তদনুরূপ সেই চূততরু সেখানে স্বীয় শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। ঐ তরু প্রার্থীদিগের প্রার্থনা-পূরকরূপে প্রতিভাত। উহার প্রতি অঙ্গে কত পুষ্পপরাগ পরিকীর্ণ আছে। দেখিলে মনে হয়, যেন শুভ্র অভ্রমালায় তরুগাত্র মণ্ডিত রহিয়াছে। ঐ তরুর কত শাখা কত দিকে প্রসারিত আছে। উহারা রত্নস্তবকে উল্লসিত হইতেছে। ঐ তরুর ঔন্নত্য এত যে, উহার নিকট আকাশও নির্জ্জিত। মেরুশৃঙ্গের উপরি সেই চূততরু বিরাজিত। দেখিলে মনে হয়, ঐ শৃঙ্গের উপর যেন অন্য একটা শৃঙ্গ প্রতিভাত। ঐ তরু কেবলই কি ঔন্নত্যগুণে আকাশকে জয় করিয়াছে? না,—আকাশবিজয়ের আরও অনেক কারণ আছে। জানিবে,—উহাতে যে পুষ্পপুঞ্জ প্রস্ফুটিত রহিয়াছে, তাহারা নভোগত নক্ষত্রনিকর অপেক্ষা দ্বিগুণ; যত পল্লবদল আছে, তাহারা প্রাবৃটকালীন পয়োধর অপেক্ষা দ্বিগুণ, যত প্রোজ্জ্বল পুষ্পপরাগ আছে, তাহারা দিবাকর ও নিশাকরের করনিকর হইতে দ্বিগুণ এবং যত সব মঞ্জরী আছে, তাহারা তড়িৎপুঞ্জ অপেক্ষা দ্বিগুণ। কাজেই বলা যায়, সেই তরুকৃত আকাশ-জয়ের এ সকলও অনেক কারণ।

রামচন্দ্র! ঐ বৃক্ষে বহুতর মধুকরের বাস। তাহারা যে গুঞ্জনধ্বনি করিতেছে, সে ধ্বনি ঐ বৃক্ষের স্কন্ধবাসিনী কিন্নরীদিগের কণ্ঠরবে মিশিয়া দ্বিগুণ হইতেছে। দেখিলাম,—ঐ চূতবৃক্ষের কত শাখায় কত দোলা আছে; সে দোলায় চড়িয়া কত অপ্সরা দোল খাইতেছে। অপ্সরাদিগের কর-পল্লব ও পদ-পল্লবে সে তরুর পল্লবরাশি দ্বিগুণ হইয়া উঠিয়াছে। ঐ বৃক্ষের শাখাসমূহে কত মায়ারূপী বিহগবেশী সিদ্ধ ও গন্ধর্ব্বগণ বিরাজ করিতেছেন; তাঁহাদিগের সহযোগিতায় সেই বৃক্ষবাসী বিহঙ্গনের সংখ্যাও

দ্বিগুণ হইয়াছে। নানা রত্নের কান্তি ও নির্ম্মল নীহারপাতে ঐ তরুস্কন্ধ দ্বিগুণিত হইয়া যেন তদীয় বস্ত্রের ন্যায় বিভাত হইতেছে। দেখিলাম,—সে বৃক্ষের বড় বড় ফলগুলি সুধাংশু-মণ্ডলের সংস্পর্শগুণে সুধারসে পূর্ণ হইয়াছে; তাই যেন তাহারা কিঞ্চিৎ স্থূলাকার ধারণ করিয়াছে। মনে হয়, মূলদেশে কল্পান্ত-মেঘ লীন আছে বলিয়া সে তরুর মূল যেন আরও অধিক স্থূল হইয়াছে। দেখিলাম,—সে তরুর স্কন্ধভাগে সুরগণ বাস করিতেছেন এবং পত্রে পত্রে কিন্নরেরা বিশ্রাম করিতেছে। তাহার কত নিবিড় শাখা; তাহাতে মেঘমালা বিলম্বিত। সে তরুর শীতলতলে সুরগণ সুখসুপ্ত। সেখানে অপ্সরারা ভ্রমরীর ন্যায় বিরাজিত। তাহারা তাঁহাদের বলয়-শিঞ্জনে ভ্রমরসমূহকে তাড়াইয়া দিয়া সেই বিপুল বৃক্ষের পুষ্পমধু গ্রহণ করিতেছে। দেখিলাম,—কত সুর, কত কিন্নর, কত গন্ধর্ব্ব ও কত বিদ্যাধরে সে বৃক্ষ পরিব্যাপ্ত। ঐ মহান্ কল্পপাদপ দশ দিক্ ও আকাশমণ্ডল ব্যাপিয়া বিরাজিত। উহাকে দেখিলেই ধারণা হয়, যেন প্রভূত জগৎ একত্র সমাবিষ্ট। উহা অবিরল কলিকাকুলে সমাকুল, ঘন-সন্নিবিষ্ট মৃদুল পল্লবে পরিস্তীর্ণ, প্রস্ফুট পুষ্পপুঞ্জে নীরন্ধ্র, নিবিড় বনে বলয়িত, পুঞ্জ পুঞ্জ মঞ্জরীনিকরে নিরবকাশ, রাশি রাশি মণি-গুচ্ছে আচ্ছন্ন এবং প্রচুরতর বসন ও ভূষণচ্ছটায় সমুজ্জ্বল। উহার চারি দিকে কত নিবিড় বন; সে বনে কত ব্রততিরাজি মন্দ মারুতের আন্দোলনে নৃত্য-পরায়ণ। ঐ বৃক্ষের চতুর্দ্দিকে কত ফল ফলিয়া আছে। কত পল্লব দুলিতেছে, কত সুগন্ধ পরাগ-পুঞ্জ পরিশোভিত আছে, তাহাতে ঐ বৃক্ষ বিচিত্র শোভায় সুশোভিত হইয়াছে। দেখিলাম,—বিবিধ বিহঙ্গমকুল সেই বৃক্ষের কক্ষে, কুঞ্জে, লতাজড়িত শাখাগ্রে, নানা লতায়, পাতায়, পুষ্পগুচ্ছে, এমন কি প্রতিশাখার গ্রন্থিদেশে কত শত কুলায় নির্ম্মাণ করিয়া বসবাস করিতেছে। এই সকল বিহঙ্গমের মধ্যে যত ব্রহ্মবাহন কলহংস আছে, তাহারা শুভ্র শুভ্র কমলিনীকন্দ ও কুমুদিনীবন্ধুর কলাবিধৌত মৃণালখণ্ড ভক্ষণ করিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতেছে। উহাদিগের মধ্যে যে সকল হংস ব্রহ্মার রথবাহনে নিযুক্ত, তাহারা সতত তাঁহার সঙ্গে থাকিয়া ব্রহ্মবিদ্যায় অভ্যস্ত, সর্ব্বদাই

প্রণব-বেদ উচ্চারণে তৎপর এবং নিয়ত সামগানে নিরত। তত্রত্য বিহঙ্গমদিগের মধ্যে অনেক শুক পক্ষী আছে, তাহারা অগ্নিদেবের বাহন; এই জন্য তাহাদের কণ্ঠে সদাই যজ্ঞীয় মন্ত্র সমুচ্চারিত হইতেছে। সতত স্বাহা শব্দ উচ্চারণ করায় তাহাদের কণ্ঠস্বরও স্বাহাকারে পরিণত হইয়াছে। ঐ পক্ষিকুল অগ্নিদেবকে যজ্ঞক্ষেত্রে লইয়া যায় এবং নিজেরা যজ্ঞবেদীর পার্শ্বস্থ কোন বৃক্ষশাখায় বিশ্রাম করিতে থাকে। যজ্ঞক্ষেত্রে যে সকল যজ্ঞ-ভাগ-ভোজী দেবগণ উপস্থিত থাকেন, তাঁহারা উহাদিগের প্রতি সর্ব্বদা দৃষ্টিদান করেন। এরূপ ভাবে দৃষ্টিদানের কারণ এই যে, ঐ সকল পক্ষী বড়ই সুন্দর। তাহাদের মধ্যে কাহারও দেহকান্তি শঙ্খবৎ শুভ্র, কেহ কেহ বিদ্যুৎপুঞ্জের ন্যায় পিঙ্গলাভ, কেহ বা নবীন নীরধরের ন্যায় নীলবর্ণ এবং কোন কোন পক্ষী কুশপত্রবৎ হরিদাভ। দেখিলাম,—ঐ বৃক্ষে অনেক শুকশিশু আছে। তাহাদের মস্তকস্থ শিখা অগ্নিশিখার ন্যায় সমুজ্জ্বল। দেখিলাম,—ঐ বৃক্ষে অনেকগুলি কুমারবাহন ময়ূর আছে। কুমারজননী ভগবতী গৌরী স্বয়ং ঐ ময়ূরসমূহের সুন্দর বর্হাগুলি রক্ষা করিয়া থাকেন। ময়ূরেরা কুমারসমীপে সমস্ত শৈব বিজ্ঞানে বিলক্ষণ অভ্যস্ত হইয়াছে। ঐ বৃক্ষে আর এক প্রকার পক্ষী আছে, তাহাদের নাম ব্যোমপক্ষী। এই সকল পক্ষীর আকার অতি বৃহৎ। ইহারা আকাশেই জন্ম গ্রহণ করে এবং আকাশেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। বিরিঞ্চির বাহন হংস-বংশধরেরা শারদ-নীরদবৎ শুভ্রদেহ; তাহারা ঐ সকল ব্যোমপক্ষীর সহিত সম্বন্ধ-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া ঐ বৃক্ষে বাস করিয়া থাকে। এইরূপে দেখিলাম,—সেখানে কত অগ্নিবাহন শুকবংশ, কত কুমারবাহন ময়ূরবংশ, পূর্ব্বোক্ত কত শত ব্যোমবিহঙ্গ, কত চঞ্চুদ্বয়শালী ভারদ্বাজ পক্ষী, কত হেমচূড়ত, কত কলবিঙ্ক, কত শকুনি, কত বক, কত কুক্কুট, কত কোকিল, কত ভাস এবং চাস পক্ষী তথায় অবস্থিত। এ জগতে যত পরিমাণ প্রাণীর বাস আছে, দেখিলাম—সেখানে তত-সংখ্যক পক্ষীই বাস করিতেছে।

অনন্তর আমি আকাশপথে অবস্থান করিয়াই দেখিলাম, সেই বৃক্ষের দক্ষিণ দিকের স্কন্ধে যে এক শাখা আছে, উহা অতীব উচ্চ এবং

ঘন পত্র-বিশিষ্ট। উহাতে মঞ্জরীজালে কুলায় প্রস্তুত করিয়া একদল দ্রোণকাক বাস করিতেছে। দেখিয়া ধারণা হইল, লোকালোক-শৈলের অরণ্যাভ্যন্তরে প্রলয়ের মেঘমালা যেন সংলগ্ন আছে। আরও দেখিলাম, —সে বৃক্ষের একটা বৃহৎ স্কন্ধ আছে। উহা নানা বিচিত্র কুসুমসমূহে সমুদ্ভাসিত ও বিবিধ কুসুমসৌরভে সুবাসিত। ঐ স্কন্ধের কোটরাভ্যন্তরে একদল বায়স যেন সভা করিয়া বসিয়া আছে। পুণ্যবান্ ব্যক্তিবর্গ যথায় অপ্সরা সম্ভোগ করেন, বায়সদিগের সেই আবাস-কোটরটী যেন তাদৃশ স্বর্গস্থান বলিয়াই বোধ হইল। সে কোটরে কত মনোজ্ঞ পুষ্প-স্তবক আছে, তাহাতে সেই কোটরচারী বায়সদিগকে যেন সৌরভ-বাসিত বলিয়াই প্রতীত হইতে লাগিল। সেই কৃষ্ণকায় বায়সগুলিকে দেখিয়া মনে হইল, যেন কতকগুলি কৃষ্ণবর্ণ মেঘখণ্ড মারুত-চালিত হইয়া সেই কোটরাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া অবস্থান করিতেছে। সেই বায়স-দলের মধ্যভাগে বিশালকায় শ্রীমান্ ভুশুণ্ড বায়স অবস্থিত। দেখিয়া বোধ হইল, যেন অসংখ্য কাচখণ্ডের মধ্যভাগে ইন্দ্রনীলমণি বিরাজিত। ঐ ভুশুণ্ড কাককে একটা সামান্য প্রাণী বলিয়া গণনা করা যায় না। তিনি একজন পরিপূর্ণমনা মান্য ব্যক্তি। সর্ব্বত্র তাঁহার সম-দৃষ্টি। প্রাণ-স্পন্দ নিরোধ করিয়াছেন বলিয়া নিত্যই তাঁহার দৃষ্টি অন্তর্মুখী। তিনি সর্ব্ব সময়ের জন্যই সুখী। তাঁহার চিরায়ু জগদ্বিখ্যাত। তিনি সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর। তদীয় আয়ুষ্কাল চিরস্থির বলিয়া এ জগতে তিনি চিরজীবী ভুশুণ্ড নামে পরিচিত। অনাদিকাল হইতে তিনি কত যুগযুগান্তরের উৎপত্তি ও বিলয় দেখিয়া আসিতেছেন। দেখিয়া দেখিয়া তাঁহার মন প্রৌঢ় হইয়া গিয়াছে। কল্পে কল্পে কত শঙ্কর, কত শশাঙ্ক, কত ইন্দ্রাদি লোকপাল জন্মিতেছে, থাকিতেছে ও নাশ পাইতেছে। তিনি এইরূপ উদ্ভব, স্থিতি ও বিনাশাদি প্রতিকল্পে গণিয়া গণিয়া খিন্ন হইয়াছেন। অতীত যুগে যত সুর ও অসুরপতি ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহার সময়ে যেরূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল, তিনি সেই সমুদায় ঘটনাই মানসপটে আঁকিয়া রাখিয়াছেন। অতীত যুগের সকল কথাই তাঁহার স্মরণ আছে। তিনি একজন সুচতুর; তাঁহার অন্তর সর্ব্বদাই প্রসন্ন এবং গম্ভীর। তিনি

স্নিগ্ধ এবং মুগ্ধভাষী। অতি সূক্ষ্মতম অর্থও তিনি স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করিতে পারেন। তিনি বিজ্ঞ, বহুদর্শী, নির্ম্মম ও নিরভিমান। এ জগতে তাঁহার অপ্রিয় কেহই নাই। তিনি সকলেরই সুহৃৎ, মিত্র ও বন্ধুস্থানীয়। এমন কি, যে মৃত্যু অতি ভীষণ, তাহারও তিনি পুত্রবৎ পরম প্রীতিভাজন; বুদ্ধিবলে গুরু অপেক্ষাও তাঁহার গৌরব অধিক। এ জগতে যত প্রাণী বাস করে, তিনি তৎসমস্তেরই পরিচয় পরিজ্ঞাত আছেন।

রাম! সেই মহাত্মা ভুশুণ্ড সৌম্য, প্রসন্ন ও মধুর। তিনি সরোবরবৎ অন্তঃশীতল। কাজেই সকলের হৃদ্যতা তাঁহার উপর বিদ্যমান। তিনি সকলের ব্যবহারবিৎ; তদীয় হৃৎপদ্ম সর্ব্বদাই প্রবুদ্ধ। তাঁহার হৃদয় সতত সরলতাময়। সে হৃদয় হইতে গাম্ভীর্য্য এবং নৈর্ম্মল্য কখনই পরিত্যক্ত হইবার নহে।

পঞ্চদশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৫ ॥

ষোড়শ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র! তদনন্তর আমি দীপ্যমান-কলেবরে নভোমণ্ডল হইতে সেই ভুশুণ্ড-বায়সের সম্মুখে নিপতিত হইলাম। আমার পতনে বায়সসভা যেন কিঞ্চিৎ বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। সে পতন যেন আকাশ হইতে অচলে নক্ষত্র-পতন বলিয়া মনে হইল। সহসা পতনাঘাতে তথায় একটা শব্দ উঠিল। সে শব্দে সভাস্থ বায়সমণ্ডলী চমকিত হইল। তখন সেই বায়সসভা নীলোৎপলময় সরোবর-সম প্রতিভাত হইতেছিল। ভূকম্পনে অম্বোধির ন্যায় মদীয় পতন-জনিত মন্দ-মারুতে ঐ কাকসভা তখন কিঞ্চিৎ আন্দোলিত হইল। আমি সেখানে অতর্কিতভাবে উপস্থিত হইয়াছিলাম; কিন্তু তাহা হইলেও ভুশুণ্ড কাক আমাকে দেখিয়াই জানিতে পারিলেন যে, এই বশিষ্ঠ এখন এখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমাকে দেখিবা মাত্র ভুশুণ্ড তত্রত্য পত্রপুঞ্জ হইতে সমুত্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া মনে হইল, যেন

গিরীন্দ্র হইতে নীল নীরদ খণ্ড অভ্যুদিত হইল। ভূশুণ্ড উত্থিত হইয়া আমাকে মধুরবাক্যে বলিলেন,—হে মুনে! আপনার শুভাগমন ত? এই বলিয়া তিনি স্বীয় সঙ্কল্প বলে তদ্দণ্ডেই নিজের দুইটী হস্ত উৎপাদন করিলেন, এবং সেই হস্তদ্বয় প্রসারিত করিয়া আমাকে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিলেন। আমার তখন ধারণা হইল, যেন নীল নীরদখণ্ড হইতে মৎপ্রতি তুষার নিকর বর্ষিত হইল।

অনন্তর সেই বায়সরাজ 'এই আসন গ্রহণ করুন' এই বলিয়া আমাকে অভিনব কল্পতরু-চ্ছদ প্রদান করিলেন। ভুশুণ্ড উত্থিত হইলে সভাস্থ সমস্ত বায়সই গাত্রোত্থানপূর্ব্বক স্ব স্ব পক্ষকান্তি প্রসারিত করত আমাকে উপবিষ্ট দেখিয়া মদীয় আসনের প্রতি দৃষ্টি বিন্যস্ত করিল। আমি ভুশুণ্ড এবং তদীয় অনুচর সহচর সহ তৎকালে কল্পলতার পত্রপুঞ্জ-সজ্জিত আসনে উপবিষ্ট ছিলাম। মহাতেজা ভুশুণ্ড মুদিত-মনে আমার উদ্দেশে অর্ঘ্য-পদ্যাদি অর্পণ করিলেন এবং সৌহৃদ্যবশে মধুর বচন বিন্যাস করিয়া আমাকে বলিতে লাগিলেন। ভুশুণ্ড কহিলেন,—অহো! অদ্য বহুদিনের পর আমাদের প্রতি আপনি মহান্ অনুগ্রহ প্রদর্শন করিলেন। আমরা এই বৃক্ষবাসী পক্ষিজাতি এক্ষণে আপনার দর্শনামৃত-রস-বর্ষণে সিক্ত হইলাম। হে মুনে! আপনি মাননীয়দিগেরও মাননীয়। মদীয় চির-সঞ্চিত পুণ্য পুঞ্জবশেই প্রেরিত হইয়া আপনি অধুনা এখানে পদার্পণ করিয়াছেন। বলুন,—হে মুনিবর! কোথা হইতে আপনি আসিলেন? এ সংসার মহামোহময়; এখানে আপনি চিরকাল ধরিয়া পর্য্যটন করিয়া বেড়াইতেছেন। কিন্তু আপনার পবিত্র হৃদয়ে অখণ্ডিত সমতা বিরাজিত আছে তো? আপনি কি নিমিত্ত অদ্য এখানে আগমন-জনিত ক্লেশ স্বীকার করিলেন? কেন আত্মাকে আগমন-ক্লেশে কদর্থিত করিলেন? আমরা আপনার বাক্য শ্রবণের জন্য সমুৎসুক হইয়াছি। বলুন,—হে মুনিবর! সত্বর বলুন। অথবা আপনার চরণ-দর্শন লাভ করিয়াই সমস্ত বার্ত্তা আমি বিদিত হইয়াছি। ভবদীয় আগমনে আমাদের প্রকৃতই পুণ্য সঞ্চয় হইয়াছে। সে পুণ্যে আমরা পুণ্যবান্ হইয়াছি। বুঝিয়াছি, ইন্দ্রসভায় চিরজীবীদিগের সম্বন্ধে আপনাদের কথোপকথন হইয়াছিল, সেই প্রসঙ্গে

আপনারা আমাদিগকে স্মরণ করিয়াছেন এবং তাহাতেই ভবদীয় পূজনীয় চরণযুগল এই অধমের আবাসে আপনি অর্পণ করিয়া ইহাকে এক্ষণে পুণ্যস্থান করিয়া তুলিলেন। হে মুনে! আমি আপনার আগমনের প্রয়োজন জানিতে পারিয়াও আপনাকে যে তৎসম্বন্ধে প্রশ্ন করিতেছি, ইহার কারণ কেবল ভবদীয় বচনামৃত-পানে আমার একান্ত বাসনা বৈ আর কিছুই নহে।

রাম! ভুশুণ্ড বায়স ত্রিকালদর্শী; কালত্রয়ের কোন বার্ত্তাই তাঁহার অবিদিত নাই। তিনি বিমল বুদ্ধিশালী চিরজীবী। সেই বিহঙ্গম-বর ঐ কথা কহিলে, আমি তাঁহার কথার প্রত্যুত্তরে বলিলাম,—হে বিহঙ্গম-রাজ্যের মহারাজ! তুমি সত্য কথাই কহিয়াছ, তুমি চিরজীবী বলিয়াই তোমাকে যে আমি দেখিতে আসিয়াছি, এ কথা সত্যই বটে। তুমি তত্ত্ব বোধ লাভ করিয়াছ; এই জন্য তোমার অন্তঃকরণ সুশীতল হইয়াছে। এ ভীষণ সংসার-বাগুরায় তুমি আর আবদ্ধ নহ; ইহা তোমার সৌভাগ্যেরই পরিচয়; সুতরাং তোমাকে আমি সর্ব্বদা কুশলী বলিয়াই মনে করি। হে ভগবন্! আপনার নিকট আমার এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, আপনি কোন্ বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন এবং কি প্রকারেই বা জ্ঞেয় বস্তু বিদিত হইয়াছেন? আপনি এ বিষয়ে যথাযথ বিবরণ বর্ণন করিয়া মদীয় সংশয়-জাল ছেদন করুন। হে সাধো! আপনার এক্ষণে বয়স কত হইয়াছে? অতীত ঘটনাবলী আপনার স্মরণ আছে কি না? ভবাদৃশ দীর্ঘদর্শী ব্যক্তির এ হেন বাসস্থান কেই বা নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন? এ সকল কথা আমাকে প্রকাশ করিয়া বলুন।

ভুশুণ্ড কহিলেন,—হে মুনে! আপনি যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, এই আমি তাহা অধুনা বর্ণন করিতেছি। আপনি অবহিত-চিত্তে মৎকথা শ্রবণ করুন। ভবাদৃশ উদারবুদ্ধি মহাপুরুষের যাহা শ্রব্য বিষয়, তাহা যদি বর্ণন করা যায়, তাহা হইলে মেঘের উদয়ে যেমন সূর্য্যের উত্তাপ নষ্ট হয়, তেমনি নিখিল অশুভই বিদূরিত হইতে পারে।

ষোড়শ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৬ ॥

সপ্তদশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র! ঐ ভুশুণ্ড কাক সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর; বর্ষার নীরধরের ন্যায় দেখিতে তিনি গাঢ় শ্যামবর্ণ। তাঁহার সরল বুদ্ধি; কোন প্রিয় বস্তু লাভেও তিনি হৃষ্ট হইবার নহেন। তদীয় বচন-বিন্যাস স্নেহময় অথচ গম্ভীর। তিনি সতত সহাস্য আস্যে সদালাপে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। হস্তস্থিত বিল্বফলের ন্যায় এই ত্রিজগতের পরিমাণফল তিনি নির্ণয় করিতে সমর্থ। ত্রিভুবনে যতকিছু ভোগসামগ্রী আছে, সমস্তই তাঁহার নিকট তুচ্ছ বলিয়া বিবেচিত হয়। তিনি তত্ত্ব বিচার করিয়া এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, এই নিখিল লোক কামনার দিকে প্রধাবিত হয়; তাই ইহারা জনন-মরণরূপ সংসারদশায় পতিত হইয়া থাকে। বিহঙ্গরাজ ভুশুণ্ড স্বয়ং পরাবর ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন। তাঁহার স্থিরোন্নত আকার ধৈর্য্য-গুণের পরিচায়ক। মন্থন-কার্য্য শেষ হইলে ক্ষীরাব্ধি হইতে মন্দর উত্তোলিত হইবার পর ঐ ক্ষীর-নীরধির যেমন পূর্ণাবস্থা হয়, সেই ভুশুণ্ড বায়স তেমনি বিশ্রান্ত, বিশুদ্ধ ও পরিপূর্ণমনে বিরাজমান। তাঁহার বুদ্ধি বিশ্রান্ত, স্বয়ং তিনি প্রশান্ত এবং অন্তরে পরমানন্দরস-পানে তিনি বিহ্বল। এ সংসারের পদার্থপরম্পরার কিরূপে উৎপত্তি এবং কিরূপে তিরোধান হয়, তাহা তিনি বিশেষরূপে বিদিত আছেন। তাঁহার বাক্যাবলী বীণাধ্বনির নায় প্রসাদিনী। আত্মতত্ত্বের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া তিনি নিখিল ভয়হর সাক্ষাৎ ব্রহ্ম হইয়াছেন। তাঁহার যেন এক অভিনব কলেবর-লাভ ঘটিয়াছে। তাঁহার বদন সদাই প্রসন্ন সৌম্য। সদাই তিনি প্রহর্ষযুক্ত। আমি পরম ব্রহ্মানন্দ-রসের রসিক; আমাকে তিনি নিখিল নিজস্বরূপ বর্ণন করিবার জন্য বিমল বাক্যে এই বিশুদ্ধ নিম্নোক্ত বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। আমার মনে হইল, সুন্দর নীরধর যেন গর্জ্জনচ্ছলে মকরন্দ-লোলুপ ভ্রমরকে কিছু বলিবার উপক্রম করিল।

সপ্তদশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৭ ॥

অষ্টাদশ সর্গ।

ভুশুণ্ড কহিলেন,—এ জগতে হর নামে এক দেবাধিদেব আছেন, তিনি নিখিল স্বর্গবাসীদিগের শ্রেষ্ঠ এবং সমগ্র দেবপ্রধানগণেরও বন্দনীয়। যেমন সহকার বৃক্ষে বল্লরী, তেমনি এক বিলাসিনী রমণী সদাই তদীয় দেহার্দ্ধ-সঙ্গিনী। ঐ রমণীর নয়ন যুগ্ম ভৃঙ্গশ্রেণী-সম, এবং উচ্চ পয়োধর-যুগ্ম পুষ্পস্তবকবৎ সুশোভিত। তুষার-হার-শুভ্র লহরী-স্তবকশালিনী গঙ্গাদেবী কুসুমমালার ন্যায় হরের জটাজুট বেষ্টন করিয়া বিরাজিতা। ক্ষীরার্ণব-জাত শ্রীমান্ সুধাংশু তদীয় চূড়ামণির ন্যায় সুশোভন। ঐ সুধাংশু দর্পণের ন্যায় সমস্ত বস্তুর প্রতিবিম্ব-গ্রাহক। উহা হইতে অনবরত পীযূষধারা ক্ষরিত হইতেছে। হরের কণ্ঠদেশে যে কালকূট বিষ আছে, উহা ইন্দ্র-নীলমণিময় ভূষণের ন্যায় শোভা পাইতেছে এবং হর-শিরো-বিহারী সুধাকর হইতে সতত গলিত সুধাধারায় সুধার ন্যায় হইয়া যাইতেছে। মহাপ্রলয় উপস্থিত হইলে এই ত্রিজগৎ ধ্বংস হইয়া যায়। সেই ধ্বংস-ব্যাপারে কেবল যে পরমাণুময় ভস্মাবশেষ থাকে, সেই ভস্ম ইহাঁর দেহভূষণ। সুধাংশু অপেক্ষাও সুনির্ম্মল শুভ্রবর্ণ মালার ন্যায় সুনির্ম্মিত অস্থিপুঞ্জ ইহাঁর গলে রত্নের ন্যায় সুশোভন। যাহা সুধাকরের সুধায় বিধৌত, নীল-নীরদরূপ অম্বরে উদ্ভাসিত এবং তারকাবিন্দু-জালে বিচিত্রিত, তথাবিধ অম্বরই হরের পরিধেয় অম্বর। তুষারশুভ্র শ্মশান-ক্ষেত্র তাঁহার বহির্বাস গৃহ। সে গৃহের সর্ব্বত্র জম্বুকবধূগণ পক্ক মহা-মাংসরূপ আহারসামগ্রী লইয়া বিচরণশীল। মাতৃকাগণ তদীয় বন্ধু-স্থানীয়। ঐ মাতৃকাসকল নর-কপাল-মালায় বিভূষিত, রক্ত-বসা ও সুরাপানে প্রমত্ত এবং শবদেহের শিরা ও নাড়ীময় মাল্যদামে মণ্ডিত। কোমলাঙ্গ ভুজঙ্গকুল তাঁহার বলয়রূপে কল্পিত। উহারা মার্জ্জিত সুবর্ণের ন্যায় সমুজ্জ্বল এবং উহাদের মস্তকস্থ মণিপ্রভা চতুর্দ্দিকে প্রসর্পিত। সেই হরের এত বড় ঐশ্বর্য্য যে, তিনি দৃষ্টিপাত মাত্রেই গিরিবরকে দাহ করিতে সক্ষম। তাঁহার ভীষণ আচরণ অসুরবৃন্দের বিত্রাস-কর এবং উহা যেন

বিশ্বগ্রাসে লালসাবান্। তিনি যখন সমাধি-সাধনায় নিমগ্ন থাকেন, এ জগৎ তখন স্বস্থভাবে অবস্থান করে। আবার যখন তাঁহার সমাধি ভঙ্গ হয়, তখন তদীয় ইচ্ছানুযায়ী কিঞ্চিৎ কর-স্পন্দন মাত্রেই সমস্ত অসুরনিবাস ধূলিসাৎ হইয়া যায়। এই যে শৈলাদি আছে, ইহারা তাঁহার সমাধিসময়ে বুভুক্ষা ও পিপাসা-বিরহিত তদীয় ধ্যানমূর্ত্তিরূপেই প্রতিভাত হয়। ঐ শৈলাদি তখন রাগ-দ্বেষাদি দোষরাশি হইতে পরিমুক্ত এবং সরস হইয়াও নীরসাকারে পরিণত হইয়া থাকে। তাঁহার অনেক-সংখ্যক প্রমথ পরিচারক আছে। তাঁহাদের কাহারও কাহারও মস্তক ও হস্ত খুরের ন্যায় আকৃতিসম্পন্ন; কাহারও একখানি মাত্র হস্ত আছে, তাহাই দন্ত, মুখ ও উদরের কার্য্যে নিযুক্ত। কাহারও মুখ উষ্ট্রের ন্যায়, কাহারও ছাগলের ন্যায়, কাহারও সর্পের ন্যায় এবং কেহ কেহ বা ভল্লুকের ন্যায় মুখধারী। সেই হর ত্রিনয়ন; তাঁহার নয়নত্রয়ে মুখমণ্ডল উদ্ভাসমান। পূর্ব্বোক্ত প্রমথগণ ও মাতৃকামণ্ডল তাঁহার পরিবারস্থানীয়। এই চতুর্দ্দশ ভুবনে যত কিছু প্রাণী আছে, মাতৃকাগণ তাহাদিগকে ভক্ষণ করিতে নিরত হইলে শিবানুচর প্রমথবৃন্দ তাঁহাদিগের সম্মুখে প্রণত-ভাবে নৃত্য করিতে থাকে। সেই হরের ভবনে নিত্য অস্ট মাতৃকা বাস করেন। তাঁহাদের নাম জয়া, বিজয়া, জয়ন্তী, অপরাজিতা, সিদ্ধা, রক্তা, অলম্বুসা ও উৎপলা। এই মাতৃকাগণ অনেক সময় শৈলশিখরে, ব্যোমপথে, লোকালয়ে, গভীর গর্ত্তে, শ্মশানক্ষেত্রে অথবা দেহীদিগের দেহমধ্যেও বাস করিয়া থাকেন। এই সকল মাতৃদেবতার মধ্যে কেহ কেহ খরবদনা, এবং কেহ কেহ বা উষ্ট্রাননা। তাঁহারা সর্ব্বদাই মদিরার ন্যায় মেদ, মাংস, রক্ত ও বসাপানে নিরতা। শবশরীরের কর-চরণাদি লইয়া মালাকারে ধারণপূর্ব্বক ইহাঁরা দিগ্‌দিগন্তরে বিহার করিতে থাকেন। কেবল যে সেখানে এই অষ্ট মাতৃকাই বাস করেন, তাহা নহে; ঐরূপ আরও অনেক মাতৃকার তথায় বাস। সেই সকল মাতৃকার মধ্যে উল্লিখিত অষ্ট মাতৃকাই প্রধান নায়িকা। অন্যান্য মাতৃকারা এই অষ্ট মাতৃকার অনুচরী। আবার এই অনুচরী মাতৃকাদিগেরও অপরাপর অনেক অনুচরী বিদ্যমান।

হে মুনিপ্রবর! পূর্ব্বে যে অষ্ট প্রধান মাতৃকার কথা কহিয়াছি, তাঁহাদের মধ্যে অলম্বুসা নাম্নী মাতৃকাই বিশেষ বিখ্যাত। গরুড় যেমন বৈষ্ণবী—বিষ্ণুশক্তির বাহন, তেমনি চণ্ডনামে এক কাক তাঁহার বহন-কার্য্যে নিযুক্ত। ঐ কাক দেখিতে ইন্দ্রনীল শৈলবৎ এবং উহার চঞ্চুপুট যেন বজ্রের ন্যায় কঠিন। একদা রৌদ্র-কর্ম্মকারিণী অষ্টৈশ্বর্য্যশালিনী মাতৃকামণ্ডলী কোন এক কারণে আকাশপথে এক সঙ্গে সম্মিলিত হইলেন এবং চিত্তের একাগ্রতা নিবন্ধন পরম আত্মতত্ত্ব যাহাতে পরিস্ফুরিত হয়, এইরূপে সেখানে পানোৎসব করিতে লাগিলেন। তথায় তুম্বুরুনামক এক রুদ্রমূর্ত্তি আছে, তাহার বামদিকে থাকিয়া তাঁহারা আরাধনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ মাতৃকাগণ মদিরাপানে মত্ত হইয়া উঠিলেন। তাঁহাদের পরম হর্ষ উপস্থিত হইল। সেই অবস্থায় তাঁহারা জগদারাধ্য তুম্বুরু, রুদ্র ও ভৈরবাখ্য দেবের পূজা করিলেন এবং বিবিধ কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহাদের মধ্যে পরস্পর কথায় কথায় এইরূপ এক কথার উত্থাপন হইল যে, দেবদেব উমাপতি আমাদের মাননীয়; কিন্তু তিনি আমাদিগকে এত অবজ্ঞার চক্ষে দেখেন কেন? যাহা হউক, আমাদের যদি কিছু প্রভাব-প্রতিপত্তি থাকে, তবে আমরা তাহা তাঁহাকে দেখাই; তাহা হইলেই তিনি আর আমাদিগকে কখন অবজ্ঞাত বা অবমানিত করিবেন না। সেই মাতৃ-দেবীগণ এইরূপ কৃতনিশ্চয় হইলেন এবং সমন্ত্রক জলে প্রোক্ষণ করিয়া রুদ্রশক্তি উমার মুখমণ্ডল ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিবর্ণ করিয়া দিলেন। ইহাতেও তাঁহাদের ক্ষোভ মিটিল না। পরমা-সুন্দরী উমার কেশগুচ্ছ আগুল্ফ-লম্বিত। সেই উমাকে তাঁহারা মায়াবলে অপহরণ করিয়া নিজেদের মধ্যে আনয়ন করিলেন এবং অভিশাপ প্রদান-পূর্ব্বক তাঁহাকে ভক্ষ্য অন্নরূপে প্রস্তুত করিয়া ফেলিলেন। তাঁহারা উমারে ভক্ষ্য অন্ন করিয়া ঐ দিন নৃত্য ও গীতাদির অনুশীলনায় মহান্ উৎসব-ব্যাপার সমাধা করিলেন। তাঁহাদের আনন্দকোলাহল এত উচ্চ হইতেছিল যে, তাহাতে নভোমণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। সেই মাতৃকামণ্ডলীর মধ্য হইতে কোন কোন বিপুল-জঘনা মাতৃকা আনন্দ-ভরে স্বীয় দীর্ঘ দীর্ঘ অঙ্গ বিক্ষিপ্ত করিয়া করতালি সহকারে উচ্চ

হাস্য ও নানাবিধ অঙ্গবিকার প্রকটিত করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের উচ্চ হাস্য-সহকৃত কল্লোল-কোলাহলে গিরিকান্তার প্রতিধ্বনিত হইল। কোন কোন মাতৃকা অত্যধিক সুরাপানে মত্ত হইলেন এবং অত্যুচ্চ চিৎকারে গিরিগুহা ধ্বনিত করিতে লাগিলেন। পূর্ণচন্দ্র সমুদিত হইলে সাগরবারি তরঙ্গসঙ্কুল হয়, সেই তরঙ্গিত জলরাশির ন্যায় কোন কোন মাতৃকা গভীর গর্জ্জন করিতে লাগিলেন এবং কেহ কেহ রক্ত মাংস ও বসা প্রভৃতি দ্বারা স্ব স্ব হৃষ্টপুষ্ট কর-চরণ ও মস্তকাদি চর্চ্চিত করত আনন্দে ঘুরঘুর-নাদে সুরাপান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

তখন সেই দেবীগণ এইরূপে উন্মাদ সহকারে পান করিতে লাগিলেন, উচ্চ চিৎকারে গগন প্রতিধ্বনিত করিলেন, দ্রুতপদে গমন করিতে লাগিলেন, উচ্চস্বরে কত কি কথা কহিতে লাগিলেন, হাস্য করিলেন, নৃত্য করিলেন, সুস্বাদু মাংস ভোজন করিতে লাগিলেন, নৃত্য করিতে করিতে ভূপৃষ্ঠে পতিত হইলেন, একে অপরের মুখে খাদ্য বস্তু অর্পণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে উদ্দাম ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইয়া ত্রিভুবন-ব্যাপার যেন পরিবর্ত্তিত করিয়া তুলিলেন।

অষ্টদশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৮ ॥

ঊনবিংশ সর্গ।

ভুশুণ্ড কহিলেন,—হে মুনে! মাতৃকাগণের তথাবিধ উৎসব-ব্যাপার প্রবৃত্ত হইলে, তাঁহাদের উত্তম উত্তম বাহনসমূহও প্রমত্ত হইয়া উঠিল। তাহারা হাস্য করিতে লাগিল, নৃত্য করিতে লাগিল, অজস্র অসৃক-পানে প্রবৃত্ত হইল। তাহাদিগের মধ্যে ব্রাহ্মীর বাহন হংসীগণ এবং অলম্বুসার বাহন সেই চণ্ডকাক, ইহারা পানে মত্ত হইয়া পরস্পর নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল। সাগরতীরে তাহাদের এইরূপ নৃত্য-পান ব্যাপার চলিতে লাগিল। নৃত্য-পান-রতা হংসীগণের তখন কামভাবের উদয় হইল। কামোন্মত্ত হংসীগণ একে একে সেই কাকের সহিত রমণ করিতে চাহিল।

সেই চণ্ড কাক তখন কামাতুরা হংসীগণের প্রিয়তম-পদে অধিষ্ঠিত হইয়া তাহাদের পরস্পরের ইচ্ছামত রমণ করিল। কাকের সহিত সঙ্গমে সমধিক পরিতুষ্ট হইয়া সেই হংসীগণ সকলেই গর্ভ ধারণ করিল।

এদিকে মাতৃকারা তাৎকালিক নৃত্য ব্যাপার সমাধা করিয়া প্রশান্ত-চিত্তে রুদ্রদেবের সমীপে উপস্থিত হইলেন। পরে সেই মহামায়াময়ী দেবীগণ শূলপাণির প্রিয়পত্নী উমাকে যে ভক্ষ্য সামগ্রীরূপে প্রস্তুত করিয়া ছিলেন, তাহা আনিয়া সেই শূলপাণিকেই অর্পণ করিলেন। তখন ভগবান্ চন্দ্রশেখর বুঝিলেন যে, ঐ সকল মাতৃকারা তাঁহার প্রিয়তমাকেই তদীয় ভোজনার্থ আনিয়া দিয়াছেন। ইহা বুঝিয়া তিনি মাতৃকাগণের উপর ক্রুদ্ধ হইলেন। মাতৃকারা দেখিলেন, হর তাঁহাদের প্রতি ক্রোধ করিয়াছেন। তদ্দর্শনে তাঁহারা নিজ নিজ অঙ্গ প্রদানপূর্ব্বক পার্ব্বতীকে পুনরায় উৎপাদন করিলেন এবং ভগবান্ চন্দ্রশেখরের সহিত আবার তাঁহার বিবাহ দিলেন। অনন্তর সেই মাতৃকামণ্ডলী, স্বয়ং মহাদেব ও তাঁহার অপরাপর পরিজন, সকলেই সন্তুষ্ট-মনে নিজ নিজ স্থানে প্রস্থান করিলেন।

হে মুনীন্দ্র! সেই যে ব্রহ্মীবাহন হংসীগণের কথা কহিয়াছি, সেই সকল হংসী পূর্ব্বোক্তরূপে গর্ভিণী হইয়া দেবী ব্রহ্মাণীর নিকট গমন করিল এবং তাহাদের গর্ভ-ঘটনাদি যাবতীয় বৃত্তান্ত যথাযথ বর্ণন করিল। তৎশ্রবণে ব্রাহ্মী দেবী তাহাদিগকে কহিলেন,—হে বৎসাগণ! তোমরা গর্ভ ধারণ করিয়াছ, মদীয় রথবহনকর্ম্মে তোমাদের অক্ষমতা হইয়াছে; কাজেই তোমরা সম্প্রতি স্বাধীনভাবে বিচরণ কর। আমার রথবহন-কার্য্য হইতে তোমাদিগকে অবসর প্রদান করিলাম। ব্রাহ্মী দেবী দয়া-পরবশ হইয়া গর্ভভার-মন্থরা হংসীদিগকে এই কথা কহিলেন এবং স্বয়ং নির্ব্বিকল্প সমাধি অবলম্বন করিয়া যথাসুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

হে মুনিবর! তখন গর্ভভরে অলসগমনা হংসীরা বিষ্ণুর নাভি-কমলের অন্তে ব্রাহ্ম-কমলাকরে বিচরণ করিতে লাগিল। অনন্তর সেই হংসীগণ যখন পূর্ণগর্ভা হইল, তখন লতাকৃত অঙ্কুরোৎপাদনের ন্যায় তাহারা একে একে বিষ্ণুর নাভিকমল-দলে অণ্ড প্রসব করিল। প্রত্যেকে

তিন তিনটী করিয়া সর্ব্বসমেত একবিংশতিটী অণ্ড—সেই হংসীরা প্রসব করিল। যথাসময়ে সেই অণ্ডগুলি ব্রহ্মাণ্ডবৎ দ্বিধা বিভক্ত হইল।

হে মুনে! সেই দ্বিধা বিভক্ত অণ্ডসমূহ হইতে আমাদের জন্ম হইয়াছে। আমরা সেই চণ্ড কাকের পুত্র বলিয়া কাকই হইয়াছি। আমাদের সংখ্যা হইল একবিংশতি। ভগবান্ বিষ্ণুর নাভিকমল-দলেই আমরা জন্ম লইলাম। এবং সেইখানেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলাম। যথাকালে আমাদের পক্ষোদ্গম হইল। আমরা আকাশে উড়িতে অভ্যাস করিলাম।

এই সময় ভগবতী ব্রাহ্মী দেবী সমাধিব্যাপারে নিরতা ছিলেন। আমরা আমাদের নিজ নিজ মাতার সহিত একযোগে বহুদিন ধরিয়া সেই ভগবতী ব্রাহ্মী দেবীর আরাধনা করিলাম। হে মুনে! আমাদের আরাধনার ফল ফলিল। ভগবতী প্রসন্ন হইলেন এবং অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগকে মুক্ত করিয়া দিলেন। তারপর আমরা নিশ্চয় করিলাম যে, শান্তমনে ধ্যানা-বলম্বনে একান্তে আমরা অবস্থান করিব। এইরূপ নিশ্চয় করিয়া পিতা চণ্ড-কাকের নিকটে গিয়া উপস্থিত হইলাম। সেখানে উপস্থিত হইবামাত্র পিতা আমাদিগকে আলিঙ্গন দিলেন। অতঃপর দেবী অলম্বুসাকে আমরা পূজা দিলাম। দেবী আমাদের প্রতি প্রসন্ন-নয়নে দৃষ্টিপাত করিলেন। আমরা সংযত হইয়া তথায় অবস্থান করিতে লাগিলাম।

এক দিন পিতা চণ্ড আমাদিগকে কহিলেন,—হে আমার পুত্রগণ! এই সংসারজাল অনন্ত বাসনাসূত্রে গ্রথিত; তোমরা কি ইহা ছেদন করিয়া আসিতে পারিয়াছ? যদি ইহাতে অপারগ হইয়া থাক, তবে যাহাতে তোমরা জ্ঞানপারগ হইতে পার, আমি এই ভৃত্যবৎসলা ভগবতীর নিকট এইরূপই প্রার্থনা জানাই। আমরা [কাকদল] কহিলাম,—হে পিতঃ! আমরা ব্রাহ্মী দেবীর কৃপায় জ্ঞেয় তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইয়াছি। এক্ষণে আমাদের এইমাত্র আকাঙ্ক্ষা যে, কোন একটা নির্জ্জন স্থানে একাগ্রে আমরা বসবাস করি।

চণ্ড কহিলেন,—বৎসগণ! শ্রবণ কর, সুমেরু নামে এক সমুন্নত সুবিপুল ভূধর আছে। উহা সর্ব্ববিধ রত্নের আকর এবং সমুদায় দেব-বৃন্দের আবাসস্থল। ঐ ভূধর নানাজাতীয় জীববৃন্দরূপ পরিবারসমূহে

পরিপূর্ণ। এই যে ব্রহ্মাণ্ডরূপ মহাগৃহ, ইহা চন্দ্র ও সূর্য্যরূপ দীপালোকে উদ্ভাসিত। ঐ সুমেরুগিরি এই মহাগৃহের মধ্যগত হৈম স্তম্ভ-নিভ। উহাকে বসুধার একটা ঊর্দ্ধোন্নমিত বাহু বলিয়াও অনুমান করা যায়। উহার উপরিভাগে সুবর্ণময় চন্দ্রাকার কত কিম্পুরুষাদি বর্গগণ বিরাজমান। রত্নময় শিখরগুলি উহার অঙ্গুলিদল এবং চারি দিকে যে সকল তরঙ্গসঙ্কুল সাগর ও দ্বীপপুঞ্জ আছে, সে সকল উহার ধ্বনিত বলয়াকারে প্রতীয়মান। সপ্ত কুলাচল যেন সামন্তবর্গ এবং জম্বুদ্বীপ যেন মহার্হ আসন। ঐ মেরু-মহীধর তন্মধ্যে বিরাজমান। ঐ মেরুগিরি যেন রাজা হইয়া শৈল-সমিতির প্রতি চন্দ্র-সূর্য্যরূপ দৃষ্টি অর্পণ করিতেছে। ঐ মেরু-মহীপতি তারকারাজিরূপ মালতীমালায় মণ্ডিত আছে এবং দিগ্‌দশা-সম্পন্ন অম্বর উহার অম্বরবৎ প্রতিভাত হইতেছে। ইন্দ্রাদি দেবগণ ঐ গিরিরাজের অলঙ্কারস্থানীয় হইয়া বিরাজ করিতেছেন। রাজার ন্যায় উহার বহু-সংখ্যক নাগ আছে। রম্যাকৃতি দিগঙ্গনাগণ পুরভূষণে ভূষিত হইয়া চারিদিক্ হইতে সলিলশীকরবর্ষী অম্বরাকার চামর লইয়া উহার ব্যজন-কার্য্যে নিরত রহিয়াছে। অধোভূমণ্ডলে ঐ মেরুভূভৃতের ষোড়শ সহস্র যোজনব্যাপী পাদ সকল বিরাজ করিতেছে। কত নাগ, কত অসুর ও কত উরগবৃন্দ ঐ পাদতলের আশ্রয়ে অবস্থিত আছে। ঐ সুমেরুশৈলের অবয়ব অশীতি সহস্র যোজন ব্যাপিয়া বিরাজ করিতেছে। রবি ও শশী উহার লোচনদ্বয়বৎ প্রতিভাত হইতেছে। সুর, গন্ধর্ব্ব ও কিন্নরবৃন্দ ঐ শৈলরাজের সেবা করিতেছে। সমৃদ্ধি-সম্পন্ন গৃহপতির গৃহে বহু বন্ধু-বান্ধব যেমন জীবিকা বিধান করে, তেমনি চতুর্দ্দশবিধ জীব ঐ সুমেরু-গিরির আশ্রয়ে অবস্থিত রহিয়াছে। ঐ গিরির বিস্তার পরিমাণ এত যে, উহার অধিবাসী জীবগণ পরস্পর পরস্পরের বাস-গৃহাদি দর্শনে অক্ষম।

ঐ সুমেরু শৈলের ঈশাণ কোনে দ্বিতীয় দিবাকরের ন্যায় এক পদ্মরাগ-মণিময় বিশাল শৃঙ্গ বিরাজ করিতেছে। উহার উপরিভাগে এক মহান্ কল্পবৃক্ষ আছে। ঐ কল্পবৃক্ষ বিবিধ ভূতবৃন্দে পরিপূর্ণ। উহা মেরু-শৃঙ্গরূপ দর্পণে সমস্ত জগতের প্রতিবিম্ববৎ প্রতীত। ঐ বৃক্ষের

দক্ষিণ দিকে একটা স্কন্ধ আছে। তাহার শাখা সুবর্ণ-পল্লবে পরিব্যাপ্ত এবং রত্নস্তবকে উদ্ভাসিত। ঐ শাখা চন্দ্র-বিম্বসম ফলরাজি ধারণ করিয়া অবস্থিত।

বৎসগণ! আমি সেই শাখার উপর এক মণিময় কুলায় নির্ম্মাণ করিয়াছি। আমার আরাধ্য অলম্বুসা দেবী যখন ধ্যানমগ্ন হইয়া অবস্থান করেন, তখন আমি আমার ঐ নিজ-নির্ম্মিত নীড়ে গিয়া বিশ্রামসুখ সম্ভোগ করিতে থাকি। ঐ নীড়দেশ রত্নময় পুষ্পস্তবকে সমাচ্ছন্ন এবং সুধাময় ফলপুঞ্জে পরিপূর্ণ। উহার যে অলিন্দভূমি আছে, তাহা চিন্তামণিময় শলাকায় সুনির্ম্মিত। ঐ নীড়ের অভ্যন্তরভাগ সুশীতল ও কুসুমসমূহে সমাকীর্ণ। স্বর্গীয় দেবগণের পক্ষেও ঐ রম্য নীড় সুদুর্গম। তোমরা ঐ স্থানে গমন কর। ঐ নীড়ে গিয়া অবস্থান করিলে ভোগ ও মোক্ষ উভয়ই তোমাদের অনায়াসে করায়ত্ত হইবে।

পিতা চণ্ড কাক এই বলিয়া আমাদিগকে তখন চুম্বন ও আলিঙ্গন দান করিলেন এবং দেবী অলম্বুসার জন্য যে আমিষ আহৃত হইয়াছিল, আমাদিগকে তাহা অর্পণ করিলেন। আমরা সেই পিতৃদত্ত আমিষ ভক্ষণ করিলাম; দেবীর চরণ-যুগল বন্দনা করিলাম এবং পিতৃচরণে প্রণত হইলাম। অতঃপর অলম্বুসা দেবীর আশ্রমস্থল সেই বিন্ধ্যকচ্ছ হইতে দ্রুতপদে আমরা প্রস্থান করিলাম। ক্রমে আকাশে উত্থিত হইয়া মেঘ-মণ্ডল ভেদ করত পবনস্কন্ধে উপস্থিত হইলাম। সেখানে যত গগনচারী ছিলেন, তাঁহাদিগকে বন্দনা করিয়া সৌর লোকে উপনীত হইলাম।

হে মুনীন্দ্র! তদনন্তর আমরা সৌর লোক হইতে স্বর্গলোকে উপস্থিত হইলাম। পরে সেই স্বর্গলোক হইতেও ঊর্দ্ধে ব্রহ্মলোকে গমন করিলাম। সেখানে গিয়া জননী হংসী এবং ব্রাহ্মী দেবীকে প্রণিপাত করিয়া পিতৃদেবের কথিত যাবতীয় ঘটনা তাঁহাদের নিকট বিবৃত করিলাম। তাঁহারা উভয়েই স্নেহভরে আমাদিগকে আলিঙ্গন করিলেন এবং যথাস্থানে যাইবার জন্য অনুমতি দিলেন। তাঁহাদের অনুমতি প্রাপ্তির পর আমরা তাঁহাদিগকে নমস্কারপূর্ব্বক সেই ব্রহ্মলোক হইতে বহির্গত হইলাম। হে মুনে! এইবার আমরা সূর্য্যবৎ সমুজ্জ্বল লোকপালপুরী উল্লঙ্ঘন-

পূর্ব্বক পবনস্কন্ধে আরোহণ করিলাম এবং আকাশপথে আগমনপূর্ব্বক এই কল্প-পাদপ প্রাপ্ত হইলাম। এখানে আসিয়া অত্রত্য নিজ নীড়ে প্রবেশ করিয়া মৌনাবলম্বনে অবস্থান করিতেছি। হে মুনে! আমাদের সর্ব্ববিধ বাধাবিঘ্ন বিদূরিত হইয়াছে।

হে মহানুভব! যেরূপে আমরা জন্মিয়াছি, আমাদের তত্ত্ববোধ লাভ ঘটিয়াছে, যেরূপে উপশান্তবুদ্ধি হইয়া এখানে অবস্থান করিতেছি, এতৎ-সমস্তই আমি আপনার নিকট অবিকল কীর্ত্তন করিলাম। এখন আপনার যদি আরও কিছু প্রষ্টব্য থাকে, বলিতে পারেন। আমি তাহার যথাসাধ্য উত্তর দানে প্রস্তুত রহিয়াছি।

ঊনবিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৯ ॥

বিংশ সর্গ।

ভুশুণ্ড কহিলেন,—হে মুনিবর! পুরাকল্পে এ জগতের যেমন যেমন অবস্থা ও যে যেরূপ সন্নিবেশাদি ছিল, এই বর্ত্তমান কল্পেও ইহা তেমনি-ভাবে আছে; তৎসমুদায়ের কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হয় নাই। যদিও আমি অতি পূর্ব্বতন কল্পে জন্মিয়াছি, এবং বহু প্রাচীনতম কল্পের কল্প-বৃক্ষস্থ কুলায়ে অধিষ্ঠিত আছি, তথাচ পূর্ব্বতন অভ্যাসবশে পূর্ব্বেকার ঘটনা এবং পূর্ব্বকল্পীয় কল্পবৃক্ষের কুলায় অধুনাতন কল্পবৎ বর্ণন করিলাম। এরূপভাবে বর্ণন করিবার কারণ এই যে, এই বর্ত্তমান কল্পের যাবতীয় ব্যাপারই আমি পূর্ব্বকল্পবৎ অবলোকন করিতেছি।

হে মুনে! অদ্য আমার চিরসঞ্চিত পুণ্যপুঞ্জের ফল ফলিয়াছে। আপনাকে যে এখন অনায়াসে সাক্ষাৎ করিতে পারিলাম, ইহাই সেই পুণ্যপুঞ্জের পরিণতি। আপনার দর্শনলাভ হইবামাত্র এই নীড়, এই শাখা, এই শাখী, এই আমি, এই সকলই অদ্য পবিত্র হইল। হে বিভো! আপনি এক্ষণে এই বিহগার্পিত পাদ্য অর্ঘ্য গ্রহণ করিয়া আমায় একান্ত পবিত্র করুন এবং আপনার আরও যাহা বক্তব্য আছে, সত্বর আদেশ করিয়া আমায় বাধিত করুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! স্বয়ং ভুশুণ্ড বিহঙ্গম এই কথা কহিয়া পুনরায় আমায় পাদ্য অর্ঘ্য অর্পণ করিলে আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, —হে বিহঙ্গরাজ! আপনার তথাবিধ প্রখ্যাতবীর্য্য মহাবুদ্ধি-সম্পন্ন ভ্রাতৃগণকে এখানে দেখিতে পাইতেছি না কেন? একমাত্র আপনাকেই এস্থানে দেখিতেছি, ইহার কারণ কি? আপনার ভ্রাতৃবৃন্দ কোথায় আছেন, শুনিতে ইচ্ছা করি।

ভুশুণ্ড কহিলেন,—হে মুনে! আমরা এখানে বহুকাল অবস্থান করিতেছি। হে অনঘ! এক একটী দিনের ন্যায় আমাদের সমক্ষে একে একে কত যুগ যে চলিয়া গিয়াছে, তাহা ইয়ত্তা করা যায় না। আমার যে সকল অনুজ ছিল, এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে একে একে তাহারা তৃণের ন্যায় তুচ্ছ দেহ পরিত্যাগ করিয়া পরম মঙ্গলময় পরমপদে প্রলীন হইয়াছে। যিনি যতই দীর্ঘায়ু হউন, যত বড় বলশালীই হউন, কিম্বা যতই মহান্ বা তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি হউন, অলক্ষিতমূর্ত্তি কালের কবলে সকলকেই পতিত হইতে হয়।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—বৎস ভুশুণ্ড! যখন ভীষণ প্রলয়কাল আসিয়া উপস্থিত হয়, যৎকালে বাতস্কন্ধাদি প্রবল প্রলয়-বাত্যা স্কন্ধোপরি দ্বাদশ দিবাকর ও নিশাকরকে লইয়া অনবরত তীব্রবেগে বহিতে থাকে, তখন তোমার কোনও রূপ ক্লেশ বোধ হয় না কি? যুগপৎ সমুদিত দ্বাদশ দিবা-করের অতি প্রখর কিরণপুঞ্জ যখন উদয় ও অস্তাচলগত বনব্যূহ দগ্ধ করিয়া তোমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হয়, হে তাত! তখন কি তুমি খিন্ন হও না? চন্দ্রের অতি শীতল কর-নিকর যখন জলরাশিকেও পাষাণবৎ কঠিন করিয়া করকাপাতে প্রবৃত্ত হয়, হে তাত! তখন তোমার কি কোনই ক্লেশানুভব হয় না? বৎস! যৎকালে কল্পকালীন জীমূতবৃন্দ এই মেরুশৃঙ্গে থাকিয়াও পরশুধরা-হর কঠোর শিলাখণ্ডের ন্যায় অজস্র নীহারপুঞ্জ বর্ষণ করিতে থাকে, তখন তোমার কি কোনই খেদ উপস্থিত হয় না? যখন প্রলয়-সমাগমে বিষম বিশ্ব-বিক্ষোভ প্রাদুর্ভূত হয়, তখন এই অতীব উন্নত কল্পবৃক্ষই বা কেমন করিয়া না ক্ষুব্ধ হইয়া থাকে?

ভুশুণ্ড কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! যাহারা অবলম্বনহীন শূন্যপদে

অবস্থান করে, সকলেই যাহাদিগকে অবজ্ঞা করিয়া থাকে, তথাবিধ বিহগদিগের জীবিকার বিষয় আপনাকে আর বিশেষ করিয়া বলিব কি? এ হেন জীবিকা সর্ব্ববিধ প্রাণীর মধ্যে বড়ই তুচ্ছ বলিয়া গণ্য। এরূপ জীবিকা বোধ হয়, অপর কোন প্রাণীরই আর নাই। বিধাতা বুঝি, মাত্র বিহঙ্গজাতির জন্যই বিজন বিপিনে, শূন্য দেশে, এরূপ কষ্টকরী জীবিকার কল্পনা করিয়াছেন। হে প্রভো! ঈদৃশ জঘন্য জাতিতে সমুৎপন্ন আশাপাশ-নিবদ্ধ চিরজীবী বিহঙ্গদিগের বিশোকিতার কথা আর অধিক কি কহিব? কিন্তু ভগবন্! বলিয়া রাখি, আমরা নিত্যই আত্ম-সন্তোষ প্রাপ্ত আছি; তাই কদাচ নিঃস্বরূপ পরমপদে সমুৎপন্ন বিবিধ বিভ্রমে আমরা মুহ্যমান হই না; ফল কথা, আপাত-দৃষ্টিতে ঐ প্রকার যতই বিঘ্ন বিপত্তি উপস্থিত হউক, তাহাতে আমাদের কোনই ক্লেশানুভূতি নাই।

হে ব্রহ্মন্! আমরা সর্ব্বদাই স্ব-স্বভাব মাত্রে সন্তুষ্ট থাকি। এই জন্য উল্লিখিতরূপ যতই কষ্ট-চেষ্টা থাকুক, তাহাতে আমাদের অবস্থিতি নির্লিপ্তভাবেই আছে। সে কষ্টজাল হইতে আমরা নির্ম্মুক্ত হইয়া আমাদের স্ব স্বভবনে স-সন্তোষ-ভাবেই কেবল কালাতিপাত করি। আমরা বাঁচিয়া থাকিয়া দেহের ঐহিক বা আমুষ্মিক কোন কর্ম্ম করিবারই বাসনা পোষণ করি না, কিম্বা মরিয়া গিয়া দেহনাশ করিবারও ইচ্ছা আমাদের নাই। আমরা এখন যেমন সর্ব্বচেষ্টা-বিরহিত হইয়া নিত্যবুদ্ধ পূর্ণানন্দ আত্মস্বরূপে আছি, উত্তরকালেও চিরতরে এমনই ভাবে রহিব। আমরা লোকের জনন-মরণাদি বিবিধ দশা-পরম্পরা দর্শন করিয়াছি এবং বিস্তর দৃষ্টান্ত আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছে। মনে আমাদের কিছুমাত্র চাঞ্চল্য নাই; মন একেবারেই চঞ্চলভাব পরিহার করিয়াছে। যাহাতে কোন কালের জন্য কোনই পরিতাপ নাই, সতত তথাবিধ আত্মা-লোকে আলোকিত হইয়া নিত্য আমরা এই কল্পবৃক্ষোপরি অবস্থান করিতেছি এবং সূক্ষ্ম কালগতি প্রত্যক্ষ করিয়া যাইতেছি। আমরা এই যে কল্প-লতা-গৃহে অবস্থান করিতেছি, ইহা রত্নরাজি দ্বারা নিত্য প্রকাশময়; কাজেই দিবারাত্রি প্রভৃতি কালবিভাগ এখানে লক্ষিত না হইলেও আমাদের

প্রাণ ও অপানবায়ুর প্রবাহ দ্বারা কল্প বা কালগতি আমরা সম্পূর্ণভাবেই বুঝিতে পারিতেছি। এই বিশাল বিস্তৃত পর্ব্বত; যদিও ইহার উপর থাকিয়া দিবারাত্রি বিভাগ বুঝিয়া উঠা যায় না, তথাচ স্ব স্ব বুদ্ধিবলে কাল-ক্রম আমাদের অজ্ঞাত নাই।

হে মুনে! তত্ত্বজ্ঞানের উদয়ে মন আমার সার ও অসার পরিচ্ছেদ হইতে পরিমুক্ত ও বিশ্রান্ত হইয়াছে। চাঞ্চল্য ইহার কিছুমাত্র নাই। ইহা সর্ব্বদাই শান্ত ও স্থিরভাবে অবস্থিত। কাজেই ক্লেশ বলিয়া আমার কোন কিছুই নাই। যেমন ভূপৃষ্ঠস্থ প্রাকৃত কাক একটুকু মাত্র শব্দ হইলেই ভয়ে বিহ্বল হইয়া পড়ে, তেমনি এই যে সংসার-ব্যাপার-জনিত অসত্য আশাপাশ, ইহাতে আমি বদ্ধ বা অভিভূত হই না। আমাদের বুদ্ধি পরম উপশমধর্ম্মিণী ও পরমালোকে শীতলতাময়ী; এবম্বিধ বুদ্ধি দ্বারা আমরা ধৈর্য্যশীল হইয়া এই জগৎকে মায়িক বলিয়া অবলোকন করিতে থাকি। ইহাতে আমাদের সত্যতা বোধ নাই; কাজেই ক্লেশও কিছুই নাই।

হে মহাবুদ্ধে! যেরূপ ভয়াবহ ক্লেশদশাই আপতিত হউক, আমাদের কিছুতেই কিছু আসিয়া যায় না; আমরা অচল ও অটলভাবে স্বচ্ছ শিলাখণ্ডের ন্যায়ই অবস্থান করিতে থাকি। এই জাগতিক সুখ-দুঃখ-দশা আপাতমধুর ও ক্ষণভঙ্গুর; ইহা কত বার আমাদের উপর পতিত হইতেছে ও কত বার চলিয়া যাইতেছে, ইহাতে আমাদের ক্লেশ বোধ কিছুমাত্রই হইতেছে না। হে পাবন! এই ভূতবৃন্দ অনবরত যাতায়াত করিতে থাকুক কিম্বা কিছুই না করুক, ইহাতে আমাদের ভয়ের সম্ভাবনা কি আছে? এই ভূতপরম্পরারূপিণী তটিনী কাল-সাগরে ধাবিত হইতেছে, ইহাতে আমাদের ক্ষতিবৃদ্ধি কি আছে? আমরা সংসার-সরিতের তটদেশে বসিয়া আছি, কিছুই আদান বা বিসর্জ্জন করিতেছি না; একই ভাবে রহিয়াছি। আমরা সাবধানতার সহিত সংসারে বিচরণ করি; এই জন্য আমরা কোমল পদ এবং তত্ত্ব-দর্শন বলে এ সংসারের উচ্ছেদ সাধন করিয়াছি; এই জন্য আমরা কঠিন। এইরূপ কোমল ও কঠিনভাবেই এই কল্পবৃক্ষে আমাদের অবস্থিতি। আপনাদের শোক

নাই, ভয় নাই, ক্লেশ নাই, আপনারা সর্ব্বদাই সন্তুষ্ট, ভবদ্বিধ মহাপুরুষ-গণের প্রসাদগুণেই আমরা সর্ব্ব সন্তাপহীন হইয়াছি।

হে ভগবন্! অস্মাদৃশ ব্যক্তির মন তত্ত্বার্থ পরিজ্ঞাত হইয়াছে; কেবল ব্যবহারিক কার্য্য সম্পাদনের জন্যই নানাদিকে ধাবিত হয়—হইলেও উহা বিষয়ানুরঞ্জনায় কখনই বশীভূত হয় না। আমাদের আত্মার বিকার নাই, ক্ষোভ নাই, তাহা উপশান্ত হইয়াছে। আমরা প্রবুদ্ধ হইয়াছি। আমাদের অন্তরে চিৎলহরী পরিস্ফুরিত হওয়ায় পূর্ণ চন্দ্রোদয়ে অম্ভোধির ন্যায় আমরা পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছি।

হে ব্রহ্মন্! যে পরমোত্তম পীযূষ পাইবার নিমিত্ত অনেক আয়াস স্বীকার করিয়া মন্দরাচল দ্বারা ক্ষীরাব্ধিকে মন্থন করা হইয়াছিল, এখানে অদ্য ভবদীয় শুভাগমনেই আমরা সেই পীযূষের স্বাদ পাইয়া যার পর নাই পরিতৃপ্ত হইয়াছি। কেন না, আমি মনে করি, যিনি সর্ব্ববিধ কামনা পরিহার করিয়াছেন, এবং তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া কৃতকৃত্য হইয়াছেন, তথাবিধ সাধু পুরুষের সঙ্গ লাভ ব্যতীত আত্মার কল্যাণ লাভ আর কিছুতেই তেমন ঘটিবার নয়। ভোগসমূহ আপাতত রমণীয়; তাহাতে এমন কি সার আছে, যাহার জন্য লালায়িত হইতে হইবে? আমি মনে করি, এক মাত্র সাধুসঙ্গই চিন্তামণি; এই চিন্তামণি হইতেই যে কিছু সার প্রাপ্ত হওয়া যায়।

হে মুনিবর! ভবদীয় বাক্য—স্নিগ্ধ, গম্ভীর, কোমল, উদার ও মধুর। আমার প্রতীতি হয়, আপনি একাই এই ত্রৈলোক্যরূপ পদ্মকোষে ষট্পদের ন্যায় বিরাজ করিতেছেন। পরমাত্মতত্ত্ব কি, তাহা যদিও আমি পূর্ব্বেই পরিজ্ঞাত হইয়াছি; কিন্তু এখন আমার ধারণা হইতেছে যে, যেন আপনার সাক্ষাৎকার লাভেই মদীয় সর্ব্ববিধ দুষ্কৃতি ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া গেল; আমি আত্মতত্ত্ব সম্যক্ সম্পরিজ্ঞাত হইলাম। হে সাধু-প্রবর! অদ্য আমি সাধুসঙ্গ লাভ করিলাম। আমার জন্ম সফল হইল। বস্তুতঃ সাধুসঙ্গই যে সর্ব্বভয়-হর, ইহাতে সন্দেহ মাত্র নাই।

বিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২০ ॥

একবিংশ সর্গ।

ভুশুণ্ড কহিলেন,—হে মুনে। যৎকালে ভীষণ প্রলয়-ক্ষোভ সংঘটিত হয় বা দারুণ বাত্যা বহিতে থাকে, তখনও এ কল্পবৃক্ষ অটল-ভাবেই অবস্থান করে; কদাচ ইহার কম্পন অনুভব হয় না। হে সাধুবর! ভিন্ন ভিন্ন লোকে যে সকল প্রাণী বাস করে, এই কল্পবৃক্ষ তাহাদিগের অগম্য; সুতরাং বলিতে হইবে, বিনা বাধায় এখানে আমরা সুখেই অবস্থান করিতেছি। যৎকালে অসুর হিরণ্যাক্ষ এই সপ্তদ্বীপ-সমেতা বসুধাকে হরণ করিয়া লইয়াছিল, এই বৃক্ষের কম্পন তখনও কিছুই হয় নাই। যখন বরাহদেব পুনরায় ধরা প্রতিষ্ঠা করেন, তখন এই অদ্রিবর সুমেরুগিরি দোলায়মান হইলেও অত্রত্য এই কল্পবৃক্ষ কিছু মাত্র কম্পিত হয় নাই। ভগবান্ বিষ্ণু চতুর্ভুজধারী; তিনি তাঁহার এক দিকের দুই বাহু প্রসারিত করিয়া সুমেরুকে যখন ধরিয়াছিলেন এবং অপর দিকের দুই বাহু দ্বারা মন্দরগিরিকে উত্তোলিত করিয়াছিলেন, তখনকার সেই ঘোরতর সংক্ষোভ-সময়েও এই বৃক্ষ কাঁপে নাই। যৎকালে সুর ও অসুর-বর্গের মধ্যে ভীষণ সমরানল জ্বলিয়া উঠে, সে দারুণ সংক্ষোভে চন্দ্র ও সূর্য্যমণ্ডল ভূপতিত হয়, এই জগন্মণ্ডল অতিমাত্র ক্ষুব্ধ হইয়া পড়ে, তখনকার সেই ঘোর দুর্দ্দিনেও এ বৃক্ষ কম্পিত-কায় হয় নাই। যখন দারুণ উৎপাত-বায়ু প্রবাহিত হওয়ায় বৃহৎ বৃহৎ ভূভৃতের অপর্য্যাপ্ত শিলাখণ্ড সকল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়াছিল এবং এই সুমেরুশৈলেরও অপরাপর পাদপ-শ্রেণী উন্মূলিত হইয়া পড়িয়াছিল, তখনও এ কল্পদ্রুম কম্পমান হয় নাই। ক্ষীরার্ণবের গর্ভগত মন্দরাদ্রি কম্পিত হইতে থাকিলে তদীয় কন্দর-মারুতে যৎকালে প্রলয়োদিত বারিদবৃন্দ বিচলিত হইয়াছিল, এই তরু তখনও কিঞ্চিৎ কম্পিত হয় নাই। যখন কালনেমির ভুজাভ্যন্তরে থাকিয়া এই সুমেরুগিরি উন্মূলিতপ্রায় হইয়াছিল, তখনও এই কল্পবৃক্ষ একটুকুও কম্পিত হয় নাই। সুধাহরণের নিমিত্ত অসুরগণ সহ দেবগণের যখন যুদ্ধ হয়, তখন বিহঙ্গমরাজ গরুড়ের পক্ষ-পবনে নভোমণ্ডলচারী সিদ্ধ-

সমূহকেও স্থানভ্রষ্ট হইতে হইয়াছিল; কিন্তু তখনকার সেই ঘোর দুর্দ্দিনেও এই বৃক্ষ পতিত হয় নাই; ইহা যেমন অটল, তেমনিই ছিল। যখন বিহঙ্গবর গরুড় জন্ম গ্রহণপূর্ব্বক সমুড্ডীন হইয়াছিল, তখন এই ধরামণ্ডল মগ্ন হইবার উপক্রম করিলে সঙ্কর্ষণ রুদ্রদেব অনন্ত মূর্ত্তি ধারণ-পূর্ব্বক এই ধরার ভার গ্রহণে নিযুক্ত হন। তখনকার সেই ঘোর বিক্ষোভ-দিনেও এই বৃক্ষ কাঁপে নাই। যখন শেষ-মূর্ত্তিধর ভগবান্ সঙ্কর্ষণ সহস্র ফণা বিস্তার করিয়া সকল শৈল, সাগর ও নিখিল প্রাণীর অসহনীয় তীব্র কল্পানল-শিখা সমুদ্গীর্ণ করেন, তখনকার সেই দারুণ দিনেও এই কল্পবৃক্ষ কিছুমাত্র কম্পিত হয় না।

হে মুনিপ্রবর! এই প্রকার ভীষণ প্রলয়ের দিনেও এই বৃক্ষবর যখন অচল অটলভাবে অবস্থান করে, তখন এ হেন বৃক্ষে বাস করিয়া আমাদের আপদ্ বিপদ্ ঘটিবে কিরূপে? যদি কোন একটা কুস্থানে অবস্থান করিতাম, তাহা হইলেই বিপদের সম্ভাবনা করা যাইতে পারিত।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে মহাবুদ্ধে! কল্পান্তকালে প্রভূত উৎপাত-বাত্যা বহিতে থাকে, ইন্দু স্থানচ্যুত হন, সূর্য্য ও নক্ষত্র-নিকর নিপতিত হইয়া থাকে, তখন তো তোমার কষ্ট হইবারই সম্ভাবনা। কিরূপে তখন তুমি বিজ্বর হইয়া থাক?

ভুশুণ্ড কহিলেন,—হে মুনে! প্রলয়ে যখন জীবগণের জগদ্ব্যবহার তিরোহিত-প্রায় হয়, কোন কিছুরই শৃঙ্খলা থাকে না, সমস্তই বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়ে; তখন আমি এই কুলায় পরিত্যাগ করিয়া থাকি। আমার সেই ত্যাগের সহিত কৃতঘ্ন-কৃত বিশিষ্ট মিত্র-পরিত্যাগের তুলনা হইতে পারে। আমি সকল কল্পনা বিসর্জ্জন দিয়া তৎকালে কেবল আকাশেই অধিষ্ঠান করিতে থাকি। আমার সর্ব্বাঙ্গ তখন নিসর্গতই নিশ্চল হইয়া উঠে এবং মনে বাসনার লেশ মাত্র থাকে না। যখন এককালে দ্বাদশ দিবাকরের অভ্যুদয় হয়, সর্ব্বত্র তীব্র উত্তাপ বিসর্পিত হইয়া পড়ে, শৈল সকল খণ্ড খণ্ড হইয়া যায়, আমি তখন স্বয়ং সলিলাত্মক বরুণদেহ ধারণ করি এবং সেই অবস্থায় ধীরভাবে কালাতিপাত করিতে থাকি। যখন

প্রবল প্রভঞ্জন বহিতে থাকিলে গিরীন্দ্র সকল খণ্ড খণ্ড হইয়া চতুর্দ্দিকে পতিত হইতে থাকে, তখন আমি এমনভাবে পাষাণ-ধারণা বন্ধন করি যে, আমার অবস্থিতি তখন অচল ও অটল হইয়া থাকে। প্রলয়ের সেই ভীষণ মুহূর্ত্তে সুমেরু প্রভৃতি পর্ব্বত যখন গলিত বা দ্রবীভূত হইয়া যায়, এ জগৎ একার্ণবাকারে পরিণত হয়, তখন আমি বায়বী ধারণা প্রাপ্ত হই এবং সেই ধারণায় আপনাকে বায়ুজ্ঞানে আকাশে আপ্লুত হইতে থাকি। তখন স্থূল-সূক্ষ্ম-সমষ্টি-স্বরূপ ব্রহ্মাণ্ডের চরম সীমাস্থানীয় অব্যাকৃত অবস্থা আমার অধিগত হয়। আমি চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের অন্তভাগে ভূমাভিধেয় বিমল ব্রহ্মপদে নির্ব্বিকল্প-সমাধি অবলম্বন করিয়া অবস্থান করিতে থাকি। অনন্তর কমলযোনি যখন পুনর্ব্বার সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করেন, তখন তদীয় ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশপূর্ব্বক এই বিহঙ্গ-কুলায়ে বাস করিতে থাকি।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে বিহঙ্গমরাজ! কল্পান্তকাল উপস্থিত হইলে যেরূপ ধারণার বলে তুমি অক্ষত-দেহে অবস্থান করিতে থাক, অন্যান্য যোগিজন সেরূপ ভাবে অবস্থান করিতে পারে না কেন?

ভুশুণ্ড কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! আমি এইরূপে থাকিব আর অন্যে অন্য প্রকারে থাকিবে, পরমেশ্বরের নিয়তিই এইরূপ দুর্জ্ঞেয়। কাহার যে কিরূপ অবশ্যম্ভাবিতা, তাহা নির্ণয় করিতে পারে, এমন শক্তি কাহারও নাই। যাহার নিয়তি যে প্রকার, তাহার তেমনই হইবে; ইহাই স্বভাবের নিশ্চয়। কল্পে কল্পে এই গিরিশিখরে বারম্বার এইরূপই তরু উৎপন্ন হইবে, ইহাই আমার সঙ্কল্প। এইরূপ সঙ্কল্প নিবন্ধন এ তরু প্রতিকল্পে এমনই হইয়া আসিতেছে।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে বিহঙ্গবর! ভবদীয় আয়ু ঐকান্তিক মোক্ষের ন্যায় অতি দীর্ঘ; এই জন্য চিরন্তন পদার্থপরম্পরার তুমিই একমাত্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দর্শক। ফলে ভবাদৃশ দীর্ঘদর্শী সংসারে আর কাহাকেই দেখি না। তুমি ধীর জ্ঞান-বিজ্ঞানশালী। তোমার মনোগতি যোগ-মার্গের অনুসারিণী। তুমি বহুবিধ সৃষ্টির আগম-অপায় স্বচক্ষে দেখিয়াছ। তাই জিজ্ঞাসা করিতেছি, হে কল্যাণ! তোমার দৃষ্টপূর্ব্ব এই জগদ্ব্যাপারে আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে, তাহা তোমার স্মরণ হয় কি?

ভুশুণ্ড কহিলেন,—হে মহাত্মন্! আমার স্মরণ হয়, এই সুমেরুর অধোদিকে ঐ যে ধরা অবস্থিত আছে, উহাতে একসময় বৃক্ষ ছিল না, শিলা ছিল না, এমন কি একগাছি তৃণ বা একটী লতা পর্য্যন্ত উহাতে জন্মে নাই। আবার এমন কথাও আমার স্মরণ হয় যে, এই ধরা একাদশ বর্ষ যাবৎ কেবলই নিরবচ্ছিন্ন ভস্মস্তূপে পরিব্যাপ্ত ছিল; তখন সূর্য্যের অভ্যুদয় ঘটে নাই, চন্দ্রমণ্ডল অপরিজ্ঞাত ছিল এবং দিবসের প্রকাশও পরিদৃষ্ট হয় নাই। আমার মনে হয়, এক সময় আমি দেখিয়াছিলাম, এই ভুবনমণ্ডল মেরুগিরির রত্নরাজির ছটায় অর্দ্ধোদ্ভাসিত এবং অপরার্দ্ধ অন্ধকারাচ্ছিন্ন; সুতরাং ইহা লোকালোক-শৈলবৎ প্রতিভাত। আবার এমনও কখন মনে পড়ে যে, যখন সুরাসুর-সংগ্রাম সংঘটিত হয়, তখনকার সেই দারুণ সংগ্রামে এই ধরামণ্ডলের মধ্যভাগ ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছিল এবং অত্রত্য জনমণ্ডলী ইহার নানাস্থানে পলায়ন করিয়াছিল। আমি দেখিয়াছিলাম, এই ধরা একদা বলগর্ব্বিত দৈত্যসমাজের আয়ত্ত হইয়াছিল এবং চারিযুগ পর্য্যন্ত তাহাদেরই অন্তঃপুরের ন্যায় সম্পূর্ণ অধীনতা স্বীকার করিয়াছিল। আমার স্মরণ হইতেছে, এই সমস্ত ধরাপ্রদেশই এক সময়ে সাগর-সলিলে মগ্ন হইয়াছিল। কেবল মাত্র এই সুমেরু গিরি তখন জলধিজলে প্লাবিত হয় নাই। তখন ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও হর, এই তিন মাত্র দেবশ্রেষ্ঠ এই সুমেরুপৃষ্ঠে অধিষ্ঠান করিয়াছিলেন। একবার আমার মনে হয় দেখিয়াছি, এই ধরা দুই যুগ যাবৎ নিরবচ্ছিন্ন বন-জঙ্গলে আচ্ছন্ন ছিল; যে দিক্ দেখি, সর্ব্বত্রই বন—সর্ব্বত্রই বৃক্ষ; তদ্ভিন্ন আর কিছুরই অস্তিত্ব কোথাও ছিল না। আবার এমনও দেখিয়াছিলাম, এই ধরা চারিযুগ পর্য্যন্ত কেবল ঘন-বিন্যস্ত শৈলসমূহে পরিব্যাপ্ত ছিল; এই জন্য সর্ব্বত্র সকলের গতিবিধি ব্যাহত হইয়াছিল। আমার মনে হইতেছে, এক সময় মৃত দানবদিগের অস্থিপুঞ্জে এই ধরা দশ সহস্র বর্ষ পর্য্যন্ত এমনই ভাবে আকীর্ণ হইয়াছিল যে, তখন ইহা পর্ব্বত-পরিব্যাপ্ত বলিয়াই প্রতীয়মান হইত। একদা দেখিয়াছিলাম, এ পৃথিবীতলে তৃণ-বৃক্ষাদির অস্তিত্ব মাত্র ছিল না, চারি দিকে দূর দূরান্তরে সর্ব্বত্র কেবলই শূন্য, কেবলই অন্ধকার পরিব্যাপ্ত ছিল বিমানচারী নভশ্চরেরা ভয়ে

নানাদিকে পলায়ন করিতেছিল। আর এক সময় দেখিয়াছি স্মরণ হইতেছে, বিন্ধ্যগিরি উন্মত্তভাবে গগনপথ ভেদ করিয়া আপনার শৃঙ্গ সকল বিস্তার করিয়াছে, দক্ষিণদিকের সমস্ত পথ কেবল পর্ব্বতে পর্ব্বতে ঢাকিয়া গিয়াছে, মুনিবর অগস্ত্য সেখান হইতে চলিয়া গিয়াছেন। আমি এইরূপ এবং অন্যরূপ বহুবিধ ঘটনা স্বচক্ষে দেখিয়াছি; আমার সে সকলই বিলক্ষণ স্মরণ আছে। সে সম্বন্ধে আর অধিক বলিব কি, সংক্ষেপতঃ সে সমুদায়ের সারাংশ আমি বিবৃত করিতেছি।

হে ব্রহ্মন্! আমি সংখ্যাতীত মনুগণকে জন্ম গ্রহণ করিতে দেখিয়াছি; তাঁহারা সকলেই অতীব আড়ম্বর-সহকারে চারিশত যুগ যাপন করিয়া গিয়াছেন। আমি আর এক সময় এরূপ এক সৃষ্টি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম যে, তাহা কেবলই শুদ্ধ অদ্বয় তেজঃপুঞ্জময়। সে সৃষ্টিতে দেব বা দানব, কাহারও উৎপত্তি হয় নাই। আবার এক সৃষ্টি দেখিয়াছি, তাহাতে ব্রাহ্মণেরা মদ্যপায়ী হইয়া উঠিয়াছেন, শূদ্রেরা দেবনিন্দায় প্রবৃত্ত হইয়াছে, এবং রমণীরা একাধিক স্বামী গ্রহণে কুণ্ঠিত হইতেছে না। আমার আর এক সৃষ্টির কথা মনে পড়ে, সে সময় এই ভূপৃষ্ঠ কেবলই বৃক্ষসমূহে পরিব্যাপ্ত ছিল। তখন মহাসাগরাদির সংস্থান-সন্নিবেশ কিছুই ছিল না। স্ত্রী-পুরুষের সংযোগ ব্যতীতই তৎকালে আপনা আপনি পুরুষোৎপত্তি হইতে দেখিয়াছি। আমার বেশ মনে আছে, আর এক সৃষ্টিতে দেখিয়াছি,—পর্ব্বত নাই, মৃত্তিকা নাই, সুর ও নরগণ গগনেই অবস্থিত; সে গগনে রবি-শশীর অস্তিত্ব নাই, অথচ সর্ব্বত্র সকলই প্রকাশমান। আমার স্মরণ হয়, অন্য এক সৃষ্টিতে দেখিয়াছিলাম, স্বর্গে ইন্দ্র নাই, ভূতলে কোন রাজা নাই, উত্তম, মধ্যম বা অধমাদি ভেদ-কল্পনা নাই, সর্ব্বদিক্ অন্ধকারাচ্ছন্ন। এইরূপে আমি বহু কল্পের বহু সৃষ্টি ব্যাপার দেখিয়া আসিতেছি। এতদ্ব্যতীত সৃষ্টির প্রারম্ভ-ঘটনা, ত্রিভুবনের বিভাগ-ব্যাপার, কুলাচলসমূহের সংস্থান-সন্নিবেশ, জম্বূদ্বীপের পৃথক্ অবস্থান, বর্ণাশ্রমধর্ম্মাদিগের উৎপত্তি, অবনীমণ্ডলের বিভাগ-ব্যবস্থা, নক্ষত্রমণ্ডলীর সংস্থান, ধ্রুব-নির্ম্মাণ, চন্দ্র ও সূর্য্যাদি গ্রহগণের উদ্ভব, ইন্দ্র ও উপেন্দ্র প্রভৃতির অবস্থিতি, হিরণ্যাক্ষের বধ-সাধন, বরাহ-

বিগ্রহ ধারণপূর্ব্বক নারায়ণ কর্ত্তৃক পৃথিবীর উদ্ধার, দেব ও দানবাদি প্রত্যেক সমাজমধ্যে এক এক রাজ-কল্পনা, বেদ-আনয়ন, মন্দগিরির উন্মূলন, সুধালাভার্থ সাগর-মন্থন, অনুৎপন্ন-পক্ষ গরুড়ের উদ্ভব এবং সাগরসম্ভব প্রভৃতি যে সকল জাগতিক ঘটনা উল্লিখিত হইয়া থাকে, এ সকল অতি অল্পদিনের কথা। হে তাত! যাঁহারা ভবাদৃশ অল্প-বয়স্ক ব্যক্তি, তাঁহাদিগেরও ঐ সকল ঘটনা স্মরণ আছে; সুতরাং আমি আর ঐ সমুদায় ঘটনার উল্লেখ করিলাম না। আমি চিরজীবী; তাই কল্পে কল্পে কত শত শত আশ্চর্য্য ঘটনা আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি। অধিক বলিব কি, এ কল্পে যিনি গরুড়বাহন বিষ্ণু, কল্পান্তরে তাঁহাকে আমি হংস-বাহন ব্রহ্মা হইতে দেখিয়াছি। এইরূপে হংসবাহন ব্রহ্মাকেও বৃষভ-বাহন শঙ্কর হইতে, অবলোকন করিয়াছি। অপিচ যিনি বৃষভবাহন, তাঁহাকেও অন্যান্য কল্পে গরুড়বাহন হইতে দেখিয়াছি। এইরূপ অনেক বিস্ময়-কর ঘটনা আমার দৃষ্টিগোচর হইয়াছে।

একবিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২১ ॥

দ্বাবিংশ সর্গ।

ভুশুণ্ড কহিলেন,—ভগবন্! এ জগতে আপনি জন্মিয়াছেন; ভরদ্বাজ, পুলস্ত্য, অত্রি, নারদ, ইন্দ্র, মরীচি, পুলহ, উদ্দালক, ক্রতু, ভৃগু, অঙ্গিরা ও সনৎকুমারপ্রমুখ মহর্ষিগণের উৎপত্তি হইয়াছে; শঙ্কর, ভৃঙ্গী, কার্ত্তিকেয় ও গণেশ প্রভৃতি দেবগণ আবির্ভূত হইয়াছেন; গৌরী, সরস্বতী, লক্ষ্মী ও গায়ত্রী প্রভৃতি দেবীগণের আবির্ভাব হইয়াছে; মেরু, মন্দর, কৈলাস, হিমালয় ও দর্দ্দুর প্রভৃতি পর্ব্বতবৃন্দ প্রাদুর্ভূত হইয়াছে; হয়গ্রীব, হিরণ্যাক্ষ, কালনেমি, বল, হিরণ্যকশিপু, ক্রাথ, বলি ও প্রহ্লাদ প্রভৃতি দৈত্যগণের উৎপত্তি হইয়াছে; শিবি, ন্যঙ্কু, পৃথুল, বৈণ্য, নাভাগ, কেলি,

নল, মান্ধাতা, সগর, দিলীপ ও নহুষপ্রমুখ মহীপতিগণ জন্মিয়াছেন; আত্রেয়, ব্যাস, বাল্মীকি, শুক ও বাৎসায়ন প্রভৃতি ঋষিগণ অবতীর্ণ হইয়াছেন; উপমন্যু, মণী, মঙ্কী, ভগীরথ ও শুক প্রমুখ রাজন্যগণ জন্মিয়াছেন এবং অপরাপর বহু জীব জন্ম লইয়াছে। এ সকল তো অতি অল্পদিনেরই ঘটনা; সুতরাং এই ঘটনাপ্রবাহ যে এক্ষণে আমার বিলক্ষণ স্মরণ আছে, তাহা বিশেষ করিয়া বলা বাহুল্য মাত্র।

হে মুনিবর! আপনি ব্রহ্মার তনয়; পরপর আপনার অষ্টজন্ম অতীত হইয়াছে। আমার স্মরণ হয়, ভূতপূর্ব্ব অষ্টম কল্পে আপনার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। আপনি যে প্রতিজন্মেই ব্রহ্মার তনয় হইয়াছিলেন, তাহা নহে। আপনি কখন আকাশ হইতে, কখন জল হইতে, কখন বায়ু হইতে, কখন শৈল হইতে এবং কখন বা অগ্নি হইতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এই যে বর্ত্তমান সৃষ্টি দেখা যাইতেছে, ইহা যাদৃশ আচার-ব্যবহারে পরিপূর্ণ, এবং এই সৃষ্টিতে দিক্‌সমূহের সংস্থান যেরূপ ভাবে নিষ্পন্ন, আমার বেশ স্মরণ আছে, এই প্রকার তিনটী সৃষ্টি আমি অতীত কালে দেখিয়াছি। এতদ্ভিন্ন আরও দশটী সৃষ্টি আমার দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। এই সকল-সৃষ্টির আকার প্রকার একই এবং একই প্রকার কাল ব্যাপিয়া উহারা অবস্থিত। ঐ ঐ সৃষ্টিতে দেবগণের এবং ধরার সংস্থান বা সন্নিবেশাদিও একই প্রকার ছিল।

হে মুনে! আমার মনে হইতেছে, আর একবার পাঁচটী সৃষ্টি আমি দেখিয়াছিলাম; সেই সেই সৃষ্টি সময়ে এই পৃথিবী পাঁচ পাঁচবার সমুদ্র-জলে প্লাবিত হইয়া অদৃশ্য হইয়াছিল। পরে ভগবান্ বিষ্ণু কূর্ম্মরূপে অবতীর্ণ হইয়া সমুদ্র হইতে ইহার উদ্ধার সাধন করেন। পূর্ব্বে সুর ও অসুরগণ একযোগে মিলিত হইয়া অমৃত আহরণের জন্য দ্বাদশবার সমুদ্র মন্থন করেন। প্রতিবারই মন্দরাকর্ষণে তাঁহারা শ্রম-শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই সকল ঘটনাই আমার বিলক্ষণ স্মরণ আছে। পুরাকালে দৈত্য হিরণ্যাক্ষ দেবগণের নিকট হইতেও রাজস্ব গ্রহণ করিয়াছিল। তাহার সর্ব্বৌষধিরসের প্রয়োজন হওয়ায় সর্ব্বৌষধি বৃক্ষের সহিত সে এই বসুধাকে তিন তিন বার পাতালতলে লইয়া গিয়াছিল। এই সকল

বৃত্তান্তও আমার মনে আছে। আরও মনে পড়ে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব অনেক কল্প গিয়াছে, সে সমুদায়ের মধ্যে ভগবান্ হরি পাঁচ পাঁচবার পরশুরাম হইয়া অবতীর্ণ হন। আবার এমনও অনেক কল্প গিয়াছে, যাহাতে তিনি অবতার স্বীকার আদৌ করেন নাই। এই যে কল্প চলিতেছে, ইহাতে তিনি ষষ্ঠ বার রেণুকার গর্ভে পরশুরামরূপে আবির্ভূত হন,—হইয়া ক্ষত্রিয়কুলের ধ্বংস সাধন করেন।

হে মুনিশ্রেষ্ঠ! আমার মনে আছে, শত শত কলিযুগ কাটিয়া গিয়াছে। শৌকরাজ শুদ্ধোদনের ঔরসে ভগবান্ হরি বুদ্ধরূপে শত শত বার অবতার স্বীকার করিয়াছেন। একবার নয়; আমার স্মরণ আছে—ভগবান্ চন্দ্রমৌলি ত্রিংশৎবার ত্রিপুর বিজয় করিয়াছেন। দুই দুইবার তৎকর্ত্তৃক দক্ষযজ্ঞ বিধ্বস্ত হইয়াছে এবং দশ দশবার তিনি ইন্দ্রকে অভিভূত করিয়াছেন। আমার আরও মনে আছে,—বাণাসুরের নিমিত্ত হরি-হরের আটবার যুদ্ধ হইয়াছিল। ঐ যুদ্ধে এক পক্ষে জ্বর নামক সৈন্য এবং অপর পক্ষে জ্বর ও প্রভৃত প্রমথসৈন্য ছিল। ঐ যুদ্ধে সুরসৈন্য-দিগের মধ্যে বিষম বিক্ষোভ জন্মিয়াছিল।

হে মুনে! প্রতিযুগে মানবদিগের বুদ্ধিবৃত্তির ন্যূনাধিক্য ঘটিয়া থাকে; এই জন্য বেদ-বিহিত ক্রিয়াকলাপ ও বেদমন্ত্রের উচ্চারণাদিরও বিলক্ষণ পার্থক্য হইয়া থাকে। ইহা আমি যুগে যুগে বেশ করিয়া অনুভব করিয়াছি এবং সে কথা আমার এখনও স্মরণ আছে।

হে পবিত্র! প্রত্যেক যুগেই পৃথক্ পৃথক্ পুরাণপ্রণেতা হইয়া থকেন; এই জন্য যে সকল পুরাণ একপ্রকার বা একই অর্থের দ্যোতক, সেই সকল গুলিরই পাঠভেদ ও পাঠবাহুল্য ঘটিয়াছে এবং এইরূপেই বহু পুরাণ প্রচলিত হইয়া আসিয়াছে। আমার বেশ স্মরণ আছে, বেদাদি নিখিল শাস্ত্রজ্ঞ ব্যাস-বাল্মীকিপ্রমুখ মহর্ষিরা পূর্ব্ব পূর্ব্বকল্পীয় প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ ইতিহাস এবং অন্যান্য আরও কত কি ইতিহাসসমষ্টিকে যুগে যুগে পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ করেন। পূর্ব্বতন এমন কোনই আশ্চর্য্য ইতিহাস নাই, যাহা আমার স্মৃতিপথে জাগরূক হইতেছে না। এমন কি, যাহা লক্ষ গ্রন্থের সমষ্টিবৎ অতি বৃহৎ জ্ঞানশাস্ত্র, সেই রামায়ণও আমার

স্মৃতিপটে অঙ্কিত আছে। রামাদির ন্যায় ব্যবহার করা কর্ত্তব্য এবং রাবণাদির ন্যায় ব্যবহার করিতে নাই; এই প্রকার জ্ঞান যাহা হইতে জন্মিয়া থাকে এবং যাহা বিশিষ্ট বুদ্ধিমত্তার পরিচয় প্রদান করে, তথাবিধ উত্তম উপদেশ ঐ রামায়ণগ্রন্থে করগত ফলের ন্যায় সুলভ রহিয়াছে। এইরূপ বাল্মীকি যাহা করিয়াছেন, সে রামায়ণ আমার স্মৃতিপথে আছে এবং তিনি যাহা ভবিষ্যতে করিবেন, তাহাও আমার মনোমধ্যে উদিত আছে। সেই ভাবী রামায়ণ যথাকালেই সাধারণ্যে প্রকাশিত হইবে। আপনি তাহা অবগত হইতে পারিবেন। বাল্মীকি নামে পরিচিত কোন পূর্ব্বকল্পীয় জীব কিম্বা অপর কোন বাল্মীকি ঐ মহারামায়ণ-গ্রন্থ একাদশ বার প্রণয়ন করিয়াছেন। অধুনা সম্প্রদায়-পরম্পরার উচ্ছেদ হইয়া গিয়াছে; তাই উহা লোপ পাইয়াছে। এই ক্ষণে ঐ রামায়ণ দ্বাদশ বার প্রচার করা হইতেছে। এই সকলই আমার বিশিষ্টরূপে স্মরণ আছে। এই মহারামায়ণের তুল্য ভারতাখ্য অপর একখানি পুস্তকের কথাও আমার মনে হইতেছে। উহা ব্যাসনামক জনৈক প্রাক্তন জীব কর্ত্তৃক বিরচিত হইয়াছিল। অধুনা উহার বিলোপ ঘটিয়াছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পের সেই একই ব্যাস অথবা কোন ব্যাসাখ্য জীব একে একে ছয়বার পর্য্যন্ত ঐ ভারত রচনা করিয়াছেন। এইবার উহার সপ্তম বার সঙ্কলন হইবে।

হে মুনিপ্রবর! যুগে যুগে আমি দেখিয়াছি,—কত বিচিত্র উপাখ্যান ও শাস্ত্রগ্রন্থ প্রণীত হইয়াছে। এখন অবশ্য সে সকল কিছুই বিদ্যমান নাই, তথাচ সে সমুদায়ের কথা আমার বিলক্ষণ স্মরণ হইতেছে। হে সাধো! পূর্ব্ব পূর্ব্ব কালে যে যে পদার্থ-পরম্পরা দেখিয়াছি,—যুগে যুগেই পুনরায় সেই সেই বা তদ্ভিন্ন অপরাপর পদার্থ-জাল প্রত্যক্ষ করিতেছি। প্রতিযুগীয় সেই সেই দৃষ্ট পদার্থ সকলই আমার স্মরণ আছে। অধুনা রাক্ষসদল ধ্বংস করিবার জন্য ভগবান্ বিষ্ণু রামরূপে মহীমণ্ডলে অবতীর্ণ হইবেন। এই অবতার তাঁহার একাদশ অবতার বলিয়া গণ্য হইবে। পশুরাজ সিংহ যেমন গজরাজকে নিহত করে, আমার মনে আছে,—ভগবান্ হরি তিনবার তেমনি হিরণ্যকশিপুকে বধ করিয়াছেন।

হে মুনিপ্রধান! ভূভার-হরণের জন্য ভগবান্ বিষ্ণু অধুনা বাসুদেব-গৃহে জন্ম লইবেন। তাঁহার এই জন্ম হইবে ষোড়শ জন্ম। সত্য কথা বলিতে কি, এই যে কিছু আমি দেখিয়াছি বা দেখিব বলিয়া মনে হইতেছে, এ সকলই একটা জগন্ময়ী ভ্রান্তি; ভ্রান্তি ব্যতীত জগৎ বলিয়া পৃথক্ কিছুই বিদ্যমান নাই। ঐ জাগতী ভ্রান্তি কখন কখন উৎপন্ন হয়,—হইয়া জলবুদ্বুদবৎ ক্ষণস্থায়ী ভাবে উত্থিত হইয়া থাকে; সুতরাং ঐ ভ্রান্তিকে নিত্য বলা যায় না; উহা জলে তরঙ্গরেখার ন্যায় জ্ঞানময় আত্মার অন্তরে কদাচিৎ উত্থিত হয়; আবার কখন বা বিলয় পাইয়া যায়।

হে বিভো! আমি অসংখ্য ত্রিভুবন দেখিয়াছি। উহাদের মধ্যে কতিপয় ভুবনের সন্নিবেশ-সংস্থান একরূপ, কতকগুলি ভুবন বিভিন্নরূপ এবং কতকগুলি অর্দ্ধ-সমাকার; এই সকলই আমার বিলক্ষণ স্মরণ আছে। আমি মনে করিয়া দেখিতেছি, জীব ও জীবগণের আচার ব্যবহার সমস্তই পর পর কল্পেও পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পেরই অনুসরণ করিতেছে। পরন্তু আমার ইহাও বেশ মনে হইতেছে যে, প্রত্যেক মন্বন্তরেই এই জাগতিক সংস্থানের বিপর্য্যয় ঘটিয়া থাকে। ফলে, কি জাগতিক কার্য্যপরম্পরা, কি অত্রত্য প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ জনমণ্ডলী, সকলই পূর্ব্বাবস্থা হইতে অবস্থান্তরে উপনীত হয়। এই আমার মিত্র, এই আমার বন্ধু, এই আমার ভৃত্য, এই আমার আশ্রয়, এ সকলই অন্যথাকারে নবভাবে বিভাত হইয়া থাকে। অন্যের কথা কি, এ সম্বন্ধে আমার নিজের কথাই বলি। কখন আমি বিন্ধ্যাচলের কোন নির্জ্জন প্রদেশে আশ্রয় লই, কদাচ সহ্যাদ্রির উপর অবস্থান করি, কখন দর্দ্দুরাচলে বাস করি, কখন মলয়াদ্রির অধিবাসী হই, এবং কখন কখন বা আমি আবার প্রাক্তন সন্নিবেশ অনুসারে ভূধর প্রাপ্ত হইয়া চূত-বৃক্ষের শাখায় নীড় নির্ম্মাণ করি।

হে মুনিশ্রেষ্ঠ! এই অনাদি অনন্ত যুগপ্রবাহ চলিয়া গিয়াছে; তথাচ আমার বাস-বৃক্ষ যেমন, তেমনই আছে। ইহা আপন পূর্ব্ব দেহ পরিহার করিয়া পূর্ব্ববৎ আকার-সন্নিবেশ অনুসারেই আবির্ভূত হইয়াছে। বাস্তবিকই এ বৃক্ষের আকার প্রকারে কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। আমার পিতৃদেব যখন জীবিত ছিলেন, তখন ইহার যেমন শোভা ছিল,

এখনও সে শোভা তেমনই রহিয়াছে। আমিও ইহাতে তেমনিই ভাবে অবস্থান করিতেছি। পূর্ব্বে এই গিরির উত্তর দিক্‌টা অন্য প্রকার ছিল, অধুনা আর এক প্রকার হইয়াছে; তথাচ আকৃতিগঠন-প্রণালীর সৌসাদৃশ্যে ইহা একই বলিয়া মনে হইতেছে। এই ভূধর সম্বন্ধেও সেই কথা; ইহা অন্য প্রকার হইলেও পূর্ব্বের ন্যায়ই প্রতিভাত হইতেছে। এখন কথা হইতে পারে, তবে কি আমিও প্রতিকল্পে অন্য হইয়া আকার-সন্নিবেশে তুল্য নহি? না—তাহা নহে; আমি পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পে অন্য একজন ছিলাম না, বা এখনও অন্য আর একজন হই নাই। আমি এক; —একই আছি এবং একই দেহ-সংস্থানে ব্রহ্মার রাত্রিদিন যাপন করিতেছি। আমি কল্পে কল্পে ভিন্ন নহি; এ কথা বলিবার কারণ এই যে, পূর্ব্বকল্পীয় ধারণাবৈভবে আমার যে নির্ব্বিকল্প-সমাধি স্থিরীকৃত থাকে, তাহা ভঙ্গ হইয়া গেলে পুনঃকল্প প্রদুর্ভূত হয়। তখন এই সেই মেরুমহীধর, এই সেই আমার বাস-বৃক্ষ, এই প্রকার প্রত্যভিজ্ঞা-বলেই আমি নূতন সৃষ্টি অনুভব করিয়া থাকি। যদি পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পের সেই একই আমি না হইতাম, তাহা হইলে আমার তথাবিধ প্রত্যভিজ্ঞার সম্ভাবনাই হইতে পারিত না। সেই একই আমি; নতুবা রবি, শশী ও নক্ষত্রাদির সঞ্চারক্রমে সুমেরু প্রভৃতি শৈলসংস্থান বা প্রাচী-প্রতীচী প্রভৃতি দিগ্‌দেশ আমার নিকট যথাযথ বলিয়া প্রতীত হইত না। আমি কখনই সকলের প্রকৃত পরিচয় পাইতে পারিতাম না এবং এই জগৎ-প্রপঞ্চের স্থিতি অনিয়ত বলিয়া ইহা সৎ ও অসৎরূপে আমি বুঝিতাম না। ফল কথা এই—আত্মার যে মায়িক বিক্ষেপশক্তি, তাহারই লীলা এমনই ভাবে বিলসিত হয়। এ জগতের যে কিছু পদার্থ-পরম্পরা, সকলেরই অনিয়ত ভাব পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। আমার বেশ মনে হইতেছে, পূর্ব্বে যে যাহার পুত্র ছিল, সে পরে তাহার পিতা হইয়াছে; যে যাহার মিত্র ছিল, সে তাহার শত্রু হইয়াছে, এবং যে পূর্ব্ব কল্পের পুরুষ, সে কল্পান্তরে স্ত্রী হইয়াছে। এইরূপ একজন দুইজন নয়; আমার বিলক্ষণ মনে হয়, এই প্রকার শত শত হইয়াছে এবং শত শত হইতেছে।

হে মুনীন্দ্র! আমার মনে হইতেছে, কলিযুগে সত্যযুগের আচার ব্যবহার দেখিয়াছি, এবং সত্যযুগেও কলির ব্যবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। এইরূপে ত্রেতা এবং দ্বাপরযুগেও আচার-ব্যবহারের বৈপরীত্য অবলোকন করিয়াছি; আবার এমনও অনেক কল্পের অনেক সত্যযুগ দেখিয়াছি, যাহাতে আচার-ব্যবহারের কোনই একটা নিয়ম স্থির ছিল না। বেদ ও বেদার্থ পরিজ্ঞানের সম্পূর্ণ অভাব নিবন্ধন সকলেই স্ব স্ব ইচ্ছানুসারে আচার ব্যবহার পালন করিত।

হে ব্রহ্মন্! আমার মনে হইতেছে, একদা চতুর্যুগসহস্র অতীত হইবার পর ব্রহ্মা সমুদায়ের সংহার সাধনপূর্ব্বক যোগনিদ্রা-ব্যপদেশে পরমাত্মার ধ্যানে নিমগ্ন হইয়াছিলেন। তখন এই সুরাসুর-নর-পরিবৃত্ত জগৎ কেবলই শূন্যাকারে পরিণত হইয়াছিল। আমার মনে পড়ে, মনোমনন-নির্ম্মিত আরও দশটী সৃষ্টি আমি দেখিয়াছি। ঐ সকল সৃষ্টিতে পার্থিব আকার কিছুই ছিল না; ঐ সৃষ্টিসমষ্টি কেবল বায়ুময় ভূতসমূহে পরিব্যাপ্ত ছিল। ব্রহ্মার দিবসাগমে এইরূপ কত অতীত সৃষ্টিপরম্পরা আমার দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছিল। আমার স্মরণ আছে, ঐ সকল সৃষ্টির দেশসমূহ বিচিত্র সংস্থানে অন্বিত এবং উহাদের জীবনিবহ নানাবিধ অবয়বসংস্থানে গঠিত ও ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যে ব্যাকুলিত। এ হেন জীবগণের আধারভূত ঐ বিচিত্র সৃষ্টিসমষ্টি বিবিধ বেশ-বিলাসে পরিবৃত।

দ্বাবিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২২ ॥

ত্রয়োবিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে মহাভুজ, রাম! অনন্তর আমি সমস্ত বিষয় বিশেষরূপে জানিবার নিমিত্ত কল্পতরুর লতাগ্র-স্থিত বায়স-বরকে পুনরায় জিজ্ঞাসিলাম যে,—হে বিহঙ্গমগণের বরেণ্য! এই জগদভ্যন্তরে আপনারাও বিচরণ করেন, এবং বিবিধ ব্যবহার করিয়া থাকেন, অথচ মৃত্যু আপনাদিগের কোনই বিঘ্ন বাধা জন্মাইতে পারে না, ইহার কারণ কি?

ভুশুণ্ড কহিলেন,—হে ভগবন্! আপনি সর্ব্ব বিষয়েরই অভিজ্ঞ; আপনার জ্ঞানের অতীত কোন কিছুই নাই। তথাচ আমার নিকট আপনি যে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, ইহা আপনার প্রভুত্বেরই স্বভাব; কেন না, প্রভুগণ স্বভাবতই ভৃত্যদিগকে মুখর করিয়া তুলেন। যাহা হউক, আপনার জিজ্ঞাস্য বিষয় আমি যথাশক্তি বিবৃত করিতেছি, ফলতঃ আমার ধারণা এই যে, সাধুদিগের আদেশ-পালনেই তাঁহাদের প্রকৃষ্টরূপে উপাসনা করা হয়। যাহার হৃদয়ে দোষরাশিরূপ মুক্তাফলগুলি বাসনা-রূপ সূত্র দ্বারা গ্রথিত নহে, মৃত্যু তাহাকে কদাচ গ্রাস করিতে পারে না। নিঃশ্বাসরূপ বৃক্ষের ক্রকচস্থানীয় ও নিখিল দেহ-লতার ক্ষতকারী কীট-স্বরূপ মানসী ব্যথাসকল যাহাকে ছিন্ন ভিন্ন করিতে পারে না, মৃত্যু তাহার হিংসা সাধনে অক্ষম। যাহারা চিন্তারূপিণী সুবিন্যস্ত ফণারাজি লইয়া দেহতরুর কোটরগত সর্প-স্বরূপে বিরাজিত, সেই সকল আশা যাহাকে দগ্ধ করিতে পারে না, মৃত্যু তাহার বধ বিধানে সক্ষম নহে। যাহা রাগদ্বেষরূপ বিষরাশি দ্বারা পরিপূর্ণ, তাদৃশ চিত্তরূপ গর্ত্তগত লোভ-বিষধর যাহাকে দংশন করিতে অক্ষম, মৃত্যু তাহাকে কস্মিন্‌কালেও গ্রাস করিতে পারে না। এই শরীর যেন সাগর; ক্রোধ ইহার বাড়বাগ্নি। এ অগ্নি সমস্ত বিবেকরূপ জলরাশিকে পান করিয়া ফেলে। এই বিবেক-শোষী ক্রোধানল যাহার দাহ জন্মাইতে পারে না, মৃত্যু তাহার কোনই অনিষ্ট সাধনে সক্ষম নহে। তৈলযন্ত্র দ্বারা শুষ্ক তিলরাশি যেমন নিষ্পিষ্ট হয়, তেমনি যাহারা কন্দর্পের তাড়নে পিষিয়া না যায়, মৃত্যু তাহার বিনাশ বিধানে সক্ষম নহে। যাহা একমাত্র নির্ম্মল ও নিতান্ত পবিত্র, তথাবিধ পরম পদে যাহার চিত্ত বিশ্রান্তি লাভ করিয়াছে, মৃত্যু তাহার জিঘাংসা পোষণ করে না। চিত্ত যাহার দেহ-বনে প্রবেশ করিয়া মর্কটবৎ চঞ্চল হয় না, মৃত্যু তদীয় বধ সাধন করিতে ইচ্ছুক নহে।

হে ব্রহ্মন্! চিত্ত যাঁহার সমাধি-সাধনায় নিমগ্ন থাকে, এই সংসার-ব্যাধির নিদানভূত পূর্ব্বোল্লিখিত দোষরাশি দ্বারা কদাচ তিনি অভিভূত হইবার নহেন। চিত্ত যাঁহার সমাহিত, তাদৃশ ব্যক্তি মোহের বশে কি দৈহিক, কি মানসিক, কোন প্রকার পীড়া-জনিত দুঃখ-জালেই জড়িত

হয় না। যিনি সমাহিত-চিত্ত হইয়া অবস্থান করেন, তাঁহার অস্ত নাই, উদয় নাই, স্মরণ নাই, বিস্মরণ নাই। ফলে, তিনি না সুপ্ত, না জাগ্রত, কিছুই নহেন। কাম ও ক্রোধ-বিকার হইতে যে চিন্তার উদয় হয়,—হইয়া হৃদাকাশকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করিয়া রাখে, তথাবিধ চিন্তায় সমাহিত-চিত্ত পুরুষের কোনই অনিষ্ট সাধন করিতে পারে না। যাঁহার চিত্ত সমাহিতভাবে থাকে, তিনি কোন কিছু দান করেন না, গ্রহণ করেন না, ত্যাগ করেন না, বা যাচ্ঞা করেন না। এক কথায় তাঁহার অনুষ্ঠেয় কোন কার্য্যই নাই অথচ তিনি সমস্ত কার্য্যই করিয়া থাকেন। যে সকল অনর্থ আছে, অকার্য্য আছে, রাগ-দ্বেষাদি দুষ্ট গুণ আছে, দুরুক্তি আছে, বা দুর্নীতি আছে, যিনি সমাহিত পুরুষ, তাঁহার ঐ সমুদায়ের কিছুতেই কোন সন্তাপ জন্মে না। যাহা প্রাপ্ত হইলে প্রচুর লাভ হইল বলিয়া মনে হয়, যাহাকে সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম বলিয়া গণ্য করা যায়, পরিণাম যাহার শুভময় হইয়া থাকে, এবম্বিধ সুখসম্পত্তি তাঁহারই ঘটিয়া থাকে—যিনি সমাহিতচিত্ত হইয়া অবস্থান করেন। যাহা সত্য, পরিণাম যাহার শুভময়, যাহাতে ভ্রান্তির লেশ মাত্র নাই, যাহা অনপায় ও ভোগদৃষ্টি হইতে বর্জ্জিত, তথাবিধ পরমাত্মাতেই মনকে মগ্ন রাখা বিধেয়। ভেদ-দৃষ্টি অপবিত্র পিশাচস্থানীয়; উহাতে চিত্তের তত্ত্বজ্ঞান-সামর্থ্য নষ্ট করিয়া দেয়। পরম সুখ-স্বরূপ ব্রহ্মতত্ত্ব যে কি, তাহা ঐ ভেদদৃষ্টির জানিবার উপায় নাই। অতএব ভেদদৃষ্টি বর্জ্জন করিয়া মনকে সদাই সুখময় ব্রহ্মে নিমগ্ন রাখা কর্ত্তব্য। কি আদি, কি মধ্য, কি অন্ত, সকল সময়েই যাহা অতি মধুর, হিতজনক ও পরম সুখময়, তথাবিধ ব্রহ্মপদেই মনকে নিবিষ্ট রাখিতে হইবে। আদি বল, মধ্য বল, অন্ত বল, সকল অবস্থাতেই যাহা অনন্তরূপে বিভাত ও সাধুসম্প্রদায়ের সেবিত, তথাবিধ আত্মসুখেই মনকে নিবিষ্ট রাখা বিধেয়। বুদ্ধির যাহা পরমালোক, অমৃতের যাহা সারাংশ এবং যাহা হইতে বিশিষ্ট আনন্দ অন্য কিছুই নাই, মনকে তাদৃশ পরব্রহ্মেই প্রলীন করিতে হয়। স্বর্গে সুর, অসুর, বিদ্যাধর, কিন্নর ও কত সুরসুন্দরী বিরাজমান; কিন্তু সেখানে এমন কোন কিছুই বিদ্যমান নাই, যাহা চিরস্থায়ী বা চির শুভকর। এই ত

সুবিপুল ভূমণ্ডল রহিয়াছে; এখানে রাজা, প্রজা, বন, বৃক্ষ, শৈল, সাগর, কত কি বিদ্যমান আছে; কিন্তু হেথায় এমন কিছু আছে কি, যাহা চিরতরে স্থিতিশীল বা নিত্য শুভময়? বলা বাহুল্য, স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল ও দিঙ্মণ্ডল, এই সমস্ত লইয়া এই যে সুবিশাল জগৎ, ইহারও তো কোথাও তেমন পদার্থ নাই, যাহা অত্যুত্তম বা চিরস্থির। তবে ক্রিয়াফলের কথা কহিবে, ইহাতেও তো চিরস্থির অত্যুত্তম সার কিছুই নাই। উহা নিত্য আধিব্যাধিময়, কেবলই দুঃখ-সম্ভিন্ন এবং অতীব অসার বস্তু। চিন্তা বা বিষয়সুখের ভাবনা—বুদ্ধির বিকার মাত্র; উহা আপাততঃ হৃদয়ের আনন্দ প্রদান করে সত্য, কিন্তু চিত্তকে তরলীকৃত করিয়া দেয় এবং পরিণামে উহাতে সুখস্বস্তির সম্ভাবনা কিছুই থাকে না। হৃদয় যেন ক্ষীরোদ সাগর; সঙ্কল্প-বিকল্প উহার মন্দরস্বরূপ মন্থনকারী। ইহার অভ্যন্তরে এমন কিছুই দেখি না, যাহা সুস্থির বা সুমঙ্গলময়। মানবদিগের ইন্দ্রিয়চেষ্টাও অনবরত আগম ও অপায়শীল। উহা বিচিত্রাকার; সুতরাং অসিধারার ন্যায় অনুভূয়মান। উহাতেও এমন কিছুই নাই, যাহা চিরস্থির বা শুভপ্রদ। বিবেকসম্পন্ন সাধু ব্যক্তির চিত্ত যথায় বিশ্রান্তি লাভ করে, এই সসাগরা বসুন্ধরার আধিপত্য, অমরাধিপত্ব বা পাতালপুরের ঐশ্বর্য্য, এই সমুদায়ই তাহার নিকট অকিঞ্চিৎকর। বিবেকবান্ সাধুগণের চিত্তের যাহা বিশ্রামস্থল, সেই পরমপদ যিনি একবার লাভ করিয়াছেন, কি দুরূহ শাস্ত্রগ্রন্থসমূহের বিচার-ক্ষমতা, কি বুদ্ধিপূর্ব্বক বিচার করিয়া জাগতিক কার্য্যাকার্য্যপরম্পরার পর্য্যালোচনসামর্থ্য, কি ভারতাদি কথার ক্রম-বর্ণনী শক্তি, এ সমস্তই তাঁহার নিকট অকিঞ্চিৎকর হইয়া থাকে; ফলে ঐ সকল শক্তির পক্ষে বিবেকার্জ্জন করিয়া পরমপদ লাভ সম্ভবপর নহে। যে চিরজীবিতা আধিব্যাধিময়, তাহাকে কিছুতেই প্রশংসা করা চলে না; মরণও যে মঙ্গলময়, তাহাও বলা যায় না; কেন না, তাহাতে কেবল মূঢ়তারই প্রশ্রয় হয়। যে নরক পাপফলভোগের বিধানকর্ত্তা, তাহাকেও ভাল বলা চলে না; কেন না, তাহাতে যে পাপোৎপত্তির অবসান হইবে, এমন সম্ভাবনা নাই। তবে কি স্বর্গের আধিপত্য লাভ শ্রেয়স্কর? না,—তাহাও নহে; কেন না, তাহাও তো

চিরসুখের নিদান নয়; পুণ্যফলের অবসান হইবা মাত্র সে স্থান হইতে পতন অবশ্যই ঘটিয়া থাকে। যাঁহারা পরমপদ লাভের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন, তাঁহাদের নিকট ঐ সকলের কোন কিছুই বাঞ্ছনীয় নহে। তবে এখন কথা এই যে, লোকে ঐ রাজ্যভোগ-সুখ রম্য বলিয়া আকাঙ্ক্ষা করে কেন? এ কথার উত্তর এই যে, তাহারা মোহের মাহাত্ম্যেই ঐরূপ আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে। পরন্তু যাঁহারা মহাপুরুষসংজ্ঞা লাভ করিয়াছেন, বিবেক-লাভে কৃতার্থ হইয়াছেন, তাঁহারা কি জন্য চঞ্চল রাজ্যাদি-সুখের লালসা পোষণ করিবেন? ফলতঃ তাঁহারা ঐ সকল বিষয়ে উপেক্ষাই প্রদর্শন করিয়া থাকেন।

ত্রয়োবিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২৩ ॥

চতুর্বিবংশ সর্গ।

ভুশুণ্ড কহিলেন,—হে মুনে! যত কিছু জ্ঞান আছে, তন্মধ্যে যাহা ভ্রমবিরহিত একাগ্রর অবিচল অদ্বৈত দৃষ্টি, তাহাই সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ ও উচ্চ বলিয়া কথিত। কে আমি, কোথা হইতে এ সংসারে আসিলাম, এবম্বিধ আত্ম-বিষয়ক চিন্তা হইতেই মানবদিগের সর্ব্বদুঃখের অবসান ঘটিয়া থাকে। এই যে সংসার-ভ্রম, ইহা চিরসঞ্চিত দুঃস্বপ্ন-স্বরূপে প্রতীয়মান। উল্লিখিতরূপ আত্মচিন্তার উদয় হইলেই উহার অবসান ঘটিয়া থাকে। মানবের নির্ম্মল মনোমার্গরূপ যে প্রশস্ত প্রাঙ্গণ, তাহাই ঐ আত্মচিন্তার বিচরণস্থান; সুতরাং যে সে ব্যক্তি ঐরূপে আত্মচিন্তা করিবার অধিকারী নহে। জ্যোৎস্নার অন্ধকারের ন্যায় সমস্ত দুঃখচিন্তারূপ অনর্থ—ঐ আত্মচিন্তায় বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

হে বিভো! আমার কথিত এই আত্মচিন্তায় সঙ্কল্পের সম্পর্ক কিছুই নাই। তদ্বিধ মহাত্মগণ ইহা অনায়াসেই লাভ করিতে পারেন।

কিন্তু অস্মাদৃশ ব্যক্তিবর্গের নিকট ইহা একান্তই দুর্ল্লভ বস্তু। যাহা সকল কল্পনার অতীতসীমায় অবস্থিত, তথাবিধ পরম পদ—অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন জীবে কিরূপে লাভ করিতে পারিবে ?

হে মুনীন্দ্র! আত্মচিন্তা যেন এক বিলাসিনী রমণী, তাহার অনেক গুলি সখী আছে। ঐ সখীরাও অনেকাংশে আত্মচিন্তারই সমান এবং জ্ঞানরূপ সুধাকরের তুষারময় কিরণজালে সুশীতল। তবে আত্মচিন্তা যেমন সহজে লভ্য নহে, ইহারা সেরূপ নয়। তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ সুলভ। আত্মচিন্তার যতগুলি সখী, তন্মধ্যে আমি একটীকে মাত্র পাইয়াছি, তাহার নাম প্রাণচিন্তা। এই প্রাণচিন্তা সর্ব্বদুঃখের ক্ষয়কারী এবং সর্ব্ব সৌভাগ্যের বর্দ্ধনকারিণী। এই প্রাণচিন্তাই জীবনের হেতুভূতা। ফল কথা এই, আমি যে এত বড় সুদীর্ঘ জীবন পাইয়াছি, তাহার কারণ ঐ প্রাণচিন্তাই।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! আমি সমস্ত বিষয়ই বিদিত আছি; সেই জন্য যদিও আমার ঐ সকল বিষয় শুনিবার নিমিত্ত তেমন উৎকণ্ঠা ছিল না, তথাচ আমার যেন কেমন একটা কৌতূহল হইল। কাজেই বিজ্ঞ ভুশুণ্ড ঐ বিষয় বলিবার পর আমি তাঁহাকে তৎসম্বন্ধে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম; বলিলাম,—হে অতি চিরজীবিত! হে সাধো! হে সমস্ত সংশয়ের উচ্ছেদকারিন্! প্রাণচিন্তা কাহাকে বলে, আমি তাহা জানিতে ইচ্ছা করি, আমার নিকট যথাযথরূপে ব্যক্ত করুন।

ভুশুণ্ড কহিলেন,—হে মুনে! আপনি সমগ্র বেদান্ত বিদিত আছেন এবং নিখিল সংশয় নাশ করিবার আপনার সামর্থ্য আছে। তথাচ এই বায়সকে যে আপনি জিজ্ঞাসিতেছেন, ইহা আমার পরিহাস বলিয়াই মনে হইতেছে। অথবা হে ভগবন্! আপনারা পূজ্য ব্যক্তি, আপনাদের নিকট ঐ সম্বন্ধে আলোচনা করিলে আমারও শিক্ষা হইতে পারিবে। এই জন্য আপনার এ প্রশ্নের প্রত্যুত্তর আমার অবশ্যই দেওয়া কর্ত্তব্য। এই ভুশুণ্ড কিরূপে প্রাণসমাধির সাধনায় চিরজীবিত্ব প্রাপ্ত হইল, কিরূপে তাহার আত্মলাভ ঘটিল, এ সকল আমি এক্ষণে বলিতেছি, আপনি শ্রবণ করুন।

ভগবন্‌! এই দেখুন, এই মনোরম দেহগৃহ আছে; এ গৃহের তিন প্রকার তিনটী মহাস্তম্ভ এবং নয়টী ইহার দ্বার। অহঙ্কার এ গৃহের অধিপতি। এই অহঙ্কার-গৃহস্থ পুর্য্যষ্টকরূপ পরিবারবর্গকে লইয়া পঞ্চ-তন্মাত্ররূপ স্বজনগণ সমভিব্যাহারে এই দেহগৃহের রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত। আমি যে দেহগৃহের বর্ণন করিতেছি, ইহা আপনি অন্তরে অন্তরে স্পষ্টতই প্রত্যক্ষ করিতেছেন। এই দেখুন, এই দুই কর্ণরন্ধ্র এই দেহগৃহের উপরিস্থ চন্দ্রশালিকা, কেশকদম্ব ইহার আচ্ছাদন দ্রব্য, বিশাল চক্ষু-যুগল এই দেহগৃহের গবাক্ষ, মুখবিবর ইহার প্রধান দ্বার এবং ভুজদ্বয় ও পার্শ্বদ্বয় এই দেহগৃহের পার্শ্বযুগ্ম। দন্তাবলীরূপ বকুলফুলের মালায় ইহার বদনবিবররূপ প্রধানদ্বারের মধ্যভাগ সমলঙ্কৃত। জ্ঞানেন্দ্রিয়গণ রূপ-রসাদি বাহ্য বিষয়সমূহের বার্ত্তাহর; তাহারা উহার দ্বারপাল। সর্ব্বগামী আত্মার উজ্জ্বল আলোকচ্ছটায় এই দেহগৃহ আলোকিত। এ গৃহের যিনি গৃহস্থ, তিনি জাগ্রদবস্থায় ইহার নয়নতারারূপ অলিন্দপ্রদেশে অবস্থান করিয়া থাকেন। রক্ত, মাংস ও বসা প্রভৃতি—জল,মৃত্তিকা ও গোময়স্থানীয়; এই দেহগৃহ তৎসমুদায় দ্বারা বিলিপ্ত। স্থূল অস্থিপুঞ্জ কাষ্ঠস্থানীয় এবং শিরাসকল রজ্জুস্থানীয়; এই দেহগৃহ ঐ সমুদায় দ্বারা সুদৃঢ়রূপে সম্বদ্ধ। এইরূপে ইহার গঠনপ্রণালী বিলক্ষণ দৃঢ়।

হে মুনিশ্রেষ্ঠ! এই দেহের অভ্যন্তরে ইড়া ও পিঙ্গলানাম্নী দুইটী সূক্ষ্ম সুকোমল নাড়ী বাম ও দক্ষিণ পার্শ্বকোষ্ঠে অনভিব্যক্তভাবে সুস্থিত আছে। এই দুই পার্শ্বকোষ্ঠের মধ্যভাগে তিনটী কমলযুগলের ন্যায় অস্থিমাংসময় তিনটী কোমল হৃৎপঙ্কজযুগল বিরাজমান। উহাদের নালগুলি ঊর্দ্ধ ও অধোগামী হইয়া অবস্থিত এবং উহাদের কোমল দলরাজি পরস্পর মিলিতাকারে বিরাজিত। চন্দ্রাখ্য অপানবায়ু নাসাগ্র হইতে পাদাগ্র পর্য্যন্ত সমগ্র দেহাকাশেই প্রবহমাণ; উহার বিগলিত সুধার সেকে ঐ পঙ্কজদলরাজি সর্ব্বদাই প্রকাশমান। প্রাণ ও অপানপবনের মৃদু সঞ্চালনে কখন কখন ঐ হৃৎপদ্মযন্ত্রের পত্রগুলি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে এবং কখন কখন বা বিকাশপ্রাপ্ত হয়। বনপ্রদেশে প্রবল বায়ু বহিয়া যৎকালে তাহা লতাপত্রসমূহে প্রত্যাহত হয়, তখন যেমন ঐ বায়ু চারি

দিকে ছড়াইয়া পড়ে, তেমনি প্রাণ ও অপান পবন ঐ পদ্মযন্ত্রের স্পন্দমান পত্রে যখন প্রতিহত হয়, তখন তাহা চারি দিকে প্রসারিত হয়—হইয়া সমস্ত নাড়ীচ্ছিদ্রে প্রবেশপূর্ব্বক স্ফীত হইয়া উঠে। এইরূপে ঐ স্ফীত বা বর্দ্ধিত বায়ু দেহগৃহের মধ্যভাগে বিভিন্ন স্থান কল্পনা করিয়া লয় এবং প্রাণাদি পঞ্চ নাম প্রাপ্ত হইয়া ঊর্দ্ধ ও অধোদেশস্থ নাড়ীনিচয়ে প্রবেশ করত দেহাভ্যন্তরে প্রবাহিত হইয়া থাকে।

এই প্রকারে ঐ হৃৎপদ্ম-যন্ত্রের বায়ু ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য করে বলিয়া তত্ত্বদর্শী মহাত্মগণ উহাকে প্রাণ, অপান ও সমান প্রভৃতি নানানামে নিরূপিত করিয়া থাকেন। যেমন সুধাংশুবিম্ব হইতে রশ্মিমালা নির্গত হয়, তেমনি যে কিছু প্রাণশক্তি—সমস্তই ঐ তিন হৃৎপঙ্কজ-যন্ত্রের পবন হইতেই নিঃসৃত হয়—হইয়া এই দেহাভ্যন্তরে ঊর্দ্ধ ও অধোদিকে বিস্তার পাইতে থাকে। নাড়ীনিচয় মধ্যে গমন, প্রত্যাগমন, কর্ষণ, হরণ,বিহরণ, উৎ-পতন ও পতন ইত্যাদি অশেষবিধ ক্রিয়া ঐ প্রাণ-শক্তিপুঞ্জ হইতেই সম্পা-দিত হয়। ঐ সেই হৃৎপদ্মগত বায়ুকেই বুধগণ প্রাণ নামে কীর্ত্তন করেন।

হে মুনিপ্রবর! এই প্রাণাভিধেয় বায়ুর কোন শক্তি লোচন দুইটাকে প্রস্পন্দিত করে, কোন শক্তি স্পর্শ গ্রহণ করে, কোন শক্তি নাসিকার পথে প্রবাহিত হয়, কোন শক্তি ভুক্ত-পীত অন্ন-রস জীর্ণ করে এবং কোনও শক্তি বাক্য নিঃসারিত করিয়া দেয়। অধিক কহিব কি, যন্ত্রকর্ত্তা তাহার যন্ত্রকে যেমন যথেচ্ছ পরিচালিত করিতে পারে, তেমনি ভগবান্ পবন দেহমধ্যে থাকিয়া সকল প্রকার কার্য্যই সমাধা করিতে থাকেন।

হে মুনে! যে প্রাণাভিধেয় বায়ু ঊর্দ্ধগমনপূর্ব্বক সতত দেহমধ্যে প্রবহমাণ,এবং যে বায়ু অপাননামে অভিহিত হইয়া অধোগমন করত নিয়ত দেহাভ্যন্তরে সঞ্চরণশীল; আমি নিরন্তর সেই দুই বায়ুরই অনুসরণ করিয়া থাকি। এই দুই বায়ুই সর্ব্বদা শীত উষ্ণভাবাপন্ন এবং নিয়তই গগন-পথের পান্থ। এই যে কলেবর নামক মহাযন্ত্র, ঐ দুই বায়ুই ইহার অশ্রান্ত বাহক এবং উহারাই হৃদাকাশের সূর্য্য ও চন্দ্রস্বরূপ। ঐ বায়ুদ্বয়ই শরীরপুরের পরিরক্ষক, মনের রথচক্র এবং উহারাই অহঙ্কার-নরপতির দুইটী প্রশস্ত তুরঙ্গ।

হে ব্রহ্মন্! আমি এই দুই বায়ুকেই সতত সমরূপে রাখিয়া সাবধানে দিনাতিপাত করিতেছি। কি জাগ্রৎ, কি স্বপ্ন, কি সুষুপ্তি, সকল অবস্থাতেই সতত সমভাবাপন্ন ঐ প্রাণ ও অপানাখ্য দেহবায়ুদ্বয়ের অনুসরণ-পূর্ব্বক সুষুপ্ত ব্যক্তিবৎ কাল কাটাইতেছি। চিরদিন আমি এমনই ভাবে থাকিব। ঐ দুই বায়ুর গতি এতই সূক্ষ্ম যে, সতত উহা বিদ্যমান রহিলেও সহস্রধাখণ্ডিত একগাছী বিষতন্তুর একাংশ অপেক্ষাও অতীব দুর্লক্ষ্য।

হে মহাত্মন্! হৃদভ্যন্তরে এই দুই বায়ু অনবরত যাতায়ত করে। উহাদের গতি বিবিধ শ্রুতিবাক্যে বিবিধাকরে বর্ণিত আছে। যে ব্যক্তি উল্লিখিত বায়ুগতির অনুসরণ করে, সে মৃত্যুপাশ হইতে মুক্ত হয় এবং পরম আনন্দ প্রাপ্ত হইয়া ইহসংসারে আর জন্ম গ্রহণ করে না।

চতুর্ব্বিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২৪ ॥

পঞ্চবিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রঘুনাথ! সেই ভুশুণ্ড পক্ষী এই কথা কহিলে আমি তাহাকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম,—হে পক্ষিবর! প্রাণবায়ুর গতি কীদৃশ, তাহা আমার নিকট প্রকাশ করিয়া বলুন।

ভুশুণ্ড কহিলেন,—হে মুনে! আপনি সর্ব্বদর্শী; কিছুই আপনার অজ্ঞাত নাই; অথচ আমার নিকট আপনি জিজ্ঞাসিতেছেন; বুঝি না, এ আপনার কি লীলাখেলা! যাহা হউক, আপনি যখন প্রশ্ন করিয়াছেন, তখন আমি অবশ্যই বলিব; আপনি আমার কথা শ্রবণ করুন।

হে ভগবন্! এই প্রাণবায়ু সতত গতিশীল এবং সর্ব্বদাই স্পন্দ-শক্তিশালী। এ বায়ু অন্তরে বাহিরে নিয়ত ঊর্দ্ধদিকেই প্রবাহিত হইয়া থাকে। আর যাহার নাম অপানবায়ু, তাহাও সদাগতি ও স্পন্দশক্তি; এই বায়ু নিয়ত অধোদিকেই প্রবাহিত হয়। হে প্রাণায়াম-তত্ত্বজ্ঞ! কি জাগ্রৎ, কি স্বপ্ন, সকল অবস্থাতে সর্ব্বদাই যে উত্তম প্রাণায়াম প্রবর্ত্তিত

হইতেছে, এবং উহার মধ্যে যাহা শ্রেয়োলাভের হেতুভূত, এতৎসমস্ত বলিতেছি, শ্রবণ করুন। প্রাণবায়ু যে পূর্ব্বোক্ত হৃৎপদ্মযন্ত্র হইতে বিনা প্রযত্নে স্বভাবতই বহির্গমনে উন্মুখ হইয়া উঠে, ধীরগণ বায়ুর সেই বহির্গত হইবার উন্মুখীভাবকে রেচক আখ্যা প্রদান করিয়া থাকেন। মস্তক হইতে অধোবর্ত্তী বাহ্য দ্বাদশাঙ্গুলি-পরিমিত প্রদেশ আক্রমণ করিতে করিতে প্রাণ-বায়ুদিগের যে অঙ্গস্পর্শ, তাহাকে পূরক বলা হয়। ঐ বায়ু যখন বাহ্য প্রদেশ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া অন্তঃপ্রবিষ্ট হয়, তখন নাসাগ্র অবধি মূর্দ্ধা ও বহিরাগম সময়ে মূর্দ্ধাবধি নাসাগ্র পর্য্যন্ত যে বায়ুসংস্পর্শ সংঘটিত হইয়া থাকে, তথাবিধ উভয় প্রকার বায়ুস্পর্শকে অন্তঃপূরক আখ্যা প্রদান করা হয়। এইরূপে নৈসর্গিক অন্তঃকুম্ভক অবস্থাকেও বুঝিয়া লওয়া বিধেয়। অন্তঃকুম্ভক অবস্থার বিবৃতি এই যে, প্রাণ অপানে যায়,—যাইয়া যাবৎ না হৃদয়ে পুনরায় ফিরিয়া আইসে, তাবৎ তাহাকে কুম্ভক নামে নিরূপিত করা হয়। এই কুম্ভকাবস্থা যোগিগণ অনুভব করিয়া থাকেন। এইরূপে রেচক, পূরক ও কুম্ভক নামে প্রাণায়াম ত্রিবিধ বলিয়া উল্লিখিত। এতদ্ব্যতীত রেচক, কুম্ভক ও পূরক এই তিন প্রাণায়াম বাহিরেও কল্পিত হইয়া থাকে। ইহারা অপানবায়ুর উদয়স্থান—নাসাগ্র হইতে দ্বাদশাঙ্গুল-পরিমিত বহিরাকাশে বিশিষ্ট যত্নের অভাব থাকিলেও আপনা হইতেই হয়।

হে মহামতে! বিমলবুদ্ধি যোগিজন বাহ্য রেচকাদির বিবরণ যাহা বলিয়া থাকেন, তাহা বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন। হে প্রভো! নাসাগ্রের সম্মুখে দ্বাদশাঙ্গুল-পরিমিত স্থানের অভ্যন্তরে বায়ুর অবস্থানাদিকেই বাহ্য পূরকাদি বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়। নাসাগ্রের অগ্রভাগে দ্বাদশাঙ্গুল-পরিমিত স্থানের মধ্যভাগে মৃত্তিকার মধ্যগত অনুৎপন্নাবস্থ ঘটের ন্যায় আকাশপথে অপান পবনের যে অবস্থিতি, বুধগণের মতে তাহাই বাহ্য কুম্ভক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। বাহ্যাভিমুখ পবনের যে নাসাগ্র পর্য্যন্ত গতিবিধি, যোগতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর মতে তাহাই প্রাথমিক বাহ্য পূরক নামে নিরূপিত। বায়ু নাসাগ্র হইতে নির্গত হইবার পর দ্বাদশাঙ্গুল-পরিমিত প্রদেশে তাহার যে গতিবিধি, তাহাকেই ধীরগণ অন্য

প্রকার বাহ্য পূরক নামে নিরূপণ করিয়া থাকেন। প্রাণপবন বাহিরে প্রশমিত হইলে যে পর্য্যন্ত না অপান পবন অভ্যুদিত হয়, ততদিন পর্য্যন্ত যে এক পরিপূর্ণ সমাবস্থা, তাহাই বাহ্য কুম্ভক নামে নির্ণীত। অপান বায়ুর যে অস্পন্দ অন্তর্মুখীভাব, তাহাকেই বাহ্য রেচক বলিয়া কল্পনা করিতে হয়। যিনি এই বাহ্য রেচকের বিষয় চিন্তা করিতে থাকেন, তাঁহার পক্ষে মুক্তি অদূরবর্ত্তিনী। বাহ্য দ্বাদশাঙ্গুলি-পরিমিত প্রদেশের চরমভাগ হইতে নাসাগ্র পর্য্যন্ত অপান বায়ুর স্বরূপাভিব্যক্তি নিবন্ধন যে পীবরত্ব, তাহা অষ্টবিধ বাহ্য পূরক আখ্যায় নির্দ্দিষ্ট। এই সকল বাহ্য ও আভ্যন্তর কুম্ভকপূরকাদিরূপ প্রাণ ও অপান বায়ুর স্বভাব অনবরত বিদিত হইতে পারিলে, কদাচ আর জন্ম লইতে হয় না।

হে মহাবুদ্ধে! আমি যে এই অষ্টবিধ দেহবায়ুর স্বভাবের কথা কহিলাম, যদি দিবারাত্র অভ্যাস করা যায়, তাহা হইলে ইহা হইতেই মুক্তিলাভ হইতে পারে। কি শয়ন, কি স্বপন, কি জাগরণ, কি গমন, যদি প্রতিনিয়ত অভ্যাস করা যায়, তাহা হইলে সকল সময়েই ঐ বায়ু নিরুদ্ধ হওয়া অসম্ভব নহে। যিনি বুদ্ধিপূর্ব্বক এই কুম্ভকাদি প্রাণায়াম অনুষ্ঠান করেন, তিনি ভোজন, পান বা অন্য কোন ক্রিয়া সমাধা করিলেও তাঁহার মনোমধ্যে কর্ত্তৃত্ব কিছুই থাকে না। এইরূপ প্রাণচিন্তা বিষয়ে যাঁহার চিত্ত আসক্ত হইয়া থাকে, তিনি কিয়দ্দিনের মধ্যেই বাহ্য বস্তুর আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া কৈবল্যপদ অধিগত হইয়া থাকেন। কুক্কুর-চর্ম্মে ব্রাহ্মণের যেমন ঘৃণার উদয় হয়, তেমনি এই প্রাণচিন্তা করিতে করিতে মানবের চিত্ত বাহ্য বিষয়ে ঘৃণা করে; কোনরূপেই তাহাতে প্রীত হইতে পারে না। যে সকল কৃতবুদ্ধি মানবেরা এ হেন প্রাণচিন্তারূপ দৃষ্টি অবলম্বনপূর্ব্বক অবস্থান করেন, তাঁহাদের আর কোন প্রাপ্তব্যই অপ্রাপ্ত থাকে না, তাঁহারা সমস্তই লাভ করিতে পারেন। তাঁহারাই প্রকৃত পক্ষে অক্লিষ্ট এবং তাঁহারাই অথির। কি জাগরণ, কি স্বপন, কি গমন, কি অবস্থান, সর্ব্বদা সর্ব্ব সময়েই যদি এই প্রাণচিন্তা-দৃষ্টি অবলম্বন করা যায়, তাহা হইলে এ সংসারে আর কদাচ বন্ধন প্রাপ্ত হইতে হয় না।

এইরূপে যাঁহারা প্রাণ ও অপান-পবনের নিরোধক্রিয়া অভ্যাস

করেন,—করিয়া তত্ত্বজ্ঞান অধিগত হইতে পারেন, তাঁহাদের অন্তঃকরণ একেবারেই মোহবিহীন হয়; তাঁহারা নির্ম্মোহ হইয়া অবস্থান করিতে থাকেন। যদি প্রাণ ও অপান বায়ুর এবম্বিধ গতিলাভ করিতে পারা যায়, তাহা হইলে মানব কর্ত্তৃক সর্ব্বদা সকল প্রকার ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইলেও তিনি নির্ম্মল হইয়া স্বস্থভাবে অবস্থান করিয়া থাকেন। তাঁহার সর্ব্ববিধ সুখই লব্ধ হইয়া থাকে।

হে ব্রহ্মন্! হৃৎপঙ্কজদল হইতে অভ্যুদিত হইয়া বাহ্য দ্বাদশাঙ্গুলি-পরিমিত প্রদেশের চরমভাগে গিয়া প্রাণবায়ুর যে নিশ্চলাকারে অবস্থান, তাহাই প্রাণের অভ্যুদয় বলিয়া কথিত। হৃৎপদ্মের বাহ্য দ্বাদশাঙ্গুলি-পরিমিত স্থান হইতে উত্থিত হইয়া অপানবায়ু যে হৃৎপঙ্কজের অভ্যন্তরে নিশ্চলভাব ধারণ করে, তথাবিধ নিশ্চলীভাব ধারণই অপানবায়ুর অভ্যুদয় বলিয়া নিরূপিত হয়। যৎকালে বাহ্য দ্বাদশাঙ্গুলি-পরিমিত প্রদেশের প্রান্তসীমা পর্য্যন্ত প্রাণবায়ু শূন্যমার্গে পরিচালিত হয়, তখন অপানবায়ু সেই প্রদেশ হইতে ভিতরের দিকে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করে। প্রাণবায়ু বহিরাকাশের অভিমুখে উন্মুখ হয়,—হইয়া অনলশিখার সদৃশ বহিয়া যায়। আর অপানপবন হৃদাকাশের অভিমুখে উন্মুখ হইয়া সলিলের প্রায় নিম্নের দিকে ধাবিত হইতে থাকে। অপান-পবন চন্দ্রের আকারে বহির্দিক্ হইতেই দেহকে আপ্যায়িত করিতে থাকে। প্রাণপবন তপন বা অনলের আকারে এ দেহের অভ্যন্তরভাগ পরিপাচিত করে। প্রখর দিনকররূপে প্রতি মুহূর্ত্তেই প্রাণবায়ু হৃদাকাশকে তাপিত করত পশ্চাৎ মুখাগ্ররূপ আকাশকে তাপিত করিতে থাকে। অপান-পবন চন্দ্রাকারে নিমেষকালের অভ্যন্তরেই মুখাগ্র দেশ অপ্যায়িত করিয়া পশ্চাৎ হৃদাকাশকে আপ্যায়িত করে। যেখানে থাকিয়া প্রাণরূপ তপন অপান-সুধাকরের মধ্যগত কলা গ্রাস করেন, তথাবিধ ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইয়া আর কখনই শোকগ্রস্ত হইতে হয় না। যেখানে থাকিয়া অপান-সুধাকর প্রাণরূপ তপনের অভ্যন্তরগত কলা গ্রাস করেন, সেই পরম পদ পাইয়া লোককে আর সংসারে জন্ম লইতে হয় না। কি বহিরাকাশ, কি অন্তরাকাশ, উভত্রই প্রাণবায়ু তপনাকারে প্রকাশমান হইয়া পশ্চাৎ

আবার আহ্লাদ-জনক চন্দ্রাকার ধারণ করে। অতঃপর ঐ প্রাণ-পবনই আহ্লাদ-জনক চন্দ্রভাব পরিহার করিয়া শোষণ-কর সৌরপদে উপনীত হইয়া থাকে। প্রাণপবন যতক্ষণ না সৌরভাব পরিহারপূর্ব্বক চন্দ্রভাব বা শীতলতা অধিগত হয়, ততক্ষণ প্রাণ ও অপানের সেই সন্ধি অবস্থায় বাহ্য প্রাণ পবনের বিলয় বশতঃ আত্মার নিরবয়ব, নিষ্ক্রিয় ও নির্ম্মনস্কাদি বাস্তব স্বভাব বিচারে স্পষ্টতই প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। তদবস্থায় যোগী পুরুষ দেশ ও কালানুসারে অপরিচ্ছন্ন আত্মায় অবস্থিত থাকেন বলিয়া আর কখনই শোকাভিভূত হন না।

এইরূপে মন যখন হৃদভ্যন্তরের ও নিয়ত রবি-শশীর অস্তোদয় পরিজ্ঞাত হইয়া আপন অধিষ্ঠান পরমাত্মার সন্ধান লাভ করে, তখন আর জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না। যিনি স্বীয় হৃদভ্যন্তরেই রবি-শশীকে উদয়াস্তময় ও আগমাপায়-সম্পন্ন রশ্মি-মালায় উদ্ভাসিত দেখেন, তিনিই বাস্তবিক দ্রষ্টৃ-পদ-বাচ্য। বাহিরের অন্ধকার ক্ষয় প্রাপ্ত হউক বা নাই হউক, তাহাতে কোনই ক্ষতি বৃদ্ধি নাই; পরন্তু যিনি হৃদয়ের অন্ধকার দূরীভূত করিতে পারেন, তিনিই বাস্তবিক সিদ্ধি লাভের অধিকারী।

মুনিবর! বাহিরের অন্ধকার যদি নষ্ট হয়, তাহা হইলে মাত্র জগৎই আলোকিত হইয়া থাকে; পরন্তু হৃদয়ের অন্ধকার যদি নাশ পায়, তাহা হইলে নিজেই আলোকিত হওয়া যায়। এই প্রাণরূপ সূর্য্য উদয় ও অস্তময়; ইহা হৃদয়ের অন্ধকার অপনয়নে সক্ষম। যদি ইহাকে বিশিষ্টরূপে পরিজ্ঞাত হইতে পারা যায়, তাহা হইলেই মুক্তিলাভ হইয়া থাকে; সুতরাং যত্নের সহিত প্রাণরূপ সূর্য্যের সন্দর্শন করাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। যে হৃৎপঙ্কজের অভ্যন্তরে অপানরূপ সুধাকর অস্তগত হয়, প্রাণসূর্য্য সেইখান হইতেই সমুদিত হইয়া বাহিরুন্মুখ-ভাব আশ্রয় করিয়া থাকেন। অপান-পবন অস্তগত হইবার পর প্রাণ-পবন হৃৎপঙ্কজ হইতে অভ্যুদিত হইয়া থাকে। যেমন ছায়ার অপায় হইলে সেইখানে আতপোদয় হয়, আবার আতপ যখন অপগত হয়, তখন তাহার সঙ্গে সঙ্গেই ছায়া আসিয়া দেখা দেয়, তেমনি প্রাণবায়ু অস্তগত হইবার পরক্ষণেই বাহ্য প্রদেশ হইতে সেইখানে অপান-পবন আসিয়া উপস্থিত হইয়া থাকে।

হে সুবোধ! এতাবতা জানিতে হইবে, যথায় প্রাণপবনের জন্ম হয়, সেখানে অপান-পবন বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া যায়; আবার অপান-পবনের যাহা জন্মভূমি, সেখানে প্রাণপবনের বিনাশ হইয়া থাকে। যৎকালে প্রাণ-পবন অস্তগত হয় ও অপান-পবন উদয়োন্মুখ হইয়া উঠে, তখনকার সেই অবস্থার নামও বাহ্য কুম্ভক। এই বাহ্য কুম্ভককে যদি অবলম্বন করা যায়, তাহা হইলে কোন সময়ের জন্যই শোক করিতে হয় না। অপিচ যে সময় অপানপবন অস্তগত হয়, আর প্রাণপবন ঈষদুদয়োন্মুখ হইয়া উঠে, তখন তাহাকে অন্তঃকুম্ভক আখ্যায় অভিহিত করা হয়। এই অন্তঃকুম্ভক যদি অবলম্বিত হয়, তাহা হইলে চিরদিনের জন্য শোকাবসান হইয়া থাকে; আর কখনই শোক করিতে হয় না। অপান-পবনের উদয়স্থান দ্বাদশাঙ্গুলি-পরিমাণ; উহা অপেক্ষা দূর কোটি-গত ষোড়শাঙ্গুলি যাবৎ প্রসর্পিত প্রাণরেচক অবলম্বনপূর্ব্বক বিমল কুম্ভক অভ্যাস করিতে পারিলে পুনরায় আর কখনই পরিতপ্ত হইতে হয় না। যিনি দেখেন, অপান-পবন নাসারন্ধ্রের মধ্য দিয়া ভিতরের দিকে প্রবেশ করিতেছে, এবং বাহ্য রেচকাধার পূরক পবন প্রাণপবনের পূরণের জন্য অভ্যন্তর দিকে প্রবিষ্ট হইতেছে, তথাবিধ প্রাণতত্ত্বদর্শী পুরুষ আর কদাচ পরিতাপ ভোগ করেন না বা পুনরায় সংসারে জন্ম লয়েন না। যাহাতে প্রাণ ও অপান এই উভয় পবনই বিলয় পাইয়াছে, সেই শান্ত আত্মপদ যদি প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা হইলে কদাচ শোকগ্রস্ত হইতে হয় না। অপান-পবন যখন প্রাণ-পবনকে গ্রাস করিতে উদ্যত হয়, তখন কি বাহ্য কুম্ভক, কি আন্তরিক কুম্ভক, যাহাতেই হউক, বিচারালোচনায় সমুদায় দেশ ও কালকে যদি নিষ্ফল বা চিন্মাত্ররূপে নিশ্চয় করিতে পারা যায়, তাহা হইলে আর কখনই শোকাক্রান্ত হইতে হয় না। এ দিকে প্রাণ যখন অপানকে গ্রাস করিতে উদ্যত হয়, তখন অন্তরে বাহিরে দেশ ও কালসম্বন্ধে অপরিচ্ছিন্ন দৃষ্টি অবলম্বন করিতে পারিলে আর কদাচ শোকগ্রস্ত হইতে হয় না। যখন প্রাণ অপান কর্তৃক এবং অপান প্রাণ কর্তৃক নিগীর্ণ হয়, তখন দেখিতে হইবে, দেশ কিম্বা কালও কবলিত হইয়াছে। যেখানে প্রাণ-পবন অস্তগত হওয়ায় অপান-পবনের উদয় হয় না, তখনকার সেই

অবস্থা যোগীদিগের নিকট অযত্নসিদ্ধ বাহ্য কুম্ভক বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। যাহাকে অযত্নসিদ্ধ অন্তঃকুম্ভক বলে, তাহারই নাম পরম পদ; তাহাই আত্মার প্রকৃত স্বরূপ এবং তাহাকেই সুবিশুদ্ধ পরম চিৎ আখ্যা প্রদান করা হয়। এই সংপ্রকাশময় চিৎস্বরূপ প্রাণবায়ুর অভ্যন্তরেই বিদ্যমান। যদি কখনও ইহাকে লাভ করিতে পারা যায়, তাহা হইলে আর কদাচ শোকগ্রস্ত হইতে হয় না। প্রাণবায়ুর অন্তরে ঐ চিৎস্বরূপের অবস্থান,—পুষ্পাভ্যন্তরে সৌরভ-স্থিতিরই অনুরূপ। যিনি প্রাণও নহেন, অপানও নহেন, আমরা সেই চিদাত্মারই উপাসনা করি। যিনি জলের ভিতর আস্বাদের ন্যায় অপানের অন্তরে অবস্থিত, অপিচ যাঁহাকে নির্জ্জীব বা সজীব কিছুই বলা চলে না, আমরা তাদৃশ পরমাত্মারই উপাসনা করিয়া থাকি। যিনি প্রাণক্ষয়ের উপান্তবর্ত্তী এবং অপানক্ষয়ের কোটিগত, আমরা সেই প্রাণ ও অপানের মধ্যস্থ চিদাত্মাকে উপাসনা করি। যিনি প্রাণেরও পরম প্রাণন এবং জীবেরও পরম জীবন, আমরা সেই দেহ-ধারণের ধুরন্ধর চিদাত্মার উপাসনা করিতেছি। যিনি মনেরও মনন, বুদ্ধিরও বোধন, অহঙ্কারেরও অহঙ্কার, আমরা সেই চিদাত্মারই উপাসনা করি। যাঁহাতে সকল, যাঁহা হইতে সকল, যিনি সকল, সকল হইতে যিনি, এবং যিনি সর্ব্বময় ও সত্যস্বরূপ, সেই চিত্তত্ত্বকেই আমরা উপাসনা করি। যিনি সকল আলোকের আলোক, নিখিল পবনের পবন এবং মন ও বুদ্ধি প্রভৃতি বিকারযোগে পূর্ব্বস্বভাব হইতে অপ্রচ্যুত, সেই পবিত্র চিত্তত্ত্বের আমরা উপাসনা করি। যাহাতে অপানের অস্তগমন ও প্রাণের অভ্যুদয় নাই, সেই নিষ্কল নিষ্কলঙ্ক চিদাত্মার আমরা উপাসনা করি। অপিচ যথায় প্রাণবায়ুর উদয় নাই বা অপানবায়ুর অস্তগমন নাই, নাসাগ্র-গগনের পথানুবর্ত্তী সেই চিদাত্মার আমরা উপাসনা করি। যেখানে প্রাণ ও অপান উভয়ই অস্তগত ও পুনরুৎপত্তি-বর্জ্জিত, আমরা সেই চিদাত্মারই উপাসনা করিয়া থাকি। প্রাণ ও অপান-পবনের যে দুইটী বাহ্য ও আভ্যন্তর উৎপত্তিভূমি এবং যাহা যোগীদিগের জ্ঞানাধার, আমরা সেই চিত্তত্ত্বেরই উপাসনা করি। যিনি প্রাণ ও অপান-রথে আরূঢ় এবং পরিচ্ছিন্নরূপে প্রাণ ও অপান-শক্তিরূপে বিরাজিত। আমরা সেই সর্ব্ব-

শক্তিরও শক্তিস্বরূপ চিদাত্মার উপাসনা করিয়া থাকি। যিনি অন্তরে প্রাণ-পবনের এবং বাহিরে অপান-পবনের কুম্ভক ও পূরকাদিরূপে পরিবর্ত্তমান, আমরা সেই চিদাত্মারই উপাসনা করি। যিনি প্রাণ ও অপানের পরিচালক, প্রাণ ও অপানের সত্তাবোধক এবং যিনি প্রাণের উপাসনাযোগে একমাত্র প্রাপ্য বস্তু, আমরা সেই চিদাত্মারই উপাসনা করি। যিনি প্রাণপবনের, স্পন্দনের, ইন্দ্রিয়সমূহ-কৃত বিষয়স্পর্শের এবং বিষয়ভোগ জন্য আনন্দের হেতুভূত, আমি সেই সকল কারণের কারণীভূত চিদাত্মারই উপাসনা করিতেছি।

হে মুনে! এই নিখিল পরিচ্ছেদ-কল্পনারূপ কালিমা যাঁহাতে নাই; কিন্তু আপাতদর্শনে সদাই যিনি সকল কল্পনাজালে জড়িত বলিয়া প্রতীয়মান, সম্যক্ অনুভব বা জ্ঞানই যাঁহার বিভব, সেই সমস্ত সুরজন-বন্দিত সর্ব্বপ্রধান পরমাত্ম-পদের প্রান্তে আমরা প্রণত হই।

পঞ্চবিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২৫ ॥

ষড়্বিংশ সর্গ

ভুশুণ্ড কহিলেন,—হে মহামুনে! স্বয়ং আমি এই প্রকারে প্রাণ সমাধি অবলম্বন করিয়া এ হেন ক্রমানুসারেই নির্ম্মল আত্মায় চিত্ত-বিশ্রান্তি লাভ করিয়াছি। এইরূপ প্রাণায়াম-যোগ আশ্রয় করিয়া আছি বলিয়াই এই সুমেরু সঞ্চলিত হইলেও আমি অণুমাত্র টলি না; আমার স্থৈর্য্য ধৈর্য্য সর্ব্বদাই অটলভাবে অবস্থিত। আমি স্বপন, জাগরণ, চলন বা অবস্থান যে কোন অবস্থাতেই অবস্থান করি, আমার এই আত্মস্থ অবিচল সমাধি স্বপ্নেও চলিত হইবার নহে। এ জগতের প্রিয়াপ্রিয় সুখ-দুঃখ দশা নিত্য, অনিত্য ও সুচঞ্চল; আমি ইহাতে বিক্ষিপ্ত হই না——সতত অন্তর্মুখ হইয়া আত্মাতেই স্বচ্ছন্দরূপে অবস্থান করিতে থাকি।

যদি কখন বায়ুকেও নিরুদ্ধ করা সম্ভব হয়, অথবা প্রখর স্রোতঃশালিনী নদীর প্রবাহকেও যদি নিরুদ্ধ করা যাইতে পারে, তথাচ আমার এই যে সমাধি, এ সমাধির নিরোধ কেহই করিয়া উঠিতে পারে না। এই সমাধির বিরুদ্ধভাব কখনই আমি স্মরণ করি না।

হে তাপসাগ্রণী! আমি উল্লিখিতরূপ প্রাণ ও অপান-পবনের অনুসরণপূর্ব্বক পরমাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছি এবং যাহাতে শোক নাই, যাহা অনাদি পদ, আমি সেই পরম পদ প্রাপ্ত হইয়াছি।

হে ব্রহ্মন্! আমি মহাপ্রলয়ের সূচনা হইতে এ যাবৎ ধীরতার সহিত জীবনিবহকে উন্মগ্ন ও নিমগ্ন হইতে দেখিয়া আসিতেছি। অতীতে কি হইয়াছে, ভবিষ্যতে কি হইবে, সে সম্বন্ধে আমি কিছুই চিন্তা করি না। আমি কেবল বর্ত্তমান দৃষ্টি লইয়াই অবস্থান করিতেছি। কোন বিষয়ে ফলাকাঙ্ক্ষা আমার নাই; কেবল সুষুপ্ত জনবৎ নিত্যই অবুদ্ধি-পূর্ব্বক আমি উপস্থিত কার্য্য মাত্রই করিয়া যাই। এইটী ভাব পদার্থ, আর ঐটী অভাব পদার্থ, ইহা প্রিয়, উহা অপ্রিয়, এই প্রকার চিন্তা আমার নিকট হেয় বলিয়া বিবেচিত হয়; আমি চিরদিন আত্মাতেই অবস্থিত এবং অনাময়-দেহে চিরজীবী হইয়া বিরাজিত। যিনি প্রাণ ও অপানপবনের সন্ধিক্ষণে প্রতিভাত, আমি সেই পরব্রহ্মের অনুসরণ করিয়া কেবল আত্মাতেই তুষ্ট আছি। তাই আমি অনাময়-দেহে চির-জীবী। আমি অদ্য ইহা লাভ করিলাম, পরে ইহা অপেক্ষা আরও উত্তম বস্তু প্রাপ্ত হইব, এই প্রকার চিন্তা আমার হৃদয়ে স্থান পায় না; তাই আমি অনাময় ও চিরজীবী হইয়া বিরাজিত।

হে সাধো! আমি কখন না নিজের, না পরের, কাহারই কোন স্তুতি বা নিন্দা করি না; তাই আমার এ হেন শুভ-সমাগম হইয়াছে। আমার চিত্ত শুভ-সমাগমেও সন্তুষ্ট নহে এবং অশুভ-সমাগমেও খিন্ন নহে; তাই আমি নিত্য এরূপ শুভ লাভ করিয়াছি। আমার নিখিল দ্বৈত-ভাবনা পরিত্যক্ত হইয়াছে; এমন কি জীবনাদি ব্যাপারে যে একটা অভিনিবেশ, তাহাও আমার নাই। সে সকল আমি ত্যাগ করিয়াছি; তাই আমার শুভ-সমাগম ঘটিয়াছে।

হে মুনে! আমার মনের চাঞ্চল্য শান্ত হইয়াছে, শোক তাপ দূরে গিয়াছে। মন এখন স্বচ্ছ, শান্ত ও সমাহিত হইয়াছে; সেই জন্যই আমি চিরজীবী হইয়াছি; আমার আধিব্যাধি কিছুমাত্রই নাই। আমি এক-সঙ্গে কামিনী, কাঞ্চন, তৃণ, লতা, শৈল, অনল, গগন বা তুষার, সর্ব্বত্র সমদর্শী হইয়া অবস্থান করিতেছি; তাই আমি অনাময় এবং সেই জন্যই আমি চিরজীবী। অদ্য আমার কি হইল, আর কল্য প্রভাতে আমার কি হইবে, এরূপ চিন্তা আমার নাই—এরূপ চিন্তাজ্বরে আমি ক্লিষ্ট নহি; তাই আমি অনাময় এবং তাহারই জন্য আমি চিরজীবী। কি জরা-মরণ-জনিত দুঃখ-পরম্পরা, কি রাজ্যলাভ-জনিত সুখ-সমৃদ্ধি, ইহার কোন কিছুতেই আমি ভীত বা হৃষ্ট নহি; তাই আমি চিরজীবী ও অনাময়।

হে বিভো! এই মিত্র, ঐ অমিত্র, ইহা আমার, উহা আমার নহে, এবম্বিধ জ্ঞান আমার নাই, এই জন্যই আমি অনাময় ও চিরজীবী। যিনি সকল, যিনি সকলের প্রকাশক এবং অনাদি অনন্ত চিৎস্বরূপ; আমি জানি,—আমিই সেই। আমি নিজেকে এইরূপে চিদভিন্নরূপে জানি বলিয়াই অনাময় এবং চিরজীবী। কি আহার, কি বিহার, কি স্বপন, কি জাগরণ, কি উত্থান, কি অবস্থান, কোন এক সময়ের জন্যই 'এই দেহ আমি বা আমার' এরূপ জ্ঞান আমি করি না। যেমন কোন সুষুপ্ত লোক, তেমনই আমি অবস্থান করি; আর এই যে কিছু সংসার-ব্যাপার, এ সমুদায়কে আমি অসৎ বা অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকি। এই কারণেই আমি অনাময় এবং চিরজীবী। কি অর্থ, কি অনর্থ, যথাকালে উভয়ই আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হয়; কিন্তু শরীরস্থ হস্তদ্বয়ের ন্যায় উহাদিগকে আমি সমান বলিয়াই জ্ঞান করিয়া থাকি। তাই আমি নিরাময় ও চির-জীবী। অবিচল চিত্তস্থৈর্য্য ও স্নিগ্ধ মুগ্ধ সমদৃষ্টি, এই উভয় দ্বারাই সর্ব্বত্র আমি সমস্ত সরলাকারেই অবলোকন করিতেছি। এই যে আপাদ মস্তক দেহ রহিয়াছে, এ দেহের কোন অংশেই আমার মমত্ব বোধ নাই। ফল কথা, এ দেহের কোন অঙ্গই আমার বলিয়া আমি জ্ঞান করি না। মদীয় অহঙ্কার-পঙ্ক আমি প্রক্ষালিত করিয়া ফেলিয়াছি। আমি যাহা করি, যাহা খাই, সকলই নিরভিমান হইয়া করিয়া থাকি। আহার-বিহারাদি

কার্য্য সকল মদীয় দৈহিক চেষ্টায় নির্ব্বাহিত হইলেও মন আমার সে সমুদায়ে নিষ্কর্ম্মা হইয়াই অবস্থান করে। এই কারণেই আমি নিরাময় ও চিরজীবী।

হে মুনে! আমি যে কোন মুহূর্ত্তে যে কোন বিষয়েরই জ্ঞান বা ভাবনা করি না কেন, আমার বুদ্ধি সেই মুহূর্ত্তেই বিনীতভাবে অবস্থান করে। আমার মতি কোন সময়ের জন্যই প্রগল্ভতার আশ্রয় লয় না। আমি অন্যকে পরাভূত করিতে পারি, কিন্তু পারিলেও তাহা করি না; আর যদি কখন আমি অন্যের নিকট পরাভূত হই, তথাচ তাহাতে আমার ক্লেশ নাই; আমি অনায়াসে সে পরাভব সহ্য করিয়া থাকি। অন্যে আমাকে পরাভূত করিল বলিয়া ক্লেশের লেশমাত্র অনুভব করি না। অপিচ আমি দরিদ্র হইলেও কোন কিছুর প্রত্যাশী নহি; এই জন্যই আমি চির নীরোগ ও চিরজীবী। এই চেতনপ্রায় দেহ অবভাসমান হইলেও আমি চিন্মাত্রদর্শী ও সর্ব্বভূতস্থ আত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ভূতবৃন্দকে স্বীয় দেহের ন্যায় দর্শন করি; এইজন্যই আমি অনাময় ও চিরজীবী। আমি নিত্য সমাহিত অবস্থায় আছি; আমার অন্তরে আশাপাশ-নিবদ্ধ চিত্তবৃত্তিকে আমি প্রবেশ পথ প্রদান করি না; এই কারণেই আমার চিরজীবিত্ব ও অনাময়ত্ব নিত্য-সিদ্ধ। আমি বাহ্য বস্তুর দর্শন-ব্যাপারে সুষুপ্তাবস্থায় থাকিয়া এ জগতের অসত্তাই অবলোকন করি এবং অন্তরে অন্তরে প্রবুদ্ধ থাকিয়া করগত বিল্বফলবৎ কেবলই এক আত্মারই সত্তা দর্শন করিতে থাকি। এ সংসারের সকল প্রপঞ্চই জীর্ণ, ভিন্ন, ভগ্ন, ক্ষীণ, ক্ষুব্ধ, ক্ষুণ্ণ ও ক্ষয়প্রাপ্ত হইলেও আমি ইহাদিগকে নিত্যই নূতনবৎ অবলোকন করিতেছি। আমি সুখীর সুখে সুখী হই এবং দুঃখীর দুঃখে দুঃখী হইয়া থাকি। আমি সমুদায়েরই প্রিয় বন্ধু; তাই আমি অনাময় ও চিরজীবী। আমি আপৎকালেও অচল ও অটল হইয়া ধীর-ভাবে থাকি। এ জগতের সমস্তই আমার মিত্রতাপাশে আবদ্ধ, সম্পদের ক্ষয় বা উদয় ইহার কোন কিছুতেই আমি অভিনিবিষ্ট নহি; তাই আমি অনাময় ও চিরজীবী হইয়া আছি। আমি কেহই নহি, অন্যেও আমার কেহই নহে, এবং আমিও কখন অন্যের নহি। আমার চিত্তে এই প্রকার

ভাবনাই বদ্ধমূল রহিয়াছে; সুতরাং আমি নিরাময় ও চিরজীবী হইয়া আছি। এ জগৎ আমি, দেশ-কাল-ক্রিয়ার নিয়ামক আকাশ আমি এবং ক্রিয়া আমি, ফলতঃ আমিই সকল; এইরূপ বুদ্ধি আমার নিত্য বিদ্যমান। তাই আমি অনাময় ও চিরজীবী। আমি বেশ বুঝি,—ঘটও চিৎ, পটও চিৎ, মঠও চিৎ, শকটও চিৎ, আকাশও চিৎ, অরণ্যও চিৎ, অধিক আর কি বলিব, এ জগতের সকলই চিৎ; এই প্রকার ভাবনাময় হইয়া আছি বলিয়াই আমি অনাময় ও চিরজীবী।

হে মুনিনায়ক! এইরূপে আমি এই ত্রিভুবন-কমলের অলি-স্বরূপে বিরাজ করিতেছি এবং চিরজীবিত ভুশুণ্ডাখ্য বায়স বলিয়া বিখ্যাত হইয়া আসিতেছি। এই ত্রিজগৎ ব্রহ্মার্ণবের তরঙ্গোপম; ইহাকে আমি ক্ষয়োদয়াদি ঘাত-প্রতিঘাতে চিরদিনই বিবিধ বিচিত্রাকারে আবির্ভূত ও বিলয় প্রাপ্ত হইতে দেখিতেছি। বুদ্ধি, মন ও ইন্দ্রিয়সমূহের দৃশ্য জগৎকে উত্থানকালে অবলোকন ও সমাধিকালে প্রকালন করিয়া চিরদিনই আমি অবস্থিত রহিয়াছি।

ষড়্বিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২৬ ॥

সপ্তবিংশ সর্গ।

ভুশুণ্ড কহিলেন,—হে জ্ঞান-পারগামিন্ ব্রহ্মন্! যেরূপে আমি জন্মিয়াছি, যে ভাবে অবস্থান করিতেছি, ভবদীয় আদেশ-রক্ষার জন্য তৎসমস্তই ধৃষ্টতার সহিত আপনার সমীপে আমি বর্ণন করিলাম।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—অহো! কি অপূর্ব্ব কথাই শুনিলাম! হে ভগবন্! আপনি যে এই শ্রুতি-সুখকর আত্মবৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন, ইহা বাস্তবিকই বিস্ময়াবহ। আপনি একান্তই চিরজীবী মহাত্মা ব্যক্তি; দ্বিতীয় কমলযোনির ন্যায় আপনাকে যাহারা দর্শন করে, তাহারা প্রকৃতই

ধন্য হইয়া থাকে। আপনার এই আত্মবৃত্তান্ত বুদ্ধির পবিত্রতা-জনক; ইহা আপনি আমার নিকট বর্ণন করিলেন। আমি ধন্য হইলাম। আপনার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া আমার দুই চক্ষু সফল হইল। আমি সর্ব্বদিক্ ভ্রমণ করিয়াছি, বিবুধগণের বিভূতি ও জ্ঞানীদিগের জ্ঞানৈশ্বর্য্য সকলই আমি দেখিয়াছি; কিন্তু সত্য কথা বলিতে কি, ভবাদৃশ জ্ঞানবান্ মহৎ ব্যক্তি কুত্রাপি আমি দেখি নাই। এই বিশাল বিশ্বের মধ্য দিয়া অনবরত ঘুরিয়া বেড়াইলে কদাচিৎ কোথাও দুই একটী মহাজন মিলিতে পারে; কিন্তু আমার ইহা নিশ্চয় ধারণা যে, আপনার ন্যায় তত্ত্বজ্ঞান-শালী মহাত্মা ব্যক্তি এ জগতের কুত্রাপি নাই। যেমন বহু বংশখণ্ড অন্বেষণ করিলে কদাচিৎ কোনও একটার ভিতর মুক্তা পাওয়া যায়, তেমনি কোন না কোন জগৎখণ্ডের অভ্যন্তরে হয় ত আপনার ন্যায় ব্যক্তির সাক্ষাৎকার পাওয়া যাইতে পারে। আপনি পুণ্যাত্মা মুক্ত পুরুষ; আমি আপনাকে দেখিতে পাইলাম, ইহা আমার পক্ষে অদ্য এক সুমহৎ শুভকার্য্যেরই অনুষ্ঠান হইল।

হে পক্ষিবর! তোমার মঙ্গল হউক; তুমি তোমার শুভময় গুহায় প্রবেশ কর। এক্ষণে মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত হইয়াছে। আমি এখন সুরপুরে প্রয়াণ করি।

বিহঙ্গম-রাজ ভুশুণ্ড আমার এই কথা শ্রবণ করিয়া আপনার আবাস-বৃক্ষ হইতে উত্থিত হইলেন এবং সঙ্কল্প-কল্পিত করযুগ দ্বারা ঐ বৃক্ষের একটী সুবর্ণ-পল্লব তুলিয়া লইলেন। পরে ঐ সুবর্ণ-পল্লব দ্বারা পূর্ণমনা ভুশুণ্ড একটী পাত্র প্রস্তুত করিলেন। অনন্তর তুষার-শুভ্র কল্প-পাদপের কুসুম-কেশর ও মুক্তারাজি দ্বারা ঐ পাত্র পূর্ণ করিয়া লইলেন। এইরূপে একটী অর্ঘ্য প্রস্তুত হইল। তখন সেই চিরজীবী ভুশুণ্ড বায়স ভক্তির সহিত অর্ঘ্য, পাদ্য ও পুষ্প প্রদানপূর্ব্বক মহেশের ন্যায় মদীয় সর্ব্বাঙ্গের অর্চ্চনা করিলেন।

অনন্তর আমি বলিলাম,—হে বিহঙ্গরাজ! আমার অনুগমন করিবার ক্লেশ স্বীকারে তোমার প্রয়োজন নাই। এই বলিয়া আমি তখন তথা হইতে উত্থিত ও পক্ষীর ন্যায় উড্ডীন হইলাম। কিন্তু সেই বায়স

কিছুতেই আমার আনুগত্য পরিত্যাগ করিলেন না; আমার নিষেধ সত্ত্বেও তিনি একযোজন পথ আমার অনুগমন করিলেন। অনন্তর আমি বিশেষ আগ্রহ জানাইয়া তাঁহার হস্ত ধারণপূর্ব্বক আমার আনুগত্য হইতে তাঁহাকে নিবর্ত্তিত করিলাম। ইহার পর মুহূর্ত্তকাল মধ্যেই আমি আকাশে অদৃশ্য হইয়া গেলাম। সেই বিহঙ্গরাজ তখন বাধ্য হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। বস্তুতঃ বলিতে কি, সাধুজনের সঙ্গ পরিত্যাগ করা বড়ই কষ্টজনক হয়। যাহা হউক, তখন আমরা উভয়েই সাগর-তরঙ্গের ন্যায় আকাশমার্গে অদৃশ্য হইয়া গেলাম।

অনন্তর আমি সেই ভুশুণ্ড বিহঙ্গের বিষয় স্মরণ করিতে করিতে সপ্তর্ষি-মণ্ডলে আসিয়া উপনীত হইলাম। আমি যেই মাত্র আসিলাম, অমনি মদীয় পত্নী অরুন্ধতী আমাকে মহাসমাদর সহকারে অর্চ্চনা করিলেন্। সুমেরুশিখরে ভুশুণ্ডের সহিত আমার যখন প্রথম সাক্ষাৎকার ঘটিয়াছিল, তখন কেবল মাত্র সত্যযুগের সূচনা; সেই সময় ঐ যুগের দুই শত বর্ষ মাত্র অতীত হইয়াছিল।

রামচন্দ্র! সেই সত্যযুগ এখন চলিয়া গিয়াছে। অধুনা ত্রেতাযুগ চলিয়াছে। হে অরিন্দম! তুমি এই ত্রেতাযুগের মধ্যভাগে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। সেই যে সত্যযুগের প্রারম্ভে ভুশুণ্ডের সহিত একবার আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তাহার পর এবার আবার অদ্য অষ্টমবর্ষ হইল, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকার করিয়া আসিয়াছি। আমি এবারেও দেখিয়াছি,—ভুশুণ্ড বায়স তেমনই অজর ও অমর হইয়া বিরাজ করিতেছেন।

হে রাম! এই আমি তোমার নিকট ভুশুণ্ডের বিচিত্র অথচ উত্তম বৃত্তান্ত বর্ণন করিলাম। তুমি ইহা শ্রবণ করিয়া অন্তরে অন্তরে বিচার করিয়া দেখ; পরে যাহা সঙ্গত হয়, তাহা করিতে থাক।

বাল্মীকি কহিলেন,—ভরদ্বাজ! যে বিশুদ্ধবুদ্ধি মানব এই মতিমান্ ভুশুণ্ডের উপাখ্যান সবিশেষ আলোচনা করিয়া তত্ত্বান্বেষণ করিবে, সে এই ভবভয়-বহুলা মায়ানদী অনায়াসেই পার হইয়া যাইতে পারিবে।

সপ্তবিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২৭ ॥

অষ্টাবিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে নিষ্পাপ! এই আমি তোমার নিকট ভুশুণ্ড-বিবরণ বর্ণন করিলাম। ভুশুণ্ড তাঁহার এবম্বিধ উত্তম বুদ্ধিবলেই মোহ-সঙ্কট হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছেন। হে মহাভুজ! তোমায় বলি, তুমিও এইরূপ প্রাণপবনের নিরোধ-যোগ অভ্যাস করিয়া উল্লিখিত উপায় অবলম্বনপূর্ব্বক ভুশুণ্ডের ন্যায় এই ভব-পারাবার হইতে উত্তীর্ণ হও। অভ্যাস জন্য যোগ ও জ্ঞানের প্রভাবে ভুশুণ্ড যেরূপ অবশ্যপ্রাপ্য পরম-পদ লাভ করিয়াছেন, তুমিও তেমনি ঐ পদ প্রাপ্ত হও। যাঁহারা বাহ্য বিষয়ে বুদ্ধিকে অনাসক্ত রাখিয়া পরম তত্ত্বে প্রাণ ও অপান-পবনের নিরোধযোগ অভ্যাস করিতে পারেন, তাঁহারা ভুশুণ্ড বায়সের ন্যায় অবস্থান প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এই বিচিত্র বিজ্ঞানদৃষ্টি তুমি অধুনা শ্রবণ করিয়াছ; এক্ষণে যোগপূর্ব্বকই হউক বা উপাসনাপূর্ব্বকই হউক, যেরূপ আত্ম-প্রতিষ্ঠা তোমার অভিপ্রেত, বিবেচনার সহিত তাহাই তুমি করিতে থাক।

রামচন্দ্র কহিলেন,—ভগবন্! আমার হৃদয়স্থ অন্ধকারপুঞ্জ আত্ম-সাক্ষাৎকার লাভ করিবার পক্ষে বিষম বিঘ্ন জন্মাইয়াছিল। আপনি ভূ-ভাস্করের ন্যায় সমুদিত হইয়া জ্ঞানালোক বিস্তারপূর্ব্বক সে সকল অন্ধকার অপনীত করিয়াছেন। ভবদীয় কৃপায় আমি প্রবুদ্ধ হইলাম, প্রহৃষ্ট হইলাম; নিখিল জ্ঞাতব্য বিষয় বুঝিলাম,—বুঝিয়া স্বীয় পদে প্রবেশ করিলাম। মনে হয়, আমি যেন আর সেই পূর্ব্বের আমি নাই। এখন কি যেন কি এক অপূর্ব্ব অবস্থায় উপনীত হইয়াছি। হে প্রভো! ভবদ্বর্ণিত এই ভুশুণ্ড-বৃত্তান্ত বড়ই বিস্ময়াবহ; আমি এই আশ্চর্য্য ঘটনা শ্রবণ করিয়াই পরমার্থ তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইতে পারিলাম। পরন্তু একটা বিষয়ে আমার কিঞ্চিৎ জিজ্ঞাস্য আছে। আপনি যে পূর্ব্বে ভুশুণ্ড-চরিত্র বর্ণন করিতে গিয়া এই মাংস, চর্ম্ম ও অস্থিময় দেহ-গৃহের

কথা কহিলেন, ইহার নির্ম্মাণকর্ত্তা কে? এ গৃহ কোথা হইতে আবির্ভূত হইল? কিরূপে স্থায়িত্ব লাভ করিল? উহার অধিবাসীই বা কাহাকে বলা যায়? এতৎসমস্ত আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রঘুনন্দন! পরমার্থ কি, তাহা তোমাকে বুঝাইবার জন্য—তোমার দোষরাশি বিদূরিত করিবার নিমিত্ত তোমার এই প্রস্তাবিত প্রশ্নের যথাযথ উত্তর প্রদান করিতেছি,—শ্রবণ কর। হে রাম! পূর্ব্বে যে দেহ-গৃহের কথা শুনিয়াছ, সে গৃহের নয়টী দ্বার, রক্তমাংসময় বিলেপন ও অস্থি সকল স্থূণারূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে। বাস্তব পক্ষে সেই দেহগৃহকে কেহই নির্ম্মাণ করে নাই। বলিতে পার, যিনি ঈশ্বর—শ্রুতি-পুরাণাদির আখ্যায়িকা-প্রসিদ্ধ জীব, তিনিই স্বীয় কর্ম্ম-ভোগের জন্য ঐ গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছেন; কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এ কথা সঙ্গত নহে। ইহার কোন নির্ম্মাতা নাই, ইহা আভাস মাত্র মিথ্যা, এই কথাই সুসঙ্গত। দেখ, জলে যে চন্দ্রাভাস পড়ে, তাহাতে নির্ম্মাতার অপেক্ষা করে কি? অপিচ চক্ষুর রোগবিশেষ হইতে দ্বিতীয় চন্দ্র-কল্পনা হইয়া থাকে, এই কল্পনাকে ভ্রম ভিন্ন সত্য বলা চলে কি? ফলে দ্বিতীয় চন্দ্রকল্পনার ন্যায় ঐ দেহগৃহ আভাসমাত্ররূপে প্রতীয়মান হইয়া সৎ ও অসৎ উভয় আকারেই বিরাজমান। যে জন ভ্রান্ত বা মূঢ়, তাহার দৃষ্টিতে উহা সৎস্বরূপে প্রতিভাত; আর যিনি অভ্রান্ত জ্ঞানী, তাঁহার চক্ষে উহা অসৎ বা মিথ্যা বলিয়া নিরূপিত। জলে যে চন্দ্রের প্রতিবিম্বপাত হয়, তাহা আর একটা চন্দ্র বলিয়া ধারণা হইলেও বাস্তব পক্ষে তাহা সত্য নহে; এইরূপ এই দেহগৃহও আভাসমাত্ররূপেই প্রতীত। যখন দেহজ্ঞান থাকে, তখনই উহা সৎ বলিয়া জ্ঞান হয়; কাজেই উহা অসৎ হইলেও দেহজ্ঞানে সৎ হইয়া পড়ে। সুতরাং ঐ দেহগৃহকে যে সৎ ও অসদাকারে বর্ণন করা হইয়াছে, তাহা সঙ্গতই বটে। আরও দেখ, স্বপ্নদর্শন-সময়ে স্বপ্নকে সত্য বলিয়াই জ্ঞান হয়, স্বপ্ন ভিন্ন অর্থাৎ জাগ্রৎকালে উহা মিথ্যা হইয়া যায়। জলের যখন বুদ্বুদাবস্থা, তখন বুদ্বুদ সত্য বলিয়াই বোধ হয়, আর যখন তাহা বিলয় পাইয়া যায়, তখন মিথ্যারূপেই প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। এই দেহসম্বন্ধেও ঐরূপ কথা। দেহ দেহজ্ঞানে সত্য

হয়, সময়ান্তরে যখন একমাত্র বিশুদ্ধ আত্মদর্শন ঘটে, তখন উহা মিথ্যা হইয়া যায়। যখন ভ্রান্ত ধারণা থাকে, তখন মরীচিকাও যথার্থ জলাকারে প্রতীত হয়; কিন্তু অভ্রান্ত ধারণায় উহা মিথ্যা হইয়া পড়ে। এইরূপ দেহও দেহজ্ঞানে সৎ, অন্যথা অসৎ হইয়া থাকে। এই দেহ আভাসমাত্র-রূপে প্রতীয়মান; এই দেহই আমি, এইরূপে যে দেহাকার মনন, তাহাই দেহ। তাই বলিতেছি,—রামচন্দ্র! এই মাংসাস্থিময় দেহই আমি, এবম্বিধ ভ্রান্তির উচ্ছ্বাস তুমি পরিহার কর। এই ভ্রমের দেহ যে একই মাত্র, তাহা নহে; সঙ্কল্প-কল্পনায় এ দেহ যে কত সহস্র সহস্র উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহার ইয়ত্তা করা অসম্ভব। তোমার সঙ্কল্পিত দেহ অসংখ্য; সুতরাং কোন্ দেহকে তুমি 'আমি' বলিয়া নির্দ্দেশ করিবে।

রামচন্দ্র! আমি জিজ্ঞাসা করি, তুমি সুখশয্যায় শয়ন করিয়া যে স্বপ্নময় শরীরে নানা দিগ্‌দিগন্তে পরিভ্রমণ কর, তোমার সে শরীর কোথায় থাকে? তুমি জাগিয়া জাগিয়া মনোরাজ্য কল্পনা কর, তখন সে দেহে স্বর্গে বা সুমেরু-শৈলাদিতে পরিভ্রমণ করিয়া থাক; বল দেখি, ঐ সময় তোমার সেই দেহ কোথায় থাকে? স্বপ্নাবস্থায়ও স্বপ্নানুভব হয়। সেই স্বপ্নদশায় যে দেহে তুমি মহীমণ্ডলে ঘুরিয়া বেড়াও, বলিতে পার কি, তোমার সে দেহ কোথায় থাকে? দেখ, মনোরাজ্যের ভিতরও তোমার মনোরাজ্য লব্ধ হইয়া থাকে; ঐ অবস্থায় তুমি যে দেহে মহাসমৃদ্ধিশালী প্রদেশে পরিভ্রমণ কর, সেই দেহই বা তোমার কোথায় থাকে? তুমি একটা বিস্তৃত মনোরাজ্য কল্পনায় যখন বিভোর হইয়া থাক, তখন তোমার যে যে দেহে বিচিত্র জাগতী ক্রিয়া সম্পাদিত হয়, বল দেখি, সেই সেই দেহসমষ্টি তোমার কোথায় থাকে?

হে রাম! তুমি তোমার সঙ্কল্পবলে যে দেহ দ্বারা অনুরাগিণী বিলাসিনী কামিনীর সম্ভোগসুখে নিমগ্ন হও, তোমার সেই দেহ কোথায় থাকে? ফলত আমি তোমার পূর্ব্ব পূর্ব্ব অবস্থায় যে যে দেহের উল্লেখ করিলাম, এই সকল দেহ যখন মনেরই কল্পনা মাত্র ও মিথ্যা, তখন জানিয়া রাখ, তোমার এই যে মাংসাস্থিময় দেহ, ইহাও ঐরূপ মনেরই একটা কল্পনা বৈ আর কিছুই নহে। এই অর্থ, এই দেহ, এই দেশ,

এবম্বিধ যে কিছু বিভ্রম, সকলই একমাত্র চিত্ত-জনিত সঙ্কল্পেরই বিজৃম্ভণ।

হে রঘুনন্দন! এই যে সংসার-বিস্তার দেখা যায়, তুমি ইহাকে একটা দীর্ঘ স্বপ্ন বা বিশাল মনোভ্রম কিম্বা একটা সুবৃহৎ মনোরাজ্য-বিলাস বলিয়াই জানিয়া রাখিবে। দিবাকরের উদয়ে জগতের লোক যেমন প্রবোধ প্রাপ্ত হয়, তেমনি তুমি যখন পরম কারুণিক পরমাত্মার ইচ্ছানুসারে প্রবোধ বা জ্ঞান লাভ করিবে, আমার কথিত ঐ সকল কথা সত্য কি মিথ্যা, তাহা তুমি তখনই বিশেষ বুঝিতে পারিবে। স্বপ্নাবস্থায় অসংখ্য সঙ্কল্পের উদয় হয়, তাহাতে এই জগৎ যেমন অন্যথাকারে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে, তেমনি এই যে কিছু সঙ্কল্প-কল্পনা, এ সকলও তোমার নিকট তখনই রূপান্তর প্রাপ্ত হইবে; অর্থাৎ মিথ্যা হইয়া যাইবে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পদ্মজন্মা ব্রহ্মার উৎপত্তি মনেরই সঙ্কল্পসম্ভব এবং এই যে বিচিত্র সংসার-রচনা, ইহা বিভ্রমগ্রস্ত মনেরই সঙ্কল্প-কল্পনায় প্রকাশিত; এইরূপ দৃষ্টান্তে বুঝিয়া রাখিবে,—এই দেহও মনেরই প্রতিভাস মাত্র। এই যেমন বলিলাম,—পদ্মযোনি মনেরই আভাসরূপে উৎপন্ন এবং এক দেহ হইতে দেহান্তর সঙ্কল্পবলেই বিভাবিত, অন্যান্য দেহসম্বন্ধেও সেই-রূপ সেই একই কথা সুনিশ্চিত। বাসনার প্রাবল্যে পূর্ব্বে যে ধারাবাহিক-রূপে দেহসজ্ঘটন চিরাভ্যস্ত হইয়া থাকে, দেখা যায়, পরেও সে দেহ তেমনি ভাবে সজ্ঘটিত হয়। এই দেহ বা জগদার বিরাট সঙ্কল্প পৌরুষ প্রযত্নে স্বাত্মদর্শনে কেবল চিৎ বলিয়াই প্রতিপন্ন।

হে রাম! যদি ঐ চিৎকে অন্যপ্রকারে ভাবনা কর, তবে উহা অন্যথাকারেই প্রতিপন্ন হইবে। এই সেই দেহ আমি, এ আমার সংসার, এবম্বিধ ভাবনার প্রাবল্যে ঐ চিৎ দেহ বা সংসাররূপেই প্রতীয়মান হইয়া থাকে। ফলে ভাবনাকে যে প্রকারে দৃঢ় করিয়া তোলা যায়, তাহা সেই-রূপেই সত্য বলিয়া অবধারিত হয়। দেখ, ঐকান্তিকতার সহিত যাহাই ভাবনা করা হইবে, একান্ত অনুরাগিণী কামিনীর ন্যায় অচিরেই তাহা সর্ব্বত্র দৃষ্টিপথে পতিত হইবে। স্বপ্নাবস্থায় নিশাযোগেও দিবস-ব্যাপার প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে এবং স্বপ্নভাবনার প্রাবল্যে দিবাকৃত্য অভ্যস্ত হইয়া

তৎকালে সত্য ঘটনায় পরিণত হয়। এইরূপ এই সংসারও ভাবনা-বলেই অভ্যস্ত হয়,—হইয়া সত্যরূপে প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। স্বপ্নাবস্থায় আশু-নশ্বর ক্ষণকালও একটা দিবসের ন্যায় দীর্ঘ বলিয়া প্রতীত হয়। এই দৃষ্টান্তে বুঝিয়া দেখ, এ সংসার সঙ্কল্পিত অল্পকালস্থ হইলেও দীর্ঘকালের জন্য স্থায়ী—অধিক কি যেন নিত্য বলিয়াই প্রতীত হয়। আতপ-তপ্ত মরু-প্রদেশের আকাশে যেমন নদী দেখা যায়, তেমনি এই পৃথ্বী বাস্তবপক্ষে অসতী হইলেও সঙ্কল্পবশেই লক্ষিত হইয়া থাকে। যেমন দৃষ্টিদোষ ঘটিলে আকাশে ময়ূর-পুচ্ছাকার পরিদৃষ্ট হয়, এই যে জাগতী শ্রী, ইহাও তেমনি ভ্রান্তিবশেই প্রতীত হইয়া থাকে। সম বা যথাযথ দর্শনে গগনে যেমন ময়ূরপুচ্ছাকার দৃষ্ট হয় না, তেমনি যদি তত্ত্বদৃষ্টিতে দেখা যায়, তাহা হইলে এই জাগতী শ্রী কিছুই প্রতীতিগোচর হইবার নহে। নিজের মনে রাজ্য কল্পনা করিয়া তাহাতে হস্তী ও ব্যাঘ্রাদি দর্শনে ভীরুজনও যেমন ভীত-চকিত হয় না, তেমনি সুধী ব্যক্তি আপনার সঙ্কল্প-কল্পিত এ সংসারে কোনও কিছু হইতে ভয় প্রাপ্ত হন না। এইরূপে যখন দেখা যায়, এক, আত্মাই সর্ব্বত্র প্রতিভাসমান হইতেছেন, তখন এই সংসারপথে অবস্থান করিয়া কে কি নিমিত্ত ভীতিগ্রস্ত হইবে? ফলে এ সংসারে ভীত হইবার কিছুই নাই; তথাচ যে ব্যক্তি ভীতিপ্রাপ্ত হয়, সে মূঢ়ের মোহ অপনয়ন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। কেন না, তথাবিধ সংসারভীত ব্যক্তির মোহ অপনীত হওয়ায় সে যদি বিশোধিত ও বিগতমল হয়, তাহা হইলে এই জাগতিক মোহ আর দেখা যায় না। সম্যক্‌রূপে জ্ঞানলাভই আত্মশোধ-নের উপায়। যদি সমীচীন জ্ঞান লাভ করা যায়, তাহা হইলে সুবর্ণের তাম্রতা প্রাপ্তির অসম্ভাবনার ন্যায় আত্মাও আর কদাচ মালিন্য গ্রহণ করেন না। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, ঐ সম্যক্‌জ্ঞান কাহাকে বলা যায়? এ জগৎ চৈতন্যেরই আভাসমাত্র বৈ আর কিছুই নয়; সুতরাং ইহা না সৎ, না অসৎ, এই জ্ঞানলাভের পর অন্যান্য সমস্ত কল্পনার যে পরিত্যাগ, তাহারই নাম সম্যক্ জ্ঞানলাভ। অপিচ জীবন, মরণ, জ্ঞান, অজ্ঞান বা স্বর্গ, এ সকল চিদাভাস ব্যতীত কিছুই নহে; সমস্তই চিদাভাস—এবম্প্রকার একতাই সম্যক্ দর্শন। কি তুমি, কি আমি, কি সংসার-প্রবাহ,

কি দশদিক্ ইত্যাদি সমস্ত দৃশ্যই আমা হইতে পৃথক্ নহে। পরন্তু সকলই সেই স্বপ্রকাশ আত্মস্বরূপ; বুধগণের মতে এইরূপ দর্শনই সম্যক্ দর্শন। এ সংসার সৎ ও অসদাত্মক; ইহাতে যদি মন একবার সম্যক্‌দৃষ্টি লাভ করে, তাহা হইলে কদাচ সে তত্ত্ব পদার্থ দর্শন না করিয়া ক্ষান্ত হয় না এবং কখনও ভ্রান্তিপূর্ণ হইয়াও উদয় লাভ করে না। মন যখন সম্যক্ দৃষ্টি লাভ করে, তখন যাবতীয় বাহ্য বস্তুর সত্তা ও অসত্তার নির্ণয়পূর্ব্বক নিষ্কাম শান্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। মনের তখন এমন অবস্থা দাঁড়ায় যে, সে কদাচ কাহারও নিন্দা করে না বা কাহারও কোন স্তুতি করে না; ইষ্টলাভেও তাহার হর্ষ হয় না বা অনিষ্টপাতেও তাহার শোক হয় না। ঐ মন তখন কেবলই এক অপূর্ব্ব শান্তিময় সত্যভাব ধারণ করিয়া বিরাজ করিতে থাকে। তত্ত্বদর্শী মুনির মন ভাবিতে থাকে, এ সংসারে বন্ধু বল, বান্ধব বল, চিরস্থায়ী কিছুই নহে; সুতরাং সকল বন্ধুরই মরণ যখন অবশ্যই ঘটিবে, তখন তাহাদের বিয়োগে কেন বৃথা পরিতাপ ভোগ কর? মরণ আমার অবশ্যই হইবে, এরূপ নিশ্চয় যখন আছে, তখন আপন মরণকাল আসিয়া উপস্থিত হইলে কেন বৃথা পরিতপ্ত হও? পুরুষ প্রাদুর্ভূত হইবার পর, কালে যখন কিছু না কিছু বিভব-সম্পদের অধিকার অবশ্যই পাইবে, তখন সে জন্য আর তাহার হর্ষাবসর কি? এ সংসারে জীবমাত্রেরই আপদ আপতিত হয়, আবার তাহা চলিয়া যায়, ইহাতে কৈ শোকের অবসর তো কিছুই দেখা যায় না? এই জগদ্বিস্তার সাগরের বুদ্বুদাবলীর ন্যায় উত্থিত হয়, বৃদ্ধি পায়, স্ফুরিত হয় এবং বিলয় পাইয়া যায়, ইহাতে শোকের সম্পর্ক তো কৈ কিছুই দেখা যায় না। যাহা সৎ, তাহা চির সৎ, আর যাহা অসৎ, তাহা চিরকালই অসৎ; এই যে জগৎ, ইহাও অসতী মায়ারই একটা বিচিত্র বিলাস। ইহাতে তো শোকের কিছু আছে বলিয়া দেখি না। আমি যে আমি—আমি বাস্তবিক হই না, হই নাই, বা হইবও না। এই যে দেহ আছে—কামনা, কর্ম্ম ও বাসনাদি বিবিধ বিচিত্র দোষ লইয়াই ইহার উদ্ভব। ইহাতে এমন কি আছে, যাহার জন্য পরিদেবনা করিতে হইবে? সত্য সত্যই আমি যদি দেহ হইতে পৃথক্‌ই হইলাম, তবে সেই পৃথক্ আমি কে? এ কথার ইহাই উত্তর

য়ে, সে আমি চিদাভাস। আমি যদি চিদাভাস বা চৈতন্য প্রতিবিম্ব হইলাম, তবে আমার সত্তা অসত্তা কি যে, তাহার জন্য আমি পরিতপ্ত হইব? মুনির মন এইরূপ ভাবিয়া ভাবিয়া [illegible] নিশ্চয় করিয়া লইলে আর কখন অস্তমিত, উদিত বা পরিতপ্ত হয় না। কেবল সতত শান্ত হইয়া বিরাজ করিতে থাকে। যে মুনি সর্ব্বোত্তম ব্রহ্মপদে অবস্থান করেন, তিনি সমুদায় বাহ্য বস্তুপরম্পরায় বাধ-ঘটনায় কেবল মাত্র পরিশোধিত ব্রহ্মভাবই গ্রহণ করিয়া থাকেন। নীড় নির্ম্মাণ করিবার উদ্দেশ্যে তিত্তিরী পক্ষী যেমন তৃণের মূলদেশ হইতে কোমল তৃণ তুলিয়া লয়, তেমনি যত কিছু বাহ্য বস্তু আছে, তন্মধ্য হইতে ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তি সারাংশময় ব্রহ্মত্বই গ্রহণ করিয়া থাকেন; যাহা সত্যস্বরূপ ব্রহ্মত্ব, তাহা গ্রহণ করিবার নিমিত্ত এ সংসারের অসারাংশ পরিত্যাগ করেন। যাহা অসার, তাহাতে তিনি অণুমাত্র আস্থা স্থাপন করেন না, এইরূপ আস্থা বন্ধন না করিবারই কথা; কেন না, আস্থাই অশেষ দোষের মূল। যেমন সুদৃঢ় রজ্জু দ্বারা বলীবর্দ্দ আবদ্ধ হয়, তেমনি আস্থাবশেই জীব সংসারাবদ্ধ হইয়া থাকে, অর্থাৎ বারবার যাহাতেই আস্থা বন্ধন করা হয়, তাহাতেই ঐকান্তিক আসক্তি আসিয়া পড়ে। তাই বলিতেছি, হে নিষ্পাপ! তুমি বুদ্ধি-বলে ব্রহ্মকেই দৃঢ়রূপে নিশ্চয় কর—করিয়া অসার অসত্য পদে আস্থা পরিহারপূর্ব্বক স্বচ্ছন্দে বিহার করিয়া বেড়াও। বিশিষ্ট বুদ্ধির সহায়তা লইয়া আস্থা অনাস্থা উভয়ই অবাধে পরিত্যাগপূর্ব্বক যাহা তোমার কর্ত্তব্য হয়—করিবে; আর যাহা অকর্ত্তব্য বলিয়া অবধারিত হইবে, তাহার প্রতি উপেক্ষা দেখাইবে; কোন সময়ের জন্য তাহার অনুষ্ঠান করিবে না। দিবাবসানে সূর্য্যের তেজ হ্রাস পাইলে জগৎ যেমন শীতল হয়, তেমনি যাঁহার নিকট এই জগৎ আভাসমাত্র বলিয়া অবধারিত, তিনি অন্তরে শান্ত বা শীতলভাব ধারণ করিয়া থাকেন। হে পবিত্র! তুমি এই অসার পদার্থ-পরম্পরার উপর বুদ্ধিপূর্ব্বক আস্থা স্থাপন করিও না; সাধারণতঃ উহাদিগকে তুমি আভাসমাত্ররূপেই অবলোকন করিতে থাক।

হে রাম! অনন্তর তোমার কর্ত্তব্য এই যে, ঐ চিত্তকল্পনায়

কলঙ্কিত আভাসমাত্রতাকেও তুমি পরিত্যাগ করিবে; পরে নিরাভাস হইয়া অবস্থান করিতে থাকিবে। হে সাধো! এইরূপে আভাস পরিহার করিয়া যাহা সর্ব্বগামী, অসর্ব্ব, একান্ত নির্ম্মল, নিত্য চিদাকাশ, তুমি তাহাই হইয়া থাক। আমি অহং নহি, আমার এই ভোগ-সমূহেও সত্যতা কিছুই নাই, এবম্বিধ চিন্তাকে যদি অন্তরে নিরন্তর স্থান দেওয়া যায়, তাহা হইলে অসার প্রপঞ্চ আর কোন অনর্থই উৎপাদন করিতে পারে না। 'আমিই সর্ব্বময় চিন্মূর্ত্তি' এইরূপ ভাবনায় যদি তন্ময় হওয়া যায়, তাহা হইলে আর এই বিশাল বিশ্ব-প্রপঞ্চ অনর্থ ঘটাইতে পারে না। এই নিরাভাসতা-সিদ্ধির উপায়ভূত যে দুইটী চিন্তার কথা বলা হইল, ইহাই সত্য; এই প্রকার চিন্তাই সাধুদিগের পরম সিদ্ধিপ্রদ।

হে রাঘব! যদি তুমি উল্লিখিত উপায়ভূত দ্বিবিধ চিন্তার একটীকেও মনোজ্ঞ বলিয়া মনে কর, তাহা হইলে সেই একই চিন্তায় তুমি তন্ময় হও; আর যদি ঐ দ্বিবিধ চিন্তাই তোমার নিকট সাধু বলিয়া বিবেচিত হয়, তবে তাহাই করিতে পার। হে কল্যাণমতে! এইরূপে বিহার করিতে করিতে তুমি সমস্ত রাগ-দ্বেষাদির উচ্ছেদ সাধন করিয়া ফেলো। কি এই লোকে, কি আকাশে, কি স্বর্গে, যেখানে যে দুর্লভ বস্তুই থাকুক, ঐ রাগ-দ্বেষাদির ক্ষয় সাধন করিতে পারিলে সে সকলই প্রাপ্ত হওয়া যায়। বৎস! মূঢ়গণের বুদ্ধি রাগ-দ্বেষাদি দ্বারা দূষিত; তাহারা তাহাদের তাদৃশ দূষিত বুদ্ধিযোগে যে কার্য্যেরই অনুষ্ঠান করে, তাহা অচিরাৎ অশুভ ফলই উৎপাদন করিয়া থাকে। যেমন দাবদগ্ধ বনভূমিতে কোন হরিণই বাস করে না, তেমনি রাগ-দ্বেষাদি-দোষ-দুষ্ট চিত্তবৃত্তিতে কোন গুণই থাকে না, যদীয় মনোরূপ কোটরাভ্যন্তরে রাগ-দ্বেষরূপ ভুজঙ্গের প্রবেশ নিষিদ্ধ, তিনি তো কল্পতরুস্বরূপ; তাঁহার নিকট হইতে না পাওয়া যায় কি? যে সকল বিজ্ঞ বিচক্ষণ ব্যক্তি বুদ্ধিমান্, ধৃতিমান্ ও শাস্ত্রজ্ঞানবান্ হইয়াও রাগ-দ্বেষাদি-দোষে কলুষ-কালিমায় লিপ্ত হইয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে কখনই বিজ্ঞ বলিয়া সম্ভাষণ করা যায় না; তাহারা শৃগালপ্রায়; কাজেই সর্ব্বপ

ধিক্কারেরই যোগ্য। অহো! আমার সম্পত্তি অন্যে ভোগ করিল, অন্যের নিকট আমার যাহা প্রাপ্য ছিল, তাহা আমি নিজের বুদ্ধি দোষে ত্যাগ করিলাম; এইরূপে নষ্ট ধনাদির আকাঙ্ক্ষায় যে[illegible]টা রাগ-দ্বেষাদির ভাব আসিয়া উপস্থিত হয়, ইহা কি? ইহা তো একান্তই তুচ্ছ। ধন বল, বন্ধু বল, মিত্র বল, এ সকলই তো বিনশ্বর বস্তু; ইহারা একবার আসিতেছে, আবার যাইতেছে, এ সমুদায়ে বুদ্ধিমান্ মানবের অনুরাগ বা বিরাগ কিছুই হওয়া উচিত নহে। বস্তুতঃ তাদৃশ মানবের তৎপ্রতি উপেক্ষার ভাবই শোভনীয়। এই যে প্রিয়াপ্রিয় বা ভাবাভাব-বিধায়িনী পারমেশ্বরী মায়া—যিনি অঘটন-ঘটনায় পটীয়সী, তিনিই এই নিখিল সংসার রচনা করিয়া ভোগাসক্ত ব্যক্তিদিগকে তন্মধ্যে নিক্ষিপ্ত করিয়া থাকেন।

হে রাঘব! ধনই বল, জনই বল, কি অন্য কোন আত্মীয় বন্ধুর কথাই বল, এ সকলের কিছুই কিছু নহে;—সমস্তই মিথ্যা, সমস্তই অবস্তুরূপে লক্ষিত। এ সকল আদিতে অসৎ, অন্তে অসৎ, মধ্যে কিছুদিনের জন্য মাত্র উহাদের সত্তা; কিন্তু তাহাও অস্থির এবং মনোবেদনায় ব্যাকুল। বল দেখি, অন্যে কেহ আকাশে পাদপ কল্পনা করিলে, তাহাতে কবে কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি আস্থা বা অনুরাগ বন্ধন করিয়া থাকে? আরও দেখ, আকাশে একজন একটী রমণীমূর্ত্তি কল্পনা করিল, অন্য কেহ দূরবর্ত্তী স্থানে থাকিয়া তাহার সহিত সম্ভোগসুখ অনুভব করিল, এই যেরূপ ঘটনা,—ইহার সহিত এই দৃশ্যমান সংসার-রচনার অবিকল সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। তাই তোমায় বার বার বলিয়া আসিতেছি যে,—হে বৎস! তুমি এই বিশাল সংসার-ভ্রমে নিমগ্ন হইও না। এই যে বিবিধ ভূত-পরম্পরাময় বিশাল বিশ্বসংসার অজ্ঞদিগকে ব্যাকুল করিয়া তুলিতেছে, যাঁহারা তত্ত্বদর্শী পুরুষ, তাঁহারা ইহাকে কল্পনাবলে আকাশে দৃষ্ট গন্ধর্ব্বপুরীর ন্যায়ই বিবেচনা করিয়া থাকেন। এই সংসার বাস্তবিকই স্বপ্নকালীন কল্পিত নগরীর ন্যায় মিথ্যাই বটে সমুদিত হইতেছে। এই যে সংসার দেখিতেছ, ইহা একটা দীর্ঘ স্বপ্ন-সংদৃষ্ট পুরী বা পাদপের ন্যায়ই প্রতিভাত। যদি অজ্ঞান-নিদ্রায় আক্রান্ত হওয়া যায়, তাহা হইলেই এবম্বিধ স্বপ্ন দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। ইহা স্বপ্নাদি ভাবাপন্ন সুষুপ্তবৎ সর্ব্বত্র অনুস্যূত। তুমি

প্রগাঢ় অজ্ঞান-নিদ্রায় আচ্ছন্ন; তাই এই সংসার-স্বপ্নে ভ্রান্ত হইয়া এ ভবে অবস্থান করিতেছ। এই জন্য তোমায় বলি, ধনরত্ন-প্রাপ্ত পুরুষবর যেমন অলক্ষ্মী পরিহার করে, তেমনি তুমিও এই সুদীর্ঘ অজ্ঞাননিদ্রাকে বিসর্জ্জন দাও, প্রভাত-প্রস্ফুট পদ্মের ন্যায় প্রবুদ্ধ হও,—হইয়া দিবাকরবৎ সতত সমুদিত নির্ব্বিকল্প চিদাভাসস্বরূপ স্বীয় আত্মাকে অবলোকন করিতে থাক।

হে মহাভুজ! আমি তোমায় পুনঃপুন প্রবোধিত করিতেছি, বার বার বলিতেছি, তুমি প্রবুদ্ধ হও, প্রবুদ্ধ হও এবং প্রবুদ্ধ অবস্থায় আত্মরূপ আদিত্য দেবকে সন্দর্শন করিতে থাক। হে রাম! আমি শীতল জ্ঞান-জল-সেচন করিলাম, সেই জল-সেক-শব্দে তুমি প্রবোধিত হও।

হে রঘুনন্দন! আবার বলি, বোধ প্রাপ্ত হও, জ্ঞান লাভ কর, সত্য-স্বরূপ অবলোকন কর, এবং এই যে অলীক জগদ্ভ্রম, ইহা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ কর। প্রকৃতই বলিতেছি, তোমার জন্ম নাই, দুঃখ নাই, দোষ নাই বা ভ্রান্তি নাই; তুমি সর্ব্বসঙ্কল্প পরিহার কর,—করিয়া আত্মাতে অবিচলভাবে অবস্থিত হও।

হে মহাত্মন্! তোমার অখিল বিকল্প-দোষ বিগলিত হইয়া গিয়াছে; তুমি সুষুপ্ত ব্যক্তিবৎ সসার সৌম্য দৃষ্টি প্রাপ্ত হইয়াছ। তুমি নিজেই সেই নিত্য বিরাট ব্রহ্ম। তুমি পরম বিশুদ্ধি লাভ কর,—করিয়া শান্তিময় পরব্রহ্মে অবস্থান করিতে থাক।

অষ্টাবিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২৮ ॥

ঊনত্রিংশ সর্গ।

বাল্মীকি বলিলেন,—ভরদ্বাজ! রামচন্দ্র স্বস্থ ও সম-চিত্ত হইয়া বশিষ্ঠ-বদন-বিনির্গত এবম্বিধ উপদেশবাণী শুনিতে লাগিলেন। তৎশ্রবণে তদীয় আত্মা পরমানন্দে নিমগ্ন ও বিশ্রান্ত হইল। সভাস্থ শ্রোতৃবৃন্দ সকলেই বশিষ্ঠ মুনির উপদেশ পাইয়া উপশান্ত ও আত্মবিশ্রান্ত হইলেন। তখন

বারিধর যেমন শস্য-সমূহোপরি বারি বর্ষণান্তে বিরত হয়, তেমনি রঘুনন্দনের আত্মবিশ্রান্তি হইলে তাহা স্থির রাখিবার নিমিত্ত বশিষ্ঠ মুনির বচন-বিন্যাসও বিনিবৃত্ত হইল।

অনন্তর অর্দ্ধ মুহূর্ত্ত অতীত হইল। রামচন্দ্র প্রতিবুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। তখন বক্তৃবর বশিষ্ঠ পুনরপি পূর্ব্বোক্ত বিষয় বিবৃত করিতে লাগিলেন।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র! তুমি অধুনা সম্যক্ সম্প্রবুদ্ধ হইয়াছ; এক্ষণে তোমার আত্মলাভ ঘটিয়াছে। তুমি এই আত্মাকেই অবলম্বন-পূর্ব্বক অবস্থান কর। এ বিষম সংসার-চক্রে আর কদাচ পদার্পণ করিও না। এই যে সংসার-চক্রের কথা কহিলাম, জানিও,—সঙ্কল্পই ইহার নাভি; এই নাভিকে চাপিয়া ধরিতে পারিলে এ সংসার-চক্রের আর চলিবার উপায় থাকে না। কিন্তু এই সঙ্কল্প-নাভি যখন রাগ-দ্বেষাদি দ্বারা ক্ষুব্ধ হইয়া উঠে, তখন এই সংসার-চক্রকে সবলে রোধ করিবার চেষ্টা করিলেও ইহা সবেগে ঘূর্ণমান হইতে থাকে। তাই বলিতেছি, যাহা সুদৃঢ় বৈরাগ্যাভ্যাসরূপ পরম পুরুষার্থ, তুমি যুক্তি সহকারে তাহাই অবলম্বন কর,—করিয়া ঐ যে সংসার-চক্রের নাভি—সঙ্কল্প বা চিত্ত, উহাকে বুদ্ধি-বলে নিরুদ্ধ করিয়া রাখ। জানিও,—বুদ্ধি ও শাস্ত্রসঙ্গত পুরুষকার প্রয়োগ করিয়া যাহা না লাভ করা যায়, তাহা আর কুত্রাপি পাওয়া যায় না। ফলে বৈধ ও বুদ্ধি-পরিশীলিত পুরুষকার দ্বারা সমস্তই সুসাধ্য হইয়া থাকে; অতএব পুরুষকারই সর্ব্বথা অবলম্বনীয়। দৈব বলিয়া যে একটা কল্পনা, তাহা বালকবুদ্ধিরই পরিচয়; অতএব দৈবকে দূরে পরিহারপূর্ব্বক স্বীয় প্রযত্নবলে অগ্রেই চিত্ত নিরোধ করা কর্ত্তব্য।

হে নিষ্পাপ! বিরিঞ্চি হইতে আরম্ভ করিয়া যে একটা অজ্ঞানরূপ ভ্রম চলিয়া আসিতেছে, সেই ভ্রমহেতুই এই দৃশ্যমান জগৎ অসৎ হইলেও সদাভাস বলিয়া লক্ষিত হইতেছে। অজ্ঞান বা ভ্রান্তির বিস্তার হইতেই এই দৃশ্যমান জগদাকার দেহসমূহ সঙ্কল্প হইতে সমুত্থিত হইয়া প্রতিভাত হইতেছে। এই দেহের মূল একমাত্র সঙ্কল্প; এই সঙ্কল্পকে দূরে পরিহার করিতে পারিলে, এ দেহ আর কখনই জন্মিতে পারে না, বা জন্মে না। হে রাম! ধীশক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে কখনই সুখ-দুঃখ বিচারে নিরত

হওয়া কর্ত্তব্য নহে। কেন না, সুখ-দুঃখ বিচারই সঙ্কল্প-সংজ্ঞায় অভিহিত। যে নরদেহ চিত্রার্পিত, তাহা অপেক্ষা জীবন্ত নর জঘন্য বলিয়াই নির্ণীত; কেন না, চিত্রার্পিত নরের সঙ্কল্প নাই; কিন্তু জীবন্ত নরের সঙ্কল্প রহিয়াছে; এই কারণেই জীবন্ত নরের মুখ দুঃখভরে পরিম্লান হয় এবং বাষ্পজলে বদন আর্দ্র হইয়া উঠে। কিন্তু চিত্রিত নরের ঐ সকল কিছুই হয় না। চিত্রার্পিত নরের স্থায়িত্ব যতদূর, জীবন্ত নরের সেরূপ নহে। জীবন্ত নর মরিবেই, তাহার মৃত্যুর কেহই বাধা জন্মাইতে পারে না। সে আপনা হইতেই আধি-ব্যাধি প্রভৃতি দ্বারা জীর্ণ শীর্ণ হইতে থাকে; নয়ন-নীরে ক্লিন্ন হয়; কিন্তু চিত্রার্পিত দেহ আপনা হইতেই নষ্ট হয় না, কেহ যদি তাহা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ফেলে, তবেই সে নষ্ট হইয়া থাকে। পরন্তু যে দেহ রক্তমাংসময়, তাহার নাশ অবশ্যই ঘটে; সে তো আপনা হইতেই বিনাশ প্রাপ্ত হয়। চিত্রার্পিত নরমূর্ত্তিকে যদি সযত্নে রক্ষা করা যায়, তাহা হইলে সে তাহার সৌন্দর্য্য লইয়া অবিকৃতভাবে থাকে; কিন্তু এই রক্ত-মাংসের দেহ তুমি শত যত্নে রক্ষা কর না কেন, অচিরেই ইহা নষ্ট হইয়া যাইবে। ইহার উপচয় চিরদিন থাকিবে না। এই জন্যই আমি বলিলাম যে, রক্ত-মাংসের দেহ চিত্রার্পিত দেহ অপেক্ষা নিকৃষ্ট। চিত্রিত দেহে যে যে গুণের অস্তিত্ব আছে, এই সঙ্কল্পময় দেহে তাহা নাই। চিত্রার্পিত দেহ জড় হইলেও তাহার তুলনায় এ সঙ্কল্প-দেহ তুচ্ছাদপি তুচ্ছ।

হে অনঘ, মহামতে! এই রক্ত-মাংসের দেহে আবার আস্থা কি আছে? বস্তুতঃ এই দীর্ঘ সঙ্কল্পময় দেহে কিছুমাত্র আস্থা নাই। যাহা স্বপ্ন-সঙ্কল্প-জনিত দেহ, তাহা অপেক্ষাও তো ইহার নিকৃষ্টতা প্রতিপন্ন। কেন না, স্বপ্ন-সঙ্কল্প হইতে যে দেহের উৎপত্তি, তাহা তো অতি অল্পক্ষণ মাত্র স্থায়ী; অপিচ সুখ-দুঃখ যত দীর্ঘই হউক, তাহাতে ইহা কদাচ অভিভূত হইবার নহে। পক্ষান্তরে এই যে সুদীর্ঘ সঙ্কল্প-সম্ভূত দেহ, ইহা বহু দুঃখের আস্পদ। সঙ্কল্পময় দেহ—অস্তি কি নাস্তি, বা সৎ কি অসৎ, এবম্বিধ সংশয়ের গোচর। বাস্তব পক্ষে উহা আমাদের নিকট মিথ্যা বলিয়াই প্রতিপন্ন। মূঢ় লোকেরাই এ দেহের জন্য অনর্থক ক্লেশ স্বীকার করে। কোন একটা চিত্রময় পুরুষমূর্ত্তির অঙ্গবিশেষ যদি নষ্ট হয়, তাহা

হইলে তাহার যেমন কোনই ক্ষতির সম্ভাবনা নাই, তেমনি সঙ্কল্পময় পুরুষ ক্ষত হউক, ক্ষীণ হউক, তাহাতে তাহার প্রকৃত ক্ষতি কিছুই নাই। যেমন মনঃকল্পিত রাজ্য ধ্বংস পাউক বা নষ্ট হউক, তাহাতে ক্ষতি কিছুই নাই, যেমন দ্বিতীয় চন্দ্রমা বিলুপ্ত হউক বা অদৃশ্য হউক, তাহাতে অনিষ্ট কিছুই নাই; যেমন স্বপ্নকালীন সমারব্ধ কর্ম্ম বিঘ্ন-বিহত হউক বা ধ্বংস প্রাপ্ত হউক, তাহাতে ক্ষতি কিছুই নাই এবং মরীচিকা নদীর জল শুষ্ক হউক বা নষ্ট হউক, তাহাতে ক্ষতি কিছুই নাই, তেমনি এই যে সঙ্কল্প-মাত্রময়-স্বভাব নশ্বর দেহযন্ত্র, ইহা নষ্ট হইয়া গেলেও ক্ষতি কিছুই নাই। এ দেহ চিত্ত-সঙ্কল্পময় সুদীর্ঘ স্বপ্ন-সঙ্কুল; ইহা ভূষিতই হউক, আর দূষিতই হউক, চিত্তের ক্ষতি তাহাতে কিছুই নাই।

হে রঘুনন্দন! এই দৃশ্যমান সঙ্কল্প-দেহ যদি নষ্ট হয়, তাহাতে আত্মা বিচলিত হইবার নহেন, চিত্তেরও নাশ তাহাতে নাই, এবং ব্রহ্মও বিকৃতি প্রাপ্ত হন না; সুতরাং এই দেহের ক্ষয়ে কাহার কি ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা? যে চক্র ঘুরিতে থাকে, তাহার উপর উত্থিত ব্যক্তি যেমন চারি পার্শ্বের চক্রবলয়ের সকল দিকই ঘূর্ণমান বলিয়া জ্ঞান করে, আর তাহার এরূপ জ্ঞানের কারণ যেমন ভ্রমণ-জনিত মোহ বৈ আর কিছুই নহে, তেমনি মিথ্যাজ্ঞান যখন সহসা প্রবল হইয়া উঠে, তখন সেই মিথ্যা-জ্ঞানরূপ চক্রারূঢ় ব্যক্তি নিয়ত কেবল দেহচক্রই দেখে। সে তখন মনে করে,—এ দেহচক্র ঘুরাইলে ঘুরিতে থাকে, উচ্চ স্থান হইতে ছাড়িয়া দিলে পড়িয়া যায়, এবং নষ্ট করিয়া ফেলিলে নাশ পায়। কিন্তু এ তো ভ্রম; এ ভ্রম নাশ করিবার উপায় কি? উপায় একমাত্র ধৈর্য্য, ধৈর্য্য সহকারেই এ বিশাল ভ্রম বিদূরিত করা সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। এ দেহের কর্ত্তা একমাত্র সঙ্কল্প; ইহা প্রকৃত পক্ষে অসৎ হইলেও মিথ্যাজ্ঞান নিবন্ধন সৎ হইয়া পড়ে। ফলে, দেখা যায়, যাহার কর্ত্তা অসত্য, সে তো কখনই সত্য হইতে পারে না। রজ্জুতে ভুজঙ্গবুদ্ধির ন্যায় বাস্তবিকই এ দেহ একটা অসদুৎ-পন্ন ভ্রান্তি মাত্র বৈ আর কিছুই নহে; কিন্তু এই ভ্রান্তিমাত্র দেহই—জাগতী ক্রিয়া অসত্য হইলেও সত্য করিয়া দেয়।

হে রাম! দেহ জড়; সে যাহা করে, তাহা বাস্তব পক্ষে

কৃত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না। দেহ তখন কিছু করিলেও তাহা কখনই কর্ত্তৃপদ-বাচ্য হয় না। কর্ত্তৃত্বের কারণ একমাত্র ইচ্ছা; কিন্তু জড়-দেহ নিরিচ্ছ। যিনি আত্মা, তিনি নির্ব্বিকার, তাঁহাতেও ইচ্ছা বা বাঞ্ছা মাত্র নাই। অতএব দেখা যায়, এ জগতের কর্ত্তা কেহই নাই। যিনি আত্মা, তিনি ইহার দ্রষ্টা মাত্র। নিবাত নিষ্কম্প প্রদীপ যেমন আপনাতেই থাকে; কিন্তু অন্যত্র কেবল সাক্ষিস্বরূপে অবস্থান করে, এ জগতে আত্মাও তেমনিভাবে অবস্থিত। দিনকর যেমন আকাশে থাকেন; সেইখানে থাকিয়া দিবাকৃত্য সম্পাদন করেন, তুমিও তেমনি অনাসক্তভাবে থাক; এবং সেই অবস্থায় থাকিয়াই রাজকার্য্য নির্ব্বাহ কর। এই অসন্ময় শূন্য দেহগৃহ বাল-কল্পিত বেতালবৎ সত্যস্বরূপে সমুদিত হওয়ায় সহসা ইহাতে সমস্ত সাধুগণের বর্জ্জিত অসার অহঙ্কার ও চিত্তনামক কুবেতাল আসিয়া কোথা হইতে আশ্রয় গ্রহণ করিল? ফল কথা, এই দুর্ম্মতি অহঙ্কারের ভৃত্যকার্য্যে তুমি নিযুক্ত হইও না। হে রাম! নিশ্চয় জানিও, উহার যদি তুমি ভৃত্য হইয়া পড়, তাহা হইলে তোমাকে নরক-ফলই ভোগ করিতে হইবে। স্বীয় সঙ্কল্প বশতই এই দেহগৃহে দুরাত্মা চিত্তবেতাল বাস করে এবং লীলাক্রমে উন্মত্ত হইয়া নৃত্য করিতে থাকে। চিত্ত-বেতাল এই দেহগৃহকে শূন্যাবস্থায় প্রাপ্ত হইয়া ইহাকে এমন করিয়া তুলিয়াছে যে, মহাপুরুষদিগকেও উহার ভয়ে নিয়ত সমাধি-সাধনায় নিরত হইতে হইয়াছে। যিনি স্বীয় দেহগৃহ হইতে চিত্ত-বেতালকে নির্ব্বাসিত করিতে পারেন, তিনি এই শূন্য সংসারে থাকিয়াও কদাচ ভীত হন না। যে দেহগৃহ চিত্ত-বেতাল কর্ত্তৃক এমনই ভাবে অভিভূত, তাহাতে থাকিয়া থাকিয়া যাহারা কত অনন্ত কোটিদেহ বৃথাই বিনাশিত করিল, কি আশ্চর্য্য! অদ্যাপি তাহারা সেই দেহগৃহেই কেন যে আত্মবুদ্ধি স্থাপন করিয়া অবস্থান করিতেছে, তাহা তো বুঝিতে পারিলাম না। বিশদ কথা এই যে, ঐ বেতালাভিভূত দেহগৃহে থাকিয়া তাহারা এত ক্লেশ পায়, তথাচ উহা ত্যাগ করিতে কিছু মাত্র চেষ্টা করে না, ইহা বাস্তবিকই বিস্ময়ের বিষয় নহে কি?

হে রঘুনন্দন! যাহারা এই চিত্তনামক বেতাল কর্ত্তৃক অভিভূত দেহ-গৃহে বাস করিয়াই মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে; তাহাদের বুদ্ধির প্রশংসা

কিছুতেই করা যায় না। তাহাদের সে বুদ্ধি সত্য সত্যই পিশাচের ন্যায়। হে সাধুশীল! এই দগ্ধ দেহগৃহ অহঙ্কারাখ্য মহাযক্ষের আলয়। ইহাতে যাহারা আস্থাসম্পন্ন হইয়া অবস্থিত, তাহারাই পিশাচাখ্যায় অভিহিত। কেন না, এই দেহগৃহ কদাচ স্থিতিশীল নহে; তথাচ ইহাতেই তাহাদের অটল আস্থা। সুতরাং তাহারা পিশাচ নহে তো কি? তাই বলি, তুমি প্রশস্ত বুদ্ধির প্রভাবে অহঙ্কারের অনুসরণ হইতে নিবৃত্ত হও; তাহাকে একেবারেই ভুলিয়া যাও এবং সত্বর আত্মাকেই আশ্রয় কর। যাহারা অহঙ্কার-পিশাচের কবলে পড়িয়া নরকে যাইবার ইচ্ছা করে, তথাবিধ মোহ-মদান্ধ ব্যক্তিবর্গের মিত্র বা বন্ধু কোথাও কিছুই থাকে না। অহঙ্কার-কলঙ্কিত বুদ্ধি লইয়া যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করা যায়, তাহার ফল বিষ-লতার ফলবৎ মৃত্যুই ঘটাইয়া থাকে। যে মূর্খ বিবেক-ধৈর্য্যে জলাঞ্জলি দিয়া নিজের অহঙ্কার লইয়াই মহোৎসবে মত্ত হয়, তুমি তাহাকে নষ্ট বলিয়াই বুঝিও।

হে রাঘব! অহঙ্কার-পিশাচের বশতাপন্ন দীন হীন ব্যক্তিবর্গ নরকানল-রাশির ইন্ধনস্বরূপেই প্রতিভাত হয়। যাহার কোটরে অহঙ্কার-বিষধর বাস করে, সেই দেহ-তরুকে অনতিবিলম্বে অধীরদিগের নিপাতিত করা কর্ত্তব্য। অহঙ্কার-পিশাচ এ দেহে থাকুক আর নাই থাকুক, এ দেহকে তুমি সত্যজ্ঞানে দেখিও না। এই অহঙ্কার-পিশাচ যদি মনে মনে অবজ্ঞাত বা তিরস্কৃত হয়, তাহা হইলে তোমার আর কিছুতেই কিছু করিয়া উঠিতে পারিবে না।

হে রাম! এই দেহগৃহে চিত্তপিশাচ বাস করিলেও অনন্ত বিলসিত আত্মার তাহাতে ক্ষতি কি আছে? ফলে আত্মায় উপেক্ষা বুদ্ধি বিদ্যমান; কাজেই ঐ চিত্ত-পিশাচ থাকিয়াও কিছুই করিতে পারে না। যে পুরুষ চিত্ত-যক্ষ দ্বারা অভিভূত, তাহার যে বিপদ কত, তাহা একশত বর্ষ ধরিয়া গণনা করিলেও শেষ করা যায় না। 'হা হতোহস্মি' 'হা দগ্ধোহস্মি' ইত্যাকার যে দুঃখ-বিলাপ, তাহা অহঙ্কার-পিশাচেরই প্রভাব; তদ্ব্যতীত অন্যের প্রভাব উহাতে কিছুই নাই। আকাশ যেমন সর্ব্বব্যাপী হইয়াও অন্য কাহারও সহিত অসম্বদ্ধ, তেমনি আত্মা সর্ব্বগ হইয়াও অহঙ্কার সহ অসংশ্লিষ্ট।

হে রঘুনন্দন! এই দেহযন্ত্র চঞ্চল, ইহা প্রাণসহ মিলিত হইয়া যাহা করে, বা যাহা গ্রহণ করে, তাহা অহঙ্কারেরই চেষ্টা। ফলে আত্মা অকর্ত্তা; তিনি কিছুই করেন না। তবে যে তাঁহাকে চিত্তচেষ্টার কারণ বলিয়া উল্লেখ করা হয়, সে কারণ—বৃক্ষের উৎপত্তি-ব্যাপারে আকাশের ন্যায়ই জানিবে। অর্থাৎ বৃক্ষের উৎপত্তিকার্য্যে আকাশ যেমন অকর্ত্তা, তেমনি আত্মাও কর্ত্তৃত্বশূন্য হইয়া আপনার মাহাত্ম্যে আপনি প্রতিষ্ঠিত। দীপের সান্নিধ্য মাত্রেই গৃহমধ্য যেমন প্রকাশ পায়, তেমনি সত্তা লাভ করিয়া কিম্বা স্থূলদেহ কল্পনা করিয়া মনও আত্মার সন্নিধিমাত্রেই পরিস্ফুরিত হইয়া থাকে। বৎস! আকাশ ও পৃথ্বীর ন্যায় বা প্রকাশ ও অন্ধকারের ন্যায় আত্মা ও চিত্ত পরস্পর নিত্য অসংশ্লিষ্ট। এই আত্মা ও চিত্তের বাস্তব সম্বন্ধ কিছুই নাই।

হে রঘুবংশাবতংস! চিত্ত—চঞ্চল স্পন্দশক্তির প্রযোজক আত্মশক্তি দ্বারা সমাবৃত থাকে; এই জন্য মূর্খেরাই তাহাকে আত্মা বলিয়া অবলোকন করে। কিন্তু যিনি আত্মা, তিনি সর্ব্বগত, সর্ব্ব বিভু ও নিত্য প্রকাশ। আর যাহা হৃদয়গত প্রগাঢ় অন্ধকার, জানিও,—তাহাই শঠ চিত্ত বা অহঙ্কার। প্রকৃত কথা এই যে, তুমিই সেই সর্ব্বজ্ঞ আত্মা, আর যাহা মন—তাহা তুমি নহ। মনোমোহকে তুমি দূর করিয়া দাও; এই মনোমোহে তুমি আচ্ছন্ন হইয়াছ কেন? এই মনঃপিশাচ শূন্য দেহগৃহে অবস্থিত; ইহা প্রকৃত পক্ষে আত্মাকে স্পর্শ করিতে না পারিলেও আত্মাকে স্পর্শ করিয়াছি বলিয়া মৌনভাবে ভাবনা করিতে থাকে। এই অমঙ্গলময় চিত্ত-পিশাচ সংসারোৎপত্তির হেতুভূত; ইহাই লোকের ধৈর্য্য-সর্ব্বস্ব অপহরণ করে; ইহাকে পরিত্যাগ করিয়া তুমি যেমন থাক, সেইরূপ ভাবেই স্থির হইয়া থাক। যে ব্যক্তি চিত্ত-বেতাল কর্ত্তৃক তীব্রভাবে আক্রান্ত হয়, কি শাস্ত্র বিচার, কি গুরূপদেশ, কি বন্ধুজনের সাহায্য, ইহাদের কোন কিছুই তাহাকে পরিত্রাণ করিতে পারে না। যদীয় চিত্ত-বেতাল ক্ষয় পাইয়াছে, একেবারে শান্ত হইয়া গিয়াছে, কিঞ্চিৎ কর্দ্দম-নিমগ্ন হরিণকে যেমন অনায়াসেই উদ্ধার করা যায়, তেমনি শাস্ত্রবিচারই বল, গুরূপদেশই বল আর বন্ধুজনের সাহায্যই বল, সকলেই সেই ক্ষীণচিত্ত

ব্যক্তিকে পরিত্রাণ করিতে পারে। এই জগৎ যেন একটা শূন্য পুরী; এই পুরী-মধ্যস্থ দেহগৃহ উন্মত্ত চিত্ত-যক্ষের উপদ্রবে একেবারেই দূষিত হইয়া উঠিয়াছে। এই জগদাকার বিশাল বিস্তৃত অরণ্য চিত্ত-বেতালের বাসভূমি; এ অরণ্য কাহার না ভীষণ হইয়াছে? যে জগৎপুরী চিত্ত-পিশাচ কর্ত্তৃক উপদ্রুত নহে, সেই পুরী-মধ্যস্থ দেহ-গৃহই কতিপয় সাধুর সেবার বিষয় হইয়া থাকে।

হে রঘুরাজ! যে দিকে যাহাই দেখ, বা যাহাই প্রত্যক্ষ কর, সকলই দেহরূপ শ্মশানবাসী মত্ত-মোহ-বেতালের আশ্রয়ভূমি। এই জগৎ যেন একটা অরণ্য; এ অরণ্যমধ্যে অনভিজ্ঞ বালকের ন্যায় আত্মদেব মোহমগ্ন-ভাবে অবস্থিত। একমাত্র ধৈর্য্য বলের যদি সহায়তা লওয়া যায়, আর যদি নিজের বিশেষ চেষ্টা থাকে, তাহা হইলেই ঐ আত্মদেবকে মোহ হইতে উদ্ধার করা যাইতে পারে; সুতরাং সেইরূপ কার্য্য করাই সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। এই জীর্ণ জগদরণ্যে ভূতবৃন্দরূপ মৃগপাল পরিভ্রমণ করিতেছে, অরণ্যে তুমি হরিণশাবকের ন্যায় বিষয়-তৃণের লালসায় বৃথা ব্যগ্র হইও না। এই ভূতলরূপ অরণ্য মধ্যে বহু হরিণশাবক বিচরণ করে,—করুক; কিন্তু তুমি সবলে অজ্ঞান-গজকে বিনাশপূর্ব্বক মৃগেন্দ্রের ন্যায় অকুতোভয়ে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতে থাক।

হে রাম! এই জঙ্গলাকীর্ণ জম্বুদ্বীপে অন্যান্য মুগ্ধ-নর-মৃগগণ যেরূপ ভাবে বিহার করিয়া বেড়ায়, তুমি সেরূপে বিহার করিও না। মহিষ যেমন পল্বল মধ্যে ডুবিয়া থাকে, তুমি সেভাবে বন্ধুজন মধ্যে মগ্ন হইয়া রহিও না। কেন না, তাহাতে প্রকৃষ্ট ফল কিছুই নাই। এই যে বিশাল বিষয়জাল দেখা যায়,—বৎস! এ সকলকে তুমি দূরে পরিহার করিবে, সাধুজন যে পথের অনুসরণ করেন, তাহার অনুবর্ত্তন করিবে; আর একমাত্র আত্মলাভই পরম লাভ, ইহা মনে মনে বিচার করিয়া একাদ্বয় আত্মারই আশ্রয় গ্রহণ করিবে। এ দেহ অপবিত্র, দুর্দ্দর্শ, দুর্ভাগ্য ও তুচ্ছাদপি তুচ্ছ, ইহার জন্য বিষয়পঙ্কে নিমগ্ন হওয়া কোন ক্রমেই কর্ত্তব্য নহে। কেন না, এই দেহময়া চিন্তারূপিণী কোপন-স্বভাবা ভীষণা রাক্ষসী উহাকে গ্রাস করিবার জন্যই ব্যগ্রভাবে অবস্থিতা। এ দেহ অস্ত একজনে নির্ম্মাণ করিল, অপর

এক বেতাল আসিয়া ইহাতে আশ্রয় লইল; অন্য কাহারও দুঃখ হইল এবং অপর একজনে সে দুঃখ ভোগ করিল; অহো! এ এক বিচিত্র মৌর্খ চক্র! অর্থাৎ সঙ্কল্প এ দেহের নির্ম্মাতা, অহঙ্কার ইহাতে অবস্থিত, মনের এখানে দুঃখোৎপত্তি, আর সেই দুঃখের ভোক্তা হইল জীব। এরূপ বিচিত্র ক্রম মূর্খতাময় নহে কি? আত্মা পাষাণবৎ অন্তরে বাহিরে একইরূপ ও নির্ব্বিকার; সুতরাং তাহার অন্যথা ভাব অসম্ভব। তথাবিধ আত্মার যে মাত্র সত্তাসামান্য-ভাব আছে, তাহারই অধ্যাস বশতঃ বৃথাই দুঃখপ্রসিদ্ধি হইয়া থাকে। যেমন পাষাণের কাঠিন্য পাষাণ হইতে অভিন্ন, তেমনি মনঃপ্রভৃতিরও সত্তা আত্মা হইতে অপৃথক্। আত্মার সত্তাতেই মনঃপ্রভৃতির সত্তা; তদ্ভিন্ন তাহাদের অভাবই সুসিদ্ধ। যেমন পাষাণের পাষাণত্ব বা ঘটের ঘটত্ব পাষাণের বা ঘটের সত্তা হইতে অভিন্ন, তেমনি ঐ মনঃপ্রভৃতিও আত্মা হইতে অব্যতিরিক্ত।

পুরাকালে কৈলাস-কন্দরে বসিয়া ভগবান্ অর্দ্ধেন্দু-শেখর সমস্ত সংসার-দুঃখের শান্তির নিমিত্ত এ সম্বন্ধে আমাকে যাহা বলিয়াছিলেন, সেই মহামোহ-ধ্বংসী অপর একটী তত্ত্ব-পদ্ধতির কথা তোমায় বলিতেছি,—অবহিত হইয়া শ্রবণ কর।

সুপ্রসিদ্ধ স্বর্গধামের পরপারে কৈলাস নামে এক শৈল আছে। ঐ শৈল পুঞ্জীভূত চন্দ্রকিরণবৎ সমুজ্জ্বল এবং ভগবতী গৌরী দেবীর উহা বিহারস্থান। ভগবান্ অর্দ্ধেন্দু-শেখর ঐ শৈলাবাসে বাস করিয়া থাকেন। একদা সেই পরম পূজ্য মহাদেবের পূজা করিবার জন্য আমি সেই শৈলোপরি গমনপূর্ব্বক তত্রত্য গঙ্গাতটে আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে লাগিলাম। তখন তপস্যার জন্য আমি তপস্বি-জনোচিত আচার অবলম্বন করিলাম। সেই অবস্থায় আমার তথায় বহুদিন অবস্থান ঘটিল। সেকালে সিদ্ধ-সম্প্রদায় আসিয়া আমায় ঘিরিয়া বসিতে লাগিলেন। আমিও তাঁহাদের নিকট হইতে বিবিধ শাস্ত্রার্থ সংগ্রহ করিয়া লইতে লাগিলাম। সেখানে আমার বহু শাস্ত্রগ্রন্থ সংগৃহীত হইল। আমি পুষ্প চয়ন করিবার জন্য তখন একটী পাত্র প্রস্তুত করিয়াছিলাম।

এইরূপে নিয়মাবলম্বনপূর্ব্বক কৈলাস-কানন-কুঞ্জে অবস্থান করিয়া

তপস্যা করিতে করিতে বহুকাল অতিবাহিত করিলাম। অনন্তর একদা শ্রাবণ মাস। কৃষ্ণ পক্ষীয় অষ্টমী তিথি। রাত্রির প্রদোষভাগ মাত্র অতীত হইয়াছে। দিক্ সকল প্রশান্তভাব ধারণ করিয়াছে। জগতের সর্ব্বচেষ্টা রহিত হইয়াছে। চরাচর জগৎ যেন কাষ্ঠ-লোষ্ট্রবৎ মৌনব্রত অবলম্বন করিয়াছে। বনাভ্যন্তরে অন্ধকারপুঞ্জ এতদূর ঘনীভূত হইয়াছে যে, যেন তাহা খড়্গ দ্বারাও ছেদন করা যায়।

এ হেন সময়ে—রাত্রির প্রথম যামার্দ্ধ অতীত হইলে, আমি সমাধি-ভঙ্গ করিয়া যেই মাত্র বাহ্য বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবার উপক্রম করিলাম, অমনি দেখিতে পাইলাম,—সহসা একটা তেজঃপুঞ্জ যেন কানন-মধ্যে প্রাদুর্ভূত হইল। মনে হইতে লাগিল,—শত শত শ্বেত মেঘ কিম্বা বহুল চন্দ্রমণ্ডল যেন এককালে নিখিল দিগ্‌বলয় আলোকিত করিয়া তুলিল। দেখিলাম,—কাননের সেই গাঢ় তিমির আর নাই। মুহূর্ত্ত মধ্যে সেই কানন-কুঞ্জ পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। আমি সেই সহসা প্রবৃত্ত তেজঃপুঞ্জের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বিস্ময়ের সহিত অন্তঃপ্রকাশময় জ্ঞাননেত্র উন্মীলনপূর্ব্বক দেখিলাম,—ভগবান্ চন্দ্রার্দ্ধ-মৌলি ভগবতী গৌরীর করে কর বিন্যাস করিয়া সেই শৈলসানুর অভিমুখে আগমন করিতেছেন। নন্দী তাঁহার পথ-প্রদর্শকরূপে অগ্রগামীদিগকে সরাইয়া দিতেছে। আমি তাহা দেখিয়া তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিলাম। আমার শিষ্যবর্গকে ডাকিলাম এবং অর্ঘ্য পাত্র হস্তে লইয়া সসন্তোষ-মনে তদীয় দৃষ্টি-পাত-পূত পুরোভাগে গিয়া দাঁড়াইলাম। তখন দূর হইতে আমি সেই দেবদেবের পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি দিলাম, অর্ঘ্য দিয়া প্রণাম করিলাম এবং যথারীতি তদীয় পাদ বন্দনা করিলাম।

অনন্তর আমার প্রতি ভগবানের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল; তাঁহার সে দৃষ্টি—সরল, সর্ব্বার্ত্তি-হর ও সুধাকরবৎ সুশীতল। সে দৃষ্টিপাতে আমি কৃতার্থ হইলাম। কিঞ্চিৎ পরেই সেই ত্রিলোকসাক্ষী শশাঙ্ক-মৌলি পুষ্পাকীর্ণ শৈলতটে উপবেশন করিলেন। আমি তাঁহার সমীপে গিয়া তাঁহাকে পাদ্য, অর্ঘ্য, ও পুষ্প দ্বারা পূজা করিলাম; তদীয় চরণোপরি পারিজাতপুষ্পের বহু অঞ্জলি অর্পণ করিলাম, নানা স্তুতিগাথা পাঠ করিলাম এবং অশেষ প্রকারে

নমস্কার করিলাম; এই ভাবে তাঁহার তখন যথাযথ পূজাকার্য্য নির্ব্বাহ করিলাম। ৩১

অতঃপর সমগ্র মাতৃকামণ্ডলী ও সখীগণ-সমভিব্যাহারিণী ভগবতী গৌরী দেবীকেও আমি ঐরূপে অর্চ্চনা করিলাম। তাঁহাদের সকলেরই পূজাকার্য্য নির্ব্বাহিত হইলে পরিপূর্ণ সুধাকরের ন্যায় আমার অন্তর শীতল হইয়া উঠিল। আমি তখন বিনীতভাবে তাঁহাদিগের সম্মুখে উপবেশন করিলাম।

এই সময় ভগবান্ অর্দ্ধেন্দুশেখর মধুর বাক্যে আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! ভবদীয় চিত্তবৃত্তি প্রশান্ত ও পরম পদে বিশ্রান্ত হইয়া কল্যাণকরী হইয়াছে তো? তোমার তপস্যা অবাধে কল্যাণপথের অনুসরণ করিতেছে তো? যাহা প্রাপ্তব্য, তাহা তোমার অধিগত হইয়াছে তো? তোমার সর্ব্বভয় বিদূরিত হইয়াছে তো?

হে রঘুনন্দন! অখিল লোকের একমাত্র সাক্ষী ভগবান্ ভবানীপতি আমাকে এইরূপ প্রশ্ন করিলে পর আমি সানুনয় বাক্যে বলিলাম,—হে ত্রিনয়ন! হে মহেশ! আপনাকে সর্ব্বদা স্মরণ করাই পরম মঙ্গল-কার্য্য; এইরূপ কার্য্যে যাহারা ব্রতী থাকে, এ জগতে তাহাদের দুষ্প্রাপ্য কি আছে? আর তাহাদের ভয়ের সম্ভাবনাই বা কোথায়? ফলে, তাহাদের অপ্রাপ্য কিছুই নাই এবং ভয়ও কোথাও নাই। আপনার অনুধ্যান বশতঃ যে পরমানন্দ প্রাদুর্ভূত হয়, সেই পরমানন্দ-রসে যাহাদের চিত্ত বিভোর হইয়া থাকে, এ জগতে এমন কোনই প্রাণী নাই যে, তাহাদের পদ-প্রান্তে প্রণত হয় না। যথায় মানবেরা ভবদীয় অনুধ্যানে একান্ত নিরত—সেই দেশই প্রকৃত পুণ্য দেশ; সেই জনপদই পুণ্য জনপদ এবং সেই পর্ব্বতই পুণ্য পর্ব্বত।

হে বিভো! আপনাকে স্মরণ করা অতীত পুণ্যের ফলস্বরূপ। উহা বর্ত্তমান পুণ্যের উপচায়ক এবং ভাবী পুণ্যের বীজস্বরূপ হইয়া থাকে। হে প্রভো! আপনার অনুস্মরণ একমাত্র জ্ঞানসুধাপূর্ণ কলশ, ধৃতিরূপিণী কৌমুদীর নিশাকর, এবং অপবর্গপুরীর দ্বারস্বরূপ। হে ভূতনাথ! ভবদীয় অনুস্মরণরূপ উদার চিন্তামণির সাহায্য পাইয়া আমি

সমুস্ত আপদের মস্তকে পদার্পণ করিয়াছি; ফলে, আপনার অনুধ্যানে মদীয় নিখিল আপদ বিদূরিত হইয়াছে।

রামচন্দ্র! আমি সেই প্রসন্নমূর্ত্তি ভগবান্ মহেশ্বরকে এই কথা কহিয়া পুনরায় প্রণতভাবে তাঁহাকে যাহা যাহা বলিয়াছিলাম,—শ্রবণ কর। আমি বলিয়াছিলাম,—ভগবন্! ভবদীয় প্রসাদে আমার সর্ব্বদিক্ পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। আমার কোন কিছুরই অভাব দেখিতেছি না। তথাচ হে দেবদেব! কোন একটী বিষয়ে আমার সন্দেহ জন্মিয়াছে; আমি সে সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতেছি। আপনি প্রসন্নচিত্তে সে বিষয় মীমাংসা করিয়া দিন। হে প্রভো! যাহা নিরাময়, নিরুদ্বেগ, যাহাতে সর্ব্বপাপ ক্ষীণ ও সর্ব্ব কল্যাণ বর্দ্ধিত হয়, তথাবিধ দেবার্চ্চন-বিধান কি প্রকার, তাহা-আমি জানিতে ইচ্ছা করি, সে সম্বন্ধে আমাকে উপদেশ প্রদান করুন।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে ব্রহ্মজ্ঞদিগের বরেণ্য! যাহা একবার মাত্র অনুষ্ঠান করিয়াই অনুষ্ঠানকর্ত্তা মুক্তি লাভ করিয়া থাকে, সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেবার্চ্চন-বিধান, তোমায় বলিতেছি,—শ্রবণ কর। হে দ্বিজ! নিরন্তর দেবার্চ্চনা-কার্য্যে তোমার বাহু সফলীকৃত হইয়াছে; কিন্তু সেই দেব কে? তাহার তত্ত্ব তুমি জানিতে পারিয়াছ কি? যদি না জানিয়া থাক, তবে জানিয়া রাখ,—সে দেব—পুণ্ডরীকাক্ষ নহেন; সে দেব—ত্রিলোচন নহেন; সে দেব—পদ্মজন্মা নহেন; সে দেব—সুরেন্দ্র নহেন; সে দেব—পবনও নহেন, সে দেব—সূর্য্য বা চন্দ্রও নহেন; সে দেব—অনল বা কোন ব্রাহ্মণও নহেন; এই যে আমি আছি, আমিও সে দেব নহি। হে দ্বিজাগ্রণী! আপনাকেও সে দেব বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না। সে দেব—দেহরূপী নহেন বা চিত্তরূপী নহেন। কমলা কিম্বা মতি এ উভয়ের কেহই সেই দেব নহেন। তবে কাহাকে সেই দেব বলা যায়? যিনি অকৃত্রিম, যিনি অনাদি, সেই সদানন্দমূর্ত্তি চিৎই দেব বলিয়া বিদিত। যাহা আকারাদি-পরিচ্ছিন্ন পরিমিত বস্তু, তাহাতে দেবত্ব আসিবে কোথা হইতে? পূর্ব্বে পূর্ব্বে যাঁহাদের নাম উল্লেখ করিলাম, উঁহারা সকলেই তো পরিচ্ছিন্ন বা পরিমিত; কাজেই উঁহাদের দেবত্ব হওয়া অসম্ভব কথা। যাহাতে কৃত্রিমতা নাই, যাহার আদি নাই, অন্ত নাই, সেই মঙ্গলময় চিৎকেই

বিবুধগণ দেব নামে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। দেবশব্দ সেই চিতেরই বাচক; লোকে সেই চিৎকেই দেবরূপে অর্চ্চনা করিয়া থাকে। তিনিই একমাত্র আছেন; তাঁহা হইতে সকল প্রবর্ত্তিত হয়, প্রকৃত সত্তাবান্ বলিতে তাঁহাকেই বলা যায় এবং তাঁহারই সত্তায় সমস্তই আত্মস্বরূপে বিরাজমান। যাহারা সেই পরম মঙ্গলময়ের তত্ত্ব বুঝে না, মূর্ত্তি-পরিচ্ছিন্ন কল্পিত দেবের অর্চ্চনা তাঁহাদের পক্ষেই শোভনীয়। দেখ, যে ব্যক্তি যোজন-পরিমিত পথে গমন করিতে অক্ষম, তাহার জন্য ক্রোশ মাত্র পথই ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। রুদ্রাদি দেবের উপাসনায় ফল পাওয়া যায় সত্য; কিন্তু তাহা ইয়ত্তাদি দ্বারা পরিচ্ছেদ-যোগ্য। যাহার পরিচ্ছেদ নাই, তথাবিধ আত্ম-দেবতার উপাসনায় যে আনন্দফল অধিগত হওয়া যায়, তাহাতে কৃত্রিমতা কিছুই নাই; তাহা অকৃত্রিম, অনাদি ও অনন্ত। এই অকৃত্রিম ফল পরিহার-পূর্ব্বক কৃত্রিম ফলের লালসায় ধাবিত হওয়া মন্দার-কানন ছাড়িয়া করঞ্জ-কাননে প্রবেশ করারই অনুরূপ হইয়া থাকে। কে পূজ্য, কাহাকে পূজা করিতে হয়, এ বিষয় যাঁহারা জানেন, তাঁহারা মল-বিরহিত মঙ্গলাস্পদ চিন্মাত্র দেবকেই এক মাত্র পূজ্য বলিয়া পরিজ্ঞাত আছেন। সেই চিন্ময় দেবতার পূজার প্রধান উপকরণ—পুষ্প। বোধ, সমতা ও শান্তি, এই তিনটীই সেই পুষ্পস্থানীয়। এই সকল পুষ্প দ্বারা আত্মদেবতার যে অর্চ্চনা করা হয়, জানিও,—তাহারই নাম দেবার্চ্চনা। আকারের অর্চ্চনাকে দেবার্চ্চনা বলা যায় না। আত্মচৈতন্যের উপাসনারূপ দেবা-র্চ্চনা ছাড়িয়া যাহারা কৃত্রিম দেবার্চ্চনায় নিরত হয়, চিরদিনের জন্য তাহাদিগকে ক্লেশই ভোগ করিতে হয়।

হে ব্রহ্মন্! যে সকল মহাপুরুষেরা জ্ঞেয় বস্তু পরিজ্ঞাত হইয়াছেন, তাঁহারা যদি কদাচিৎ আত্মধ্যান হইতে ব্যুত্থিত হইয়া অর্থাৎ সমাধি ভঙ্গ করিয়া সাকার দেবতার পূজা করেন, তবে তাঁহাদের সে পূজা বালকের ক্রীড়ার ন্যায়ই হইয়া থাকে। সে পূজায় তাঁহারা কৃত্রিম ফল-ভোগের আশা কিছুই পোষণ করেন না। তাঁহারা বিলক্ষণ জানেন, একমাত্র ভগবান্ আত্মাই পূজ্য দেবতা; তিনিই ভগবান্ মঙ্গলময় ও পরম কারণ। জ্ঞানরূপ পূজার উপকরণ দিয়া সর্ব্বদা সেই এক আত্মদেবেরই পূজা করিতে

হয়। এই যে জীবভাবাপন্ন অব্যয় চিদাকাশ, ইহাকেই তুমি ব্রহ্ম বলিয়া বিদিত হও। এই ব্রহ্ম ভিন্ন আর দ্বিতীয় পূজ্য দেবতা কেহই নাই। এই আত্মদেবতার অর্চ্চনাকেই তুমি মুখ্য অর্চ্চনা বলিয়া জানিও।

তখন আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—হে প্রভো! চিদাকাশ-রূপ আত্মা যেরূপে এই জগদ্ভাবে পরিণত ও যে প্রকারে জীবাদি ভাব প্রাপ্ত হইলেন, তাহা আমার নিকট প্রকাশ করিয়া বলুন। আমার কথার প্রত্যুত্তরে ঈশ্বর কহিলেন,—মুনে! কল্পান্তে যাহা অবশিষ্ট থাকে, সেই পরাবর-বর্জ্জিত এক মাত্র চিদাকাশই সর্ব্বত্র বিদ্যমান। তাঁহাতে চেত্য বা দৃশ্য জগদ্ভাব কিছুমাত্রই নাই। যেমন রবি-শশিপ্রভৃতির প্রকাশ আপনা হইতেই বিস্তার প্রাপ্ত হইয়া পড়িলে সেই স্বপ্রকাশের বহির্গত প্রভাকার স্পন্দনই নীল-পীতাদিরূপে প্রসিদ্ধ হইয়া উঠে, তেমনি উল্লিখিত অপরিচ্ছিন্ন চিদাকাশের মায়িক বাসনাদি পথের স্পন্দনই এই জগদাকারে প্রথিত হইয়াছে। এই জন্যই বলা যায়, যে এই জগৎ স্বপ্ন-সংদৃষ্ট নগরের সহিত উপমিত এবং ইহাকে চিদ্ভিন্ন অন্য আর কোন পদার্থ বলিয়াই নির্দ্দেশ করা চলে না। পরমার্থ পক্ষে বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে, এ জগতের পৃথক্ ভিত্তি কিছুই নাই; ইহা কেবল নির্ম্মল চিদাকাশরূপ আত্মমাত্রেই প্রতিভাত। চিৎ যে চেত্যাকারে পর্য্যবসিত হইয়া আত্মসাক্ষাৎকার করেন, তাহা নহে; কেন না চিতের পরিণাম নাই, তিনি অদ্বিতীয়; কাজেই তাঁহার রূপান্তর ধারণ অপ্রসিদ্ধ কথা। সুবিশুদ্ধ চিৎ মায়াবৃত থাকেন বলিয়া এই চেত্য জগৎ তাঁহা হইতে ভিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হইয়া থাকে। ফল কথা এই যে, এ জগৎ স্বপ্নপুরীর ন্যায় আভাসমান; ইহাতে দ্বৈত নাই, পরিণাম নাই, ইহা একমাত্র চিদাকাশ বৈ আর কিছুই নহে। ইহাতে ভাবান্তর আসিবে কিরূপে? এই যে গিরিমালা, এই যে জগদ্বৃন্দ, এই যে আত্মা, এই যে জীব, এই যে পঞ্চভূত, জানিবে—এ সকলই সেই একমাত্র চিদাকাশ বা চিন্মাত্র। সৃষ্টির আদিতে বিভিন্ন স্বর্গ বা বিভিন্ন পুরীর মধ্যবর্ত্তী স্থানের সর্ব্বত্র তুমি অনুসন্ধান করিয়া দেখ; দেখিয়া বল, একাম্বর চিদাকাশ ভিন্ন আর কোন কিছুরই অস্তিত্ব সম্ভাবনা

আছে কি না ? ফলতঃ চিদাকাশ বৈ আর কিছুই নাই। কি আকাশ, কি পরমাকাশ, কি ব্রহ্মাকাশ, কি চিৎ, কি জগৎ, এই সকল—বৃক্ষ, তরু, পাদপ ও মহীরুহ প্রভৃতির ন্যায় মাত্র পর্য্যায় ভেদ বলিয়াই উল্লিখিত। বাস্তব পক্ষে দেখিতে গেলে দেখা যাইবে, উহারা একই বস্তু বৈ আর কিছুই নহে। স্বপ্ন সঙ্কল্পে কিম্বা মায়ার মহিমায় দ্বৈতানুভব হয় সত্য, কিন্তু তত্ত্ব-দৃষ্টির সাহায্যে দেখিলে প্রতীয়মান হইবে—একমাত্র চিদাকাশই তখন দ্বৈত জগদাকারে প্রতিভাত হয়। এইরূপ মহাচিদাকাশই জাগ্রৎ জগদাকারে প্রকাশ পাইয়া থাকে। যেমন স্বপ্ন-সঙ্কল্পিত পুরীমধ্যে চিদাকাশ বৈ আর কিছুরই সম্ভাবনা নাই,—একমাত্র চিদাকাশই ঐ প্রকারে প্রতীতিগোচর হয়, জাগ্রদবস্থাতেও সেইরূপই হইয়া থাকে। অর্থাৎ স্বপ্নে চিদাকাশ বৈ পদার্থান্তরের আস্তিত্ব যেমন অসম্ভব, তেমনি জাগ্রদবস্থাতেও এক-মাত্র চিদাকাশ বৈ পদার্থান্তরের সম্ভাবনা নাই। যে হেতু চিদাকাশ বৈ অন্য কোন চেত্য বস্তু অসম্ভব, সেই হেতু এই নিখিল চেত্য জগৎই সৎ চিন্মাত্র বলিয়া অবধারিত। এই ত্রিজগতের উদ্ভব স্বপ্নেরই অনুরূপ বলিয়া নিশ্চিত। স্বপ্নাবস্থায় যে ঘটপটাদি দৃষ্টিগোচর হয়, তৎসমস্ত যেমন চিদাকাশরূপ আত্মা ব্যতীত আর কিছুই নহে, তেমনি সৃষ্টির আদিতে যে সকল ঘটপটাদি সৃষ্ট হয়, তাহারাও যে একাদ্বয় চিদাকাশ, সে কথা আর বলাই বাহুল্য মাত্র। স্বপ্ন-সঙ্কল্পিত নগরে যেমন বিশুদ্ধ জ্ঞান বৈ আর কিছুরই উপলব্ধি হয় না, তেমনি এই ত্রিজগতেও একমাত্র চৈতন্যই বিদ্যমান, তদ্ব্যতীত আর কিছুই কোথাও নাই। যে কোন দৃষ্ট বস্তু, যে কিছু ত্রৈকালিক ভাব বা অভাব অথবা দেশ, কাল কিম্বা চিত্ত, সকলই সেই একাদ্বয় চিদাকাশ বৈ আর কিছুই নহে। এই যিনি পরমার্থ আত্মদেব বলিয়া নির্দ্দিষ্ট এবং ত্বং, অহং, অশেষ, জগৎ ও নিখিল বস্তুস্বরূপে যিনি অবধারিত, জানিবে—তিনিই সত্য চিদাকাশ এবং তিনিই একমাত্র পূজ্য আত্মদেব ; তোমার, আমার, অন্যের, জগতের, অধিক কি—এই সমগ্র বস্তুপরম্পরার যে চিদাকাশমূর্ত্তি পরমাত্ম-দেবই দেহস্বরূপ, তিনি ভিন্ন এ সমুদায়ের স্বরূপ আর কিছুই নাই।

হে মুনে ! সঙ্কল্পের বা স্বপ্নের নগরে চিদাকাশ ভিন্ন অন্য কোন

স্বরূপই যেমন বিদ্যমান নাই, তেমনি সৃষ্টির আদিম অবস্থা হইতে এ পর্য্যন্ত এই সৃষ্টি-ব্যাপারেও একমাত্র চিদাকার ভিন্ন অন্য কোন রূপেরই অস্তিত্ব উপলব্ধ হয় না।

ঊনত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২৯ ॥

ত্রিংশ সর্গ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে মুনে! এইরূপে এই যে নিখিল বিশ্ব দেখা যায়, এ সমস্তই কেবল সেই একমাত্র পরমাত্মা। এই যিনি পরমাকাশ-রূপ পরব্রহ্ম বা পরমাত্মা, ইনিই পরম দেব বলিয়া কীর্ত্তিত। এই পরম দেবের পূজাই পরম শ্রেয়স্কর। এই প্রকার দেবপূজা হইতেই সকল মঙ্গল প্রাপ্ত হওয়া যায়। সর্ব্ব জগতের অধিষ্ঠানভূত ব্রহ্ম বস্তুকে এ হেন দেবপূজার ফলেই অধিগত হওয়া যায়। এই পরম দেবেই সমস্ত প্রতিষ্ঠিত। এই দেবতার আরাধনার ফলে যে সুখ লাভ করা যায়, তাহার আদি নাই, অন্ত নাই, সে সুখ অদ্বিতীয়, অনুপম ও অখণ্ড। সে সুখ লাভ করিতে হইলে কোন প্রকার বাহ্য আয়াসের আবশ্যক হয় না; তাহা অনায়াসেই লব্ধ হইয়া থাকে। সে সুখে কৃত্রিমতা কিছুই নাই—তাহা অকৃত্রিম, অপরিসীম।

হে মুনিশ্রেষ্ঠ! তুমি তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছ; তাই তোমাকেই এই সকল রহস্য কথা কহিতেছি। জানিয়া রাখ,—এই পরম দেবতার অর্চ্চনা-ব্যাপারে পুষ্প-ধূপাদির আবশ্যক হয় না। যাহাদের মতি অব্যুৎপন্ন, যাহারা বালকের ন্যায় সরলহৃদয়, যাহাদের তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্তি হয় নাই, পুষ্প কিম্বা ধূপাদি দ্বারা কৃত্রিম দেবপূজা তাহাদের জন্যই বিহিত। তত্ত্ব-জ্ঞানের অনুদয়, শমদমাদি সদ্গুণসমষ্টির অভাব, ইত্যাদি কারণেই লোকে মিথ্যা কল্পিত পুষ্প ধূপাদি উপচার-যোগে কোন এক আকৃতি কল্পনা করিয়া দেবপূজা সমাধা করিয়া থাকে। নিজে নিজে সঙ্কল্প করে,—করিয়া পুষ্প ও ধূপাদি উপচার দ্বারা সাদরে অর্চ্চনাপূর্ব্বক অজ্ঞ বালকেরাই সন্তুষ্ট হয়।

বালকের ন্যায় অজ্ঞ লোকেরাই স্ব স্ব সঙ্কল্পানুরূপ অর্থ দ্বারা বৃথা দেবার্চ্চনা করে এবং স্বপ্নোপম অসত্য স্বর্গাদি ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

হে ব্রহ্মন্! পুষ্প কিম্বা ধূপাদি উপচার দ্বারা যে দেবপূজা করা হয়, সে পূজা বালকের বুদ্ধি-কল্পিত বলিয়াই নির্দ্দিষ্ট। কিন্তু ভবাদৃশ তত্ত্বজ্ঞানশালী ব্যক্তিদিগের যেরূপ পূজা যোগ্য, তাহা আমি বলিতেছি।

হে মতিমান্‌গণের বরেণ্য! সেই দেব অস্মদাদিরও আদিভূত। তিনিই ত্রিজগতের আধার পরমাত্মা। কি ব্রহ্মা, কি বিষ্ণু, কি রুদ্র, সমস্ত প্রধান প্রধান দেবতারও তিনি অতীত। তিনি নিখিল সঙ্কল্প-পরম্পরার সীমান্তর্গত ও সর্ব্ব সঙ্কল্পের আধারভূত। তিনিই শিবময় এবং সর্ব্বময়; অথচ তিনি অসর্ব্ব। তিনি দিক্ ও কালাদি দ্বারা অপরিচ্ছেদ্য, সর্ব্বারম্ভের প্রকাশকর্ত্তা, চিন্ময়-মূর্ত্তি ব্রহ্ম। সেই ব্রহ্মই সুনির্ম্মল দেব আখ্যায় অভিহিত। হে মুনে! উল্লিখিত সম্বিৎই নিখিল কলার অতীত, সমুদায় পদার্থ-পরম্পরার অন্তরে বিরাজিত, সমুদায়ের সত্তা-সম্পাদক এবং সমস্তের সন্তাপ-হর্ত্তা।

হে ব্রহ্মন্! ঐ দেব ব্রহ্মই ভাব ও অভাবের মধ্যবর্ত্তী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। ঐ ব্রহ্মদেবের এক নাম পরমাত্মা এবং অপর নাম 'ওঁ তৎসৎ' বলিয়া উদাহৃত। উনি মহাসত্তা-স্বভাবে সর্ব্বত্র সমতাপন্ন; উহাঁকেই মহাচিৎ নামে নিরূপিত করা হয় এবং উনিই পরমার্থ আখ্যায় পরিশ্রুত। যেমন লতাভ্যন্তরে রসাবস্থান, তেমনি সত্তাসামান্য বা মহাসত্তারূপে উনিই অর্থাৎ ঐ চিৎতত্ত্বই সর্ব্বত্র অনুস্যূতভাবে বিরাজমান।

হে নিষ্পাপ! তোমার, তোমার পত্নী অরুন্ধতীর, আমার, আমার পত্নী পার্ব্বতীর, আমার যে সকল পারিষদ প্রমথ আছে,—তাহাদের এবং এই নিখিল জগতের যে চিৎতত্ত্ব, প্রশস্ত ধীশক্তি-সম্পন্ন তত্ত্ববিদ্‌গণ সেই চিৎতত্ত্বকেই দেবনামে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। ইহা ভিন্ন কর-চরণাদি-সম্পন্ন অন্যান্য বিশেষ বিশেষ জীবকে যে দেবরূপে কল্পনা করা হয়, বলিতে পার কি, সে দেবে সম্বিৎ মাত্র ব্যতীত আর কি সার আছে? ঐ সম্বিৎ মাত্র বা চিৎতত্ত্বই এ সংসারের সার পদার্থ; উহাই সকলের সারাংশ। উহাকেই সর্ব্বময় দেব নামে নিরূপিত করা হয় এবং ঐ 'অহং'-স্বরূপ চিৎতত্ত্ব হইতেই সমুদায় সার সমধিগত হওয়া যায়।

হে ব্রহ্মন্! ঐ চিৎতত্ত্বকে দূরস্থ বা দুর্লভ বলা চলে না। উনি সর্ব্বদা দেহমধ্যেই বিদ্যমান। কেবল যে দেহমধ্যেই আছেন, আর কোথাও অবস্থিত নহেন, তাহা নহে। উনি সর্ব্বত্রই বিরাজ করেন। বলিতে কি, এই যে আকাশ, এখানেও উনি অবস্থিত রহিয়াছেন। ঐ চিৎতত্ত্বই নিখিল কার্য্য সম্পাদন করেন, সমস্ত ভক্ষণ করেন, পালন করেন, সর্ব্বত্র গমন করেন, নিশ্বাস পরিত্যাগ করেন। সেই চিৎতত্ত্বই সম্বেত্তা; তিনিই প্রতি অঙ্গ পরিজ্ঞাত আছেন।

হে মুনিশ্রেষ্ঠ! এই বিচিত্র দেহপুরী সেই চিৎতত্ত্বেরই স্বরূপে নিবদ্ধ হইয়া প্রকাশ পাইতেছে। এই পুরীর অভ্যন্তরে চিৎই বাস করিতেছেন। হৃদয়-গুহার মধ্যভাগে তিনিই গুহাধিপতি হইয়া বিরাজ করেন। ঐ গুহা দেহগৃহের মধ্যগত অন্নময়াদি বাহ্য কোষসমূহে সমন্বিত। সেই নির্ম্মল আত্মা মনোরূপ ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়েরও অতীত; কেবল শিষ্য-সম্প্রদায়কে উপদেশ দিবার জন্যই তাঁহার চিৎ আখ্যা প্রদান করা হয়। তিনি চিন্মূর্ত্তি, তিনি সূক্ষ্ম, তিনি সর্ব্বগ, তিনি নির্লেপ। এই ভাস্বর আভাস তিনিই করেন অথচ তিনি কিছুই করেন না। বসন্ত যেমন সরসভাবে তরুরাজিকে রঞ্জিত করে, তেমনি এই অতি নির্ম্মলা চিৎ জগৎসিদ্ধির নিমিত্ত এ জগতের কার্য্যকলাপ নির্ব্বাহ করিতেছেন। মায়াশবল চিতের অভ্যন্তরে যে সকল চারু চমৎকারিতা আছে, সেই সমস্তই যখন বিচিত্র-ভাবে বহির্গত হয়, তখন নানা বিচিত্র পদার্থ-পরম্পরা উৎপন্ন হইয়া থাকে। সেই সমুদায় উৎপন্ন পদার্থসমূহের মধ্যে কেহ আকাশ, কে জীব, কেহ চিৎ, কেহ কলা, কেহ চিত্ত, কেহ ক্রিয়া, কেহ দ্রব্য, এবং কেহ কেহ বা যোগ্যতানুসারে বৈচিত্র্যরূপে ভাব বা বিকার প্রভৃতি নামে নিরূপিত হইয়া থাকে। উহাদের মধ্যে কাহারও নাম প্রকাশ, কাহারও নাম শৈল, কাহারও নাম তমঃ, কাহারও নাম অর্ক, কাহারও নাম চন্দ্র, এবং কাহারও কাহারও নাম ইন্দ্রিয়। বসন্ত যেমন নিজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও স্বীয় স্বভাব নিবন্ধন তরু-লতা প্রভৃতির অঙ্কুর জন্মাইয়া থাকে, তেমনি চিদাত্মার কোন ইচ্ছা না থাকিলেও স্বভাবতই তিনি এই জগৎসমৃদ্ধি বিস্তার করিতেছেন। এই নিখিল ত্রৈলোক্যরূপ অর্ণবের যথাযথ স্বরূপ যদি নিরূপণ করিতে

যাওয়া যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে—একমাত্র চিদাকার জলই ইহার সর্ব্বত্র বিদ্যমান ; অন্য কিছুই কুত্রাপি নাই। ঐ চিৎস্বরূপিণী ঈশ্বরীই সঙ্কল্পরূপ মধুর আস্বাদ লইয়া থাকেন। দেহরূপ সঙ্কল্প-বনে ভ্রমণ-পরায়ণ চিত্ত-ভ্রমরই ঐ মধু সঞ্চয় করিয়া থাকে। কি সুর, কি অসুর, কি গন্ধর্ব্ব, কি শৈল, কি সাগর, এই সর্ব্ব-সম্পন্ন জগৎ জলাবর্ত্তে জলবৎ চিৎসত্তায় অবস্থিত রহিয়াই প্রবাহিত হইতেছে। এই ভ্রম-জনক সংসার-চক্র চিৎচক্রে পড়িয়াই ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। বন্ধনের হেতুভূত চিত্তময় আচার-ব্যবহারই ঐ সংসার-চক্রের সঞ্চলন। ইন্দ্রধনু ও বজ্রমণ্ডিত নীরদখণ্ড দ্বারা বর্ষাঋতু যেমন সৌরাতপ নাশ করে, তেমনি সেই চিৎই চতুর্ভুজ বিষ্ণু-স্বরূপ ধারণপূর্ব্বক সমগ্র অসুরমণ্ডলী নাশ করিয়া থাকেন।

হে ব্রহ্মন্! অধিক বলিব কি, ঐ চিৎই বৃষবাহন ত্রিনয়ন চন্দ্র-শেখর হইয়া গৌরীর মুখ-পঙ্কজের ভ্রমররূপে বিরাজ করেন। তিনিই ধ্যানাধীন-মনে বিষ্ণুর নাভি-নলিনাসনে ত্রয়ীরূপিণী কমলিনীর সরসী-সদৃশী ব্রাহ্মী স্থিতি অবলম্বন করিয়া থাকেন। ঐ চিৎই ইন্দ্ররূপে সুর-সমাজের রাজা হইয়া এই ত্রিলোকের চূড়ামণির ন্যায় অবস্থান করিতেছেন। ঐ চিৎই তেজোরূপে চন্দ্র ও সূর্য্য প্রভৃতি জ্যোতিষ্ক হইয়া সাগরসলিলের ন্যায় কদাচিৎ পতিত, কদাচিৎ উৎপতিত এবং কখন কখন বা আত্মাতে প্রলীন হইতেছেন। তিনিই চন্দ্রিকারূপে চারি দিক্ আলোকিত করিতে-ছেন এবং তিনিই নিখিল ভূতের সত্তারূপিণী কুমুদিনীকে প্রস্ফুটিত করিয়া তুলিতেছেন। নারী যেমন নিজোদরে গর্ভ ধারণ করে, তেমনি এই চিৎই দর্পণশ্রীরূপে এই প্রতিবিম্বিত জগৎ গ্রহণ করিতেছেন। জলের শক্তি যেমন জলরাশিরূপ সমুদ্র হইয়া তদীয় সত্তা সম্পাদন করে, তেমনি চিৎই চতুর্দ্দশ ভুবন-গত ভূতবৃন্দের অস্তিত্ব প্রতীত করাইয়া দেন। ঐ মহাচিৎ যেন একটী লতিকা; বিচিত্র তেজঃপুঞ্জ উহার কুসুমগুচ্ছ, সঙ্কল্প উহার ঘন পল্লব, ব্যোম উহার আলবাল এবং সত্তাসমূহ উহার ফল। ঐ চিৎই লতাকারে আরও কত বিচিত্র সদসদাত্মক দৃশ্য পুষ্প ধারণ করিয়াছেন। ঐ দৃশ্য কুসুমরাশি পরিমর্দ্দনে ম্লান হইয়া যায়; অর্থাৎ বিচারালোচনায় উহারা লয় প্রাপ্ত হয়। ঐ চিৎ-লতিকা জীব-

সমুদ্ররূপ রজঃপুঞ্জে পরিশোভিত ও বাসনারসে রঞ্জিত। সম্বেদন বা সবিকল্প জ্ঞান ঐ লতিকার ত্বগাবরণ এবং চিত্ত-চেষ্টারূপ কলিকাকুলে ঐ লতা পরিপূর্ণ। উহাতে কত অতীত অসংখ্য ত্রিজগৎরূপ কিঞ্জল্কজাল বিরাজিত রহিয়াছে। উহা নিরন্তর স্পন্দরূপ মহান্ বিলাসে উল্লসিত হইতেছে। সমুদায় ঋতু যেন পর্ব্বসমূহ; সেই সকল পর্ব্ব দ্বারা ঐ লতা কর্কশ-ভাবাপন্ন। যে কিছু জড়স্বভাব শৈলাদি পদার্থ আছে, তৎসমস্তই উহার মূলশিফা। ঐ লতার আপাদ মস্তক প্রবৃত্তির আবরণে আবৃত। চন্দ্র-সূর্য্যাদি প্রভার ন্যায় চারিদিকের চিত্র বিচিত্র দৃশ্য কুসুমসমূহকে ঐ চিৎ-লতিকাই বিকাশিত করিয়া তুলিতেছেন। ঐ মহাচিৎ হইতেই সর্ব্বত্র সমুদায় বস্তু উৎপাদিত হইতেছে, উৎপাদিত পদার্থ-পরম্পরার অভিমান সঞ্চারিত হইতেছে এবং সেই সকল পদার্থ বিখ্যাত হইতেছে। ঐ যে সূর্য্যাদি জ্যোতিষ্কপুঞ্জ নিত্য নিত্য ভাসমান হইতেছে, মহাচিতের সাহায্যই উহার মূল। ইহারই সাহায্যে দেহসকল স্পন্দিত হইতেছে, চিতে জড়-ভ্রম ও জড়ে চিদ্‌ভ্রম জন্মিতেছে। ঐ চিৎই আপনার সত্তায় সমগ্র জগৎকে দৃশ্যরূপে স্থাপনপূর্ব্বক তদ্‌ভিন্নতায় অবস্থান ও নর্ত্তন করিতেছেন। এই জগৎ-পরম্পরা যেন একটা ধূলিখেলা; ইহা ঐ আবর্ত্ত-রূপিণী চিতের সত্তায় দৃশ্য দেহ ধারণ করিয়া আপনাকে ঐ চিৎ হইতে স্বতন্ত্র ভাবিয়া নৃত্য-নিরত হইতেছে। দীপালোকচ্ছটা যেমন গৃহস্থ বস্তুর প্রকাশকারিণী, তেমনি এই ত্রৈলোক্য-দীপের শিখারূপিণী ঐ চিৎশক্তিই জাগতিক নিখিল কার্য্য-পরম্পরার প্রকাশবিধায়িনী। ঐ চিৎই জগদ্‌গত নিখিল পদার্থের আকার ধারণ করেন,—করিয়া চন্দ্রমণ্ডলস্থ কলঙ্কের ন্যায় সর্ব্বত্র লক্ষিত হইয়া থাকেন। এই যে পদার্থপুঞ্জ, ইহারা চিদাকার রসায়নের সেক-নিবন্ধনই বর্ষাবারি-পরিস্নাত ললিতাকৃতি লতার ন্যায় উপচিত হইয়া সাফল্য লাভ করে। গৃহের ভিতর যেমন অন্ধকার, তেমনি ঐ চিতের ছায়াতেই সর্ব্ব-পদার্থের জাড্যোদয়। যদি ঐ সকল চিৎ-চমৎকৃতি দেহমধ্যে সমুদিত না হইত, তাহা হইলে এই ত্রৈলোক্যের অন্তর্গত দেহসকল কখনই ঐ চিচ্ছায়াবিত ছায়াজাড্য পরিহার করিয়া সাকারভাব ধারণ করিতে পারিত না। এই দেহ-গৃহের অভ্যন্তর চিদাকাশের সহায়তায় প্রকাশমান।

এখানে ক্রিয়ারূপিণী চঞ্চলা কুলবধূ সতত সঙ্কল্পরূপ শিশুকে স্বীয় ক্রোড়ে স্থাপন করিয়া বিরাজ করিতেছে। দেখিয়াছ কি কোথাও ঐ চিদালোক ব্যতীত বস্তুরস,—কাহার রসনাগ্রে কিরূপে কখন স্ফুরিত হইয়া থাকে? ফল কথা এই যে, যদি চিৎ বা চৈতন্যের যোগ না ঘটে, তবে রসনার উপর স্থাপিত হইলেও কোন বস্তুরই স্বাদানুভব হয় না। এই দেহ যেন একটা তরু; ইহা কর-চরণাদি শাখা প্রশাখায় অন্বিত ও কেশপাশরূপ লতা-বিতানে বিজড়িত; এ দেহ-তরুর অন্তরে যদি চৈতন্যের যোগ না থাকে, তাহা হইলে ইহার কি কখন শোভার বিকাশ হইতে পারে? ফলতঃ একমাত্র চিৎই চরাচর জগতের আকার ধারণ করে,—করিয়া বর্দ্ধিত হয়,—লুণ্ঠিত হয়, ভোজন-পানাদি যাবতীয় ক্রিয়া সম্পাদন করে। সর্ব্বত্র একমাত্র চিৎই আছেন, আর কিছুই কুত্রাপি নাই। যে কিছু দৃষ্টিগোচর হয়, সমস্তই সেই একমাত্র চিৎ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র! ভগবান্ ত্রিনয়ন তৎকালে সুধাংশুর ন্যায় স্বচ্ছ বাক্যে আমাকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলে, আমি তাঁহাকে পুনরায় সুধাংশু-স্বচ্ছ বাক্য-বিন্যাসে জিজ্ঞাসা করিলাম,—হে দেব! বুঝিলাম, এই নিখিল জগৎ একমাত্র সেই সর্ব্ব-গামিনী চিৎ ব্যতীত আর কিছুই নহে; কিন্তু আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে এই চিদাত্মক দেহের যখন মরণ-মূর্চ্ছাদি উপস্থিত হয়, তখন ইহা নেত্র-বক্ত্রাদি-বিরহিত মৃণ্ময় ভিত্তিভূমির ন্যায় অচেতন অবস্থায় উপনীত হয় কেন? এ দেহ প্রথমে চিন্ময় হয়, পশ্চাৎ আবার অচিন্ময় হইয়া উঠে, এ কল্পনা কিরূপে হইতে পারে? এ কল্পনা প্রত্যক্ষানুভূত; অথচ চিতের বিনাশ বা পরিণাম নাই এবং তিনি জড়ও নহেন, এরূপ অবস্থায় ঐ কল্পনার সঙ্গতি হয় কিরূপে?

ঈশ্বর কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! হে ব্রহ্মবিদ্গণের বরেণ্য! তোমার এই প্রশ্ন অতীব উপাদেয়। শ্রবণ কর,—আমি তোমার জিজ্ঞাস্য বিষয় বর্ণন করিতেছি। এ দেহে যে সর্ব্বভূতময়ী চিৎ বিরাজ করিয়া থাকেন, তাঁহাকে দ্বিবিধরূপে কল্পনা করা হয়। তন্মধ্যে একপ্রকার চিৎ ব্যষ্টি-সমষ্টি-বুদ্ধিতে উন্মুখাত্মিকা অর্থাৎ বিজ্ঞানময় শব্দ-বাচ্য কর্ত্তৃ ও ভোক্তৃ-

স্বভাবা; অন্য প্রকার চিৎ বা কূটস্থ চেতন—নির্ব্বিকল্প। সুশীলা রমণী যেমন স্বপ্নাবস্থায় উপপতি কল্পনা করিয়া দুঃশীলা হইয়া উঠে, তেমনি ঐ শেষোক্ত চিৎ সঙ্কল্পযোগে আপনাকে জীবরূপে ভাবনা করিয়া অন্য প্রকার হইয়া উঠেন। যেমন শিষ্ট শান্ত ব্যক্তি ক্রোধে কলুষিত হইয়া উঠিলে কিঞ্চিৎ কালের মধ্যেই আর এক প্রকার হইয়া পড়ে, তেমনি এই চিৎও বিকল্প-কল্পনায় স্বস্বরূপের অন্যথাভাব উপগত হইয়া থাকেন।

হে ব্রহ্মন্! বিকল্প-কল্পিত চিৎ স্বীয় স্বরূপ হইতে পরিচ্যুত হইয়া ক্রমশ জাড্য ভাবনায় আপনার কল্পনা-বলেই সবিকল্পক বুদ্ধির বিষয় হইয়া উঠেন। এই চিৎ আপনা হইতেই আকাশময় পরমাণু-সম্বলিত শব্দ-স্পর্শাদি নিখিল ভোগ্যসমূহের বীজাত্মক চেত্যভাবে উপনীত হইয়া থাকেন। অনন্তর তিনিই সমষ্টি প্রাণভাব লাভ করেন। তৎপশ্চাৎ ঐ চিৎই পঞ্চীকৃত সূক্ষ্ম ভূতময় হইয়া ক্রমশ সপ্ত দ্বীপাদি বিবিধ দেশ ও নিমেষাদি কালস্বরূপে বহুধা বিভক্ত হইয়া উঠেন। এই সময় ঐ চিৎ প্রাণ ধারণ করিবার পর জীব হন,—হইয়া ক্রমশঃ বুদ্ধি ও মন হইয়া পড়েন। এই অবস্থায় 'আমি চণ্ডাল' এইরূপ মনন সহকারে ব্রাহ্মণ যেমন ব্রাহ্মণত্ব হইতে পরিচ্যুত হইয়া চণ্ডাল হইয়া উঠেন, তেমনি ঐ চিৎই মনোভাবাপন্ন হইয়া সংসারভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ঐ চিৎ অজ্ঞান-শবলিত রূপ ধারণ করেন,—করিয়া দেহ জীবাকারে সঙ্কল্পিত হইয়া উঠেন এবং তৎপ্রযুক্ত জড়তানিবন্ধন অসর্ব্বজ্ঞরূপে পুনঃপুন ভোগ-সঙ্কল্পের-কল্পনায় সংসারাবস্থায় পতিত হইয়া থাকেন। উল্লিখিত চিৎ অনন্ত সঙ্কল্পময়ী; তিনি জড়তার সঙ্কল্পে স্থূলভাব ধারণ করেন,—করিয়া, জাড্য নিবন্ধন জল যেমন পাষাণত্ব উপগত হয়, তেমনি জড়তাবশে মোহ-মগ্ন হইয়া থাকেন।

হে মুনে! ঐ সময় সেই চিৎকে চিত্ত, মন, মোহ ও মায়া প্রভৃতি নামে নিরূপিত করা হয়। উল্লিখিতরূপ জড়ভাব লাভ করিয়াই তিনি সংসারে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকেন। এই প্রকারে চিৎ যখন মোহগ্রস্ত হইয়া পড়েন, তখন তিনি তৃষ্ণা-নিগড়ে নিপীড়িত ও কাম-ক্রোধাদির ভয়ে ভীত চকিত হইয়া ভাব ও অভাবদশায় পতিত হইয়া থাকেন। তৎ-

কালে তাঁহার পরিচ্ছেদ ঘটনা হয়। তিনি দুঃখ দাব-দহনে দগ্ধীভূত ও শোকরূপ অনিষ্টাপাতে পরিক্লিষ্ট হইয়া 'আমি অমুক এইরূপ দুঃখ-মোহাদি স্বভাব হইয়াছি' এই প্রকার অলীক ভ্রমে ব্যাকুল হইয়া পড়েন। তদীয় চঞ্চল দেহবল্লরী ভাব ও অভাব-দোলায় চড়িয়া দোল খাইতে থাকে। জরাজীর্ণ বন্য হস্তিনী যেমন পঙ্কমগ্ন হইয়া আর উঠিতে পারে না, তিনিও তেমনি মোহপঙ্কে পড়িয়া আর উত্থিত হইতে সমর্থ হন না। এই অপার অসার সংসার-বিকারের মধ্যে পড়িয়া তাঁহাকে তখন সন্তাপে উত্তপ্ত-হৃদয় হইতে হয়। রাগ ও ক্রোধের আক্রমণে তৎকালে তিনি অভিভূত হইয়া পড়েন। যূথভ্রষ্ট হরিণের ন্যায় সে অবস্থায় তাঁহাকে বিবশ হইতে হয়। তৎকালে তিনি সম্পদের উদয়ে হৃষ্ট হইয়া উঠেন এবং তাহার অপচয় ঘটিলে দুঃখ ভোগ করিয়া থাকেন। অল্পবয়স্কা বালিকা নিজের সঙ্কল্প-কল্পনায় বেতালোদয় দর্শন করিয়া ভয়ে যেমন পলায়ন করিয়া থাকে, তেমনি সেই সংসারী চিৎ তখন স্বীয় সঙ্কল্প হেতু উপস্থিত সম্ভ্রম-দর্শনে ভয়ে ব্যাকুল হইয়া পড়েন। কণ্টক-লোলুপা উষ্ট্রী যেমন নিম্বাদি তিক্ত ফলগুলিকে মধুর জ্ঞানে সেই সেই বিষয়ের লালসা পোষণ করে, তেমনি তিনিও তখন তুচ্ছাদপি তুচ্ছ সংসার-সুখ বিষদিগ্ধ হইলেও তাহাই উত্তম জ্ঞানে আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকেন। এইরূপে অশেষ দোষজালে জড়িত হইয়া চিৎকে তখন অধঃপতিত হইতে হয়। তিনি বিষম সঙ্কটে পড়িয়া যৎপরোনাস্তি বৈষম্য অবলম্বন করিয়া থাকেন। তৎকালে তাঁহাকে এক দুঃখ হইতে দুঃখান্তরে এবং এক বিপদ হইতে অন্য বিপদে পতিত হইতে হয়। এইরূপে তিনি কত শত শত অনর্থ-পরম্পরায় যে জড়িত হইয়া পড়েন, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না।

এই প্রকারে চিৎ নিশ্চেষ্ট ও অস্বাধীন অবস্থায় পতিত হইয়া নরকাদি নানাস্থানে নীত হইয়া থাকেন এবং সেই সেই স্থানে দুর্ব্বিষহ দুঃখ ভোগ করেন। ক্রমশঃ ইনি মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়াও বাল্যকাল হইতে কেবল ব্যবহারকৌশল শিক্ষা করিয়া সুচতুর হইয়া উঠেন, আর অনবরত কেবল পুত্র, বিত্ত ও কলত্রাদি সংগ্রহের জন্য নানা কৌশল প্রদর্শন করিতে থাকেন; পরন্তু এই সকল যে নিজেরই বন্ধনের হেতুভূত, তাহা বুঝিয়া

বুঝেন না এবং মোক্ষোপযোগী বিবেকের পদ পাইবার জন্যও কিছুমাত্র প্রয়াস স্বীকার করেন না। কাজেই সে পদ প্রাপ্তি ইহাঁর পক্ষে একান্তই দুর্ল‍ভ হইয়া উঠে। ঐ চিৎ নানা দশায় নিপতিত হইয়া থাকেন; তদবস্থায় উঁহাকে সর্ব্বত্র শঙ্কিত হইতে হয়। ক্রমশঃ যখন উঁহার অন্তিমদশা আসিয়া দেখা দেয়, তখন উনি স্বল্প-সলিলচারী শফরীর ন্যায় ভূলুণ্ঠিত অবস্থায় ছট্‌-ফট করিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করেন। বাল্যাবস্থায় কোন কর্ম্ম করিবার ক্ষমতা থাকে না, যৌবনে চিন্তাকুল হইতে হয়, আর যখন বার্দ্ধক্য আইসে, তখন অতি দুঃখে কষ্টে মৃত্যুগ্রস্ত হইয়াও তিনি মুক্তি পাইতে পারেন না। ঐ সময় তাঁহাকে পূর্ব্বকৃত শুভাশুভ কর্ম্মের ফলভোগ করিতে হয়। পূর্ব্বকৃত কর্ম্মপাশে তিনি আকৃষ্ট হইয়া পড়েন। পূর্ব্বানুষ্ঠিত কর্ম্ম-পরম্পরার বৈচিত্র্যানুসারে তখন হইতে তিনি কখন স্বর্গে সুরনারী, কখন পাতাল-বাসিনী নাগ-রমণী, কখন দৈত্যগৃহে আসুরী, কখন ভূতলে মানবী, কখন রক্ষোগৃহে রাক্ষসী, কখন বনচারিণী বানরী, কখন গিরীন্দ্রশিখরে মৃগেন্দ্রবধূ, কখন কুলাচলে কিন্নরকামিনী, কখন সুমেরুশৈলে বিদ্যাধরী, কখন অরণ্য-কোটরে হিংস্র প্রাণী, কখন বৃক্ষের বল্লরী, কখন বৃক্ষকুলায়-স্থিতা বিহঙ্গী, কখন শৈলসানুবাহিনী লতাবল্লী এবং কখন কখন অরণ্যচারিণী মৃগী হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকেন।

ঐ চিৎ কখন কোন্ অবস্থায় থাকেন, তাহা নির্ণয় করা সহজ নহে। ফলে তিনি সকল ভাবেই বিরাজ করেন। তিনি নারায়ণ হইয়া সাগর-সলিলে শয়ন করিয়া থাকেন, ব্রহ্মভবনের কমলজন্মা ব্রহ্মা হইয়া ধ্যান ধারণায় তন্ময়ভাবে অবস্থান করেন এবং তিনিই কৈলাসশৈলে কান্তার অর্দ্ধাঙ্গসঙ্গী শঙ্কর হইয়া বাস করিয়া থাকেন। তিনি স্বর্গের সুররাজ ইন্দ্ররূপে বিরাজ করেন। তিনি সূর্য্য হইয়া দিবস-পরম্পরা রচনা করিয়া থাকেন। তিনি জলধর হইয়া জলবর্ষণ করেন। তিনিই পবনাকারে নিখিল বস্তু স্পন্দিত করিয়া থাকেন। কি সংসারচক্র, কি যুগ-পরম্পরা, কি মন্বন্তরসমূহ, তিনিই তৎসমস্ত হইয়া বহিয়া যাইতেছেন। তিনিই দিবস বিভাবরী-রূপে যথাক্রমে তেজ ও তিমিরভাব পরিগ্রহ করিয়া থাকেন।

সেই চিৎই কোথাও বৃক্ষাদির বীজ ও রসরূপে উল্লসিত, কোথাও

অটল অচল পাষাণাকারে অবস্থিত, কোথাও রসবাহিনী নদীরূপে প্রবাহিত এবং কোথাও কোথাও বা সুবিস্তৃত কুমুদকানন ও কুমুদকুসুম হইয়া সুশোভিত। তিনি কোন কোন প্রদেশে সুপক্ক ফলরাজি হইয়া বিরাজ করেন। কোথাও কাষ্ঠ কিম্বা বহ্নিরূপে বিভাত হইয়া থাকেন, কোথাও শৈত্যগুণে সুশীতল বারির আকার ধারণ করেন, কোথাও আকাশ হইয়া প্রকাশ পাইয়া থাকেন, কোথাও বা আবার তিনি কিছুই নহেন। কোথাও সেই চিৎ উজ্জ্বল আকার ধারণ করিয়া থাকেন। কোথাও তিনি কঠিনতর শিলার স্বরূপে বিরাজ করেন। কোথাও তিনি নীলাকারে বিভাত, কোথাও হরিতবর্ণে উল্লসিত, কোথাও অগ্নি হইয়া বিভাসিত এবং কোথাও বা মহীরূপে প্রতীত।

এই যে সকল জগৎবস্তু দেখা যায়, সকলই সেই চিৎ; তিনি সর্ব্বময়ী। তিনি না আছেন, এমন স্থান নাই; তিনি সর্ব্বব্যাপিনী। তাঁহাতে নিখিল শক্তিই নিহিত; তিনি সর্ব্বশক্তিময়ী। এই সকল কারণেই সেই চিৎ উল্লিখিত বহু বিবিধরূপে বিকাশমান। ফল কথা এই যে, তিনি স্বচ্ছ আকাশ অপেক্ষাও স্বচ্ছ এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ববর্ণিত বিবিধ প্রকার ভেদ হইতেও তিনি সম্পূর্ণ বিভিন্ন। জলে স্পন্দগুণ আছে, তাই সে যেমন তরঙ্গাকার ধারণ করে, তেমনি ঐ চিৎ যখন যেখানে যেরূপ ভাবে আপনাকে বিবর্ত্তিত করিয়া থাকেন, তখন তাহা সেইরূপেই উপলব্ধি করেন।

ঐ চিৎই হংসী, বকী, কাকী, ও বৃকী হইয়া থাকেন। তিনিই তুরগী, হরিণী, বলাকা, বানরী, কিন্নরী, কুক্কুরী, বর্টিকা, পিঙ্গলী, শালী, মক্ষিকা, ভ্রমরী ও শুকী হইয়া বিরাজ করেন। ধী, শ্রী, হ্রী, প্রীতি, রতি, মায়া, শর্ব্বরী, কিম্বা শশী, এ সকলও তিনিই। এইরূপে তিনিই নানা যোনিতে নানাকারে নানা নামে সর্ব্বদা পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন। যেমন জলের আবর্ত্তে তৃণ পড়িয়া ঘূর্ণমান হইতে থাকে, তেমনি ঐ চিৎই এ সংসারে অনবরত ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। গর্দ্দভ নিজে গভীর শব্দ করে, সেই শব্দে সে আপনি যেমন ভীত হইয়া পড়ে, তেমনি তিনি আপনিই সঙ্কল্প করেন,—করিয়া আপনিই ভীত হইয়া থাকেন। এই চিতের তুল্য অবলা চপলা মুগ্ধ-বালা অন্য আর কেহই নাই।

হে মহামুনে! এই আমি তোমার নিকট জীবশক্তির কথাই কহিলাম। এই শক্তি প্রাকৃত আচার-ব্যবহারে বিবশ হইয়া পশুধর্ম্মে পরিভূত হইয়া থাকেন। যেমন যেমন কর্ম্ম, সেই সেইরূপ স্বভাব ধারণ করিয়া ইনি পরমাত্মার শোচনীয় হইয়া পড়েন। যাহা বহু দুঃখপূর্ণ অনন্ত ভ্রান্তি, ঐ জীবশক্তি তাহাকেই আশ্রয় করিয়া থাকেন। ধান্য যেমন অচিরস্থির তুষাবরণ ধারণ করে, তেমনি এই চিৎও স্বাভাবিক নশ্বর মল পরিগ্রহ করিয়া থাকেন। এই চিৎশক্তিই অবিদ্যাকারে অনিয়ত অবস্থিত। ইনি জীবভাব উপগত হইয়া পতি-বিরহিতা রমণীর ন্যায় দৈন্য-দুর্ভাগ্য-নিপীড়িত ও সকল বিভব-বর্জ্জিত হইয়া শোক প্রকাশ করিতে থাকেন।

হে মুনীন্দ্র। জড়াকৃতি অবিদ্যার সামর্থ্য কত, তাহা তুমি একবার ভাবিয়া দেখ। বলিব কি, যিনি পূর্ণব্রহ্ম স্বভাব, সেই চিৎও এই অবিদ্যা-বলেই আপনার স্বরূপ ভুলিয়া গিয়া ঘটীযন্ত্রস্থ ঘটীর মধ্যগত আকাশবৎ কেবলই অধঃপতনের দিকে ধাবিত হইয়া থাকেন। আহা! ইহা কি পরিতাপের বিষয় নহে?

ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩০ ॥

একত্রিংশ সর্গ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে মুনে! লোকে স্বপ্নাবস্থায় 'আমি উন্মত্ত' এরূপ ভাবনায় মোহমগ্ন হইয়া যেমন দুঃখানুভব করে, ঐ চিৎও তেমনি 'আমি দুঃখযুক্ত' এইরূপ ভাবনায় বিভোর হইয়া অজ্ঞান-প্রভাবে উল্লিখিত অলীক জীব-জগদ্ভাব সঞ্চয় করিয়া থাকেন। যেমন কোন বিপর্য্যস্ত-মতি মুগ্ধ কামিনী না মরিয়াও মরিয়াছি বলিয়া কখন কখন রোদন করে, ঐ চিৎও তেমনি অনষ্ট হইলেও নষ্ট হইয়াছি ভাবিয়া দুঃখাভিভূত হইয়া থাকেন। যাহার বুদ্ধি বিপর্য্যয় ঘটে, সে যেমন কুলালচক্র ঘুরিতে থাকিলেও তাহাকে স্থির বলিয়া ধারণা করে, তেমনি ভ্রান্ত জন 'অহং' ভ্রান্তি বশতঃ এই জগৎ চৈতন্যে স্থির আছে বলিয়া

অনুভব করিয়া থাকে। ঐ চিৎ কর্ত্তৃক এই সংসার অনুভূত হয়। এই অনুভব-ব্যাপারের কারণ একমাত্র চিত্ত। কিন্তু এই কারণীভূত চিত্ত মিথ্যা। কেন মিথ্যা, তাহার কারণ এই যে, চিৎতত্ত্ব ভিন্ন অন্য পদার্থের সম্ভাবনা একেবারেই নাই। ফলে, চিৎ ব্যতীত অন্য কিছুরই অস্তিত্ব অসম্ভব। কাজেই যখন কারণেরই অভাব, তখন এই চেত্য জগতেরও যে সম্পূর্ণই অভাব, সে পক্ষে সন্দেহ আছে কি? যে চিৎ যত্নের সহিত চিত্তকে চেত্য করিয়া তুলেন, সেই চিৎকেও চিত্ত বা চিত্তাধীন বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না। ঐ চিৎ পরম বিশুদ্ধ বলিয়াই বর্ণিত। পাষাণে যেমন তৈল নাই, তেমনি উল্লিখিত চিতে দ্রষ্টা, দৃশ্য বা দর্শন, এ সকলেরও কিছুই নাই। চন্দ্রে কৃষ্ণবর্ণতার অভাবের ন্যায় ঐ চিতে কর্ত্তা, কর্ম্ম বা করণ এ সমুদায়েরও কিছুই নাই। আকাশে যেমন অভিনব অঙ্কুরোদ্গম অসম্ভব, তেমনি চিতে প্রমাতা, প্রমেয়, প্রমাণ, এ সকলেরও সম্ভাবনা নাই। নন্দনবনে খদিরবৃক্ষের অভাবের ন্যায় ঐ চিতে চিত্ত, চেতন বা চেত্য বিষয় প্রভৃতির সদ্ভাব কিছুই নাই। কি তুমিত্ব, কি আমিত্ব, কি অন্য পরোক্ষ বস্তুতত্ত্ব, আকাশে পর্ব্বতের অভাববৎ ঐ চিতে কিছুরই অস্তিত্ব নাই। কজ্জলে যেমন শুভ্রতা নাই, তেমনি ঐ চিতে কি নিজ দেহত্ব, কি পরদেহত্ব, কিছুরই সদ্ভাব নাই; পরমাণুমধ্যে সুমেরুগিরির অন্তর্ভাব যেমন একান্তই অসম্ভব, তেমনি ঐ চিতে নানাত্ব বা অনানাত্ব নাস্তি বলিয়াই প্রতিপন্ন। বিষম ঊষর ভূমিতে যেমন লতার অস্তিত্ব নাই, তেমনি ঐ চিতে নাম বা রূপসম্বন্ধ কিছুমাত্রই নাই। যেমন সৌর মণ্ডলে রাত্রি নাই, তেমনই ঐ চিতে 'নাস্তি' 'নাস্তি' রূপে সকল প্রকার দৃশ্য বস্তুর নিষেধও বিদ্যমান নাই। তুষারে উষ্ণতার অভাবের ন্যায় ঐ চিতে বস্তুত্ব বা অবস্তুত্ব কিছুরই অস্তিত্ব নাই। যেমন পাষাণোদরে বৃক্ষোৎপত্তি নাই, তেমনি চিতে শূন্য বা অশূন্যভাব কিছুই বিদ্যমান নাই। মহতী শূন্যতা বা অশূন্যতা যেমন আকাশে কেবল স্বচ্ছভাবেই পর্য্যবসিত, ঐ চিতে শূন্যতা বা অশূন্যতাও তেমনি কেবল নির্ম্মলভাবেই পরিণত; বস্তুতঃ উহার কিছুই উহাতে নাই। চিতে বা ব্রহ্মচৈতন্যে সমষ্টিচিত্তরূপ দোষবশতঃ চতুর্ব্বিধ দেহ জন্মিয়াছে এবং সেই

জন্মই সংসার-দুঃখ অনিবার্য্য হইয়া উঠিয়াছে, এরূপ মনে করা অবশ্য উচিত নহে; কেন না, উহাকে সত্য বলিয়া ভাবনা করিলেই অনর্থ উৎপাদন করে। নতুবা সেরূপ ঘটে না। অর্থাৎ এই সংসাররূপ অনর্থ ঐ চিত্ত-প্রবর্ত্তিত দেহেন্দ্রিয়াদি-বিষয়ক অহম্ভাবনাবলেই আবির্ভূত হয়। ঐ ভাবনার স্রোত যখন নিবৃত্তি পায়, তখন ঐ অনর্থ উপশম প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তখন আর উহার কিছুই থাকে না। যিনি তত্ত্ববিদ্, ভাবনা থাকিতে তাঁহারও ইহা দুরপনেয় হয়। তদীয় অহম্ভাবনার নিবৃত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত উহা তাঁহার স্থিরই হইয়া রহে। তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি এ সংসারকে তৃণের ন্যায় তুচ্ছ বোধে অনায়াসে বিদূরিত করিতে পারেন বটে, তাঁহার নিকট ঐ কার্য্য সহজসাধ্য হইয়া দাঁড়ায় সত্য; কিন্তু অহম্ভাবনার স্রোত বহিতে থাকিলে উহা একান্তই অসাধ্য। এক্ষণে কথা এই যে, ঐ ভাবনার নিবৃত্তি যে আপনা হইতেই ঘটিবে, তাহা কখনই সম্ভাব্য নহে; ভাবনাকে বিদূরিত করিতে হইলে পুরুষকার প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন হয়। নতুবা ঐ কার্য্য কখনই ঘটিতে পারে না। যখন ভাবনাকে বিদূরিত করিয়া এই সংসাররূপ অনর্থ নিরস্ত করিতে পারা যায়, তখন সেই সর্ব্বব্যাপিনী চিৎ-শক্তি অদ্বয় নির্ব্বিকল্পরূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকেন। ঐ নিত্য-নির্ম্মলা চিৎই নিখিল তেজঃপদার্থের প্রকাশকারিণী। তাঁহা হইতেই সর্ব্ব বস্তুর বিকাশ হইয়া থাকে। তিনি নিত্যোদিত, নির্ম্মনস্ক ও নিরঞ্জন। তাঁহাতে কোনও প্রকার বিকার সম্ভাবনা নাই। কি ঘট, কি পট, কি গর্ত্ত, কি কুড্য, কি শকট, কি সুর, কি অসুর, কি বানর, কি নর, কি নাগ, কি খর, কি সাগর, সর্ব্বত্র সর্ব্বস্থানেই ঐ চিৎ নিত্য বিদ্যমান। ঐ চিৎ সর্ব্বত্র সাক্ষীর ন্যায় বিরাজ করেন। তাঁহার স্পন্দন কোথাও নাই। দীপের যেমন সর্ব্ব দ্রব্যকে প্রকাশিত করা ব্যতীত অন্য কোনই কার্য্য নাই, ঐ চিতের তেমনি প্রকাশ-কারিত্ব ভিন্ন ক্রিয়ান্তর কিছুই নাই। চিৎ এই রূপই স্বভাব-সম্পন্ন বটেন; কিন্তু তাহা হইলেও পূর্ব্বোল্লিখিত দেহাদি ভাবে তিনি মালিন্যময়ী হইয়া পরে বিকল্পময়ী হইয়া উঠেন। তৎকালে তিনি অজড় হইলেও জড়, এবং সর্ব্বময়ী হইলেও অসর্ব্ব হইয়া পড়েন। যাঁহাতে বিকল্প নাই, যাহা অতীব সূক্ষ্ম, এবম্বিধ অবস্থায় অবস্থিত হইয়াই

তিনি প্রাণময় লিঙ্গদেহে প্রতিবিম্বিত হন,—হইয়া সূক্ষ্ম কৌশের তন্তুর গুটি-ভাবে পরিণতির ন্যায় আপনার সম্বিৎকেই আপনি কর-চরণাদিরূপে প্রকাশ করিতে থাকেন। স্বপ্নদশায় পুরুষের বাসনাময় চৈতন্য বাহিরে অবোধাকারে এবং অন্তরে বোধাকারে বিরাজিত হয়; এই জন্য উহা যেমন সৎ ও অসৎ এই উভয়াকারেই প্রতিভাত হইতে থাকে, তেমনি ঐ চিৎ জাগ্রদবস্থায় পুরুষের বাহিরে রূপাদির আকারে এবং অন্তরে মনের আকারে বিভাত হইয়া জ্ঞান ও অজ্ঞান এই উভয়স্বরূপেই প্রথিত হইয়া থাকেন। দুর্জ্জনের সংসর্গ করিতে করিতে সাধুজনও যেমন অসাধু মধ্যে পরিগণিত হয়, তেমনি ঐ চিৎ স্বভাবতঃ নির্ম্মলা হইলেও দেহাদির আকারে চেতিত হন,—হইয়া তাহারই অনুরূপ চিন্তায় আক্রান্ত হইয়া থাকেন। সুবর্ণ মলাক্ত হইয়া তাম্রভাব ধারণ করে, আর যখন সেই মল পরিষ্কার করিয়া ফেলা হয়, তখন যেমন আবার তাহা সুবর্ণাকারেই পরিণতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে; এই চিত্তের অবস্থাও সেইরূপই পরিজ্ঞাত হইবে। দর্পণের মল মাজিয়া ঘসিয়া পরিষ্কার করিলে ঐ দর্পণ যেমন পদার্থসমূহের প্রতিবিম্ব-গ্রহণার্হ স্বচ্ছ ভাব ধারণ করে, ঐ চিৎও তেমনি অজ্ঞানবশে জড় জীবভাব লাভ করিয়া তত্ত্ববোধ নিবন্ধন নিজ কৈবল্য পদ পুনরায় প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। চিৎ যখন অজ্ঞান অনুভব করেন, তখনই এই সংসার আসিয়া উপস্থিত হয়। এই চিৎস্বরূপ বিদিত হইতে পারিলে, এ সংসার অসৎ হইয়া পড়ে; কোথায় যে পলাইয়া যায়, তাহার আর সন্ধান থাকে না। এই চিৎ যখন চিদ্ভাব ব্যতীত অসৎ অহম্ভাব আশ্রয় করেন, তখন তাঁহার অবিনশ্বরতা ও নিত্যতা সুসিদ্ধ হইলেও তিনি যেন বিনাশ প্রাপ্ত হন বলিয়াই প্রতীত হয়। যাহাতে বৃন্ত হইতে বিশ্লেষ ঘটাইয়া দেয়, এ হেন অল্পমাত্র স্পন্দনেই যেমন বৃক্ষের ফল উচ্চ গিরিতট হইতে অধঃপতিত হয়, সূক্ষ্ম চিৎপদার্থ হইতে এই যে বিশাল জীবভাব, ইহাও তেমনই জানিতে হইবে। ফল কথা, এই যে বাহ্য রূপ-রসাদির সত্তা, ইহা একমাত্র ঐ চিৎ বৈ আর কিছুই নহে। অধ্যস্ত ভেদাভেদ অজ্ঞান হইতেই উৎপন্ন। জ্ঞানবলেই ইহা লয় প্রাপ্ত হয়। চিত্ত বা ইন্দ্রিয়াদিতে চিত্ত-সাক্ষীর যে বোধবিকাশ, তাহা ঐ চিতের সত্তামাত্রেই সম্পন্ন।

হইয়া থাকে এবং উহার যে কার্য্য বা ব্যবহারাদি, তৎসমস্তও ঐ চিতের আলোক সত্তা হইতেই নিষ্পন্ন হয়। চিতের সন্নিধানক্রমেই ব্যানবায়ু বিচালিত হইয়া উঠে। সেই বায়ু হইতে নয়নতারার স্পন্দন হয়। সেই স্পন্দ-গত দীপ্তিই তৈজস বা চক্ষুরিন্দ্রিয় আখ্যায় অভিহিত। ঐ চক্ষুরিন্দ্রিয় দ্বারা যে নীল পীতাদি রূপের বোধ হয়, সেই বোধও সেই পরমাচিৎ ব্যতীত আর কিছুই নহে। ত্বক্ এবং বায়ু, ইহারা উভয়েই জড় বা তুচ্ছস্বভাব, অর্থাৎ উহাদের স্বাধীন সত্তা নাই,—উহারা স্বতঃ স্ফূর্ত্তি-বিরহিত। সুতরাং ঐ উভয়ের সংযোগরূপ যে স্পর্শ, তাহাও উল্লিখিত চিৎসত্তা হইতেই সমুৎপন্ন। চিত্তের সত্তাতেই ঐ উভয় সত্তা সম্পন্ন হয়,— হইয়া স্পর্শেন্দ্রিয় নাম প্রাপ্ত হইয়া থাকে। গন্ধ-তন্মাত্রের সহিত ঘ্রাণ-পবনের যে সম্বন্ধ,—যাহা গন্ধজ্ঞান নামে নিরূপিত, সেই জ্ঞানও গন্ধাকারিত চিত্ত-বৃত্তির নিমিত্ত বলিয়া গন্ধসম্বিৎ নামে নির্দ্দিষ্ট। ঐ জ্ঞান যখন অন্তঃকরণ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, জানিবে—তখন উহাই পরমাচিৎ বলিয়া প্রথিত হইয়া থাকে। এইরূপে শব্দতন্মাত্রের সহিত বায়ুর যে স্পর্শ, তাহাই শব্দসম্বিৎ নামে নিরূপিত। ঐ সম্বিৎ অন্তঃকরণবৃত্তি-বিরহে সুষুপ্তিবৎ হয়,—হইয়া পরমাচিৎ নামে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। কর্ম্মেন্দ্রিয়ের প্রবৃত্তি-জনিত যে সঙ্কল্প—যাহা চিত্তের কালুষ্য মননাখ্যায় কথিত, ঐ মনোবৃত্তির সাক্ষী সম্বিৎই নির্ম্মল আত্মচৈতন্য বলিয়া বিদিত। ঐ প্রকাশাত্মক নিত্য চিৎ আপনাতে অবস্থান-পূর্ব্বক নিজের অন্তরে এই জগদ্ভাব ধারণ করেন। চিতের এই জগদ্ভাব-ধারণ—স্ফটিকোপলের আপনাতে কাননাদি প্রতিবিম্ব-ধারণেরই অনুরূপ। চিৎশক্তি অদ্বিতীয়; তিনি এই সকল জগদ্ভাবে নির্ব্বিকারভাব ধারণ করিলেও কদাপি অস্তমিত হন না,—উদিত হন না,—স্পন্দিত হন না—বা উপচিত হন না। ঐ চিৎ সঙ্কল্প প্রভাবে জীবভাব ধারণ করেন—করিলেও সম্পূর্ণ সঙ্কল্পাভাবে আপনাতে থাকিয়া এই জড় জগৎকে অজড় ও বাস্তবা-কারে ভাবিতে ভাবিতে স্বস্বরূপেই অবস্থান করিয়া থাকেন। এই চিতের রথ জীব; জীবের অহঙ্কার, অহঙ্কারের বুদ্ধি, বুদ্ধির মন, মনের প্রাণ, প্রাণের ইন্দ্রিয়গণ, ইন্দ্রিয়বর্গের দেহ এবং দেহের কর্ম্মেন্দ্রিয়সমূহ; উল্লিখিত

রথসমূহের কার্য্য হইল স্পন্দন। এ দেহ—জরামরণময়; এই দেহপিঞ্জরের মধ্যগত জীববিহঙ্গমের যে দোলাচক্র, তাহা মূলকারণ ঈশ্বরের মায়িক ঐশ্বর্য্য হইতেই সমুৎপন্ন। কেন না, এই যে সকল প্রপঞ্চ পরিদৃশ্যমান হয়, এতৎসমস্তই প্রতিভাসক্রমে আত্মায় অসৎ স্বপ্নবৎ প্রথিত। ইহাতে একটুকু মাত্র সত্যতার সম্পর্ক খুঁজিয়া পাওয়া যায় না; মৃগতৃষ্ণায় জলের ন্যায় ইহা একান্তই অলীক।

হে মুনিপ্রবর! পূর্ব্বে যে রথপরম্পরার বিষয় বলা হইয়াছে, তন্মধ্যে প্রাণ-রথ নামে এক রথের নির্দ্দেশ আছে। বুধগণের মতে ঐ রথ কল্পনার রথ বলিয়াও নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। কেন না, যেখানে প্রাণ-বায়ু প্রবাহিত হয়, সেখানে মানস-কল্পনারও অধিষ্ঠান দেখা যায়। আবার যেখানে আলোকশ্রী রহিয়াছে, রূপও সেই স্থানে অবস্থিত আছে। বলবান্ প্রাণ যেখানে বিরাজিত, সেই স্থানই পরিস্পন্দিত বা বিচলিত হইতে থাকে। দৃষ্টান্ত দেখ, যে অরণ্যে বায়ু বহিয়া যায়, সেই অরণ্যই ঘূর্ণিত হয় কিম্বা কম্পিত হইতে থাকে। মন যখন আকাশে প্রলীন হয়, তখন প্রাণবায়ুর স্পন্দনরোধ ঘটে; সে আর স্পন্দিত হয় না। যেমন তেজের অবিদ্যমানতায় রূপেরও অবিদ্যমানতা, তেমনি প্রাণপবনের প্রশমন-ঘটনায় অন্তরে মনেরও সম্পূর্ণ অস্তিত্বাভাব। দৃষ্টান্ত দেখ, বাত্যা যদি থামিয়া যায়, তাহা হইলে আর ধূলি উড্ডীন হইবার সম্ভাবনা নাই। ফলে, যেখানে প্রাণবায়ু থাকিবে, মনও তথায় অবস্থান করিবে, সন্দেহ নাই। বস্তুতঃ রথের গতি যে যে স্থানে হয়, সারথিকেও সেই সেই স্থানে যাইতে হয়। ক্ষেপণোন্মুক্ত পাষাণ যেমন দ্রুত অন্যত্র গমন করে, তেমনি চিত্তও প্রাণপবন দ্বারা পরিচালিত হইয়া ক্ষণ মধ্যেই দেশান্তরে প্রয়াণ করিতে পারে। নতুবা প্রাণপবনের নিরোধঘটনায় মনও ক্ষয় পাইয়া যায়। দেখ, যথায় পুষ্প আছে, সেইখানেই গন্ধ আছে; যেখানে অগ্নি আছে, সেইখানেই উষ্ণতা রহিয়াছে; যেখানে চন্দ্র আছে, সেইখানেই তাহার কিরণকান্তি বিরাজ করিতেছে। এইরূপ যেখানে প্রাণপবন আছে, সেইখানেই মন বিদ্যমান রহিয়াছে। চাক্ষুষাদি জ্ঞান হইবার কারণ পবনস্পন্দন। এই পবনই সর্ব্বাঙ্গে অন্নরস প্রবেশ করাইবার

নিম্নিত নাড়ীনিচয় স্পর্শ করে। চিৎ—চিত্ত-মনো-ঘটিত লিঙ্গদেহাত্মক প্রাণ-কোটরে বিম্ব-প্রতিবিম্বরূপে দ্বিগুণিত হয়। তাহাতে তাহার যে একটা স্ফার বা পিতত ভাব হইয়া উঠে, তাহা প্রাণপবনের কার্য্য ব্যতীত কোনক্রমেই হইবার নহে। ঐ আকাশবৎ স্বচ্ছ সম্বিৎ জড়াজড় নিখিল পদার্থেই বিরাজমান। উহা যখন প্রাণপবনের স্পন্দনবশে স্পষ্টতই প্রকট হইয়া চলিতে থাকে, তখনই উহাকে অনুভব করা যায়। ঐ চিৎ জড়পদার্থেও সত্তামাত্ররূপে অবস্থিত। উনি যখন জড়দেহে প্রাণ-পবনে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠেন, তখন অধ্যস্ত চিতের সহিত অভিন্নভাবে বিষয়ানুভব করিতে থাকেন। প্রাণের বিদ্যমানতায় যে দেহ বিবিধ উল্লাসে উল্লসিত হইতে থাকে, প্রাণবায়ুর যখন অভাব হয়, তখন আবার সেই দেহই নির্ম্মনন ও নিশ্চল হইয়া পড়ে।

হে মুনিবর! যিনি পরম চিৎ, তিনি আপনার পুর্য্যষ্টকেই প্রতিবিম্বিত হন। দেখ, প্রতিবিম্ব স্বচ্ছ দর্পণেই দৃষ্টিগোচর হয়; পরন্তু পাষাণাদি অন্য কোন পদার্থেই তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না। যে পুর্য্যষ্টকের উল্লেখ করিয়া আসিলাম, জানিও,—যাহা সমুদায় কার্য্যের একমাত্র কারণ, সেই মনই ঐ পুর্য্যষ্টক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। তবে বিভিন্ন সম্প্রদায়-গত আচার্য্যগণ স্বস্ব শিষ্য-পরম্পরাকে উপদেশ দিবার জন্য স্ব স্ব কল্পনানুসারে ঐ পুর্য্যষ্টককে আরও নানাবিধরূপে কল্পনা করিয়াছেন।

হে ঋষে! এই যে কিছু সঙ্কল্পময় দৃশ্যজাল আছে, এতৎসমস্ত যাহা হইতে উৎপন্ন ও যাহাতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া অনুভূতিগোচর হয় এবং মনই যাহা হইতে দেহাকারে ভ্রমিত হইতে থাকে,—এই যে বিশ্ব দেখিতেছ, ইহাকেই তুমি সেই পরম পদার্থ বলিয়া পরিজ্ঞাত হও।

একত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩১ ॥

দ্বাত্রিংশ সর্গ।

ঈশ্বর কহিলেন,—মুনিবর! ঐ পরমা চিৎ পুর্য্যষ্টকে প্রতিবিম্বিত হইয়া কিরূপ প্রণালী অনুসারে ঐহিক এবং পারলৌকিক কার্য্যকলাপ নির্ব্বাহ করে এবং কি প্রকারেই বা স্পন্দন-সম্পন্ন হইয়া বিবিধ সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হইয়া থাকে, তাহা আমি বর্ণন করিতেছি,—শ্রবণ কর। ঐ চিতের একটা শক্তি আছে, সে শক্তির আশ্রয় স্থান ব্রহ্ম। ঐ শক্তি আপনার আবরণ শক্তির সহায়তায় ব্রহ্মকে যেন নাস্তিরূপে প্রতীত করাইয়া দেয় এবং পূর্ব্বসঞ্চিত বহু বিবিধ কামনা, বাসনাময়ী মানসী চেষ্টা ও বৈধ নিষিদ্ধ কায়িক বাচিক কর্ম্ম-পরম্পরায় মনোভাবে পরিণতি প্রাপ্ত হইয়া চিৎসত্তা হইতে নিঃসৃত হইলেও জড়ের ন্যায় বিরাজ করিতে থাকে। এইরূপে ঐ ব্রহ্মশক্তি ব্যবহারদশায় উপনীত হন,—হইয়া জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়রূপে দ্রষ্টা, দৃশ্য ও দর্শনাদি নানাকারে বিকাশ পাইতে থাকেন। এই পরমা চিৎ আপনার মায়াশক্তির প্রভাবেই কলঙ্কিত হন, —হইয়া এই জগদাকার গন্ধর্ব্বনগর নির্ম্মাণ করেন। অথচ তিনি যে কিছু করেন, এরূপ বলা যায় না। চিত্ত ও বুদ্ধি প্রভৃতির অবিদ্যমানতায় এই জড় দেহ কাষ্ঠ কিম্বা কুড্যাদির ন্যায় নিশ্চেষ্টভাবে অবস্থিত হয় এবং উহাদের যখন অস্তিত্ব থাকে, তখন উহা আকাশোৎক্ষিপ্ত শিলাখণ্ডবৎ স্ফুরিত হইতে থাকে। দেখ, লৌহবস্তু অতি জড়, উহা অয়স্কান্ত মণির সন্নিকর্ষে চেতনবৎ চালিত হয়। এইরূপে দেখা যায়, জীবও সর্ব্বগত পরব্রহ্মের সান্নিধ্যবশেই স্পন্দমান হইয়া থাকে। এই জীবনিবহের স্ফুর্ত্তিলাভ—চিৎশক্তিবলেই ঘটে। বিশদার্থ এই যে, জীব চিতেরই প্রতিবিম্ব-স্বরূপ। বলিতে পার, দ্রব্যে দ্রব্যেরই প্রতিবিম্ব-নিয়ম দেখা যায়, জীব ভৌতিক দ্রব্যস্বভাব; ইহা অদ্রব্যস্বভাব চিৎস্বরূপের প্রতিবিম্ব হইবে কিরূপে? এ কথার উত্তরে বক্তব্য এই যে, মুকুরে যে কেবল দ্রব্যেরই প্রতিবিম্বগ্রহ হয়, এমন কথা নহে; ইহাতে দ্রব্যস্বভাবে অনবস্থিত গুণ, ক্রিয়া ও জাতি প্রভৃতিরও প্রতিবিম্ব পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। উল্লিখিত জীবসম্বন্ধে এইরূপ প্রতিবিম্বগ্রহণের নিয়মই

জানিতে হইবে। যেমন কোন সৎ ব্রাহ্মণ মোহের বশে স্বীয় স্বরূপ ভুলিয়া গিয়া শূদ্রভাব প্রাপ্ত হয়, তেমনি এই জীব ব্রহ্মপ্রতিবিম্ব হইলেও আপন স্বরূপের বিস্মরণে জড় ভাবাপন্ন হইয়া থাকে। ঐ চিৎ যখন আপনার স্বরূপ ভুলিয়া যান; তখনই তিনি চিত্তভাবে আপতিত হইয়া থাকেন। ফলে, এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে যে, মোহের বশে মহৎ লোকেও বিকল্পদশায় বিবশ ও দীন-ভাবাপন্ন হইয়া যান। তরলতরঙ্গ-তাড়নায় জল যেমন সঞ্চালিত হয়, এই চিৎও তেমনি প্রাণ-সমান হইয়া এ দেহকে স্পন্দিত করিয়া থাকেন। প্রবল বায়ুবেগে শিলাখণ্ড যেমন চালিত হয়, তেমনি উপাধি-পরবশ জীব উল্লিখিতরূপ ক্রিয়াস্বভাব প্রাপ্ত ও মননশক্তি-সম্পন্ন হইয়া এই দেহযন্ত্র সকল পরিচালিত করিয়া থাকেন।

হে ব্রহ্মন্! এই শরীর যেন একটা শকট; ইহাকে চালিত করিবার নিমিত্ত পরমাত্মা—মন ও প্রাণ এই দুই সুদৃঢ় বাহন সৃজন করিয়াছেন। ঐ চিৎ জড়স্বরূপ স্বীকার করিয়া জীবভাব লাভ করে,—করিয়া জীবস্বরূপ প্রাপ্তির পর প্রাণরূপ তুরঙ্গ-যোজিত মনোরথে আরোহণপূর্ব্বক বাস্তবপক্ষে যদিচ নিজের স্বরূপ পরিহার করেন না, তথাচ সেই অবস্থায় কোথাও জাত বস্তু, কোথাও নষ্ট বস্তু, কোথাও বহু বস্তু এবং কোথায়ও বা স্বতন্ত্র একই বস্তু হইয়া প্রতিভাত হইয়া থাকেন। যেমন জল হইতে তরঙ্গস্বভাব অভিন্ন, তেমনি এই চিৎও জগৎ হইতে অপৃথক্। এই জীবজগৎ মনোবৃত্তিতে প্রতিভাসিত আত্মচৈতন্যের আশ্রয় লইয়াই স্ফুরিত হয়। এই দৃশ্য বস্তুব্যাপিনী রূপসম্পত্তি কেবল মাত্র আলোকের আশ্রয় লইয়াই প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। কেন না, আলোকের অভাবে কদাচ রূপপ্রকাশ সম্ভব নহে। যেমন দীপের সত্তায় গৃহভূমি আলোকিত হইয়া উঠে, তেমনি নিরাময় আত্মচৈতন্যের সত্তা মাত্রেই জীব জীবিত হইয়া থাকে। যেমন একই জল হইতে তরঙ্গ ও তরঙ্গ হইতে ফেনপুঞ্জ প্রাদুর্ভূত হয়, তেমনি সংসারের যত কিছু আধিব্যাধিময় দুঃখরাশি, তৎসমস্তই একমাত্র জীব হইতে সমুৎপন্ন হয়,—হইয়া বিস্তৃত বা পল্লবিত হইয়া থাকে। যেমন বায়ু-বিতাড়িত তরঙ্গভঙ্গী-প্রাপ্ত জল জর্জ্জরিত হইয়া যায়, তেমনি এই দেহ-

পদ্মের মধুকর-স্বরূপ জীব আধিব্যাধিবশে দৈন্যদুঃখে বিশীর্ণ হইয়া থাকে। আদিত্য যেমন মেঘমণ্ডল প্রকাশ করেন,—করিয়া নিজেই তাহাতে আবৃত হইয়া থাকেন, তেমনি চিৎশক্তি সর্ব্বশক্তির অধিষ্ঠান হইয়াও 'আমি তো চিৎ নহি' এবম্বিধ ভাবনায় বিভোর হইয়া এ দেহাভ্যন্তরে বিবশভাবে অবস্থান করেন। তীব্র মদিরারস পান করিয়া মত্ত ব্যক্তি যেমন তৎকালে নিজের অঙ্গ কর্ত্তিত হইলেও মোহবশে তাহার জ্বালা অনুভব করিতে পারে না, তেমনি চিৎও উল্লিখিত প্রকার বিবশভাব উপগত হইয়া মোহক্রমে আত্মসম্বিদের অনুভবে সক্ষম নহেন। মদিরোন্মত্ত মানবের মত্ততা অপগত হইলে পর আপনার মত্তাবস্থায় কি কার্য্য করা হইয়াছে না হইয়াছে, তাহা যেমন সে স্মরণ করিয়া রাখিতে পারে, তেমনি ঐ চিৎ যখন আপন মোহ হইতে মুক্ত হন, তখন তিনি স্বীয় চিৎস্বরূপতার অনুভব করিতে সক্ষম হইয়া থাকেন। ফলে, মোহের ঘোর নিরস্ত হইয়া গেলেই অবাধে তিনি আপন স্বরূপ অনুভব করিতে পারেন। কুষ্ঠরোগী ব্যক্তির গলিত অঙ্গুলিপ্রভৃতির স্পন্দনপ্রবৃত্তি যেমন থাকে না, তেমনি জীবের চৈতন্য বিলুপ্ত হইয়া গেলে তখন আর প্রাণপবনের স্পন্দশক্তি কর-চরণাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহের অনুসরণ কিছুতেই করে না। বিশদ কথা এই যে, কুষ্ঠরোগী ব্যক্তির কর-চরণাদি যেমন অল্পে অল্পে গলিত হইয়া যায়, তেমনি জীবের চৈতন্য যখন শনৈঃ শনৈ অপহৃত হইতে থাকে, তখন তাহার হস্ত-পদাদি নিস্পন্দ হইয়া পড়ে। যেমন যজ্ঞকার্য্যে অব্যবহৃত কাষ্ঠপাত্র যজ্ঞবেদিকার একপার্শ্বে নিস্পন্দভাবে অবস্থান করে, তেমনি সম্বিৎ তখন অস্পন্দ দেহের হৃদয়-মধ্যগত কমলদলোদরে অস্পন্দ অবস্থায় অবস্থিত হইয়া থাকে। নলিনীপত্র বা তালবৃন্ত নিস্পন্দ হইলে বাহ্-পবন যেমন প্রশান্ত হইয়া যায়, তেমনি তৎকালে ঐ অভ্যন্তরস্থ প্রাণ-পবন-সমূহও প্রশান্তভাব অবলম্বন করিয়া থাকে। প্রাণবায়ু প্রশান্ত হইয়া অন্তরস্পর্শী হইলে গগন-পবনের প্রশান্ত অবস্থায় ধূলি-পটলের প্রশান্তির ন্যায় তৎকালে জীব প্রশান্ত এবং রূপোপাধির লয়ে পরিপূর্ণ ও নামোপাধির অবসানে মূঢ় হইয়া অবস্থান করেন। অর্থাৎ জীব তখন কারণাত্মা হইয়া বিরাজ করিতে থাকেন। হে মুনে! তখন মনও

নীরজস্ক ও নিরাধার হইয়া অবশিষ্ট থাকে এবং প্রাণপবন সহ কারণাত্ম-পদ লাভ করিয়া পার্থিব বৃক্ষ-বীজবৎ পুনর্ব্বার দেহাবির্ভাব বিষয়ে উন্মুখ হইয়া উঠে।

এইরূপে বৈকল্য-প্রাপ্ত পুর্য্যষ্টক সমুদায় কারণ সহ প্রশান্ত হইয়া গেলে দেহের আর স্পন্দন থাকে না। দেহ তখন নিশ্চল হইয়া পড়ে। স্বস্বরূপের অজ্ঞতাই মোহ; সেই মোহের ঘোরে চিত্তের যে চেত্যাকারে অনুভূতি, তাহাতেই সর্ব্ব বাসনা স্পন্দিত হইয়া উঠে। চিৎ ঐ সকল বাসনায় পরিচালিত হইয়াই অন্তরে স্বস্বরূপের বিস্মৃতি-ঘটনায় অলীকভাব স্মরণ করে। ক্রমশঃ হৃদয়-কমলদল স্ফুরিত হয়, তাহাতে সমস্ত পুর্য্যষ্টক পরিস্ফুট হইয়া প্রকাশ পায়। কিন্তু যদি ঐ হৃদয়-কমল-যন্ত্রকে নিস্পন্দ করা যায়, তাহা হইলে ঐ পুর্য্যষ্টক বিনষ্ট হইয়া থাকে।

হে দ্বিজ! যে পর্য্যন্ত দেহে পুর্য্যষ্টক থাকে, ততকাল দেহকে জীবিত বলা হয় আর যখন পুর্য্যষ্টক শান্ত হইয়া যায়, তখন দেহ মৃত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। বাত, পিত্ত, কফ ও রাগ-দ্বেষাদি করিয়া যত কিছু পরস্পরবিরোধী মলরাশি আছে, তাহাদের প্রকোপে এবং দেহের শস্ত্রাদি-কৃত ছেদন ও ভেদনাদিতে যৎকালে হৃৎপদ্মযন্ত্র অভ্যন্তরে স্ফুরিত হইতে পারে না, তখন বাতযন্ত্রের নিরোধ-ঘটনায় বাতপুঞ্জের ন্যায় পুর্য্যষ্টক ধীরে ধীরে গগনগাত্রে মিলিয়া যায়। জীব যে মরণাদি-দুঃখরাশি ভোগ করে, এই ভোগের কারণ কেবল তাহার নিজের সঙ্কল্প বৈ আর কিছুই নহে। আপনার সঙ্কল্প হইতেই জীবের দুঃখভোগ ঘটে এবং তাহা হইতেই অনবরত শরীর-গত পদ্মযন্ত্র প্রবাহিত হইয়া থাকে। হৃদয়ে যাঁহাদের নিয়ত নির্ম্মল বাসনা বিরাজিত, তথাবিধ জীবনিবহ স্থির ও এক-রূপ ভাবে চিরজীবী ও জীবন্মুক্ত হইয়া অবস্থান করেন। যখন হৃৎপদ্ম-যন্ত্র নিরুদ্ধ হয় এবং প্রাণপবন প্রশান্ত হইয়া যায়, এই দেহ তখন অধীর-ভাবে ভূলুণ্ঠিত হইয়া কাষ্ঠ ও পাষাণবৎ অবস্থান করিতে থাকে।

হে মুনীন্দ্র! এই পুর্য্যষ্টক যখন গগনপবনে বিলয় পাইয়া যায়, মনও তখনই গগনে বিলয় প্রাপ্ত হয়। মন দীর্ঘকাল ধরিয়া ভোগ্য দেহভাবে অভ্যস্ত হয়, এবং তদবস্থায় বাসনা-বলিত থাকে। এই জন্য মন যে যেখানেই

বিলীন বা ভ্রান্ত হউক, সে—সেই সেইখানেই স্বীয় কর্ম্মফলের পরিপাকে স্বর্গ-নরকাদি দর্শন করিয়া থাকে। যেমন গৃহস্থ ব্যক্তি গৃহ হইতে দূর দূরান্তরে চলিয়া গেলে গৃহাভ্যন্তর শূন্যাবস্থায় পড়িয়া থাকে, মনও তেমনি প্রাণপবন চলিয়া যাইবার পর শরীরবিরহিত শবাকারে পর্য্যবসিত হয়। প্রথমে সর্ব্বব্যাপিনী ব্রহ্মচিৎ চেত্যাবস্থা হইতে চেতনভাবে, পরে চেতন ভাব হইতে জীবভাবে, জীবভাব হইতে মনোভাবে এবং মনোভাব হইতে পুর্য্যষ্টকাকারে উপনীত হইয়া আতিবাহিক দেহ ধারণ করিয়া থাকেন। অনন্তর ঐ সূক্ষ্ম ভূতসমষ্টিরূপ আতিবাহিক দেহ চিত্তকে অঙ্কে রাখিয়া অবস্থানপূর্ব্বক স্বপ্ন-সম্ভ্রমবৎ ভাবনার প্রভাবে স্থূল শরীর অবলোকন করিতে থাকেন। ক্রমশঃ ভাবনা যখন দৃঢ়ীভূত হইয়া উঠে, তখন ঐ ভাবনাস্থানে তাত্ত্বিক বুদ্ধি স্থাপন করিয়া তাহাতেই আসক্ত হইয়া থাকেন এবং কিছুকাল মধ্যেই আতিবাহিক ভাব ভুলিয়া যান। এইরূপে তিনি কৃত্রিম ভাবনার প্রাবল্যে এই স্থূল দেহে সত্যবুদ্ধি স্থাপন করিয়া যাহা অসত্য, তাহাকে সত্য এবং যাহা সত্য, তাহাকে অসত্য করিয়া তুলেন। ঐ সর্ব্বগামিনী চিৎ আপনার নানা অংশ কল্পনা করিয়া তন্মধ্যে একাংশে জীব হইয়া মনের আকারে পর্য্যবসিত হন এবং মন হইয়া পুর্য্যষ্টক-রথে আরোহণ করত এ জগৎ আক্রমণ করিয়া থাকেন। যৎকালে এই চিৎ প্রাণময় সূক্ষ্মাত্মক পুর্য্যষ্টক-দেহ উদ্ভাবিত করিয়া তুলেন, তখন লোকে ইনি জীবিত বলিয়া ব্যবহৃত হন। ফল কথা এই যে, শবের অভ্যন্তরে বেতালের প্রবেশ বশতঃ স্পন্দিত শবদেহের যেমন জীবিতভাবের আশঙ্কা হয়, তাঁহার তাৎকালিক সেই জীবিতভাব সেইরূপই হইয়া থাকে। উল্লিখিত পুর্য্যষ্টকের তিরোধান হইলে চিত্ত যে কালে গগনগাত্রে বিলয় প্রাপ্ত হয়, তখন ঐ দেহ কাষ্ঠ-কিম্বা পাষাণাদির ন্যায় অচেতন অবস্থায় উপনীত হইয়া থাকে। ঐ অবস্থায় দেহকে মৃত বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়। নূতন তরুপত্র যেমন কালবশে জীর্ণ হইয়া যায়, তেমনি ঐ জীব-ভাব-গত চিৎ অজ্ঞানস্বভাব-নিবন্ধন স্বীয় অজর অমর ব্রহ্মস্বরূপ ভুলিয়া যান এবং কালবশে বিবশভাবে জীর্ণ দেহের অনুরূপ অসামর্থ্য প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অনন্তর হৃৎপদ্মযন্ত্র যখন জৈবিক স্মৃতিশক্তি হইতে পরিহীন

হইয়া নিশ্চলাকারে অবস্থিত হয়—প্রাণবায়ুর নিরোধ অবস্থা ঘটিয়া থাকে, তখনই মানবকে মৃত আখ্যায় অভিহিত করা হয়। বৃক্ষের পত্র যেমন যথাকালে জন্মে,—জন্মিয়া বিশীর্ণভাবে বৃক্ষ হইতে বিচ্যুত হয়, এই মানব-দেহেরও সেইরূপ অবস্থা; ইহা প্রথমতঃ জন্ম লয়,—পরে আবার কাল-বশে বিশীর্ণ হইয়া যায়। উল্লিখিত বৃক্ষপত্রের ন্যায়ই দেহীদিগের দেহ জাত ও মৃত হইয়া থাকে। ফলে জনন এবং মরণ, ইহাই হইল দেহের স্বভাব; সুতরাং এ দেহের জন্য আর শোক বা দুঃখের বিষয় কি? এই চিদর্ণবের অভ্যন্তরে কত যে দেহরূপ বুদ্বুদমালা কত দিকে উদ্ভূত হয়, তাহার ইয়ত্তা করা অসম্ভব। কিন্তু যাঁহারা তত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষ, তাঁহারা এই বুদ্বুদের প্রতি একেবারেই আস্থা স্থাপন করেন না।

হে ঋষে! পূর্ব্বে ঐ যে ব্রহ্মচিত্তের কথা কহিলাম,—তিনি সর্ব্ব-গামিনী হইলেও এই মনোমুকুরে প্রতিবিম্বিত হন; মুকুর বিনা কোন বস্তুই অন্তরে বস্তুর প্রতিবিম্ব-ধারণে সক্ষম নহে। চিদাকাশ পরিপূর্ণ ও নির্ম্মল-স্বভাব; উহাতে চিৎ-অচিৎ জীবজগৎরূপ কল্পনাপুঞ্জ আপাতরম্য নানা-কারে জনন-মরণাদির ক্রমানুসারে আত্মাকে বিমুগ্ধ ও তাপিত করিবার জন্যই প্রতিভাস প্রাপ্ত হইতেছে। ঐ জীব-জগৎরূপ কল্পনা সকল পূর্ব্ব পূর্ব্ব শুভাশুভ কর্ম্মের ফলস্বরূপ সুখ-দুঃখ ভোগাদির কোলাহলে সতত মুখর-ভাবাপন্ন হইয়া রহিয়াছে।

দ্বাত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩২ ॥

ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে চন্দ্রার্দ্ধমৌলে! চৈতন্যতত্ত্ব—মহামহিম, অনন্ত ও একরূপ; তিনি কিরূপে দ্বৈত-ভাবাপন্ন হইলেন? অর্থাৎ দিক্ ও কালাদি দ্বারা যে আত্মার পরিচ্ছেদ-ঘটনা নাই; এবং যাঁহার স্বজাতীয় বিজাতীয় কিম্বা স্বগত কোন ভেদ-ভিন্নতার সম্পূর্ণ অভাব, সেই চৈতন্য-

স্বরূপ আত্মতত্ত্বে দ্বৈতভাবের আবির্ভাব হইল কিরূপে? বিশদ কথা এই যে, এই দ্বৈত জগদ্ভাব নিজ হইতে তাঁহাতে আবির্ভূত হইতে পারে না। কেন না, তাঁহার তো বিকার নাই বা অবয়ব নাই। উহা যে অন্য কাহারও সহায়তা পাইয়া প্রাদুর্ভূত হইতে পারিবে, তাহারও সম্ভাবনা দেখি না; কেন না, একমাত্র তিনি ছাড়া তো দ্বিতীয় কাহারও অস্তিত্ব নাই। যদি বলা হয়—কারণ নাই বা রহিল, কারণ বিনাই এই দ্বৈতভাবের আবির্ভাব হইয়াছে? তদুত্তরে আমার বক্তব্য এই যে, হে দেবাধিদেব! যদি তাহাই হয়, তবে তো এই আত্মচৈতন্য অকারণ অনন্তকোটি বন্ধনসঙ্কুল হইয়া সেইরূপেই চিরগ্রথিত হইয়া থাকেন; কদাচ তত্ত্ববোধের অভ্যুদয় বা তাঁহার সেই বন্ধন-মোচনের সম্ভাবনা হয় না। কাজেই দুঃখ-দূরীকরণেও তিনি সক্ষম নহেন। তদীয় দুঃখ দূরীকরণের অক্ষমতার প্রতি কারণ এই যে, যাহা অকারণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহার যদি একটার উচ্ছেদ করিতে যাওয়া যায়, তবে তখন আর একটা আসিয়া সেখানে তো উপস্থিত হইবেই; অধিকন্তু অন্যান্য বহু বন্ধনেরও আবির্ভাব অসম্ভব নহে। কেন না, সে সকল বন্ধন ঘটিবার পক্ষে তো কোন কারণেরই তখন প্রয়োজন হয় না।

ঈশ্বর কহিলেন,—সেই ব্রহ্ম—সর্ব্বশক্তি-সম্পন্ন। তাঁহার যে দ্বিত্বাদি-কল্পনা, তাহা কেবল ব্যবহার-নির্ব্বাহার্থই করা হইয়া থাকে। পরন্তু পরমার্থ-দৃষ্টিতে দেখিলে দেখা যাইবে, তিনি একমাত্র সৎ। এইরূপে যখন দ্বিবিধ-দৃষ্টির ব্যবস্থা আছে, তখন পরমার্থ পক্ষে তাঁহাতে দ্বিত্ব একত্ব-রূপ কল্পিত অংশ লইয়া একটা আপত্তি উত্থাপন করার মূল্য কিছুই নাই। একথা বলিবার কারণ এই যে, দ্বিত্ব থাকিলে একত্বের সম্ভাবনা হইতে পারে এবং একত্ব থাকিলেও দ্বিত্ব সম্ভাবনা অপ্রসিদ্ধ নহে। এখন এ কথা বলা যায় যে, একত্ব দ্বিত্বেরই ব্যাবর্ত্তক হইয়া থাকে। আবার কথা এই যে, দ্বিত্ব যখন সম্পূর্ণরূপেই অপ্রসিদ্ধ, তখন সেই অপ্রসিদ্ধের ব্যাবৃত্তি নিমিত্ত একত্ব কল্পনায় ফল কি? ফলে দেখা যায়, চিৎস্বরূপ ব্রহ্মে ব্যবহারার্থ দ্বিত্ব-কল্পনার ব্যাবর্ত্তনের জন্যই একত্ব কল্পিত হয়। এ জন্য বলা যায়, কি একত্ব, কি দ্বিত্ব, উভয়ই তাঁহাতে অসৎ বলিয়া বিভাত।

এতাবতা বুঝিতে হইবে, তাঁহাতে একত্বেরও যখন অপ্রসিদ্ধি, তখন একত্বই বল, আর দ্বিত্বই বল, উভয়েরই অভাব সুসিদ্ধ। দেখ, এক না হইলে দ্বিতীয় হইবার সম্ভাবনা নাই এবং দ্বিতীয় না হইলেও এক হওয়া অসম্ভব। উপদেশাদি ব্যবহার নির্ব্বাহের জন্য যে ব্যবহারিক দৃষ্টি আর যে পরমার্থ-বিষয়ক দৃষ্টি, এ উভয়কে এক করিয়া সত্তার দ্বৈবিধ্য কল্পনায় দেখা যায়,—পরমার্থে ব্যবহারিক সত্তায় দ্বৈত জগদ্ভাবের বিরোধঘটনা কিছুই হয় না। কেন না, একই বীজ যদি অঙ্কুর, পত্র, বৃক্ষ কিম্বা ফলাদির আকারে বিকৃতি প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে তাহাতে যেমন নানাত্ব কল্পনা করা হইয়া থাকে, তেমনি এ ক্ষেত্রেও কার্য্য-কারণের একই সত্তা নিবন্ধন একরূপত্ব সুসিদ্ধ। যদি বলি, ব্রহ্ম উপাদান করণ আর জগৎ তাহার কার্য্য, তাহা হইলেও সম্ভবতঃ ভবদীয় সন্দেহ নিরাস হয়। আর অন্যদিকে নিখিল বিকারের পরমার্থ সত্তা ভিন্ন একটা কিছু ব্যবহারিক সত্তা যদি অঙ্গীকার করা না হয়, তাহা হইলে তো দেখা যায়— এই দ্বৈত চিতেরই একটা বিকল্প হইয়া উঠে; ইহাতে কোনই বিরোধ ঘটনা দেখা যায় না। ঐ চিৎস্বরূপ ব্রহ্ম আপনা হইতেই চৈত্য-বিকল্পনায় চৈত্যময় হইয়া স্ফুরিত হইয়া থাকেন। অতএব ঐ চৈত্যকে চিৎস্বরূপ হইতে ভিন্ন কিছুতেই বলা যায় না। উল্লিখিত চিৎস্বরূপের এই যে বিকল্প-বিকারাদি, ইহারা চিৎ হইতেই প্রাদুর্ভূত হইয়া ব্যবহারিক পদার্থ-পরম্পরায় নানাকার্য্য-কারণাদি ভাবের উপযোগী হয়। যদি ব্রহ্মসত্তায় ব্যবহারিক জগতের সত্তা স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে জলে জলতরঙ্গ, শৈলোপরিস্থ সলিল-তরঙ্গ ও শস্যোৎপন্ন ব্রীহি যথা-দির অঙ্কুর, এতৎসমস্তই একরূপ হইয়া যায়। এই সকলই ব্রহ্ম সত্য, অন্যথা সমুদায়ই এক প্রকার অলীক মাত্র; কাজেই জল-তরঙ্গাদি ব্যবহারিক, মরুমরীচি তোয়তরঙ্গ প্রাতিভাসিক এবং বন্ধ্যাপুত্র ও শশশৃঙ্গ একান্ত অসত্য, ইত্যাদি রূপ বিকল্প-কল্পনায় যে অবান্তর বৈলক্ষণ্য, তাহা নিশ্চয়ই অজ্ঞকল্পনা, সন্দেহ নাই। দেখা যায়, নিজের সত্তা কাহারই নাই; একমাত্র ব্রহ্মসত্তাতেই যখন সকলের সত্তাকল্পনা, তখন ইহা আছে উহা নাই, এই প্রকার সত্য-কল্পনা করা কি নিমিত্ত?

ফলে, অজ্ঞানবশে এ জগতের পদার্থপুঞ্জের যে পরস্পর ভেদ পরিদৃষ্ট হয়, তত্ত্বসাক্ষাৎকার হইলে তাহা একই হইয়া যায়। এ বিষয়ে অধিক বাক্য-বিকল্পনার আবশ্যক কিছুই নাই।

হে দ্বিজবর! প্রকৃত কথা এই যে, অজ্ঞান যে পর্য্যন্ত না বিদূরিত হইয়া যায়, তাবৎ পর্য্যন্ত সহস্র সহস্র যুক্তির প্রয়োগেও এই জগদ্গত প্রত্যক্ষ ভ্রান্তিসিদ্ধ পদার্থপরম্পরার শান্তি কিছুতেই হইবে না। সত্য কথা বলিতে কি, তরঙ্গ, বিন্দু ও বুদ্বুদপ্রভৃতি যেমন জল হইতে অভিন্ন, তেমনি ব্রহ্মের সর্ব্বশক্তিতাও তাঁহা হইতে অস্বতন্ত্র। যেমন লতাজাত পুষ্প পল্লব ও পত্র প্রভৃতি লতা হইতে অভিন্ন, তেমনি কি দ্বিত্ব, কি একত্ব, কি জগত্ত্ব, কি তুমিত্ব, কি আমিত্ব, ইত্যাদি কোন কিছুই চিৎস্বরূপ হইতে পৃথক্ নহে। দেশ ও কালাদিরূপে চিতের যে ভেদ করা হয়, তাহাও চিদ্ভিন্ন আর কিছুই নহে; সুতরাং সেই ব্রহ্মচৈতন্য দ্বৈত-ভাবাপন্ন হইলেন কিরূপে? এই প্রকার প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া তুমি যে চিদ্ভিন্ন দ্বৈতের আশঙ্কা করিয়াছ, তাহা তো ভ্রান্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে। অতএব তোমার এইরূপ প্রশ্নই যুক্তিযুক্ত হয় নাই

'হে মুনে! দেশ বল, কাল বল, ক্রিয়া বল, সত্তা বল, আর নিয়তি প্রভৃতি শক্তির কথাই বল, এতৎসমস্তই চিদাত্মক; কেন না, চিত্তের সত্তাতেই এই সকলের সত্তা প্রতিষ্ঠিত। যেমন একই জলীয় তরঙ্গ ঊর্ম্মি ও বীচি প্রভৃতি বিভিন্ন নামে নিরূপিত হইয়া থাকে, তেমনি একই চিৎতত্ত্ব—চিৎ, ব্রহ্ম, চিত্ত, চেত্য ও 'অহং' ইত্যাদি নানা নামে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকেন। এই চিদ্বিলাস যেন একটা মহাসাগর; এ সাগরে তরঙ্গোদয়ের সম্ভাবনা নাই সত্য, তথাচ যেন উহা তরঙ্গিতভাবে বিবর্ত্তিত। এই যে তরঙ্গিতত্ব, ইহাই চেত্য সম্বন্ধ বলিয়া কথিত। ঐ পরম চিৎতত্ত্ব ভিন্ন ভিন্ন বাদিগণের নিকট ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত। তাঁহাদের মধ্যে কেহ উহাকে শূন্য, কেহ পরমাত্মা, কেহ ব্রহ্ম, কেহ ঈশ্বর এবং কেহ কেহ শিব নামে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। বাস্তবিকই ঐ চিৎতত্ত্ব নানা সম্প্রদায়ের নিকট ঐরূপ নানা নামে নিরূপিত। যিনি 'অহং' নামে ব্যাখ্যাত, সেই 'অহং'ই পরমাত্মশব্দের বাচ্য। পরমাত্মা

নাম-রূপের অতীত হওয়ায় বাক্য ও মনের অগোচর। পরমাত্মার তথাবিধ রূপের নির্ব্বাচন করা অসাধ্য। এই পরিদৃশ্যমান জগৎ উল্লিখিত চিদাকৃতি লতারই ফল-কুসুমাদিরূপে প্রতীত। উহাকে ঐ চিৎ হইতে ভিন্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না। কেন না, উহা চিন্ময়।

হে ঋষে! তুমি যদি তত্ত্ববিষয়ক বিবেক-বিজ্ঞানের নিমিত্ত এই অসত্য জীবজগদ্-বিষয়ক প্রশ্নের অবতারণা করিয়া থাক, তবে তাহা শ্রবণ কর। ঐ চিৎ যখন মহীয়সী অবিদ্যারূপ উপনেত্র ধারণ করেন, তখন তিনি জীব নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। ঐ অবস্থায় দ্বিতীয় চন্দ্রবৎ মিথ্যা জীবজগদ্ভাব তাঁহার দৃষ্টিগোচর হয়। ঐ চিৎ আপনা হইতেই ভাবিতে থাকেন,—আমি চিৎ নহি, আমি ব্রহ্ম নহি, আমি তাহা হইতে স্বতন্ত্র; এবম্বিধ ভাবনার প্রবাহে তাঁহাকে যেন তখন একটা বিকল্পময় ভিন্নভাব ধারণ করিতে হয়। তিনি নিষ্কলঙ্ক নির্ম্মল অবস্থায় অবস্থান করিলেও একটা কল্পিত কলঙ্কিত আকার ধারণ করিয়া এই বিষম সংসার-নদীর জলে ঝম্ফ প্রদান করেন। তখন একটা ঔপাধিক কলঙ্ক মাখিয়া তিনি চেতনাকারে এই সমস্ত প্রপঞ্চবিস্তার অনুভব করিতে থাকেন। চিৎ আপনা হইতেই পুর্য্যষ্টক পদে একীভূত হইয়া জীবস্বরূপতা-লাভ করেন। চিৎস্বরূপের প্রকাশেই ঐ জীবকে তখন চিন্ময় হইয়া জীবন ধারণ করিতে হয়। ক্রমশঃ জীব আতিবাহিক দেহ ধারণ করিয়া 'আমি ভূতপঞ্চকময় স্থূল-দেহস্বরূপ' এইরূপ ভাবনা করিতে করিতে তদাকার কোন একটী দ্রব্যরূপে পরিণত হন। পরে প্রাণিবর্গের ভক্ষ্য সামগ্রীর সহিত মিশিয়া তাহাদিগের উদর-মধ্যগত হইয়া থাকেন।

অনন্তর ঐ জীবের এই একপ্রকার অনুভব হইতে থাকে যে, যেন আমি প্রাণবান্ হইয়াছি। বাস্তবিক যিনি অনুভবাত্মক ব্রহ্ম, তিনিই উল্লিখিত 'অহং'আদিরূপে পঞ্চভূতময় স্থূলদেহ অনুভব করিতে করিতে চক্ষুরাদির সহযোগে এই চরাচর বাহ্য পদার্থসমুহের অনুভূতি করিতে থাকেন এবং সেই সেই অনুভূতি-বাসনায় নিজেও তখন তদাকৃতি প্রাপ্ত হন। চিৎ সূক্ষ্ম আতিবাহিক দেহে অবস্থিত হইলেও পুনঃসঞ্চিত স্থূল-ভাবের বাসনা-প্রাবল্যে সূক্ষ্মভাবের সুদৃঢ় অভ্যাস ক্ষীণ হইয়া যায় জানিয়া,

তখন তিনি কাকতালীয়বৎ সহসা সূক্ষ্ম আকার পরিহার করেন। পুরুষ যেমন কল্পনার বলে স্বীয় সম্মুখে স্পষ্ট বেতালমূর্ত্তি উপস্থাপিত করে, তেমনি ঐ চিৎ একাক্ষয় হইলেও দ্বিত্ব কল্পনা করিয়া দ্বৈতভাব আনয়ন করিয়া থাকেন। 'আমি কিছুই করি না' এইরূপ সঙ্কল্প প্রভাবে পুরুষের যেমন কর্ত্তৃত্ব নিবৃত্তি পায়, তেমনি অদ্বৈত সঙ্কল্পেও আত্মার দ্বৈতভাব ঘুচিয়া যায়। যদি দ্বিত্ব সঙ্কল্প করা হয়, তাহা হইলে একেরই মাত্র দ্বিত্ব হইয়া থাকে, আর যদি অদ্বয়ত্ব সঙ্কল্প করা হয়, তাহা হইলে অনেকেরও অনেকত্ব নাশ পায়। পরমাত্মা নির্ব্বিকার ও সর্ব্বদা সর্ব্বগামী। তাঁহাতে দ্বৈত ভাব নাই।

হে মুনিবর! ভাবিয়া দেখ, যাহা সঙ্কল্পবলে বিরচিত হয়, সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলেই তাহার ক্ষয় হইয়া থাকে। ইহার দৃষ্টান্ত পক্ষে মনো-রাজ্য ও গন্ধর্ব্ব-নগরের কথা উল্লেখ্য হইতে পারে। সঙ্কল্প করিতে হইলেই ক্লেশ হয়; কিন্তু সঙ্কল্পের বিনাশ-ব্যাপারে ক্লেশ কিছুই নাই। মনোরথ-রচিত পুরীর সৃষ্টিকার্য্যে সঙ্কল্পরূপ যক্ষ একজন প্রসিদ্ধ শিল্পী। পরন্তু ঐ পুরীর ধ্বংস-ব্যাপারে তাহার ক্ষমতা কিছুই নাই। প্রবল সঙ্কল্পের বলে দুঃখের উদয় হয়; কিন্তু একমাত্র ঐ সঙ্কল্পের অভাব-ঘটনায় সে দুঃখ ক্ষয় পাইয়া যায়। সুতরাং এরূপ কার্য্যের জন্য আবার কষ্ট কি আছে? মানব যৎকিঞ্চিৎ সঙ্কল্প করে, তাহাতেই অগাধ দুঃখে মগ্ন হইয়া যায়; কিন্তু যদি কোনই সঙ্কল্প না করে, তবে তাহার অক্ষয় সুখভোগ ঘটিয়া থাকে। যে পর্য্যন্ত না তোমার চেতনা হইতে সঙ্কল্পরূপ সর্প চলিয়া যায়, ততদিন তুমি যদি রমণীয় নন্দনবনেও বাস কর, তথাপি প্রকৃত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য লাভে সমর্থ হইবে না। তাই বলি, তুমি স্বীয় বিবেক-বায়ু দ্বারা সঙ্কল্পরূপ মেঘকে অপসারিত করিয়া দাও এবং শারদীয় স্বচ্ছ গগনের ন্যায় পরমোত্তম নির্ম্মল ভাব অবলম্বন কর। তোমার সঙ্কল্পনদী উন্মাদিনী হইয়া ছুটিয়াছে, আত্মা উহাতে ভাসিয়া চলিয়াছেন। তুমি মণি-মন্ত্রের সাহায্য লইয়া ঐ নদীকে শুষ্ক কর,—করিয়া আত্মাকে আশ্বস্ত করিয়া লও এবং আপনি নির্ম্মনস্ক হইয়া অবস্থান করিতে থাক। তোমার চিদাত্মা সঙ্কল্পরূপ-সমীরণে সঞ্চালিত হইয়া পর্ণ-তৃণ-খণ্ডবৎ

চূত্ত্বাকাশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, তাই বলিতেছি, তুমি তাঁহারে সবলে ধারণ করিয়া তদীয় যথাযথরূপ অবলোকন কর। তোমার আত্মবিবেক আবির্ভূত হউক; নিজেই তুমি তাহার সাহায্যে আত্মার সঙ্কল্প-সম্ভূত কালুষ্য বিদূরিত করিয়া যাহা পরমোত্তম নির্ম্মল ভাব, তাহা লাভ কর,—করিয়া পরমানন্দ প্রাপ্ত হও। আত্মা সর্ব্বশক্তিশালী; তিনি যেরূপে যাহা দৃঢ়ভাবে ভাবনা করেন, নিজের সঙ্কল্পবেগে তাহাই তখন সেইরূপেই প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। এ জগৎ সঙ্কল্পমাত্র; কাজেই ইহা মিথ্যা। যদি সঙ্কল্পের অবসান হইয়া যায়, তাহা হইলে কোথায় যে উহার লয় হয়, তাহার সন্ধান পাওয়া যায় না। জন্মরূপ মেঘমালা সঙ্কল্পরূপ সমীরে একত্র পুঞ্জীভূত হয়; কিন্তু যখন অসঙ্কল্পরূপ প্রবল পবনের সংস্পর্শ মাত্র ঘটে, তখনই উহা পরমপদে বিলীন হইয়া যায়। এই যে দেখিতেছ, তৃষ্ণারূপিণী করঞ্জবল্লী বর্দ্ধিত হইয়া ক্রমেই সুদৃঢ় হইতেছে, এ বল্লীর মূলদেশের সন্ধান করিতে গিয়া একমাত্র সঙ্কল্পকেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাই বলিতেছি, হে মুনে! তুমি ঐ বল্লীর মূলোচ্ছেদ করিয়া ফেলো এবং উহাকে বিশুষ্ক করিয়া লও। যদি সঙ্কল্পাদির অবসান হইয়া গেলেও এ জগৎ উদ্ভাসিত হইতে থাকে, তবে জানিবে—তাহা প্রতিভাস মাত্র বৈ আর কিছুই নহে। যতদিনে না ঐ প্রতিভাস ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, জীবন্মুক্ত ব্যক্তিবর্গ ততদিন যাবৎ এই সংসার-বিভ্রমকে মনোরথ-রচিত নগরের ন্যায় অলীক বলিয়াই অনুভব করিতে থাকেন। বিশদ কথা এই যে, তাঁহাদের প্রারব্ধ ক্ষয় তখনও একেবারে হয় না বলিয়া ঐ ভ্রান্তা-নুভূতি তাঁহাদের থাকে মাত্র; পরন্তু এ সংসারে সত্যতাবুদ্ধি তাঁহাদের থাকে না। অপি চ ঐ যে ভ্রান্তানুভূতি থাকে, তাহার ফলে তাঁহাদের কোন দুঃখ বোধ থাকিবার নহে। কেন না, অজ্ঞান দ্বারাই স্বস্বরূপের আবরণ ঘটে; ঐ অজ্ঞানই দুঃখের মূল হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু ঐ অজ্ঞান তখন তাঁহাদের থাকিতেই পারে না। যে পর্য্যন্ত কেহ নবীন নরপতি হইয়া নূতন রাজ্য লাভ করিয়া মনে না করেন যে, আমি রাজা হইয়াছি। তাবৎ 'রাজা আমি, সকলের অধিপতি আমি' এইরূপ রাজত্ব বিস্মৃতি হেতু তিনি অবশ্য রাজ্যসুখভোগ করিতে পারেন না; কিন্তু যখন ঐ নবীন

নরপতি জানিতে পারেন যে, আমি রাজা হইয়াছি, তখন আর তাঁহার আনন্দের অবধি থাকে না। তখন তাঁহার পূর্ব্বস্মৃতি আপ্ত জনের উপদেশ-লব্ধ 'আমি রাজা' ইত্যাকার স্মৃতির প্রভাবে বাধিত হইয়া যায়। এ বাধা শরদাগমে স্বীয় জড়ত্তাগুণে জগদাচ্ছাদনী বর্ষাঋতুর বাধ-ঘটনার স্থায়ই ঘটিয়া থাকে। এই যেমন দৃষ্টান্ত, ইহা জীবন্মুক্ত পুরুষের পক্ষেও প্রযোজ্য। তাঁহাদের পূর্ব্বস্মৃতিও ঐরূপে 'আমিই ব্রহ্ম' এবম্বিধ প্রবল স্মৃতির প্রভাবে বাধিত বা পরিভূত হইয়া যায়। বর্ত্তমান স্মৃতির প্রাবল্য হইতেই পূর্ব্বস্মৃতির বাধঘটনা হয়। এ স্থলে পূর্ব্বস্মৃতি বলিতে প্রাক্তন সঙ্কীর্ণ জীবভাবেরই স্মরণ বলা যায়। বর্ত্তমান স্মৃতি প্রবল হইবার কারণ—মনন ও নিদিধ্যাসনাদি পুরুষকার বলিয়াই বিদিত। এই জন্য যাদৃশ চিত্তবৃত্তি ঘনপ্রবাহে ধাবিত হয়, তাহারই উপচয় হইয়া থাকে। দেখ, বীণার যে সকল তন্ত্রী থাকে, তাহাদের মধ্যে যে তন্ত্রীর ধ্বনি সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ, তাহাই অগ্রে আসিয়া কর্ণপটহে ধ্বনিত হইয়া থাকে।

মুনিবর! 'আমিই সেই একাদ্বয় আত্মা' তুমি এইরূপই একাভিমুখী ভাবনায় বিভোর হইয়া থাক; যদি তুমি ঈদৃশ ভাবনায় সুসিদ্ধ হইতে পার, তাহা হইলে নিশ্চয়ই বলিতে পারি, তুমিই সেই পূর্ণ ব্রহ্ম হইয়া বিরাজ করিবে। তাই বলিতেছিলাম, ভবাদৃশ বিজ্ঞলোকের পক্ষে ঐরূপ বাহ্য পূজার প্রয়োজন কিছুই নাই। কেন না, যাহারা তুচ্ছ ফলের প্রয়াসী, তাহারাই বাহ্য পূজার অনুষ্ঠাতা; তাহাদের পক্ষেই ঐরূপ বাহ্য পূজা শোভনীয় হইয়া থাকে। জানিও, একমাত্র সত্য পরমার্থ পরমাত্মাই তোমাদের পূজ্য দেবতা। তিনি ব্যতীত আর কাহারও পূজার আয়োজনে তোমার প্রয়োজন কিছুই দেখি না। অন্যান্য পূজাদ্রব্য-সংগ্রহও কোন ফলোপধায়ক নহে। কেন না, সেই সেই সামগ্রীসম্ভার কেবল মনেরই অলীক কল্পনা।

ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত। ৩৩ ॥

চতুস্ত্রিংশ সর্গ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে মুনে! ঐ প্রকার দেবপূজা দ্বারা এই বিশ্বকেই তোমার পূজা করা হয়। বাধ-দৃষ্টিতে এ বিশ্ব অসত্য বটে; কিন্তু যদি অধিষ্ঠানের বিষয় চিন্তা করা যায়, তাহা হইলে উহা যে সৎ ও দেব-স্বরূপ হইয়া পড়ে, তাহা তো যুক্তিসঙ্গত কথা, সন্দেহ কি? আরও দেখ, তত্ত্বদৃষ্টিতে দেখিলেই উহাতে দ্বিত্ব একত্বের অভাব প্রতিপন্ন হইবে, আর ব্যবহার দৃষ্টিতে দেখিতে গেলেই কেবল উহার দ্বিত্ব একত্ব হইয়া উঠিবে। এইরূপ হওয়াও সর্ব্বথা যুক্তিসিদ্ধ বটে। কারণ এই যে, চিতের মোহমূলক বৈরূপ্যকেই সংসারাখ্যা প্রদান করা হয়। পরন্তু যদি তত্ত্ব বিচার করিয়া দেখা যায়, তাহা হইলে তিনি অকলঙ্ক ও অসংসারী বলিয়াই প্রতিপন্ন হন। কাজেই তাঁহার অভেদত্ব ও অদ্বয়ত্ব স্বতঃসিদ্ধ। 'আমিই এই দৃশ্য দেহাদি' ইত্যাকার ভাবনাতেই তাঁহাকে কলঙ্কিত হইতে হয় এবং এই জন্যই তিনি বদ্ধ হইয়া পড়েন। পরন্তু যখন ঐ প্রপঞ্চবিস্তারী কল্পিত চিদংশকে নিজ হইতে অভিন্নভাবে বুঝিতে পারেন, তখনই তাঁহার মুক্তি হইয়া থাকে। বাহ্য সাকার ভাবের ভাবনাবশেই ঐ চিৎ দ্বৈতভাবে উপনীত হইয়া থাকেন এবং সেই অবস্থাতেই তিনি আপন অখণ্ড সত্ত্ব পরিহার করিতে বাধ্য হন। অপিচ তখন এমন একটা অবস্থা দাঁড়ায় যে, ঐ দৈহিক সুখ দুঃখ-জড়িত কল্পিত অসত্য ভাব ক্ষণমধ্যেই তিনি সৎ বলিয়া গ্রহণ করেন। ব্যবহার-দৃষ্টিতে দেখা যায় বটে যে, তিনিই এই নিখিল নাম-রূপাত্মক; কিন্তু সত্য কথা বলিতে কি, তিনি বাস্তবিকই শূন্যস্বভাব; তবে যে তাঁহাতে সত্য বা অসত্য ইত্যাদিরূপে নামরূপাদির কল্পনা করা হয়, তাহা বাস্তব পক্ষে কিছুই নয়। তিনি স্বভাবতই নিরাকার ও বিশুদ্ধ। সেই সর্ব্বময় নিরুপম ব্রহ্মই অগ্রে তদীয় আকাশবৎ বিকাশিনী মায়াশক্তি বলে মনোদ্বারাই জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, সৃষ্টি, স্থিতি ও সংসারভাবে

আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধি-ভৌতিক রূপ ত্রিবিধ পথে প্রবাহিত জগদাকারে প্রকট হইয়া থাকেন। মন আপন ইন্দ্রিয়বর্গের একাংশ; তাহাকে যদি মনোদ্বারাই ছেদন করা যায়, তাহা হইলেই সত্যস্বরূপ ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার ঘটে এবং তাহা হইলেই এই যে জগৎপরম্পরা-রূপিণী জালরচনা, ইহা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া বিলয় পাইয়া যায়। তাৎকালিক জীবসত্তা 'ইতি' পদে ব্যবহৃত বলিয়া ঐ নামেরই যোগ্য হয়। সে সত্তা তখন ভর্জ্জিত বীজবৎ পুনরুৎপাদন-শক্তি হইতে বিচ্যুত হইয়া অবস্থান করে। তৎকালে নিখিল দৃশ্যের বাধ-ঘটনায় মাত্র অপরোক্ষ দৃক্‌স্বরূপেরই পরিশেষ হয় বলিয়া ঐ সত্তা 'পশ্যন্তী' নামে নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে। উহা অনুরাগভরে চিত্ত-বিষয়ের আর পুনঃপুন অনুস্মরণ করে না; তাহা হইতে সম্পূর্ণ ই বিরত হইয়া থাকে। ঐ সত্তা তখন মনোমোহরূপ জলদ-জাল হইতে নির্ম্মুক্ত হয়,—হইয়া শারদাকাশের ন্যায় নির্ম্মলভাবে বিরাজ করিতে থাকে। প্রথমতঃ উহা চেত্যভাবরূপ চাঞ্চল্য লাভ করে বটে; কিন্তু এই যে সময়ের কথা কহিতেছি, এ সময়ে উহা সুবিশুদ্ধ চিৎস্বরূপেই বিরাজিত হয়। তৎকালে তত্ত্বদর্শী জীবন্মুক্ত ব্যক্তি জীব-দ্দশাতেই সংসার-সমুদ্রের পরপারে গমন করেন এবং নিখিল পদার্থ-পরম্পরার সত্তামাত্রেই পর্য্যবসিত হইয়া থাকেন। যাহাতে জন্মবীজ নাই, এ হেন সৌষুপ্ত পদ কি, তাহা তিনি পরিজ্ঞাত হন এবং তথাবিধ প্রচুরতর আনন্দস্বরূপের পরিজ্ঞান হওয়ায় পরিপূর্ণরূপে বিরাজমান হইয়া বিতত ব্রহ্মপদে বিশ্রান্তি লাভ করেন।

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! মনঃ ক্ষয় হইবার পর প্রথমতঃ উল্লিখিত চিচ্ছক্তির যেরূপ অবস্থা হয়, তাহা তোমার নিকট ব্যক্ত করিলাম। অধুনা উহার সুবিশুদ্ধ দ্বিতীয় অবস্থা বর্ণন করিতেছি,—শ্রবণ কর। এই চিচ্ছক্তি মনোদশা হইতে মুক্ত হইলে শান্তিশালিনী হইয়া বিরাজ করেন এবং নিখিল জ্যোতি ও তমোভাব হইলে মুক্ত হইলে বিশাল আকাশবৎ স্বচ্ছাকারে বিরাজ করিতে থাকেন। অতঃপর উনি কালবশে প্রগাঢ় সুষুপ্তদশার অনুভববৎ, শিলান্তর্গত সন্নিবেশবৎ, সৈন্ধবের অন্তর্নিবিষ্ট রসবৎ এবং বায়ুর মধ্যগত স্পন্দশক্তিবৎ যখন যেখানে সমুদায়ের সারাংশভাবে

পর্য্যবসিত হন, তখন আকাশগত শূন্যশক্তিবৎ পরমাকাশ আশ্রয় করিয়া চেত্যাংশে উন্মুখীভাব পরিহার করেন,—করিয়া নির্ব্বাত নিস্পন্দ সলিলের ন্যায় নিশ্চলাকারে বিরাজ করিতে থাকেন। ক্রমশঃ ঐ চিচ্ছক্তি সূক্ষ্ম সমীর-কণার স্পন্দ পরিত্যাগবৎ ও সূক্ষ্ম কুসুমাংশের সৌরভ্য পরিহারবৎ কালত্ব ও আকাশত্ব বর্জ্জন করেন এবং যত কিছু দৃশ্যবস্তু আছে, তৎ-সমুদায়ের অনুভূতি হইতে সর্ব্বথা মুক্তাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। তখন তিনি না জড়, না অজড়, এমন এক অবস্থায় উপনীত হন, তাঁহার জড়াজড় উভয়ভাব হইতে মুক্তি ঘটে এবং ঐ অবস্থায় তিনি অপরিচ্ছন্ন ভাব লাভ করিয়া কি যেন কি এক অনির্ব্বচনীয় সত্তা ধারণ করিয়া থাকেন। দিক্ কিম্বা কালাদি দ্বারা সে মহাসত্তার পরিচ্ছেদ-ঘটনা হয় না। তিনি মহা-সত্তারূপে অবস্থিত হইয়া নিষ্কলঙ্ক ও নিরাময় হইয়া থাকেন এবং তৎকালে তাঁহাকে জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি-দশায় উপনীত ও পরিণতরূপে বর্ণন করা হয়। সমুদায় বস্তুর প্রকাশ ও আনন্দাংশ হইতেও উৎকৃষ্টতম প্রকাশ ও আনন্দরূপে তিনি বিরাজ করেন। তাঁহার সে রূপ অনির্ব্বচনীয়; তিনি বিশ্ব-চক্ষু হইয়া সর্ব্ব সাক্ষীর ন্যায় বিরাজমান।

হে সুব্রত! এই আমি তোমার নিকট চিত্তের দ্বিতীয় অবস্থা বিবৃত করিলাম,—হে তত্ত্ববিদ্‌গণের বরেণ্য! অধুনা উহার তৃতীয় অবস্থা বর্ণন করিতেছি,—শ্রবণ কর। ঐ চিৎ ব্রহ্মাকার অখণ্ড-বৃত্তি ও তৎপরিব্যাপ্ত ব্রহ্মের একীভাবে পরিণত হওয়ায় নাম ও রূপাতীত হইয়া থাকেন। তখন ব্রহ্ম, আত্মা, ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকার সংজ্ঞার পরপারে তিনি অবস্থান করিয়া কৈবল্যরূপে বিরাজ করেন। তৎকালে তাঁহার কোনওরূপ বিকার থাকে না; তাই তিনি একেবারে নিষ্কলঙ্ক হইয়া কালাপেক্ষাও স্থির ও তমোতীত স্বস্বরূপে অবস্থানপূর্ব্বক যাহা তুরীয়াতীত প্রভৃতি নাম হইতেও অতীত পরম পুরুষার্থ, তৎস্বভাবেই বিরাজ করেন। ঐ চিৎই সকল প্রকার সুখের সীমাস্বরূপ এবং উনিই সর্ব্ববিধ মঙ্গল হইতেও মঙ্গলময় হইয়া বিরাজিত। জানিবে,—এবম্বিধ সর্ব্বোৎকৃষ্ট, অবিচ্ছেদ-বিরহিত, কেবলী-ভাব-সম্পন্ন, পুণ্যময়, চিৎস্থিতিই উহার তৃতীয় অবস্থা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। চিত্তের এই যেরূপ অবস্থার বিষয় তোমার নিকট বর্ণন করিলাম, ইহা সমুদায়

পথ ও পথিকের দূরস্থিত ; কাজেই এ কথা বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, ঐ প্রকার চিন্মূর্ত্তি আমার বাক্যাতীত। ফলে, আমি উহার স্বরূপ নির্ণয়ে অসমর্থ।

হে মুনে ! আমি যে তোমার নিকট চিতের কথা কহিলাম, এই চিৎ জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি, এই ত্রিবিধ অবস্থারই অতীত। সনাতন পরম দেব বলিতে যাঁহাকে বুঝায়, ইনিই সেই চিৎস্বরূপ। তুমি সেই চিৎপদেই অবস্থিত হও।

হে মুনিবর ! চিৎই এ বিশ্বের উপাদান ; এরূপ ধারণায় এ বিশ্বকে এই চিন্ময় বলিয়াই জানিবে। ঐ চিৎই অদ্বিতীয় সত্যস্বরূপে বিরাজমান ; ইনি কাহারও উপাদান নহেন। এইরূপ পারমার্থিক জ্ঞানে এ বিশ্ব আবার ঐ চিন্ময়ও নহেন। পারমার্থিক-জ্ঞানে দেখিলে দেখা যাইবে, এ বিশ্ব কিছুই নহে। ইহাকে উৎপন্ন বা বিনষ্ট কিছুই বলা চলে না। ফল কথা এই যে, এ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সমস্তই একরূপ, শান্ত ও আকাশ-কোষবৎ শূন্যময়। কেন না, একমাত্র চিৎই অদ্বৈত, অসংক্ষুব্ধ, অবিকারী ও ঘন-চেতনাকারে বিরাজিত। এই চিৎ এত নিত্য যে, ইহার নিকট চিরস্থির কাল ও গগনাদিও অনিত্যরূপে প্রতিভাত। ইনি চিদ্ঘন বলিয়া কি শিশু-কল্পিত শিলাকোষ, কি জগৎ-পরম্পরা, কি জাগতিক পদার্থসমূহ, ইহারা সৎ ও অসৎ হইলেও ইহাদের প্রভেদ কিছুই নাই ; সকলই ইহারা একরূপেই প্রতীয়মান। ফলে একমাত্র চিতের সত্তাতেই যাহা অলীক, তাহাও সত্য এবং যাহা সত্য, তাহাও অলীক হইয়া পড়ে। সত্য কথা বলিতে কি, এতৎসমস্তই বাক্যাতীত শান্ত, শিব, ব্রহ্ম। ওঙ্কারের তুরীয় মাত্রা—যিনি বিশুদ্ধ ব্রহ্ম, তিনিই একমাত্র পরম গতি।

বাল্মীকি কহিলেন,—ঈশ্বর উল্লিখিতরূপে উপদেশ প্রদান করিয়া মুনিবর বশিষ্ঠ ও স্কন্দ, নন্দী প্রভৃতি অন্যান্য অনুচর সহচরসহ মুহূর্ত্তমাত্র সেই আশ্রমে তূষ্ণীভাবে অবস্থান করিলেন। তখন সেই সংসারের পর-পারে অমল ভূমানন্দ চিদেকরসের পরিণামক্রমে তদীয় চিত্তবৃত্তি বিশ্রান্ত হইল এবং তদুচ্চারিত প্রণবার্দ্ধ মাত্রার চরম ভাগও তখন সম্যক্ উপশান্ত হইয়া গেল।

চতুস্ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩৪ ॥

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! অতঃপর মুহূর্ত্ত কাল অতীত হইল; গৌরীরূপিণী সরোজিনীর সরোবর শঙ্কর আমায় প্রবোধ প্রদান করিবার জন্য শনৈঃ শনৈ স্বীয় নয়ন উন্মীলন করিলেন। তদীয় বদনাকাশে ত্রিনয়নরূপ রবি, শশী ও অগ্নি সমুদিত হইয়া তাঁহার প্রবোধ-সমাধি প্রকাশ করিয়া দিল। মনে হইল, দিবাকর সমুদিত হইয়া দিবাভাগ যেন প্রকাশ করিয়া দিলেন। বিশদার্থ এই যে, তিনি তখন সমাধি হইতে সমুত্থিত হইলেন এবং আবার আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন।

ঈশ্বর কহিলেন,—মুনিবর! তুমি বিচার করিতে থাক; বিচার দ্বারা সত্বর স্বীয় প্রত্যক্স্বরূপের সত্তা নিশ্চয় করিয়া লও। আকাশ নিস্পন্দ; কিন্তু পবন স্পন্দমান হইয়া উহাকে যেমন ধূলি-জাড্যাদি যোগে আবিল করিয়া তুলে, তেমনি তুমি অনর্থজালে আপনাকে জড়িত করিও না। বাহ্য বিষয়ের যে কিছু দ্রষ্টব্য ছিল, সকলই তাহা দেখিয়াছ; তবে আর কেন ভ্রমের ঘোরে বিভোর হইয়া থাক! এ সংসার সকলই ভ্রান্তিময়; এখানে এমন তো কিছুই দেখি না, যাহা তত্ত্বজ্ঞ যোগীদিগের পক্ষে ত্যাজ্য বা উপাদেয় হইতে পারে? নিজে তুমি অসিধারার ন্যায় এই শান্তি ও অশান্তিপূর্ণ বিকল্পসমূহকে ছেদন করিয়া ধীরপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছ। যদি ঐ প্রকারে বিকল্পজাল বিহত করিতে না পারিতে, তাহা হইলে আর তোমার ধীরপদ পাইবার অধিকার থাকিত না, যাহা হউক, এখন তোমার ধীরপ্রকৃতির গুণে তুমি আত্মদর্শন-লাভে সক্ষম হইবে। সুতরাং অচিরাৎ তুমি আত্মদর্শী হইবার চেষ্টা কর। আর যদি তুমি তাহাতে অসমর্থ হও, তাহা হইলে কিছু কাল যাবৎ শ্রবণ-মননাদি কতিপয় বাহ্য দৃষ্টি অবলম্বন করিয়া নিরন্তর তত্ত্বলাভার্থ যত্ন করিতে থাক; দেখিও—প্রমাদবশে কখনই যেন তাহা হইতে উপরত

হইও না। বলা বাহুল্য, আত্মবোধ অখিল বাহ্য প্রপঞ্চের অতীত; তুমি তাহা লাভ করিবার প্রয়াসী হইলে আপাততঃ এই দৃশ্য-দশায় অবস্থিত রহিয়া মদুক্ত উপদেশাবলী শ্রবণ কর। নতুবা চুপ করিয়া মূকের ন্যায় বসিয়া রহিলে কি ফল হইবে?

অনন্তর 'তুমি বাহ্য দেহাদি-ব্যাপারে আত্মবুদ্ধি পরিহার কর' এই কথা কহিয়া শূলপাণি শঙ্কর দেহাত্মতা ভ্রান্তি পরিত্যাগ করিবার উপায় বলিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন—দেখ, প্রাণবায়ুর সাহায্য পাইয়াই এই দেহগৃহ যন্ত্রবৎ পরিচালিত হইতেছে। যদি প্রাণবায়ু না থাকিত, তাহা হইলে এ দেহ নিস্পন্দ হইয়া মূকবৎ বিরাজ করিত। যে শক্তি স্পন্দিত করিয়া থাকে, তাহা পবনের, আর যাহা সম্বেদনশক্তি, তাহা —চিত্তের অধীন। এই সম্বেদনশক্তির মূর্ত্তি কিছুই নাই। ইহা নির্ম্মল আকাশ অপেক্ষাও নির্ম্মলা। সৎপদার্থের সত্তাই ইহার সত্ত্বের প্রতি কারণ। যাহা স্পন্দশক্তি, তাহার কারণ প্রাণ আর এই যে নশ্বর দেহ, ইহাই তাহার আশ্রয়। এ দেহের অভাবঘটনায় স্পন্দশক্তির কারণ ঐ প্রাণ—সাধারণ বায়ুর আকারেই বিরাজ করে। যিনি চিদাত্মা বলিয়া বিদিত, তিনি আকাশ অপেক্ষাও নির্ম্মলাকারে প্রতিভাত। তাঁহার বিনাশ কখনই নাই; সুতরাং এ বৃথা জনন-মরণ ভ্রমে কেন আর আচ্ছন্ন হইতেছ? যেমন স্বচ্ছ দর্পণে প্রতিবিম্বপাত হয়, তেমনি এই প্রাণ ও মনোময় দেহেই ঐ চিৎ-প্রতিবিম্ব পতিত হইয়া থাকে।

মুনিবর! বুঝিয়া দেখ, কোন বস্তু সম্মুখে থাকিলেও মলদিগ্ধ দর্পণে তাহার প্রতিবিম্ব-পাত হয় না, বলিয়া দর্পণসম্বন্ধে সে বস্তু যেমন অসৎরূপে প্রতিপন্ন হয়, তেমনি এই যে দেহ দেখিতেছ, ইহা প্রাণহীন অবস্থায় পড়িয়া থাকিলে তাহাতে চিতের বিদ্যমানতা থাকে না। যদিও চিৎপদার্থ সর্ব্বগত, তথাচ বুদ্ধিময় লিঙ্গদেহ ভিন্ন অন্য কুত্রাপি তিনি কি কার্য্যকারিত্ব-সম্বন্ধে, কি স্বীয় তত্ত্ববোধব্যাপারে, কোন বিষয়েই সক্ষম নহেন। বুদ্ধি লিঙ্গদেহে অবস্থিত; সেই বুদ্ধিযোগে কি ক্রিয়া, কি তত্ত্ববোধ, সকল বিষয়েই সমর্থ হইয়া থাকেন। যখন তিনি মায়াকলঙ্ক হইতে উত্তীর্ণ হইয়া যান, তখন তাঁহার 'পরম শিব' এই সংজ্ঞাই প্রথিত হইয়া থাকে। অর্থাৎ

ঐ চিৎই ব্রহ্মাকারিত চিত্তবৃত্তি হইতে তত্ত্ববোধ প্রাপ্ত হইয়া পরম কল্যাণময় কৈবল্যরূপে বিরাজ করিতে থাকেন। তত্ত্বজ্ঞগণ জানেন,—ঐ চিৎ-দেবতাই সর্ব্বসত্তার স্ফূর্ত্তি নিদান; সেই জন্য তিনিই হরি, তিনিই শিব, তিনিই ব্রহ্মা, এবং তিনিই সুরেশ্বর। ঐ পরম দেবতা চিৎই অনল, অনিল, রবি ও শশী ইত্যাদি আকার ধারণ করিয়া থাকেন। উনিই অখিল চৈতন্যের নিদান—সর্ব্বগামী চেতন আত্মা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। এই আত্মাই দেবগণের প্রতি-পালয়িতা—স্বর্গাধিপতি দেবরাজ ইন্দ্র। এ জগতে যাঁহারা ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব প্রভৃতি হইয়া বিরাজ করিয়া থাকেন, তাঁহারা উক্ত মহাচিৎ দেবতা হইতেই প্রাদুর্ভূত। সকলেই তাঁহারা মহাচিতের সমুল্লাস; তাঁহাদের কেহই মিথ্যা মোহে আবদ্ধ হইবার নহেন। তাঁহাদের এইরূপ প্রাদুর্ভাবের দৃষ্টান্ত স্থলে উত্তপ্ত লৌহখণ্ড হইতে জ্বলন্ত লৌহকণার নিঃসরণ ও বারিধি হইতে বারিবিন্দুসমূহের ইতস্ততঃ বিক্ষেপের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। শাস্ত্রীয় ব্যবহার-দর্শনেই তাঁহাদের এরূপ প্রাদুর্ভাবের সত্যতা স্বীকার করা যায়; পরন্তু পরমার্থ দর্শনে দেখা যায়, তাঁহারাও ভ্রমোৎপন্ন। ভ্রান্তির বীজ অবিদ্যা; সেই অবিদ্যাই নিখিল কল্পনার রচয়িত্রী। ব্রহ্মাদি প্রপঞ্চরূপ শত সহস্র শাখা প্রশাখা তাহা হইতেই বিস্তৃত। কি বেদ, কি বেদার্থ, কি ক্রিয়াকলাপ, কি জীবাদি, কি তাহাদের কাম, কর্ম্ম, বাসনা বা জনন, মরণ, জীবন, সকলই ঐ অবিদ্যায় বিলসিত। এই দেশ-কালানু-সঙ্গিনী অনন্ত অবিদ্যা বার বার কত প্রকারে যে প্রসারিত হইয়া আসিতেছে, তাহার নির্ণয় করা অস্মদাদিরও অসাধ্য। বাস্তবিকই এই অবিদ্যার বিষয় বর্ণন করিবার শক্তি কাহারও নাই। ব্রহ্মা বল, বিষ্ণু বল, আর শিবাদির কথাই বল, ঐ চিদাত্মা তাঁহাদেরও পরম পিতা। বৃক্ষে রাশি রাশি পত্র-পল্লব হয়, উহাদের মূলকারণ যেমন বৃক্ষ বৈ আর কেহই নয়, তেমনি ঐ পরমা চিৎ দেবতাই সমুদায়ের মূল। এই সর্ব্বস্বরূপ চিদাত্মাকেই সকলের সত্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়। সমুদায়ের চৈতন্যসঞ্চার ইনিই করিয়া থাকেন। ইনিই সকলের সত্তা প্রদান করেন। প্রত্যেক ইন্দ্রিয় ও প্রত্যেক পদার্থে ইনিই স্ফুরিত আছেন। ইনি সর্ব্বত্র সর্ব্বদা আত্মাকারে সমুদিত। যাঁহারা পরম তত্ত্বের সন্ধান পাইয়াছেন, তাঁহারা ইঁহাকেই অর্চ্চনা ও বন্দনা

করিয়া থাকেন। ইনি চৈতন্যরূপে সর্ব্বত্রই অবস্থিত; কাজেই ইহাঁকে আবাহন করিয়া আনিবার জন্য কোনই মন্ত্র-তন্ত্রের প্রয়োজন হয় না। ইনি সর্ব্বজীবের—সর্ব্ব পদার্থের অন্তরে নিত্যই আহূত রহিয়াছেন।

হে মুনিবর! ঐ চিৎ দেবতা যে যে বস্তুর দশায় পতিত হন, সেই সেই বস্তুর স্বরূপ ও সেই সেই বস্তুর মননরূপ মন হইয়া নিজেই সাক্ষী দৃষ্টির স্বরূপ ধারণ করিয়া থাকেন। হে ঋষে! জানিবে,—এই চিদাত্মাই সুরেশ্বর; ইনিই সকলের আদ্য, পূজ্য, নমস্য ও স্তোতব্য মহার্ঘ বস্তু। ইহাঁকে নিখিল পদার্থের ও নিখিল মহান্ বস্তুর চরম সীমা বলিয়াই নির্দ্দেশ করা হয়। এই আত্মার সাক্ষাৎকার লাভে জরা, শোক, ভয়, দূরে যায়। আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারিলে জীবকে আর ভৃষ্ট বীজবৎ অঙ্কুরিত হইতে হয় না। সকল জন্তুর অন্তরে যিনি জ্ঞানরূপে অবস্থানপূর্ব্বক অভয় দান করিতেছেন এবং বিনা আয়াসেই যে সর্ব্বাদি দেবের উপাসনা সুসিদ্ধ হইতে পারে,—হে মুনে! সেই অজ পরম পদরূপে তুমিই বিরাজ করিতেছ। তাই বলিতেছি, তুমি আর কেন বাহ্য দর্শনে বিমুগ্ধ হইতেছ?

পঞ্চত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩৫ ॥

ষট্‌ত্রিংশ সর্গ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে মুনে! চিদাকার আত্মার সাক্ষাৎকার ঘটিলে পুনরুৎপত্তি নিবৃত্তি পায়; এইজন্য যিনি সমস্ত বস্তুর সত্তাস্বরূপে অবস্থিত, সেই স্বানুভূতিময় ও বিশুদ্ধ আত্মদেবকে ব্রহ্মজ্ঞগণ সংসার-রোগ-হর সর্ব্বেশ্বর বলিয়া নিরূপণ করিয়া থাকেন। জানিও—এই নির্ম্মল চিদাত্মাই সর্ব্ববীজের বীজ, সমস্ত সংসারের সার ও সর্ব্বকর্ম্মের মধ্যে উত্তম কর্ম্ম। ইনি নিখিল কারণের কারণ হইলেও অকারণ ও অনাবিল। যত কিছু ভাবনীয় পদার্থ আছে, তৎসমস্তের ইনি ভাবনস্বরূপ। ইনি অভবাত্মক এবং সকলের

ইনি অভাবনীয়। ইনি সমস্ত বুদ্ধিবৃত্তির প্রকাশক এবং চৈতন্যাত্মক জীবের অন্তরে ইনিই চিৎসার-স্বরূপে বিরাজমান। ইনি স্বয়ং প্রত্যক্-স্বরূপে অবস্থান করেন—করিয়া বুদ্ধিবৃত্তির ব্যাপ্তিবশে সমস্ত বাহ্য বেদ্য বস্তুর প্রকাশ করিয়া থাকেন। সমস্ত বেদ্য বস্তুর অধিষ্ঠান তত্ত্বস্বরূপে ইহাঁর অবস্থান। ইনি সতত একরূপে বিরাজ করেন—করিলেও মায়াবশে বহুরূপে বিভাবিত হইয়া থাকেন। যত কিছু জ্যোতিঃ আছে, সকলেরই ইনি জ্যোতিঃস্বরূপ। এই আত্মা নির্ম্মল ও অলৌকিক; তাই কদাচ কাহারও ইনি অবলোকনীয় নহেন। তত্ত্বদর্শিগণ পরিজ্ঞাত আছেন, এই চিদাত্মা বিমল ও প্রকাশস্বরূপ; ইনি একমাত্র বীজ হইয়াও বহুবীজরূপে বিরাজমান। ক্ষিতিপ্রভৃতি যত কিছু ভূত আছে, তাহাদের একটীও ইহাতে অবস্থিত নাই। ব্যবহারিকই বল, অসত্যই বল; আর প্রাতিভাসিকই বল, এই ত্রিবিধ অবস্থা হইতেই ইনি পরিমুক্ত। জগৎসত্তা ও আদি সত্তার বাধ-ঘটনায় যাহা সাক্ষি-চিন্মাত্ররূপে পর্য্যবসিত হয়, জানিবে—ইনিই সেই চিন্মাত্র। ইনি রঞ্জনের বীজাবস্থায় রাগাত্মা, বিষয়স্মরণে চিত্তক্ষোভক বলিয়া রঞ্জক এবং বিষয়সম্বন্ধে রঞ্জন। ইনি স্বয়ং আকাশস্বরূপ বটেন, তথাচ সহসা একটা সুশোভিত প্রাচীরাকারেও পরিদৃষ্ট হইয়া থাকেন। এই চিদাত্মা চিত্তরূপে বিকাশ প্রাপ্ত; ইহাঁতে কত কোটি কোটি জগৎ মরুমরীচিকাবৎ স্ফুরিত হইতেছে, হইবে ও হইয়াছে। ইনি স্বপ্রকাশ; ইঁহাতে এই জগৎপ্রপঞ্চ ইঁহারই সত্তামাত্রে সুসম্পন্ন হইলেও বাস্তব পক্ষে কিছুই হইতেছে বলিয়া বলা যায় না। যেমন অগ্নির উষ্ণতা অগ্নি হইতে পৃথক্ নহে, তেমনি এই জগৎ ঐ চিৎ হইতে ভিন্ন নহে। ইনি নিজোদরে মহামেরু ধারণ করেন, মহামেরুকে আচ্ছাদন করিয়া অবস্থান করেন, অথচ তত্ত্বজ্ঞগণ ইঁহাকে পরমাণুর ন্যায় সূক্ষ্ম বলিয়াই জ্ঞান করিয়া থাকেন। ইনি মহাকল্পকে নিজোদরে ধারণ করেন, তথাচ ইনি নিমেষনামে নির্ব্বাচিত হন। ইনি সমস্ত কল্পকাল আক্রমণ করিয়া অবস্থান করেন—করিলেও নিমেষ-নিশ্চিত কালত্ব ইঁহার পরিত্যাজ্য নহে। ইনি কেশাগ্রবৎ অতি সূক্ষ্মাকার অথচ ইনি সমগ্র মহীমণ্ডল ব্যাপিয়া বিরাজমান। ইহার শেষ সীমা কোথায় আছে, তাহা এই সপ্তসাগররূপ বসনধারিণী ধরিত্রীও

পরিব্যাপ্ত করিতে পারেন নাই। ইনি এ সংসারের রচয়িতা নহেন, অথচ ইনিই ইহার কর্ত্তৃত্বভাগী হইয়াছেন। ইনি সমস্ত মহৎ কর্ম্মের কর্ত্তা হইয়াও অকর্ত্তা। ইনি দ্রব্য হইয়াও অদ্রব্য; কোন দ্রব্যই ইঁহাতে নাই অথচ ইনি দ্রব্যশালী। ইনি কায়-বিগ্রহিত; অথচ ইনি মহাকায় বলিয়া নির্ব্বাচিত। পক্ষান্তরে ইনি মহাকায় বা ব্রহ্মাণ্ডদেহ ধারণ করিলেও কায়শূন্য বলিয়া কথিত। ইনি অদ্য শব্দ-বাচ্য ষষ্টিঘটিকাত্মক হইলেও প্রাতঃ অর্থাৎ তৎপূর্ব্ববর্ত্তী ত্রিমুহূর্ত্ত মাত্র; আবার পরমার্থ পক্ষে দেখিতে গেলে দেখা যাইবে, ইনি অদ্য, আদ্য মুহূর্ত্ত বা প্রাতঃ কিছুই নহেন। অথচ ইহাকে অদ্য এবং প্রাতঃ উভয় বলা যায়। 'ভিণ্ডি' 'ভিণ্ডি' 'খিলে মত্ত' 'পুরু-পিচ্ছিল' 'সালঘ' 'চিবিৎ' 'চলিং' 'সদালো' 'কালাসো, 'গুলুগুলু' 'শিলী' ইত্যাদি করিয়া যত কিছু অনর্থক কথা আছে, তাহাও ইহার নিকট সত্য হইতে পারে। অধিক কথা কি, বেদাদি শাস্ত্রের কথা যেমন সত্য, ঐ সকল কথাও তেমনই সত্যরূপে পরিণত হইতে পারে। এ জগতে এমন কোন বিষয়ই দেখি না, যাহা ইহাতে সত্য হওয়া অসম্ভব এবং এমন বস্তু কিছুই নাই, যাহা ইনি নহেন বা হইতে পারেন না। বলিতে কি, আকাশ-কুসুমাদি সম্পূর্ণ ই অলীক; সেই সকল অলীক পদার্থও ইহাঁতে সত্য হইতে পারে। ইনি সর্ব্বময়; সর্ব্বত্রই সর্ব্বরূপে ইহাঁর অবস্থান। এ ত্রৈলোক্যে ইনি ভিন্ন আর কিছুই নাই।

হে মুনে! যাঁহাতে সকল, যাঁহা হইতে সকল, যিনি সকল, সকল হইতে যিনি, এবং যিনি সকলস্বরূপ, সেই সর্ব্বাত্মাকে নমস্কার। তিনিই একমাত্র সমস্ত। তাঁহাতে আরোপক্রমে অসতেরও সত্তা হইয়া থাকে। যত কিছু অনর্থক শ্লোক আছে, সে সমস্তও তাঁহাতে সার্থক হইয়া পড়ে।

ষট্‌ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৩৬॥

সপ্তত্রিংশ সর্গ।

ঈশ্বর কহিলেন,—যে সর্ব্বেশ্বরের অনুগ্রহগুণে নানাপ্রকার অনর্থক বাক্য বা শ্লোকাবলীর অর্থও সত্য বলিয়া প্রতীত হয়, সেই সর্ব্বজগতের সত্তারূপ মণির পেটিকাস্থানীয় মায়াশবল ব্রহ্মে কোন্ বিমলাভাস শক্তির না বিকাশ হইয়া থাকে? তিনি আত্মা—চিদাকার পরম মণি, তাঁহাতে যে সকল বীজশক্তি বিচিত্র বিশ্বের আরোপ করিতেছে, তাহাদের প্রকাশ স্পষ্টতই হইয়া থাকে। সেই ঐশী চিৎসত্তাই ধান্যাদি বীজ-কণিকার অভ্যন্তরে অবস্থান করে,—করিয়া মৃত্তিকা, জল ও কালাদি সহকারী কারণের সহায়তায় প্রথমতঃ অঙ্কুরোৎপাদন করিয়া থাকে; অনন্তর তণ্ডুল ভাবে পরিণত হইয়া ওদন হইয়া পড়ে। এই চিৎশক্তিই রস সামান্য-রূপে জলের ফেন ও আবর্ত্তমধ্যে বিরাজ করেন,—করিয়া কঠোর শিলাদি-সহ উচ্চ স্থান হইতে নিম্ন স্থানে নিপতিত জলাকারে বিভাত ও রসনেন্দ্রিয়-যোগে লৌল্য প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ইনিই কুসুমগুচ্ছের অভ্যন্তরে মকরন্দরস গন্ধ-রূপে বিরাজ করেন,—করিয়া প্রাণেন্দ্রিয়ে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া নাসাদ্বয়কে উৎফুল্ল করিয়া তুলেন। যেমন কোন শূন্য শৈল ক্রমশ সমুৎপন্ন তৃণ-লতাদি দ্বারা সমাচ্ছন্ন হইয়া কালবশে লোকাবাসে পূর্ণ হইয়া উঠে এবং তখন যেমন একটী নূতন লোকালয় সৃষ্টিরূপে প্রতিভাত হয়, তেমনি ঐ চিৎসত্তা শিলার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া শিলা হইতে স্বতন্ত্র সত্তাহীনভাবে ভাসমান শিলাস্বরূপকে ব্যবহারিক সত্তায় সত্য' করিয়া থাকেন। পিতা যেমন পুত্রকে আত্মানুরূপ জ্ঞান করেন,—করিয়া তাহার সাহায্যে স্বীয় কার্য্য উদ্ধার করিতে চেষ্টান্বিত হন, তেমনি ঐ চিৎসত্তা প্রথমে পবনরূপ স্পন্দকোষময় হন,—হইয়া তদবস্থায় উপনীত নিজ হইতে লব্ধোৎপত্তি ত্বগিন্দ্রিয়কে স্পর্শ-জ্ঞানার্থ প্রবর্ত্তিত করিয়া থাকেন। চিৎ-সত্তার স্বস্বরূপ মোক্ষ; তাহাকে প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত উনি আপনাকে সর্ব্ব জগতের সম্মিলিত সত্তা-সমষ্টিস্বরূপ একরূপ ভাবনা করিবার পর

সমস্ত প্রপঞ্চকে আকাশবৎ শূন্য করিয়া ফেলেন। ঐ চিৎশক্তি কাল-নামক নির্ম্মল আকার ধারণ করেন; তদবস্থায় ঐ কালকল্প-নিমেষাদি লাঞ্ছনে লাঞ্ছিত হইয়া আকাশ-মুকুরের অভ্যন্তরে চিৎসত্তার স্বীয় প্রতিবিম্ব-বৎ প্রতীত হইয়া থাকেন। কি ব্রহ্মা, কি বিষ্ণু, কি মহেশ্বর, কি সদাশিব, এ সকল নাম কেবল শক্তির উৎকর্ষের তারতম্য-মূলক; পরন্তু সকলেই উঁহারা পরিণামশীল। সর্ব্বকার্য্যের ব্যবস্থাপিকা মূলশক্তির ঐ সকল নাম-ভেদ মাত্র। 'ইহা এইরূপ আর ইহা এইরূপ নহে' এই প্রকারে স্বয়ং নিয়তিই সমুৎপন্ন হইতেছে। তিমির-পরিবৃত রজনীযোগে গৃহাভ্যন্তরে প্রদীপ জ্বালিলে গৃহমধ্যস্থ বস্তুনিচয় যেমন প্রকাশিত হয়, তেমনি ঐ অপরিমিত চিৎজ্যোতিতেই এই জগৎরূপ চিত্ত-পরম্পরা প্রকাশ পাইতেছে। পরমাকাশ যেন একটা নগর, এই নগরের নাট্যশালায় ঐ নিয়তি নিজশক্তি-সম্পাদিত সংসার-নাটকের অভিনয় দেখিতে দেখিতে সাক্ষিস্বরূপে অবস্থান করিতেছেন।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে জগন্নাথ! চিদাত্মা শিবের শক্তি কি? ঐ শক্তি কিরূপে রহিয়াছে? উহার সাক্ষীভাব কি প্রকার? এবং উহার সংখ্যা ও কার্য্যই বা কিয়ৎপরিমাণ? তাহা আমার নিকট প্রকাশ করিয়া বলুন।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে সাধো! পরমাত্মা শিব—চিন্মাত্রস্বরূপ, শান্ত, সর্ব্বময়, নিরাকার ও অপ্রমেয়। তাঁহার ইচ্ছাসত্তা, ব্যোমসত্তা, কালসত্তা, নিয়তিসত্তা, মহাসত্তা এবং জ্ঞানশক্তি, ক্রিয়াশক্তি, কর্তৃত্বশক্তি ও অকর্তৃত্ব-শক্তি প্রভৃতি কত অসংখ্য শক্তি আছে, তাহার অন্ত নাই।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে দেব! এই শক্তিপুঞ্জ কোথা হইতে কিরূপে আসিয়া পরমাত্মায় প্রাদুর্ভূত হইল? এবং এই শক্তিসমূহের বহুত্ব হইল কিরূপে? কিরূপে ইহাদের উদয় হয় এবং ভেদাভেদই বা ইহাদের কি প্রকার?

ঈশ্বর কহিলেন,—শিব—চিন্মাত্র ও অনন্তরূপ; তদীয় মায়িক বিকল্প-কল্পনাপ্রযুক্ত চিদ্ভেদই শক্তিনামে নিরূপিত। ঐ শক্তি বাস্তব পক্ষে চিৎ হইতে ভিন্ন নহে; তবে যে তাহা বিভিন্নবৎ প্রতীত হয়,

সে কেবল কল্পনারই খেলা। জলের তরঙ্গ, বীচি ও লহরী এ সকল বিভিন্ন হইলেও জলাকারে যেমন অভিন্ন, তেমনি জ্ঞাতৃত্ব, কর্ত্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব বা সাক্ষিত্ব প্রভৃতি সেই সেই কল্পনায় বিভিন্নবৎ প্রতিভাত হইলেও চিৎ-স্বরূপতায় উহারা এক বা অভিন্ন। সুতরাং বিভিন্ন কল্পনার ঘটনাক্রমেই শক্তির ভেদ বা বহুত্ব স্বীকৃত হইয়া থাকে। এ ব্রহ্মাণ্ড বা জগৎ যেন একটা নৃত্য-মণ্ডপ; ইহাতে ঐ শক্তিপুঞ্জরূপ নর্ত্তকদল কালের নিকট ক্রমশ শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া নৃত্য করিয়া থাকে। দ্বিপরার্দ্ধকাল-পরিমিত, তদবান্তর কল্প ও তদবয়ব কালাবচ্ছিন্ন যে শক্তি, তাহাই নিয়তি নামে নির্দ্দিষ্ট। ঐ নিয়তি আবার ঈশ্বরের ক্রিয়া, যত্ন, ইচ্ছা বা কাল ইত্যাদি নানা নামে নিরূপিত হইয়া থাকে। যত কাল মহারুদ্রের অবস্থান, ততদিন পর্য্যন্ত 'ইহা এইরূপেই স্থিত' এবম্বিধ নিয়মে অবস্থান এবং তৃণাগ্র হইতে ব্রহ্মার স্পন্দ পর্য্যন্ত এইরূপে নিরবচ্ছিন্ন নিয়মন-নিবন্ধন ঐ শক্তি নিয়তি নামে নির্দ্দিষ্ট। যতদিনে না তত্ত্ববোধ দ্বারা ঐ নিয়তি মার্জ্জিত হইয়া যায়, ততদিন উহা নিরুদ্বেগে নৃত্য করে এবং জগৎ-পরম্পরা-নাটকের অভিনয় করিতে থাকে। নিয়তির তথাবিধ নৃত্য কিম্বা অভিনয় নানা রস-বিলাসে পরিপূর্ণ এবং বিবর্ত্তরূপ আঙ্গিক অভিনয় দ্বারা চিত্তাকর্ষণশীল। উহার ঐ অভিনয়-ব্যাপার যখন ভঙ্গ হইয়া যায়, পুষ্করাবর্ত্ত নামক বহু বাদ্যযন্ত্র প্রলয়ের সেই মুহূর্ত্তে বিদ্যুদাঘাতে বাদিত হইয়া থাকে। এই ব্রহ্মাণ্ডই নিয়তির নাট্যমঞ্চ; সকল ঋতুজাত সকল প্রকার কুসুমসমূহে এ মঞ্চ সমাকীর্ণ। ভূয়োভূয় বারিধারা-বর্ষণ অভিনয়দর্শীদিগের গাত্র-নিঃসৃত স্বেদবিন্দুবৎ পরিলক্ষিত। এই নাট্যমঞ্চের অভিনেত্রী নিয়তির পরিধেয় বসন—নীলাম্বর। মেঘমালারূপ দশা-বিস্তারে ঐ অম্বর সুশোভন।' নানা রত্নযুত সপ্ত সাগর ঐ অভিনেত্রীর হস্তবলয়বৎ বিভাত। প্রহর, দিবস ও পক্ষ প্রভৃতি ঐ অভিনেত্রীর কটাক্ষপাত; এইরূপ কটাক্ষপাত দ্বারা ঐ অভিনেত্রী অম্বর-তলের শোভা বিস্তার করে। কুলাচল সকল উহার কিরীটাদি শিরোভূষণ; এই ভূষণসমূহ নৃত্যভঙ্গিমায় কখন নামিত বা কখন উন্নামিত হয়। প্রসন্ন পুণ্যজল-বাহিনী ভাগীরথী উহার ত্রিগালম্বিত হার-গুচ্ছ; গঙ্গাজল-বিম্বিত চন্দ্রমা ঐ হারগুচ্ছ-নিহিত চন্দ্রকান্ত মণি।

সন্ধ্যাকালীন অম্বুদ উহার কর-পল্লব; এ পল্লব কখন প্রকট এবং কখন অন্তর্হিত। এই ত্রিভুবনস্থ জনগণ ঐ নিয়তি নাম্নী অভিনেত্রীর গাত্রভূষণ; এই সকল ভূষণ নিরন্তর ঝঞ্ঝনায়িত হয় বলিয়া নিয়তির নাট্যমঞ্চ নিয়ত অতি মনোরম। এই ভূতল, পাতাল, নভোমণ্ডল, এ সকলই ঐ নিয়তি-নটীর পাদক্ষেপ-ভূমি। তারকাপুঞ্জ উহার গাত্রগলিত স্বেদবিন্দু; উহা কখন উদ্গত এবং কখন বিলয় প্রাপ্ত হয়। ঐ নটীর গগনরূপ বদনে রবি-শশিরূপ কুণ্ডলদ্বয় দোলায়মান। ব্রহ্মাণ্ড-কপাট ঐ নিয়তি-নটীর চন্দ্রাতপ। অসুর-তাড়িত লোক সকল উহার মুক্তাগুম্ফিত উত্তরীয় বসন। সুখ-দুঃখ দশা ঐ নাট্যমঞ্চের অভিনেত্রীর রসভাব-বিকাশ।

হে মুনে! এই নানাকার ভঙ্গীবহুল নিয়তিবিলাস—সংসার-নাটকের অভিনয়-ব্যাপারে পরমেশ্বর সতত সর্ব্বসাক্ষিরূপে একই ভাবে বিরাজিত। তিনি ঐ নটী বা নাটক হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ঐ উভয়ের সহিত কোনই সম্বন্ধ তাঁহার নাই।

সপ্তত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩৭ ॥

অষ্টত্রিংশ সর্গ

ঈশ্বর কহিলেন,—আমি প্রথমে যে পরম দেবতার বিষয় বর্ণন করিলাম, তিনিই নিত্য পূজনীয়। তিনি চিদ্ঘন; অনুভূতিই তাঁহার স্বরূপ। তিনি সর্ব্বগামী এবং তিনিই সকলের আশ্রয়। কি ঘট, কি পট, কি শকট, কি অবট, কি মানব, তিনি সর্ব্বত্র সর্ব্বপদার্থে, সর্ব্ব জীবে অবস্থিত। শিব, হরি, হর, ব্রহ্মা, ইন্দ্র, কুবের, যম ইত্যাদি নানা নামে নানারূপে তিনিই পূজিত হইয়া থাকেন। তিনি সর্ব্বাত্মা; সকলের অন্তরে বাহিরে সর্ব্বদা তিনি বিরাজমান। সুবুদ্ধি-সম্পন্ন সাধকসম্প্রদায় সেই ভগবান্ পরম দেবকে বিবিধ বিধানে, বিবিধক্রমে পূজা করিয়া থাকেন।

হে মহাবুদ্ধে! যেরূপ ক্রমে তাঁহার বাহ্য পূজা বিহিত হইয়া

থাকে, তাহা অগ্রে বলিতেছি ; শ্রবণ কর। অনন্তর আন্তরিক পূজা-ক্রম বলিব, শ্রবণ করিও। এই যে দেহগৃহ দেখিতেছ, ইহা শাস্ত্রোক্ত সংস্কার ও স্নানাচমনাদি দ্বারা পবিত্র হইলেও যত্নের সহিত পরিত্যাজ্য। এ দেহের সাক্ষী চিন্মাত্ররূপে যে অববোধ, তাহাই পরম পবিত্র ; যত্নের সহিত পরিশোধন করিয়া তথাবিধ দেহই গ্রাহ্য। কেন না তত্ত্ব বিজ্ঞানবশে দেহের যে প্রকার শুদ্ধি হয়, স্নান কিম্বা আচমনাদি দ্বারা সেরূপ শুদ্ধি ঘটে না। এ সম্বন্ধে স্থূল কথা এই যে, যাহা ভাবশুদ্ধি, তাহাই প্রকৃষ্ট শুদ্ধি ; স্নান আচমনাদি সে শুদ্ধির সহায়ক মাত্র। অন্তরে ধ্যান করাই এই পরম দেবের পূজা ; ইহা ভিন্ন ইঁহার পূজার অন্য ক্রম কিছুই নাই। অন্য প্রকার যে পূজা, তাহা তাঁহার পূজাবিষয়ক একটা প্রসঙ্গ মাত্র। সুতরাং এই কথাই স্থির যে, ধ্যান দ্বারাই ঐ ভুবনাধার দেবের পূজা করা সর্ব্বদা কর্ত্তব্য। তিনি দেব—চিদাকার ; তিনি লক্ষ লক্ষ সূর্য্যের ন্যায় সমুজ্জ্বল ; নিখিল প্রকাশের তিনি প্রকাশকর্ত্তা। এই যে বিশোধিত চিৎপ্রকাশ, ইহাই অহন্তাবের সারাংশ। সুতরাং ইহাকে আশ্রয় করাই সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। পরমাকাশ অপার অনন্ত ; তাহার যে বিপুল বিশালতা, তাহাই এই পরম দেবের গ্রীবাদেশ। যাহা অধোগত অনন্ত আকাশকোশ, তাহাই উঁহার চরণপঙ্কজ। ঐ যে অনন্ত অপার দিঙ্মণ্ডল, উহাই উঁহার ভুজমণ্ডল। এতদীয় হৃদয়কোশের কোণদেশে কত অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড-পরম্পরা বিশ্রান্ত রহিয়াছে। ইহার বিশালদেহ প্রকাশময় এবং তাহা পরমাকাশের তলদেশে বিরাজমান। ইহার চারিদিকে, অন্তরালে, ঊর্দ্ধে ও অধোদিকে ব্রহ্মা, ইন্দ্র, হরি, রুদ্র ও ঈশ প্রমুখ দেবেন্দ্রবৃন্দ বিরাজ করিতেছেন। যে সকল ভূত আছে, তৎসমস্ত ঐ পরম দেবের পরম দেহবৎ পরিজ্ঞেয়। ইচ্ছা প্রভৃতি শক্তিপুঞ্জ ঐ পরমদেবের শরীরগত নাড়ী বলিয়া বিদিত। ঐ সকল শক্তি বিবিধ আরম্ভের বিধাত্রী এবং ত্রিজগৎরূপ যন্ত্রের রজ্জুস্থানীয়া। এই যে পরম দেবতার স্বরূপ বলিলাম, ইনি সর্ব্বদা সাধুগণের পূজাস্পদ। ইনি সর্ব্বাধার ও সর্ব্বগামী। ইঁহাকে অনুভূতিময় চিৎস্বরূপ বলিয়াই নির্ণীত করা হয়। ঘট, পট, মঠ, অবট, শকট, ভিত্তি, মনুষ্য, পশু, সর্ব্ব-পদার্থে সর্ব্বজীবে ইনি বিরাজমান। শিব বল,

হরি বল, হর বল, ব্রহ্মা বল, ইন্দ্র বল, যম বল, কুবের বল, ইনিই সকল; ইনিই নানামূর্ত্তিধর—অনন্ত পদবাচ্য। যদি ভেদবুদ্ধি পরিত্যাগ করা হয়, তাহা হইলে বুঝা যাইবে, ইনিই একমাত্র সত্তামূর্ত্তি। এই সত্তামূর্ত্তি ব্যতীত ইহাঁর রূপান্তর আর কিছুই নাই। যিনি কাল-দেব এই জগৎপরম্পরার বিবর্ত্তনকারী, তিনি ইহার দ্বারপাল। শৈল-বন-পরিব্যাপ্ত এই নিখিল ভুবনময় ব্রহ্মাণ্ড ইহাঁর মায়াশবলিত অংশবিশেষের একদেশ। সুতরাং উহা ইহাঁর দেহাবয়ব বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। ঐ মহাদেব—সহস্রনেত্র, সহস্রকর্ণ, সহস্রশিরা, সহস্রবাহু ও শান্তমূর্ত্তি; এই মহাদেবই একমাত্র চিন্তনীয়। ইহাঁর দর্শনশক্তি সর্ব্বগামিনী, ঘ্রাণশক্তি সর্ব্বগামিনী, স্পর্শশক্তি সর্ব্বগামিনী, রাসনশক্তি সর্ব্বস্পর্শিনী এবং শ্রবণ ও মননশক্তিও দূর-প্রসারিণী। ইনি সর্ব্বপ্রকার মননাতীত; এবং সর্ব্বাপেক্ষা পরম শিব-স্বরূপ। ইনি সর্ব্বদা সর্ব্বব্যাপারের কর্ত্তা এবং সমগ্র সঙ্কল্পিত বস্তুর প্রদাতা। ইনি দেব—সর্ব্বময়, নিখিল ভূতের অন্তরে বিরাজমান এবং ইনিই সকলের একমাত্র সাধ্য বস্তু।

এইরূপে এই দেবাধিদেবকে চিন্তা করিয়া পরে যথাবিধি ইহাঁকে অর্চ্চনা করা কর্ত্তব্য। হে ব্রহ্মবিদ্গণের বরেণ্য! এই সম্বিৎস্বরূপ দেবকে যাদৃশ উপচার দ্বারা পূজা করা কর্ত্তব্য, তোমার নিকট সেই উপচারবিধি বলিতেছি, শ্রবণ কর। এই পরম দেবতার পূজা করিতে হইলে, কি ধূপ, কি দীপ, কি কুসুম, কি চন্দন, কি কুঙ্কুম, কি কর্পূর, কি অন্নাদি দান, কি ঐশ্বর্য্য-নিবেদন, কি অন্যান্য বিবিধ বিচিত্র উপকরণ, এ সকলের কিছুরই আবশ্যক হয় না। যাহা অনায়াস-লভ্য, শীতল, অবিনশ্বর, আত্মবোধ-সুধা, সেই সুধা দ্বারাই কেবল ইহাঁর পূজা করিতে হয়। ঈদৃশ পূজাই ইহাঁর পরম ধ্যান এবং ইহাই ইহাঁর পরমার্চ্চনা। যাহা বিশুদ্ধ চিন্মাত্ররূপে অন্তরে বিরাজিত, তথাবিধ আত্মেশ্বর দেবকে পরমাস্বাদময় বিশুদ্ধ ধ্যান-সুধা দ্বারাই শয়নে, স্বপনে, দর্শনে, শ্রবণে, স্পর্শনে, ভোজনে, ঘ্রাণে, নিশ্বাসত্যাগে, কথাপ্রসঙ্গে এবং আদান ও দান ব্যাপারে, সর্ব্ব-কালেই পূজা করা কর্ত্তব্য। ঐ পরম দেবের ধ্যান-ব্যাপারে একাগ্রতার সহিত যে চেষ্টা করা হয়, তাদৃশ চেষ্টাই এই দেব-পূজার কুসুমরূপে

নির্দ্দিষ্ট। ধ্যানই ইহাঁর পূজাকার্য্যের প্রকৃষ্ট উপহার, ধ্যানই ইহাঁর অর্চ্চনাব্যাপার,—এবং ধ্যানই ইহাঁর পূজার পাদ্য। ধ্যানাভিব্যক্ত সম্বেদনই ইহাঁর পুষ্প। বলিতে কি, ঐ পরমদেবের পূজার সমস্ত উপকরণই একমাত্র ধ্যান। ধ্যান ব্যতীত ঐ পরমাত্ম-দেবতার সাক্ষাৎকার লাভ কিছুতেই ঘটে না। এই আত্মার স্বরূপ-প্রকাশরূপ যে অপার অনুগ্রহ, তাহা একমাত্র ধ্যানবলেই লভ্য।

হে সুমতে, মুনিপ্রবর! দেহাভিমানী স্বীয় গৃহে যেমন ভোগ সকল উপভোগ করেন, তেমনি এই আত্মদেব ধ্যানের প্রভাবেই প্রসন্ন হইয়া সমুদায় বিষয় ভোগ করিয়া থাকেন। যদি মূঢ় ব্যক্তিও ত্রয়োদশ নিমেষ-ব্যাপী কাল পর্য্যন্ত এই পরমেশ্বরকে পূজা করে, তবে তাহার গো-দানের ফল লাভ হইয়া থাকে। মানব যদি শত নিমেষকাল পর্য্যন্ত এই পরম প্রভু পরমাত্মার পূজা করে, তবে তাহার অশ্বমেধযজ্ঞের ফল লাভ হইয়া থাকে। যে জন অর্দ্ধঘটিকা সময় যাবৎ এই আত্মদেবতার অর্চ্চনা করে, তাহার সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়। এক ঘটিকা যাবৎ ধ্যানোপহারে আত্মা দ্বারা আত্মাকে পূজা করিতে পারিলে, রাজসূয় যজ্ঞের ফল লাভ হইয়া থাকে।

এইরূপে যদি অর্দ্ধ দিবস যাবৎ পূজা করা হয়, তাহা হইলে নর একলক্ষ রাজসূয় যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হইতে পারে। এইরূপ একদিবস-ব্যাপী পূজাকার্য্যে মানব পরমোত্তম কৈবল্যধামে বাস করে। পূর্ব্বে যেরূপ ধ্যানের বিষয় বলা হইল, পরমাত্মদেবের এই প্রকার ধ্যানই পরম যোগশব্দে কথিত। এইরূপ ধ্যানই সর্ব্বোত্তম ক্রিয়া। আত্মদেবতার এই উত্তম বাহ্য পূজাক্রম কীর্ত্তিত হইল।

হে আত্মস্বরূপিন্ মুনিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ! যাহাতে নিখিল পাপ ব্যাহত হয়, তথাবিধ পবিত্র পূজা যে মানব অক্লিষ্টচিত্তে ক্ষণেকের তরেও সমাধা করিতে পারে, সে আমার ন্যায় মুক্ত পুরুষ হয়,—হইয়া আত্মপদ লাভ করিতে সক্ষম হইয়া থাকে এবং সুরাসুর-নর সকলেই তাহার পূজার জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করে।

অষ্টত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৩৮॥

ঊনচত্বারিংশ সর্গ।

ঈশ্বর কহিলেন,—যিনি নিখিল পবিত্র অপেক্ষা পবিত্র, যাঁহাতে সমস্ত তমোভাবের অবসান, এক্ষণে আত্মদেবতার সেই আভ্যন্তর পূজার বিষয় বলিব,—শ্রবণ কর। কি শয়ন, কি স্বপন, কি গমন, কি অবস্থান, কোন সময়েই ঐ আভ্যন্তর পূজার বাধা নাই। এই আন্তরিক পূজাও ধ্যানাত্মিকা; ইহা সর্ববিধ ব্যবহার-দশাতেই নিষ্পন্ন হইতে পারে। যিনি শরীরস্থ নিখিল ব্যবহারকর্তা পরম শিব, সতত অন্তরে সেই দেবকেই এ পূজায় ধ্যান করিতে হয়। তিনিই সন্নিধিমাত্রে সমুদায়ের কর্তা ও বোধয়িতা; শয়ন, উত্থান, গতি, স্থিতি, স্পর্শ ও অস্পর্শ ইত্যাদির প্রয়োজয়িতা একমাত্র তিনিই এবং তিনিই ভোগরাশির কর্তা এবং ভোক্তা। যে কিছু বাহ্য পদার্থ আছে, এতৎসকলই সেই জ্ঞানময় পরম শিবের রচনা। তিনিই নিখিল কার্য্যের স্বরূপপ্রদ এবং দেহরূপ লিঙ্গাভ্যন্তরে শান্তভাবে বিরাজিত। এই বোধলিঙ্গ বা আত্মদেবকেই উহাঁর মৃৎকাষ্ঠাদিময় লিঙ্গান্তর পরিহারপূর্ব্বক পূজা করিতে হয়। এইরূপ পূজায় তদীয় যথাপ্রাপ্ত স্বরূপ জ্ঞানেরই আবশ্যক। প্রারব্ধ কর্ম্মফলের প্রবাহে পড়িয়া ভোগ-ব্যাপারে অবস্থাননিবন্ধন বিশুদ্ধি লাভে সক্ষম না হইলেও বিশুদ্ধ আত্মবোধরূপ স্নান দ্বারা বিশুদ্ধি লাভ করত নিত্য বোধরূপ উপচার-যোগে উল্লিখিত বোধলিঙ্গের পূজা করা কর্ত্তব্য। এই আত্মদেবতার ঈদৃশ পূজাকালে কখন ইহাঁকে গগন-মণ্ডলোদ্ভাসয়িতা আদিত্য-মণ্ডলাকারে ভাবনা করিতে হইবে। কদাচিৎ চন্দ্র-ভাবনায় ইহাঁকে চন্দ্রাকারে উদীয়মান বলিয়া ভাবিবে। ভাবিবে,—এই যে কিছু প্রাতিভাসিক পদার্থ আছে, এতৎসমুদায়ের মধ্যে ইনিই সম্বিৎস্বরূপে বিরাজমান। ইনিই দেহগত বায়ুযোগে প্রাণাকারে সুষ্মার্গে প্রবাহিত হইতেছেন। শব্দাদি যে কিছু বিষয় আছে, ইনিই তাহাকে স্বীয় আনন্দরসে আপ্লুত করিয়া মধুররূপে আস্বাদন করিয়া থাকেন। ইনি প্রাণ ও অপান-পবনরূপ

রথারোহণপূর্ব্বক প্রাণ ও হৃদয়-তরঙ্গের সহায়তায় বিচরণ করেন? ইনি হৃদয়-নিহিত গুহার গহ্বরে প্রচ্ছন্নরূপে বিহার করিয়া থাকেন। যত কিছু জ্ঞেয় দৃষ্টি আছে, তৎসমুদায়ের ইনি জ্ঞাতা; যত কিছু কর্ম্ম, তৎসমুদায়ের ইনি কর্ত্তা, যত কিছু ভোজ্য দ্রব্য, তৎসমস্তের ইনি ভোক্তা এবং যত প্রকার সম্বিৎ বা অনুভব, তাহার ইনি স্মরণকর্ত্তা। ইনি সর্ব্বাঙ্গে চেতনা সঞ্চার করত প্রকাশ পাইতেছেন। যত কিছু বিষয় আছে, তৎসমুদায়ের ভাবনা ও অভাবনা, উভয় অবস্থাতেই ইনি লক্ষিত হইয়া থাকেন। যত কিছু প্রকাশস্বরূপ, তৎসকল অপেক্ষাও ইনি প্রকাশময়। ইনি সর্ব্বব্যাপী ও শিবময়। এই আত্মদেবতা এই প্রকারেই চিন্তনীয়। অপিচ ইহাঁকে আরও এইরূপে চিন্তা করিবে যে, ইনি নিষ্কল হইলেও স-কল, দেহস্থ হইলেও ব্যোমচর এবং অরঞ্জিত হইলেও রঞ্জিত। ইনিই সর্ব্বাঙ্গব্যাপী বোধরূপী। মনের যাহা মননশক্তি, তন্মধ্যে ইহাঁর অবস্থান। প্রাণ ও অপানপবনের মধ্যে ইহাঁর আবির্ভাব। হৃদয়, কণ্ঠ ও তালু, এতৎসমুদয়ের মধ্যে ইনি বিরাজমান। ভ্রূদ্বয়ে ও নাসাপুটে ইহাঁর যাতায়াত। শৈব শাস্ত্রের যে ষট্‌ত্রিংশৎ তত্ত্ব প্রসিদ্ধ, সেই সকল তত্ত্বের চরম স্থানে ইহাঁর অধিষ্ঠান। অন্তরে ইনি শব্দাদি বিষয়সমূহের দ্রষ্টা এবং ইনিই মনো-বিহঙ্গের ইতস্ততঃ পরিচালয়িতা। সবিকল্প ও নির্ব্বিকল্প, এই দ্বিবিধ বাক্‌পথেই ইনি অবস্থিত। যেমন তিলরাশির প্রত্যেকটীর মধ্যেই তৈল-সম্বন্ধ আছে, তেমনি ইনি সর্ব্বাবয়বের অভ্যন্তরেই বিদ্যমান রহিয়াছেন। কোনওরূপ কলা বা কলঙ্ক ইহাঁতে নাই; পরন্তু পঞ্চভূতমাত্রার স্থূলদেহ-রূপে পরিণতিক্রমে ইনিই আবার মূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাকেন। যদিও ইনি সকল দেহেই অবস্থান করেন বটে, তথাচ হৃদয়পদ্মের একদেশেই ইহাঁর অবস্থান। যদিও বিমল প্রকাশ চিন্মাত্রই ইহাঁর স্বরূপ; তথাচ বহুল অধ্যাস-কল্পনার ইনিই একমাত্র অধিষ্ঠান। অনুভূতিরূপে ইনিই সর্ব্বত্র প্রত্যক্ষীভূত হইয়া থাকেন। আবার এমনও সময় হয়, যখন ইনি স্বীয় আত্মস্বরূপ বিস্মৃত হইয়া যান এবং পরে প্রত্যক্ চেতনভাব লাভ করিয়া ভোগাকাঙ্ক্ষী হইয়া উঠেন। ইনি আপনা হইতেই স্বাতিরিক্ত পদার্থ-পরম্পরার আকার ধারণ করেন,—করিয়া ক্ষণমধ্যেই যেন দ্বৈত

ভাব উপগত হইয়া থাকেন। এই অবস্থায় ক্রমশঃ ইহাঁর কর, চরণ ও কেশ-নখাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ-সংস্থান হয়; ইনি তখন দেহিরূপে পরিচিত হইয়া এই প্রকার ভাবনায় বিভোর হইয়া পড়েন যে, এই ত বিবিধ ব্যবহার-বতী বিচিত্র মনঃশক্তিপুঞ্জ সতত আমার উপাসনায় নিরত রহিয়াছে। মনঃশক্তিসমষ্টির এ হেন উপাসনার দৃষ্টান্ত পক্ষে পত্নীগণ-কৃত উত্তম পতির পরিচর্য্যার বিষয়ই উল্লেখ্য। মন মদীয় দৌবারিকের কার্য্যে নিযুক্ত আছে। সে আমাকে ত্রিজগতের যাবতীয় ঘটনা বিজ্ঞাপিত করিতেছে। এই ত চিন্তা; ইনি আমার দ্বারস্থিতা শুদ্ধরূপা প্রতি-হারীর পদে অধিষ্ঠিতা। বুদ্ধি আমার শক্তিস্থানীয়া; ক্রিয়া আমার কমনীয় মূর্ত্তি কামিনীর ন্যায় বিরাজিতা। সমস্ত জ্ঞান আমার সর্ব্বাঙ্গের ভূষণস্বরূপ। কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয়গণ মদীয় দ্বাররূপে বিরাজমান। আমি—অনন্ত আত্মস্বরূপ; আমার আকৃতির সীমা পরিসীমা নাই। আমি পূর্ণ একাদ্বয় আত্মস্বরূপে অবস্থিত হইয়া সমস্ত বস্তু-পরম্পরার পূরণ-কর্ত্তা।

যে পূজক আত্মদেবতার এবম্বিধ স্বচ্ছ প্রত্যক্‌ভাবের পরিচয় পাইতে পারেন, তিনি অন্তরে দেবভাবে পূর্ণ হইয়া অদীনভাবে অবস্থান করিয়া থাকেন। সেই পূজক ব্যক্তিকে তখন আর অস্ত বা উদয় প্রাপ্ত হইতে হয় না। তিনি তখন না সন্তুষ্ট, না কুপিত, না ক্ষুধার্ত্ত, না তৃপ্তিসম্পন্ন, কিছুই হন না; তিনি যে, কোন বিষয়ের আকাঙ্ক্ষা বা পরিহার করেন, তাহাও নহে। তথাবিধ পূজক জন অন্তরে সমভাব লাভ করেন এবং জীবন্মুক্ত ব্যক্তির তুল্য ব্যবহারী ও তুল্যাকৃতি হইয়া সর্ব্বত্র সমদর্শিরূপে বিরাজ করিতে থাকেন। সেই মহামনা পূজক তৎকালে সৌম্যাবস্থায় উপনীত হন; সর্ব্বতোভাবে শুভাচার হইয়া থাকেন। যতদিন দেহের স্থিতি, ততদিন পর্য্যন্ত তিনি অপরিচ্ছিন্ন একাত্মা হইয়া বিরাজ করেন।

এইরূপে পূজক পুরুষ ক্রমিক উপচয় অনুসারে অহর্নিশ দেবপূজার অনুষ্ঠান করিতে থাকেন। যিনি চিন্ময় আত্মা, তিনিই ঐ পূজকের পূজ্য দেবতা। সর্ব্বগামিনী সমবুদ্ধির প্রসঙ্গে যথাপ্রাপ্ত বস্তুর সাহায্যেই ঐ পূজক ব্যক্তি চিন্ময় দেবের উপাসনা করিয়া থাকেন। পূর্ব্বেও বলিয়াছি,

এখনও বলিতেছি, এই আত্মদেবতার পূজায় বিশেষ কোন উপকরণ আয়োজনের প্রয়োজন নাই। সম্মুখে যে বস্তু মিলে—বাহ্য বা আভ্যন্তর সকল প্রকার বস্তু দ্বারাই তাঁহার পূজা হইয়া থাকে। তাঁহার পূজায় গন্ধ পুষ্পাদি উপচার উপকরণ সংগ্রহ করিবার জন্য কিছুমাত্র আয়াস স্বীকারেরই প্রয়োজন নাই। যে যেরূপ জাতি হইয়া জন্মিয়াছে; শাস্ত্র-বাক্য তাহার যাদৃশ অধিকার নির্দ্দেশ করিয়াছে, সে পুরুষ তাহার অনুরূপ স্বস্ব অভীষ্ট বস্তু দ্বারা সেই পরমোত্তম পরমেশ পরমাত্ম-দেবতার পূজা করিবে। যাঁহার প্রভূত বিভব ও প্রচুর ঐশ্বর্য্য আছে, কি শয়ন, কি আসন, কি যান, কি বাহন, কি ভক্ষ্য-ভোজ্য ও অন্নপানাদি সামগ্রী সম্ভার, সমস্ত বস্তু দ্বারা সর্ব্বকালেই তিনি যথালব্ধ শান্তিময় আত্মদেবতার অর্চ্চনা করিবেন। যে ব্যক্তি কান্তা-জনের ভোগবিলাসী ও নানা সুরস সুমিষ্ট ভক্ষ্য-ভোজনে আসক্তিশালী, তাদৃশ ব্যক্তি আত্মস্বরূপ সমধিগত হইয়া স্বীয় সর্ব্ববিধ সুখসামগ্রীসম্ভার উপহারস্বরূপ প্রদানপূর্ব্বক আত্ম-দেবতার অর্চ্চনা করিবে। যে মানব আধি-ব্যাধির নিপীড়নে মোহপঙ্কে মগ্ন হইয়া থাকে, সে তাহার দুঃখরাশিই উপহার দিয়া আত্মদেবতার পূজা করিবে। এ জগতে সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা করিয়া সর্ব্বসাধারণে যত কিছু বস্তু প্রাপ্ত হইতে পারে, সকলেই তাহার নিজের নিজের বস্তু এবং জীবন, মরণ ও স্বপ্নাদির যে কোন অবস্থা তাহাদের অভীষ্ট, সেই সেই বস্তু এবং সেই সেই অবস্থা দ্বারাই তাহারা আত্মদেবতার অর্চ্চনা করিতে পারে। যে দরিদ্র ব্যক্তি, সে তাহার দারিদ্র্য দিয়া আত্মদেবতার অর্চ্চনা করিবে; আর যিনি রাজা—তিনি তাঁহার রাজ্য অর্পণ করিয়াও আত্মদেবতার অর্চ্চনা করিতে পারেন। এইরূপ পূজার সামগ্রী প্রদান করিবার ব্যবস্থাই বিহিত আছে। যত বিচিত্র জাগতী চেষ্টা, তৎসমস্তই আত্মদেবের পূজার পুষ্প; সেই সকল পুষ্প দ্বারাই শুদ্ধাত্মার পূজা করিতে হয়। ফল কথা, ইহাই শাস্ত্রের উপদেশ যে, যিনি যেরূপ অবস্থায়ই থাকুন, তাঁহাকে তাদৃশ অবস্থার উপহার দিয়াই আত্মদেবের অর্চ্চনা করিতে হয়। যে জন স্ব স্ব পুত্র-কলত্রাদি পরিজনের সহিত কলহ করিয়া কাল কাটাইয়া থাকে, শান্ত সুন্দর আত্মদেবের অর্চ্চনা করিতে হইলে তাঁহাকেও আপনার মনোবৃত্তি—রাগ-দ্বেষাদিই উপহারস্বরূপ অর্পণ করিতে

হয়। যাহা সর্ব্বভূতে সমতাপ্রদর্শিনী মিত্রতা, তাহাই আত্মদেবের অর্চ্চনার প্রধান উপকরণ; এই উপকরণই যাহাতে সংগ্রহ করা যায়, তাহারই চেষ্টা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। শান্ত আত্মদেবের অর্চ্চনা করিতে গিয়া সাধুগণ অনুক্ষণ অন্তরে যাহাকে স্থান দান করেন, এবং সুধাকরের স্থায় যাহা মাধুর্য্যময়, তথাবিধ মৈত্রীযোগেই আত্মার অর্চ্চনা করা বিধেয়। মৈত্রী, করুণা, উপেক্ষা ও মুদিতা প্রভৃতি বিশুদ্ধ চিত্ত-পরিকর্ম্ম সাহায্যেই আত্মদেব অর্চ্চনীয়। নিখিল ভোগরাশির মধ্য হইতে যাহা সহসা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, যাহা চিরদিন স্থির আছে, ঈদৃশ যথালব্ধ বিষয় দ্বারাই আত্মদেবতার অর্চ্চনা করিতে হয়। যাহা বৈধ এবং নিষিদ্ধ, তথাবিধ ভোগরাশির ত্যাগ বা তাহাতে নিতান্ত আসক্তি, যাহার যাহা ইষ্ট, তাহা দ্বারাই বিশুদ্ধ আত্মদেবের পূজা কর্ত্তব্য। কাঙ্ক্ষিত কিম্বা অকাঙ্ক্ষিত, যুক্ত কিম্বা অযুক্ত, ত্যক্ত কিম্বা গৃহীত, যাহার যাহা অভিপ্রেত, সে তাহারই সাহায্যে প্রভু আত্মদেবের অর্চ্চনা করিবে। যাহা একান্ত নষ্ট, তাহা উপেক্ষা করিবে; যাহা প্রাপ্ত, তাহা সংগ্রহ করিয়া লইবে।

এইরূপে নির্ব্বিকার-চিত্তে যথালব্ধ বস্তু দ্বারাই আত্মদেবতার অর্চ্চনা হইয়া থাকে। স্থূল কথা, ইষ্টানিষ্ট যাবতীয় বিষয়েই পরম সাম্যভাব স্থাপন করিয়া অহরহ আত্ম-পূজা-ব্রত অবলম্বন করিবে। এ বিশ্ব সকলই ব্রহ্ম, এই প্রকার বুদ্ধিযোগ অবলম্বন করিয়া সকলই অতিশুভ বলিয়া ধারণা করিবে। অপিচ এ বিশ্বসংসার ব্রহ্ম-সম্বলিত মায়াময়; সুতরাং জানিবে—ইহা শুভাশুভ উভয়াত্মক।

এইরূপে সকলই আত্মময় করিয়া লইবে, পরে আত্মপূজা-ব্রতে নিরত হইবে। আত্ম-পূজা করিতে হইলে যাহা আপাতত মনোরম বা আপাত মাত্রে নীরস, তৎতাবৎ সমান বলিয়া জ্ঞান করিবে। এইরূপ করিয়া আত্মপূজায় ব্রতী হইবে। 'এই সেই আমি, আর এই সেই আমি নহি' এবম্প্রকার বিভাগ কল্পনা পরিহার করিবে। অপিচ 'সমস্তই ব্রহ্ম' এইরূপ নিশ্চয় করিয়া আত্মপূজায় নিরত হইবে। সতত সকল প্রকার আকার ও বিকারময় যথালব্ধ বস্তু দিয়াই সর্ব্বথা আত্মদেবতার পূজা করিতে হয়। যাহা অনিষ্ট, তাহাকে ত্যাগ করিবে এবং যাহা ইষ্ট, তাহাকেও

পরিহার করিবে; অথবা ইষ্টানিষ্ট উভয়কেই আত্মজ্ঞানে অঙ্গীকার করিয়া তাহারই দ্বারা নিয়ত আত্মদেবতার অর্চনা করিতে হইবে। সমুদ্র যেমন সরিৎসমূহের কামনা বা পরিহার কিছুই কখন করে না, কেবল ঘটনাক্রমে উপনীত হয় বলিয়া তাহাদিগকে ভোগ করিয়া থাকে, তেমনি বাঞ্ছা এবং বিসর্জ্জন এই উভয়বিধ বুদ্ধি পরিহারপূর্ব্বক বিজ্ঞ ব্যক্তি দৈবক্রমে স্বভাবতই সমুপাগত ভোগরাশি উপভোগ করিবেন। কি তুচ্ছ, কি অতুচ্ছ, উভয়-বিধ বিষয়-দৃষ্টি-জনিত উদ্বেগ সম্পূর্ণ বিদূরিত করিবে; কদাচ উদ্বেগের আশ্রয় লইবে না। আকাশ যেমন বিতত বিচিত্র পদার্থোপরি পতিত হয়, তেমনি তুচ্ছ বা অতুচ্ছ বিষয়ের জন্য স্বভাবতঃ উদ্বেগ বা হর্ষ সঞ্চার হইলেও তাহার অনুসরণ করা বুদ্ধিমানের অকর্ত্তব্য। দেশ, কাল ও ক্রিয়ার সহযোগিতায় যে শুভ বা অশুভ সমাগম ঘটে, তাহাকে নির্ব্বিকার-ভাবে গ্রহণ করিতে হইবে এবং তাহার সাহায্যে আত্মদেবের অর্চনা করিবে। এই আত্মপূজার ব্যবস্থায় যে সকল বিভিন্ন উপচার কল্পিত হইল, তৎসমস্ত এক প্রকার সমানরূপে ও সমান-রসেই আস্বাদন করিবে। সে সকল না অম্ল, না কটু, না তিক্ত, না কষায়, না অন্য রসময়;—এইরূপে বিচিত্র রস-মিশ্রিত হইলেও তাহারা কেবল মধুর বলিয়াই বিবেচ্য। কেন না, বিচিত্র রসস্থিত যে সমত্ব, তাহাই সমধিক মাধুর্য্যময়। রসশক্তি ইন্দ্রিয়ের অগোচর; তথাবিধ সমভাবগত রসশক্তির যোগে ভাবিত বস্তু ক্ষণমধ্যেই অমৃতময় হয়। সমতারূপ সুধা দ্বারা যাহা মাখিয়া লওয়া যায়, সুধাকর হইতে গলিত নূতন সুধার ন্যায় তাহা একান্তই মধুর হইয়া থাকে। সর্ব্বত্র একমাত্র ব্রহ্মবস্তু-দর্শনই সমতা; তথাবিধ সমতাগুণে স্বয়ং আকাশ-বৎ নির্ব্বিকারভাবে মনোলয় করিয়া যে স্থিতি, তাহাই মুখ্য পূজা আখ্যায় অভিহিত। যে উপাসক তত্ত্বজ্ঞ হইতে পারিয়াছেন, তিনি স্বচ্ছ পাষাণবৎ কঠিন চিদ্ঘনরূপে পূর্ণচন্দ্রবৎ সর্ব্বত্র সমজ্যোতি ও সর্ব্বত্র পরিপূর্ণ হইয়া রহিবেন। ফল কথা, তত্ত্বজ্ঞ সাধক পুরুষ বাহিরে কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদন করিতে ব্যাপৃত রহিলেও অন্তরে তিনি রঞ্জনারূপিণী কুহেলিকা হইতে নির্ম্মুক্ত থাকেন,—থাকিয়া আকাশবৎ বিশদ ও পূর্ণভাবে বিরাজ করেন। যখন অজ্ঞান-মেঘ সম্পূর্ণ চলিয়া যায়, অহঙ্কাররূপ কুহেলিকার চির

অবসান ঘটে এবং যে সকল হৃদয়বিদারী উপদ্রব, সে গুলি যখন স্বপ্ন-যোগেও দৃষ্টিপথে পড়ে না, বুঝিতে হইবে—তত্ত্ববেদী সাধকরূপ শারদাকাশ তখনই পরিপূর্ণভাবে অবস্থান করিতেছে।

হে মুনে! জীবদ্দশাতেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মপদে তুমি অবস্থান কর। সদ্যঃপ্রসূত শিশুর যেমন ভেদজ্ঞান থাকে না, সকলই যখন তাহার নিকট একইরূপ অবলোকিত হয়, তেমনি এই নিখিল প্রপঞ্চই তুমি বিকল্পজাল-মুক্ত চিদাভাস ও চিত্ত-মূলীভূত শান্ত শিব আত্মময়-ভাবে অবলোকন করিতে থাক। যিনি সূর্য্য, তিনি ভবৎসমীপে আনন্দসুধায় পরিপূর্ণ হওয়ায় নিষ্কলঙ্ক শশধরবৎ প্রতিভাত হউন। প্রমাতা ও প্রমেয়াদি ভাব সকল তোমার মনোবৃত্তি হইতে তিরোহিত হউক। এই যিনি দেহাখ্য আত্মদেব, ইহাঁকে—দেশ, কাল ও ক্রিয়ার বৈচিত্র্যে যত কিছু বস্তু—যত প্রকার সুখ-দুঃখাদি, সকলই উপহার প্রদান করিয়া নিয়ত পূজা কর এবং সর্ব্ব চেষ্টা-বিরহিত বুদ্ধিযোগে আশ্রয় করিয়া বিরাজ করিতে থাক।

ঊনচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩৯ ॥

চত্বারিংশ সর্গ।

ঈশ্বর কহিলেন,—আত্মবিদ্ ব্যক্তির কৃতাকৃত নিখিল কর্ম্মই শিবার্চ্চন-পর; সুতরাং বলা যায়, তুমি যথাকালে যথাশক্তি যে কার্য্য কর বা না কর, তাহাতেই তোমার শান্ত শিব চিন্মাত্র আত্মার অর্চ্চনা করা হয়। এই আত্মদেবতা তথাবিধ পূজা-ব্যাপারেই আহ্লাদিত ও প্রকটিত হইয়া থাকেন। ঐ স্বয়ম্প্রভু আত্মদেব ঐরূপ অর্চ্চনাতেই পারমার্থিক-রূপে প্রগাঢ় আনন্দস্বরূপে প্রকাশমান হন এবং মায়ার আবরণ ভঙ্গ করিয়া থাকেন। রাগ-দ্বেষাদি শব্দে যে অর্থ বুঝিতে পারা যায়, তাহা

নির্ম্মল আত্মায় স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিত নাই। দৃষ্টান্ত স্থলে, বহ্নি হইতে বহ্নিকণার অপার্থক্যের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। 'আমি দরিদ্র, অন্যে রাজা, কিম্বা আমি রাজা, অন্যে দরিদ্র' এই প্রকার জ্ঞান এবং সেই জ্ঞান-জনিত যে সুখ দুঃখাদির অনুভব, জানিবে,—তাহাই প্রকৃত আত্মার অর্চ্চনা। আত্মা নিত্য বস্তু; তাঁহাকে বিশ্বরূপে ভাবনা করাই তাঁহার পূজা। আত্মা বা ব্রহ্মই জাগ্রৎ-স্বপ্নাদিরূপে বিবর্ত্তমান হইতেছেন। তাঁহার ঘটাদিরূপে যেমন বিবর্ত্তন, উক্ত বিবর্ত্তনও তাঁহার সেইরূপই। এ জগৎ সমস্তই একমাত্র শিব শান্ত আত্মস্বরূপ; আত্মার আভাসেই ইহা আভাসমান। তাঁহার সত্তাতেই ইহার সত্তা। আত্মার সত্তা নহিলে এ বিশ্বপ্রপঞ্চের প্রকাশ হওয়া অসম্ভব। এই সমগ্র প্রপঞ্চ আত্ম-সত্তাতেই প্রতীয়মান। এ কারণ বলা যায়, ইহা আত্মস্বরূপেই বিরাজমান। কিন্তু ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের কথা যে, এই আত্মা—ঘট-পট ও মঠাদির আকারে পরিণত অন্য আর একপ্রকার হইয়া গিয়াছেন। ইনি জীবাদির স্বভাবে বিবর্ত্তমান হইয়া নিজের প্রকৃত স্বরূপ একেবারেই ভুলিয়াছেন। অতএব দেখা যায়, সকলই যখন এক অনন্ত আত্মা; তিনিই যখন ব্রহ্ম-স্বরূপে বিরাজমান, তখন পূজ্যই বা কি, পূজাই বা কি, আর পূজকই বা কি? এরূপ ভাব আসিবার সম্ভাবনাই বা কি আছে? এখন ফল কথা এই যে, যদি তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা যায়, তাহা হইলেই এই সকল পূজ্য-পূজাদি ভাব অলীক বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়া থাকে।

হে ব্রহ্মন্! পূজ্য ও পূজাদি ব্যবহার নিয়ত পরিচ্ছিন্নাকারে কল্পিত হয়; কিন্তু প্রকৃত কথা বলিতে কি, শান্ত অপরিচ্ছিন্ন ঈশ্বরে তাহার সম্ভাবনাই নাই। যিনি পূজ্য ও পূজাদিভাবে পরিচ্ছিন্ন, তাঁহাকে কখনই নিত্য নির্ম্মল সর্ব্বশক্তিশালী অনন্ত ঐশ্বর্য্যের পাত্র বলা যায় না।

হে বিভো! আত্মস্বরূপ ঈশ্বর অতি নির্ম্মল চিদাকার; এ ত্রিজগতে তাঁহারই রূপ প্রসারিত। তাঁহার আকৃতি কল্পনা করা উচিত নহে। যে সকল পণ্ডিত এই আত্মতত্ত্ব পরিজ্ঞাত আছেন, তাঁহাদিগকে উপদেশ প্রদান করিবার আর কিছুই নাই। তবে যে সকল অজ্ঞ লোক পরমেশ পরমাত্মাকে দেশ-কালাদি দ্বারা পরিচ্ছিন্ন বলিয়া কল্পনা করে, তাহারাই

উপদেশের পাত্র হইয়া থাকে। আমরা উপদেশ দিতে হইলে তাহা-দিগকেই দিয়া থাকি। তাই বলিতেছি, তুমি তথাবিধ অজ্ঞদিগের পরিচ্ছিন্ন দৃষ্টি পরিহার কর,—করিয়া অবশেষে যে তত্ত্বদৃষ্টির নির্দ্দেশ করিলাম, তাহাই অবলম্বন কর। এইরূপ করিয়া সম, স্বচ্ছ, শান্ত, বিষয়বিরক্ত ও নিরাময় হও,—হইয়া যথালব্ধ বিষয়ের উপভোগপূর্ব্বক অখিন্ন-মনে সুখ-দুঃখ বা শুভাশুভ সমস্তই উপহারস্বরূপ প্রদান করিয়া আত্মদেবতার অর্চ্চনা-কার্য্যে নিরত হও।

হে মুনে! তুমি অধুনা তত্ত্ববিচার করত দেহ হইতে জীবকে পৃথক্ করণানন্তর পরিশোধিত করিয়া লইয়াছ। তত্ত্বজ্ঞ সাধু মহাপুরুষের গুণ-রাশি তুমি লাভ করিয়াছ। যাহা তত্ত্ব, তাহা তোমার অধিগত হইয়াছে; তোমার আর এখন মায়াকলঙ্ক নাই, তাহা একেবারেই মুছিয়া গিয়াছে। এই বাহ্য বিশ্বপ্রপঞ্চের সহিত তোমার আর কোনই সম্বন্ধ নাই; সুতরাং নবনির্ম্মিত স্ফটিকাগারে যেমন কোনও কিছুর লেপ লগ্ন হয় না, তেমনি তোমার মায়াকলঙ্ক নিরস্ত হওয়ায় নিষ্প্রপঞ্চ তোমাতে আর জন্ম দুঃখাদি কিছুই সংলগ্ন হইতেছে না।

চত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪০ ॥

একচত্বারিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে দেব! ব্রহ্ম যদি শিবাদি শব্দের প্রবৃত্তি-নিমিত্তক কোনই ধর্ম্ম স্পর্শ না করেন, তবে তাঁহাকে শিব নামে অভিহিত করা হয় কি নিমিত্ত? তাঁহাকে আত্মা কিম্বা পরমাত্মা নামেই বা নির্দ্দেশ করা হয় কেন? হে ত্রিভুবনপতে! ভগবন্! তিনিই সৎ; অথচ তিনি কিছুই নহেন। আবার তিনিই কিঞ্চিৎ অথচ তিনি অকিঞ্চিৎ—শূন্য। যাহা বিজ্ঞান, তাহাও তিনিই। আমার ইহাও এখন জিজ্ঞাস্য যে, এই সকল ভিন্ন ভিন্ন নামে তাঁহাকে নির্দ্দেশ করা হয় কেন?

ঈশ্বর কহিলেন,—এ জগতে একমাত্র তিনিই আছেন। তিনি সৎ, তাঁহার আদি বা অন্ত কিছুই নাই। কোন পদার্থান্তরের প্রকাশাপেক্ষা তিনি করেন না; তাই তাঁহাকে নিরাভাস ও স্বয়ং জ্যোতিঃ নামে নিরূপিত করা হয়। তিনি সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অগম্য; তাই তাহাকে অকিঞ্চিৎ বা শূন্যাকারে অবস্থিত বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে ঈশ্বর! যাহা বুদ্ধিপ্রভৃতি-সম্পন্ন ইন্দ্রিয়-নিচয়ের দৃষ্টি-বিষয় নহে, কিরূপে তাহা নিঃশঙ্কভাবে লাভ করা যাইতে পারে?

ঈশ্বর কহিলেন,—হে মুনে! পূর্ব্বে যে আত্মবস্তুর বিষয় বলিয়াছি, সে বস্তুর প্রকাশের নিমিত্ত বুদ্ধিপ্রভৃতির আবশ্যক হয় না। যে বুদ্ধিবৃত্তি ব্রহ্মাকারময় ও সাত্ত্বিকভাবে পরিণত, তাহার সাহায্যে অবিদ্যাবরণ ভঙ্গ করিয়া লইতে হয়। যখন অবিদ্যাবরণ ভঙ্গ হইয়া যায়, তখন ব্রহ্মবস্তু আপনা হইতেই প্রকাশ পাইয়া থাকেন। সেই যে স্বয়ম্প্রকাশ, তাহাই তাঁহার সাক্ষাৎকার। এরূপ ব্যাপারে ইন্দ্রিয়বৃত্তির প্রয়োজন কিছুই নাই। রজক যেমন জল দ্বারা মল ক্ষালন করে, তেমনি যিনি মুমুক্ষু,—তিনি শম-দমাদি সাধনার বলে সাত্ত্বিক অবিদ্যাংশরূপে পরিণত হন,—হইয়া ক্রমশঃ সৎশাস্ত্র, সাধুসঙ্গ ও সদ্‌গুরুনামক সাত্ত্বিক অবিদ্যাংশের সহায়তা-গুণে বিশুদ্ধ সাত্ত্বিক অবিদ্যাংশ দ্বারা আপনার অবিদ্যাংশ ক্ষালন করেন,—করিয়া পূর্ণ ব্রহ্মরূপে অবস্থান করিতে থাকেন। যখন ব্রহ্মাকার বৃত্তি দ্বারা সৌভাগ্যবশে কাকতালীয়বৎ অবিদ্যার ক্ষয় হইয়া যায়, তখন আত্মা আপনিই আপনাকে দেখেন,—ইহাই তাঁহার স্বভাব নিশ্চয়। শিশু জন হস্তে অঙ্গার লইয়া অগ্রে হস্ত মলিন করে, পশ্চাৎ ধুইয়া ফেলে, তাহাতে তাহার হস্ত যেমন আপনা হইতেই নির্ম্মল হইয়া যায়, তেমনি সাধুসঙ্গ ও সৎশাস্ত্রাদির অনুশীলনরূপ অবিদ্যাংশ দ্বারা যদি অবিদ্যাংশ বিচার করা যায়, তাহা হইলে কি সাত্ত্বিক, কি তামসিক, উভয়বিধ অবিদ্যাংশই তিরোহিত হয়। তখন সেই স্বপ্রকাশ আত্মাই কেবল নির্ম্মল হইয়া প্রকাশ পাইতে থাকেন। আত্মাই আত্মা দ্বারা আত্মার বিচার করেন, আত্মাই আত্মাকে অবলোকন করেন এবং আত্মাই তখন আত্মস্বরূপ হইয়া অবস্থান

করিতে থাকেন। এইরূপে আত্মাই আছেন, অবিদ্যা নাই। কাজেই অবিদ্যার অভাবই তত্ত্বদর্শী বিবুধগণের অনুভব-সিদ্ধ। কিন্তু যে পর্য্যন্ত এই অবিদ্যারূপ কিঞ্চিৎ নানা বস্তুর অস্তিত্ব থাকিবে, ততক্ষণ আত্মাকে অবগত হইবার সম্ভাবনা কোনক্রমেই নাই। গুরূপদেশাদিকে আত্মজ্ঞান জন্মিবার কারণ বলা যায় না। কেন না, যে গুরুর মুখে উপদেশ পাইয়া আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত হইতে হইবে, তিনিও তো ইন্দ্রিয়-ঘটিত পুর্য্যষ্টকাত্মা বৈ আর কেহই নহেন। আর যিনি ব্রহ্ম, তিনি সমস্তের অতীত বস্তু; যদি সর্ব্বেন্দ্রিয় ক্ষয় হইয়া যায়, তবেই তিনি প্রকাশ পাইয়া থাকেন। কাজেই গুরুকে কিরূপে সেই আত্মজ্ঞানের কারণ বলা যাইতে পারে? দেখ, যাহার অবিদ্যমানতায় যে বস্তু লাভ করা যায়, তাহা থাকিতে কিরূপে তাহার উপলব্ধি হইবে? তবে কি বলিব, গুরূপদেশাদি ব্যর্থ? সে সমুদায়ের প্রয়োজন কিছুই নাই? এ কথার উত্তরে বলিব, না—গুরূপদেশাদি ব্যর্থ নহে। দেখ, তৎসমুদায় আত্মজ্ঞানের কারণ না হইলেও তাহাতে এই মাত্র হয় যে, নিজের কণ্ঠে হার আছে;—সে হারের অস্তিত্ব ভুলিয়া যাওয়ায় পরের উপদেশে যেমন তাহার লাভ হইয়া থাকে, তেমনি গুরূপদেশাদিও আত্মজ্ঞানের সাধক বলিয়া তৎসমস্ত তাহার কারণরূপে বর্ণন করা হয়। এইরূপে শিষ্যজনের হৃদয়-নিহিত অজ্ঞান-অপনয়নের জন্যই গুরূপদেশাদির প্রয়োজন হইয়া থাকে। আত্মা অনির্ব্বাচ্য এবং অদৃশ্য হইলেও যখন গুরূপদেশাদি প্রয়োজন সাধিত হয়, তখন আত্মদেবতা আপনা হইতেই প্রসন্ন বা প্রকাশমান হইয়া থাকেন। স্থূল কথা এই, শাস্ত্রানুশীলন বা গুরূপদেশ দ্বারা আত্মবোধ প্রাপ্ত হওয়া যায় না; আত্মা নিজেই প্রবুদ্ধ হইয়া থাকেন। আত্মার নিজ বোধই তাঁহার স্বভাব। অথচ যদি গুরূপদেশ না পাওয়া যায় বা শাস্ত্রচর্চ্চা না করা হয়, তবে আত্মবোধে আদৌ প্রবৃত্তিই হইবে না। এ জন্য বলা যায়—গুরূপদেশ, শাস্ত্রচর্চ্চা, ইত্যাদির সংযোগ বশতঃ আত্মজ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে। গুরু, শাস্ত্রার্থ ও শিষ্য, এ তিনের সহিত পরস্পর চির-সংযোগ ঘটিলেই দিবসে লোক-ব্যবহারের ন্যায় আত্মজ্ঞান প্রবর্ত্তিত হয়। কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ক্ষয় হইলে ক্ষণভঙ্গুর সুখ-দুঃখাদির উৎপত্তি রহিত হইয়া যায়; তাহা

হইলেই তখন যে অবশেষিত অক্ষয় বস্তু বিদ্যমান থাকে, তাহাই শিব, আত্মা, সৎ ইত্যাদি নামে অভিহিত হয়। যাঁহাতে বাধকালে জগতের সত্তা নাই এবং আরোপদশায় জগতের সত্তা যথায় স্থিরীকৃত হয়, তাহা আকাশ অপেক্ষাও স্বচ্ছ এবং অনন্ত। এই যে অনন্ত নির্ম্মল অধিষ্ঠান-তত্ত্ব, ইহাই সৎশব্দ দ্বারা নির্ব্বাচিত। এই যে বিচিত্র বিশ্ব ও বিশুদ্ধ তত্ত্ব, এতদুভয়ের ঐক্যজ্ঞানরূপ শুদ্ধ অকলঙ্ক আত্মরূপে যাঁহারা অবস্থান করেন, যাঁহারা পরম পদের অদূরে জীবন্মুক্ত ব্যক্তির সমক্ষে বিরাজ করিয়া থাকেন এবং যাঁহাদের সম্পূর্ণ স্বরূপ-বিশ্রান্তি ঘটে নাই বলিয়া যাঁহারা কিঞ্চিন্মাত্র বিশুদ্ধ অবিদ্যাভাগে অবস্থান করেন, সেই ব্রহ্মা, রুদ্র ও ইন্দ্র প্রমুখ সুপণ্ডিত লোকপালগণ, মুমুক্ষুগণ ও মনোমুক্ত মনীষিগণ জীবন্মুক্ত সিদ্ধির নিমিত্ত উপাসকসম্প্রদায়ের বোধ সুবিধার জন্য ও বেদপুরাণাদির প্রকৃত অর্থ মীমাংসার্থ একাগ্রতার সহিত এই নির্নাম ও নীরূপ ঈশ্বরের 'চিৎ' 'শিব' 'ব্রহ্ম' 'আত্মা' 'পরমাত্মা' 'ঈশ' 'ঈশ্বর' এবম্প্রকার ভিন্ন ভিন্ন নাম নিরূপণ করিয়াছেন। ইহারই নাম জগৎতত্ত্ব, ইহাই আত্মতত্ত্ব এবং ইহারই নাম শিবতত্ত্ব। যাহা জগৎতত্ত্ব, তাহাই শিবতত্ত্ব বলিয়া নিরূপিত। হে বশিষ্ঠ! এই স্বতত্ত্বই সর্ব্বদা সর্ব্বরূপে সর্ব্ববস্তুর সর্ব্ব-ভাব-নির্ব্বাহক; এবং ইহাই কেবল ব্রহ্ম-সুখ; ইহা ভিন্ন অন্য অণুমাত্র কিছুই নাই। ইহা নিশ্চয় করিয়া তুমি সুখে অবস্থান কর। দেখ, শিব, আত্মা, পরব্রহ্ম, এই সকল শব্দ দ্বারা যে ভেদজ্ঞান হয়, সে ভেদ বাস্তবিক নহে, তাহা কাল্পনিক। এরূপ কল্পনা প্রাচীনগণই করিয়াছেন।

হে মুনিশ্রেষ্ঠ! তত্ত্বজ্ঞ মানব, এ হেন ভাবে দেবার্চ্চনার অনুষ্ঠান করিলে অস্মদাদি ভৃত্যবর্গ যে পরম পদের আশ্রয় লাভ করিয়াছে, সেই পরম পদেই প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—ভগবন্! এ জগৎ বাস্তব পক্ষে নাই; অথচ ইহা বিদ্যমানবৎ প্রতীত হয় কেন? যেরূপে ইহা আছে বলিয়া অনুভব হয়, সংক্ষেপে তাহা আমার নিকট প্রকাশ করিয়া বলুন।

ঈশ্বর কহিলেন,—জানিবে,—ঐ যে ব্রহ্মাদি শব্দের অর্থ, উহা কেবল চিৎই। এই যে নির্ম্মল আকাশ দেখিতেছ, ইহাও ঐ চিতের

সমীপে সুমেরুবৎ স্থূল। ঐ চিৎ যখন চেত্যভাব লাভ করেন, তখন উনি নাম-সম্বন্ধের যোগ্য হইয়া উঠেন। আবার যাহা নির্ব্বিকল্প, সমাধিসিদ্ধ, চিদানন্দময় একরস-স্বভাব, তাহাতে তিনি যখন অবস্থান করেন, তখন ঐ চেত্যভাব দূরে চলিয়া যায়, ইহাই সুনিশ্চয়। ক্ষণেকের তরে ঐ চিৎ চেত্য-ভাবের ভাবনা করিয়া অহম্ভাবের অনুগমন করিয়া থাকেন। চিত্তের এই অহম্ভাব-লাভ—স্বপ্নে পুরুষের বস্তু গজত্ব প্রাপ্তিরই অনুরূপ। চিত্তের ঐ প্রকার অহম্ভাবের কল্পনা হইতে ক্রমশঃ দেশ ও কালভাবের কল্পনা আইসে। ঐ সকল কল্পনা শূন্যরূপিণী; উহারা ক্রমে ক্রমে ঐ অহম্ভাব-কল্পনার সহচরী হইয়া উঠে। দেশ ও কাল কল্পনা যখন অহম্ভাব-কল্পনায় সমবেত হয়, তখন স্পন্দ-বিজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া ঐ অহম্ভাব-কল্পনা বাতলেখার ন্যায় প্রাণস্পন্দ উপগত হয়। ঐ অবস্থায় উহা জীবসত্ত্ব বা জীবশক্তি নামে নিরূপিত হইয়া থাকে। এই জীবশক্তি তৎকালে 'আমি' এই প্রকার নিশ্চয় করিয়া বুদ্ধিভাব লাভ করেন,—করিয়া অজ্ঞপদে অবস্থান করিতে থাকেন। ঐ সময় শব্দশক্তি, জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি আসিয়া উহাতে স্বস্ব রূপ বিস্তারপূর্ব্বক স্ফুরিত হয়। অনন্তর এই শক্তি-সমষ্টি মিলিত হইয়া সহসা স্মৃতির আনুকূল্য করত মন নামে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। এই মন সঙ্কল্প-পাদপের ভূতাত্মক বীজ। পণ্ডিতগণের মতে ঐ মন আতিবাহিক দেহ নামে নিরূপিত। উহা যখন অন্তঃস্থ ব্রহ্মশক্তিতে পরিব্যাপ্ত হয়, তখন উহা জ্ঞাতৃপদে নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে। এই সময় ঐ মনে কতিপয় শক্তি আসিয়া সমুদিত হয়। ঐ শক্তিগুলি ক্রমানুসারে বাহিরে থাকিয়া প্রকৃত পক্ষে অনুদিত হইলেও উদিত হয়। বায়ুসত্তা, স্পন্দসত্তা, স্পর্শসত্তা, ত্বাচসত্তা, রূপসত্তা-প্রকাশিনী তেজঃসত্তা, রূপসত্তা, জলসত্তা, স্বাদুসত্তা, রসসত্তা, গন্ধসত্তা, ভূমিসত্তা, হেমসত্তা, স্থূল ব্রহ্মাণ্ড-পিণ্ড-সত্তা, দেশসত্তা ও কালসত্তা; এইগুলিই উল্লিখিত শক্তিসমষ্টি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। যেমন বৃক্ষবীজ নিজের অভ্যন্তরে নিজের সহিত অভিন্নভাবে অঙ্কুর ও পত্রাদি ভাব ধারণ করিয়া থাকে, তেমনি মনও ঐ সর্ব্বময় আকার-বিরহিত সত্তা-গুলিকে নিজের সহিত অপৃথক্‌ভাবে ক্রোড়ে লইয়া অবস্থান করে। জানিবে —এতৎসমস্তই পুর্য্যষ্টক এবং ইহাই আতিবাহিক দেহ বলিয়া বিদিত।

হে মুনে! বাস্তবপক্ষে দেখিতে গেলে দেখা যাইবে, সেই যে অপরিচ্ছিন্ন বোধস্বরূপ ব্রহ্ম, তিনিই এই বিবিধ বিভাগসম্পন্ন হইয়া প্রকাশ পাইতেছেন। অজ্ঞদর্শনে দেখা যাইবে, এই সমুদায় এইরূপে সম্পন্ন হইতেছে আর তত্ত্বদৃষ্টিতে দেখা যাইবে, এ সকলের কোন কিছুই সম্পন্ন হইতেছে না। এ সমুদায়কে না জ্ঞান, না জ্ঞানরূপ, বা না চিদাভাসময় চেতন, কিছুই বলা চলে না। সমুদ্র জলরাশির আধার; তাহার গর্ভে যেমন জলের বিবিধ বিলাস হইয়া থাকে, তেমনি ঐ সকল বা ঐ পুর্য্যষ্টক কেবল পরব্রহ্মেই আত্মস্বরূপে স্ফূর্ত্তি পাইতেছে। সত্য কথা এই যে, ঐ ব্রহ্ম হইতে উহার কিছুমাত্র পার্থক্য নাই। এই যে দৃশ্যপ্রপঞ্চ আছে, এ সমুদায়কে যদি আত্মচৈতন্যরূপে জ্ঞান করা যায়, তাহা হইলে উহা একই চেতন আত্মস্বরূপ হইয়া থাকে, আর যদি ইহাকে ভিন্নভাবে ভাবনা করা যায়, তাহা হইলে উহা অচেতন জড়প্রায় হইয়া পড়ে। ফলে, ভাল করিয়া উহাকে জানিতে পারিলে, ঐ সকলই সঙ্কল্প-নগরবৎ অলীক হইয়া থাকে। এই সমুদায় দৃশ্যকে সম্বিৎ বলিয়া পরিজ্ঞাত হইলে একমাত্র শিবভাবই ব্যক্ত হয়; তদ্ব্যতীত অন্য কিছুই প্রতীতির বিষয় হয় না; অতএব অজ্ঞাত অবস্থাতেই এ সকল বস্তু বলা যায়; আর জ্ঞাত অবস্থায় বস্তুর অতীত হইয়া পড়ে। কেহ কেহ বলিতে পারেন, আত্মবস্তু আপনা হইতেই অতি সূক্ষ্ম চিন্মাত্র-স্বভাব; তিনি সঙ্কল্প-বশে নিজের অভ্যন্তরে এই সকল অংশাংশিভাবাক্রান্ত দৃশ্যমণ্ডল দর্শন করেন। যদি এইরূপই হয় অর্থাৎ তাঁহাদের মতে এ সকলই অন্তরে—বাহিরে কিছুই নহে, এইরূপই প্রতিপন্ন হয়; তবে বলা যায়—তাঁহাদের মতেও অদ্বৈত আত্মবাদ সুদৃঢ়। এই স্থূলভাব চিরাভ্যস্ত দৃঢ় সংস্কারের বলেই বহিঃস্থ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। বাহিরে যে রূপাদি সত্তা দেখা যায়, এই দর্শনের দ্বার—চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় সকল। অন্তরে যে অহঙ্কারপুরুষ আছে, তৎসহ কর-চরণাদি অবয়বসমূহের একমাত্র সমাবেশ-ভাবনায় আমি পুমান্, আমি অমুক, আমি পশু, এবম্বিধ জ্ঞানব্যবহার ও তদনুস্থত হর্ষাদি-ব্যবহার সুসম্পন্ন হইয়া থাকে। সত্য দেহ নাই, তথাচ জীবদবস্থায় দেহদর্শনের ব্যাঘাত জন্মে না। দৃষ্টান্ত দেখ, যেমন গন্ধর্ব্বনগর নাই এবং

স্বপ্ন-দৃষ্ট পুরুষও অলীক ব্যাপার অথচ ভ্রমে পড়িয়া গন্ধর্ব্ব নগর ও দ্বিচন্দ্রা-দোষে স্বাপ্ন মনুষ্য দেখিতে পাওয়া যায়, তেমনি কোনও প্রকার দেহের সত্তা প্রকৃত পক্ষে না থাকিলেও ভ্রমের ঘোরেই ইহা কেবল অবলোকিত হইয়া থাকে।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে দেব! এ জগৎ গন্ধর্ব্বনগর ও স্বপ্ন-সংদৃষ্ট নরের ন্যায় অলীক হইলেও দুঃখ প্রদান করে। আমি জিজ্ঞাসা করি, এই দুঃখক্ষয় করিবার উপায় কি আছে? তাহা আমাকে বলিয়া দিন।

ঈশ্বর কহিলেন,—মুনে! একমাত্র বাসনাই সর্ব্বদুঃখের হেতু; জগতের সত্তাতেই ঐ বাসনার উৎপত্তি। যখন এ জগতের বিদ্যমানতা একেবারেই থাকিবে না,—মরুমরীচিকায় জলের ন্যায় এ জগৎ সম্পূর্ণই অলীক বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে, তখন কে কাহার বাসনা পোষণ করিবে এবং বাসনাই বা কোথা হইতে জন্মিবে? তখন বুঝিতে হইবে, বাসনাদি কিছুই কোথাও নাই। দেখিয়াছে কি কেহ,—কোথাও কোন স্বপ্ননর মৃগতৃষ্ণাজল পান করিয়াছে? দ্রষ্টা, মন, মননাদি ধর্ম্ম ও অহম্ভাবময় জগৎতের অবিদ্যমনতায় যাহা একমাত্র সৎ, সেই ব্রহ্ম বস্তুই পরিদৃষ্ট হইয়া থাকেন। বাসনা, বাস্য ও বাসক কিছুই কুত্রাপি নাই। নিখিল সঙ্কল্প-ভ্রম বিদূরিত; একমাত্র কৈবল্য বা মুক্তিই বিদ্যমান। এ সংসার সত্য আর মিথ্যা যাহাই হউক, যাঁহার নিকট ইহা চিরতরে বিলীন, তাঁহার কাছে কৈবল্য ভিন্ন অন্য অবশিষ্ট কি থাকিতে পারে? যে স্থান শূন্যময়, যথায় জনপ্রাণী নাই, সেখানে যেমন মিথ্যা বেতালোৎপত্তি হয়, তেমনি এই যে জগদাখ্য চিত্তবাসনা, ইহাও অলীক উৎপন্ন বৈ আর কিছুই নহে। যদি এই বাসনার শান্তি ঘটে, তবে তখন এমন এক শান্তির অভ্যুদয় হয়, যাহা চিরতরে অখণ্ড বা অনপায় হইয়া থাকে। অহম্ভাবে, জগতে এবং মৃগতৃষ্ণাজলে যে ব্যক্তি আস্থাস্থাপন করে, সে অবোধ, ধিক্কারেরই পাত্র; তাহাকে কখনই উপদেশের পাত্র বলা যায় না। যাহার বিবেক আছে, তত্ত্ববিদ্‌গণ তাদৃশ জীবকেই উপদেশ দিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি অজ্ঞানে উন্মত্ত ও ভ্রমাচ্ছন্ন হইয়া মিথ্যা দেহাদিতে অভিমান-সম্পন্ন, সে প্রবীণ হইলেও বালক; আর্য্যগণ সেই মিথ্যাভিমানী ব্যক্তিকে উপদেশ প্রদান করেন না;

তাঁহারা তাহাকে উপেক্ষাই করিয়া থাকেন। যদি চ কেহ ঐ অজ্ঞ জনকে উপদেশ প্রদান করেন, তবে বলা যায়, ঐ উপদেষ্টার কর্তৃত্বে কোন কনক-কান্তি কন্যা কোন এক স্বপ্নদৃষ্ট যুবকের করেই সম্প্রদান করা হয়।

একচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪১ ॥

দ্বিচত্বারিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে বিভো! আপনি বলিয়াছেন, জীব জীবদ্দশায় দেহভ্রম অবলোকন করে। এক্ষণে অবশিষ্ট জিজ্ঞাস্য এই যে, ঐ জীব সৃষ্টির প্রারম্ভে আকাশে থাকিয়া কিরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হয়?

ঈশ্বর কহিলেন,—হে মুনে! স্বপ্নাবস্থায় নর যেমন সূক্ষ্মতম নাড়ী-পথে বিস্তৃততম ব্রহ্মাণ্ড দর্শন করে, তেমনি জীব পরে উল্লিখিতরূপে পরম সূক্ষ্ম চিদাকাশেই স্বীয় দেহ অবলোকন করিতে থাকে। জীবের ঐ দেহ পরব্রহ্ম হইতেই নিষ্পন্ন হয়। চিন্ময় ব্রহ্ম সর্ব্বগত, সর্ব্বত্র অবস্থিত, ও সর্ব্বশক্তি-সম্পন্ন; সুতরাং তাঁহা হইতে কোনও সৃষ্টিই অসম্ভব নহে। যেমন স্বাপ্ন নর স্বাপ্ন জগৎ সৃষ্টি করে,—করিয়া তন্মধ্যে রথ-গজ-তুরগাদি দেখে, তেমনি ঐ আদি দেহী জীবও আপনাতে ব্রহ্মাণ্ড সৃজন করেন। ঐ জীব যে রূপে সৃষ্টি করেন, অদ্যাপি তাঁহার সে রূপ প্রসিদ্ধ আছে। সেই আদি পুরুষ জীব কোন কোন সৃষ্টিতে 'আমি অব্যক্ত সনাতন পুরুষ' এইরূপে আপনাকে প্রথিত করিয়া থাকেন। এই প্রকারে প্রথম-সম্ভূত জীব কোন সৃষ্টিতে সদাশিব নামে প্রসিদ্ধ এবং কোন কোন সৃষ্টিতে বিষ্ণু নামে নিরূপিত হইয়া থাকেন। এই বিষ্ণুনামধেয় জীবের নাভি-নলিন হইতে যে জীবের উৎপত্তি হয়, তিনি পিতামহ নামে প্রথিত হন। কোন সৃষ্টিতে তিনি পিতামহ নাম গ্রহণ করেন, এবং কোন কোন সৃষ্টিতে তিনি ঐ নাম পরিত্যাগ করিয়া অপর কোন নামে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকেন। সেই পুরুষ সঙ্কল্পময়; তিনি সঙ্কল্পবশেই মূর্ত্তিমান্ হইয়া থাকেন। তাঁহার

প্রথম সঙ্কল্পই মনোমূর্ত্তি ধরিয়া যে যে বিষয়ের কল্পনা করে, তাহা তৎক্ষণাৎ তদাকারে অনুভব করিতে থাকে। অর্থাৎ যিনি সদাশিবাখ্য প্রথম পুরুষ, তিনি কেবল সঙ্কল্পময়;—মায়িক সঙ্কল্পরূপেই তাঁহার অবস্থান; তদীয় সমস্ত সঙ্কল্প সূক্ষ্ম ভূতাদি সৃষ্টি দ্বারাই পরিপুষ্ট হইয়া উঠে। অনন্তর উনি সমষ্টিমনোরূপে অবস্থান করেন। সমস্ত ব্যষ্টি মন সমষ্টি-মনেরই অন্তর্নিবিষ্ট। এই ব্যষ্টি ও সমষ্টিমনোরূপী হিরণ্যগর্ভ প্রভৃতি মূর্ত্তি যখন যে যে ভুবন বা যে যে প্রজাদির কল্পনা করে, তৎক্ষণাৎ সেই সেই ভুবন ও সেই সেই প্রজাদি তাঁহার সাক্ষাতে স্ফুরিত ও ব্যবহার-ক্ষম হইয়া থাকে। এই যত কিছু সঙ্কল্পময় বস্তু, এতৎসমস্তই অসম্যক্-দর্শনে শূন্য বেতালবৎ মিথ্যা এবং ভ্রমদৃষ্টিতে সমস্তই সত্য বা সৎ হইয়া থাকে। এইরূপে অহন্তাবই সত্য মিথ্যা জগদাকারে বিস্তার পায় এবং উল্লিখিত-রূপেই সেই আদি পুরুষ স্বসৃষ্ট পদার্থের দ্রষ্টা হইয়া থাকেন। আবার স্বস্বরূপের পর্য্যালোচনায় নিমেষ মধ্যেই চিদাকাশ মাত্রে পর্য্যবসিত হন; অপিচ স্বীয় স্বরূপের বিস্মৃতি-ঘটনায় তিনিই আবার নিমেষ মাত্রে অনন্ত সংসারভাবে পরিণত হইয়া থাকেন। দেখ, যাহাকে কল্পকাল বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়, কল্পনার প্রভাবে তাহাও নিমেষ এবং যাহা নিমেষ, তাহাও কল্পনার উৎকর্ষে কল্প হইয়া পড়ে। ফলে যেমন কল্পনা, তেমনই অনুভব উপস্থিত হয়। প্রতিভাসের বৈপরীত্য-মাত্রেই নিমেষই কল্প এবং কল্পই মহাকল্প-পরম্পরা অনুভব করিয়া থাকে। প্রতি পরমাণুতে পরমাণুতে, প্রতি আকাশে আকাশে, প্রতি ক্ষণে ক্ষণে—সৃষ্টি, কল্প, মহাকল্প, ভাব ও অভাব সকল সমুদিত হয়। পরস্পর বাসনার একত্ব নিবন্ধন কোন কোন সৃষ্টি জীবগণের পরস্পর একই সময়ে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। কোন কোন সৃষ্টি পরস্পরের দৃষ্টিপথে পতিত হয় না। সেই সকল বিভিন্ন প্রকারের সৃষ্টি জীবগণের কেবল বাসনানুসারেই হয়; কাজেই দর্শন ও অদর্শনাদি ব্যবহার জীবগণের বাসনানুসারেই সত্য হইয়া পড়ে। এ স্থলে দর্শন বলিতে রূপভেদের কল্পনা এবং অদর্শন বলিতে রূপবিশেষের অকল্পনাই বুঝিতে হইবে; সুতরাং যাহা অদৃশ্য, তাহাও অধিষ্ঠানাংশে সত্য। আত্মা সৎস্বরূপ; তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকার ঘটিলে,

কোন স্থষ্টিই দৃষ্টিগোচর হয় না। কেন না, জীব স্থষ্টিরূপে অবস্থিত হইলে তাঁহারই নিকট এই স্থষ্টি সম্ভাবিত ও সত্য হইয়া পড়ে। যিনি পরমার্থ-স্বভাব পরমাকাশ, তাঁহাতে উহা সম্ভাব্য নহে। এই স্থষ্টিপ্রবাহ তাঁহাতে আকাশস্বরূপেই পরিণত হইয়া যায়। এই স্থষ্টিপ্রবাহ সৎ ও অসৎস্বরূপ; অজ্ঞান-নাশে ইহার লয় হয়। মনে কর, স্বপ্নে একটা পর্ব্বত দেখা গেল, যেমন স্বপ্ন ভাঙ্গিল, অমনি সেই পর্ব্বত যেমন লয় পাইল, তেমনি যেইমাত্র অজ্ঞানভঙ্গ হয়, অমনি ঐ স্থষ্টিপ্রবাহও বিলয় পাইয়া যায়। ঐ স্থষ্টিপ্রবাহ দেশ বা কাল কিছুই আক্রমণ করে না; উহার কর্তৃত্বও কিছুই নাই। উহাকে সৎস্বরূপ বলিয়াও ব্যাখ্যা করা যায় না। কোন প্রকার কাল্পনিক সত্তাও এই স্থষ্টিপ্রবাহে নাই। ইহার যে ক্ষণিক সত্তা আছে, তাহাও বলা যায় না। অতএব এই স্থষ্টি-পরম্পরার জন্ম বা নাশ কিছুই নাই। একমাত্র চিৎই আছেন। তিনিই আপনাতে সঙ্কল্পাকারে এই সমস্ত প্রপঞ্চবৈচিত্র্য বিস্তার করেন। স্বপ্ন-নির্ম্মিত নগরী যেমন পতন ও উৎপতনস্বভাব হয়, তেমনি এই জগদ্বিস্তারও পতিত বা উৎপতিত হইতেছে। সঙ্কল্প-কল্পিত শৈল দ্বারা অনন্ত দেশ-কালাদি যেমন আক্রান্ত হয় না, তেমনি এই স্থষ্টি দ্বারা দেশ-কালাদি কিঞ্চিন্মাত্রও আক্রান্ত নহে। যেমন মনে মনে সুমেরু কল্পনা করিলে, সেই কল্পিত সুমেরু দ্বারা দেশ-কালাদির কোন একটা অংশবিশেষ আক্রান্ত না হইলেও মনে হয় যেন উহা দ্বারা দেশ-কাল আক্রান্ত রহিয়াছে, তেমনি এই যে মিথ্যাময় অনন্ত জগৎ, ইহা দেশ কিম্বা কালাদি আক্রমণ করিয়া না রহিলেও অজ্ঞান-অবস্থায় মনে হয় বটে যে, এ জগৎ যেন দেশ-কালাদি আক্রমণ করিয়া রহিয়াছে। যেমন দেশ-কালাদি বস্তুকল্পে অসৎ, তেমনি এই সমগ্র জগৎও বস্তুতঃ অসৎ বৈ আর কিছুই নয়। সেই যে আত্ম-নামধেয় আদি পুরুষ, তিনিই স্বীয় সঙ্কল্পবলে এ সকল করেন ও করিয়াছেন। সেই পুরুষই স্বীয় সঙ্কল্প দ্বারা কীট, পতঙ্গ, স্থাবর ও জঙ্গম-জাতিরূপে পরিণত। চতুর্ব্বিধ ভূতজাতির উৎপত্তি এইরূপই। কি উচ্চ কল্পে রুদ্র, কি নীচ কল্পে তৃণস্তম্ব, সকলই সেই মায়াময়ের সঙ্কল্পকণে সমুৎপন্ন। সঙ্কল্প বা বাসনার সূক্ষ্মতানুসারে কেহ অণু এবং উহার বৈপুল্যে কেহ বা মহৎ;

অতীত বা ভবিষ্যৎ সৃষ্টিতেও চরাচর জীবজাতির উৎপত্তিপ্রকার এইরূপই ছিল এবং হইবে। ইহাই সংসারমায়ার ক্রম; অভ্যাসবশে উল্লিখিত ক্রমের যে উপশান্তি, তাহাই শিবপদ-বাচ্য। ফলে, যাহা পরমার্থ তত্ত্ব, তাহার সহিত সাক্ষাৎকার ঘটিলে যখন এই সংসারমায়া-বৈচিত্র্যের বিলয় ঘটে, এবং সর্ব্ববিধ ভেদ উপশান্ত হইয়া যায়, তখনই অভ্যাসগুণে শান্তিময় পরব্রহ্মে বিশ্রান্তি লাভ হয়। চিৎশক্তিময় শিব যদি নিমেষের শতাংশের একাংশ-পরিমিত কালও স্বরূপ হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়েন, তবে তাহা হইতেই অনন্ত কল্পবিস্তৃত অনর্থ-পরম্পরার উদয় হইয়া থাকে। চিৎস্বরূপে যে প্রতিষ্ঠা, তাহারই নাম ব্রহ্মভাব। এই ব্রহ্মভাব তত্ত্বজ্ঞ জনের অনুভবগম্য এবং চিদাত্মাতেই উহার অবস্থান। ঐ চিৎস্বরূপই অনাদি অনন্ত স্বপ্রকাশ আত্মা বা ব্রহ্মশব্দে প্রথিত হইয়া থাকে। এই সৃষ্টিপ্রবাহ যখন প্রৌঢ়ভাব ধারণ করে, তখন আর মহাচিতের বিকাশ থাকে না। অর্থাৎ যেমন যেমন মিথ্যাভিমানের উপচয় ও তদনুযায়িনী সৃষ্টি প্রাদুর্ভূত হয়, তেমনি তেমনি চিদ্‌বিলাসেরও হ্রাস প্রাপ্তি ঘটে।

হে মুনে! মিথ্যা দিক্, দেশ ও কালাদিরূপ পরিচ্ছেদ দ্বারা আত্মার পরমাণুভাব পরিস্ফুট হয়। ক্রমশঃ চিদাত্মার পরিচ্ছিন্ন ভাব ভূততন্মাত্রের সহিত মিলিত হইলে দেব, দানব, তরু, লতা ও হরিণাদি জন্তুরূপে প্রাদুর্ভূত হয়। অর্থাৎ চিদাত্মার পরিচ্ছেদ দ্বারাই তাঁহার ক্ষুদ্র—মশকাদি ভাব, বৃহৎ—গজাদিভাব, শ্রেষ্ঠ—সুরাদি ভাব এবং অশ্রেষ্ঠ—অসুরাদি ভাব উপগত হইয়া থাকে। এ বিশ্ব এইরূপে সৎ ও অসৎস্বরূপ। যাহা বিশ্বগামী, বিশ্বকর্ম্মা নিত্য বিতত অনন্ত অব্যয় ব্রহ্মপদ, তাহাতে এ বিশ্ব কুসুমস্রজের ন্যায় গুম্ফিত রহিয়াছে। সেই ব্রহ্ম দূরে নহেন, নিকটে নহেন, ঊর্দ্ধে নহেন, অধোদিকে নহেন বা অন্য কুত্রাপি সংলগ্ন নহেন। তিনি আমার বা তোমারও নহেন; তিনি না পূর্ব্ব, না অপূর্ব্ব, না অদ্য, না প্রাতঃ কিছুই নহেন; তাঁহাকে সৎ বা অসৎ বলা চলে না। তিনি সৎ ও অসৎ এতদুভয়ের মধ্যবর্ত্তীও নহেন। এই স্বপ্রকাশ ব্রহ্মচৈতন্যই নিখিল মিথ্যা বিকল্প-পরম্পরার প্রমাতা; তিনি ব্যতীত আর কেহই ঐ সকলের প্রমাতা নাই। যাহার সাহায্যে এই বাহ্য ব্যবহারসকল সফল হয়, সেই প্রমাণ-

পুষ্পস্থ জলে অনলের অনবস্থিতির ন্যায় উল্লিখিত ব্রহ্মপদে অপ্রতিষ্ঠ; ফলে ব্রহ্মপদ নিখিল প্রমাণ-প্রমাতাদির পরপারে বিরাজিত।

হে মুনিবর! তুমি আমার নিকট যে যে বিষয় জানিতে চাহিয়াছিলে, তাহা আমি কহিলাম। তোমার মঙ্গল হউক, আমরা অধুনা অভিমত দিকে প্রয়াণ করি। এই বলিয়া শঙ্কর পার্ব্বতীকে বলিলেন,—উঠ পার্ব্বতি! আইস, আমরা এখন চলিতে থাকি।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—ভগবান্ নীলকণ্ঠ এই কথা কহিয়া বিরত হইলে, আমি তাঁহার উদ্দেশে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিলাম। অনন্তর তিনি স্বীয় পরিজন-পরিচারকদিগের সহিত অম্বর-কোটরে প্রস্থান করিলেন। সেই ত্রিলোকপতি ভগবান্ উমাপতি প্রস্থান করিবার পর আমি কিঞ্চিৎকাল তাঁহার প্রদত্ত সেই উপদেশ-পরম্পরা মনে মনে চিন্তা করিয়া দেখিলাম,—আমার বুদ্ধি তখন পরিশুদ্ধ ও পবিত্র হইয়া সম্পূর্ণ নূতন হইয়া গেল। আমি সেই বুদ্ধিযোগে আত্মদেবতার অর্চ্চনা করিতে লাগিলাম। এই রূপ অর্চ্চনায় আমার অপার শান্তি লাভ হইল। আমি শান্তি প্রাপ্ত হইয়া জড় দেবতার উপাসনা হইতে বিরত হইলাম।

দ্বিচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৪২॥

ত্রিচত্বারিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র! সেই মহেশ্বর জগৎতত্ত্ব সম্বন্ধে আমাকে এইরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন। আমি নিজেও ইহা এইরূপ জানিয়াছি। এ জগতের যথাবস্থান তুমিও বোধ হয় জানিতে পারিয়াছ। এই অলীক জগৎ, যে মায়ার অলীক ভ্রমে অলীক উপাধি-ঘটিত বলিয়া অলীক জীব কর্ত্তৃক পরিদৃষ্ট হইতেছে, সে সংসার-মায়ায় সৎ ও অসন্ময় কি আছে? লৌকিক ব্যাপারের প্রতি দৃষ্টিপাত কর; দেখিবে—কোন কল্পনাকুশল কবি সম্মান ও অর্থলালসায় কোন রাজাকে সুমেরু বা কল্পতরুরূপে বর্ণন

করেন। বর্ণ্যমান রাজাও তখন আপনাতে সুমেরুত্ব ও কল্পতরুত্ব অনুভব করিতে থাকেন। তা' যদি না হইবে,—কবি-কথায় রাজা যদি অলীকত্ব বুদ্ধিই স্থাপন না করিবেন, তবে অবশ্য ধনাদি-দানে সে কবিকে কিছুতেই তিনি সম্মানিত করিতেন না। এই দৃষ্টান্তে দেখিবে—আত্মাও স্বরূপভ্রমে বর্ণনার অনুরূপ অভিমানী হইয়া থাকেন। জলে যেমন দ্রবত্ব, পবনে যেমন স্পন্দত্ব এবং আকাশে যেমন শূন্যত্ব, আত্মাতেও তেমনি এই সৃষ্টি-ভাব কল্পিত। ফলে, আত্মার স্বরূপজ্ঞানের অভাবেই তাঁহাতে সৃষ্টিকল্পনা করা হইয়া থাকে।

হে রঘুনায়ক! মহেশ্বরের নিকট যে দিন হইতে আমি পূর্ব্বোক্ত-রূপ উপদেশ সকল প্রাপ্ত হইয়াছি, তদবধি তাঁহারই নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে আত্মদেবতার অর্চ্চনা করিয়া আমি স্বস্থভাবে কাল কাটাইয়া আসিতেছি। এইরূপে আত্মদেবের অর্চ্চনায় ব্যাপৃত আছি, অথচ বাহ্য কার্য্য-পরম্পরাও আমার ত্যক্ত হয় নাই। আমি যথোপস্থিত ব্যবহার-পরম্পরা সম্পাদন করিয়া অশ্রান্তমনে এতদিন অতিপাতিত করিতেছি। যখন যাহা উপস্থিত হইতেছে, আমি তাদৃশ ক্রিয়া বা আচাররূপ পুষ্পমালা দিয়া আত্মদেবতার পূজা করিয়া আসিতেছি। সুষুপ্তি অবস্থায় আমার এই আত্মপূজা বিচ্ছিন্ন হইয়াও বিচ্ছিন্ন হয় না। কি দিবা, কি রাত্রি, সর্ব্ব-কালেই নিরবচ্ছিন্নভাবে আমার এই পূজাকার্য্য চলিতেছে। অর্থাৎ আমি সুখসুপ্ত ছিলাম, কি হইয়াছে, না হইয়াছে, কিছুই জানিতে পারি নাই, এইরূপ অজ্ঞানানুভূতি দ্বারাও তখনকার পূজা তাঁহার নির্ব্বাহ করা হয়। সত্য বটে, এ প্রকার গ্রাহ্য ও গ্রাহকভাব সমস্ত দেহীরই সমান; ফলে সুষুপ্তিকালেও অজ্ঞানের অনুভূতি দ্বারা আমি যেমন আত্মদেবতার অর্চ্চনা করি, সমস্ত জীবই এইরূপ অর্চ্চনা করে বটে; কিন্তু যোগী পুরুষের সহিত অজ্ঞ জীবদিগের পার্থক্য অনেক; কেন না, যোগী পুরুষ একাগ্রতার সহিত যথা তথা আত্মদেবতারই অর্চ্চনা করেন। তাঁহারা যাহাই করেন, সমস্তই আত্মদেবকে উৎসর্গ করিয়া দেন। অজ্ঞ জীব আত্মার গ্রাহ্য গ্রাহক-ভাব বুঝে না; কাজেই তাহাদের যথোপস্থিত ক্রিয়া বা আচার কোন কিছুই আত্মদেবতার পূজাস্থানীয় হয় না। যোগীদিগের ঐ সকল তথ্যই

বিদ্বিত্ত; তাই তৎসমস্ত তাঁহাদের আত্মপূজার পুষ্পতুল্য উপহার হইয়া থাকে। সুতরাং যোগীরা যে আত্মদেবতার অর্চ্চনা করেন, তাহাকেই প্রকৃত অর্চ্চনা বলা যায়।

হে রঘুনাথ! তোমায় বলি, তুমিও উল্লিখিত জ্ঞানে জ্ঞানী হও; ঐরূপ যুক্তির আশ্রয় লও। আসক্তি পরিত্যাগ কর,—করিয়া এই সংসার-রূপ শূন্য অরণ্যে নির্ভয়ে বিচরণ কর; দেখিবে,—তোমার খেদ কিছুতেই উপস্থিত হইবে না। হে সুব্রত! যখন তোমার বন্ধু-বিয়োগ বা ধনহানি-জনিত মহাদুঃখ উপস্থিত হইবে, তখন তুমি মদুক্ত যুক্তি আশ্রয় করিয়া বিচার করিতে থাকিবে। তোমার বন্ধু-সমাগম হউক বা ধন-সমৃদ্ধি লাভ হউক, অথবা বন্ধু-ধনাদির বিচ্ছেদই ঘটুক, তাহাতে তুমি হর্ষ বা শোকানুভব করিবে না। ঐরূপে তুমি মিথ্যা জ্ঞানে সুখ-দুঃখ পরিত্যাগ করিবে। কেন না, এই বিশাল সংসারের ঘটনা-পরম্পরা প্রতিনিয়ত এমনই ভাবে হইয়া আসিতেছে। এই জগতের যাবতীয় ঘটনাবলী যেরূপে আসিতেছে, যে ভাবে চলিয়া যাইতেছে, এবং যে প্রকারে জনসাধারণকে অভিভূত করিয়া ফেলিতেছে, তাহা তুমি অবশ্যই পরিজ্ঞাত আছ; বিষয়-সমূহের বিচিত্র গতিও তোমার অবিদিত নাই। উহারা যে ভাবে আইসে, যেরূপে যায়, তাহাও তোমার অগোচর নাই। ধন, প্রেম, বন্ধু বান্ধব সকলই অতর্কিত কারণে আসিতেছে, লয় পাইতেছে। ফলে, উহারা অবিচারপ্রসঙ্গেই আইসে, আবার বিচারপ্রসঙ্গেই মিথ্যা হইয়া লয় পায়। হে বিশুদ্ধবুদ্ধে! বাস্তবিকই এই সমস্ত জগৎকার্য্য তোমার অন্তরে নাই; তুমিও এ সকলের অন্তরে অবস্থিত নহ। তোমার নিকটেও এ সকল কিছুই নাই। এ সকল এইরূপই অকিঞ্চিৎকর; ইহা তুমি বিলক্ষণ বুঝিতেছ, বুঝিয়াও ইহার জন্য সন্তপ্ত হইতেছ কেন? হে অপরিচ্ছিন্ন চিন্মূর্ত্তে! যদি তুমি এই জগৎকে তুচ্ছ বলিয়া জ্ঞান করিতে না পার, তাহা হইলে ভাবো যে, তুমিই এই জগৎস্বরূপ; এ জগৎ তোমারই অবয়ব। নিজাবয়বের পরিবর্ত্তন-ঘটনায় হর্ষই বা কি? আর শোকই বা কি আছে? তুমি চিন্মাত্র; এ জগৎ তোমা হইতে অভিন্ন। সুতরাং তোমার আবার হেয় বা উপাদেয় কল্পনা কোথায় কি হইতে পারে?

তরঙ্গমালা যেমন সাগরই, তেমনি জগৎস্পন্দ—এই বিশ্বসংসার, যখন চিন্ময়ই, তখন আর শোক বা হর্ষের অবসর কোথায়? হে রাম! এখন হইতে তুমি চিদেকতানতা প্রাপ্ত হও,—হইয়া সুষুপ্তদশায় উপস্থিত হও; ক্রমে তুরীয়াবস্থায় অবস্থান করিতে থাক। এই যে জগদ্বৈচিত্র্য-রূপ বৈষম্য, ইহা হইতে তুমি মুক্ত হও,—হইয়া ব্রহ্মের সহিত জগদাভাসকে একরসতাপন্ন করিয়া লও এবং উদার বুদ্ধিশালী হইয়া প্রকাশময়-কলেবরে আত্মদেবতার অর্চ্চনা করিতে থাক এবং পরিপূর্ণ অম্ভোধির ন্যায় অবস্থিত হও।

হে রঘুনন্দন! তুমি মৎকথিত সমস্ত জগৎতত্ত্ব-বিবরণ শ্রবণ করিলে; শুনিয়া এক্ষণে তোমার বুদ্ধি পূর্ণতা প্রাপ্ত হইল। যদি তোমার এখন আরও কিছু জিজ্ঞাস্য থাকে, তবে তাহা তুমি অসঙ্কোচে ব্যক্ত কর।

রামচন্দ্র কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! এখন আর আমার কোনও সংশয় নাই। মদীয় সর্ব্ব সন্দেহ নিরস্ত হইয়াছে। আমি নিখিল জ্ঞাতব্য অবগত হইয়াছি। আমার অকৃত্রিম তৃপ্তি জন্মিয়াছে। হে মুনে! মদীয় দ্বৈত-মল প্রক্ষালিত হইয়া গিয়াছে। সর্ব্ব কল্পনারও উপশম ঘটিয়াছে। আমি মনে করি না যে, এখন আর আমার কোনও কল্পনা রহিয়াছে। অগ্রে আমার যে অজ্ঞান ছিল, তাহা আর এখন নাই। ঐ অজ্ঞানবশে পূর্ব্বে আমার যে আত্মকলঙ্কের ভ্রান্তি ছিল, ভবদনুগ্রহে তাহাও এখন আমার চলিয়া গিয়াছে। আমার পূর্ব্বকালীন সমস্ত ভ্রান্তিই নিরস্ত হইয়াছে। আমি বুঝিয়াছি, আত্মার জরা নাই, মরণ নাই, তিনি সতত অকলঙ্ক। এক্ষণে আমার বিলক্ষণ প্রতীতি জন্মিয়াছে যে, এই সমস্তই ব্রহ্ম। আমি অধুনা সর্ব্বসংশয়ের অতীত হইয়াছি। আমার কোন বিষয়ে কোন প্রশ্ন নাই এবং কোনরূপ বাঞ্ছাও আমার নাই। যেমন বিশ্বকর্ম্মার যন্ত্র-শাতিত সূর্য্যমণ্ডল, তেমনি আমার চিত্ত সুবিশুদ্ধ ও সুনির্ম্মল হইয়াছে। সুমেরুগিরি স্বর্ণের আকর; তাহার যেমন আর সুবর্ণের প্রয়োজন নাই, তেমনি শিষ্যসম্প্রদায়কে সাধুগণ যে সকল আচার ব্যবহার প্রতিপালন করিবার উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন, আমার আর এখন সে সমুদায় আচার-ব্যবহারের উপদেশ লইবার আবশ্যক

কিছুই নাই। আমি সে সমুদায়ের প্রতি বীতস্পৃহ হইয়াছি। যাহাতে আমি আশাবন্ধন করিতে পারি, এমন কোনও বস্তুই নাই এবং যাহার আমি আকাঙ্ক্ষা করি, এমন বস্তুও ত কিছুই দেখি না। এ বিশাল চরাচরে এমন কিছুই নাই, যাহা আমার হেয়, উপেক্ষ্য বা উপাদেয় হইতে পারে? হে মুনে! ইহা হেয়, ইহা উপাদেয়, ইহা সৎ, আর ইহা অসৎ, ইত্যাদি চিন্তাভ্রান্তি আমার সম্পূর্ণই শান্ত হইয়া গিয়াছে। আমি স্বর্গ চাই না, রৌরব-নরকেও আমার দ্বেষ নাই। আমি মন্দরাদ্রির ন্যায় অচল ও অটলভাবে আত্মাতেই অবস্থিত রহিয়াছি।

হে মুনীন্দ্র! 'এ জগৎ যেরূপ দেখা যাইতেছে, ইহা এইরূপই; এতদ্ভিন্ন ইহাতে অন্য কোনই তত্ত্ব নাই' যে মূঢ়ের হৃদয়ে এইপ্রকার জ্ঞান বদ্ধমূল আছে; 'ইহা বস্তু, ইহা অবস্তু' এই প্রকার সন্তাপজননী কল্পনা তাহারই হইয়া থাকে। ঐরূপে যে মূঢ় ব্যক্তি এ জগৎকে বিদিত হইয়াছে, এ জগতে এমন কিছুই নাই, যাহা তাহাকে কার্পণ্য-দশায় উপনীত করিতে পারে। হে বিভো! এ জড় সংসার-সাগর বিশুদ্ধ চিদাকার-বৃত্তি-বিরহিত ও বিচিত্র তরঙ্গভঙ্গ-সঙ্কুল। আমি এ সাগর হইতে সমুত্তীর্ণ হইয়াছি। সম্পদের যাহা চরম অবধি, তাহা আমি জানিয়াছি এবং বিপদের যাহা চরম সীমা, তাহাও আমি দেখিয়াছি। অপিচ যাহা সর্ব্বসারভূত পরমানন্দ, তাহাও আমি প্রচুররূপে প্রাপ্ত হইয়াছি। এক্ষণে আমার পূর্ণতা হইয়াছে। আমি মনে করি, আমার মন এখন আশা-মাতঙ্গের দলনে ও সংসারাব্ধির সন্তরণে মহাশূরের ন্যায় বিরাজ করিতেছে। মনের এই শূরত্ব বা বীরোচিত কার্য্য হ্রাস করিবার ক্ষমতা অন্য কাহারও নাই। আমার মনের এখন আর কোনই বিকল্প নাই; কোন আকাঙ্ক্ষাও নাই। মন আমার সুদৃঢ় স্থৈর্য্য প্রাপ্ত হইয়াছে। এ জগতে যে যে কিছু প্রসিদ্ধ নির্ম্মল বস্তু আছে, তৎসমুদায়ের কিছুই আমার মনে নাই। মন আমার আনন্দ প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বোত্তম পদে বিরাজ করিতেছে।

ত্রিচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪৩ ॥

চতুশ্চত্বারিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র! ইন্দ্রিয়-সম্বন্ধ থাকিলেও, যে মনে কর্ত্তৃত্বাভিমান নাই বা রাগ-দ্বেষাদি নাই, তথাবিধ মন দ্বারা যাহা করিবে, তাহা অকৃত বলিয়াই জানিবে; অর্থাৎ সে কর্ম্ম—বন্ধনের হেতুভূত নহে। বলিতে পার, বিষয়সমূহের তুষ্টি-জনকত্বই নিয়ম; সুতরাং কিরূপে তাহাতে আসক্তি ত্যাগ সম্ভবপর হইতে পারে? ঐ কথার উত্তরে বক্তব্য এই যে, কোন দ্রব্যের প্রথমতঃ লাভক্ষণে যেরূপ সন্তোষ হয়, কিছুকাল অতীত হইলে তাদৃশ সন্তোষ আর থাকে না, ইহা কাহার না অনুভব-গম্য হয়? যখন কামনা করা যায়, তখন কাম্য বস্তু প্রাপ্ত হইলে যাদৃশ সন্তোষ ঘটে, সময়ান্তরে সেরূপ সন্তোষ কিছুতেই ঘটে না। সুতরাং এই প্রকার ক্ষণিক সুখে অজ্ঞ-জন ব্যতীত আর কেহই আসক্ত হয় না। যখন দেখিতে পাওয়া যায়, কামনার সমকালেই সুখ বা সন্তোষ হয়, সর্ব্বদা বা সময়ান্তরে তাহা হয় না, তখন এই প্রকার স্থির করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য যে, কামনাই সেই প্রকার সমুদায় সুখের কারণ এবং ঐ সকল সুখ-সন্তোষের অবসানই দুঃখময়। তাই বলিতেছি, রামচন্দ্র! তুমি কামনারে পরিত্যাগ কর। ফলে, যাহা ক্ষণিক সুখের হেতুভূত, তাহাকে পরিহার করাই সঙ্গত। বৎস! তোমাকে বার বার এইরূপ বলিবার কারণ এই যে, ভাবী কালে তুমি আর অহম্ভাব-পঙ্কে নিমগ্ন হইবে না। একবার যদি ব্রহ্মপদ পাইয়াছ তো আর কখনই কালদোষে অহঙ্কার-পঙ্কে যেন তোমার পতন না ঘটে।

হে রাম! তুমি আত্মজ্ঞানরূপ সমুচ্চ সুমেরুশিখরে বিশ্রান্তি লাভ করিয়াছ, তোমার পক্ষে পুনরায় অহম্ভাবরূপ মহাগর্ত্তে পতিত হওয়া অবশ্যই উচিত কার্য্য হইবে না। এরূপ পতন তোমার কখন হইবেও না। কেন না, যদীয় মানস পটে অনন্ত ব্রহ্মদৃষ্টি সমুদিত হইয়াছে, জ্ঞানরূপ সুমেরুশৈলের শিখরে যিনি অধিরোহণ করিয়াছেন, অহম্ভাবরূপ পাতালতলে তাঁহার পতন একান্তই অসম্ভব ব্যাপার। দেখা যাইতেছে,

তোমার স্বভাব সমতা ও সত্যময় হইয়াছে। আমার মনে হয়, তোমার সমস্ত সংসার-বিকল্প ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে। অবিদ্যার আবরণ তোমার সম্পূর্ণই ঘুচিয়াছে।

হে রাম! তোমার পরিপূর্ণ সাগরবৎ সুগভীর শুদ্ধ সমতা—আমাকে ইহাই জানাইয়া দিতেছে যে, তুমি স্বস্বভাবেই অবস্থিত হইয়াছ। তোমার অসঙ্গ জীবনে আশা—নৈরাশ্যে, ভাবনা—অভাবে এবং মন—শূন্য-রূপে প্রতিভাত হউক। অর্থাৎ তোমার আশা—নিরাশা—মন—অমন, অভাব—ভাব এবং জীবন—অসঙ্গ হউক। তুমি যে যে বস্তু দেখিবে বা যে যে বস্তুদশা প্রাপ্ত হইবে, সে সকলকে তুমি সত্তাসামান্যরূপে চিদ্‌ঘন ব্রহ্মভাবে বৃংহিত করিয়া লইবে। যদি তুমি আত্মতত্ত্ব বিদিত হইয়া থাক, তাহা হইলে মুক্ত আর যদি অবিদিত হইয়া থাক, তাহা হইলে তুমি বদ্ধ। তাই বলিতেছি, হে রঘুনন্দন! তুমি আপনিই আপনাকে প্রবুদ্ধ করিয়া লও। যে অবস্থায় ভোগসুখে স্পৃহা থাকে না, যথাপ্রাপ্ত সুখ-দুঃখ নির্ব্বিকারভাবে ভোগ করা হয়, তাহারই নাম বাসনাক্ষয়। এই বাসনা-ক্ষয়কেই সমত্ব বা আকাশতুল্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়। তুমি ঈদৃশ নির্ব্বাসন অন্তঃকরণেই কর্ম্মাচরণ কর। এইরূপ করিলে শত বিক্ষোভ—শত ঝঞ্ঝা-তাড়নেও তুমি আকাশের ন্যায় নির্ব্বিকার হইয়া থাকিবে। কি জ্ঞাতা, কি জ্ঞেয়, কি জ্ঞান, এই তিন বিভাগকে—এমন কি দুঃখাদি পর্য্যন্ত সমস্তকেই তুমি যদি শান্তচিত্তে আত্মা বলিয়া অনুভব কর, তাহা হইলে তোমাকে আর কখনই সংসার-যাতনা ভোগ করিতে হইবে না। নিশ্চয়ই তুমি সংসারাতীত হইয়া থাকিবে। বিষয়াকার চিত্তবৃত্তির উন্মেষেই সংসারের উদয় হয় আর তাহার অনুদয়েই সংসারের লয় হইয়া থাকে। প্রাণের যে উন্মেষ ও নিমেষ, তাহাও সংসারের উদয় ও লয়ের দ্বিতীয় কারণ বলা যায়। তুমি অভ্যাস ও সংযম অবলম্বন কর,—করিয়া তাহাদের সাহায্যেই প্রাণকে উন্মেষবিহীন করিয়া লও। এইরূপে বাসনা ও প্রাণ-প্রচলন নিরুদ্ধ করিয়া চিত্তকে বৃত্তি-বিরহিত করিয়া লইবে। অজ্ঞানের বা অজ্ঞতার উদয় ও বিলয়ই কর্ম্মোদয় ও কর্ম্মনিবৃত্তির কারণ বলা যায়; সুতরাং গুরুর বাক্য, শাস্ত্রের উপদেশ ও সংযম অবলম্বন করিয়া তুমি

অজ্ঞান ও অজ্ঞানোদয়-সমাগত কর্ম্মকে নির্ম্মূল করিয়া ফেলো। বায়ুবিধূত ধূলিসঙ্গে আকাশ যেমন ভাবান্তর প্রাপ্ত হয় বলিয়া মনে হয়, তেমনি চিৎ-স্বরূপের যে চেত্যভাবে স্পন্দন, তাহারই জন্য এই সংসারে ভাবান্তরের উপস্থিতি। রূপ-পরিজ্ঞানের মূল যেমন আলোক ও কুড্যাদির সম্বন্ধ, তেমনি দৃশ্য ও দর্শনের সম্পর্করূপ দ্রষ্টার যে অলীক ভাবান্তর, তাহাই এই জাগতিক ভাব-স্ফুরণের মূল। যদি দৃশ্য ও দর্শন এই উভয়ের সহিত সম্বন্ধ সংঘটন না থাকিত, তাহা হইলে এই জগৎপরিজ্ঞান বা জগদুৎপত্তিই হইত না। যেমন চিত্রার্পিত পুরুষের অন্তরে ভাবনার উদয় অসম্ভব, তেমনি যখন দৃশ্য দর্শনের সম্বন্ধরূপ স্পন্দাভাব হয়, তখন এই জগদাভাসময়ী সম্বিৎ কিছুতেই সমুদিত হইতে পারে না। মায়ার আবির্ভাব চিত্তস্পন্দন হইতেই হয়। যখন চিত্তস্পন্দের অভাব ঘটে, তখন ঐ মায়া লয় পাইয়া যায়। দৃষ্টান্ত দেখ, জল স্পন্দিত হইলেই তরঙ্গোদয় হয় আর জলস্পন্দ না হইলেই তরঙ্গের উত্থান হয় না। যদি তত্ত্ববোধ প্রাপ্ত হইয়া বাসনাংশ পরিত্যাগ করা যায় অথবা প্রাণবায়ুকে নিরোধ করা সম্ভব হইয়া উঠে, তাহা হইলে চিত্ত নিস্পন্দ হয়। চিত্তের স্পন্দরাহিত্যেই তাহার চিত্ততা অপগত হইয়া থাকে। যদি প্রাণ-পবনের নিরোধ-ঘটনা হয়, তাহা হইলেই চিত্ত অচিত্ত হইয়া পড়ে। তখন সে পরম পদেই পর্য্যবসিত হয়। দৃশ্য-দর্শনে বা তৎসম্পর্কে যে সুখোদয় ঘটে, তাহাও বাস্তবিক ব্রহ্মসুখ। সেই সুখের চরম সীমা যে পূর্ণ সম্বিৎস্বরূপ ব্রহ্মদৃষ্টি, তাহারই সাহায্যে মনের লয় সম্পাদন করিতে হয়। যথায় চিত্তের অভ্যুদয় নাই, ফলে যাহা চিত্ত হইতে জন্মে না, জানিবে—সেই সুখই অকৃত্রিম সুখ; তাদৃশ সুখ সুমেরুশৈলে শৈত্যাবাসের ন্যায় স্বর্গাদি স্থানেও সুদুর্লভ। চিত্তের বিনাশ হইতে যে সুখের অভ্যুদয় হয়, তাহা অপরিসীম—অনন্ত। সে যে কি অপূর্ব্ব সুখ, তাহা বাক্য দ্বারা ব্যক্ত করা যায় না। সে সুখের ক্ষয় কখনই নাই; তাহার উদয় বা উপশান্তি কদাচ নাই। তত্ত্ববোধ জন্মিলেই চিত্তের বিনাশ হয়। দুর্ব্বুদ্ধি বা ভ্রান্তির মাহাত্ম্যেই চিত্তসদ্ভাব প্রতীয়মান হইয়া থাকে। ঐ ভ্রান্তির প্রভাবেই বাল-কল্পিত বেতালবৎ এই মোহ-সমৃদ্ধি ঘনীভূত হয়। এ চিত্ত থাকিলেও তত্ত্ববোধেই ইহার বিলয় হইয়া থাকে।

তাম্রকে যদি সুবর্ণভাবে উপনীত করা যায়, তাহা হইলে তাম্র আর থাকে না, তাহা সুবর্ণ নামেই নিরূপিত করা হয়, তেমনি এই চিত্ত সৎ হইলেও তখন অসৎ হইয়াই পড়ে। যিনি তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ, তাঁহার চিত্তকে চিত্ত বলিয়া উল্লেখ করা যায় না; তাহা তত্ত্ব নামেই নিরূপিত হইয়া থাকে। তাম্রের সুবর্ণভাবে পরিণতির ন্যায় তত্ত্ববোধের উদ্রেকে চিত্ত নামতঃ ও অর্থতঃ অন্য প্রকার হইয়া যায়। ভ্রান্তি-বীজত্বই চিত্তের চিত্ততা, তত্ত্ব-বোধের উদয় হইলেই তাহা বিলয় প্রাপ্ত হয়। তত্ত্ববোধের উদ্রিক্ততায় ভ্রমাংশই উপশান্ত হয়। কিন্তু যাহা সৎ, তাহার অভাব কখনই হয় না। বিকল্পময় চিত্তাদি বস্তুকে শশশৃঙ্গাদিবৎ অসৎ বা অলীক বস্তু বলিয়াই নির্দ্দিষ্ট করা হয়। কিন্তু যখন আত্মবোধের উদয় হয়, তখন উহার বিলয় প্রাপ্তি ঘটে। ঐ চিত্তাবস্থাকে সার্ব্বকালিক বলা যায় না; উহা জগৎ-স্থিতিতে অবস্থিত হইয়া কিয়ৎকাল সত্ত্বরূপে তুরীয়াবস্থায় বিহারপূর্ব্বক অনন্তর তুরীয়াতীত হইয়া থাকে। এই জগৎরূপ বিপুল ভ্রমবিলাসে একমাত্র ব্রহ্মই পর্য্যবসিত; একমাত্র তিনিই এক হইয়াও অনেকরূপে প্রতিপন্ন। এই জন্য তাঁহার 'সর্ব্বময়' এই সুসঙ্গত নাম নিরূপিত। বৎস! যেমন মনোরথ-কল্পিত প্রাসাদ, উপবন ও বাপী প্রভৃতির সমাবেশ হৃদয়-মধ্যে সম্ভব হইতে পারে না বলিয়াই নাই, তেমনি পরম সূক্ষ্ম চিদেকরস পরব্রহ্মে জগৎসমাবেশ হওয়া অসম্ভব বলিয়াই তাঁহাতে তাহা বিদ্যমান নাই।

চতুশ্চত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪৪ ॥

পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র! অধুনা তুমি সংক্ষেপে একটী রম্য কথা শ্রবণ কর। এ কথা অতি অপূর্ব্ব; ইহা শ্রবণে বিস্ময় ও উল্লাসে প্রাণ পুলকিত হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে আত্মবোধও জন্মাইয়া দিবে।

একটী অতি বিপুল বিমল বিল্বফলের কথা কহিতেছি, সেই ফল বহু সহস্র যোজন ব্যাপিয়া বিরাজিত; সুতরাং তাহার বিপুলতা কত, সহজেই তাহা অনুমেয়। কত যুগযুগান্ত অতীত হইয়াছে, ভবিষ্যতে আরও কত হইবে; তথাচ ঐ বিল্বফল জীর্ণ হয় নাই এবং ভবিষ্যতে কখন হইবেও না। উহার রস অনপায়ী এবং স্বাদ সুধাসম সুমধুর। উহা অনাদিসিদ্ধ হইলেও পুরাতন নহে; ঐ ফল নিত্যই নূতন এবং নিত্যই চন্দ্রকলার ন্যায় সুন্দর ও কমনীয়তায় সমুজ্জ্বল। উহা ভুবনব্যূহের মধ্যভাগে বিরাজিত এবং মন্দরাচলবৎ সুদৃঢ়। মহাপ্রলয়ের বাত্যাবেগেও ঐ ফল বিচলিত হয় না এবং উহার বিশালতা এত যে, কত কোটি কোটি অযুত অযুত যোজন অতিক্রম করিলেও তাহার ইয়ত্তা করা অসাধ্য। ঐ বিল্বফলই জগৎস্থিতির আদি মূল। এই মূল কোথায় কিরূপে অবস্থিত, তাহা অবধারণ করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই। এ বিশাল ব্রহ্মাণ্ড-পরম্পরা ঐ বিল্বফলেরই উপরিস্থিত। যদি নিকটে গিয়া দেখা যায়, তবে বোধ হয়, উহারা যেন পর্ব্বতের উপরিগত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সর্ষপসকল বিরাজমান। ঐ ফলের রসধারা বড়ই মধুর—বড়ই চমৎকার। এমন কোন ষড়িন্দ্রিয়-ভোগ্য রস কোথাও দেখি না, যাহা উহার ঐ রসধারাকে অতিক্রম করিতে পারে।

হে রাঘব! এ ফল নিত্য নিত্য এইরূপই সুরসময়; অথচ ইহা পাকিয়াও কখন পড়ে না বা কখন জীর্ণ হয় না। কি ব্রহ্মা, কি বিষ্ণু, কি রুদ্র, কি ইন্দ্র, কি অন্য কোন চিরজীবী জীব, এ পর্য্যন্ত কেহই ঐ বিল্বফলের আদি, অন্ত বা মধ্য কোন কিছুরই প্রকৃত সংবাদ জানিতে পারেন নাই। এই যে বিশালকায় ফলের কথা কহিলাম, উহার শাখা, মূল, স্তম্ভ, অঙ্কুর, বৃন্ত বা কুসুম কিছুই দেখা যায় না। ঐ ফল দেখিতে যেন একটা ঘনাকার পিণ্ড; উহা অতি বিতত ও অতি স্থূল। উহার উৎপত্তি বা পরিণাম কখনও দৃষ্ট হয় না। ঐ মহাকৃতি ফল সমস্ত ফলের সার। উহার মজ্জা নাই, অস্থি নাই; উহা বিতত, নির্ব্বিকার ও নিরঞ্জন। শিলাখণ্ডের অভ্যন্তর ভাগের ন্যায় ঐ ফল নীরন্ধ্র। ইহার রস সুধাকরের সুধা অপেক্ষাও সুস্বাদু; পরন্তু তাহা সম্বিন্মাত্রেরই আস্বাদ্য। এই রসই

সকল প্রকার সুখের আকর; শীতলতা ও আলোকের নিদান। দেখিতে এ ফল শৈল বা পিণ্ডীভূত অমৃত-সদৃশ এবং ইহাই আত্মার মানুষানন্দাদি হৈরণ্যগর্ভ আনন্দ পর্য্যন্ত কর্ম্মফল-স্থিতির মজ্জা বা সার। হৈরণ্যগর্ভ আনন্দ ফল অপেক্ষাও যাহা পরমোত্তম, তাহার যাহা অব্যক্ত মজ্জা, ঐ শ্রীফলেরও সেই একই মজ্জা, এবং এই মজ্জাই আত্মচমৎকৃতি বলিয়া আখ্যাত। ত্রিবিধ পরিচ্ছেদ-পরিহীন স্বভাব কর্ত্তৃকই উহা রক্ষিত এবং উহাই অদ্বৈত শ্রীফলমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া বিরাজিত। আত্মচমৎকৃতির অধ্যাসবশেই ভেদবুদ্ধি জন্মিয়া থাকে। পরম প্রয়োজনীয় বলিয়াই ঐ আত্মচমৎকৃতি ফলত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। অর্থাৎ ভেদবুদ্ধি-জনিত অন্যত্ব বা দ্বিতীয়ত্বের এই যাহা পরম প্রয়োজনীয় চিন্ময় রস-মজ্জাকৃতি তাত্ত্বিক সংস্থান-বৈচিত্র্য, ইহারই দ্বারা এই আত্মচমৎকৃতি অম্বিত। এই আত্ম-চমৎকৃতি অণু হইতেও অণীয়সী, মহান্ হইতেও মহীয়সী। ইহা সনাতনী; সুতরাং ইহাতে বার্দ্ধক্যাদি বিকার কিছুই নাই। এই আত্মচমৎকৃতি সর্ব্বদাই নিতান্ত বালিকার ন্যায় বিরাজিতা। ‘এই আমি স্ত্রী, এই আমি ক্লীব’ এবম্বিধ ভেদের প্রতি ঐ আত্মচমৎকৃতিকেই কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়। যাহা অবিদ্যামল, তাহাই ‘ইহা অন্য, উহা ভিন্ন,’ এবম্বিধ ভেদ প্রতীতির কারণ। বাস্তব পক্ষে দেখিতে গেলে, উহা অকিঞ্চিৎ বলিয়াই প্রতিপন্ন হয়। যিনি স্বপ্রকাশ চিন্ময় মূর্ত্তি, তাঁহার নিকট উহা আকাশ-কুসুমবৎ অসম্ভব বলিয়াই অবধারিত। অথচ ঐ সকল দ্বৈত ভেদপ্রতীতিরূপ অবিদ্যা-মালিন্যের প্রতি ঐ আত্মচমৎকৃতিই হেতু বলিয়া উল্লিখিত। এখন বুঝিতে হইবে, পূর্ব্বোক্ত বিল্বফলের স্বরূপ যখন ঐ আত্মচমৎকৃতিই, তখন উহা অদ্বৈত সৎ বলিয়াই নিশ্চিত। ঐ যে আত্ম-চমৎকৃতি শক্তি, উহাই অহঙ্কার আবির্ভাবের অব্যবহিত পরক্ষণেই আকাশ, আকাশগুণ শব্দ এবং এই ত্রিভুবনের ব্যষ্টি সমষ্টি পরমাণুবিশেষে অহঙ্কার বিস্তারপূর্ব্বক আভিমানিক আবরণ প্রাপ্ত হইয়া বিরাজমানা। ঐ শ্রীফলমজ্জা আত্মচমৎকৃতির কৃতিত্ব এইখানেই যে, উহা স্বীয় স্বরূপের পরিবর্ত্তন বা পরিবর্জ্জন না করিয়া ক্রমশঃ সম্বিৎশক্তিরূপেই বিরাজ করিতে থাকে। ঐ মজ্জার সেই যে সম্বিৎশক্তি, তাহাই তরলাকারে নিজ

নির্ব্বিকার-ভাবে জাগতী দৃষ্টি প্রসারিত করে। ঐ যে অনন্ত বিস্তীর্ণ নভোমণ্ডল, এই যাহা কালকলা, এই যাহা নিয়তি নামে নির্দ্দিষ্ট, এই যে স্পন্দরূপিণী ক্রিয়া, এই যে বিবিধ সঙ্কল্প-বিস্তার, এই যে আশা, এই যে ভ্রান্তি, এই যে রাগ-দ্বেষের ব্যবস্থা, এই যাহা হেয়, ও উপাদেয়, এই যে 'তুমিত্ব' 'আমিত্ব' ও তত্ত্ব এবং এই যে ব্রহ্মাণ্ড-পরম্পরা, আর যে কিছু ঊর্দ্ধ, অধঃ, পূর্ব্ব, পশ্চাৎ, সম্মুখ, পার্শ্ব, দূর, নিকট, ভূত, ভাবী ও বর্ত্তমান, এতৎসমস্তই সেই সম্বিৎশক্তি হইতে বিস্তারিত এবং ঐ ঐ রূপ যাহা কিছু আছে, সকলই তাঁহাতে প্রতিষ্ঠিত। সেই বিল্বফলের মজ্জা মধ্যেই সমস্তের অস্তিত্ব এবং সেই মজ্জাই ঐ ঐ পদার্থরূপে বিরাজিত। এই যে কল্পনাময় অসংখ্য পদ্মের আকারস্বরূপ অনন্ত জীব-পরম্পরা, ইহারা ঐ বিল্বমধ্যেই বিদ্যমান। এই যে ব্রহ্মাণ্ডরূপ মণ্ডপরচনা আর ঐ যে তদন্তর্গত বিবিধ ক্রীড়ামণ্ডপ, এ সকলও ঐ বিল্বমধ্যেই অবস্থিত। যে পদ্ম অনন্ত কল্পনাতত্ত্বে পল্লবিত এবং যদীয় কর্ণিকায় এই লোকসকল প্রতিষ্ঠিত, ইহা সেই ভগবান্ হরির হৃৎপদ্ম। এই পদ্ম এবং পূর্ব্বোক্ত সেই বিল্ব উভয়ই অভিন্ন। এই পদ্মের কোটরদেশ কত মহারুদ্রগণে পরিপূরিত হইয়াছে। বিষয়লম্পট স্বর্গবাসী ও নরকবাসীদিগের গমনাগমনের নিমিত্ত ইহাতে অতি বিস্তীর্ণ পথ প্রসারিত রহিয়াছে। এ জগৎকে একটা পদ্ম বলিয়া বর্ণন করা যায়। এ পদ্মের কর্ণিকা—সুমেরু, পদ্মগত মধু—চন্দ্র এবং তত্রত্য অমৃতপিপাসু দেববৃন্দ উহার ভ্রমরস্বরূপে বিরাজিত। এই যে জগৎপদ্ম, ইহাও ঐ বর্ণিত বিশ্বেরই অন্তর্ভূত। এ জগৎকে একটা জীর্ণ বৃক্ষের সহিতও তুলিত করা যায়। সত্ত্বগুণ বা স্বর্গ—এই বৃক্ষের পুষ্প এবং রজোগুণ বা নরক ইহার মূল। ব্রহ্মরূপ সাগরতটে যাহা অবস্থিত ও তারকারাজি যাহার কেশরবৎ বিরাজিত, এই সেই অপার আকাশপদ্ম এবং যাহাতে সুকৃত দুষ্কৃতরূপ ভীষণ গ্রাহ বিদ্যমান, মাস ঋতু প্রভৃতি যাহার তরঙ্গভঙ্গী, যদীয় প্রজাসৃষ্টিরূপ আবর্ত্তমধ্যে প্রভূত ভূত-পরম্পরা বারবার উন্মজ্জন ও নিমজ্জন করিয়া ঘূর্ণমান ও প্রাণিবর্গের আয়ু পরিমাণে যাহা বিস্তীর্ণ, এই সেই ব্যোম-কমল-শালিনী কাল-নলিনী; ইহা ক্ষণ, ও মুহূর্ত্তাদি কল্পান্ত পর্য্যন্ত নিখিল কালকলে-

বররূপ পল্লবদলে শোভিতা, এবং রবিশশী ও অগ্নিপ্রমুখ তেজঃ-পদার্থরূপ কেশরজালে সমলঙ্কৃতা। পূর্ব্ববর্ণিত জীর্ণ জগৎবৃক্ষ, ব্যোমপদ্ম, বা কাল-নলিনী, এ সকলই ভাব-বিকারময়। ইহারা এবং এই যে জরামৃত্যু-রূপিণী বিসূচিকা, এই যে বিদ্যা ও অবিদ্যার বিলাস, এই যে শাস্ত্র ও অশাস্ত্রার্থ, এতৎসমস্তই সেই বিল্ব-ফলের মজ্জা-চমৎকৃতি বৈ আর কিছুই নহে।

এইরূপে ব্যষ্টি সমষ্টি সঙ্কল্প ও সন্নিবেশ মধ্যে বিল্বফলের সেই মজ্জা-চমৎকৃতি অধিষ্ঠিত রহিয়াছে। ঐ চমৎকৃতি শান্ত, স্বচ্ছ, নির্ব্বাধ, সৌম্য ও নির্ভাবনরূপে বিরাজিত। উহা সকলের কর্তৃত্ব সাধন করে, অথচ কর্তৃত্ব প্রকটন করিয়াও উদাসীনের ন্যায় অবস্থান করিয়া থাকে।

হে রাম! ঐ বিল্বফলের মজ্জাচমৎকৃতি এমনই অপূর্ব্ব যে, উহা অদ্বৈতা; তাই একা এবং উহাই সর্ব্বরূপে বিরাজিতা; তাই বিবিধার ন্যায় অনুভূতিগোচরা। এ দিকে আবার ঐ মজ্জাচমৎকৃতিই দ্বৈতসাধনী; সুতরাং উহা অনেকাত্মিকা এবং কোন সজাতীয় বিজাতীয় ভেদ উহাতে নাই বলিয়া উহাই আবার অবিবিধা বা একা। এইরূপে উহাই সেই সত্যস্বরূপিণী মহতী চিচ্ছক্তি বলিয়া নিশ্চিতা।

পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪৫ ॥

ষট্চত্বারিংশ সর্গ।

রামচন্দ্র কহিলেন,—হে ভগবন্, সর্ব্বসারবেদিন্! আপনি এই যে কথা কহিলেন, ইহা দ্বারা আমার মনে হয়, আপনি ঐ বিল্বরূপে বিশ্ব-বিসারিণী মহতী চিদ্ঘন ব্রহ্মসত্তার বিষয়েই উপদেশ প্রদান করিলেন। বস্তুতঃ আমি বুঝিলাম,—'আমি' 'তুমি' ইত্যাদি করিয়া যত কিছু অহম্ভাব আছে, সমস্তই ঐ চিন্মজ্জার রূপ; উহাতে দ্বৈত, ঐক্য, বা কল্পনাদি কোন ভেদই নাই।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! মেরু প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা যেমন এই ব্রহ্মাণ্ড-রূপ কুষ্মাণ্ডের মজ্জা, তেমনি এই যে ব্রহ্মাণ্ডাদি যাবতীয় জগৎস্থিতি, এতৎসমস্তকেই সেই চিদ্বিল্বফলের মজ্জা বলা হয়। কাজেই কেবল অহন্তা-দিই যে উহার মজ্জা, তাহা বলা যায় না। চিদ্বিল্বফলের মজ্জা,—এ কথা বলায় তদভ্যন্তরগত রসঘনীভূত পরিণামভেদকেই যে বুঝিতে হইবে, এরূপ ভ্রান্তি যেন তোমার উপস্থিত হয় না। দেখ, বিল্বফলের খর্পর বা ত্বগাবরণ যেমন মজ্জাধার, তেমনি যদি এই সৃষ্টি-মজ্জার আধার-স্থানীয় অন্য কোন খর্পর থাকিত, তবেই ঐরূপ পরিণামবিশেষকে মজ্জা বলা যাইতে পারিত। পরন্তু এই যে সৃষ্টিরূপ মজ্জা, ইহার আধার-স্থানীয় পদার্থান্তরের সম্ভাবনা নাই; কাজেই ঐ সর্ব্বগামী চিদাত্মমূর্ত্তির সাকল্য বা একদেশের পরিণতিক্রমে বিনাশ সম্ভাব্য নহে। কেন নহে, তাহার কারণ এই যে, যাহার অবয়বসংস্থান অসম্ভব, তাহাতে মুখ্য অন্তঃপ্রদেশ বা পরিণাম সম্ভাব্য হইতে পারে না। জানিবে—চারিদিকে চক্ষু চাহিয়া এই যাহা যাহা দেখিতে পাওয়া যায়, ইহা কেবল সেই চিদ্বিল্বফলের বিবর্ত্ত-চমৎকার বৈ আর কিছুই নহে। চিতি যেন মরীচ-বীজ; এই জগৎনামিকা চমৎকৃতি তাহারই। শিলার উদরে যেমন শিল্পী জনের মনঃকল্পিত কমলবন-সন্নিবেশ বিদ্যমান, তেমনি যে অন্তর সুষুপ্তি অবস্থার ন্যায় সৌম্যভাবে পরিণত, ঐ চমৎকৃতি তাহাতেই অবস্থিত। মরীচের উপরিস্থ আবরণ কঠিন; কিন্তু তাহার ভিতর-ভাগ সেরূপ নহে। ঐ যে চিতিমরীচের উল্লেখ করিয়াছি উহারও অভ্যন্তর ভাগ সেই প্রকার।

হে সুধাংশুবদন! এ সম্বন্ধে তোমার নিকট এক বিচিত্র আখ্যায়িকা কীর্ত্তন করিতেছি; ইহা বিস্ময়করী ও মনোহারিণী। শ্রবণ কর, এক স্থানে এক মহাশিলা আছে, উহা স্নিগ্ধ, স্পষ্ট, মৃদুস্পর্শ ও মহাবিস্তার-বতী। এ শিলা নিত্য অক্ষুব্ধ ও নিত্য নিবিড়। সরোবরের মধ্যে যেমন অসংখ্য কমলফুল প্রস্ফুটিত থাকে, তেমনি ঐ শিলার অভ্যন্তরেও রম্য রম্য প্রফুল্ল পদ্ম বিরাজমান। ঐ সকল পদ্মের সংখ্যা যে কত, তাহা নির্দ্দেশ করা অসম্ভব। ঐ পদ্মসমূহের দলগুলি পরস্পর মিলিতভাবে

অবস্থিত। উহারা পরস্পর বিঘটিত, পরস্পর উপনিগূঢ়, গূঢ় ও প্রকট। উহাদের কতকগুলি ঊর্দ্ধমুখে, কতকগুলি অধোমুখে এবং কতকগুলি বক্রভাবে বিরাজিত। ঐ সকলের মূল পরস্পর মিলিত এবং মুখদেশ পরস্পর প্রোত। উহাদের কতকগুলির মূল কর্ণিকাজালে এবং কতক-গুলির কর্ণিকা মূলমধ্যে বিরাজিত। কতকগুলির মূল ঊর্দ্ধে, কতক-গুলির অধোদিকে এবং কতকগুলি একেবারেই নির্ম্মূল। মুকুলিত পদ্মাকার সহস্র সহস্র শঙ্খ তাহাদের নিকট বিরাজমান এবং প্রফুল্ল পদ্ম-সদৃশ বিশাল চক্র সকলও সেখানে বিদ্যমান।

রামচন্দ্র কহিলেন,—প্রভো! আপনার উক্তি সত্যই বটে। আমিও এই প্রকার এক মহতী শিলা সন্দর্শন করিয়াছি। সে শিলাও ঐরূপ কমলকুলে সমলঙ্কৃতা। অর্থাৎ রামচন্দ্র নিজে তীর্থ যাত্রা প্রসঙ্গে হরির আস্পদ শালগ্রাম-ক্ষেত্রে এক শিলা দেখিয়া আসিয়াছিলেন; গুরু-দেবের বাক্যে তাঁহার সেই শিলাই মনে পড়িল। তিনি ভাবিলেন,—ভগবান্ বশিষ্ঠ সেই শিলাকেই জগৎ-কল্পনা সহ ব্রহ্ম-দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ করিয়াছেন।

রামচন্দ্রের কথাবসানে বশিষ্ঠ বলিলেন,—বৎস! সত্যই বটে, আমি যে শিলার উল্লেখ করিয়াছি, তাহা তুমি দেখিয়াছ; যখন দেখিয়াছ, তখন অবশ্যই তাহার তত্ত্ব তুমি বুঝিতে পারিয়াছ। সে শিলার যে প্রাণ আছে, তাহা সমান ও নিরবকাশ; বিশদার্থ এই যে, তাহা কেবল ঘনচৈতন্য ও নির-তিশয় আনন্দ-স্বরূপ। যদিও তোমার তাহা বিদিত থাকুক, তথাচ আমি সেই শিলার দৃষ্টান্ত দ্বারা তোমাকে ব্রহ্ম যে কি, তাহাই বুঝাইবার প্রয়াস পাইতেছি। যেমন বিল্বফলের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝাইবার প্রয়াস পাইয়াছি, তেমনি ইদানীং ঐ শিলার প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া ব্রহ্ম বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম। শিলায় যেমন শঙ্খ পদ্ম প্রভৃতি আকৃতি আছে; আবার নাইও বটে; তেমনি ব্রহ্মেও এই সমস্ত বিদ্যমান অথচ অবিদ্য-মান। শিলায় শিল্পীর মনঃকল্পনাতেই শঙ্খ-পদ্মাদি আকৃতি আছে; শিল্পী তাহার নিজের কল্পনানুযায়িনী ক্রিয়া দ্বারাই ঐ সমস্ত স্থূল দৃশ্য প্রকটিত করাইয়া থাকে। এইরূপ ব্রহ্মও আপনার মায়িক কল্পনাকেই

মায়িক পরিণাম দ্বারা এই সমস্ত দৃশ্য প্রপঞ্চ স্থূলাকারে প্রকাশিত করিয়াছেন।

হে রাঘব! যাহা প্রাকৃত শিলা, আমি তাহার কথা তোমার নিকট বলি নাই। মৎকথিত এই শিলা—চিৎশিলা। চিদ্বস্তুতে শিলার আরোপ করিলাম, এই জন্য যে সাধারণতঃ শিলার যেমন নিবিড়ত্ব, একাত্মকত্ব, একরসত্ব, কূটস্থত্ব ও বিবিধ শালভঞ্জিকাদি শক্তিবৈশিষ্ট্য আছে, তেমনি ঐ চিত্তেও নিবিড়তা, অন্তরে বাহিরে একাত্মকতা ও বিশ্ববিরচনী-শক্তি-শালিতা বিদ্যমান। কাজেই এই শিলাকে আমি চিৎ বলিয়া বর্ণন করিলাম। যদিচ এই চিতের ভিতরে ঘনত্ব, নিরবকাশত্ব, অধিক কি, একটী অতি ক্ষুদ্র রন্ধ্র পর্য্যন্তও নাই, তথাচ মায়ার শক্তি এমনই যে, আকাশে বিপুল অনিল-সংস্থানের ন্যায় উহার অভ্যন্তরে সমগ্র বিশ্বই বিদ্যমান। উহা সম্পূর্ণতঃ নীরন্ধ্র, অথচ উহাতেই স্বর্গ আছে, আকাশ আছে, বায়ু আছে, পৃথ্বী আছে, পর্ব্বত আছে, নদী আছে, দিক্ সমূহ আছে, সরিৎ আছে, সাগর আছে, এইরূপে সকলই বিদ্যমান রহিয়াছে। উহাতেই এই নিবিড়িকার জগৎপদ্ম প্রকটিত হইয়াছে। এই জগৎটাকে একটা ভিন্ন বস্তু বলিয়া মনে হয় বটে; কিন্তু বাস্তব পক্ষে ইহা অভিন্ন। তবে কি ইহা শুদ্ধ চিদাত্মক? না—তাহাও নহে। তবে ইহা কি? ইহা একটা মায়িক রূপ মাত্র। শিল্পিকুল যেমন শিলার উপর শঙ্খপদ্মাদি বিবিধ আকৃতি লিখিত বা খোদিত করিয়া রাখে, তেমনি বর্ণ্যমান চিৎপদার্থে ভূত, ভাবী, বর্ত্তমান, এই ত্রৈকালিক পদার্থ-পরম্পরা খোদিত রহিয়াছে। এ কথা বলার তাৎপর্য্য এই যে, শিলায় যে সকল খোদিত আকৃতি থাকে, তাহা যেমন শিলা হইতে অভিন্ন, পরন্তু তাহার আকৃতিভাগ মিথ্যা, তেমনি এই যে চিৎকল্পিত জগৎ, ইহাও চিৎই; পরন্তু কল্পিত জগৎ অসত্য। শিলায় রচিত শঙ্খ-পদ্মাদির আকৃতি ভিন্ন বলিয়া বোধ হইলেও সে সকল যেমন শিলার অনতিরিক্ত, তেমনি এই যে সৃষ্টিবিস্তার, ইহাও ভিন্ন বলিয়া প্রতীত হইলেও চিৎ হইতে অনতিরিক্ত। পাষাণ-দারণকারী যন্ত্র দ্বারা যৎকালে শিলায় পদ্মাকৃতি বা চক্রাকৃতি খোদিত হয় নাই, তথাবিধ সুষুপ্তি-অবস্থায় সেই শিলায় ঐ পদ্ম বা চক্রাকৃতি যেরূপভাবে

ছিল, এই যে জগৎপরম্পরা, ইহাও ঐ চিৎশিলায় তেমনি ভাবে আছে, ছিল এবং থাকিবে। শিলায় পদ্মরেখাদির ও মরীচের মধ্যগত চমৎকৃতির যেমন উৎপত্তি-নাশ নাই, তেমনি ঐ চিৎ-শিলায় ও চিৎ-মরীচ-বীজে এই সৃষ্টিরূপ পদ্ম ও চমৎকৃতি অস্তোদয়হীনভাবে বিরাজ করিতেছে। সতী স্ত্রীর অন্তরে যেমন তদীয় অভীষ্ট পতিদেবতার মূর্ত্তি সতত জাগ্রত থাকে এবং যে প্রকার বিল্বফলের অভ্যন্তরে মজ্জাসার ওত-প্রোতভাবে অবস্থান করে, বৎস! জানিবে—এই অনন্ত বিকারশালী ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলীও তেমনি ভাবে চিৎশিলায় বা চিদ্বিল্ব-ফলে বিদ্যমান রহিয়াছে। এই নানা বিকারময়ী ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলী যখন চিন্মাত্র, তখন তদ্বিকার ভুবন-শরীরাদি-ভেদেরও চিন্মাত্রত্ব, ইহাই অর্থতঃ সুসিদ্ধ; এইরূপ দুরুক্তির কোনই অর্থ নাই, সুতরাং উহা নিষ্ফল; কেন না, যেমন জলবিকার বিন্দু ও বুদ্বুদাদি অবশেষে যে জল, সেই জলই হইয়া যায়, তেমনি এই যে সকল বিকার, ইহাও চরমে চিৎপদার্থেই পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। অতএব সমস্ত বিকারই ব্রহ্ম, ব্রহ্ম ভিন্ন স্বতন্ত্র বিকার আর কিছুই নাই। এই জন্যই বলা যায় যে, ব্রহ্মে ব্রহ্মেরই উল্লিখিতরূপ উৎপত্তি লয় হয় এবং ব্রহ্মই একমাত্র বিদ্যমান রহিয়াছেন। যাহা কেবল নাম দ্বারাই নির্ব্বাচিত, নামের বিলয়ে তাহারও লয় হইয়া থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, যেমন কবি-বর্ণনায় গন্ধর্ব্বনগরের বৈচিত্র্য নামমাত্রেই নির্দ্দিষ্ট; কিন্তু পাঠকেরা প্রকৃতপক্ষে তাহা দেখিতে পায় না, তেমনি এই যে জগৎ-সৃষ্টি-রূপ বিকারাদি, ইহাও নামমাত্র বৈ আর কিছুই নয়; পরন্তু প্রোক্ত কবি-বর্ণিত বিষয়ের বোদ্ধা চিন্মাত্র বলিয়া তাহার জ্ঞানে ঐ বিষয় যেমন সত্যরূপে প্রতীতিগোচর হয় এবং কবিবর্ণিত নগরাদি যেমন নির্ব্বাচন মাত্রেই সুসিদ্ধ হইলেও প্রতীতিশালী ব্যক্তি যেমন চৈতন্যশালীই থাকিয়া যায়, তেমনি এই বিকার ও বিকারাদি অর্থহীন সকলই ব্রহ্ম বলিয়া বিদিত; কেন না, এ জগতে বিকারাদি নামে বাস্তবিক কিছুই বিদ্যমান নাই। ব্রহ্মের অনন্তত্ব হেতু সার্থক, নিরর্থক, বর্জ্জন, অবর্জ্জন, সমস্তই ব্রহ্ম; কাজেই বিকারাদি যে কিছু আছে, সকলই ব্রহ্মে অধিষ্ঠিত এবং ক্রমশ ব্রহ্মই সমুৎপাদিত। মরুপ্রদেশে জল ভ্রম হয়; এই ভ্রমের প্রতি কারণ

যেমন মরীচিকা, তেমনি যত কিছু অন্যার্থ আছে, জানিবে—তৎ সমস্তেরই মূল ব্রহ্ম; সমস্তই ব্রহ্মস্বরূপ। বীজ—পুষ্প ও ফলের অভ্যন্তরে থাকিলেও তাহার অভ্যন্তর যেমন পৃথক্ বলিয়া মনে হয় না, ফলতঃ পুষ্প-ফলাদি নিজোৎপাদিত পদার্থে বীজসত্তার যেমন অনুবর্ত্তন, জানিতে হইবে—সৃষ্টিকার্য্যে চিৎস্বরূপেরও অনুবর্ত্তন তেমনই। অতএব সকলই যে চিদাত্মক মাত্র, ইহাই প্রকৃত নিশ্চেয়। অঙ্কুর, শাখা, পল্লব, ইত্যাদিরূপ পর পর বিকারে পরিণত হইয়া বীজসত্তা যেমন তত্তৎ প্রকার-ভেদের প্রতি কারণ হইয়া থাকে, তেমনি জানিতে হইবে—চিদ্‌ঘনের যাহা চিদ্‌ঘনত্ব, তাহাও ক্রমে ক্রমে এই ত্রিজগদ্বিকারে পরিণতি প্রাপ্ত হইয়া তদীয় কারণরূপে অবস্থিত হইয়া থাকে। অগ্রে এক, পরে দুই, এতদনুসারে দ্বৈতকল্পনা একেরই অধীনতায় অবস্থিত; কাজেই যাহা একাদ্বয় চিৎ, তাহাই তত্ত্বসার; অন্য যত কিছু—সকলই অতত্ত্ব বলিয়া গণ্য। এই যে জগৎ দেখা যাইতেছে, ইহা কেবল জাড্যকল্পনা হইতেই জন্মিয়াছে। কেন না, চিৎ কখনই ঈদৃশ জড়স্বভাব-সম্পন্ন হইতে পারে না। যাহা চিৎ, তাহার কখনই স্বভাবের বৈপরীত্য হইবার সম্ভাবনা নাই। চিৎ ও অচিৎ এই দুয়ের অস্তিত্ব অসম্ভব; ঐ দুই বলিয়া যাহাকে নির্দ্দেশ করা হয়, তাহা অন্তরে একই বা অভিন্নভাবেই পরস্পর পরস্পরের অন্তর্নিবিষ্ট। শিল্পী জন মহাশিলার অন্তরে প্রতিকৃতি কল্পনা করে। ঐ কল্পিত প্রতিকৃতির সত্তা আর চিত্তের অভ্যন্তরে মায়াকল্পিত জাগতী সত্তা, উভয়ই তুল্য। একই ব্রহ্ম—রেখা ও উপরেখাময়ী প্রকাণ্ড শিলার ন্যায় এই ত্রৈলোক্যময়রূপে পরিদৃশ্যমান হইয়া থাকেন। শিলাগর্ভে পদ্মাদি চিহ্ন থাকে, সে চিহ্ন যেমন শিল্পী জনের কেবল বাসনাকল্পনা আর তাহা যেমন ক্ষয়োদয়হীন নিত্য বলিয়া নিরূপিত, তেমনি জানিবে—এই যে 'তুমিত্ব' 'আমিত্ব' প্রভৃতি অহম্ভাবময়ী জাগতী গতি, ইহাও অস্তোদয়-বর্জ্জিত নিত্যাকারে বিভাত। শিলামধ্য-গত রেখাদি যেমন শিলাময়; তাহার সারতাও যেমন শিলা বৈ আর কিছুই নয়, কাজেই জানিবে—এই যে অস্মৎপরিজ্ঞাত জীবেশ্বররূপ জগৎকর্ত্তা বা তদীয় কর্তৃত্বাদি এবং কার্য্যস্বরূপ জগৎ, সকলই তেমনি চিৎ বা চিৎস্বরূপ। তত্ত্বদর্শনে শিলামধ্যগত পদ্মাদির স্পন্দন,

অস্পন্দন, আবির্ভাব বা তিরোভাব কিছুই যেমন লক্ষ্য হয় না, আত্মতত্ত্বের সাক্ষাৎকার ঘটিলে জগৎকর্ত্তৃ প্রভৃতিরও অবস্থা সেইরূপই জানা যায়। এই যে জগৎ বা ব্রহ্ম, ইহাকে কেহই নির্ম্মাণ বা বিনাশ কিছুই করিতে সক্ষম নহে; কাজেই ইহা যে কাহারও নির্ম্মিত, তাহা বলা যায় না; ইহা যে হয়, তাহাও নহে এবং ইহা যে বিনষ্ট, তাহাও কখন নহে। গিরি-শৃঙ্গকে যেমন গিরি হইতে স্বতন্ত্র বা তদ্‌বিকার প্রাপ্ত বলা যায় না, ঐ জগৎ ও ব্রহ্মসম্বন্ধেও সেইরূপ ভাব পরিব্যক্ত। শিলা যেমন বহু শিল্পীর বিবিধ বিরুদ্ধ বিশেষ বিশেষ মানস-কল্পনায় নানাকারে প্রকাশমান হইলেও সে সকল যেমন একই অভিন্ন শিলা হইয়া অবস্থান করে, তেমনি নানা জীবজাতির বহু বিরুদ্ধ বিশেষ বিশেষ কল্পনা সত্ত্বেও জানিবে,—সেই একই ব্রহ্ম স্বস্বরূপে বিরাজিত। কেবল এই মাত্র বলা যায় যে, তিনি যেখানে যেরূপ আকারে কল্পিত হইয়া থাকেন, সেইখানে সেইরূপ আকারেই অবস্থান করেন। বস্তুগত তদীয় ভেদ কিছুই নাই। এই যত কিছু পদার্থ দেখা যাইতেছে, এতৎসমুদায়ে ব্রহ্মসত্তা বিরাজমান; ব্রহ্মসত্তাই এই দৃশ্যমান পদার্থ-পরম্পরার সত্তা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। স্বপ্নদৃষ্ট বিষয় ও বিচিত্র কল্পনা-ভেদ যেমন সুষুপ্ত অবস্থায় জীবমাত্রেই অবিরোধে অনুভব করে, অথচ বাস্তব পক্ষে তাহা অলীক বৈ আর কিছুই নহে, এই পরিদৃশ্যমান সমস্তই তেমনি অনুভূত হইয়া থাকে। ফলতঃ সমস্তই সেই একই ব্রহ্ম এবং সকলই সেই সদাত্মকরূপে বিরাজিত। সুতরাং এই বিবিধভাব বিকারময় জগৎসম্বন্ধীয় মহাভ্রম শিলাভ্যন্তরগত পদ্মাদি-সন্নিবেশের ন্যায় উন্মেষিত বাসনামাত্র বৈ আর কিছুই নহে। যদিও এ জগৎ উন্মেষিত বাসনামাত্র, তথাচ ইহা চিদ্‌ঘন ব্রহ্মাকাশময় বলিয়া নিত্য ও প্রশান্ত। এই সৃষ্টিপ্রভৃতি অবস্থা শিলার উদরগত পদ্মাদির ন্যায় অকিঞ্চিৎকর; ইহা ব্রহ্মাত্মরূপে পরিদৃশ্যমান হইলেও বাস্তব পক্ষে ইহা কখনই সত্তা বা স্বরূপস্থিতি-লাভে সক্ষম নহে।

ষট্‌চত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪৬ ॥

সপ্তচত্বারিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রঘুনন্দন! আমি যে অচেতন ফলের সহিত চিত্তত্ত্বের দৃষ্টান্ত তোমায় প্রদর্শন করিলাম; ইহার কারণ এই যে, চিৎ-তত্ত্ব যে কালে ঐ অচেতন ফলবৎ স্বস্বরূপের সন্ধানে বিমুখ হয়, তখনই সৃষ্টিবিস্তার ঘটে। প্রসিদ্ধ স্বপ্ন ভিন্ন চিত্তত্ত্বের যে যুগ-বর্ষাদিরূপে অপর স্বপ্ন, তাহাই স্বীয় সত্তার সন্নিবেশক্রমে সৃষ্টিরূপে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। এই সৃষ্টিকে চিৎতত্ত্বের তুল্য সত্তাসম্পন্ন স্বগত ভেদ বলা যায় না। দেশ, কাল ও কাষ্ঠাদি যে কিছু পরিদৃষ্ট হয়, তৎসমস্তই চিন্ময়; সুতরাং 'ইহা অন্য, আর উহা ভিন্ন' এবম্প্রকার কল্পনার উপপত্তিও ইহাতে হইতে পারে না। যত কিছু শব্দ, শব্দার্থ, বাসনা বা সঙ্কল্প-বিকল্প-কল্পনা, সে সমুদায়ের জ্ঞাতার একাত্মকতা নিবন্ধন কিরূপে ইহাকে অসৎ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে? ফলের অভ্যন্তরে মজ্জাদি আছে, সে সকলের সন্নিবেশ যেমন একই বস্তু, অথচ পারিভাষিক নামাদি দ্বারা বীজ, সার, ইত্যাদিরূপে নানা, তেমনি ঐ চিৎতত্ত্বেরও পারিভাষিক নামানুক্রমিক বিচিত্রতা হেতু সত্তা ও ঘনতা একমাত্র হইলেও নানাকারে বিরাজমানা। ফলের অন্তরে যে সারসত্তা আছে, তাহার ন্যায় ঐ চিৎসত্তা ও তদভ্যন্তর-গত সন্নিবেশ-নিষ্পত্তি যদিও অনানা, তথাচ নানা এবং উহা যদিও অবিকৃত, তথাচ বিকৃতবৎ ভাসমানা। শিলামধ্যগত পদ্মাদি চিহ্নের সন্নিবেশের ন্যায় যাহাকে জগৎ বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, তাহা দর্পণ-বিম্বিত নগরের ন্যায় ঐ চিন্মুকুরেই প্রতিবিম্বিত। ঐ চিৎস্বরূপই বস্তুগত্যা বাহিরে কোন কিছুরূপে প্রতিভাত না হইলেও প্রতিভাত বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে। যেমন চিন্তামণির অপূর্ব্ব মায়িক শক্তি আছে বলিয়া তাহার সন্নিধানে যাহাই কেন চিন্তা করা যাউক না, সেই চিন্তিত বিষয়ই তাহাতে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তেমনি ঐ পরমোত্তম চিন্মণিমধ্যেই সহস্র সহস্র জগতের অস্তিত্ব উপলব্ধি হইয়া থাকে। মুক্তাশুক্তির অভ্যন্তরে যেমন মুক্তারাজি বিরাজিত, তেমনি চিৎশক্তির সম্পুটকমধ্যেই এই

জগৎমৌক্তিক তন্ময় হইলেও তদন্তবৎ পরিদৃশ্যমান। মনে হয়, যেন উহা সেই চিৎসম্পুটকে উল্লিখিত হইয়া বিস্তার প্রাপ্ত হইয়াছে। ভগবান্ ভাস্বান্ যেমন আপনার আবির্ভাব ও তিরোভাবক্রমে রাত্রিদিন বিরাজ করেন এবং জগতের সমস্ত বস্তু দেখাইয়া দেন, তেমনি এই যে ভাস্বান্ চিৎ-সূর্য্য, ইনিও নিজের অঙ্গেই স্বপ্রকাশ ও অপ্রকাশস্বরূপ জাগতিক দ্রব্যের প্রকাশ ও অপ্রকাশ করিয়া থাকেন। সমুদ্রের জল, তরঙ্গ, আবর্ত্ত ও স্পন্দাদি যেমন সমুদ্র হইতে অভিন্ন হইলেও ভিন্নবৎ প্রতীত, তেমনি ঐ চিৎশিলার অভ্যন্তরসন্নিবেশ উহা হইতে অভিন্ন হইলেও ভিন্নবৎ প্রতিভাত। যাহা আছে, যাহা নাই, যাহা অতীত হইয়াছে, ভবিষ্যতে যাহা হইবে বা বর্ত্তমানে যাহা হইতেছে, এতৎসমুদায়ই সেই চিৎশিলার দেহাঙ্কিত পুত্তলিকাস্বরূপ। ভাব কিম্বা অভাব পদার্থের মধ্যে যাহা সত্যস্বরূপে প্রথিত, তাহা সেই পূর্ব্ববর্ণিত চিদ্বিল্ব-ফলেরই মজ্জা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট; বলিতে কি, সকল পদার্থই যখন সেই চিদ্বিল্ব-ফলের মজ্জাসার, তখন তাহাই চিন্ময় এবং চিৎতত্ত্ব; ইহাই নিশ্চিত। যেমন শিলাফলক পরিত্যাগ করিলে পদ্মচক্রাদি চিহ্ন কেবল শব্দার্থমাত্রেই পর্য্যবসিত হয়, তাহার বাস্তবিকতা কিছুই থাকে না, তেমনি ঐ চিৎতত্ত্ব হইতে যদি পৃথক্ করিয়া ধরা যায়, তাহা হইলে এ জগতের অসত্তাই প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং যে কিছু বৈচিত্র্য বা নানাত্বভেদ দেখা যায়, তাহা ঐ চিন্ময়ই; তদ্ভিন্ন দ্বিতীয় কিছুই নাই। আর যদি ঐ শিলা হইতে পৃথক্‌রূপে ধরিয়া লওয়া না হয়, তাহা হইলে পদ্মাদি চিত্র-চিহ্নের যেমন পৃথক্ বস্তুত্ব আর থাকে না, সেই একই শিলাগর্ভ বা শিলা-ফলক বলিয়া প্রতীতিগোচর হয়, তেমনি এই জগৎপ্রপঞ্চকে ঐ চিৎ হইতে স্বতন্ত্ররূপে যদি ধরিয়া লওয়া না হয়, তাহা হইলে এ সকলই যে সেই একই চিৎ, ইহাই প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। জীব মরুমরীচিকায় ভ্রান্ত হইয়া জলের জন্য প্রধাবিত হয়; যিনি স্থলাভিজ্ঞ জন, তিনি তাহাকে স্থল বলিয়াই বুঝেন; পরন্তু যিনি বিচক্ষণ ব্যক্তি, তিনি তাহা সৌরকর বলিয়াই ধারণা করেন। ইহাতে প্রকৃত পক্ষে দেখিতে গেলে দেখা যাইবে—আতপই সত্য আর জলভ্রমাদি অসত্য; এই প্রকার সদসন্ময়

মরীচিকার ন্যায় তুমি নিজেকে সদসদ্বপু বলিয়া বুঝিতেছ সত্য; বাস্তুবিক পক্ষে তুমি তাহা নহ; তুমি সেই একমাত্র চিৎস্বরূপই। গুহাগর্ভে জলরাশি যেমন স্পন্দিত হয়, তরলাকারে চলাচল করিয়া থাকে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে জলের স্পন্দন নাই, তেমনি ঐ ব্যাপরোন্মুখ চিদ্ঘনের অন্তরও স্পন্দিত হইয়া উঠে। শিলায় যে সকল শঙ্খ পদ্মাদি সমুৎকীর্ণ হয়, তাহারা যেমন শিলাময় বৈ আর কিছুই নয়, তেমনি এই চিদবস্থিত জগৎও চিন্ময় বলা যায়। পরন্তু সামান্যবুদ্ধি লোকে তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারে না বলিয়াই এ জগৎ অচিন্ময় বলিয়া প্রতীয়মান হয়। এই জন্য বলিতেছি, তুমি ইহা জানিবার এবং জানিয়া হৃদয়ঙ্গম করিবার চেষ্টা কর যে, এই যে কিছু জগৎ-পদ্মাদি পদার্থ-পরম্পরা, এ সকলই ঐ চিৎশিলা-গর্ভে অবস্থিত। আমি দৃষ্টান্তরূপে তোমায় যে মহাশিলার বৃত্তান্ত বলিলাম, যে শিলা তুমি স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছ বলিয়া জানাইলে, সে শিলাকেও চিৎশিলা বলা হয়। শিল্পিগণের শত সহস্র চেষ্টা বা যত্নেও উহা সচ্ছিদ্র হয় না; উহাতে ভেদ বিকার কিছুই নাই। উহা অজ, এবং সংশান্ত। উহাতে যে পদ্মাদি সন্নিবেশ, তাহা মিথ্যা; সুতরাং উহা সন্নিবেশসদৃশ ভাসমান। ব্রহ্ম নিরঞ্জন; স্বচ্ছ শরৎকালবৎ সুনির্ম্মল। তিনিই এ জগৎ প্রকাশিত করিয়া তাহাতে তাপবিতরণে ব্যাপৃত রহিয়াছেন। গলিত অমৃত রসময় সৌম্য সুধাকরের ন্যায় ব্রহ্মই এ জগৎ পরিস্ফুরিত করিতেছেন। তিনিই চন্দ্রের ন্যায় প্রকাশমান হইয়া জগদাকারে প্রকাশ পাইতেছেন। এই বিশ্ব ব্রহ্মপদে সুষুপ্তবৎ ও শিলোৎকীর্ণ পদ্মাদির ন্যায় অবস্থিত। ফলে শিলাঙ্কিত পদ্ম যেমন পদ্মাকারে বিনশ্বর এবং শিলাস্বরূপে অবিনশ্বর, ব্রহ্মে এই জগতের স্থিতিও ঐপ্রকার। ব্রহ্মে যেমন ব্রহ্মত্ব অবস্থিত, এই জগৎও ব্রহ্মে সেইরূপই বিরাজিত। যেমন তরু ও পাদপ নামে ভিন্ন; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তরু ও পাদপের প্রভেদ কিছুই নাই, তেমনি ব্রহ্ম ও জগৎ, এ উভয়ের নামে মাত্র ভেদ, বাস্তব ভেদ কিছুই নাই; ফলে জগৎও যাহা, চিন্ময় ব্রহ্মও তাহা বৈ আর কিছুই নহে। যেমন চিৎস্বরূপ, এ জগৎও তেমনই; চিৎস্বরূপের ন্যায় ইহার ভাবাভাব কদাচ নাই। মরুস্থলীগত সৌরতাপ যেমন জলভ্রমের

উদ্ভাবক, জানিবে—ঐ ব্রহ্মই তেমনি জগতের আভাসরূপ। করকাদি যেমন কেবল আকৃতিগত ভিন্ন; পরন্তু তাহা সকলই জল মাত্র, ব্রহ্ম ও জগৎসম্বন্ধেও সেই কথা। সৌরকর যেমন পরিণামে নির্ম্মল জলাকারে পরিণত হয়, এই যে মেরাদি স্থূলতম পদার্থ-নিচয়, ইহারাও তেমনি তত্ত্বদর্শী জনের নিকট শুদ্ধ সূক্ষ্মতমত্বাদি ধর্ম্মে ব্রহ্মস্বরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে। অতএব ব্রহ্মজ্ঞগণ পরিজ্ঞাত আছেন যে, তৃণাদি ব্রহ্মাণ্ডান্ত যাবৎ সমস্ত বাহ্য প্রপঞ্চ এবং চিত্তাদি হিরণ্যগর্ভ পর্য্যন্ত নিখিল আন্তরিক প্রপঞ্চ, এতৎসমুদায় পদার্থ-পরম্পরার পরস্পর বিভাগক্রম অবলম্বন করিলে সর্ব্বশেষে যাহা গিয়া অবিভাজ্য বলিয়া নিরূপিত হয়, তাহাই পরম সূক্ষ্ম বস্তু এবং তাহাই ব্রহ্মের রূপ; তত্ত্বদর্শিগণ তাহাকেই পরম পদার্থ বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকেন। বিভাগক্রমে যে যে সূক্ষ্মভাবের লাভ হয়, সেই সেই সঙ্ঘাত বা মিলিতভাবই উত্তরোত্তর স্থূল, স্থূলতর ও স্থূলতমাদির আকারে কল্পিত হইয়া থাকে। স্থূলত্বের নিদর্শন—সুমেরু প্রভৃতি এবং ক্ষুদ্রতার নিদর্শন—তৃণাদি। অতএব দেখা যায়, যখন সূক্ষ্মতার সার সৎ, তখন ইহাও অবশ্যই জ্ঞাতব্য যে, স্থূলতার সারও সেই সৎ বৈ আর কিছুই নয়। যেমন পরমাণুগত রসশক্তি স্থূল জলে ইন্দ্রিয়গোচর হয়, সেই স্থূল জলগত রসশক্তি পরমাণু হইতেই উপচয় প্রাপ্ত হইয়া নেত্রগোচর হইয়া থাকে, হে রঘুনন্দন! জানিবে—ব্রহ্মসত্তাও সেই প্রকার স্থূল পদার্থে স্থূল জলগত রসশক্তিবৎ স্থূল ঘটাদিগত হইয়া অনুভূতিগম্য হয়। তৃণ, গুল্ম, লতা ও জল প্রভৃতি বিভিন্নরূপে ঐ রসশক্তি যেমন ইন্দ্রিয়গোচর হয়, কিন্তু যাহা রসশক্তি, তাহা একই মাত্র; তেমনি ব্রহ্মত্বও নানা ভাবেই আবির্ভূত হইয়া থাকেন। সেই ব্রহ্মতা কখন অনুভূত এবং কখন বা তাহাই আবার অব্রহ্মতা বলিয়া প্রতিপন্ন। অর্থাৎ যাহা জলীয় পরমাণুগত রসশক্তি, তাহাই যেমন স্থূল জলে অনুভূত হয়, তেমনি সেই যাহা সর্ব্বমূল ব্রহ্মসত্তা, তাহাই ঘটাদি-পদার্থে অনুভূতিগম্য হইতেছে। ফলে, ব্রহ্মসত্তা বা সৎস্বরূপ ব্রহ্মই—এই ঘট, ঘট আছে, ঘট বিদ্যমান, এইরূপে ঘটের সঙ্গে সঙ্গেই পরিব্যক্ত হইতেছেন। যে রসশক্তি জলে আছে, সেই রসশক্তিই তৃণাদি পদার্থে বিদ্যমান রহিয়াছে। রসশক্তি একই;

তাহা তৃণাদি বিভিন্ন পদার্থে বিভিন্নরূপে প্রকাশ পাইতেছে। এইরূপে দেখা যায়, একই ব্রহ্মসত্তা বিভিন্ন পদার্থে বিভিন্ন প্রকারে প্রকাশ প্রাপ্ত হইতেছে। জানিবে—রূপবিলাস বা নীলপীতাদি বর্ণবৈচিত্র্যের সূক্ষ্ম পরমাণুগত সাম্যের ন্যায় ব্রহ্মসত্তাই এই নিখিল ঘটাদি-ব্যক্তির গুণী ও গুণরূপী অবান্তর বিজাতীয় বৈলক্ষণ্য-আকারে অর্থসত্তা-স্বরূপে বিরাজমানা। এইরূপই বটে নিয়ম নির্দ্দিষ্ট আছে যে, উৎপত্তিক্ষণে কারণ—কার্য্যরূপে এবং ধ্বংসক্ষণে কার্য্য—কারণরূপে পরিণত হইয়া অবস্থান করে। ময়ূরের উপাদান অণ্ডরসেই যেমন তাহার পিচ্ছ, পক্ষরাজি ও কাঠিন্য বিরাজমান, তেমনি মেরু প্রভৃতি যে কিছু স্থূল কার্য্যজগৎ, তৎসমস্ত তিরোভাব-ক্ষণে চিত্তে এবং সম্পূর্ণ মহাপ্রলয়-ক্ষণে সেই চিৎতত্ত্বে অবস্থিত হইয়া থাকে। ময়ূরাণ্ডরসে যে প্রকার বিচিত্র পিচ্ছিকাপুঞ্জ বিদ্যমান, এই বিশ্বব্যাপক চিৎতত্ত্বেও তেমনি এই নানাত্ব-বৈচিত্র্য বিরাজমান। ময়ূর আর ময়ূরময় অণ্ডরস যেমন বৈচিত্র্যময়, ভেদদৃষ্টিতে এই জগৎ ও তদধিষ্ঠিত ব্রহ্মও তেমনি নানাস্বরূপ। অণ্ডাবস্থ রসাকার ময়ূর যে প্রকার নানারূপ অথচ একমাত্র রসস্বরূপ বলিয়া একই রূপ, ঐ ব্রহ্মও সেই প্রকার। সুতরাং বিচিত্র ময়ূরপুচ্ছ যেমন তদীয় ডিম্বরস ভিন্ন অন্য কিছু নহে, তেমনি এই বিচিত্র বিশ্বকেও ব্রহ্মরস ব্যতীত আর কিছুই বলা চলে না। যখন ব্রহ্ম সৎ আর জগৎ অসৎ, তখন অদ্বৈতই সৎ এবং দ্বৈত জগৎই অসৎ। সৎ ও অসৎ উভয়ই একাধারে অবস্থিত; কেন না, সৎ ও অসতের যে তত্ত্ব, তাহা সদ্বস্তুতেই পর্য্যবসিত। ফলে অভাব বলায় কোন একটা ভাব বস্তুরই অভাব বুঝা যায়। পরন্তু সেই অভাব কখন শূন্যনিষ্ঠ হইতে পারে না; অতএব সেই ভাব পদার্থ কে? তাহা সেই পরব্রহ্ম বলিয়াই বিজ্ঞেয়। সুতরাং ব্রহ্মের অদ্বয়ত্ব নিবন্ধন এই ভিন্নাভিন্ন-স্বভাব জগৎস্বরূপ অনুভূতিসিদ্ধ মাত্র; পরন্তু ইহা উপপত্তি-সিদ্ধ নহে। এ জগৎ চিৎতত্ত্বে ওতপ্রোতভাবে বিরাজিত; ময়ূরে অণ্ডরস ও অণ্ডরসে ময়ূরবৎ এই জগতে চিৎতত্ত্ব ও চিৎতত্ত্বে জগৎ অবস্থিত এবং ময়ূর ও অণ্ডরসের ন্যায় ঐ ব্রহ্ম ও জগৎ এক অথচ এক নহে—ভিন্ন।

হে রাঘব! এই যে বিবিধ পদার্থ-ভ্রমরূপ পিচ্ছপুঞ্জ-পরিশোভিত বিশ্বময়ূর, এ ময়ূরের অণ্ডরস ঐ আদ্য ব্রহ্ম চিৎতত্ত্বই। এ রসে ময়ূর এবং অময়ূর উভয় রূপই বিদ্যমান। ফলে, বিশ্ব এবং বিশ্বের অভাব এই উভয় রূপই আছে। সুতরাং যাহা ময়ূরাণ্ডরস, তাহাই যথাকালে ময়ূর; কাজেই ময়ূর ও ময়ূরাণ্ড এক বা অভিন্ন বস্তু বলিয়াই বিদিত। এইরূপে জানিতে হইবে, চিৎ ও জগৎ একই বস্তু; অপিচ ময়ূরাবস্থা যেমন বিচিত্রিত, এই বিশ্বব্যবস্থাও তেমনি বৈচিত্র্যময়।

সপ্তচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪৭ ॥

অষ্টচত্বারিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রঘুনন্দন! স্বীয় রূপাদি পরিণাম প্রাপ্ত না হইয়াও ময়ূর যেমন অণ্ডমধ্যে অধিষ্ঠিত থাকে, জানিবে—ঐ যে বিশুদ্ধ চিদণ্ড, উঁহার অভ্যন্তরেও অহন্তাবাদি অন্তর্জগৎ এবং দিক্ ও আকাশ প্রভৃতি বহির্জগৎ সকলই অনুদিত অবস্থায় অবস্থিত রহিয়াছে। বস্তু-গত্যা কিছুই যাহাতে অভ্যুদিত নহে, অথচ অবিদ্যার প্রভাবে তাঁহাতেই কিন্তু সকল বিদ্যমান। তিনিই—সেই চিদানন্দই এ দেহে অঙ্গসমূহের রস-স্বরূপ প্রাণ হইয়া স্বর্গাদি উত্তম বৈষয়িক সুখে, চিত্তবৃত্তি-ভেদে বিচিত্র ভোগরূপে, স্ফটিকশিলা বা মুকুরাদিগত চন্দ্রবিম্ববৎ প্রতিবিম্বিত হইয়াছেন এবং হইতেছেন। যাহা প্রচুরতর আনন্দ, তাহা সেই মূল চিদ্ঘনাকারেই বিরাজিত; তদীয় প্রতিবিম্ব—এই বিষয়ানন্দ-সুখ, অনুভব দ্বারাই অনুমানযোগ্য। তুরীয় পদাবস্থিত মুনি, দেব, প্রমথ, সিদ্ধ ও মহর্ষি-সম্প্রদায় সর্ব্বদা সেই স্বাত্মস্বরূপ নিরতিশয় ভূমানন্দকেই অনুভব করিয়া থাকেন। এতদ্ভিন্ন অন্যের এরূপ অনুভব হয় না। কেন হয় না? তাহার কারণ এই যে, তাহার নানাবিধ দৃশ্য-দর্শনে প্রাণ-স্পন্দ-জনিত চিত্তবিক্ষেপ আসিয়া উপস্থিত হয়; এই জন্যই সেই পরমানন্দ তাদৃশ

জনের অনুভব-গম্য হয় না। কাজেই বলা যায়, যাঁহারা নিরুদ্ধদৃষ্টি ও নির্নিমেষ হইয়াছেন, যাঁহাদের সর্ব্বেন্দ্রিয় তাঁহাতেই নিবিষ্ট আছে, অন্যান্য দৃশ্য-দর্শনের আসক্তি তাঁহাদেরই নাই; তাঁহারাই প্রকৃত নিস্পন্দ হইয়াছেন। কর্ম্মের পথে অবস্থান করিয়াও যে সকল মহাপুরুষ ষষ্ঠ বা সপ্তম ভূমিকায় অধিরোহণ করিয়াছেন, এবং মুহূর্ত্তকালের জন্যও বাহ্য বস্তুসত্তার চিন্তা-ব্যাপারে লিপ্ত হইতেছেন না, যাঁহারা জ্ঞান ও জ্ঞেয় সম্বন্ধের ত্যাগ-সমাধিতেই অবস্থান করিতেছেন, চিত্রলিখিত অবরুদ্ধ-সংস্থানের ন্যায় যাঁহাদের প্রাণ মন নিস্পন্দ, তাঁহারা—সেই মহাপুরুষরাই চিত্ত ও চিত্তাশ্রয় বিষয় বিসর্জ্জনপূর্ব্বক ভূমানন্দ ব্রহ্মপদে সমভাবে অবস্থিত হইয়া থাকেন। জগৎপতি সর্ব্বদাই অন্তরে স্বরূপানন্দময়; তিনি এরূপ হইয়াও যেরূপে বাহ্যিক মায়াবশে এই জগদ্ব্যবহার প্রতিষ্ঠা করিতেছেন, উল্লিখিত ষষ্ঠ বা সপ্তম ভূমিকারূঢ় মহাপুরুষেরাও তেমনি অন্তরে অখণ্ড বৃত্তিধারার স্পন্দনে প্রচুরতর আনন্দাস্বাদ-রূপে পরম পুরুষার্থ সাধন করিয়া থাকেন। তাঁহাদের এই যেরূপ আন্তরিক সাধনা, এইরূপে তাঁহারা আবার চিত্ত-চেত্য-স্পন্দনবশে বাহ্যিক ব্যবহার-প্রতিষ্ঠারূপ অর্থ সাধনও করিয়া থাকেন। যেমন নির্ম্মল চন্দ্রকর তরু-পল্লবাদির অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া দর্শকের চিত্তাহ্লাদ উৎপাদন করে, তেমনি যাঁহারা ষষ্ঠ বা সপ্তম ভূমিকায় অধিরোহণ করিয়াছেন, তাদৃশ মহাপুরুষদিগের বাহ্যিক দৃশ্য বিষয়ের সহিত বুদ্ধিবৃত্তির সংযোগ বশতঃ জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয় এই ত্রিপুটীক্রমে নিরতিশয় আনন্দের অভিব্যক্তি হয়,—হইয়া আহ্লাদ বিস্তার করে। প্রকৃত কথা এই যে, তাঁহাদের নিখিল ব্যাপারই সুখময় হয়। চন্দ্রমণ্ডল হইতে গগনে গলিত স্বচ্ছ কৌমুদী যেমন আহ্লাদময়, সেই যিনি শুদ্ধ সম্বিৎস্বরূপ পরমাত্মা, তদীয় রূপও তেমনি সুপরিশুদ্ধ আহ্লাদময়; আত্মার তথাবিধ আহ্লাদময় স্বরূপ পূর্ব্ববর্ণিত মহাপুরুষদিগেরই অনুভূতি-গোচর। দেহাদি বলিয়া কোন কিছু উপাধি তাহার নাই। সে রূপ প্রত্যক্ষ করিবার শক্তিও কাহারও নাই। তাহা কি, বা কিরূপ, এতাদৃশ উপদেশের বিষয়ীভূত বলিয়াও তাহাকে বর্ণন করা যায় না। তাহা না অতি নিকটে, না অতি দূরে; তাহাকে কেবল অনুভব-লভ্য

আত্মার বিশুদ্ধ চিৎস্বরূপ বলিয়াই ব্যাখ্যা করা যায়। ঐ চিৎস্বরূপের নাই দেহ, নাই ইন্দ্রিয়, নাই প্রাণ, নাই চিত্ত, নাই বাসনা, কিছুই নাই। উহা না জীব, না স্পন্দস্বরূপ, না সম্বিত্তি, না জগৎ, কিছুই নহে। উহাকে অতি নিকটবর্ত্তী বলিয়াও বর্ণন করা যায় না; এবং উহা যে অতি দূরে আছে, তাহাও বলিবার যো নাই। অথবা উহা যে নিকট-অনিকট, তাহাও নহে। উহাকে মধ্যস্থ বা মধ্য বলিয়াও নির্দ্দেশ করা যায় না। উহা না শূন্য, না অশূন্য, এবং না শূন্যাশূন্য, কিছুই নহে। উহাকে দেশ কালাদি বস্তু বলিয়াও ব্যাখ্যা করা হয় না অথবা দেশ, কাল, পাত্র দ্বারাও উহা নির্ণেয় হইবার নহে। অথচ উহাই আবার দেশ, কাল ও পাত্র দ্বারা পরিচ্ছেদ-যোগ্য হয়। এই দৃশ্যপরম্পরা যে আধারে বা যাহার অধীনে স্পন্দিত হইতেছে, সে আধার কেবল ও আত্মা। আত্মার আদি নাই, অন্ত নাই; তিনি অবিনাশী ও অবিরোধী। ঐ চিদ্ব্রহ্মকে মহাকল্পাদি কালে আবির্ভূত অব্যাকৃত কারণরূপ বলিয়াও নির্দ্দেশ করা যায় না। তিনি যে কল্পান্ত বা প্রাকৃতাদি প্রলয়স্বরূপ, তাহাও নহেন। সৃষ্টির আরম্ভকালে, ইহ বা পরলোকে অগ্নি বায়ু প্রভৃতি দ্বারা দহনে, শোষণে, ক্লেদনে বা ভেদনাদি বিকারেও তিনি বিকৃত হইবার নহেন। তাঁহাকে সবিকার বা নির্ব্বিকার কোন বস্তু বলিয়াই ব্যাখ্যা করা যায় না। কত সহস্র সহস্র দেহরূপ ঘট জন্মিতেছে, কত ধ্বংস পাইতেছে, কিন্তু কৈ, আত্মাকাশের ভিতরে বাহিরে কুত্রাপি উৎপত্তি-বিনাশের কথা মাত্রও তো নাই! বলিতে কি, ঐ আত্মাকাশের খণ্ড-বিভাগ পর্য্যন্তও সম্ভবিতে পারে না। সুতরাং দেহাদির বিকার বিলোকন করিয়া ঐ চিদ্ব্রহ্মের বিকার কল্পনা অকর্ত্তব্য; ফলে ঐরূপ কল্পনা কিরূপেই বা মনে স্থান প্রাপ্ত হইবে?

হে আত্মজ্ঞগণের অগ্রণী! তাই বলিয়া দেহাদিরে তুমি পৃথক্ পদার্থ মনে করিও না। কেন না, দেহাদি যে কিছু বস্তু, সমস্ত ঐ আত্মাই। কেবল মাত্র বোধের বিকৃতিঘটনায় উহা কিঞ্চিৎ পৃথক্‌রূপে অবস্থিত বলিয়া মনে হয়। যে বুদ্ধি সর্ব্বথা সুনির্ম্মল হইয়া সুসিদ্ধ হইয়াছে, তথাবিধ স্ব স্ব বুদ্ধি দ্বারাই জ্ঞানিগণ এই বিশ্বসংসারকে আত্মময় বলিয়া বিদিত

হইয়াছেন। তাই বলিতেছি, রামচন্দ্র! তুমি রাজকীয় কার্য্যে ব্যাপৃত থাক—থাকিয়াও তত্ত্বজ্ঞানের বলে সংসার যাতনা হইতে মুক্তি লাভ কর, অর্থাৎ তুমি আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকারের ফলে মুক্ত আত্মস্বরূপ ও নির্ম্মল হইয়া বিরাজ কর। এই যে চরাচরাত্মক জগৎ দেখা যাইতেছে, এ সকলই নির্গুণ, নির্ম্মল স্বরূপ ও নিরুপাধিক ব্রহ্ম। ইহার আদি অন্ত নাই, ইহা নিত্য, শান্ত, সম-স্বরূপ।

হে রঘুবর! কাল বল, কর্ম্ম বল, কর্ত্তা বল, করণ বল, ক্রিয়া বল, আর সৃষ্টি, স্থিতি, লয়, যাহাই বল, সকলই সেই ব্রহ্ম। ইহা যখন তুমি দেখিতে পাইতেছ, তখন আর এই বিশাল সংসার-চক্রে ভ্রমণ করা তোমার পক্ষে সম্ভব হইতে পারে কি?

অষ্টচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪৮ ॥

ঊনপঞ্চাশ সর্গ।

রামচন্দ্র কহিলেন,—ব্রহ্মন্! যাঁহাতে দেশকালাদি ত্রিবিধ পরিচ্ছেদ নাই; যিনি মহান্ হইতেও মহীয়ান্ বস্তু; তথাবিধ ব্রহ্মের যখন উৎপত্তি-বিকারাদি কিছুই নাই, তখন কিরূপে এ জগৎ ভাবাভাবময় হইয়া প্রতিভাসিত হইতেছে?

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! দুগ্ধ হইতে দধির ন্যায় স্বরূপের পরিবর্ত্তন ঘটনায় পুনরায় যে আর পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্তি ঘটে না, তাহাই বিকার ও পরিণামাদি নামে নিরূপিত হইয়া থাকে। ভাবিয়া দেখ, দুগ্ধ যদি একবার দধি হয়, তাহা হইলে পুনর্ব্বার সে দধি আর দুগ্ধস্বরূপ লাভে সমর্থ হয় না; পরন্তু ব্রহ্ম হইতে যে জগৎস্বরূপের আবির্ভাব ঘটে, তাহার কি আদি, কি অন্ত, কি মধ্য, সর্ব্বত্রই ব্রহ্ম। কাজেই এই জগৎসৃষ্টি কেবল নির্ম্মল ব্রহ্মমাত্র বৈ আর কিছুই নহে। জানিবে—ইহাই বটে এই দ্বিবিধ পরিণাম-ব্যাপারের পার্থক্য, অর্থাৎ কারণে কার্য্যোৎপত্তি পঞ্চবিধ; তন্মধ্যে প্রথম—অতিরোহিত প্রাগবস্থ; অর্থাৎ পূর্ব্বাবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটে না,

অথচ রূপান্তর প্রাপ্তি হয়; যথা—মৃত্তিকার ঘটাকৃতি। দ্বিতীয় প্রতিবদ্ধ প্রাগবন্ধ; অর্থাৎ যেমন জলের করকাভাব প্রাপ্তি। করকায় জল আছে, অথচ তাহা দেখিয়া তথায় জলরূপ পূর্ব্বাবস্থা পরিজ্ঞাত হওয়া যায় না। করকায় জলভাব থাকিলেও তাহা প্রতিবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। তৃতীয়—প্রচ্ছন্ন প্রাগবস্থ; যেমন রজ্জুতে সর্প। চতুর্থ—অপ্রচ্ছন্ন প্রাগবস্থ; যেমন জলের তরঙ্গিত ভাব। অর্থাৎ পূর্ব্বাবস্থা থাকিয়াও ভাবান্তরের উদ্ভব। পঞ্চম—বিনষ্ট প্রাগবস্থ ভাব; যথা—দুগ্ধ হইতে দধির উৎপত্তি। দধি আর দুগ্ধভাব প্রাপ্ত হয় না; তাহার পূর্ব্বাবস্থা দুগ্ধভাব তখন নষ্ট হইয়া যায়। যাহা হউক, বুঝা গেল, এই দুগ্ধাদির ন্যায় ব্রহ্মের বিকারিতা নাই। অপিচ পরমাণুর যে দ্ব্যণুকভাব অবয়বীর প্রতি কারণ হয়, সে ভাবও ইহাতে অসম্ভব। কেন না, যাহা দেশ-কালাদি পরিচ্ছেদ সম্পন্ন কিম্বা সংযোগ বিভাগাদি গুণ-সংযুক্ত, তথাবিধ পদার্থেরই অবয়বি-গঠনের কারণতা বিদ্যমান; পরন্তু যাঁহার দেশ-কালাদি বিভাগ নাই, সংযোগ-বিভাগাদি সম্ভব নহে, তাদৃশ অনাদি অনন্ত অসংযুক্ত অবিভক্ত ব্রহ্মবস্তুর অবয়বি-গঠন-রীতিই বা কি এবং কিরূপেই বা তাহা সম্ভবপর? কি আদি, কি অন্ত, সর্ব্বত্রই যিনি সমান, তথাবিধ ব্রহ্মের এই তদসংস্পর্শী ক্ষণবিকার সম্বিদের বিবর্ত্ত মাত্র; কেন না, অবিকারের বিকার হওয়া সম্ভব নহে। এই ব্রহ্মের না সম্বেদ্য,—না সম্বিত্তি, কিছুই নাই; তিনি 'ব্রহ্ম' এই শব্দ মাত্রেরই বাচ্য। যেমন চিদাত্মা, তেমনি তাঁহার সম্বন্ধ-সম্পর্ক কাহারও সহিত নাই। আদিতে অন্তে যেরূপ বস্তু দেখা যায়, এ ব্রহ্মকে সকলে সেইরূপ বলিয়াই নির্দ্দেশ করে; তবে মধ্যে যে তাঁহার বিকার সহ অসংস্পর্শভাব, তাহা কাহারও বুঝিবার সাধ্য নাই বলিয়াই ঐ পূর্ব্বভাব তাঁহার প্রকাশ পায়। বলা বাহুল্য, আত্মা কিন্তু কি আদি, কি মধ্য, কি অন্ত, সর্ব্বত্র সর্ব্বদা সমভাবেই বিরাজিত। যাহা বিকার, তাহা আত্মারই বস্তু বলা যায় বটে, কিন্তু যাহা আত্মতত্ত্ব, তাহা কদাপি সেই বিকারময় হইবার নহে। ঐ আত্মতত্ত্বই অরূপ—তাই ঈশ্বর; এক—তাই ঈশ্বর; নিত্য—তাই ঈশ্বর। উহা কখনই ভাববিকারের অধীন হয় না, হইতে পারে না।

রামচন্দ্র কহিলেন,—গুরুদেব! সেই ব্রহ্ম এক এবং নিতান্ত নির্ম্মল; সুতরাং তাঁহাতে সম্বিৎস্বরূপা অবিদ্যার উদয় হইবে, কিরূপে?

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! এই সকলই ব্রহ্মতত্ত্ব; ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান, এই তিন কালেই উহা বিদ্যমান। ঐ তত্ত্ব নির্ব্বিকার; উহার আদি নাই, অন্ত নাই, এবং অবিদ্যা বলিয়াও যে কোন কিছু আছে, তাহাও নাই, ইহাই বটে নিশ্চয়। 'ব্রহ্ম' এই শব্দ উচ্চারণ করিলেই তৎসঙ্গে একটা বাচ্য ও বাচকের ক্রম নির্দ্দেশ হয়; কিন্তু ব্রহ্মে তাহাও নাই। উল্লিখিত বিকারাদি অন্যভাব তো নাইই। তবে অন্য ভাব আছে বলিয়া তোমার নিকট যে বলিলাম, ইহা অজ্ঞদিগকে সহজে বুঝাইবার একটা পথ কল্পনা মাত্র। বাস্তবিক কি তুমি, কি আমি, কি জগৎ, কি দিক্, কি স্বর্গ, কি আকাশ, কি পৃথ্বী, কি অগ্নি, ইত্যাদি যত কিছু আছে, তৎসমস্তই ব্রহ্ম মাত্র। ব্রহ্মের আদি নাই, অন্ত নাই বা উহাতে অবিদ্যাসম্পর্ক কিছু মাত্র নাই। জানিবে—অবিদ্যা একটা নাম মাত্র; পরন্তু উহার সত্তা আদৌ নাই। উহা ভ্রম মাত্র বলিয়াই নিশ্চিত। বৎস রাম! এখন দেখ, যাহা কোন কালেই নাই, যাহা বাস্তবিকই মিথ্যা; তাহার স্বরূপই বা কি? আর তাহা সত্যই বা হইবে কিরূপে?

রামচন্দ্র কহিলেন,—ভগবন্! উপশম-প্রকরণে আপনিই ভ্রান্তিরূপিণী অবিদ্যার বিষয় উল্লেখ করিয়াছিলেন। এই জন্য আমি বিচার করিয়া দেখিতেছি যে, অবিদ্যা কোথায় আছে? উহা ভ্রান্তি; ভ্রান্তির আবার অস্তিত্ব কি আছে?

বশিষ্ঠ কহিলেন,—বৎস রঘুনন্দন! এ যাবৎ তুমি অবুদ্ধ অবস্থায় ছিলে; এই জন্য তোমার বোধ জন্মাইবার মানসে তথাবিধ অসত্য যুক্তিবহির্ভূত বাক্যে তোমায় উপদেশ দিয়াছিলাম। বাস্তবিক যাহারা অবোধ, তাহাদিগের বোধ বিকাশের জন্য বুধগণ 'ইহার নাম অবিদ্যা, উহার নাম জীব' এই প্রকার কাল্পনিক ক্রমই অগ্রে প্রদর্শন করিয়া থাকেন। মন যত দিন অপ্রবুদ্ধ থাকে, তত দিন মনকে যদি ঐ প্রকার শাস্ত্র-কল্পিত

উপদেশ না দেওয়া হয়, তবে সে মন অন্য শত তিরস্কারেও প্রবুদ্ধ হয় না। যুক্তির সাহায্যে অসম্ভাবনা বা বিপরীত ভাবনা ঘুচিয়া যায়; অনন্তর জীবকে প্রবুদ্ধ করিয়া পরমাত্মার সহিত যোজিত করিতে হয়। যে কার্য্য যুক্তিবলে সাধিত হইয়া থাকে, অন্য শত সহস্র যত্ন কর—কিছুতেই তাহা সেরূপ ভাবে সম্পাদিত হইবার নহে। তুমি নিজেও বুঝিয়া দেখ, তোমার যাদৃশ কার্য্য যুক্তিবলে সুসিদ্ধ হইল, শত যত্ন করিলেও তাহা সাধ্য হইত কি? দেখ, অবুদ্ধি অপরিপক্ববুদ্ধি লোককে যদি 'সকলই ব্রহ্মময়' এইরূপ উপদেশ মাত্র দেওয়া যায়, তবে তাহাতে ফল কিছুই হয় না। আমার মনে হয়, অজ্ঞ জনকে ঐরূপ তত্ত্বোপদেশ প্রদান করা আর বন্ধুজ্ঞানে কোন একটা শাখা-পত্র-শূন্য স্থাণুর নিকট গিয়া আত্ম-দুঃখ প্রকাশ করা, উভয়ই সমান হইয়া পড়ে। মূঢ় লোককে অগ্রে তত্ত্বোপদেশ না দিয়া যুক্তির বলে তাহাকে প্রবুদ্ধ করিয়া লওয়া উচিত; আর যিনি প্রাজ্ঞ, তাঁহাকেই তত্ত্বোপদেশ দ্বারা সকল বিষয় বুঝাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। যুক্তি প্রদর্শন করিয়া মূঢ়কে যদি প্রবোধিত করিয়া না লওয়া হয়, তবে তাহাকে প্রাজ্ঞপদে উন্নীত করা যায় না।

রামচন্দ্র! এতদিন তোমার অজ্ঞান ছিল, সম্যক্ বোধবিকাশ তুমি প্রাপ্ত হইতে পার নাই; কিন্তু এখন আর তোমার সে অবস্থা নাই। তুমি অধুনা যুক্তির সাহায্যে প্রবোধ প্রাপ্ত হইয়াছ। সম্প্রতি তুমি প্রকৃতই প্রবুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছ। অতএব আমি তোমায় এখন তত্ত্বোপদেশই প্রদান করিব। বুঝ রাম! আমি ব্রহ্ম, তুমি ব্রহ্ম, ত্রিজগৎ ব্রহ্ম; অতএব এই পরিদৃশ্যমান সমস্ত ভূলোকই ব্রহ্ম। উহাতে দ্বিতীয় কলনার অস্তিত্ব নাই; যাহা তোমার ইচ্ছা, করিতে পার, তাহাতে বাস্তব ব্রহ্মত্বের হানি কিছুই নাই। এই ত্রিজগৎ অসম্বেদ্য মহাসম্বিদের ভ্রান্তিবাধার চরম সীমা মাত্র। ইহার অভ্যন্তরে একমাত্র পরম প্রত্যয়বান্ পরম জ্যোতিঃ বিশ্বব্যাপী 'অহং' পরমাত্মা বিদ্যমান। তুমি 'অহং' স্বরূপে কত কার্য্য করিয়া যাইতেছ, অথচ তাহাতে তুমি লিপ্ত হইতেছ না। হে রাঘব! কি অবস্থান, কি গমন, কি শ্বসন, কি প্রশ্বাসন, কি বিসর্জ্জন, কি গ্রহণ, কি শয়ন, সর্ব্বকালে সর্ব্বাবস্থায় তুমি ইহাই অনুভব করিতে থাক যে, আমিই

সেই অহন্তাবরূপী, পরমজ্যোতিঃ, বিশ্বব্যাপী, চৈতন্যময় পরমাত্মা। যদি তোমার মমতা ও অহঙ্কার পরিত্যক্ত হইয়া থাকে, প্রকৃতই তুমি যদি প্রাজ্ঞ হইয়া থাক, তবে আর কেন? তুমি এখন সেই শান্ত সর্ব্বজীব-বিহারী চিদেকরস ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ কর। ফলে অন্তরে অন্তরে চিন্তা করিতে থাক যে, তুমিই সেই সুবিশুদ্ধ ব্রহ্ম। তুমি আরও ভাবিতে থাক যে, যাহার আদি নাই, অন্ত নাই, তথাবিধ শ্রুতিসম্মত পরম পদস্বরূপ আভাসই তোমার রূপ এবং তুমি সেই সর্ব্বগামী একাত্ম শুদ্ধ সম্বিন্ময় হইয়াই বিরাজ করিতেছ। শত সহস্র কুম্ভে যেমন একই মৃত্তিকা আছে, তেমনি যাহা আত্মা ও তুর্য্যরূপে প্রসিদ্ধ, যাহা অবিদ্যা, প্রকৃতি, কিম্বা জগৎ নামে নির্ব্বাচিত, সেই সমুদায়ই সেই সন্মাত্র অভিন্ন ব্রহ্ম বৈ আর কিছুই নহে। ঘট হইতে যেমন ঘটের মৃণ্ময়তা বা মৃত্তিকা ভিন্ন নহে, তেমনি আত্মা হইতেও প্রকৃতি পৃথক্ নহে, ফলতঃ প্রকৃতিই আত্মা। জলের যেমন আবর্ত্ত, তেমনি আত্মার যে বিবর্ত্ত বা স্পন্দন, তাহাই প্রকৃতি নামে নিরূপিত। ফলে আত্মস্পন্দনেই প্রকৃতির প্রাদুর্ভাব হয়; সুতরাং আত্মাকেই প্রকৃতি বলা যায়। পবন ও স্পন্দন এই দুই যেমন নামে মাত্র ভিন্ন; প্রকৃত পক্ষে উহারা ভিন্ন নহে, তেমনি আত্মা ও প্রকৃতি এ উভয় নামে মাত্রই স্বতন্ত্র; বস্তুতঃ স্বাতন্ত্র্য ইহাদের কিছুই নাই। যত ক্ষণ অজ্ঞানস্থিতি, ততক্ষণই আত্মা ও প্রকৃতি, এইরূপ ভেদবুদ্ধির স্থায়িত্ব; পরন্তু যেমন মাত্র জ্ঞানের উদয় হয়, অমনি ঐ ভেদ-বুদ্ধি নিরস্ত হইয়া যায়। দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ করা যাইতে পারে, রজ্জুগত ভুজঙ্গ-ভ্রম অজ্ঞান হইতেই সত্য হইয়া থাকে। চিৎ-ক্ষেত্রে কল্পনার বীজ নিক্ষিপ্ত হইলে তাহা চিন্তারূপ অঙ্কুরে পরিণত হয়,—হইয়া তাহা হইতে ক্রমশঃ সংসার-বনের সন্নিবেশ হইয়া পড়ে। আত্মজ্ঞানরূপ অনল দ্বারা যদি কেহ ঐ কল্পনা-বীজকে দগ্ধ করিয়া ফেলে, তাহা হইলে দগ্ধ তৃণে জলসেচনে যেমন কোনও অঙ্কুরোৎপত্তি হয় না, তেমনি ঐ আত্মজ্ঞান-রূপ অনল দ্বারা দগ্ধ কল্পনা-বীজও বাসনা-রূপ বারি-সেচনে আর কখন অঙ্কুরিত হয় না বা অঙ্কুরিত হইয়া কোনও কালে সংসার-বনের সৃষ্টি করে না। অপিচ যদি ঐ চিৎ-ক্ষেত্রে কল্পনা-বীজ আদৌ পতিতই না হয়,

তাহা হইলে যাহাকে সুখ-দুঃখরূপ ফলশালী শরীর-তরুর কারণ বলা হয়, সেই চিন্তাঙ্কুর কদাচ উৎপন্ন হইতেই পারে না।

হে রাম! তুমি আত্মবোধ প্রাপ্ত হইয়াছ; এক্ষণে অজ্ঞান-প্রসূত ভ্রম-বিলসিত দ্বৈতভাবকে দূরে পরিহার কর। যাহা একাত্ম-ভাবরূপ সাতিশয় আনন্দবৈভব, তাহাতে তুমি পরিপূর্ণ হইয়া উঠ। তুমি অভয়াত্মা হও। মনে রাখিও,—ভূত, ভাবী, বর্ত্তমান, এই কালত্রয়েও দুঃখ বলিয়া কিছুই নাই; দুঃখ নামে কোন কিছুরই অস্তিত্ব নাই। থাকিবার মধ্যে আছেন কেবল একমাত্র আত্মা। ইহাই আমাদের সার উপদেশ জানিবে।

উনপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪৯ ॥

পঞ্চাশ সর্গ।

রামচন্দ্র কহিলেন,—গুরুদেব! আমি ভবদীয় প্রসাদে নিখিল জ্ঞাতব্য বিষয়ই বিদিত হইয়াছি; যাহা অদ্ভুত দ্রষ্টব্য, তাহা আমি দেখিয়াছি; অদ্য ভবৎপ্রদত্ত পরম ব্রহ্ম-জ্ঞানসুধায় আমি পরিপূর্ণ হইলাম। এখন আমি বুঝিতে পারিয়াছি, পূর্ণ ব্রহ্ম হইতে উপাধি গ্রহণক্রমে যে জীবোৎপত্তি হয়, সেই ব্যষ্টি জীবও পূর্ণস্বভাব এবং সমষ্টি আকাশাদিও সেই পূর্ণ ব্রহ্ম হইতে পূর্ণরূপে প্রাদুর্ভূত। অতএব এই সমস্তই পূর্ণ ব্রহ্মে পরিপূর্ণ। উপাধি পরিচ্ছেদ পরিত্যাগ করিলে দেখা যায়, সেই পূর্ণ ব্রহ্মের পূর্ণতা, পূর্ব্ববৎ সর্ব্বত্রই অবস্থিত। আমি এইরূপ বুঝিয়াছি, —বুঝিয়াও আবার আপনার নিকট প্রশ্ন করিতেছি। আমার এই প্রশ্নের ফলে মদীয় জ্ঞান আরও বৃদ্ধি পাইবে এবং সাধারণেরও জ্ঞান হইবে।

হে ব্রহ্মন্! আমি আপনার শিশু-পুত্রস্থানীয়; আপনি আমার পিতৃস্থানীয়। সুতরাং আমার এইরূপ পুনঃপুন প্রশ্নে আপনার যেন আমার উপর বিরক্তি সঞ্চার না হয়। আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, মুক্ত

প্রাণীর কর্ণ, নেত্র, স্পর্শেন্দ্রিয়, জিহ্বা, ঘ্রাণেন্দ্রিয়, সমস্তই বর্ত্তমান থাকে, এবং তাহা স্পষ্টরূপে দেখিতেও পাওয়া যায়, তথাচ মৃত ব্যক্তির ইন্দ্রিয় সকল কি নিমিত্ত বিষয়গ্রহণে অপারগ হইয়া থাকে? আর জীবদ্দশাতেই বা কিরূপে তাহারা বিষয় গ্রহণে সমর্থ হয়? কেহ কেহ বলিতে পারেন, ইন্দ্রিয় বহির্ভাগে আসিয়া ঘটাদির স্বরূপ অনুভবপূর্ব্বক অন্তরে প্রবেশ করিয়া তদ্বিবরণ প্রকাশ করিয়া দেয়। এ কথার উত্তরে বলা যায় যে, ঐরূপ কথা কোন ক্রমেই সঙ্গত নহে; কেন না, এই যে অক্ষিগোলকাদি ইন্দ্রিয়বর্গ, ইহারা জড়স্বভাব; ইহাদের পৃথক্ চেতন নাই বা বাক্য-সামর্থ্য নাই; সুতরাং ইন্দ্রিয়গণ জড়স্বভাব হইয়াও কি প্রকারে শরীরে ঘটাদির বাহ্যত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবে? অপর কাহারও মত যে, ইন্দ্রিয়েরা বাহিরের বিষয় হৃদয়ে লইয়া গিয়া স্থাপন করে, এরূপ মতও সমীচীন নহে। কেন না, অনেক সময় এরূপও দেখা যায় যে, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়বর্গ দেখিতেছে বা শুনিতেছে, অথচ অন্তরে তাহার অনুভূতি হইতেছে না। ইন্দ্রিয়েরা যদি বাহ্যার্থ সকল হৃদয়েই লইয়া রাখিত, তাহা হইলে তাহারা সেইখানেই দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হইয়া থাকিত, অথবা বাহিরের দিকে চলিয়া আসিত, কৈ সে রূপ ত কিছুই দেখা যায় না? তবে যদি এমন কথা বলা হয় যে, ঘটাদি বিষয় সকল ইন্দ্রিয়কে স্বীয় অধিকারে আকর্ষণ করিয়া লইয়া আইসে এবং সেই বিষয়াকৃষ্ট ইন্দ্রিয়েরা বিষয় সহ মিলনে হৃদয়গত ভোক্তার জন্য কিছু অংশ লইয়া যায়; ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারা এ কথার দৃষ্টান্তও প্রদর্শন করা যাইতে পারে। অর্থাৎ ঘ্রাণেন্দ্রিয় অগ্রে সুগন্ধে সমাকৃষ্ট হইয়া পড়ে, অনন্তর নাসিকা দ্বারা আকর্ষণে সেই সুগন্ধ অন্তরে কিঞ্চিৎ নীত হইয়া থাকে। আমার মতে এরূপ কথাও সঙ্গত নহে। কেন না, পরস্পর যদি সংযোগ না ঘটে, বা পরস্পর যদি নিকটে না আইসে, তাহা হইলে তো আকর্ষণ হওয়া অসম্ভব কথা। চক্ষু—ঘট দর্শন করে, এ সময় অবশ্য চক্ষুর সহিত ঘট-সংযোগ ঘটে না বা প্রত্যক্ষকালে চক্ষুর সমক্ষে ঘট আনীতও হয় না; দূর হইতেই ঘট প্রত্যক্ষ হয়। আর এক কথা এই যে, ঘটে রজ্জু বাঁধিলে সেই রজ্জু যেমন ঘটকে টানিয়া লইয়া যায়, তেমনি ইন্দ্রিয়ও বিষয় আকর্ষণ করে,

এরূপ কথাও সম্ভবপর নহে; কেন না, যে ঘট রজ্জু দ্বারা বন্ধন করা হয়, তাহারই তো আকর্ষণ হইয়া থাকে, পরন্তু রজ্জু যদি ভিন্ন স্থানে রহিল, আর ঘট যদি আর কোথাও থাকিল, তবে তো আর রজ্জুতে আকর্ষণ করিতে পারে না। কিন্তু এদিকে দেখা যায়, ইন্দ্রিয় বিভিন্ন স্থানে থাকিয়াও বিষয়ানুভব করিতেছে। স্পষ্টই দেখা যায়, যেন ইন্দ্রিয় এবং বিষয় উভয়ই ভিন্ন স্থানস্থিত লৌহশলাকার ন্যায় বিদ্যমান। সুতরাং পরস্পর অসংশ্লিষ্ট অবস্থায় ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের রজ্জুঘটবৎ পরস্পর আকর্ষণ হওয়া সম্ভব হইবে কিরূপে? অথবা চক্ষুরাদির মধ্যেই বা কিরূপে ঐ স্থূল ঘটাদির প্রবেশ সম্ভব হইবে? হে প্রভো! তত্ত্ব-বোধের উদয়ে আমার সর্ব্ব সংশয় ছিন্ন হইয়া গেলেও সাধারণ তত্ত্ব-জিজ্ঞাসুদিগের অবগতির নিমিত্ত এই সকল বিশেষ বিশেষ প্রশ্ন পুনঃপুন জিজ্ঞাসা করিলাম,—আপনি অনুকম্পা করিয়া এই বিশিষ্ট প্রশ্নগুলির যথাযোগ্য উত্তর দানে অনুগৃহীত করুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র! যথাযথ বিবেচনা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে, প্রত্যক্ষ প্রমাণাদির কারণ ইন্দ্রিয়াদি, প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত ঘটাদি এবং প্রত্যক্ষ প্রমাণাদির কর্ত্তা চিত্তাদি, ইহারা বস্তুগত্যা নাই; একমাত্র চৈতন্যই আছেন। তদ্ব্যতীত অন্য বস্তুর অস্তিত্ব সম্পূর্ণই অসম্ভব। ঐ চিৎ আকাশ অপেক্ষাও সমধিক সুনির্ম্মল; তিনি মিথ্যা মায়ায় আবিষ্ট হইয়া পূর্ব্ব পূর্ব্ব বাসনানুসারে আপনাকে পুর্য্যষ্টকরূপে কল্পনা করেন। সেই প্রথম কল্পনাই ভাবী জগৎস্থিতির প্রকৃতি এবং তাহারই অবয়ব হইতে ইন্দ্রিয়াদি করণ ও ঘটাদি কর্ম্মের উৎপত্তি। এইরূপে ঐ পুর্য্যষ্টক-রূপে পরিণত চিৎতত্ত্বই স্বস্বরূপ চিত্তাদি পুর্য্যষ্টকের স্বভাবক্রমে নিজাবয়ব —চিত্তবৃত্তিরূপে পরিণত হয় এবং সেই অবয়বেই বাহ্য ঘটাদি পদার্থ বহিরাকারে প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে। এতাবতা বুঝিতে হইবে, পুর্য্যষ্টক-ঘটিত লিঙ্গদেহরূপী জীব মৃত-দেহ হইতে দূরে অপগত হইলে তখন দর্শন-সামর্থ্য, এমন কি কোন ইন্দ্রিয়ের শক্তিই থাকে না।

রামচন্দ্র কহিলেন,—প্রভো! ইহা যদি এইরূপই হয়, তাহা হইলে যে পুর্য্যষ্টক পঞ্চীকৃত ভূতভাগ-যোগে জগদাকারে পরিণতি প্রাপ্ত হইয়া

সহস্র সহস্র জগৎ নির্ম্মাণ-ব্যাপারে স্বীয় মাহাত্ম্য বিস্তার করে এবং যে পুর্য্যষ্টক দর্পণবৎ ঐ বিশ্ব-বিরচন-মাহাত্ম্যের প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিতে থাকে, তথাবিধ পুর্য্যষ্টকের স্বরূপ কি প্রকার? হে ভগবন্! আমায় এ বিষয় উপদেশ বিতরণ করুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! যাঁহার আদি নাই, অন্ত নাই, যিনি নিরাময় ও তেজোময়, যাঁহার স্বরূপ শুদ্ধ চিন্মাত্র, যিনি সর্ব্ব প্রকার বিভাগ-কল্পনা-বিরহিত ও জগতের বীজভূত, সেই ব্রহ্মই আকাশাদি সূক্ষ্ম ভূতসমষ্টি সৃষ্টি করিবার পর অপঞ্চীকৃত ভূতপঞ্চকে লিঙ্গ শরীর ও পঞ্চীকৃত ভূতপঞ্চকে ব্রহ্মাণ্ডসমষ্টির সৃষ্টি বিধানপূর্ব্বক প্রতিবিম্বক্রমে কল্পনোন্মুখ হইয়া অভিমানাকারে সূত্রপ্রাণ ধারণান্তে দেহাভ্যন্তরে জীবরূপে বিরাজ করেন। এই জীবই বাসনার উপচয় ও অঙ্গপুষ্টির সঙ্গে সঙ্গে পুষ্টি লাভ করিয়া থাকেন এবং বাহ্যিক ও আন্তরিক ব্যাপার-সহযোগে স্পন্দিত হইয়া থাকেন। সেই ব্রহ্ম তৎকালে বিভিন্ন অভিমানে ভিন্ন ভিন্ন নাম ধারণ করেন। অহম্ভাবনায় তিনি অহঙ্কার, মননবশে মন, বোধ বিনিশ্চয়ে বুদ্ধি এবং ইন্দ্র বা পদার্থ দর্শনে ইন্দ্রিয় নাম গ্রহণ করিয়া থাকেন। এইরূপে তিনি দেহের ভাবনা-বশে দেহ, ঘটভাবনায় ঘট, ইত্যাদি ইত্যাদিরূপ সর্ব্বসামান্য ব্যাপারভাবে পুর্য্যষ্টক নামে নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন। এইরূপে যিনি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ব্যাপারে জ্ঞাতা, কর্ম্মেন্দ্রিয়ের ব্যাপারে কর্ত্তা, কর্ম্মফলরূপ সুখ-দুঃখাদির আশ্রয়রূপে ভোক্তা এবং সর্ব্ব প্রকাশকরূপে সাক্ষী প্রভৃতি নাম প্রাপ্ত হইয়া থাকেন এবং যিনি জীবপ্রাধান্যে জীব নামে নির্দ্দিষ্ট হন, সেই সম্বিৎই জড়াংশের প্রাধান্য ক্রমে ঐ পুর্য্যষ্টক বলিয়া নির্ণীত। জানিবে—চিদংশ লক্ষ্য করিয়া জীব এবং জড়াংশ লক্ষ্য করিয়া পুর্য্যষ্টক এই দুই প্রকার সংজ্ঞা প্রবর্ত্তমান। এই প্রকারে ঐ জীবই কাল, অবস্থা, ও বাসনাভেদে নানাভাবে ভাবিত হয়, —হর্ষ-বিষাদাদি দ্বারা আক্রান্ত হইয়া নানাকার ধারণ করে এবং কালক্রমে পুর্য্যষ্টকস্বভাবের অনুগমন করিয়া অনন্ত বাসনা-কল্পনা-প্রসূত অনন্ত আকার ধারণ করে। জল সেচন দ্বারা বীজ যেমন ক্রমশঃ অঙ্কুর, কাণ্ড, শাখা, প্রশাখা, পত্র, পুষ্প, ফল, এ সকল আকার ধারণ করিয়া

থাকে, তেমনি ঐ সমষ্টি ব্যষ্টি জীবও বাসনারূপ বারি-সেচনে নিখিল জগদাকার ধারণ করে, অর্থাৎ অঙ্কুরাদি যেমন বীজেরই আকার ভেদ, তেমনি এই জগৎও সমষ্টি ব্যষ্টি জীবের আকার ভেদ মাত্র। পরন্তু জীব এই নিগূঢ়-তত্ত্ব জানে না যে, আমিই এই আদ্য চিদাত্মা। সে জানে— আমি দেহাদি-সমন্বিত এবং সেই দৃশ্যমান চরাচর জগৎ আমারই। জীবের এই প্রকার ধারণা কেবল মিথ্যা জ্ঞানবশেই হইয়া থাকে। যেমন সমুদ্র-সলিলে পতিত কাষ্ঠখণ্ড তরঙ্গের তাড়নায় একবার উন্মগ্ন ও একবার নিমগ্ন হয়, তেমনি জীব বাসনার জালে জড়িত হইয়াই কদাচিৎ ঊর্দ্ধগতি এবং কদাচিৎ অধোগতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। দৈবক্রমে সনকাদি সদৃশ কোন কোন জীব বিশুদ্ধ জন্ম লাভ করিয়া আত্মজ্ঞান লাভে প্রথম জন্মেই ভববন্ধন হইতে মুক্ত হয়—হইয়া সেই অনাদি অনন্ত পরম পদ প্রাপ্ত হয় এবং কোন কোন জীব বহুকাল ধরিয়া বহুযোনি ভ্রমণের পর অতি কষ্টে আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত হয়—হইয়া শ্রুতিসম্মত পরম পদে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

হে সুমতে! জীবের সৃষ্টি এইরূপই; জীব বর্ণিত প্রকারেই দেহ লাভ করে—করিয়া কিরূপে অন্তরে জড় চক্ষুরাদি যোগে ঘটাদি নিখিল বস্তু উপলব্ধি করিতে থাকে, তাহা অধুনা বিশেষ করিয়া বলিতেছি, শ্রবণ কর। চৈতন্য যখন জীবরূপে পুর্য্যষ্টকে প্রতিবিম্বিত হইয়া পরিচ্ছেদ্য অর্থাৎ ইয়ত্তায় অবধারণীয় হন, তখন তাঁহার দেহ ঐ ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় মন ও অন্যান্য ইন্দ্রিয়গ্রামে সম্বলিত হইয়া অবস্থান করে। তৎকালে জীবরূপী চৈতন্য স্বীয় ইন্দ্রিয়যোগে আপনার দেহ-মধ্যগত সুখদুঃখ প্রভৃতি অনুভব করিতে থাকেন। বাহিরের কিছুই যে তিনি অনুভব করিবেন, তাহা তিনি পারেন না। সেই জীবচৈতন্য পরে যখন চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা ঘটাদি বহিঃপদার্থে গমন করেন—করিয়া তৎসংসৃষ্ট হন, তখন সেই ঘটাদি পদার্থের প্রকাশ্য হইয়া থাকেন। ইন্দ্রিয়-পথে নির্গত জীব, চৈতন্যের সংস্পর্শে চৈতন্য সহ একত্ব প্রাপ্ত হন। চিত্তসমন্বিত ইন্দ্রিয়ই যাথার্থ অনুভবের হেতু হইয়া থাকে। চিত্তসহযোগ ভিন্ন কেবল যে ইন্দ্রিয়, তাহা ঐ বাহ্য পদার্থ-বিজ্ঞানের হেতু নহে। সুতরাং বলা যায়, মৃতদেহস্থ ইন্দ্রিয় আর মুক্ত

দেহস্থ ইন্দ্রিয় চিত্তসংযোগ হইতে বিরহিত বলিয়া বাহ্যার্থজ্ঞান উৎপাদন করে না। স্বচ্ছ বস্তুতেই প্রতিবিম্ব-পাত হইয়া থাকে। মনোবৃত্তি ও নেত্ররশ্মি অতীব স্বচ্ছ; সুতরাং তাহাতেই বাহ্যাকাশগত ঘটাদি পদার্থ প্রতিবিম্বিত হয় এবং তদনুসারে সেই সেই পদার্থপ্রতিবিম্ব মনোবৃত্তির অন্তর্গত জীবে সংশ্লিষ্ট হইয়া থাকে; এই জন্য জীব তত্তৎ পদার্থ অনুভব করে। জীবের স্থিতি যে কেবল দেহাবচ্ছেদেই রহিয়াছে, তাহা বলা যায় না; দেহের বাহিরেও তিনি অবস্থিত। পরন্তু প্রাণ সম্বন্ধ থাকে না বলিয়া দেহের অন্যত্র তিনি জীবভাবান্বিত নহেন। ফলে যথায় প্রাণব্যাপ্তি আছে, তাহার অন্যত্র 'অহং' বা 'আমি' এবম্বিধ জ্ঞানের বিকাশ হয় না। যৎকালে নেত্রের তারকা দুইটী শাণ-পরিষ্কৃত উজ্জ্বল ইন্দ্রনীলমণির ন্যায় থাকে, তখন ঘটাদি বাহ্য বস্তুর যে প্রতিবিম্ব, তৎসহ চিত্তবৃত্তি তাহাতে প্রবিষ্ট হয়। ইহাতেই লোকে বলিয়া থাকে যে, বাহ্য ঘটাদি পদার্থ প্রতিবিম্বিত হয়। অনন্তর নয়নতারকায় প্রবেশপ্রাপ্ত পদার্থপরম্পরা অভিমানী জীবের সহিত প্রতিবিম্ববৎ সংশ্লিষ্ট হইয়া থাকে। এইরূপে বাহ্য ঘটাদি বস্তু সকল অহঙ্কারময় জীবের জ্ঞেয় হইয়া দাঁড়ায়। পদার্থ-জ্ঞান যে এইরূপ সংশ্লেষ-ঘটিত হয়, তাহা বালকেরাও বিদিত আছে, পশুরাও বুঝিয়া থাকে; অধিক কি, কোন কোন এমনও স্থাবর জড়পদার্থ দেখা যায়, যাহার ঐরূপ পদার্থজ্ঞান স্পষ্টতই প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। ইহার নিদর্শনস্থলে উল্লেখ করা যায় যে, স্থাবরজাতির মধ্যে লজ্জাবতী নামে এক প্রকার ক্ষুপজাতীয় বৃক্ষ আছে, তাহাকে স্পর্শ কর, অমনি তাহার পত্রাদি সঙ্কুচিত হইয়া যাইবে। এ ব্যাপারে তাহাদের পদার্থ-জ্ঞান কি স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় না? স্বচ্ছতম নয়নরশ্মি জীবচৈতন্যে পূর্ণ হইয়া বহিস্থ ঘটাদি পদার্থকে যখন যেরূপে পরিব্যাপ্ত করে, জীব তাহাকে সেইরূপেই পরিজ্ঞাত হয়; সুতরাং দূরস্থিত বস্তুর সহিত কি করিয়া সম্বন্ধ-সংঘটন হইবে? এরূপ আশঙ্কার নিরাস—এই খানেই হইল। স্পর্শজ্ঞান বা ত্বাচ প্রত্যক্ষের ক্রমও এইরূপই। জীব সংস্পর্শ হইতে রসে ও গন্ধে যে সম্বন্ধ, তাহা প্রত্যয় দ্বারা পরিজ্ঞেয়। পরন্তু শব্দের স্থান আকাশ; সুতরাং প্রতিবিম্ব ব্যতিরেকেই শব্দের বৃত্তি কর্ণাকাশে প্রবিষ্ট

হয় এবং অবিলম্বে জীবাকাশে প্রবেশ করিয়া থাকে। বলিতে পার, গন্ধও ঐরূপে বায়ু সহযোগে অন্তরে প্রবেশ করে না কেন? উত্তরে বলা যায়, —না; তাহা হইতে পারে না। কেন না, ইন্দ্রিয়জ্ঞানের রীতি ঐ প্রকারই।

রামচন্দ্র কহিলেন,—ভগবন্! মানসে, মুকুরে, মণিতে, জলাদিতে, নবপল্লবে ও কাচ প্রভৃতিতে যে প্রতিবিম্ব পরিদৃষ্ট হয়, ইহা কি? প্রকাশ করিয়া বলুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—বিজ্ঞবর! তুমি প্রতিবিম্বকে একটা ভ্রান্তিবিশেষ বলিয়া জানিবে। কেবল প্রতিবিম্বই যে ভ্রান্তি, তাহা নহে; এই যে জগৎ দেখা যাইতেছে, ইহাও ভ্রান্তি ব্যতীত আর কিছুই নয়। সুতরাং এই জগৎকে তুমি সত্য বস্তু জ্ঞানে বিশ্বাস করিও না। তরঙ্গ যেমন জল-সামান্য হইতে অভিন্ন, তেমনি 'অহং' ও তদ্‌গ্রাহ্য জগৎ সমস্তকেই তুমি চিজ্জল হইতে অপৃথক্ বলিয়া বুঝিবে। এই চিজ্জলই সতত নিত্যভাবে বিরাজমান। ঐ যে পরম চিৎসাগর, উহাতে দেশ, কাল বা ক্রিয়া, কিছুই বিদ্যমান নাই। চিন্ময়তা প্রযুক্তই আত্মা দেশ, কাল বা ক্রিয়া দ্বারা পরিচ্ছেদ্য নহেন। তিনি সতত সর্ব্বত্রই বিরাজিত।

হে রাম! তুমি সকল সময়ে অনাসক্ত-চিত্তে কালাতিপাত কর। তোমার বুদ্ধি সুখ-দুঃখকে মিথ্যা বলিয়া বিদিত হউক,—হইয়া শান্তিময়ী হইয়া বিরাজ করিতে থাকুক। তুমি সংসার-মায়ারূপ ব্যাধি হইতে নির্ম্মুক্ত হও,—হইয়া নিবিষ্টমনে সমতার আশ্রয় লও,—লইয়া আনন্দময়-রূপে বিরাজ করিতে থাক।

একপঞ্চাশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র! এত কাল তুমি বোধ হয়, মদীয় বাক্যার্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছ। তুমি অবশ্যই বুঝিয়াছ যে, যখন সৃষ্টিবিস্তার হয় নাই, তখন তুমি সেই অনাদি অনন্ত ব্রহ্মস্বরূপেই বিদ্যমান ছিলে। ব্রহ্মার ন্যায় তোমারও চক্ষুরাদি কিছুই তখন ছিল না। সৃষ্টির প্রাক্‌কালে ব্রহ্মারও যেরূপ সমষ্টি পুর্য্যষ্টক প্রাতুর্ভূত হইয়াছিল, তুমি ব্যষ্টি জীব—তোমারও তেমনি পুর্য্যষ্টকাদি প্রকাশ পাইয়াছে। অন্য যে সকল ব্যষ্টি জীব, তাহাদেরও তাহাই হইতেছে। গর্ভাবস্থায় ষষ্ঠ মাসে শিশুর যাদৃশ ইন্দ্রিয়াদি হয়, যখন ভূমিষ্ঠ হয়,—তখনও তাহার সেইরূপই হইয়া থাকে। অপিচ তৎকালে গর্ভস্থ শিশু বাসনানুরূপ যেরূপ ইষ্ট বস্তু ভাবনা করে, পরিশেষে তাহাই সে প্রাপ্ত হয়। এইরূপ দৃষ্টান্তে দেখ, সেই সমষ্টি হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মার সমষ্টি মনোব্যাপারে যাদৃশ সম্বিৎ প্রাতুর্ভূত হইয়াছিল, যে প্রকার ইন্দ্রিয় বা, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় প্রকাশ পাইয়াছিল, সেইরূপে ব্যষ্টি তুমি—তোমারও অন্তরে সম্বিৎ ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় প্রাতুর্ভূত হইয়াছে। সৃষ্টির প্রাক্‌কালে যে শুদ্ধ সম্বিতের প্রাতুর্ভাব ছিল, সৃষ্টির পরে তাহাই 'অহং' অভিমানী অনন্ত জীব-ভাবাদি দ্বারা অন্বিতা হন; এইরূপ হইলেও ঐ সম্বিৎ নিন্দার্হ নহেন। তিনি যে বিশুদ্ধ নিরঞ্জন, তাহাই থাকেন। কেন না, একমাত্র পরমার্থ সৎ বলিতে, তাঁহাকেই বলা যায়। তিনি ভিন্ন আর সমস্তই অসৎ, তিনিই যখন অদ্বিতীয় অনন্ত, তিনি কি বস্তু, তাহা যখন কেহই জানিতে পারে না, তখন সেই অনাময় সম্বিৎতত্ত্বে অন্যের অস্তিত্ব অসম্ভব কথা। তাঁহাতে দোষ নাই, গুণ নাই, মন নাই বা কোন বস্তুই নাই। একমাত্র সেই সম্বিৎই সত্য; অন্য সমস্তই অসত্য। কেন না, আর আর সকলই দেশ কালাদি দ্বারা পরিচ্ছিন্ন, স্থূল, এবং অন্য বিভিন্ন বস্তুও পরিচ্ছেদ-যোগ্য। লোকে ঐ সম্বিৎকে 'মন' আখ্যায় অভিহিত করে, কিন্তু ঐরূপ অভিধান মন্তব্যাদির বিষয়ীভূত বুদ্ধি-

বৃত্তির অধ্যারোপ মাত্র বৈ আর কিছুই নহে। বস্তুতঃ উঁহাকে মন, জীব বা পুর্য্যষ্টকাত্মক, কিছুই বলা যায় না। যে কিছু বিদ্যা-বিলাসাদি, সকলই ঐ সম্বিৎতত্ত্বের স্বরূপ বলিয়া বিদিত বটে ; কিন্তু বাস্তব পক্ষে বিদ্যা-বিলাসাদি বলিয়া উঁহার কোনই স্বরূপ নাই। উঁহা মনের অতীত, ইন্দ্রিয়ের অগোচর, নিত্য বিরাজিত পরমাত্মা। প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা যাহাকে 'অস্তি' বলিয়া বিদিত আছেন, আর নাস্তিকেরা যাঁহাকে 'নাস্তি' বলিয়া থাকে, তাহা ঐ সম্বিৎই। ব্রহ্ম হইতে মননাত্মা চিন্মূর্ত্তি জীবের উৎপত্তি হইয়াছে, এইরূপ কল্পনা কেবল উপদেশের জন্যই করা হয়। বাস্তব বিচারে প্রতিপন্ন হইবে,উহা কেবল ভ্রান্তি মাত্র। দেখ, কোনও রূপে ব্যাধি আসিয়া দেহকে যদি আক্রমণ করে, তবে তাহার মূল অনুসন্ধানে সময় নষ্ট করা অপেক্ষা ব্যাধির চিকিৎসা করাই যেমন সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য,তেমনি অবিদ্যারূপ ব্যাধি আসিয়া যদি উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তাহার মূলের অনুসন্ধান না করিয়া উপদেশ দ্বারা তাহাকে দূরীকৃত করাই বিধেয়। অবিদ্যা অপসারিত হইলে বিচারালোচনায় অবশেষে স্বরূপজ্ঞানই উপস্থিত হইয়া থাকে। সেই যে জ্ঞান,তাহাই প্রশস্ত এবং সর্ব্ব-বস্তুময়। স্থূলাকার মণির মধ্যভাগে মহাচল যেমন প্রতিবিম্বিত হয়, তেমনি ঐ জ্ঞানেই আকাশাদি নিখিল বস্তু প্রতিভাসিত রহিয়াছে। অর্থাৎ অবিদ্যা এবং অবিদ্যার কার্য্য লয় প্রাপ্ত হইলে তৎকালে একমাত্র নির্ম্মল জ্ঞানই অবশিষ্ট থাকে ; অতএব তোমায় বলি,তুমিও ভ্রান্তিরূপিণী অবিদ্যারে বিনাশ কর—করিয়া এই সকল অচিরস্থির জগদ্‌ভাব বিসর্জ্জনপূর্ব্বক জীবন্মুক্ত অবস্থায় নিজ নির্ম্মল স্বরূপে বিরাজ করিতে থাক। যে বস্তু প্রকৃত পক্ষে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার অসত্তা উপলব্ধি হইবে কিরূপে ? এরূপ আশঙ্কা যেন তোমার মনে হয় না ; কেন না, ঐ যে সকল বস্তু দৃষ্টিপথে পতিত হয়,সে সমুদায়ই মরীচিকায় জলের ন্যায় ভ্রান্তিরই কার্য্য মাত্র। তবে এই মাত্র হয় যে, উঁহারা অসৎ হইলেও সতের ন্যায়ই প্রতিভাত হইয়া থাকে। প্রকৃত পক্ষে উঁহারা সৎ নহে ; উঁহাদের যে সত্যতা, তাহা অজ্ঞানবশেই প্রতিপন্ন হয় ; পরন্তু যদি জ্ঞানদৃষ্টিতে বিচার করিয়া দেখা যায়, তবে যাহা বাস্তব, তাহাই প্রত্যক্ষ হয়, যাহা ভ্রম, তাহাও তখন দূরীভূত হইয়া যায়। জীবই বল, আর পুর্য্যষ্টকাদিই বল,সকলই অবিদ্যার ভ্রম, সত্যাত্মার সন্নিধান বশতই ঐ অসত্যস্ত

অসত্য অবিদ্যার কল্পনা বা সত্যতা উপলব্ধি হয়। সেই অবিদ্যা হইতেই জীবাদি কল্পনা হইয়া থাকে, ইহাই শাস্ত্রকারগণের মত। অধুনা তোমার প্রবোধ সিদ্ধির জন্য সেই অবিদ্যার স্বরূপ তোমায় বলিতেছি ; তুমি অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। পূর্ব্বে যে চিৎতত্ত্বের কথা কহিয়াছি, সেই চিৎশক্তি পুর্য্যষ্টকরূপে জীবত্ব লাভ করেন ; এই জন্য তিনি যখন যে বস্তু যে প্রকারে ভাবনা করেন,তখনই তাহা সেই ভাবে অনুভব করিয়া থাকেন। যক্ষ থাকুক, আর নাই থাকুক,রাত্রিকালে বালককে যক্ষ আসিয়াছে বলিয়া ভয় দেখাইলে, সে যেমন যক্ষের অস্তিত্বজ্ঞানে ভীত হয়, তেমনি সত্যই হউক আর মিথ্যাই হউক, ঐ জীবচৈতন্যই পঞ্চতন্মাত্র কল্পনা সত্য বলিয়া ধারণা করাইয়া দেন এবং তিনি নিজেও জীবরূপে ধারণা করেন, অপিচ আত্মায় ইন্দ্রিয়াদি দ্বারের সত্তা থাকে বলিয়া উহাকে সত্য জ্ঞানে দর্শন করিতে থাকেন। উল্লিখিত পঞ্চতন্মাত্র হইতেই বাহ্যিক ভূতপঞ্চকের উৎপত্তি হইয়াছে। দেখ, অঙ্কুর যেমন শত শত শাখাপ্রশাখায় পরিণতি প্রাপ্ত হয় ; পরে ঐ সকল শাখা-প্রশাখা যেমন অঙ্কুর হইতে পৃথক্ বলিয়া প্রতিভাত হইয়া থাকে, তেমনি পঞ্চভূত ও পঞ্চতন্মাত্র হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া অবধারিত হয়। বাস্তব পক্ষে দেখিতে গেলে উভয়ই কিন্তু অভিন্ন বৈ আর ভিন্ন নয়। জীব কিন্তু তাহাতেই ইন্দ্রিয়, মন ও প্রাণ প্রভৃতি আন্তরিক বস্তু এবং ঘটাদি বহির্বস্তু যথাযথ বলিয়া ধারণাপূর্ব্বক বাসনার অনুরূপ দৃঢ়তা অবলম্বন করে। দেখ, লোকে চন্দ্রের কিরণপুঞ্জ বলিয়া যাহা ধারণা করিয়া লয়, তাহা যেমন চন্দ্রের আত্মপ্রকাশ বৈ আর কিছুই নয়, তেমনি ঐ যে কিছু বিষয় সুখাদি, তাহা সেই বিষয়েন্দ্রিয়-সম্বন্ধে প্রকাশমান আত্মচৈতন্যেরই আত্মানন্দ মাত্র ব্যতীত আর কিছুই নয়। অর্থাৎ চিৎশক্তি যে বিষয়স্পর্শে সুখানুভব করে, সে সুখ তাহার নিজেরই ; পরন্তু ভ্রমের ঘোরে এইরূপ বিবেচনা করে যে, বিষয় আমায় সুখী করিতেছে। যেমন মরীচের তীক্ষ্ণতা ও আকাশের শূন্যতা অভিন্ন হইলেও ভিন্নবৎ ব্যবহৃত হয়, তেমনি আমার যাহা অনুভব, তাহা তদতিরিক্ত না হইলেও অন্য অর্থাৎ বিষয়-সন্নিকর্ষ জন্য সুখাদিরূপে উপলব্ধ হইয়া থাকে। সুতরাং জীব—উল্লিখিতরূপ বিষয়-ভোগই পুরুষার্থ, এবম্বিধ নিশ্চয়পূর্ব্বক তাহা প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত

বিবিধ নিয়ম ও উপায় অবলম্বন করে। এইরূপ করিলে এই প্রকার হয়, আর অমুক কার্য্য করিলে অমুক ফল হইয়া থাকে, ঈদৃশ স্থির নিয়মের নামান্তর স্বভাব; এই স্বভাববশেই কখন কিছু হয়, আবার কখনও বা কিছু হয় না। যেমন গুড় ও মধুর রসই খণ্ড-শর্করাকারে পরিণত হয়, অথবা মৃত্তিকা যেরূপ ঘটাকার ধারণ করে, তেমনি আত্মাই স্বভাব বা শাস্ত্র, এই উভয়ের অন্যতরের অনুসরণ-ক্রমে সেই সেই ফলের স্বরূপে বিবর্ত্তিত হইয়া থাকেন। রামচন্দ্র! গুড়, মধু ও মৃত্তিকা সম্পূর্ণ রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়া পূর্ব্বাবস্থা হইতে অন্য এক প্রকার অবস্থায় উপনীত হইলেও গুড় বা মধুর মাধুর্য্য এবং ঘটের উপাদান মৃত্তিকার মৃৎস্বারূপ্য থাকে বলিয়া আত্মার সহিত উহাদের উপমা দেখাইলাম; বস্তুতস্ত গুড়, মধু বা মৃত্তিকার ন্যায় ঐ আত্মার কোনই বিকার নাই। কেন নাই?—তাহার কারণ এই যে, দেশ কিম্বা কালাদি দ্বারা যাহা পরিচ্ছেদ্য বা পরায়ত্ত হইয়া থাকে, বিকারাদি তাহারই সম্ভবপর; পরন্তু যে আত্মার দেশ বা কালাদি দ্বারা পরিচ্ছেদ বা পরাধীনতা নাই, গুড়, মধু বা মৃদ্বিকারাদির সাধর্ম্ম্য তাঁহার কিরূপে হইতে পারে? এইরূপে আমাদিগের সেই আত্মস্থ সত্তাস্বরূপ ব্রহ্মবস্তুই ঘট, পট, কুড্য ইত্যাদি বিবিধ বিচিত্র জগৎ-স্বরূপে নানাত্মক হইয়া স্বীয় আত্মস্বরূপেই দ্বৈতভাবে উপনীত হইয়া থাকেন। দেখ, নিদাঘ-দিনে মেঘ সৌর কররূপে অবস্থান করে, অনন্তর ঐ মেঘই যখন বর্ষার অভ্যুদয় হয়, তখন বারিপ্রদ মেঘ হয় এবং ক্রমশঃ জলাকার বীজমধ্যে প্রবেশ করিয়া পশ্চাৎ অঙ্কুরে পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। এইরূপে ঐ যে আত্মার কথা বলিয়া আসিতেছি, সেই আত্মাও কালভেদে, দেশভেদে, ভাব ও অভাবস্বরূপে বিরাজ করিতেছেন। ইহা এইরূপ হইবে, আর ইহা এরূপ হইবে না, এই প্রকার যে কিছু বিধি-নিষেধ আছে, সকলই সেই সর্ব্বপ্রভু আত্মাতে সুবিহিত রহিয়াছে। এ জগতে যত কিছু বৈচিত্র্য-বিস্তার আছে, তাহার ব্যত্যয় করিবার শক্তি কাহারও নাই। দর্পণসন্নিভ [illegible] আকাশে তাহার রূপ, অংশ-কার্য্য কিছুই প্রতিফলিত হয় না; কেন [illegible], আকাশে, তৎকার্য্যে বা ভূভাগান্তরে সর্ব্বত্রই আকাশের ভেদ-ভিন্নতা [illegible]; ঐ আকাশই কেবল

প্রতি-বিম্ববিহীন মুকুরোদরবৎ স্বচ্ছাকারে প্রকাশমান। এতাদৃশ আকাশের ন্যায় অবিদ্যা-সম্বলিত ব্রহ্ম স্বস্বরূপে বিরাজমান সত্য; পরন্তু ব্রহ্ম স্বাত্মায় স্বস্বরূপেই সমস্ত বস্তু ও বস্তুশক্তি প্রভৃতির আকারে প্রকাশ প্রাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন এবং জীবাকারে প্রতিফলিত হইয়া বিরাজ করিতেছেন। ব্রহ্মের স্বরূপ স্বভাবতই চিন্ময়; কাজেই যদিও তিনি দেহ-বিরহিত, তথাচ ভেদকল্পনায় দ্বৈতভাব ধারণ করেন। সৃষ্টিপ্রভৃতির উপক্রমে যে প্রকার বস্তুস্বভাবে আত্মপ্রকাশ হয়, সেই স্বভাব যদিও অসত্য বটে, তথাচ আত্মার সত্যস্বরূপতা নিবন্ধন তাহাও সত্যরূপে প্রতীয়মান হয়; বলিতে কি, আত্মার সত্যতা হেতু তাহাতে সে স্বভাব নিশ্চিতরূপেই বিদ্যমান আছে। কনক-নির্ম্মিত কটকের কথা উল্লেখ করিয়া দেখাইতেছি। মনে কর, যেমন কনক-কটকের কনকত্বই সত্য আর তাহার কটকত্ব অসত্য, তেমনি ঐ যে চৈতন্যাত্মার বিষয় বলিয়া আসিতেছি, তিনিও—জীবদেহে সত্য এবং অসত্য, এই উভয় স্বরূপেই বিদ্যমান। ফলে জীবদেহে বা মনে সেই একমাত্র চৈতন্যই সত্য, বিভিন্ন জীব বা মন সম্পূর্ণ অসত্য। আবার সুবর্ণময় ভাণ্ডের রহস্য ভাবিয়া দেখ; তাদৃশ ভাণ্ডে যেমন সত্য সুবর্ণত্ব মিথ্যাময় ভাণ্ডস্বরূপে বিরাজিত, তেমনি জানিবে—মনে চিৎ ও জড় এই উভয়-স্বরূপতারূপে সত্যাসত্য উভয়ই বিদ্যমান। চিৎতত্ত্ব সর্ব্বব্যাপী হইলেও মনেই তাঁহার চৈতন্যাংশ সমধিক। সুতরাং চিৎতত্ত্বের যে সেই চিৎজড় ভাব, তাহাকে প্রকৃত সত্য বলা যায় না। কটকের কনকত্ববৎ চিৎতত্ত্বের যে জড়ভাব, তাহা কোন না কোন সময়ে বিরাজ করিয়া থাকে। চিত্তকেই চিৎতত্ত্বের জড় দেহাকার বলা যায়। সুর, নর ও স্থাবরাদির মধ্যে দৃঢ় ভাবনায় তাহা যখন যাদৃশ ভাবাপন্ন হয়, তখন তাদৃশ ভাবই ধারণ করিয়া থাকে। বাসনা-কলিকার প্রস্ফুটনে ঐ চিৎতত্ত্ব যখন অন্তরে বৈচিত্র্যরূপ নানাকার ভাবনা করেন, তখনই তিনি নানারূপে বিরাজ করিতে থাকেন। মনে কর, স্বপ্নে একটা গ্রাম দেখা গেল; আবার পরক্ষণেই বনাদি প্রতিভাত হইল; এক্ষেত্রে সেই পূর্ব্বদৃষ্ট স্বপ্নময় গ্রাম যেমন বনাদিভাব প্রাপ্ত হয়, তেমনি বাসনার বৈচিত্র্য-বশেই স্বপ্নের ঐ প্রতিভা সময় দেহরূপী জীবচৈতন্যও একদেহ হইতে অন্য দেহে

প্রয়াণ করিয়া থাকেন। স্বপ্নে যেমন নর-নারীর শরীর প্রতিভাসমান হয়, আবার ক্ষণমধ্যেই সেই স্বপ্ন-দৃষ্ট নরশরীর স্বপ্নে ভিত্তিদর্শনে ভিত্তি হইয়া পড়ে, অপিচ ঐ স্বপ্নভিত্তিও পটস্বপ্ন দর্শনে পরে পটাকারে পরিণত হয়, তেমনি যখন মরণরূপ মূর্চ্ছা সময়ের সমাগম ঘটে, তখন ক্ষণমধ্যেই এই জীবদেহ অন্য দেহাকারে প্রতিভাত হইয়া থাকে। তাই বলিতেছি, হে রাঘব! স্বপ্নের রূপান্তর আশ্রয় করিবার ন্যায় এই জীবনিবহ যে স্বপ্নযোগে রূপান্তর পরিগ্রহ করে, জানিবে—তাহা স্বীয় প্রতিভাসবশেই ঘটিয়া থাকে। দেহের যেমন যৌবন ও জরা প্রভৃতি কালিক পরিবর্ত্তন ঘটে, তেমনি জীবের ঐ দেহান্তর-ভাব যে কালনিয়মে হইবে, সেরূপ বলা যায় না; কেন না, দেহ বাল্যাদি বিশেষ বিশেষ অবস্থায় উপনীত হইলেও সেই দেহই যে এই, ইহা নিশ্চিতই বুঝিতে পারা যায়। পরন্তু জীবদেহের যে ভূত ও ভাবী দেহপরম্পরা, তাহা প্রত্যভিজ্ঞানাদি দ্বারা বুঝিয়া উঠা যায় না। বলিতে কি, দেহান্তর আদৌ ঘটে কি না, এইরূপ ভ্রান্তিই জন্মিয়া থাকে। এতাবতা বুঝিতে হইবে, দেহের বাল্য, যৌবন ও জরা প্রভৃতির ন্যায় জীবদেহের দেহান্তর কালিক পরিণাম নহে। উহা স্বতই বাসনা-বৈচিত্র্য হইতে উৎপন্ন হয়। যাহা পূর্ব্বে দেখা গিয়াছে, অথবা যাহা কখনই দৃষ্টিপথে পতিত হয় নাই, এই দৃষ্টাদৃষ্ট উভয়বিধ পদার্থই স্বপ্নাবস্থায় দৃষ্টিগোচর হয়। হে বেদবিদ্‌গণের অগ্রণী! তুমি জানিবে; এই জগৎস্বরূপ জীব স্বপ্নেরই অন্তর্গত। বাস্তব পক্ষে এই অনাদি সংসারে জীবের অননুভূতি-বিষয় কিছুই নাই। মরণকালে ভাবী দেহের কারণীভূত কর্ম্ম দ্বারা যে বাসনার উদ্বোধ হয়, সেই বাসনানুসারেই দেহান্তর প্রাপ্তি ঘটে। তবে এ কথা বলিতে পারা যায় না কি যে, বাক্যজন্য ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হয়, আর সেই সাক্ষাৎকার-লভ্য যে ব্রহ্মভাব ঘটে, তাহাও দেহান্তরবৎ বাসনাময়ই? না—তাহা হইতে পারে না; কেন না, যিনি পরমাত্মা—তিনি 'শিব' 'অদ্বৈত' 'চতুর্থ' ইত্যাদি স্বীয় অভিধানের বাচ্যমাত্র; তিনি তুরীয় দৃষ্টি দ্বারা পরিদৃষ্ট হন। তাঁহার উল্লিখিত প্রকার ত্রিবিধ স্বপ্ন নাই, অপিচ জাগ্রদবস্থায় তিনি যে কখন অনুভূতিগম্য হন, তাহাও নহেন। সুতরাং তদীয় বাসনার অভাব নিবন্ধন তাঁহার

স্বরূপ বাসনাময় হইবার নহে এবং হইতেও পারে না; কাজেই তিনি যে নির্ম্মলাত্মা, নিরঞ্জন চৈতন্যমাত্র, ইহাই নিশ্চিত। উক্তরূপ চিদাত্মাই জীবরূপে স্বীয় চিৎস্বভাব নিবন্ধন স্বপ্নাবস্থায় অপূর্ব্ব অভিনব বস্তু অবলোকন করিতেছেন এবং পূর্ব্বদৃষ্ট পদার্থপুঞ্জও প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। অতএব নিয়ত প্রগাঢ় ভাবনায় অদৃষ্টপূর্ব্ব বিষয়েও বাসনা ঈদৃশ প্রবল হইয়া থাকে যে, পূর্ব্বদৃষ্ট বিষয়বাসনাও তাহার প্রভাবে বিলোপ প্রাপ্ত হয়। অতএব দেখা যায়, এমন যে বাসনা—তাহাও পুরুষাকারের নিকট পরাজয় স্বীকার করে। ভাবিয়া দেখ, গত পূর্ব্ব দিনে যে কুকর্ম্ম করা হয়, অদ্যকৃত সৎকর্ম্মের ফলে তাহা সৎকর্ম্মে পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। সুতরাং বুঝিয়া রাখিবে যে, জীবের দেহাদি বাসনারই পরিণতিমাত্র; যত দিন মোক্ষ না ঘটিবে, ততদিন আর ঐ জীবদেহের শান্তিপ্রাপ্তি নাই। মোক্ষ না হওয়া পর্য্যন্ত জীবের চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়বর্গের দেশ ও কালানুসারে কেবল উন্মজ্জন ও নিমজ্জন হইতে থাকিবে। জীব-চৈতন্যের এই যে দেহাকার-কলিত বাসনা, ইহা মোক্ষ প্রাপ্তি পর্য্যন্ত বিদ্যমান থাকে। সুতরাং বলা যায়, বালক যেমন রাত্রিকালে ভয়ে ভয়ে অন্যপ্রদর্শিত যক্ষাকৃতি স্বীয় সমক্ষে দেখিতে থাকে, তেমনি ঐ যে বাসনার কথা কহিয়া আসিতেছি, ঐ বাসনাই জীবের পঞ্চভূতময় দেহাকারে অবস্থান করে এবং ঐ দেহই জীবের দৃষ্টি-পথে পতিত হইতে থাকে। কিন্তু বলিয়া রাখি, জীবের ঐ পাঞ্চভৌতিক দেহাদির নিবৃত্তি মোক্ষ না হওয়া পর্য্যন্ত কিছুতেই হইবার নহে। মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্রা, এই অষ্টকের নাম পুর্য্যষ্টক; এই পুর্য্যষ্টকই আতিবাহিক দেহ বলিয়া কথিত; ইহা কেবলই ভাবনাময়, ইহার মূর্ত্তি কিছুই নাই। বলিতে পার, এই পুর্য্যষ্টকের পঞ্চীকৃত আকাশাদি-ঘটিত স্থূল মূর্ত্তি নাই কেন? এ কথা বলা সঙ্গত নহে; কেন না, তোমার কথিত মূর্ত্তি পুর্য্যষ্টক তখনই হইতে পারিত, যদি পঞ্চীকরণ দ্বারা অমূর্ত্ত তন্মাত্রসমূহের স্থূলত্ব হইত। কিন্তু এই যে তন্মাত্ররূপ লিঙ্গাত্মা, ইনি অমূর্ত্তই। ইহাঁর পঞ্চীকৃত আকাশই অসম্ভব। এইরূপে স্থূল তেজ, বায়ু ও জলত্বাদিও সম্ভবপর নহে। এইভাবে স্থূলভূতসমূহেরই যখন অসম্ভাবনা, তখন এই পরমাণু অপেক্ষাও অতিসূক্ষ্ম তন্মাত্ররূপ লিঙ্গাত্মার

দেহক—মুমেরুস্থের ন্যায় একান্তই অসম্ভাবিত; সুতরাং ঐ পুর্য্যষ্টককে ভৌতিক দেহান্ত বলিয়া বর্ণন করা যায় না। মুক্তিপ্রাপ্তির অনুপযোগী বলিয়া এই মোক্ষশাস্ত্রে স্থূল সদ্ভাব কল্পনা অযৌক্তিক। ভাবিয়া দেখ, মনোমাত্রই যখন দেহাদি প্রপঞ্চ, তখন বৈরাগ্যাদির অভ্যাস-যোগে মনের মল বা রাজস ভাব দূরীভূত হওয়ায় শমদমাদি সাধনসম্পদ্ লাভ, অনন্তর জ্ঞানোদয়, জ্ঞানোদয়ে মনঃকল্পিত নিখিল প্রপঞ্চের স্বপ্নবৎ অবধারণ এবং সেই সেই প্রপঞ্চের মূল তত্ত্ব কি, তাহাও জ্ঞানগম্য হয়; ঐ সময় কার্য্য-কারণরূপ অবস্থাবন্ধন ঘুচিয়া যায়, সুষুপ্তি আদি অবস্থারও তিরোধান ঘটে; এইরূপে মুক্তি আসিয়া উপস্থিত হয়। সুষুপ্তি অবস্থা নিখিল দেহাদি প্রপঞ্চ জড় পদার্থপুঞ্জকে বাসনাত্মায় উপসংহৃত করিয়া লয়; আর যাহা স্বপ্নাবস্থা, তাহাই দেহানুভব করিয়া থাকে। এই দুই অবস্থায় অবস্থিত হইয়া আতিবাহিক দেহ স্থাবর জঙ্গমাদি দেহ ধারণপূর্ব্বক মোক্ষ প্রাপ্তি না হওয়া পর্য্যন্ত প্রতিনিয়ত এই দৃশ্যাকারে পরিভ্রমণ করিতে থাকে। অর্থাৎ জাগ্রদবস্থা চলিয়া গেলেও সুপ্তি অবস্থা থাকে; তাহা হইতে পুনরায় জাগ্রদবস্থা আসিয়া উপস্থিত হয়। এই মূর্ত্ত পুর্য্যষ্টক বা স্থূল দেহ অতীত হইলেও তাহার সঙ্গে সঙ্গে যে সূক্ষ্ম পুর্য্যষ্টক চলিয়া যায়, তাহা নহে; কাজেই মুক্তির অভ্যুদয়ও ঘটে না। মুক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত উল্লিখিত আতিবাহিক দেহ অবস্থান করে এবং উহা বার বার স্থূল দেহে প্রবেশ করিয়া থাকে। ঐ দেহ সকলেরই থাকে; উহা কখন সুষুপ্ত অবস্থায় স্থিত হয়, কখন স্বপ্নাবস্থায় অবস্থান করে। ঐ আতিবাহিক দেহ যৎকালে সুষুপ্তভাবে অবস্থানপূর্ব্বক বাসনাকারে অন্তর্গত ভাবী দুঃস্বপ্ন-যোগে বিদ্ধবৎ হইয়া পড়ে, তখন উহার স্মৃতি বিলুপ্ত হয়; উহা অপ্রকটিতরূপে অবস্থান করিতে থাকে এবং চিৎ-প্রতিবিম্ব-সম্পর্কে জগদ্ভাবের সংহারে কালানল-সন্নিভ দীপ্তিমান্ হইয়া বিরাজ করে। এই যে স্থাবরাদি নিকৃষ্ট অবস্থা দেখা যায়, জাড্যাধিক্য নিবন্ধন ইহাকেই দীর্ঘ সুষুপ্ত বলা যায়। সত্য বটে কল্পবৃক্ষ স্বর্গীয় বৃক্ষ; তাহারই নামান্তর কল্পতরু। সাধারণ বৃক্ষাদির ন্যায় এই বৃক্ষের দুঃখ-কষ্টাদি কিছুই নাই। প্রচুর

পুণ্য আছে বলিয়াই অন্যান্য বৃক্ষবৎ কৃমি, কীট, ক্ষুধা বা তৃষ্ণাদি-জনিত দুঃখ উহাকে ভোগ করিতে হয় না। প্রত্যুত কল্পবৃক্ষের প্রচুর আনন্দই সর্ব্বদা বিদ্যমান; তথাচ মনুষ্যাদির ন্যায় তাহার প্রবোধ নাই। কেন না, জড়তার আধিক্য নিবন্ধন উহাতে সুষুপ্তিপ্রাচুর্য্যই অবস্থিত; কাজেই উহা নিয়ত প্রগাঢ় মোহান্ধকারে সমাচ্ছন্ন। জীবের যে সুষুপ্তি, তাহারই নাম জড়তা; স্বপ্নাবস্থায় যে চিত্তভ্রমণ, তাহাই সংসার; যাহা জাগ্রদবস্থা, তাহাই তুরীয়াবস্থা; আর যাহা প্রবোধ, তাহারই নাম মুক্তি। জীবের প্রবোধ জন্মিলেই মুক্তি লাভ হয়। প্রবোধেই জীব নির্ম্মল হইয়া থাকে। তাম্র যেমন সুবর্ণত্ব লাভ করে, জীব তেমনি প্রবোধে নির্ম্মল হইয়া পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। প্রবোধ নিমিত্ত জীবের যে মুক্তি হয়, সে মুক্তি দুই প্রকারে বিভক্ত। উহার মধ্যে একের নাম জীবন্মুক্তি; অপর বিদেহ-মুক্তি। তুরীয়াবস্থা-প্রাপ্তিকেই জীবন্মুক্তি বলা হয়। দেহপাতের পর যে তুর্য্যাতীত পদে অবস্থিতি, তাহারই নাম বিদেহ-মুক্তি। তুরীয়াতীত পদ প্রাপ্তিই বোধ বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। জীব তাহা হইতেই উৎকৃষ্ট চিন্মাত্র ব্রহ্মস্বরূপ লাভ করিয়া থাকে। জীবের ঐ অবস্থা শাস্ত্রীয় প্রযত্ন দ্বারাই লব্ধ হয়। তাহার প্রকৃত স্বরূপ কি, তাহা যদি সে অবগত হয়, তাহা হইলে যাহা সর্ব্বাবভাসক চিন্ময়তা, তাহাতেই তাহার অবস্থান হয়। কিন্তু ঐ আত্মতত্ত্ব যাহার অজ্ঞাত, সে এই দীর্ঘ স্বপ্নসন্নিভ সংসারভয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কিন্তু বলিতে কি, এ সংসারের উদয় মিথ্যা এবং ভয়প্রাপ্তিও অসত্য। কেন না, একথা প্রকৃতই যে, চিংদশ ব্যতীত জীবহৃদয়ে অন্য কিছুই বিদ্যমান নাই। জীব মিথ্যা দৃষ্টির আশ্রয় লইয়া আপনিই আপনাকে বিভিন্নরূপে অবলোকন করে এবং মিথ্যাময় শোকে অভিভূত হইয়া পড়ে। ফলে কিন্তু জীবে মাত্র পরমাত্মাই আছেন; তাহা ভিন্ন অন্য কোন সৎ পদার্থের অবস্থান তাহাতে নাই। এই যে চরাচর জগৎ পরিদৃষ্ট হইতেছে, ইহা কেবল মায়ার বিজৃম্ভণ মাত্র। মায়ার প্রভাব বস্তুতই অতি চমৎকার। কেন না, যাহাতে জগৎস্থিতি নাই, এ জগৎ তাহাতেই পরিদৃষ্ট হয়। দেখ, স্থালীমধ্য-গত অন্ন সিদ্ধ করিতে থাকিলে তাহা ফুটিয়া উঠিয়া

নানাকার ধারণ করে, জলের তাৎকালিক সেই সেই ভিন্ন ভিন্ন আকার বাস্তবিক পদার্থান্তর না হইলেও কেবল ভ্রমের ঘোরেই যেমন পদার্থান্তর বলিয়া বোধ হয়, তেমনি জানিবে—এই যে সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম জীবের উৎপত্তি-বিনাশ বা গমনাগমনরূপ সংসারভাব, ইহা মিথ্যা ভ্রমোদয়েই দৃষ্ট মাত্র বৈ আর কিছুই নয়। বাসনাকেই উহার বন্ধন বলা যায়, আর বাসনার বিলয়েই উহার মোক্ষ লাভ হয়। জীবাণুর যে সুষুপ্তি অবস্থায় অবস্থান, তাহাই বাসনার চরম সীমা। ইহাই স্বপ্নাবস্থায় বিচিত্রভাবে প্রকাশমান হইয়া থাকে। বাসনার ঘনীভাবেই সুষুপ্তির ন্যায় অবস্থা উপস্থিত হয়। স্বপ্নে সেই ঘনীভূত অব্যক্ত বাসনারাশির বৈচিত্র্য ও কিঞ্চিৎ স্ফুটত্ব এবং জাগ্রৎকালে তাহারই চরম প্রস্ফুট ভাব প্রকাশ পাইয়া থাকে। প্রগাঢ় বাসনামোহে আচ্ছন্ন হইয়া জীব স্থাবরাদি ভাব লাভ করে। বাসনা যখন মধ্যম অবস্থায় থাকে, তখন জীবের তির্য্যক্ যোনি প্রাপ্তি ঘটে, আর যখন উহা অল্প থাকে, তখন উহার পুরুষাবস্থা অর্থাৎ নর, কিন্নর, ও গন্ধর্ব্বাদি ভাব উপস্থিত হইয়া থাকে। বাসনার তারতম্য নিবন্ধন যেরূপ বৈচিত্র্য-বিকাশ হয়, জানিবে—গ্রাহ্য ও গ্রহণাদির বৈচিত্র্যেও তেমনই হইয়া থাকে। যৎকালে সুষুপ্তি হইতে বিচ্যুতি ঘটে, তখন দেহাভ্যন্তরে আনখাগ্র পরিব্যাপ্ত প্রাণ অহম্ভাবরূপ জীবনে এইরূপই পরিচ্ছেদ ঘটনা হয় যে, 'আমি এই প্রকার এবং এই দেহপরিমাণই আমি' ঈদৃশ পরিচ্ছেদ হইবার পরেই ঘটাদি পদার্থ-পুঞ্জকে বাহ্য বস্তু বলিয়া বোধ হয়। তখন চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়-পথে অন্তঃকরণের নিঃসরণ হয় এবং সেই অন্তঃকরণ দ্বারা বৃত্তিময় জীবও নির্গত হইয়া থাকে—হইয়া সে যখন ঘটাদি বাহ্য বস্তু সহ সম্মিলিত হয়, তখনই 'আমি ঘট জানিতেছি' এই প্রকার গ্রাহ্য-গ্রাহক-সম্বন্ধীয় বাসনাত্মিকা সত্তা সেই সেই বৈচিত্র্যরূপে স্ফুটীভূত হইয়া থাকে। ইহাই স্পষ্টরূপে বলা যায় যে, অন্তঃস্থিত জীবচৈতন্য যখন বাহিরের অনাত্ম-পদার্থে পরিব্যাপ্ত হয়, তখন চিত্তের সাহায্যেই গ্রাহ্য-গ্রাহক-সম্বন্ধীয় বাসনা মরীচিকার ন্যায় বিতা[illegible]মে সমুদিত হইয়া থাকে। সুতরাং বলা যায়, গ্রাহ্য-গ্রহণাদি বুদ্ধি সম[illegible]ই মৃগতৃষ্ণাবৎ ভ্রম মাত্র; উহা বাস্তব কিছুই নহে। আত্মা কিছুই ত্যাগ করেন না, কিছুই তিনি

গ্রহণ করেন না। তিনিই—সেই চিদাত্মাই অন্তরে বাহিরে প্রকাশ পাইতেছেন। অতএব এই বাহ্য ও আভ্যন্তর জগৎ চিদ্ব্যতিরিক্ত কোন কালেই অন্য কিছুই নহে। ইহাতে ভেদ-বিকল্পনা করা অনুচিত। যখন তত্ত্বজ্ঞানের উদয়, তখন আমরা সকলেই সেই এক চিৎস্বরূপেই বিরাজমান। সাগরে তরঙ্গ-বুদ্বুদাদি কত কি সমুদিত হয়, তত্ত্বতঃ বিবেচনা করিয়া দেখিলে সে সকল যেমন একমাত্র আকাশ অপেক্ষাও সুবিমল জল বলিয়াই বুঝিতে পারা যায়, তেমনি এই সকল জগদ্বৃত্তান্তও যদি বিবেক-সহকারে বিশেষরূপে দেখা হয়, তাহা হইলে বুঝা যাইবে, ইহাতে বাসনাবস্থাদি ভেদ-ভিন্নতা কিছুই বিদ্যমান নাই; ইহা একমাত্র সেই অনাময় পরম পদেই বিরাজমান।

একপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৫১॥

দ্বিপঞ্চাশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র! তোমার এরূপ ধারণা হওয়া অসম্ভব নহে যে, স্বপ্ন প্রত্যেক জীবেরই ভিন্ন ভিন্ন; যাহা জাগ্রৎপ্রপঞ্চ, তাহা সকলেরই একবিধ; সুতরাং স্বপ্নবৈধর্ম্ম্যে অনুভূয়মান জাগ্রদবস্থাকে কিরূপে স্বপ্ন বলা যায়? তোমার এরূপ ধারণা নিরাসের জন্য বক্তব্য এই যে, আদি জীব বা সমষ্টি জীবের যে স্বপ্নাবস্থা নানা কল্পনার প্রভাবে কোমলাকারে বিরাজ করে, অস্মদাদি ব্যষ্টি জীবের তাহাই জাগ্রৎ বা সংসার-দশা। ইহা না সত্য, না অসম্ভব; [illegible] না, ব্যষ্টি-জীবের যেমন স্বপ্ন হয়, সমষ্টি জীবের সেরূপ হয় [illegible]। এই নিমিত্ত বলা যায়, অস্মদাদি ব্যষ্টি এই যে জাগ্রৎ[illegible]সিদ্ধ ভূতভুবনাদি ভাব, ইহাই সমষ্টি জীবের

জাগ্রৎ ও স্বপ্ন এই উভয়বিধ অবস্থা হইতে প্রাদুর্ভূত; সুতরাং উহাকে স্বপ্ন হইতে ভিন্ন বলা চলে না।

হে বেদ্যবিদ্‌গণের বরেণ্য! জানিবে—স্বপ্ন বস্তু নহে; উহা অসত্য। অস্মদাদি ব্যষ্টি জীবের যে জাগ্রৎপ্রসিদ্ধ ভূত-ভুবনাদি ভাব, উহাও অসত্য এবং অবস্তু; সুতরাং ঐ জাগ্রদ্ভাব সমষ্টি জীবের স্বপ্নমধ্যে পরিগণিত। স্বপ্নে যে বস্তু দেখা যায়, তাহা যেমন অনুভূতিমাত্র, বাহিরে তাহার অপ্রকাশ, সমষ্টি জীবের স্বপ্নও তেমনি আদিতে অপ্রকাশ অবস্থায় অবস্থিত। অস্মদাদির স্বপ্নরহস্য যেমন সহজে প্রকাশ পায় না, তেমনি জীবের যাহা চৈতন্য ভাব, তাহা সত্বর প্রকাশিত হয় না, এই নিমিত্ত উহার দীর্ঘস্বপ্ন; সাধারণ স্বপ্নসহ ঐ স্বপ্নের তথাবিধ দীর্ঘতাই বৈধর্ম্ম্য।

হে নিষ্পাপ! জীবনিবহ যেমন এক স্বপ্ন দেখিয়া পরে অন্য স্বপ্ন দেখে, যাহা প্রকৃতই অসত্য, তাহাও যেমন স্বপ্নে সত্য বলিয়া জ্ঞান করে, তেমনি ঐ যে জীবসমষ্টিরূপ জীবের কথা বলিয়া আসিতেছি, উহাও আত্মচৈতন্যের সত্যতানিবন্ধন যাহা অসত্য, তাহাকেও ক্রমাগত সত্যরূপে অবলোকন করিতে থাকে। ইহাই উহার উত্তরোত্তর স্বপ্ন-সন্দর্শন। অর্থান্তরে বলা যায়, হে পবিত্র! জীব-নিবহ যেমন এক স্বপ্ন দেখে,—দেখিয়া তৎপরে অপর স্বপ্ন দর্শন করে, তেমনি ঐ সমষ্টি-জীবচৈতন্য সত্য হইলেও দৃষ্টির দোষে অসত্য বস্তুরূপে অবলোকন করিতে থাকে। বস্তু-স্বভাবের যে বিপরীত দর্শন, তাহাই উহার স্বপ্ন।

বৎস! বুঝিয়া দেখ, ব্রহ্মবস্তু অজড়। তথাচ সমষ্টি জীবের অংশভূত ব্যষ্টিজীবের অনুভবস্বরূপ মোহের বশে সেই অজড় ব্রহ্মকেও ভূত-ভুবনাদিরূপ জড়ভাবে অবলোকন করা হয়। আর যাহা অসত্য, তাহা সত্য বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। জীবনিবহ ভানুর অভ্যন্তরে নিখিল ভুবন-ভ্রম অবলোকনপূর্ব্বক ভেদ-কল্পনার প্রবাহরূপ ভ্রমে পড়িয়া স্বপ্নভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গের ন্যায় ভ্রমণ করিতেছে। তাহাদের কৃত ঐ সকল কল্পনায় যে সত্যতা সমারোপিত হয়, তৎপ্রতি কারণ এই যে, জীবনিবহ ব্যষ্টিভাবে ভ্রমণ-পরায়ণ হইলেও উহাদের যাহা পরম জীব, তিনি সর্ব্বগামী, অনন্ত ও সত্যস্বরূপ; সুতরাং তাহারই সত্যতায় উহারা যাহা ভাবনা করে,

সেই সত্য সম্বন্ধ-নিবন্ধন তাহাও অচিরাৎ সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হইয়া থাকে। বাহ্য বস্তুর সঙ্গ-পরিহারে জীবের যখন অসত্যে সত্য ভ্রম নিবৃত্তি পাইবে, তখনই তত্ত্ববোধে জীবন্মুক্তি প্রাপ্তি ঘটিবে।

হে মহাভুজ! স্বয়ং ভগবান্ পুণ্ডরীকাক্ষ পাণ্ডুপুত্র অর্জ্জুনকে সঙ্গ-বর্জ্জনরূপ শুভগতি-বিষয়ে ভাবী কালে উপদেশ প্রদান করিবেন। অর্জ্জুন সেই উপদেশের আশ্রয় লইয়া তৎকালে মহামুনিব্রত অবলম্বন-পূর্ব্বক সর্ব্বদুঃখ হইতে নির্ম্মুক্ত ও জীবন্মুক্ত হইবেন। অপিচ তিনি সেই উপদেশপ্রভাবে সুখময় আত্মজীবনও বিসর্জ্জন দিবেন। এ সকল তোমায় বলিতেছি, অবধান কর,—করিয়া তুমিও সেই অর্জ্জুনবৎ জীবিত-কাল কর্ত্তন কর।

রামচন্দ্র কহিলেন,—ভগবন্! পাণ্ডুনন্দন অর্জ্জুন কোন্ কালে প্রাদুর্ভূত হইবেন? ভগবান্ হরি তাঁহাকে কিরূপ অসঙ্গ-গতিই বা উপদেশ দিবেন?

বশিষ্ঠ কহিলেন,—শুন রাম! যেমন আকাশের আশ্রয়ে মহাকাশ বিদ্যমান, তেমনি ভবদীয় আত্মায় এক সৎ মহাত্মা বিরাজমান। সে মহাত্মা—অনাদি অনন্ত; তাঁহার নাম কেবলই কল্পনা। শ্রুতি-বর্ণিত স্বীয় মহিমাতেই সেই আত্মা বিরাজিত। এই বিশ্বসংসার তাঁহাতেই অধিষ্ঠিত। সুবর্ণ হইতে কটকাদি অলঙ্কারের উৎপত্তি হয় বলিয়া তাহাতে যেমন কটকাদি এবং জলে তরঙ্গের উদ্ভব বলিয়া তাহাতেই যেমন তরঙ্গের স্থিতি, তেমনি সেই যে বিমল আত্মা, তাঁহাতেই এই সংসার-বিভ্রমের অবস্থিতি। জানিবে—জালবদ্ধ পক্ষিগণের ন্যায় এই চতুর্দ্দশবিধ ভূতজাতি দৃশ্যমান সংসারজালে জড়িত হইয়া অবস্থান করিতেছে। ইহাদের মধ্যে শ্রুতি-স্মৃতি-গীত-চরিত যম, চন্দ্র ও সূর্য্য প্রভৃতি মহাত্মগণ এই পঞ্চীকৃত পঞ্চতন্মাত্রময় সংসারের লোকপালপদে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন। ইহা পবিত্র, সুতরাং উপাদেয়, আর ইহা পাপ, সুতরাং পরিত্যাজ্য, ইহা ভাল, কাজেই কর্ত্তব্য, আর ইহা মন্দ, কাজেই অকর্ত্তব্য, ইত্যাদি প্রকার নিয়ম তাঁহারাই স্ব স্ব অধিকারানুরূপ সঙ্কল্প-সংঘটিত জ্ঞানবলে স্থাপন করিয়াছেন।

হে অনঘ! যম বহু কাল ধরিয়া স্বীয় অধিকৃত কর্ম্মস্রোতে নিজ চিত্তকে অচলভাবে স্থাপন করেন; কিন্তু চিরদিন সে ভাব তাঁহার থাকে না; কিয়ৎকাল অতীত হইলে, তিনি ভাবান্তরে উপনীত হন। ভগবান্ যম প্রতি চতুর্যুগেই জীবহিংসা-জনিত পাপের ভয়ে ভীত হইয়া তপস্যা করিয়া থাকেন। তিনি কদাচিৎ আট বর্ষ, কখন দশ বর্ষ, কদাচিৎ দ্বাদশ বর্ষ, কখন কখন পঞ্চদশ বর্ষ, কোন সময়ে সপ্ত বর্ষ, আবার কোন কোন কালে বা ষোড়শ বর্ষ পর্য্যন্ত তপস্যায় মনোনিবেশ করেন। ঐ অবস্থায় কৃতান্ত উদাসীনের ন্যায় সমাসীন হইলে এই সংসারস্থ ভূতবৃন্দের মধ্যে কেহই আর তখন মৃত্যুকবলিত হয় না। তৎকালে অহিংসানিবন্ধন এই পৃথিবী ভূতবৃন্দে নীরন্ধ্রীকৃত হওয়ায় ভূতভূয়িষ্ঠ হইয়া একেবারে সঞ্চারের অযোগ্য হইয়া পড়ে। সর্ব্বত্রই ভূতবৃন্দে পরিব্যাপ্ত হয়; কাজেই পৃথ্বীতলে লোকের গতি-বিধি অসম্ভব হইয়া উঠে। তখন মনে হয়, এ তো পৃথ্বী নয়; ইহা যেন বর্ষাকালের স্বেদ-পরিপ্লুত মশক-কুল-সমাকীর্ণ কোন একটা প্রকাণ্ড কুঞ্জর অবস্থিত। অনন্তর সেই বিবিধ বিচিত্র ভূতবৃন্দ পৃথিবীর ভারভূত হইয়া পড়ে। সুরগণ নানা উপায়ে তাহাদিগের সংহার সাধন করিয়া পৃথিবীর ভার লাঘব করেন। এইরূপে সহস্র সহস্র যুগ যাবৎ ঈদৃশ শত শত ভার-হরণ ব্যাপার চলিয়া আসিতেছে। অনন্ত ভূত, অনন্ত জগৎ অতীত হইয়াছে, হইতেছে এবং ভাবী কালেও হইবে। সেই পিতৃপতি যম এক্ষণে সূর্য্যনন্দন নামে পরিচিত হইতেছেন। হে সাধো! তিনি অধুনা কতিপয় যুগের অবসানে প্রাণিহিংসা-জনিত স্বীয় পাপাপহরণের নিমিত্ত প্রাণিপীড়ন কার্য্য পরিহার করিয়া দ্বাদশ বর্ষ যাবৎ ব্রতচর্য্যা করিবেন; কাজেই মরণধর্ম্মী প্রাণিগণের মৃত্যু না হওয়ায় পৃথিবী ভারাক্রান্ত হইয়া দীনভাবে অবস্থান করিবেন। পতিগত-প্রাণা রমণী যেমন দস্যুর আক্রমণে ভীত হইয়া স্বীয় পতির শরণ গ্রহণ করেন, এই পৃথিবীও তেমনি জীবনিবহের ভার-ধারণে ক্লান্ত হইয়া বিপদ্‌বারী শ্রীহরির শরণাপন্ন হইবেন। তৎকালে ভূ-ভার-হরণ-কামনায় বৈকুণ্ঠবিহারী হরি সর্ব্বদা দেবাংশ সহযোগে এ ভূতলে নর-নারায়ণরূপে আবির্ভূত হইবেন। তাঁহার একমূর্ত্তি—বাসুদেব

এবং অপর মূর্ত্তি—পাণ্ডুনন্দন অর্জ্জুন নামে প্রথিত হইবে। সাক্ষাৎ ধর্ম্মের পুত্র 'যুধিষ্ঠির' নাম গ্রহণ করিয়া পাণ্ডু রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্ররূপে পরিচিত হইবেন। তিনি এ জগতে ধার্ম্মিক বলিয়া খ্যাতি লাভ করিবেন। মহাব্ধি-মেখলা-মণ্ডিত পৃথিবীর তিনি অধিপতি হইবেন। দুর্য্যোধন নামে তাঁহার এক পিতৃব্যজ ভ্রাতা হইবে। তাহার সহিত ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠিরের ভ্রাতা ভীমসেনের অহিনকুলবৎ ঘোর বিরোধ বাধিবে। যুদ্ধে ভীম নকুলবৎ এবং দুর্য্যোধন সর্পের ন্যায় হইবে। পৃথিবীর উপর একাধিপত্য স্থাপন করাই দুর্য্যোধনের উদ্দেশ্য। কাজেই কুরু ও পাণ্ডব উভয় পক্ষেরই যুদ্ধাকাঙ্ক্ষা সমুদ্দীপ্ত হইবে। এই উপলক্ষে উভয় পক্ষে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনার সমাবেশ হইবে।

হে রাঘব! সেই ভীষণ সমরে গাণ্ডীবধারী পার্থের মূর্ত্তি ধারণ করিয়া স্বয়ং হরি অষ্টাদশ অক্ষৌহিণীর সহিত কুরুকুলের ধ্বংস সাধন করিবেন। এই কার্য্যে পৃথিবীর ভার লঘূকৃত হইবে। বিষ্ণুর যে দেহ অর্জ্জুনাদির আকার ধারণ করিবে, তাহা প্রাকৃত ভাবে পরিপূর্ণ হইবে; কাজেই ক্রোধ-হর্ষাদি নর-ধর্ম্মে সে দেহ আক্রান্ত হইবে। অর্থাৎ অবিদ্যা হইতে যে অজ্ঞতার উদয় হয়, তাহা সে দেহে থাকিবে। সেই অবিদ্যার প্রভাবেই অর্জ্জুন উভয়পক্ষীয় সেনাদল মধ্যে আপনাদের আত্মীয় স্বজনকে মরণোদ্যত দেখিয়া বিষণ্ণ হইবেন এবং যুদ্ধ হইতে বিরত হইবার ইচ্ছা করিবেন। হে রঘুনন্দন! উপস্থিত কার্য্য সমাধা করিবার জন্য হরি তাঁহার অর্জ্জুনা-ভিধেয় দেহকে স্বীয় স্বতঃসিদ্ধ আত্মবোধময় দেহ দ্বারা নিম্নোক্ত প্রকার উপদেশ প্রদান করিয়া প্রবুদ্ধ করিয়া লইবেন। তিনি বলিবেন,—হে অর্জ্জুন! এই আত্মার কখন উৎপত্তি বা নাশ নাই। ইনি ষড়ভাব-বিকার-বিরহিত পরম পদার্থ; ইহাঁর জন্ম অগ্রে নাই বা পরেও নাই। ইনি অজ, নিত্য, শাশ্বত, পুরাণ পুরুষ। দেহ বিনষ্ট হউক, বা অন্যাবস্থায় উপনীত হউক, ইহাঁর বিনাশ কিছুতেই নাই। যিনি ইহাঁকে হন্ত অথবা যিনি ইহাঁকে হন্তা বলিয়া মনে করেন, এ কথা নিশ্চয় বলা যায় যে, তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে কেহই ইহাঁর প্রকৃত তত্ত্ব অবগত নহেন। কেন না, আত্মা কাহাকেও বিনাশ করেন না এবং ইহাঁকেও কেহ নিহত করিতে

পারে না। ইনি অনন্ত, ইহাঁর রূপান্তর নাই; তাই ইনি সর্ব্বদা এক-রূপ ও সৎস্বরূপে বিদ্যমান। ইহাঁর স্বরূপ আকাশ অপেক্ষাও সূক্ষ্ম। এ হেন পরমেশ পরমাত্মার কিরূপে কি অপচয় হইতে পারে?

হে জ্ঞানময়! তুমি অবলোকন কর—আত্মা ঐরূপই অনন্ত, অব্যক্ত ও আদি-মধ্য-বিরহিত। তুমিই সেই অপরিচ্ছিন্ন, নির্দ্দোষ ও চৈতন্য-স্বরূপ; সুতরাং অজ, নিত্য ও নিরাময়রূপে তুমিই ত প্রতিভাত। এ অবস্থায় বন্ধুসংসর্গ বা স্বজন-বিয়োগ-সম্ভাবিত সুখ কিম্বা দুঃখ প্রকাশ তোমার পক্ষে কোন ক্রমেই উচিত কার্য্য হইতে পারে না।

দ্বিপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫২ ॥

ত্রিপঞ্চাশ সর্গ।

ভগবান্ কহিলেন,—হে অর্জ্জুন! তোমার জরা-মরণাদি ষড়্ভাব-বিকার নাই। সুতরাং তুমি শাশ্বত;—স্বীয় বন্ধু-বান্ধবাদির ও অন্যান্য সর্ব্বভূতেরই তুমি সাক্ষাৎ আত্মস্বরূপ। অতএব 'আমি অপরের হন্তা' বলিয়া তুমি যে মনে মনে একটা অভিমান পোষণ করিতেছ, সে অভিমান মিথ্যা। বাস্তবিক তুমি কাহারও হন্তা নহ; সুতরাং ঐ অভিমান তুমি পরিত্যাগ কর। বধাদি প্রবৃত্তিকালে 'আমি ইহাকে বধ করিতেছি' এই প্রকার অহঙ্কার ভাব যাহার না থাকে এবং যাহার বুদ্ধি উত্তরকালে সেই বধাদি ক্রিয়ার ফল—হর্ষ বা বিষাদাদি দ্বারা লিপ্ত হয় না, সেই ব্যক্তি এ সংসারের চতুর্ব্বিধ ভূতজাতিকে নিহত করিলেও বস্তুতঃ কাহাকেই নিহত করে না এবং সেই বধ প্রযুক্ত পাপের ফলে সেও অবশ্যই নিবদ্ধ বা নিহত হয় না। নিজের অন্তরে যে দেহাদি অভিমান বা অপর কোন বুদ্ধিবৃত্তির উদয় হয়, তাহাই অনুভূত হইতে থাকে; তাহাকেই অনুভব শব্দের অভিধেয় বলা হয় এবং তাহাতেই এই, ইহা, তাহা, সেই, আমি, ইহা আমার, এই আমি মরিতেছি, ইহা আমি করিতেছি, ইত্যাদি বোধোদয় হইয়া থাকে। অতএব

এবম্বিধ সম্বিৎ তুমি পরিত্যাগ কর, অর্থাৎ মিথ্যা বা তুচ্ছ জ্ঞান দূরে অপসারিত করিয়া দাও।

হে ভারত! যদি তুমি উল্লিখিত প্রকার সম্বিতে আবিষ্ট হও, অর্থাৎ আমিই হত্যা করিতেছি, এই প্রকার ভ্রমাত্মক অজ্ঞানে আবর্জ্জিত হইয়া পড়, তাহা হইলে 'আমি নাশ পাইলাম' বলিয়া একটা নির্ব্বেদ আসিয়া তোমার অন্তরে উদিত হইবে। অর্থাৎ আমি অমুককে মারিয়া ফেলিলাম বলিয়া পাপের প্রকোপে পরলোক হারাইলাম, অপিচ ইহলোকেও সুখ নাই, এখানেও বন্ধু-বিয়োগাদি অনিষ্টাপাতে আমার সর্ব্বনাশ ঘটিল, এই বলিয়া অন্তর তোমার দুঃখাভিভূত হইবে। সুতরাং বলিতেছি, তুমি এক্ষণে বুঝিয়া দেখ যে, মাত্র ভ্রমের ঘোরেই তোমাকে উভয়ত্র দুঃখানুভব করিতে হইবে। স্বীয় আত্মার অংশভূত সত্ত্বাদি গুণ-বিকার-সম্পন্ন দেহেন্দ্রিয়াদিই কার্য্য করে—তাহারাই প্রকৃত কর্ত্তা; পরন্তু মোহের বশে 'আমি করি' এইরূপ অভিমানের আবির্ভাব হইয়া থাকে। চক্ষু দেখিতে হয়, দেখুক, কর্ণ শুনিতে হয়, শুনুক, ত্বক্ স্পর্শ করিতে হয়, করুক, আর রসনা রসাস্বাদন করিতে হয়, করুক, ইহাতে 'অহং' যোগ কর কেন? ফলে বিষয়ে চক্ষুরাদিরই প্রবৃত্তি হয়, আত্মার সঙ্গে উহার কোন সম্বন্ধ নাই, তিনি ঐ বিষয়ের কেহই নহেন। সুতরাং চক্ষুরাদি যে কার্য্য করে, তাহাতে আত্মায় কর্ত্তৃত্ব আরোপ করা কর্ত্তব্য নহে। মনের ধর্ম্ম—সঙ্কল্প-বিকল্প; মন তাহা করিতে হয়—করুক, তাহাতে ক্লেশের ভাগী হইতেছ কেন? বস্তুতঃ অন্তঃকরণই সঙ্কল্প-বিকল্পাদি কর্ম্মানুষ্ঠানে নিরত হইয়া থাকে; সুতরাং তুমি ইহা বেশ দেখিতে পাইতেছ যে, কি অন্তঃকরণ-বৃত্তি, কি বাহ্য বৃত্তি, কুত্রাপি তোমার আত্মা লিপ্ত নহে। অপিচ তুমি ক্লেশ-ভাজন বলিয়া যচ্ছন্দেশে শোক প্রকাশ কর, সে শোক-সম্বন্ধই বা আত্মায় কৈ? আরও দেখ, যে কার্য্য বহুর সহিত এক যোগে অনুষ্ঠিত হয়, তাহাতে আমি একা ইহার কর্ত্তা, এরূপ অভিমান করিলে উপহাসাস্পদ হইতে হয় না কি? ফলে যাহাদের বুদ্ধি-শুদ্ধি নাই, তাহারাই ঐ প্রকার 'অহং' অভিমান পোষণ করিয়া থাকে। যোগিগণ আত্মশুদ্ধির নিমিত্ত অসঙ্গ-ভাবে শরীর, মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতি দ্বারা কর্ম্মানুষ্ঠান করেন।

যাঁহাদের দেহ 'অহং'ভাবরূপ বিষে জর্জ্জরিত হইয়া মৃত্যুর পথে উপনীত হয় নাই, তাঁহারা কোনরূপ লৌকিক কিম্বা শাস্ত্রীয় কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াও কিছুই করেন না এবং সেই সেই কার্য্যের ফল ভোগ করিয়াও ফলভোগী হন না। কেন না, বিষয়ের প্রতি আসক্তি প্রভৃতি ব্যাধি তাঁহাদের একেবারেই অপগত হইয়া যায়। মানব শত বিজ্ঞ বা বহুদর্শী হউক, সঙ্গ-দোষে দুঃশীল হইয়া পড়িলে তাহার যেমন আর শোভার বিকাশ হয় না, তেমনি এই দেহ যদি অভিমানরূপ অমেধ্য ভাবে দূষিত হয়, তবে আর তাহা শোভা পায় না। যাঁহার মমতা নাই, অহঙ্কার নাই, অপিচ ক্ষমা আছে, সুখে দুঃখে সমভাব আছে, সে ব্যক্তি অবশ্য-কর্ত্তব্য শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম করুক কিম্বা অনাবশ্যকীয় লৌকিক কর্ম্মই করুক, তাহাতে সে কদাচ লিপ্ত হয় না।

হে পাণ্ডুনন্দন! সমরে বিমুখ না হওয়াই ক্ষত্রিয়োচিত কর্ম্ম। তুমি একজন ক্ষত্রিয়, যুদ্ধ করাই তোমার স্বধর্ম্ম। এই কার্য্য বন্ধু-বান্ধবাদির বধের প্রযোজক বলিয়া সাতিশয় নিষ্ঠুর কর্ম্ম মধ্যে গণ্য হইলেও তোমার পক্ষে ইহা মঙ্গলাবহ, সন্দেহ নাই। পরন্তু স্বধর্ম্ম-বিরুদ্ধ নির্দ্দোষ কর্ম্মও শ্রেয়স্কর নহে। দেখ, তোমার ধর্ম্মোচিত কর্ম্ম ক্রূর হইলেও চিত্তশুদ্ধি দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞানাদি সুখের এবং ধর্ম্ম, যশ, রাজ্য বা স্বর্গাদি অভ্যুদয়েরও কারণ হইবে। স্বজন-বধাদি দ্বারা কুৎসিত হইলেও শাস্ত্রীয় প্রমাণানুসারে এ কার্য্য তোমার শ্রেষ্ঠ কার্য্য। এ কার্য্যে তুমি কোন প্রত্যবায়ের আশঙ্কা না করিয়া যুদ্ধে শত্রুবিজয়ে প্রবৃত্ত হও—হইয়া অমরধর্ম্ম লাভ কর। বিজ্ঞের কথা আর বিশেষ করিয়া বলিব কি? যাহারা মূর্খ, তাহারাও স্বধর্ম্ম পালন করিয়া থাকে। কেন না, স্বধর্ম্মই সকলের পক্ষে মঙ্গলকর। যাঁহাদের মনে অহঙ্কারের লেশমাত্র নাই, তাঁহাদের মন পাতিত্য-জনক কোটি কোটি মহাপাতকাদির দ্বারাও লিপ্ত হইবার নহে।

হে ধনঞ্জয়! তুমি সিদ্ধি কিম্বা অসিদ্ধিতে সমভাবস্বরূপ যোগ অবলম্বন কর এবং নিঃসঙ্গ হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে থাক। ফল প্রাপ্ত হইবে বলিয়া কর্ম্মে তোমার প্রবৃত্তি না হউক। তুমি কর্ম্মফলের প্রতি কোনরূপ আসক্তি না রাখিয়া যথাপ্রাপ্ত কর্ম্মসমূহের অনুষ্ঠান কর। এইরূপ

করিলে তোমাকে আর কর্ম্মবন্ধনে আবদ্ধ হইতে হইবে না। হে অর্জ্জুন! তুমি নিজের দেহকে শান্ত শিব ব্রহ্মময় বলিয়া ভাবনা কর, আর অনুষ্ঠেয় কর্ম্মসমূহকেও ব্রহ্মময় করিয়া লও। অবশেষে সেই কর্ম্ম ব্রহ্মেই সমর্পণ কর। এইরূপ করিলে অচিরাৎ তুমিও ব্রহ্ম হইতে পারিবে। অর্থাৎ তুমি যে কিছু কর্ম্ম করিবে, তাহা ব্রহ্মভাবে ভাবিত হইয়াই করিবে, আর তোমার অনুষ্ঠিত কর্ম্মকেও তুমি ব্রহ্মভাবে ভাবিত করিবে। সকল বস্তু, সকল কামনা, সমস্ত প্রার্থনা, সমুদায় কার্য্য—তুমি ঈশ্বরেই অর্পণপূর্ব্বক স্বয়ং ঈশ্বরাত্মা হইয়া অবস্থান কর। তোমার যখন এরূপ জ্ঞান হইবে যে, ঈশ্বর সর্ব্বভূতেই আত্মরূপে অবস্থান করিতেছেন, তখন তোমার দ্বারা এ ভূতল অলঙ্কৃত হইবে; নিজেই তুমি নিরাময় ঈশ্বর হইবে। তাই বলিতেছি, হে অর্জ্জুন! একমাত্র ঈশ্বরেই তোমার সর্ব্ব সঙ্কল্প সমর্পিত হউক। তুমি সমদর্শী ও শান্তচিত্ত হও—সন্ন্যাস যোগ আশ্রয় কর। এইরূপ করিয়া তুমি মুক্তিমতি মুনি হও।

অর্জ্জুন কহিলেন,—হে ভগবন্! সঙ্গত্যাগ, ব্রহ্মার্পণ, ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ, সন্ন্যাস, জ্ঞান এবং যোগ এই সমুদায়ের বিভাগ কি প্রকার? হে বিভো! মদীয় মহামোহ নিবৃত্তির জন্য ঐ সকল আপনি যথাক্রমে প্রকাশ করিয়া বলুন।

ভগবান্ কহিলেন,—যখন সর্ব্বপ্রকার বাসনা ও সর্ব্ববিধ সঙ্কল্পের অবসান হয়, তখন আর ভাবনার কোনও আকার থাকে না; পণ্ডিতগণের মতে সেই অবস্থাই ব্রহ্মপর বা ব্রহ্মনিষ্ঠ। নির্ব্বিকল্প সমাধির পরিপাক দশায় ব্রহ্মবিদ্গণ যাহার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া থাকেন, তথাবিধ নিষ্প্রপঞ্চ প্রত্যগাত্মরূপই ব্রহ্ম। ব্রহ্মসারূপ্য লাভ করিবার জন্য সমুদ্যত জীবের অজ্ঞানাপগমে চিত্তের যে ব্রহ্মরূপে একনিষ্ঠা, তাহারই নাম জ্ঞান। যে মনোবৃত্তির প্রবাহ অজ্ঞান-বিনাশের কারণ, তথাবিধ ব্রহ্মবুদ্ধির প্রবাহই যোগ নামে নির্দ্দিষ্ট। কি জগৎ, কি আমি, সকলই ব্রহ্ম; কর্ম্মকালে এইরূপ বুদ্ধিকে অবিচ্ছিন্ন ভাবে রক্ষা করাই ব্রহ্মার্পণ। ব্রহ্মভাবের ব্যাখ্যা এইরূপ যে, যেমন পাষাণস্তম্ভের অন্তর ও বহির্ভাগ একই প্রকার, তেমনি ব্রহ্মেরও বাহ্য ও অভ্যন্তর একরূপ।

তিনি শান্ত, শিব ও আকাশবৎ স্বচ্ছস্বভাব। তাঁহাকে দৃশ্য প্রপঞ্চের অতীত বলা হয়, অথচ তিনি তাহার অতীত নহেন। তিনি দৃশ্যপরম্পরার দ্রষ্টা, প্রকাশক ও সাক্ষিভাবে বিরাজমান। বলিতে পার, তিনি যদি দৃশ্য নহেন; তবে তো তিনি দ্রষ্টা বা চক্ষুরাদিও নহেন; ইহা অবাধেই বলা যাইতে পারে; কেন না দ্রষ্টা বা চক্ষুরাদিকেও তো দৃশ্যের মধ্যেই গণ্য করা হয়। এ কথার উত্তর এই যে, এরূপ বলিতে পার না; কেন না, দ্রষ্টা বা চক্ষুরাদির যাহা দ্রষ্টা, তাহাও তো তদ্ভিন্ন অন্য কেহই নহে। অতএব এ জগতে চক্ষুরাদিই অদ্বিতীয় দ্রষ্টা। কাজেই বলিতে হইবে যে, ব্রহ্ম দৃশ্য নহেন—তিনি চক্ষুরাদির ন্যায় একমাত্র দ্রষ্টা। সুতরাং এই যে জগৎ দেখা যায়, ইহা সেই 'অহং'অভিমানী ব্রহ্মে অধ্যস্তমাত্র বৈ আর কিছুই নহে। এই অল্প মিথ্যাভেদগামী জগৎ তাঁহাতেই প্রতিভাত হইতেছে। এ জগৎ তাঁহারই অন্যতা বা প্রতিভাস স্বরূপ। এইরূপে জীবনিবহের প্রত্যেক অহম্ভাবই অধ্যাস মাত্র; সুতরাং তাদৃশ অহম্ভাবে আগ্রহ করা বিধেয় নহে। জানিবে—ঐ 'অহং'ভাব চৈতন্যেরই কোটি কোটি অংশাংশ হইতে কল্পিত হইয়া আবির্ভূত হয়। ইহা ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র বা পৃথক্‌রূপে ভাসমান বটে; কিন্তু বাস্তব পক্ষে উহার স্বাতন্ত্র্য বা পার্থক্য কিছুই নাই। কেন না, স্বাতন্ত্র্য বা পরিচ্ছেদ ব্রহ্মে একেবারেই অসম্ভব। বলিতে পার—ব্রহ্ম জ্ঞাতা বা তিনি জানিতেছেন, এরূপ তো ব্যবহার হইয়া থাকে। এ পক্ষে বক্তব্য এই যে, এ সকল স্থলেও 'অহং' যে পৃথক্ কোন বস্তু, তাহা বলা যায় না। কেন না, ঈদৃশ 'জ্ঞাতা' প্রভৃতি উপপত্তিযোগে ব্রহ্মে যে পার্থক্য নির্ণয়, তাহা সর্ব্বথা অযৌক্তিক। এইরূপে অহম্ভাব যেমন অপৃথক্, তেমনি এই ঘট, এই পট; ইত্যাদি করিয়া যত কিছু বস্তু, তৎসমস্তও সেই অনন্ত ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। কেন না, ঘট পটাদি করিয়া যত কিছু ভাব আছে, তৎসমস্তও সেই অপার ব্রহ্মেই সমুদিত হইতেছে। যে অনন্ত ব্রহ্মে 'অহং' 'মম' বা আমি, আমার, তুমি, তোমার, ইত্যাদি ভাব স্ফুরিত হইতেছে,—সাগরে পূর্ণতার ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে, সেই যে অসীম অনন্ত ব্রহ্ম, তিনিই প্রত্যেক দেহে আত্মচৈতন্য নামে প্রথিত হইতেছেন। সকল ভাবই

পূর্ণতার আকারে ব্রহ্ম—যাহা পৃথক্ বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তাহা সেই পূর্ণ পরম বস্তুরই প্রতিভাস। ইহাতে অহম্ভাবের আগ্রহ প্রকাশিত করা যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া বলা যায় না। ভাবিয়া দেখ, আমি, তুমি, তোমার, আমার, ইত্যাদি বিভিন্ন বিকল্পনায় বিশেষ বিশেষ বিষয়বৈচিত্র্যে বৈচিত্র্য প্রকাশ পাইলেও তাহাতে যাহা সমস্ত বৈচিত্র্যসত্তার কারণীভূত, সেই সম্বিৎসারময় একই আত্মার আর বৈচিত্র্য বিকাশ কিছুই নাই। আত্মার সেই একত্বে তোমার আগ্রহ বা আস্থা হইতেছে না কেন?

হে পার্থ! এই প্রকার বিচারালোচনা করিলেই লোক সংসারবিভাগ বিদিত হইতে পারে। তৎকালে তাহার আর আমি বা আমার ইত্যাদি ভাবে আগ্রহ মোটেই থাকে না; তাহা তাহার বুদ্ধিতেই লয় প্রাপ্ত হয়। তখন সেই ব্যক্তির কর্ম্মফলে স্পৃহা হয় না, তাদৃশ নিঃস্পৃহতা-রূপ যে ত্যাগ আসিয়া তাহার উপস্থিত হয়, তাহাই সন্ন্যাসাখ্যায় অভিহিত হইয়া থাকে। সমুদায় সঙ্কল্পপরিহারের নামই অসঙ্গভাব। যত কিছু কল্পনা আছে, সেই সকল কল্পনাপরম্পরারূপ দ্বৈতভাব-সমবায়ের উপাদান ঈশ্বর ব্যতীত আর কেহই নহে। স্বভাবতঃ ভাবিয়া দেখ—দেখা যাইবে, একমাত্র ঈশ্বরত্বই অনুভূত হয়; বৈচিত্র্য ভেদ কিছুই তাঁহাতে নাই। এই প্রকারে যদি দ্বৈতভাব গলিয়া যায়, তাহা হইলে ঈশ্বরে সর্ব্ব সমর্পণ ঘটে। তথাবিধ সর্ব্বস্ব সমর্পণই ঈশ্বরার্পণ বলিয়া বুঝিবে। অজ্ঞানবশেই ঐ চিদাত্মা ব্রহ্মে ভেদকল্পনা উপস্থিত হইয়া থাকে। এই ভেদ নামতঃ; বস্তুতঃ—অর্থতঃ নহে। সেই একাদ্বয় চিদাত্মাই একমাত্র অর্থ। ফলতঃ কি শব্দ, কি অর্থ, সকলই বোধমাত্র। বোধ ভিন্ন সে সমুদায় আর কিছুই নহে। সুতরাং এই যে দিক্, জগৎ, আমি, আমার, তুমি, তোমার, ক্রিয়া, কাল, এই সকলই বোধাত্মা আমি। হে ভারত! যাহা কাল, তাহা আমি, যাহা দ্বৈত ও অদ্বৈত ভাব, তাহাও আমি, আর যাহা দ্বৈত ও অদ্বৈতভাবের নিয়মাধীন জগৎ, তাহাও আমি বলিয়াই বিদিত। অতএব হে অর্জ্জুন! তুমি আমাতে আত্ম মন সমর্পণ কর,—আমার গুণ শ্রবণ কর, এবং আমার নাম কীর্ত্তন করিতে থাক। এই সকল উপাসনাযোগে আমাতে তুমি ভক্তিযুক্ত হও। তুমি

দানযজ্ঞ কর, কর্ম্মযজ্ঞ কর, এই সকল করিয়া আমারই যজন করিতে থাক এবং আমারই উদ্দেশে সর্ব্বদা নমস্কার কর। হে অর্জ্জুন! এই রূপ যোগ দ্বারা মৎপ্রতি চিত্ত নিবেশ করিয়া যদি তুমি মৎপরায়ণ হইতে পার, তাহা হইলে আমি আত্মস্বরূপ ;—আমাকে লাভ করিতে সমর্থ হইবে।

অর্জ্জুন কহিলেন,—হে দেবদেব! শুনিয়াছি আপনার পর ও অপর নামে দুইটী রূপ আছে। ঐ রূপদ্বয় কি প্রকার? উহাদের মধ্যে সিদ্ধি-লাভের জন্য আমাকে কোন্ রূপের আশ্রয় লইতে হইবে? তাহা আমার নিকট প্রকাশ করিয়া বলুন।

ভগবান্ কহিলেন,—হে অনঘ! জানিবে—আমার সাধারণ এবং পরম এই দ্বিবিধ রূপ বিদ্যমান। তন্মধ্যে যাহা হস্ত-পদাদি-যুক্ত ও শঙ্খ-চক্রাদি-ধর, সেই রূপই আমার সাধারণ রূপ। আর আমার যে রূপ—অনাময়, অদ্বিতীয়, অনাদি, অনন্ত ও অবিশুদ্ধচেতা ব্যক্তিবর্গের দুর্ব্বোধ্য এবং যাহা ব্রহ্ম, আত্মা, পরমাত্মা, ইত্যাদি নামে নিরূপিত, তাহাই আমার পরম রূপ। আত্মজ্ঞানের অভাব নিবন্ধন যতদিন তুমি অবুদ্ধ অবস্থায় থাকিবে, অথবা যতকালে না তোমার বুদ্ধির উন্মেষ হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত তুমি আমার চতুর্ভুজধর সাধারণ রূপেরই অর্চ্চনা করিতে থাক। এই প্রকার করিতে করিতে তোমার চিত্তশুদ্ধি হইবে এবং চিত্তশুদ্ধি ঘটিলে তখন প্রবোধ সঞ্চার হইবে। এইরূপ হইলেই আমার সেই অনাদি অনন্ত পরম রূপ তুমি জানিতে পারিবে। আমার ঐ রূপরহস্য বিদিত হইতে পারিলে তোমাকে কখন আর জন্মদুঃখ ভোগ করিতে হইবে না। হে অরিন্দম! যদি তুমি বুঝিয়া থাক যে, তোমার চিত্তশুদ্ধি ঘটিয়াছে, তাহা হইলে বুঝ যে, আমি ঈশ্বর; আমার পারমার্থিক আত্মায় তোমার আত্মাকে একরসীকৃত কর,—করিয়া বুদ্ধির সহায়তায় পরম পূর্ণ অখণ্ড আত্মার আশ্রয় লও। এই দিঙ্মণ্ডল, এই জগৎ, ইত্যাদি করিয়া যাহা কিছু আছে, তৎসমস্তই আমি। এই প্রকার উপদেশ যে তোমায় আমি প্রদান করিলাম, ইহার উদ্দেশ্য কেবল তোমাকে আত্মতত্ত্বে অভিজ্ঞ করিয়া তোলা বৈ আর কিছুই নহে। আমি মনে করি, মদুপদেশে তুমি সম্যক্

প্রবোধ প্রাপ্ত হইয়াছ ; পরম পদে তোমার বিশ্রান্তি লাভ ঘটিয়াছে, এবং তোমার সঙ্কল্পজাল ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে তুমি সত্য একাত্মময় হইয়া অবস্থান কর। সর্ব্বত্র তোমার সমদর্শিতা হউক, তুমি যোগযুক্ত হইয়া সর্ব্বভূতে আত্মাকে এবং আত্মায় সর্ব্বভূতকে অবস্থিত অবলোকন কর। যে জন আত্মাকে সর্ব্বভূতে অবস্থিত জানিয়া আত্মার একরূপত্ব অবধারণ করে, তাহার আর পুনরুৎপত্তি ঘটে না। জীব যখন আত্মাতেই সর্ব্বভূতের অধিষ্ঠান দেখে এবং সর্ব্বভূত আত্মাভিন্ন ভাবে অবস্থিত জ্ঞানে আত্মদর্শী হয়, তখন সেই সর্ব্বশব্দ একত্বেই পর্য্যবসিত হইয়া থাকে এবং সেই একত্বেরও আত্মাতেই সমাপ্তি হয়। সেই আত্মা সৎ বা মূর্ত্ত ভূতত্রয় —ক্ষিতি, জল ও তেজঃস্বরূপ অথবা অসৎ বা মরুৎ ও ব্যোমরূপ সূক্ষ্ম ভূতদ্বয়-স্বভাবও নহেন। তবে তাঁহার স্বরূপ কি? তিনি ভূমানন্দ চিদেকস্বভাব ; তথাবিধ আত্মা যাঁহার অনুভবগম্য হয়, ঐ প্রকার অনুভূতি-বলে অচিরাৎ তাঁহার ভূমানন্দময় কৈবল্য করতলগত হইয়া থাকে। তিনি এই ত্রিলোকের জীবনিবহের অন্তরে বিরাজিত প্রকাশাত্মা, একমাত্র অনুভব ব্যতীত উপলব্ধি যাঁহার হয় না, আমিই সেই আত্মা, ইহা নিশ্চিতই। হে ভারত! যিনি ত্রিভুবনগত জল, গব্য দুগ্ধ ও সমুদ্র-সম্ভব লবণাদির অভ্যন্তরে রসাকারে অনুভূত হইয়া থাকেন, তাঁহাকেই আত্মা বলিয়া অবগত হইবে। যাহা নিখিল প্রাণীর অন্তরে সূক্ষ্ম অনুভবরূপে বিরাজমান, এবং যাবতীয় অনুভবগম্য বিষয় হইতে বিযুক্ত বলিয়া যাহা অতি দুর্লক্ষ্য— অতি সূক্ষ্ম, জানিবে—সেই সর্ব্বব্যাপী পদার্থই আত্মা। সমগ্র দুগ্ধের সারাংশ ঘৃত যেমন তদভ্যন্তরে অবস্থিত, তেমনি যাবতীয় পদার্থের অভ্যন্তরে সেই সেই পদার্থের অধিষ্ঠাতৃরূপে এবং সর্ব্ব দেহীর অন্তরে প্রকাশস্বরূপে আমার সেই পরম রূপ বিরাজিত। যেমন নিখিল রত্নের অন্তরে বাহিরে তেজ আছে, তেমনি সর্ব্বদেহের অন্তরে বাহিরে আত্মা অবস্থান করিতেছেন। যেমন সহস্র সহস্র ঘটের অন্তরে বাহিরে আকাশের বিদ্যমানতা, তেমনি এই ত্রিভুবনগত যাবতীয় দেহের অন্তরে ও বাহিরে আত্মা বা আমার অস্তিতা। যেমন শত শত মুক্তা একই সূত্রে গ্রথিত, তেমনি আত্মা এক—তাঁহাতেই লক্ষ লক্ষ জীবদেহ নিবদ্ধ ; কিন্তু তিনি

অলক্ষিতভাবে বিরাজিত। ব্রহ্মাদি তৃণ স্তম্ব পর্য্যন্ত যে কিছু পদার্থ পরিদৃষ্ট হয়, তাহাদের অন্তর্গত সাধারণ সত্তাই আত্মা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। এই আত্মাই জন্ম-বর্জ্জিত ব্রহ্ম। আত্মার যে সর্ব্বাধিষ্ঠানরূপে নির্ব্বিকার অবস্থান, তাহার নাম ব্রহ্মতা; এই ব্রহ্মতাই বাস্তবী। মুক্তামালায় সূত্রের ন্যায় সর্ব্বান্তর্যামিরূপে তাঁহার যে অবস্থিতি, তাহারই নাম জীবতা। এই জীবতার বাস্তবত্ব নাই। হন্তা এবং হন্তব্য প্রভৃতি ভাব ঐ জীবের অবাস্তব ভাবের অন্তর্নিবিষ্ট। বাস্তবিক আত্মা কখনই হন্তব্য বা হত নহেন এবং হনন জন্য পাপও তাঁহাতে স্পর্শে না। হে অর্জ্জুন! জগতের এই যে রূপ, ইহা যখন আত্মারই, তখন বাস্তব পক্ষে কে কাহাকে হনন করিবে? কেই বা জাগতিক সুখ-দুঃখ বা শুভাশুভ দ্বারা লিপ্ত হইবে? আদর্শে প্রতিবিম্বের ন্যায় ব্রহ্ম সাক্ষিরূপে বিরাজিত। যে ব্যক্তি তাঁহাতে জগদ্ভাবের অবস্থিতি, এবং জগতের বিনাশে আত্মার অবিনশ্বরতা দর্শন করে, সেই ব্যক্তিই যথার্থদর্শী। হে পাণ্ডব! সর্ব্বদেহে যে আমি আমি করিয়া চিদংশের ভান বিদ্যমান, তাহা আমি; আর এতৎসমস্ত আমি নহি অর্থাৎ জড়দেহে ইন্দ্রিয়াদি করিয়া যে বিষয়াংশ, সে সমুদায় আমি নহি। আমি এই প্রকার উক্তি করিতেছি; ইত্যাদি করিয়া যে কিছু ভেদ-বিভাগ-খ্যাতি, ইহাও আমি; আমা ভিন্ন আর কিছুই নহে। ফলে দর্পণ যেমন প্রতিবিম্বে লিপ্ত নহে, এবং প্রতিবিম্বও দ্বিতীয় বস্তু নহে, তেমনি আমি নির্লিপ্ত অভেদ আত্মরূপে সর্ব্বদেহে আবির্ভূত রহিয়াছি। তুমি আমাকে এইরূপেই অবগত হও। সাগরে যেমন জলস্পন্দের সঞ্চার হয়, তেমনি অভিমান-লাঞ্ছিত চিত্তগত আমি তুমি ইত্যাদি ভাব বা অভাব বিকারাদি সমুদায়ই আত্মাতে প্রবর্ত্তিত ও বিলীন হইয়া থাকে। শৈলের প্রস্তরত্ব, বৃক্ষের কাষ্ঠত্ব ও তরঙ্গের জলত্ব যেমন যথার্থ, পদার্থসমূহের আত্মাও তেমনি স্বতঃসিদ্ধ। দর্পণের প্রতিবিম্ব স্পন্দমান হইলেও নির্ম্মল দর্পণ যেমন নিস্পন্দ বা নিশ্চল অবস্থায় অবস্থিত, তেমনি যে ব্যক্তি সর্ব্বভূতে আত্মাকে এবং আত্মাতে সর্ব্ব-ভূতকে অবলোকন করে, তাহার দৃষ্টিতে এই সদা-সচেষ্ট ক্রিয়া-

নিরত ভূতবৃন্দের মধ্যে আত্মাও দর্পণবৎ অক্রিয়, অকর্ত্তৃ, ও উদাসীন-ভাবে প্রতিভাত হইয়া থাকেন।

হে অর্জ্জুন! জানিবে—যেমন নানাকারের তরঙ্গে জল এবং হার-কেয়ূরাদি অলঙ্কারে সুবর্ণ, তেমনি আত্মা সর্ব্বভূতে বিরাজিত। সাগর তরঙ্গে নানা ঊর্ম্মিমালা যেমন কখন উৎপন্ন এবং কখন বিলীন হয়, কিন্তু সাগরসলিল যেমন সেই একই ভাবে অবস্থান করে; অপিচ স্বর্ণে কত কি অলঙ্কার জন্মে, পরন্তু স্বর্ণ যেমন সেই একই ভাবে বিরাজ করে, জানিবে—পরমাত্মাতে ভূতবৃন্দও তেমনি অবস্থিত আছে।

হে ভারত! কি পদার্থপরম্পরা, কি ভূতবৃন্দ, আর কি সেই বৃহৎ ব্রহ্ম, দর্পণ ও দর্পণগত প্রতিবিম্বের ন্যায় সকলই এক; ইহাতে ভেদ কিছুই নাই। সুতরাং সকলই যখন সেই একমাত্র নির্ব্বিকার ব্রহ্ম-পদেই পর্য্যবসিত, তখন আর ত্রিজগতে জন্মাদি ভাব-বিকারাশ্রয় অন্য কি বিদ্যমান আছে? আর বন্ধুবধাদি বিকার তোমারই বা কোথায় রহিয়াছে? এ জগতের অন্যত্বই বা কি আছে? সুতরাং কেন আর বৃথা মোহের বশে অবস্থান কর? সাধুগণ এই আত্মতত্ত্ব শ্রবণ করিয়া মনে মনে সুখে দুঃখে সমভাব অনুভব করেন; অন্তরে তাঁহাদের কেবল সেই অভয় ব্রহ্মপদই অনুভূত হয়। তাঁহারা নির্ভয় হইয়া জীবন্মুক্ত-দেহে বিচরণ করিতে থাকেন। এই জীবন্মুক্ত ভাব উপস্থিত হইলেই সাধুগণের মন হইতে ক্রমশঃ মোহাদি অবসাদ অপগত হইয়া থাকে। সুখ দুঃখ, শীত উষ্ণ, ইত্যাদি দ্বন্দ্বভাব তাঁহাদের আর থাকে না। তাঁহারা অধ্যাত্ম-জ্ঞানে পরিপূর্ণ ও অধ্যাত্মধ্যানে তন্ময় হইয়া রহেন। তাঁহাদের সর্ব্বকামনার অবসান হয়। সেই অবস্থায় অবশেষে তাঁহারা বিদেহ-কৈবল্য লাভ করিয়া থাকেন।

ত্রিপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫৩ ॥

চতুঃপঞ্চাশ সর্গ

ভগবান্ কহিলেন,—হে মহাভুজ! আমার উপদেশবাণী তুমি অতি শ্রদ্ধার সহিত শুনিতেছ; শুনিয়া প্রীত হইতেছ; অতএব তোমার হিতৈষণায় পুনরপি আমি পরম বাক্য বলিতেছি, শ্রবণ কর। হে কৌন্তেয়! বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ হইলে শীত উষ্ণাদির অনুভাবন ও তৎপ্রযুক্ত সুখ দুঃখাদির উদ্ভাবন হইয়া থাকে; কিন্তু তাহারা আগম ও অপায়-সমন্বিত; সুতরাং অনিত্য। কাজেই অকিঞ্চিৎকর বোধে ঐ সকল সহ্য বা উপেক্ষা কর এবং উহাতে বৈরাগ্য আনয়ন কর। উহা উপেক্ষা করা একাত্মদর্শী ব্যক্তির পক্ষে অসম্ভব ব্যাপার নহে; যখন উপেক্ষা বা বৈরাগ্য সিদ্ধ হয়, তখন ঐ সকল স্বীয় আত্মভূত হইয়া পড়ে। যখন বিষয়েন্দ্রিয়ের সম্পর্ক বা সুখ দুঃখও সেই অদ্বয় পূর্ণানন্দ স্বভাব হইতে অপৃথক্ বলিয়া ধারণা জন্মে, তখন সুখই বা কৈ? আর দুঃখই বা কোথায়? আমি প্রিয়তম ধন-জনাদি দ্বারা পূর্ণ রহিয়াছি, এই প্রকার ভ্রান্তির ঘোরে যে আভিমানিক সুখ-উৎপন্ন হয়, আর আমি প্রিয়তম ধনাদি হইতে বিযুক্ত হইয়াছি, এই রূপ ভ্রমে যে দুঃখ জন্মিয়া থাকে; এই উভয় দিক্ হইতে সমুদিত সুখ-দুঃখই কিছুই নহে। কেন না, যিনি নিরবয়ব; যাঁহার ক্ষয়োদয় নাই, তথাভূত আত্মার আবার ভাব অভাব কোথায়? বস্তুতঃ যাহার অবয়ব আছে, বা উৎপত্তি বিনাশ আছে, তাহারই ভাব অভাব ঘটিয়া থাকে; কিন্তু আত্মার সে সব কিছুই নাই; সুতরাং ঐরূপ ধনজনাদির ভাব ও অভাব-ঘটিত সুখ-দুঃখ ভ্রম ভিন্ন বৈ আর কি? যখন পূর্ব্বোক্ত তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম হয়, তখন উহা অসম্ভব বলিয়াই প্রতীয়মান হয় এবং তাহা হইলে স্বতই উহার নিবৃত্তি ঘটিয়া থাকে। ইন্দ্রিয় এবং বিষয়ের সত্যতা বোধ যাঁহার উপশান্ত হইয়াছে, তাঁহাকেই ধীর ও মোক্ষভাগী বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। এই সমস্তই যখন আনন্দময় আত্মা, সুখ দুঃখাদি ভেদ সকল যখন ভ্রমাত্মক;

তখন কেনই বা না তাহার উপশম ঘটিবে? আত্মা নিরতিশয় আনন্দৈক-রস ও সর্ব্বময়; সুতরাং সমুদায় সুখ-দুঃখাদি ভেদও আত্মময় বৈ আর কি? সুখ দুঃখাদি করিয়া যে কিছু বস্তু আছে, তাহাদের সত্তাও নাই, ভেদও নাই, উহারা মিথ্যা; যাহা মিথ্যা, তাহা সহ্য করা যাইবে না কেন? সত্তা বলিতে এক আত্ম-সত্তাই আছে। সুখ-দুঃখাদির পৃথক্ সত্তা নাই। উহার বিদ্যমানতাও অসম্ভব। আর যাহা সৎ বা সত্য পদার্থ, তাহার কখন অভাবও নাই। তিনি নিত্য বিদ্যমান আত্মা; কাজেই বলিতে হইবে, যখন সুখ-দুঃখাদি পদার্থের উৎপত্তি ও বিনাশ আছে, তখন উহাদের প্রকৃতই অস্তিত্ব নাই। সেই এক সৎস্বরূপ পরমাত্মাই আছেন। তিনিই সর্ব্বব্যাপী হইয়া বিরাজ করিতেছেন। বিকারী বস্তুতে যে কিছু সত্তার উপলব্ধি হয়, তাহা সেই আত্মাধিষ্ঠানের সত্যতাবলেই হইয়া থাকে। ফল কথা, সুখ-দুঃখাদির বাস্তবত্ব কিছুই নাই। এই জগৎটাই সৎ পদার্থ, আর যিনি ঐ নিরতিশয় আনন্দমূর্ত্তি আত্মা, তিনি অসৎ, এ প্রকার ধারণা পরিত্যাগ কর। তথা, জগৎ ও আত্মা, এই উভয়ের মধ্যে যে সম্বন্ধ-ঘটক অজ্ঞান, তাহাকে তুমি তুচ্ছ বোধে মন হইতে দূর করিয়া দাও। এক সেই চিদাত্মাই সৎ, ইহা ভাবিয়া সেই চরম পদার্থে মন প্রাণ নিরোধ করিয়া তাঁহাতেই দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হও।

হে অর্জ্জুন! আত্মা দেহের অন্তরে আছেন বটে; কিন্তু দেহের সুখে তাঁহার সুখ নাই, বা দুঃখেও তাঁহার দুঃখ নাই। ঐ সুখ-দুঃখাদিরে দৃশ্য আর আত্মাকে তাহাদের উদাসীন দ্রষ্টা বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়; সুতরাং সুখ-দুঃখাদি দৃশ্য বস্তু কখনই দর্শকধর্ম্মী হইতে পারে না; ইহাই নিশ্চিত। আত্মা চৈতন্যময়; তিনি এই অনিত্য মিথ্যা দেহের অভ্যন্তরে অবস্থিত রহিলেও নিত্য সত্যরূপেই প্রতিভাত। জড়স্বভাব চিত্তাদিই সুখ-দুঃখের ভাজন; ঐ চিত্তাদিরূপ জড়দেহ নষ্ট হইলেও আত্মার তাহাতে ক্ষতি কিছুই নাই। চিত্তাদি-ঘটিত জীবভাবই ভোক্তা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট, অর্থাৎ ইহাকেই সুখ-দুঃখের ভোগকর্ত্তা বলা হয়। কি জীবভাব, কি জীবকৃত সুখ-দুঃখাদি ভোগ, সকলই মায়া-বিহিত বা ভ্রমোৎপাদিত। সুখাদি বা দুঃখাদি বস্তু সকল আত্মা হইতে পৃথক্

বলিয়া প্রতীতিগোচর হয়; কিন্তু উহারা কিছুই নহে। কেন না, এ সংসারে এমন কিছুই নাই বা এরূপ কিছুই অনুভূতি-বিষয় হয় না, যাহাকে আত্মা হইতে পৃথক্ বলা যায়। অতএব আত্মা ব্যতীত অন্য কি বস্তু কাহার অনুভবের বিষয় হইবে?

হে ভারত! যাহাকে দুঃখ বলিয়া ব্যাখ্যা করা হয়, তাহা অজ্ঞান-জনিত ভ্রান্তি বৈ আর কিছুই নহে। যদি সম্যক্ বোধের উদয় হয়, তাহা হইলে ঐ দুঃখাদি ক্ষয় পাইয়া যায়। অজ্ঞানবশেই রজ্জুতে সর্পভয় হইয়া থাকে। অজ্ঞানের অবসানে যখন জ্ঞানের উদয় হয়, তখন আর রজ্জুগত সর্পভয় থাকে না। এইরূপে দেখা যায়, দেহাদি বা দুঃখাদি অজ্ঞান হইতেই উৎপন্ন হয়; সুতরাং অজ্ঞান চলিয়া গেলে জ্ঞানের যখন উদয় হয়, তখনই আর উহারা তিষ্ঠিতে পারে না। এই যে বিশ্ববিস্তার বিলোকিত হয়, ইহা সাক্ষাৎ অজ পূর্ণ ব্রহ্ম; সুতরাং ইহার উৎপত্তি বা বিনাশের সম্ভাবনা কোন কালেই নাই। তুমি ইহাকে সত্য পরম বস্তু বলিয়াই জ্ঞান কর। এই জ্ঞানের নাম পরম বোধ বা সত্য বোধ বলিয়া নিরূপিত। উৎপত্তি ও বিনাশ-ধর্ম্ম আছে, এরূপ যত কিছু বস্তু দেখিতে পাও, একটুকু ভাবিয়া দেখ—ঐ সকল ব্রহ্মাম্বুধিরই তরঙ্গবিস্তার। অধুনা তোমার বিশুদ্ধ বোধের উদয় হইয়াছে; তাই তুমি এখন ব্রহ্মাবর্ত্তে বিরাজমান হইতেছ। এখন তুমিই সেই নিরাময় ব্রহ্ম। সমুদায় কাল বল, ক্রিয়া বল, দেশ বল, আর তুমি আমি বা অন্যান্য সৈন্য-সামন্ত যাহাই বল, সকলই সেই ব্রহ্মাব্ধির স্পন্দনবৎ বিরাজমান। ব্রহ্মে ভাব বা অভাব বিকল্পনা কিছুই নাই। মান, মদ, শোক, ভয়, ক্রিয়া, সুখ, দুঃখ ও দ্বৈতভাব এ সমুদায় অসত্য; ইহাদিগকে তুমি পরিত্যাগ কর—করিয়া কেবল সেই এক সত্যাত্মক ব্রহ্মস্বরূপ হও। তোমার হস্তে যে সেনাসমবায় নিহত হইবে, সে সকলও তুমিই; এইরূপ অনুভবযোগে শুদ্ধ ব্রহ্মময় হইয়া থাক।

হে ভারত! সুখ দুঃখ, লাভ অলাভ, কিম্বা জয় পরাজয়, কিছুরই দিকে তুমি লক্ষ্য করিও না। সেই সেই বিষয়ের জ্ঞান পরিহার কর—করিয়া সুবিশুদ্ধ ব্রহ্মময়তা লাভ কর। তুমিই সাক্ষাৎ ব্রহ্ম, মনে মনে

উহাই স্থির করিয়া লও। লাভালাভে তোমার সম জ্ঞান হউক। তুমি তত্ত্বনিশ্চয় দ্বারা নিজেকে বিশ্বরূপে ভাবনা করিয়া গুহামধ্যগত বায়ুর ন্যায় অস্পন্দভাবে প্রকৃত কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও। হে কৌন্তেয়! তুমি যে কার্য্য করিবে, যাহা ভোজন করিবে, যে কিছু হোম করিবে, দান করিবে, আবিবে—সকলই সেই পরমাত্মা। এই আত্মতত্ত্ব অবগত হইয়া তুমি ধৈর্য্য অবলম্বন কর। যে ব্যক্তি অন্তরে যন্ময় হয়, সে তাহাই পায়, তাহাই হইয়া থাকে। অতএব তুমি সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম বস্তুকে পাইবার নিমিত্ত সত্য ব্রহ্মময় হইয়া থাক। ব্রহ্মজ্ঞ বুধগণ উপস্থিত কর্ম্মকেও ব্রহ্ম বলিয়া ভাবনা করেন; অযাচিত স্বতঃ আগত কর্ম্মকেও ব্রহ্ম বলিয়া স্থির করিয়া লয়েন। তাঁহারা কেবল যথাপ্রাপ্ত কর্ম্মই করিতে থাকেন; সে কার্য্য জন্য ফলের প্রত্যাশা তাঁহারা করেন না। যে জন কর্ম্মে বা ইন্দ্রিয়-সম্পাদিত ব্যাপার মাত্রেই ব্রহ্ম দর্শন করেন আর অকর্ম্মে বা ব্রহ্মে কর্ম্ম দেখেন, মনুষ্যসমাজে সেই ব্যক্তিই বুদ্ধিমান্ বলিয়া খ্যাতি লাভ করেন। তাঁহাকেই কৃতকৃত্য বলিয়া প্রশংসা করা যায়; বাস্তবিক তাঁহারই সর্ব্বকার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। বিশদার্থ এই যে, আমি যে কিছু কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেছি, তৎসমুদায়ের প্রকৃত সত্তা কিছুই নাই। কেন নাই? তাহার কারণ এই যে, সৎস্বরূপ আত্মার কর্তৃত্ব সম্ভাবনা নাই; সুতরাং সে সকল মিথ্যা। তৎ-ভাবতে কেবল ব্রহ্মই বিদ্যমান। এই ভাব যাঁহার অন্তরে সমুদিত হয়, তিনিই কর্ম্মে অকর্ম্মদর্শী; আর আমি যাহা করিতেছি, বলিয়া অনুভূত হয়, তাহাতে আমি ত স্বতন্ত্র কেহই নহি। আমি ব্রহ্মস্বরূপই; সুতরাং আমার যাহা কার্য্য, তাহা ব্রহ্মেরই অনুষ্ঠেয়। এইরূপ স্থির ব্রহ্মভাবনায় যিনি কার্য্য করিয়া যান, এবং যিনি স্থির করিয়া লয়েন যে, ব্রহ্ম সর্ব্বত্রই আছেন; তাঁহার প্রতিষ্ঠার বিচ্যুতি কুত্রাপি নাই। কেন না, সমস্তই ব্রহ্ম; অতএব ব্রহ্মপ্রতিপাদনরূপ কর্ম্ম আমার অবশ্যই কর্তব্য। এইরূপ নিশ্চয়কারী ব্যক্তিই অকর্ম্মে কর্ম্মদর্শী, অর্থাৎ নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মে কর্ম্মের অধ্যারোপকারী। এই প্রকারে উভয়থাদর্শী ব্যক্তিই জনসমাজে বুদ্ধিমান্।

হে অর্জ্জুন! তুমি ফল প্রাপ্ত হইবে বলিয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করিও না;

অপিচ, কর্ম্ম উপস্থিত হইলে তাহার অনুষ্ঠান হইতে বিরাম লাভেও তোমার যেন আসক্তি হয় না। ফল কথা এই যে, তুমি ফলের আকাঙ্ক্ষা না করিয়াই কর্ম্ম করিয়া যাও। সিদ্ধি কিম্বা অসিদ্ধিতে সমতারূপ যোগ তোমার অবলম্বিত হউক। তুমি অসঙ্গভাবে কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে থাক, তোমার কর্ম্মাসক্তি চলিয়া যাউক; তুমি তত্ত্বদৃষ্টির সহায়তায় অপ্রমাদী হইয়া নিষ্কর্ম্মভাব অবলম্বন ব্যতীত যেমন ভাবে থাকিতে হয়, তেমনই ভাব অবলম্বন কর। যিনি কর্ম্মফলের আসক্তি বর্জ্জন করিয়া নিত্য-তৃপ্ত ও নিরাশ্রয়ভাবে অবস্থান করেন, তিনি যদি কর্ম্মনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন, তথাচ তাঁহার কর্ম্ম করা হয় না। জ্ঞানিগণের মতে কর্ম্মাসক্তিই কর্তৃত্ব; এই কর্ত্তৃত্বে কর্ত্তার অপেক্ষা নাই। ফলে স্বয়ং কার্য্য না করিলেও কার্য্যে যদি আসক্তি থাকে, তবে কর্তৃত্ব আপনা হইতেই ঘটে। মনে যদি অনবধানতারূপ মূর্খতা থাকে, তাহা হইলেই আসক্তির সঞ্চার হয়; সুতরাং ঐ মূর্খতাকে পরিহার করাই কর্ত্তব্য। যিনি পরম তত্ত্বজ্ঞানের আশ্রয় লয়েন, তাঁহার আসক্তি আদৌ থাকে না। সেই সদাত্মা নিরাসক্ত হইয়া সর্ব্ববিধ কর্ম্ম করিতে থাকিলেও কোন কার্য্যেই কখন তাঁহার কর্তৃত্ব প্রকাশ পায় না। সুতরাং তাঁহার কার্য্য করা, না করারই সমান। এইরূপ অকর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইলেই বিদেহকৈবল্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। যাহার হৃদয়ে কর্তৃত্বাভিমান নাই, তাঁহার ভোগবাসনার বিকাশ হয় না। এইরূপ বাসনার অনুদয়েই সকলই এক অভেদ বলিয়া প্রতীতিগোচর হয়। এই যে একত্ব-প্রতিষ্ঠা, ইহা হইতেই অনন্তত্ব এবং এই অনন্তত্ব হইতেই বিশাল ব্রহ্মত্ব লাভ ঘটিয়া থাকে। তোমায় বলি, তুমিও ঐ প্রকারে ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া বিরাজ কর।

হে পার্থ! যিনি নানাত্ব বুদ্ধি পরিহার করিয়াছেন—দ্বৈত ভাবরূপ মালিন্য হইতে মুক্ত হইয়া পরমাত্মময়তা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি প্রমাদবশে বৈধ বা নিষিদ্ধ কর্ম্ম করিলেও সে কর্ম্মের কর্তৃত্বভাজন হন না। এই দৃষ্টান্তে বলা যায়, তুমিও ঐরূপ হইয়া অকর্ত্তা হও। যাঁহার সকল কার্য্য কাম-সঙ্কল্প হইতে বর্জ্জিত হয়, তদীয় কর্ম্মনিচয় জ্ঞানাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইয়া যায়। সুধীগণ তাদৃশ ব্যক্তিকেই প্রকৃত পণ্ডিত নামে অভিহিত করিয়া

থাকেন। যিনি সর্ব্বত্র সমদর্শী, সর্ব্বদা সৌম্য, শান্ত ও স্বস্থ এবং সর্ব্ব-বিষয়েই নিস্পৃহ হইয়া অবস্থিত, তিনি সাতিশয় কর্ম্মব্যগ্র হইলেও সর্ব্বথা অব্যগ্ররূপেই প্রতিভাত।

হে অর্জ্জুন! তুমি নির্দ্বন্দ্ব হও এবং সতত ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া সত্ত্ব-গুণের আশ্রয় লও। যাহা অলব্ধ, তাহা লাভ করিবার প্রয়াস করিও না এবং যাহা লব্ধ বস্তু, তাহারও রক্ষণাবেক্ষণে নিবিষ্ট হইও না। এইরূপে চিত্তকে প্রমাদ হইতে মুক্ত কর এবং নিয়ত পরমাত্ম-পদকেই অবলম্বন করিয়া অবস্থিত হও। যখন যে কার্য্য উপস্থিত হইবে, তুমি অনাসক্তভাবে তাহার অনুবর্ত্তী হইয়া এ ভূতলের ভূষণরূপে বিরাজ করিতে থাক। যে জন কর-চরণাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়গুলিকে সংযত রাখে, কিন্তু মনে মনে ইন্দ্রিয়-ভোগ্য বিষয়গুলিকে স্মরণ করিতে থাকে, সে তো বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচার শঠ; তাহাকে দাম্ভিক নামেই অভিহিত করা হয়। পরন্তু যিনি মন ও ইন্দ্রিয়গুলিকে বিষয় হইতে সংযত করিয়া রাখেন, ফলাভিসন্ধান পরিহার করেন,—করিয়া কর্ম্মেন্দ্রিয়-যোগে কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে থাকেন, হে অর্জ্জুন! তিনিই বটে শ্রেষ্ঠ পুরুষ। দেখ, পর্ব্বত হইতে নানাপথে নানা নদনদী নির্গত হয়,—হইয়া অচল গম্ভীর সাগরে প্রবেশপূর্ব্বক তদীয় জল-ভাব লাভ করত তাহাতে বিলয় পাইয়া যায়। এইরূপে যে আত্মজ্ঞান-নিষ্ঠ ব্রহ্মময় সন্ন্যাসীর নিকট এই নিখিল মায়া-বিলসিত বিষয়-কামনা-জাল অকিঞ্চিৎকর জ্ঞানে উপেক্ষিত হয়,—হইয়া পরিশেষে আত্মায় বিলয় প্রাপ্ত ও আত্মমাত্রতা উপগত হইয়া থাকে, বাস্তবিক শান্তিরূপ মুক্তি তিনিই লাভ করেন। পরন্তু যে ব্যক্তি বিষয় কামনার অধীন, তাহার মুক্তি প্রাপ্তি কখনই সম্ভবপর নহে।

চতুঃপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫৪ ॥

পঞ্চপঞ্চাশ সর্গ।

ভগবান্ কহিলেন,—হে ভারত! দেহ ধারণের জন্য অন্ন-পানাদি ভোগ করিতে হয়। এই ভোগ হইতে তোমাকে সম্পূর্ণ বিরত হইতে বলিতেছি না। পরন্তু তোমায় এই মাত্র বলিতেছি যে, তুমি ভোগার্থ কোন চিন্তা করিও না। কিম্বা ভোগের সৌষ্ঠব-সম্পাদনেও আসক্তি রাখিও না। কেবল মাত্র যথালব্ধ বিষয়েরই অনুসরণ করিয়া যাও এবং লাভ কিম্বা অলাভে সমভাব অবলম্বন করিয়া অবস্থান করিতে থাক। অনাত্ম দেহাদি—জন্মাদি ষড়বিকার-স্বভাব; ইহাতে তুমি আত্মবুদ্ধি স্থাপন করিও না; পরন্তু যিনি জন্মাদি-বিরহিত, সত্যস্বরূপ, আত্মা, তাঁহাতেই তুমি আত্মবুদ্ধি স্থাপন কর।

হে মহাভুজ! দেহের নাশে কিছুই নষ্ট হয় না, আত্মার নাশই প্রকৃত নাশ। কিন্তু আত্মার নাশ নাই; তিনি ধ্রুব—নিত্য। আত্মা অচিন্ত্যাত্মক; সর্ব্ব পরিগ্রহ হইতে তিনি বর্জ্জিত। কাজেই শীর্ণতাদি দেহধর্ম্ম তাঁহার নাই। তিনি কর্ম্ম করিয়াও কিছুই করেন না। পণ্ডিতগণের মতে কর্ম্মাসক্তিই কর্তৃত্ব; আসক্তি থাকিলে কার্য্য না করিলেও কর্তৃত্ব আসিয়া উপস্থিত হয়। মনের অজ্ঞানতাই ঐরূপ আসক্তির প্রতি কারণ হইয়া থাকে। অতএব অজ্ঞান পরিহার করাই কর্ত্তব্য। পরম তত্ত্বজ্ঞান অবলম্বনপূর্ব্বক আসক্তি-বিরহিত মহাত্মপদে উপনীত হইতে পারিলে সর্ব্বকর্ম্ম করিয়াও কর্তৃত্বের ভাজন হইতে হয় না। আত্মা অজর, অমর; তাঁহার আদি অন্ত কিছুই নাই। জ্ঞানিগণ আত্মার স্বরূপ ঐরূপই নির্ণয় করেন। আত্মার আদি আছে বা অন্ত আছে, এরূপ ধারণা অসঙ্গত। এই অসঙ্গত ধারণা হইতেই লোকে দুঃখভোগ করিতে থাকে। তোমায় বলিয়া দিতেছি, তোমার যেন ঐ প্রকার অসঙ্গত বা দুষ্ট ধারণা হয় না। যাঁহারা আত্ম-জ্ঞানশালী উত্তম ব্যক্তি, তাঁহারা কদাচ আত্মার বিনাশ দর্শন করেন না। কেন না, আত্মাকেই তাঁহারা আত্মা বলিয়া বিদিত আছেন; পরন্তু

যাহা অনাত্ম দেহাদি বস্তু, তাহাতে তাঁহাদের আত্মবোধ বা আত্মদৃষ্টি কদাচ নাই।

অর্জ্জুন কহিলেন,—হে ত্রিজগৎপতে মানদ! আপনি যাহা বলিলেন, তাহা যদি সেইরূপই হয় অর্থাৎ আত্মা অবিনশ্বর, ইহাই যদি স্থির সিদ্ধান্ত—তবে মূঢ়গণ দেহাদিরে আত্মা বলিয়া জানে, জানুক; তাহাতে তাহাদের দেহাদি নাশে পরম প্রিয় আত্মবস্তুর তো নাশ কিছুই ঘটে না?

ভগবান্ কহিলেন,—হে পার্থ! আমি যাহা বলিয়াছি, তাহা ঐরূপই বটে। এ জগতের কোথাও বাস্তবিক কিছুই নষ্ট হয় না। একমাত্র অবিনশ্বর আত্মাই যখন বিরাজিত আছেন, তখন কে কোথায় কাহাকে নষ্ট করিবে? এই আত্মার ইষ্ট বস্তু পুত্রাদি বিনষ্ট হইল, এই আমি ইষ্ট বস্তু লাভ করিলাম, এরূপ কল্পনা বন্ধ্যা নারীর পুত্রের স্থায় মোহ-ভ্রান্তি ব্যতীত আর কিছুই বলিয়া মনে করি না। কেন না, যাহা অসৎ, তাহার সত্তা নাই, আর যাহা সৎ, তাহারও অভাব হইতে পারে না। সৎ ও অসৎ এই উভয় সম্বন্ধে তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতগণ এইরূপ বিধিনির্ণয়ই দেখিয়া থাকেন। কিন্তু যাহারা অজ্ঞান, তাহারা এরূপ নির্ণয়ে সমর্থ নহে। এই সমগ্র জগৎ যৎকর্ত্তৃক পরিব্যাপ্ত, তিনিই সৎ, তিনিই সত্য, তিনিই সত্তাস্বরূপ। তাঁহার কখন অভাব বা বিনাশ নাই। তিনি অব্যয়; তাঁহাকে বিনাশ করিবার শক্তি কাহারও নাই। তিনি আত্মা সর্ব্বদাই একরূপ; তাঁহার বিনাশ নাই। ইন্দ্রিয়, মন ও প্রত্যক্ষাদির তিনি অবিষয়; কাজেই তিনি অপরিচ্ছিন্ন, নিত্য সত্তাস্বরূপ; তাঁহার এ সকল দেহ বিনশ্বর বলিয়াই নির্দ্দিষ্ট। অতএব হে ভারত! তুমি যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হও। অর্থাৎ মরীচিকা প্রভৃতিতে সত্যাকারে প্রতীয়মান জলাদি যেমন প্রমাণ নিরূপণ হইলে আর থাকে না, তেমনি ইন্দ্রজালবৎ মিথ্যা বলিয়া এই দেহ নশ্বর; ফলে প্রকৃষ্ট জ্ঞানের উদয়ে ইহার অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। আত্মসম্বন্ধীয় প্রতিভাসমান দেহ এইরূপেই বিনশ্বর; যাহা বিনশ্বর, তাহাই অসৎ বা মিথ্যা; সুতরাং বন্ধু-বান্ধবাদির মিথ্যাভূত দেহ নাশ পায় তো তোমার তাহাতে অনিষ্টাশঙ্কা নাই; তুমি অকুতোভয়ে যুদ্ধ করিতে থাক। দেখ, একমাত্র আত্মাই আছেন; দ্বিত্ব নাই, কেন না,

অসৎ বস্তুর অস্তিত্ব থাকিবে কিরূপে? সুতরাং সৎ আত্মাই অবিনশ্বর; তিনিই অনন্ত। যদীয় চির সত্তা প্রসিদ্ধ, তাঁহার বিনাশ সম্ভাবনা নাই। দ্বিত্ব একত্ব বা কার্য্য-কারণের পরিহারে যাহা পরিশিষ্ট, তাহাই সৎ ও অসতের মধ্যবর্ত্তী শান্ত পরম পদ ব্রহ্ম।

অর্জ্জুন কহিলেন,—হে প্রভো! যদি এইরূপই হয়, তবে 'আমি মরিলাম' 'লোক সকল নিয়তির অধীন' কিম্বা 'নিয়তির অধীনতায় তাহাদের স্বর্গ-নরকাদি এ সকল কথার তাৎপর্য্য কি?

ভগবান্ কহিলেন,—ভূমি, জল, অনল, অনিল, আকাশ, এই পঞ্চ ভূততন্মাত্র ও মনোবুদ্ধি-ঘটিত যে ব্যষ্টি-সমষ্টি স্থূলদেহ, তাহাতে তাদাত্ম্য ভাবই পরমাত্মার জীবভাব। পরমাত্মা ঈদৃশ জীবভাব উপগত হইয়া জীব-দেহে বিরাজ করেন। রজ্জু দ্বারা সমাকৃষ্ট হইয়া পশু শাবক যেমন একস্থান হইতে স্থানান্তরে নীত হয়, জীবাবস্থায় তিনিও তেমনি বাসনার আকর্ষণে এক দেহ হইতে দেহান্তরে প্রয়াণ করিয়া থাকেন। পিঞ্জরে যেমন পক্ষী থাকে, জীব তেমনি দেহাভ্যন্তরে বিরাজ করে। প্লক্ষ বৃক্ষের পত্ররস যেমন পত্রান্তরে সঞ্চারিত হয়, আর সঙ্গে সঙ্গে সেই পূর্ব্বতন পত্র শুষ্ক হইয়া যায়, জীব তেমনি বাসনার বশেই দেশ-কাল-যোগে এক দেহ জর্জ্জর হইলে অন্য দেহে গমন করিয়া থাকে। পবন যেমন পুষ্প হইতে গন্ধ লইয়া প্রবাহিত হয়, জীব তেমনি তদীয় পূর্ব্বতন দেহ হইতে চক্ষু, কর্ণ, ঘ্রাণ, স্পর্শন ও রসন প্রভৃতি সূক্ষ্ম দেহ গ্রহণপূর্ব্বক দেহান্তরে প্রয়াণ করিয়া থাকে। যুক্তিবলে বুঝিতে গেলে বুঝা যায়, বাসনাকল্পই জীবের স্থূল দেহ; যদি বাসনা বিসর্জ্জিত হয়, তাহা হইলেই ঐ দেহের ক্ষয় হইয়া থাকে। যখন বাসনাক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে লিঙ্গ দেহের ক্ষয় হয়, তখন জীব পরম ব্রহ্মরূপে বিরাজ করিতে থাকে। মায়াবী পুরুষ যেমন মায়াবলে শূন্য পথে ভ্রমণ করে, জীব তেমনি বাসনানুগত লিঙ্গ দেহে পরমাত্মার প্রতিবিম্বে অভিব্যক্ত ও ভ্রমভারে সমাক্রান্ত হইয়া বহুল যোনিতে ভ্রমণ করিয়া থাকে। পবন যেমন পুষ্প হইতে সৌরভ লইয়া প্রবাহিত হয়, জীবও তেমনি বাসনার বশে নিখিল ইন্দ্রিয়স্বভাব গ্রহণপূর্ব্বক বিবিধ যোনিতে বিচরণ করে। বায়ু প্রশান্ত হইলে বৃক্ষ যেরূপ নিশ্চলভাব অবলম্বন করে, জীবও তেমনি যখন দেহ

হইতে নির্গত হইয়া যায়, তখনই ইন্দ্রিয়বর্গ নির্ব্যাপার বা ভোগ-পরাঙ্মুখ হয়। দেহের যে নিস্পন্দ অবস্থা, তাহারই নাম লোকপ্রসিদ্ধ মৃত্যু। দেহ নিশ্চেষ্ট অবস্থায় ক্রমশঃ ছেদ-ভেদাদি বিবিধ দোষে দৃষ্টিবহির্ভূত হইয়া যায়। জীব দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলে তাহা তখন মৃত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। তৎকালে জীব মাত্র প্রাণপবনের মূর্ত্তিরূপে বিরাজিত রহিয়া চিদাকাশ বা ভূতাকাশ যে কোন স্থানেই অবস্থিত হয়, বাসনার অভ্যাসে সেই সেই স্থানেই বিস্তৃত আকার দর্শন করিয়া থাকে। জীব এই দেহকে অসদাকারে অবলোকন করে। তোমায় বলি, তুমিও দেহের নাশে ঐরূপ অসত্তাই অবলোকন কর। অথবা সুষুপ্ত দশায় লোক যেমন দর্শন করিতে পারে না, তুমিও তেমনি এই দেহ, দেহের নাশ বা দেহের অসত্তা কিছুই অবলোকন করিও না। কেন না, যাহার সত্তা যেরূপে পরিদৃষ্ট হয়, তাহার নাশও তেমনই ভাবে প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। নর বা নরের নাশ উভয়ই বাসনাবশে কল্পিত; কোন পদার্থ বিশেষ দ্বারা নির্ম্মিত নহে। এ কথা প্রসিদ্ধ আছে, যে সৃষ্টির আদিতে লোকপিতামহ ব্রহ্মাও গো, অশ্ব ও মনুষ্যাদির অনুরূপ পূর্ব্বকল্পীয় বাসনানুযায়ী কল্পনার প্রভাবে বর্ত্তমান কল্পীয় গো, অশ্ব ও মনুষ্যাদি সৃষ্টি করেন। তিনি যে মৃত্তিকা ও দণ্ডাদি লইয়া কুম্ভকারের ঘটাদি নির্ম্মাণের ন্যায় ভূতসৃষ্টি করিয়া থাকেন, তাহা নহে। সমস্তই তদীয় বাসনানুযায়ী কল্পনা মাত্র। ভাবিতে পার, উৎপত্তির প্রথম ক্ষণে সমস্ত জগৎই বাসনাময়; সুতরাং তৎকালে উহা মিথ্যাভূত হইতে হয়, হউক; কিন্তু মধ্যক্ষণে স্থিতিকালে অর্থক্রিয়ায় সমর্থ বলিয়া তাহাতে তো সার্ব্বজনীন সত্যতানুভব নিশ্চিতই; সুতরাং স্থিতিকালে উহাকে বাস্তব বলা কখনই অসঙ্গত নহে। এ আশঙ্কা নিরাসের জন্য বলা যায়, উৎপত্তির প্রথম ক্ষণে সহসা যাহা সত্য বা মিথ্যা, যে ভাবেই দেখা যায়, বিনাশ পর্য্যন্ত তাহা সেই ভাবেই থাকে; তাহা আর স্বভাবান্তর ভজনা করে না। ইহার কারণ এই যে, যাহার সত্তায় সমগ্র দ্রব্যসত্তার প্রতীতি হয়, যাহা না থাকিলে দ্রব্যসত্তার সম্পূর্ণই অভাব ঘটে, সেই অধিষ্ঠানরূপিণী সম্বিৎ-শক্তিই যথাযথ সমুৎপন্নরূপ স্থিতির কারণ। ফল কথা, উৎপত্তিক্ষণে যে পদার্থ যে প্রকার বা যাদৃশ ভাবাপন্ন হয়, সম্বিৎ-শক্তিবশেই সেই পদার্থ

বিনাশাবধি সেরূপে সেই ভাবেই অবস্থান করে। সুতরাং দেহাদি সমস্তই বাসনাময় বলিয়াই প্রতিপন্ন। পূর্ব্বোপার্জ্জিত অশুভ বাসনারে পশ্চাদুপার্জ্জিত শুভ বাসনা দ্বারাই অভিভূত করা যায়। ইহার দৃষ্টান্ত স্থলে প্রায়শ্চিত্তের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। যেমন প্রায়শ্চিত্তাদি প্রযত্ন দ্বারা পূর্ব্বকৃত পাপ নষ্ট হয়, অথবা যেমন অদ্যকৃত দাহাদি যত্ন দ্বারা পূর্ব্বকৃত গৃহাদির বিনাশ সম্ভবপর হইতে পারে, তেমনি শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনাদি শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট উপায় সাহায্যে প্রাগ্ভবীয় বাসনাময় দেহের বিনাশ হইতে পারে। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, এই বিষয়চতুষ্টয়ের বাসনার মধ্যে যে বিষয়টীর বাসনা নিতান্ত প্রগাঢ় হইবে, সেই বিষয়ের বাসনাই জয়শালিনী হইবে। অতএব যাহাতে শাস্ত্রীয় শুভ বাসনা সমুদ্রিক্ত হয়, শুভাকাঙ্ক্ষী পুরুষের পক্ষে তাহাই করা কর্ত্তব্য। উপরি উক্ত বিবরণে বুঝিতে হইবে, মোক্ষে যাহাদের অল্পাভিনিবেশ, আর ভোগে দৃঢ়াসক্তি, তাহাদের নিকট মোক্ষাভিনিবেশেরই পরাভব ঘটিয়া থাকে; অতএব এমন কথা বলিতে পারা যায় না যে, অনেকে জ্ঞান লাভার্থ চেষ্টা করিলেও তাহাদিগের নিকট কাম-ক্রোধাদি বাসনারই জয় হইয়া থাকে। অতএব ইহা স্থির কথা যে, বিন্ধ্যগিরি বিদীর্ণ বা প্রবল প্রভঞ্জন প্রবহমাণ হইতে থাকিলেও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি কদাচ শাস্ত্রসম্মত পুরুষকার পরিহার করেন না। জীব আদিকাল হইতেই অজ্ঞান ও মূঢ় বুদ্ধির আশ্রয় লয়; তাহাতেই তাহার শাস্ত্রীয় যত্নে অল্পাভিনিবেশ থাকে বলিয়া বাসনার বৈচিত্র্যে চিরাভ্যস্ত স্বর্গ, নরক ও উদ্ভবাদি সুখ-দুঃখময় অনর্থ সকল সতত সর্ব্বত্র প্রদর্শন করিতে থাকে।

অর্জ্জুন কহিলেন,—ভগবন্! জীব জগৎস্থিতির নিমিত্তীভূত; উঁহার ঐ প্রকার স্বর্গ, নরক ও উদ্ভবাদি ভ্রান্তির বীজ বা কারণ কি? তাহা আমার নিকট প্রকাশ করিয়া বলুন।

ভগবান্ কহিলেন,—হে পার্থ! যে বাসনা ঈশ্বরেরও কর্ম্ম-কামনাদি ও সুখ-দুঃখাদির হেতুভূত, সেই স্বপ্নপ্রায় অসাধারণী বাসনাই চিরাভ্যাস নিবন্ধন প্রৌঢ়তা উপগত হইয়া ঐ প্রকার সংসারভ্রম উৎপাদন করিয়া থাকে। ইহাতে কারণান্তর কিছুই নাই। অতএব যাঁহারা আত্মার

মঙ্গল কামনা করেন, তাঁহাদের পক্ষে পরম পুরুষার্থ প্রাপ্তির জন্য বাসনারই সমূলে উচ্ছেদ করা কর্ত্তব্য।

অর্জ্জুন কহিলেন,—হে দেবদেব! বাসনার মূল কি? কোথা হইতে তাহার উৎপত্তি এবং কিরূপেই বা তাহার ক্ষয় হইয়া থাকে? তাহা আমার নিকট বিবৃত করুন।

ভগবান্ কহিলেন,—পার্থ! অজ্ঞান হইতে মোহ জন্মে। সেই মোহ হইতেই অনাত্মায় আত্মবুদ্ধি হইয়া থাকে। এই বুদ্ধিই বাসনার মূল বলিয়া কথিত। যখন বোধের উদয় হয়, তখনই ঐ বাসনা সমূলে বিলয় পাইয়া যায়। হে কুন্তীনন্দন! আত্মস্বরূপ কি, তাহা তুমি জানিতে পারিয়াছ; যাহা সত্য, তাহা তোমার অধিগত হইয়াছে। অতএব এই সেই আমি, এ সকল আমার, আমার কর্ত্তৃত্বে ইহা নির্ব্বাহিত হইতেছে এবম্বিধ মমতারূপ বাসনারে তুমি বিসর্জ্জন দাও।

অর্জ্জুন কহিলেন,—হে দেবাধিপ! যখন বাসনার ক্ষয় হইবে, তখন জীবের নিজের বিনাশও তো সুসিদ্ধ হইবে। কেন না, যাহার সত্তায় যদীয় প্রকাশ হইয়া থাকে, তাহার নাশ হইলে তাহারও অসত্তা অনিবার্য্য হয়। যদি জীবই বিনষ্ট হইল, তবে আর জনন-মরণের ভাগী হইবে কে? ফল কথা, তখন পরমানন্দ আবির্ভাবরূপ পরম পুরুষার্থ ও আত্যন্তিক অনর্থনাশের ভাজন কাহাকে বলা যাইবে?

ভগবান্ কহিলেন,—হে মতিমন্! জীব প্রতিবিম্ব মাত্র সংসারধর্ম্মী; ইনি প্রতিবিম্ব হইতে অন্য ভূতমাত্রাধীন জন্মাদি ও দেশ-কালাদি ভেদে ভিন্ন, এইরূপ যদি প্রতীতি হইত, তাহা হইলেই ভবৎ-প্রদর্শিত দোষ সম্ভব হইতে পারিত। কিন্তু তাহা তো হইবার নহে; ইনি বাস্তবিক বিশুদ্ধ ব্রহ্মই বটেন। ব্রহ্মেরই স্বকল্পিত সঙ্কল্পবশে তাঁহার যে অবিদ্যাবৃত বা স্বীয় তত্ত্বজ্ঞানে অক্ষম আত্মরূপ, তাহারই নাম বাসনাময় জীব। হে ভারত! ঐ আত্মরূপ যখন আপনার তত্ত্ববোধ প্রাপ্ত হইয়া বাসনা হইতে মুক্তিলাভে সঙ্কল্প-বিরহিত অব্যয় অবস্থায় অবস্থিত হয়, তখনই তাহাকে মুক্ত বলা যায়। এইরূপ মুক্তিই মোক্ষ আখ্যায় অভিহিত।

হে মহাভুজ! ব্রহ্মতত্ত্বের যথাবস্থিতি সম্যক্ অবলোকন করিতে

পারিলেই বাসনাপাশ হইতে মুক্ত হওয়া যায় এবং ঐরূপ অবস্থাপন্ন ব্যক্তিই মুক্ত নামে অভিহিত হইয়া থাকে। তোমায় বলি, যদি চেষ্টা কর, তাহা হইলে তুমিও এই বর্ত্তমান জন্মে ঐ মুক্তি অনুভব করিতে পার। অতএব মুক্তি লাভ করিবার পক্ষে সংশয় কিছুই নাই। দেখ, যাহার বাসনাক্ষয় হয় নাই, সে যদি সর্ব্বজ্ঞ বা সর্ব্বধর্ম্ম-পরায়ণ হইয়াও অবস্থিত হয়, তথাচ তাহাকে পিঞ্জরগত পক্ষীর ন্যায়ই আবদ্ধ বলা যায়। পরমাত্মা স্বয়ং স্বীয় মায়ায় আবৃত হওয়ায় বেদান্তপ্রমাণ অধিগত হইতে পারেন না; ঐ অবস্থায় গগনে ঐন্দ্রজালিক শিখি-পুচ্ছের ন্যায় তদীয় অন্তরে নানাভ্রমদায়িনী সূক্ষ্ম বাসনা বিরাজ করিতে থাকে। আবার তিনিই যখন অধিকারী দেহে বেদান্ত-প্রতিপাদ্য বস্তু লাভ করেন, তখন তাঁহার তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হয়। তিনি সমূল বাসনাবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন। এই পরমাত্মবিষয়ে সমূল বাসনাই বন্ধন, আর সেই বন্ধনের ক্ষয়ই মোক্ষ।

ষট্পঞ্চাশ সর্গ।

ভগবান্ কহিলেন,—হে অর্জ্জুন! এইরূপে তুমি বাসনারে বিসর্জ্জন দিয়া জীবন্মুক্তভাবে অবস্থান কর এবং অন্তরে স্নিগ্ধ শান্তি লাভ করিয়া বন্ধুবধ-জনিত অহেতুক দুঃখ পরিহার কর। হে অনঘ! তুমি আকাশের ন্যায় বিশদাশয় হইয়া বিরাজ কর; তোমার জরামরণ-শঙ্কা বিদূরিত হউক। তুমি ইষ্ট বা অনিষ্ট সঙ্কল্প পরিত্যাগ কর এবং বৈরাগ্যের দিকে অগ্রসর হও। যাহা শিষ্ট জনের ব্যবহার-পরম্পরাগত যথাপ্রাপ্ত আবশ্যকীয় দৈনন্দিন কার্য্য এবং যোগাদি অন্য যে সকল প্রয়োজনীয় কর্ম্ম, সে সমুদায় তুমি অনুষ্ঠান করিতে থাক। এইরূপ কার্য্যকারিতায় তোমার তত্ত্বজ্ঞানের কোনই অপচয় হইবে না। শিষ্ট জনের ব্যবহারাগত ধর্ম্মসঙ্গত যে কর্ম্মানুষ্ঠান, তাহারই নাম জীবন্মুক্ত স্বভাব এবং তাহাই জীবন্মুক্ততা বলিয়া

নির্দ্দিষ্ট ; পরন্তু মূঢ় জনের ব্যবহার বিপরীত। মূঢ় লোকেরা এই কর্ম্ম করি, অথবা ইহা পরিত্যাগ করি, এই প্রকার অভিসন্ধি লইয়া কার্য্য করে, অথবা কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হয়। কিন্তু জ্ঞানীর এ বিষয়ে সমান ভাব। জীবন্মুক্ত শান্তচিত্ত ব্যক্তি পরম্পরাগত যথোপস্থিত কর্ম্ম সমাধা করিয়া সুষুপ্ত অবস্থায় উপনীত ব্যক্তির ন্যায় স্বীয় আত্মায় সঙ্কল্প-বিরহিত ভাবে প্রকাশমান হইয়া থাকেন, অর্থাৎ সুষুপ্ত ব্যক্তি যেমন নির্ব্বিশেষ চৈতন্য মাত্রে অবস্থান করেন, যাঁহারা জীবন্মুক্ত পুরুষ,—তাঁহারা কার্য্য না করিলেও সেই ভাবে বিরাজ করিতে থাকেন। কূর্ম্মের অঙ্গসমূহ বাহিরে প্রকাশ পায় ; কিন্তু অল্পমাত্র বিক্ষেপেই সঙ্কুচিত হইয়া অন্তরে প্রবেশ করিয়া থাকে। এইরূপ দৃষ্টান্ত অনুসারে যদীয় ইন্দ্রিয়বর্গ জ্ঞানবলে তুচ্ছ বিষয়-ব্যাপার হইতে বিনা চেষ্টায় আপনা হইতেই সঙ্কুচিত হইয়া হৃদয়গত পরমাত্মায় মনের সমভিব্যাহারে নিশ্চল ও একরস হইয়া অবস্থান করে, তিনিই যথার্থ জীবন্মুক্ত। এই ত্রিজগৎ একটা চিত্ররচনার অনুরূপ ; চিত্তরূপ চিত্রকরই বিশ্বাধিষ্ঠান আত্মাতে এই সমগ্র ত্রিজগৎ-চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। এই চিত্র সকল লোক-প্রথিত বৈচিত্র্য দ্বারা ভিত্তিবিহীন, ত্রৈকালিকরূপে প্রকাশ পাইতেছে। ঐ চিত্তরূপ চিত্রকর প্রথমতঃ অজ্ঞানাকাশে অজ্ঞানরূপে অস্ফুট হইলেও আভাসময় অন্তঃকরণ বৃত্তিরূপ তুলিকায় উন্মীলিত করিয়া এক আশ্চর্য্য চিত্র আঁকিয়া রাখিয়াছেন। সাধারণতঃ চিত্রকরেরা অগ্রে চিত্রফলক বা চিত্রভিত্তি স্থির করিয়া পরে তাহাতে চিত্র অঙ্কন করে ; কিন্তু এই চিত্ত-রূপ চিত্রকর সেরূপ নিয়মের অধীন নহে। এই চিত্রকর সমষ্টি মনের সঙ্কল্প সত্য বলিয়া সঙ্কল্প-ক্ষণে প্রথমতঃ চিত্র অঙ্কন করে, অনন্তর তৎকর্ত্তৃক চিত্রফলক নির্ম্মিত হয়। বলা বাহুল্য, চিত্ত-চিত্রকরের আকাশই চিত্রভিত্তি বা চিত্রফলক। এইরূপে এই বিশ্ববিরচনা একান্তই অপূর্ব্ব বলিয়া বোধ হয় ; কেন না, তৃণময়ী ভিত্তির ন্যায় উহা একান্ত অসার হইলেও ভ্রান্তদৃষ্টিতে সার সত্য বলিয়াই প্রতীয়মান হইতেছে। এ বিষয়ে আরও আশ্চর্য্য এই যে, প্রসিদ্ধ চিত্র-ব্যাপারে ভিত্তি সকল চিত্ররাজি হইতে ভিন্ন হইয়া থাকে ; কিন্তু এই যে সকল চিত্ত-চিত্রকরের ভিত্তিস্থানীয় ব্যোম প্রভৃতি দেখা যায়, ইহাদের

তিত্তিস্থানীয় ব্যোম প্রভৃতি দেখা যায়, ইহাদের আধার আধেয় স্পষ্টতঃ উপলব্ধ হইলেও চিত্তত্বের অবিশেষত্ব নিবন্ধন কিঞ্চিন্মাত্রও ভেদ ভিন্নতা নাই।

হে কমললোচন! জানিবে—ঐ চিত্ররচনা শূন্য অপেক্ষাও শূন্যতমা। যেমন স্বপ্নাবস্থায় অন্তরে এই ত্রিজগতের ক্ষয়োদয় ভ্রান্ত বলিয়া উপলব্ধ হইয়া থাকে, তেমনি মন এবং এই অন্তর্বহিঃস্থিত জগৎ সকলই শূন্যময়; ইহা অসৎ বা সম্পূর্ণই মিথ্যা। তবে যে যৎকিঞ্চিৎ সত্যতা বোধ হয়, তাহা চিরন্তন মনোরাজ্য বলিয়াই প্রথিত; উহার বাস্তব সত্যতা কিছুই নাই। ভ্রান্তি-বিকল্পিত পদার্থপুঞ্জে সত্যকল্পনার ত্রৈকালিক অভাব বিদ্যমান। সুতরাং তত্ত্বজ্ঞান সমুদিত হইবার পূর্ব্বে তাহা কি প্রকার এবং কিরূপ সত্য পদার্থরূপেই বা ভাসমান হইবে? দেখ, শরৎকালের মেঘমণ্ডল সৌর-কিরণে পরিদৃষ্ট হয়, আবার সেই কিরণেই তাহা শুষ্ক জলাকারে বিলয় পাইয়া যায়। এইরূপ দৃষ্টান্ত দ্বারা বলা যাইতে পারে যে, বসন্ত-বর্ষাদি কাল, বাল্য-কৌমারাদি অবস্থা এবং ষড়্‌ভাব-বিকার-ক্রম—এই সমুদায়ে দর্শনরূপ আলোকযোগে পদার্থপুঞ্জের যে সত্যতা বোধ জন্মিয়া থাকে, সেই প্রসিদ্ধ সত্যতা তত্ত্বজ্ঞানরূপ আলোকযোগে পুনরায় বিলয় প্রাপ্ত হয়। ফলে তত্ত্বজ্ঞানের উদয়ে পদার্থপুঞ্জের সত্যতাভ্রম তিরোহিত হইয়া যায়। অতএব সচরাচর এই যে কিছু দেখা যায়, এ সকলই মনোরূপ চিত্রকরের চিত্র-ন্যস্ত চিত্রপুত্তলিকা বৈ আর কিছুই নয়। এই যে ত্রিভুবনাদি চিত্ররচনা, ইহার কোন একটা আকার নাই; কেন না, যাহার ভিত্তিই নাই, তাহার আবার আকার আসিবে কোথা হইতে?

হে ভারত! এই ত্রিভুবনাদি যত কিছু চিত্র আছে, ইহাদের কোনই অস্তিত্ব নাই; ঐ যে সৈন্যশ্রেণী, উহাদেরও অস্তিত্ব নাই আর এই যে তুমি, তোমারও নাই। সুতরাং বল দেখি, কে কাহার নিগ্রহ করিবে? তাই বলিতেছি, হে অর্জ্জুন! এই সকল জানিয়া শুনিয়া তুমি ঘাত্য-ঘাতক ভ্রম পরিত্যাগ কর এবং ঐ ভ্রম জন্য শোকমালিন্য তোমার চলিয়া যাউক। তুমি নির্ম্মল ও নিরঞ্জন হইয়া ব্রহ্মাকাশে বিরাজ করিতে থাক। কেন না, চিদাকাশের বধাদি প্রবৃত্তি হইতেই পারে না, আর যাহা প্রাপ্তি-

ভাসিকী প্রবৃত্তি, তাহাও ব্রহ্মাকাশরূপিণী বৈ আর কিছুই নহে। অতএব সকলই নির্ম্মল ব্রহ্মাকাশ। যেমন মনোগত মনোরাজ্য-চিত্র প্রপঞ্চাকার হইলেও অকিঞ্চিৎকর বলিয়া আকাশ বা শূন্যময়, তেমনি জানিবে—এই যে কিছু জগৎ সমস্তই শূন্যাপেক্ষা শূন্যতম। চিত্তরূপ ভিত্তিভূমিতেই চিৎ-চিত্রকর এই সকল চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। এইরূপ উক্তি করিলেও সকলই শূন্যময় হইয়া পড়ে; তাহাতে পার্থক্য কিছুরই হয় না। সমস্তই আকাশে পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। হে পার্থ! জগতের উদয় এবং ক্ষয় যেমন চিত্তে প্রকাশ পায়, তেমনি ঐহিক ক্ষয়োদয় এবং জনন-মরণ সকলই ক্ষণিক প্রকাশমান হয়। ভাবিয়া দেখ, অধুনা ক্ষণকালের ভাবনায় মোহের আবরণে তোমার মনোরাজ্যে কত কি ঘাত্য-ঘাতক ভাবাদির কল্পনা হইতেছিল, এক্ষণে আমার উপদেশবলে সে সকল কল্পনা তোমার নিরস্ত হইল। মন যেমন এই মিথ্যা বিস্তৃত সংসার-কল্পনায় সু-নিপুণ, ক্ষণকালকে কল্পকালে পরিণত করিতেও তেমনি উহা সক্ষম। এই জন্যই এই অসত্য ভূত-ভুবনাদি অনাদি অনন্ত কল্প পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ক্ষণকালকে কল্পকাল বা সত্যকে অসত্য করিয়া তোলা মনের কার্য্য; কিন্তু তাহার এ কার্য্য তেমন বিস্ময়াবহ না হইলেও এই অসত্য জগৎরূপ মনোরাজ্যের যে সত্যতাবোধ, ইহাই বড় বিস্ময়ের বিষয়। এ হেন সত্যতা ভ্রম মনের প্রভাবেই প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। মনই ইহাকে সত্য-রূপে প্রতীত করাইয়া দেয়। আত্মা নিত্য মুক্ত; তাঁহাতে এই জগৎ-ভ্রান্তি ক্রমশঃ সমুৎপন্ন হয় বলিয়া জ্ঞানীর দৃষ্টিতে ইহা নিতান্তই তুচ্ছ। পরন্তু যাহারা অজ্ঞানী, তাহাদের নিকটই ইহা বজ্রসার-সদৃশ দুরুচ্ছেদ্য। তাহারাই ইহাকে অবিনশ্বর বলিয়া কল্পনা করিয়া থাকে। এ জগৎ সেই অপরিজ্ঞাত আত্মতত্ত্বের অন্যথা প্রতিভাস মাত্র; সুতরাং আত্মার আধ্যারোপে বা অপবাদে কোন ক্রমেই এ জগতের বজ্রসারতা হইতে পারে না। আর সত্যই যদি এই জগতের স্থিরত্ব থাকিত, তাহা হইলে উহার স্থায়িত্ব ভ্রম নিরাস করিবার জন্য প্রযত্নের অপেক্ষা থাকিত। কিন্তু এ জগৎ কোন কালেই নাই। ইহা তো চিৎতত্ত্বস্থিত চিত্ত-চিত্রকরের একটা চিত্র মাত্র। কিন্তু এই চিত্র-ব্যাপারে ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয় যে,

ইহার ভিত্তি নাই বা নীল পীত প্রভৃতি অঙ্কনসাধন কোন বর্ণও নাই। তথাচ ইহা একটা প্রকাণ্ড উজ্জ্বল চিত্ররূপে সম্মুখে প্রতিভাত হইতেছে। ঐই জগৎ-চিত্র দেখিতে কেমন সুন্দর, কেমন ইন্দ্রিয়-প্রলোভন! কেমন মনোহর! এ চিত্র যাহার দৃষ্টিপথে পতিত হয়, সে-ই ইহাতে আসক্ত হইয়া পড়ে। ঐ দেখ, গাঢ় তিমিররূপ বর্ণযোগে ইহা কেমন অঙ্কিত রহিয়াছে! আরও দেখ, তেজোরূপ কিরণচ্ছটায় এ চিত্র কেমন বিভাসিত রহিয়াছে! কত শত কল্প যুগাদি ইহার অবয়ব হইয়াছে। কত রাগে ইহা রঞ্জিত আছে; নানাবিধ দৃষ্টিবিলাস দ্বারা অম্বিত রহিয়াছে; বিবিধ অনুভব ইহার লোচনাকারে বিরাজ করিতেছে এবং নানা গ্রহই এ চিত্রের উগ্র প্রভাবৎ প্রতিভাত হইতেছে। পূর্ব্বদিকে রবির উদয়ে এবং পশ্চিমে তাঁহার অস্তগমনে, ঐ দেখ, এই বিশ্বচিত্র কেমন যেন নানাবর্ণে চিত্রিত রহিয়াছে। ঐ দেখ, ঐ নীল নভোমণ্ডল, এই চিত্রন্যস্ত নীল সরোবরবৎ বিভাত হইতেছে। ঐ রবি-শশি-তারকা কমলকুলের ন্যায় কেমন, বিকসিত আছে। শরৎ-বসন্তাদি কালভেদে ঐ উপরিস্থিত মেঘমালা নানা রচনায় অঙ্কিত হয়। ঐ মেঘমালা এই চিত্রের পত্র ও মঞ্জরীরূপে বিরাজ করিতেছে। এ চিত্রের ত্রিলোকরূপ ভিন্ন ভিন্ন কক্ষমধ্যে ঐ সুরাসুর নররূপ কত শত পুত্তলিকা কেমন সুন্দর চিত্রিত আছে। এই বিশ্বচিত্রের ভিত্তিভূমি আকাশ। ঐ দেখ, ঐ ব্যোমভিত্তি কেমন সুন্দর রবি-শশীর আলোকরূপ সুধালেপে তারুণ্যবৎ ঢলঢলাকারে বিরাজ করিতেছে। কামনাকুল চপল চিত্ত এ বিশ্বচিত্রের চিত্রকর। সে আপনার অধিষ্ঠানভূত ব্রহ্মাকাশে কেমন সুন্দরভাবে এই ত্রিলোকীরূপিণী নটীর চিত্র আঁকিয়া রাখিয়াছে। ঐ দেখ, ঐ নটী কেমন মনোহারিণী ও হাবভাব-বিলাসময়ী। নব নব উন্মেষবতী বুদ্ধি ঐ নটীর নাট্যশালা। সাক্ষীভূত স্বয়ং চৈতন্যই ইহার প্রদীপরূপে প্রকাশমান। বুদ্ধির বৃত্তি-সমূহ ঐ নটীর আভরণরাজি; সে ঐ সকল আভরণ দ্বারা এই নিখিল লোক প্রকাশিত করিয়া বিরাজ করিতেছে। ঐ উন্নত হিমাচল ইহার অঙ্গলতিকা, কাদম্বিনী ইহার কেশকলাপ, এবং রবি-শশি উহার নেত্রযুগল। ঐ নটী তথাবিধ নেত্রযুগ্ম পাতিত করিয়া এই নিখিল লোক অবলোকন করিতেছে।

ঐ নটী প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি শাস্ত্ররূপ বস্ত্রযুগল পরিধান করিয়াছে। অর্থাৎ স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতাল এই লোকত্রয় নর্ত্তকীর ন্যায় প্রতিভাত; সপ্ত পাতাল নর্ত্তকীর উরু জানু প্রভৃতি সপ্ত অঙ্গ। বিশদ ব্যাখ্যা এই যে, অতল, বিতল, সুতল, তলাতল ও রসাতল প্রভৃতি সপ্ত পাতাল যথাক্রমে উহার পদতল, পদপৃষ্ঠ, গুল্‌ফ, জানু ও জঙ্ঘা প্রভৃতি সপ্ত অঙ্গ। এইরূপে উপর্য্যুপরি অবস্থিত জন, তপ ও সত্যাদি সপ্ত লোককেও উহার নাভি, বক্ষ ও কণ্ঠাদি সপ্ত অঙ্গ বলিয়া উল্লিখিত করা হয়। উন্নত ভূমিভাগ ঐ নটীর নিতম্ব দেশ, হরি-হর-বিরিঞ্চি ও ইন্দ্র এই দেব-চতুষ্টয় উহার চারি হস্ত। বিবেক এবং বৈরাগ্য উহার স্তনদ্বয়; সত্ত্ব গুণ উহার বাহু কঞ্চুক এবং অনন্তাদি নাগবৃন্দ-বেষ্টিত বসুধাতল উহার পদ্মপ্রতিম পাদপীঠ। মধ্যলোক ঐ নটীর উদরদেশ, এবং সুমেরু প্রভৃতি নানা বর্ণময়ী গিরিমালা উহার ঐ উদরের পত্ররচনা। সুমেরুগিরির প্রদক্ষিণীকরণ লক্ষণ—রাত্রি ও অন্ধকারের যে চপলতা প্রকাশ, ঐ ত্রিজগৎ-নটীর রবি-শশিরূপ অক্ষিদ্বয়ের চেষ্টায় সে চপলতা অপনীত হইতেছে। বজ্র উহার দন্তপঙক্তির স্থান অধিকার করিয়াছে। এই চতুর্দ্দশবিধ ভুবনের অভ্যন্তরে যে চতুর্দ্দশ প্রকার পরস্পর বিসদৃশ প্রাণিপুঞ্জ বাস করিতেছে, সেই সকল প্রাণীই ঐ নটীর সমুদ্গত রোমরাজি। ঐ গগনে যত তারকা আছে, সে সকল উহার করাল পুলক। ভূতগণের প্রলয়বাদই উহার আপাদলম্বিনী কদম্ব-পুষ্পমালা। বৈরাগ্য ও শুভ-বাসনারূপ সৌরভে ঐ পুষ্পমালা পরিব্যাপ্ত। চিত্তরূপ চিত্রকর চিত্ররচনার উপযোগী বিচিত্র বাসনা ও কাম-কর্ম্মাদি উপকরণ প্রাপ্ত হইয়াছে; তাই অচিরাৎ সে বিশিষ্ট চিত্র-রচনায় স্বীয় ক্ষমতা প্রকাশ করিতে পারিয়াছে এবং সেই ক্ষমতাবলেই ঐ ত্রিলোকীরূপিণী উত্তমা নটীর চিত্রাঙ্কন করিয়া রাখিয়াছে। ঐ নটীর চিত্ররচনা ব্যষ্টি-সমষ্টি জীবে অন্বিতা, বিবিধ বিলাসে মণ্ডিতা এবং শূন্যতায় পরিপূর্ণা।

ষট্‌পঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৫৬।

সপ্তপঞ্চাশ সর্গ।

ভগবান্ কহিলেন,—হে অর্জ্জুন! ঐ যে বিশ্বচিত্র-বিরচনের কথা কহিলাম, উহাতে এইটুকুই আশ্চর্য্যের বিষয় জানিবে যে, ঐ চিত্র প্রথমতঃ ভিত্তিবিহীন-ভাবে সমুদিত হয়, পরে উহার ভিত্তির উদয় হইয়া থাকে। ফল কথা এই যে, মন জগদাকার কল্পনা করিবা মাত্র এই জগৎচিত্র প্রাদুর্ভূত হয়; অনন্তর তদন্তর্গত ভূতভুবনাত্মক বিরাট ভিত্তি তদীয় আধাররূপে কল্পিত হইয়া সমুদিত হয়। অথবা ব্যষ্টি-বিস্তৃতিই সমষ্টি, সমষ্টিই বিরাট, বিরাটই আধার; এই আধারকল্পনা ব্যষ্টিসমূহেরই কল্পনাধীন। অগ্রে ব্যষ্টিকল্পনা হওয়া চাই, নতুবা সমষ্টিকল্পনা হওয়া সম্ভবে না। অতএব সর্ব্বাগ্রে নিরাধার আধেয় চিত্র-বিরচন; তৎপশ্চাৎ ভূতভুবনাত্মক বিরাট আধার-ভিত্তির প্রকল্পন। যখন অভিত্তিক বিশ্ব-চিত্র প্রকটিত হয়, তখনই বিশাল ভিত্তি লক্ষিত হইয়া থাকে। দেখ, ঐন্দ্র-জালিকতার প্রভাবে তুম্ব ফলও জলমগ্ন হয় এবং গুরুভার শিলাও জলোপরি ভাসিতে থাকে। এই ব্যাপার যেমন একটা বিচিত্র, জানিবে—মায়া যাহা করে, তাহাও তেমনি বিচিত্র। এই বিশ্ব-চিত্রের আশ্চর্য্য কথা লইয়া, আঁর অধিক আলোচনায় প্রয়োজন নাই; এ কথা এক্ষণে ছাড়িয়া দেই। পরন্তু দেখ, এই চিত্তের চিত্র ত্রিভুবন—শূন্যময়; ইহার অন্তরে তুমি চিদা-কাশরূপে বিরাজ করিতেছ। এমন এক জন তুমি—তোমাতেও যে অলীক অহম্ভাবরূপ শূন্যতা আসিয়া সমুদিত হইতেছে, ইহা ঐ পূর্ব্বোল্লিখিত বিশ্ব-চিত্র অপেক্ষা আরও অধিক আশ্চর্য্যের বিষয় নহে কি? দেখ, শূন্যই সকল শূন্যময় করিয়া তুলিয়াছে, শূন্যেই শূন্যের লয় হইতেছে, শূন্যেই শূন্যের অনুভূতি হইয়া থাকে, শূন্যেই শূন্যের ভোগব্যাপার চলিতেছে এবং শূন্যেই শূন্য বিস্তীর্ণ আছে। এইরূপে জগতে তুমি চিদাকাশতাই অবলোকন কর। এই প্রকার অবলোকনেও তোমার দৃষ্টি যদি অহম্ভাবে অবসন্ন হইয়া পড়ে, তবে তাহা প্রকৃতই আশ্চর্য্যের বিষয়। বাসনা অনন্ত বিস্তৃত; সে

রজ্জুর ন্যায় এই বিশ্বসংসার বেষ্টন করিয়া অবস্থান করিতেছে। হে পার্থ! ঐ বাসনা-রজ্জুর এমনই বেষ্টন যে, উহাতে চিদাকাশ পর্য্যন্ত বেষ্টিত হইয়া থাকে। জানিবে—আদর্শগত প্রতিবিম্বের ন্যায় এ জগৎ ব্রহ্মেই প্রতিষ্ঠিত। অতএব এ জগতের যখন ব্রহ্ম ব্যতীত আধারান্তর নাই, তখন ইহার ছেদ-ভেদ হওয়া একান্তই অসম্ভব। যখন সমস্তই ব্রহ্ম, তখন তদধিষ্ঠিত ছেদ-ভেদাদির বিষয়ীভূত এই জগৎ সেই ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন বৈ কদাচ ভিন্ন নহে। সেই চিদাকাশই সৎস্বরূপ এবং তিনিই যখন সর্ব্বময়, তখন কে বল, কি জন্য কাহাকে কোথায় পাইয়া ছেদ-ভেদাদি দ্বারা নিগৃহীত করিবে? বিশদ কথা এই যে, যদি ব্রহ্মাতিরিক্ত পদার্থ দেখা যাইত, তাহা হইলেই ছেদ-ভেদাদি ব্যবহার চলিতে পারিত। তাহা যখন নাই, তখন আর ঐ ব্যবহার-বাদ কেমন করিয়া হইবে? বল দেখি, যখন সকলই ব্রহ্ম, এইরূপ জ্ঞান উপস্থিত হইবে, তখন কে কাহাকে কোথায় পাইয়া কখন কিরূপে ছেদন করিবে? এইরূপে বুঝিয়া লইলে, তোমার বাসনারাশিরও ব্রহ্মাতিরেকে অভাবই প্রতিপন্ন হইল। বুঝা গেল, সকলই ব্রহ্ম; তাঁহা ব্যতীত বাসনা বলিয়া আর কোন একটা পৃথক্ পদার্থ নাই। অতএব বাসনা অলীক বস্তু; যে ব্যক্তি সেই অলীক বস্তুকেও বর্জ্জন করিতে পারে নাই, সে যদি সর্ব্বধর্ম্ম-নিরত বা সর্ব্বজ্ঞানে উন্নতও হয়, তথাচ জানিয়া রাখিবে—সে ব্যক্তি পিঞ্জর-প্রবিষ্ট সিংহ অথবা শুক পক্ষীর ন্যায় সম্পূর্ণই আবদ্ধ। যাহার চিত্তক্ষেত্রের অভ্যন্তরে অল্পমাত্রও বাসনার বীজ নিহিত আছে, তাহার ভাগ্যে তাহা হইতে পুনর্ব্বার এক সুবিশাল সংসার-কাননের সৃষ্টি হওয়াও অসম্ভব নহে। সুতরাং চিত্তমধ্যে বাসনারে অল্পমাত্রও অবকাশ দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। কেন না, জানিয়া রাখিবে—ঐ অণু পরিমাণ বাসনাবীজ হইতেও সহস্র সহস্র অনর্থ উৎপন্ন হইতে পারে। পুনঃপুন অভ্যাসবশে বাসনার বীজ বাড়িয়া যায়; অতএব সত্ত্ব-সংবোধরূপ অনল প্রজ্বলিত করিয়া তন্মধ্যে ঐ বাসনাবীজকে দগ্ধ করাই সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। যদি একবার এইরূপে বাসনাবীজ দগ্ধ করিয়া ফেলা যায়, তাহা হইলে আর উহা অঙ্কুরিত হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না। যাহার চিত্তগত বাসনাবীজ দগ্ধ হইয়া গিয়াছে, চিত্ত তাহার স্বচ্ছভাবে পূর্ণ

হইয়াছে। জলে যেমন পদ্মপত্র লিপ্ত হয় না, তেমনি সেই নির্ব্বাসন নির্ম্মল মন সুখদুঃখাদি কোন বিষয়েই মগ্ন হয় না।

হে অর্জ্জুন! তোমায় বলিতেছি, তুমি তোমার অশেষ বাসনা-জাল বিসর্জ্জন দাও। মৎকথিত এই ভগবদ্গীতারূপ পরম পবিত্র উপদেশ শ্রবণ করিয়া মনের মোহ দূর করিয়া ফেলো। বন্ধু-বান্ধবাদির উদ্দেশে বা তাহাদিগের বধাদি চিন্তায় মনের যাবতীয় ক্লেশ পরিহার কর। এইরূপ করিয়া তুমিই একমাত্র শান্ত চিত্ত, ব্রহ্ম-স্বরূপ, নির্ভয় ও নির্ব্বৃতি-প্রাপ্ত হও।

সপ্তপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫৭ ॥

অষ্টপঞ্চাশ সর্গ।

অর্জ্জুন কহিলেন,—হে অচ্যুত! ভবৎপ্রসাদে আমার মোহ নষ্ট হইয়াছে। আমি স্মৃতিলাভে সমর্থ হইয়াছি। অর্থাৎ কণ্ঠগত বিস্মৃত চামীকরবৎ স্বতঃসিদ্ধ আত্মতত্ত্বের স্মৃতির ন্যায় স্মৃতিলাভ করিয়াছি। তাহাতে আমার সর্ব্ব সন্দেহ দূর হইয়া গিয়াছে। আমি সর্ব্ব বিষয়েই নিঃসন্দেহ হইয়াছি; এক্ষণে আপনার উপদিষ্ট যথাপ্রাপ্ত ব্যবহারই আমি করিতে থাকিব।

ভগবান্ কহিলেন,—হে পার্থ! তত্ত্বজ্ঞানের উন্মেষণে যাঁহার চিত্ত হইতে রাগাদি মনোবৃত্তিগুলি নিরস্ত হইয়াছে, তুমি জানিও—তাঁহার সে চিত্ত শান্তি লাভ করিয়াছে এবং বাসনারে বিসর্জ্জন দিয়া স্বত্বস্বরূপে অবস্থিত হইয়াছে। এ কারণ বলা যায়, তত্ত্বজ্ঞানের প্রভাবে তোমার চিত্ত হইতেও যদি চিত্তবৃত্তিগুলি শান্তভাব লাভ করিয়া থাকে, তাহা হইলে জানিবে—তাহাও শান্ত, বাসনা-বিরহিত ও সত্ত্বস্বরূপ হইয়াছে। যাহা ব্যবহারতঃ সর্ব্বত্র সর্ব্বময়—কিন্তু যদি তত্ত্ব বিচার করা যায়, তাহা

হইলেই সর্ব্ব-বিরহিত হয়, সেই প্রত্যেক্‌চেতন পদ উল্লিখিত অবস্থাবস্থাতেই লব্ধ হইয়া থাকে। ঐ পদই সেই অনুভব-পদাতীত সাক্ষাৎ ব্রহ্ম। যে পক্ষী ভূতল হইতে অতি ঊর্দ্ধে উড়িয়া বেড়ায়, তাহাকে যেমন কেহই দেখিতে পায় না, তেমনি এই জগদ্বাসী অজ্ঞ জনেরাও সেই অত্যুচ্চ পদ পরিজ্ঞাত হইতে পারে না। অপিচ চক্ষুর সাহায্যেও তাহা দেখিতে পায় না, কিম্বা অন্যান্য ইন্দ্রিয়যোগেও তাহা অনুভব করিতে সক্ষম হয় না। ঐ প্রত্যক্‌চেতনই মহাভূতাদি ত্রয়োদশ ক্ষেত্রের অবভাসক; উহাতে সঙ্কল্প-লেশ কিছুমাত্র নাই। উহা শুদ্ধ এবং নেত্রপথের অতীত। পরমাণু প্রভৃতি অতি সূক্ষ্ম বস্তু যেমন লোকলোচনের গোচরীভূত হয় না, তেমনি যাহা সর্ব্বাতীত চিৎস্বভাব বলিয়া সুনির্ম্মল এবং অসঙ্গ বলিয়া শুদ্ধ, তথাবিধ ব্রহ্মপদকেও বাসনা কখনই অবলোকন করিতে পারে না। যে ব্রহ্মপদের সাক্ষাৎকার লাভ হইলে এই নিখিল দৃশ্যমান স্থূল ঘট-পটাদি বিশ্ব লয় পাইয়া যায়, তুচ্ছ বাসনা সেই ব্রহ্মপদের প্রভাবে কি করিয়া উঠিতে পারে? ফলে সে পদের প্রান্তে উহা আর তিষ্ঠিতেই পারে না। যেমন আগ্নেয় পর্ব্বতে হিমকণার অস্তিত্ব থাকিতে পারে না, তেমনি ঐ যে শুদ্ধ চিত্তত্ত্বের কথা কহিলাম,—উহা প্রাপ্ত হইলে অবিদ্যা অবস্থান করিতে পারে না, উহার লয় হইয়া থাকে। ধূলিস্তূপের ন্যায় অতি অসার ভোগ-বাসনার বন্ধনই বা কোথায়? আর এই বিশ্বগ্রাসী চিত্তভাবরূপ বিপুল অনিলই বা কোথায়? যতদিন না আপনা হইতে ঐ শুদ্ধ বুদ্ধ আত্মতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হওয়া যায়, ততদিন যাবৎ ঐ অবিদ্যা নানা আকার ও বিকার-যোগে পরিস্ফুরিত হইতে থাকে। যাহার উদর-গহ্বরে এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ড প্রবিষ্ট রহিয়াছে, তথাবিধ গগনতলের ন্যায় ঐ আত্মায় কি দৃশ্য, কি দর্শক, সকলই লয় প্রাপ্ত হইয়া যায়। তখন একমাত্র নির্ম্মলতাই বিরাজ করিতে থাকে। সেই নির্ম্মল পরম বস্তু পূর্ণ-স্বরূপ, সমুদায় জগদাকার হইতে বর্জ্জিত ও বাক্যাতীত; বল দেখি, কাহার সহিত উঁহার উপমা হইতে পারে?

হে অর্জ্জুন! তোমায় বলিতেছি, তুমি অন্তরে পরিপূর্ণ আত্মস্বরূপ দর্শন কর, ইষ্ট কামনাগুলিকে বিসর্জ্জন দাও, নিবৃত্তিনামক মন্ত্রযুক্তির

সহায়তা লইয়া প্রবৃত্তির হেতুভূত বাসনারে সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন কর—করিয়া ভববন্ধন হইতে উন্মুক্ত, ভয়-বিরহিত এবং সমস্ত অনর্থের অতীত হইয়া 'আমিই সেই ভগবান্' এইরূপ জ্ঞানযোগে বিরাজ করিতে থাক।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র! ত্রিলোকপতি শ্রীহরি তখন অর্জ্জুনকে এই সকল কথা কহিয়া কিয়ৎকাল মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক তৎসম্মুখে উপবেশন করিয়া রহিবেন। পাণ্ডুনন্দন অর্জ্জুন ঐ সময় তাঁহার সমস্ত উপদেশ প্রাপ্ত হইবেন; তাঁহার ঐ উপদেশ প্রাপ্তি মরাল কর্ত্তৃক শ্বেত-পদ্মখণ্ড-লাভেরই অনুরূপ হইবে। অর্জ্জুন সেকালে ভগবৎ-প্রদত্ত উপদেশসমূহের মর্ম্মার্থ গ্রহণ করিবেন এবং বলিবেন,—হে ভগবন্! দিবসকরের অভ্যুদয়ে পদ্মিনী যেমন প্রফুল্ল হইয়া উঠে, আপনার উপদেশে আমার মতিও তেমনি বিকসিত হইয়া উঠিয়াছে। আমার মনে যত কিছু শোকভার ছিল, তাহা এখন সমস্তই গলিয়া গিয়াছে; অন্তঃ-করণে পরম তত্ত্ববোধের আবির্ভাব হইয়াছে। কৃষ্ণসারথি কিরীটী এই কথা কহিয়া গাত্রোত্থানপূর্ব্বক মনের সর্ব্ব সন্দেহ বিসর্জ্জন দিয়া স্বীয় গাণ্ডীব ধনু ধারণ করতঃ সমরক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইবেন। তখন অগণিত গজ, বাজী ও সারথি সকল ক্ষত-বিক্ষত ও রুধিরাক্ত-দেহে ইতস্ততঃ প্রধাবিত হইতে থাকিবে। হতাহতগণের শোণিতধারায় বসুন্ধরা প্লাবিত হইয়া ভীষণ মহানদীর ন্যায় প্রতিভাত হইবে। ঐ যে আকাশে বিশ্বচক্ষু বিভাকর বিরাজ করিতেছেন, অর্জ্জুনের কার্ম্মুক-নির্ম্মুক্ত শর-নিকরে ও ভূতলোত্থিত ধূলিপটলে উনি আচ্ছন্ন হইয়া পড়িবেন।

অষ্টপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫৮ ॥

ঊনষষ্টিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র! অর্জ্জুনের ন্যায় তুমিও সকল কলুষ-হারিণী স্থিতি আশ্রয় কর এবং অসঙ্গ সন্ন্যাসযোগ ও ব্রহ্মার্পণ দ্বারা অখণ্ড মহাবাক্যার্থের তাৎপর্য্য—সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মাত্মা হইয়া অবস্থান করিতে থাক। জানিবে—যিনি সর্ব্ব বস্তুর আধার, যাঁহা হইতে নিখিল বস্তুর আবির্ভাব, এবং যিনি সর্ব্বময় হইয়া বিরাজমান, তিনিই সেই নিত্য পরমাত্মা। নিখিল প্রপঞ্চের অতীত বলিয়া তিনি দূরে আছেন, আবার সকল প্রপঞ্চের অন্তর্গত বলিয়া সতত তিনি নিকটেও রহিয়াছেন; সুতরাং বলা যায়, কি দূর, কি নিকট, সর্ব্বত্রই তিনি সমভাবে বিরাজ করিতেছেন। তিনি আকাশবৎ সর্ব্বব্যাপী হইলেও জাতির আকারে সেই সেই বস্তুতেই পর্য্যাপ্ত মাত্র। অতএব এইরূপে জানিতে হইবে সকলই সেই এক আত্মা; তদ্ভিন্ন অন্য কিছুই নাই। সুতরাং এখন ভাবিয়া দেখ, তুমি পরিচ্ছন্নভাবে সেই আত্মাতেই অবস্থান করিতেছ। সেই আত্মার সত্তা-তেই তোমার সত্তা; অতএব দেখা যায়—কি পরিচ্ছিন্ন, কি অপরিচ্ছিন্ন, সর্ব্বভাবে সর্ব্বথা তুমিই সেই আত্মা। সেই আত্মাতেই তোমার অবস্থান। তুমি মনে মনে ইহা বুঝিতে থাক,—বুঝিয়া সংশয় সন্দেহ সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া আত্মনিষ্ঠ বা আত্মময় হও। এইরূপে তুমিই যে সেই অপরিচ্ছিন্ন আত্মা, ইহা অন্তরে ধারণা করিয়া লও। এ জগতে বিবেকিগণ আত্মার দুই প্রকার রূপ অনুভব করিয়া থাকেন; এক—চিত্ত ও চিত্তবৃত্তি প্রতি-ষ্ঠিত অনুভবলভ্য বিষয়ের প্রকাশ ভাব, ইহা চিত্ত-নির্ম্মিত; অপর—চিত্ত, চিত্তবৃত্তি ও তদ্বিষয়-সমূহের আগম ও অপায়াদি সকল অবস্থায় সাক্ষী বা উদাসীনভাবে দ্রষ্টা সম্বিৎস্বরূপ; ইহা অনির্ম্মিত বা নিত্য-সিদ্ধ। এই উভয় রূপই যদি চেত্য দ্বারা সম্বেদ্য এবং জ্ঞাতৃ, জ্ঞান ও জ্ঞেয়, এই ত্রিপুটী হইতে বিনির্ম্মুক্ত হয়, তবে তাহাই সেই পরম পদ ব্রহ্ম। জানিবে—যিনি বেদ্য-মুক্ত, বেদনরূপী অনির্ম্মিত ও চিদাভাস, তিনিই

তৎপদ-বাচ্য এবং সেই তৎপদই তুমি। ঐ সম্বিৎ-স্থিতিই পরা, পরমা ও পরাকাষ্ঠা। তাহাই চরম আনন্দোৎকর্ষ; এবং তাহাই সীমারও সীমা, দৃষ্টিরও দ্রষ্টা, মহিমারও মহিমা, এবং গুরুরও গুরুতরা; অপিচ, আত্মা, বিজ্ঞান, শূন্য, ব্রহ্ম, শ্রেয়ঃ, শিব, শান্ত, বিদ্যা, ও পরা প্রতিষ্ঠা, সমস্তই তিনি। যাহা এই দেহাভ্যন্তরে সর্ব্বানুভবরূপ চিদাত্মা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট, যাহাতে সমস্ত দ্রব্যনিবহ সংস্বরূপে অনুভূত, সেই বস্তুই ব্রহ্ম; সেই ব্রহ্ম বস্তুই এই বিশ্বরূপ তিলের তৈল, জগদ্ভবনের প্রদীপ, জগৎপাদপের রস, জগৎপশুর পালক ও সর্ব্ব জগতের সার। ঐ ব্রহ্ম বস্তুই প্রাণিবৃন্দরূপ মুক্তাস্রজের সূত্র এবং তাহাই এই ভূতবৃন্দরূপ মরীচনিচয়ের তীক্ষ্ণতা। পদার্থে পদার্থত্ব, পরম উত্তম তত্ত্ব, সৎবস্তুর সত্তা ও অসৎ বস্তুর অসত্তা, সকলই সেই চিদাত্মা। তত্ত্ব-বোধরূপ অসাধারণ উপায় দ্বারা যাহা স্বস্বরূপ আত্মা বলিয়াই উপলব্ধ হয়, জানিবে—তাহাই সত্য পরম পদ। দেখ, যদি বিচার আলোচনা না করা হয়, তাহা হইলে এই জগদ্‌গত সমস্ত ভাবই সুন্দর সুদৃশ্য বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। পরমাত্মার যে কিছু বিকল্প-কল্পনা, তাহাও ঐরূপই জানিতে হইবে। বস্তুগত্যা ঐ সকলের কোনই অস্তিত্ব নাই। যদি বিচার করা যায়, তাহা হইলে উহাদের কিছুই থাকিবার নহে; সমুদায়ই কোথায় বিশীর্ণ বা বিগলিত হইয়া যায়। এই সমগ্র জগৎ মিথ্যা ভ্রমাত্মক 'অহং'-আদি-স্বরূপ; এখানে কি লইয়া আস্থাবান্ হইবে? আর যিনি সেই অসঙ্গ, অদ্বয় বস্তু, বুদ্ধিই বা কি করিয়া তাঁহাকে প্রাপ্ত হইবে? আর বুদ্ধি যদি সেই আত্মপদকে লাভও করে, তাহাতেই বা সে কি নির্ণয় করিয়া লইতে পারিবে? বুদ্ধি যে আদি, মধ্য ও অন্তাদি পরিচ্ছেদ কিম্বা সঙ্কল্প-বিকল্পাদি করে, তাহাও তো সেই 'অহং'স্বরূপ ব্রহ্ম। যদি এইরূপ বিচার করা যায়, তাহা হইলে ঐ যে অনাদি অনন্ত অহমাত্মক ব্রহ্মাকাশ, উহার ইয়ত্তাই বা কি করা হইবে? যদীয় অন্তরে বিচারবশে ঈদৃশ নিশ্চয় বদ্ধমূল হইয়াছে, বাহিরে সে লোকসম্মত বা শাস্ত্রসঙ্গত কার্য্যে বিরত রহিলেও তাহার ঐরূপ স্থিতির অপায় কখন ঘটে না। যাহার মন সম হইতেও সম ব্রহ্মে অবস্থিত—সুতরাং উদয় ও অস্ত-বিরহিত

হইয়াছে, জানিবে,—সেই মহাত্মার অন্তরে ঐ স্থিতি সতত অনুদিত ও অনস্তমিতভাবে বিরাজ করে। যদীয় চিত্তে আকাশবৎ শূন্যতা সমুদিত হইয়াছে, তিনি মহাত্মা; তিনিই ব্রহ্মময় হইতে সক্ষম হইয়াছেন এবং সুবুপ্ত বুদ্ধির সহায়তায় ভাবনাবলে তিনিই অদ্বৈত পদে অধিরোহণ করিয়াছেন। অতএব দেখা যায়, সেই মহাত্মা ব্যবহারে যথেচ্ছাচার হইলেও তাহার ভাবনা যে একই, তাহার ব্যতিক্রম কখনই হইবার নহে। যেমন আদর্শগত নর কার্য্যচেষ্টায় ব্যাপৃত রহিলেও কি মান, কি অপমান, কোন কিছুতেই সে ক্ষোভাদির ভাজন হয় না, তেমনি যে পুরুষের ব্যবহারনিষ্ঠা থাকিলেও কিঞ্চিন্মাত্র হৃদয়ক্ষোভ হয় না, অর্থাৎ মান ও অপমানাদিজনিত কিছুমাত্র দুঃখ জন্মে না, জানিবে—সেই পুরুষই মুক্তিলাভের অধিকারী হইয়া থাকে। মনে কর, দর্পণে লৌকিক ক্রিয়া-কলাপ প্রতিবিম্বিত হইলেও দর্পণের যেমন ভাবান্তর কিছুই ঘটে না, সে যেরূপ বৈচিত্র্যময়, সেইরূপই থাকে, তেমনি যিনি চিন্মণি, তাঁহাতেই এ সকল জাগতিক ভাব প্রতিবিম্বিত; প্রতিবিম্ববৎ ঐ চিন্মণির কোনরূপ বিকার বা চেষ্টা নাই। উনি দর্পণবৎ নিয়ত একই অবিকৃতভাবে বিরাজমান। দেখ, যে দর্পণ অতি নির্ম্মল, তাহাতে যদি প্রতিবিম্ব পতিত হয়, তবে দর্পণের নৈর্ম্মল্যগুণে দর্পণের স্বরূপ যেমন একটা প্রতিবিম্বময় বলিয়াই বোধ হয়; পরন্তু দর্পণের প্রকৃত নৈর্ম্মল্যাকৃতি আর তখন অনুভবগোচর হয় না, তেমনি ঐ যে পরম নির্ম্মল চিন্মণির কথা কহিয়া আসিয়াছি, এ জগৎ তাহাতে যেভাবে বা যেরূপ ব্যবহারে রহিয়াছে, তদীয় নৈর্ম্মল্যনিবন্ধন সেইরূপেই ইহা প্রতিবিম্বিত হইয়াছে; তাহার ভেদ-বিপর্য্যয় কিছুমাত্রই ঘটে নাই। সুতরাং চিচ্চমৎকৃতির অনুভব আর হইতে পারিতেছে না; পরন্তু উহাই 'সক্রিয় জগৎ' এইরূপই অবভাস প্রতীয়মান হইয়া আসিতেছে। বস্তুতঃ এ জগতে একত্ব নাই, দ্বিত্ব নাই; যে কিছু বাচ্য, বাচক, শিষ্য, শিষ্যাভিপ্রায়, চেষ্টা বা গুরু ও গুরুবাক্য, ব্যাখ্যা-কল্পনা কিম্বা তোমার প্রতি আমার উপদেশ-বাণী, এতৎসমস্তই চিন্ময়; চিৎই চিৎস্বরূপে বিবর্ত্তিত হইয়া থাকেন। ঐ চিৎতত্ত্বের যে বিবর্ত্ত, তাহাই সংসারাখ্যায় অভিহিত। ঐ চিৎস্বরূপে যে অস্পন্দন বা বিবর্ত্তাভাব, তাহাই শ্রুতি-

নিগদিত পরম পদ। ঐ চিৎস্বরূপের স্পন্দন যখন প্রশান্ত হইয়া যাইবে, তখনই এ সংসারের নিবৃত্তি ঘটিবে। অর্থাৎ চিদাত্মার কেবলী-ভাবই অসংসার, আর তাহার যাহা বিপরীত ভাব, তাহাই সংসার। কাজেই কেবলীভাবের প্রতিষ্ঠাতেই সংসারের নিবৃত্তি। তোমার চিত্ত যখন অপরিচ্ছিন্ন মহাচিত্তে পরিণতি পাইবে, তখন জীব, জগৎ, ইত্যাদি-রূপ বিভিন্ন অংশভাবেরও বিলয় হইবে। এই অংশভাব-সমূহের বিলয়ই পরম পুরুষার্থ এবং তাহারই নাম বাসনা-বিনাশ। ঐ সম্বিৎস্পন্দ অস্তিত্ব-হীন ও অসত্যস্বরূপ হইয়াও যখন প্রসিদ্ধ জড়স্বভাবের উদ্ভাবক, তখন যাহা স্পন্দ-রাহিত্য, তাহাই ঐ চিৎস্বরূপের জড়েতর পরম রূপ। মহানুভব ব্যক্তিগণ এইরূপই নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। যে পর্য্যন্ত এই অনাত্ম জগতে যথার্থ বুদ্ধি থাকিবে, সেই পর্য্যন্তই এই সংসার সৎস্বরূপে বিরাজ করিবে। পরন্তু সেই অনাত্ম জগৎকে যখন অনাত্মরূপে ভাবনা করা না যাইবে, তখনই তাহার লয় হইয়া যাইবে। অতএব বুঝিতে হইবে, যিনি জীবন্মুক্ত ব্যক্তি, তাঁহার পক্ষে সংসার দগ্ধ বস্ত্রের ন্যায় অসার। বিশদার্থ এই যে, দগ্ধ বস্ত্র যেমন অসার বলিয়া সে আর বন্ধন-কার্য্যের উপযোগী হইতে পারে না, তেমনি জীবন্মুক্তের সংসারও সংসারে যথার্থ ভাবনার অভাব-নিবন্ধন সারশূন্য দগ্ধ বস্ত্রবৎ পুনর্ব্বার আর বন্ধনের কারণ হয় না। ফলে, এ সংসার সেই নিষ্পন্দ চিন্মাত্রেই পর্য্যবসিত। সুবর্ণ যেমন হার ও বলয় প্রভৃতি হইতে পৃথক্ থাকে না, তেমনি প্রমাণ ও প্রমেয়াদিও চিদাত্মায় স্বতন্ত্র নাই। চিত্তই চিদাত্মার প্রথম স্পন্দ; সেই স্পন্দই সংসার এবং সেই সংসারই তাহার অবোধতা।

হে রাম! ঐ সকল সংসারাখ্য ভাব বোধকালে থাকে না; বোধ-কালে কেবল ও শুদ্ধ চিন্মাত্রই অবশেষিত হইয়া থাকেন। অতএব সে কালে ভোগ-বাসনারও অবসান হইয়া থাকে। ভোগবাসনার অবসান হইবার পর সহজ-সিদ্ধ ভোগবাসনার পরিহার করাই জীবন্মুক্তের লক্ষণ। জীবন্মুক্ত মহাপুরুষেরা ভোগ ভাবনা করেন না; তাঁহাদের এইরূপ নির্ভাবনার কারণ এই যে, আত্মতত্ত্ব অপেক্ষা ভোগরাশি তাঁহাদের প্রিয় বস্তু হইতে পারে না। ফলতঃ সুস্বাদু খাদ্য বস্তু দ্বারা পরম পরিতৃপ্তি

হইলে কেই বা আবার কদন্ন-ভোজনে লালায়িত হয়? সুতরাং এ কথা নিশ্চিতই যে, আত্মতত্ত্ব লাভে পরম পরিতৃপ্ত জীবন্মুক্ত পুরুষেরা ভোগনিবহে আর আশঙ্কা রাখেন না। জানিবে,—নৈসর্গিক ভোগাকাঙ্ক্ষা পরিহার করাই জীবন্মুক্ত ভাবের অন্যতম প্রধান লক্ষণ। আত্মচিৎই ভোক্তৃ, ভোগ্য ও ভোগের আকারে স্পন্দিত হইয়া সর্ব্বময়রূপে বিরাজ করিতেছেন। নিরন্তর অভ্যাস-স্থৈর্য্যে অন্তরে যে এইরূপ নিশ্চয় দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হয়, তাহাও জীবন্মুক্তভাবের লক্ষণান্তর বলিয়া নিরূপিত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি ভোগ-ব্যাপারে নির্লিপ্ত থাকে; পরন্তু কেবল লোকের অনুরোধ রক্ষার নিমিত্তই মাত্র দেহ ধারণের উপযোগী ভোগ করিয়া যায়, তাদৃশ ব্যক্তি ভোগ করিলেও প্রকৃত পক্ষে তাহার ভোগ করা হয় না। সত্য কথা বলিতে কি, সেই ব্যক্তিই বুদ্ধিমান্ এবং সেই ব্যক্তিই তত্ত্বজ্ঞ। দেখ, কোন এক ব্যক্তির ভ্রম হইয়াছে; সে সেই ভ্রমের ঘোরে আকাশে লগুড় দ্বারা আঘাত করিতেছে। এই সময় আর এক ব্যক্তি সেখানে আসিল। তাহার বুদ্ধি আছে; সে পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তির ভ্রম বুঝিতে পারিয়াও মাত্র তাহার অনুরোধ-রক্ষাকল্পেই আকাশে যেমন আঘাত করিতে থাকে; পরন্তু তাহার ঐ আঘাত-চেষ্টা বৃথা হইয়া যায়—কেবল অনুরোধ রক্ষাই হয়, তেমনি অনুরোধে যে ভোগ-চেষ্টা, তাহাও বৃথা হইয়া যায়; তাহাতে বাস্তবিক ভোগ কিছুই হয় না। বলিতে পার, অনুরোধ রক্ষা করিতে গিয়া আকাশে আঘাত করিলে কিম্বা ভোগ্য বস্তু ভোগ করিলে 'আমি কর্ত্তা' এই প্রকার ভ্রমজ্ঞানে পূর্ব্বোক্ত সর্ব্বাত্মরূপ বুদ্ধি কৃত্রিম হইয়া যাইবার সম্ভাবনা; সুতরাং কিরূপে তাহা জীবন্মুক্ত ভাবের লক্ষণ হইতে পারে? এ কথার উত্তরে বলা যায়, হাঁ তোমার ঈদৃশ আশঙ্কা অলীক নহে; কেন না, ঐ প্রকার কৃত্রিম বুদ্ধি জীবন্মুক্ত-ভাবের সাধক হইতে পারে; কারণ, সর্ব্বাত্ম-ভাব অবলোকন যদিও কৃত্রিম হয়, তথাচ তাহা পরিচ্ছিন্ন আত্মদৃষ্টি নিরস্ত করিয়া তত্ত্বজ্ঞানের অনুকূল হইয়া থাকে। অতএব বলা যায়, ঐ প্রকার কৃত্রিম বুদ্ধিও নিরতিশয় আনন্দময় আত্মতত্ত্ব-স্বরূপ লাভ করিবার সহজ উপায়। ফলে কৃত্রিম বুদ্ধি যোগ করা ভিন্ন সিদ্ধিলাভ সম্ভব পর নহে। দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি নিরস্ত করাই তত্ত্বজ্ঞান উন্মেষিত

হইবার উপায়ান্তর। কিন্তু তাই বলিয়া দেহ ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলা তত্ত্বজ্ঞানের লক্ষণ হইতে পারে না। বলিতে কি, যত দিন যাবৎ অন্তরে না সম্যক্ জ্ঞান সমুদিত হয়, ততকাল চিত্তের এই সংসারনামধেয় স্পন্দাস্পন্দ অবস্থা বিদ্যমান থাকে; কিন্তু যে কালে সম্যক্ জ্ঞান প্রাদুর্ভূত হয়, আর সেই জ্ঞান স্থির হইয়া থাকে, তখন এ সকল সংসার-ভাব প্রদীপের ন্যায় কোথায় যে নির্ব্বাণ পাইয়া কি হইয়া যায়, তাহা আর বলিয়া বুঝাইবার উপায় নাই। বাস্তবিক বিচার করিয়া দেখিলে ঐ প্রশান্ত মূর্ত্তি চিৎপ্রদীপের স্পন্দ ও অস্পন্দনের কথা মাত্রই নাই। নিস্পন্দ প্রাণবায়ু যেমন সৎ কিম্বা অসৎ, এ দুইয়ের কিছুই নহে এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্ত্তীও নহে; অজ্ঞানস্পন্দ-বিরহিত চিত্তত্ত্বের যে মোক্ষনামধেয় রূপ, তাহাও সেইরূপই বটে। বলা বাহুল্য, শান্তিস্থিতিই চিদাত্মার স্বরূপাবস্থা আর অশান্তি ভাবই তাহার স্বরূপ-চ্যুতি। বন্ধ বা মোক্ষ এতদুভয়ের নাম-গন্ধও তাঁহাতে নাই। আমি বদ্ধ, আমাকে মুক্ত হইতে হইবে, এই প্রকার জ্ঞানও আত্মার পূর্ণতা পক্ষে বিঘ্ন আনয়ন করে। মোক্ষ-লাভের ইচ্ছা দূরে থাকুক, ঐ চিদাত্মা বিক্ষেপ ও প্রচ্ছাদন হইতে বর্জ্জিত না হউক, এই প্রকার ভাবও বন্ধের কারণ হয়। অতএব সর্ব্ব প্রকার সম্বেদন-শূন্যতাই পরম পদ বলিয়া জানিবে। সঙ্কল্প, সঙ্কল্প্য ও সঙ্কল্পক শব্দে যাহা বুঝায়, তাহা বন্ধ ও মোক্ষের যোগ্য পাত্র। যদি বিচার করিয়া দেখা যায়, তাহা হইলে আর উহা তিষ্ঠিতে পারে না। 'অহং' ভাব যদি অপ্রতিষ্ঠ বা নিরাশ্রয় হইয়া পড়ে, তাহা হইলে বন্ধন ও মোক্ষ, এই দুইটীর ব্যবহার কোথায় বা কাহার উপর চাপাইবে? সঙ্কল্প-ত্যাগের ইহাই উপায় যে, জ্ঞানী যদি স্বকৃত সঙ্কল্পের বিচার করে, পূর্ব্বাপর তত্ত্ব আলোচনা করিতে থাকে এবং বিবেকবলে তাহা নিরস্ত করিবার চেষ্টা করে, তাহা হইলে সঙ্কল্পের অবসান হয়। এইরূপে সঙ্কল্পাবসানেই চিত্তের নিস্পন্দতা স্থিরীকৃত হইয়া থাকে; ইহার অন্যথা কখন হয় না। কাজেই তৎকালে এই যে সঙ্কল্পমূলক সংসার, ইহাও ক্ষীণ হইয়া যায়। স্পন্দ ও স্পন্দময় বায়ুর ক্ষয় হইলে নিস্পন্দ চিদ্‌ঘন মাত্রই অবশেষে বর্ত্তমান থাকে। সংসার স্পন্দাদিময়; সুতরাং স্পন্দাদি ক্ষয়ের

সঙ্গে সঙ্গে তাহারও ক্ষয় হইয়া যায়। তখন আর সংসারভাব থাকে না। চিৎস্পন্দও চিত্তের প্রকাশ ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। এই প্রকার ধারণা-যোগেও সংসার নিবৃত্তি ঘটে। অতএব ইহা এক প্রকার বিবিধ দৃশ্যময় দীর্ঘ স্বপ্ন। যাঁহারা তত্ত্বজ্ঞানী জীবন্মুক্ত ব্যক্তি, তাঁহারা এ স্বপ্নে কদাচ মুগ্ধ হন না। তাঁহারা বুঝিতে পারেন—এ সকল আত্মসম্বিদেরই বর্গ।

হে রাম! যাঁহাতে এই নিখিল জগদাকারের উপলব্ধি বাধিত হয়—হইয়াও সতত সবলে আনন্দপ্রদ বলিয়া সুন্দরস্বরূপে উৎপন্ন হয়, যাঁহাতে ঐ পূর্ব্বোল্লিখিত সকল সম্বিদের সত্তা ও স্থিতি সমুদিত হইয়া থাকে এবং যাঁহা হইতে এই সকল কল্পনাকার পঙ্ক গলিত হইয়া যায়, তুমি সেই প্রত্যক্ আত্মাকে ধ্যানযোগে অবলোকন কর।

ঊনষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫৯ ॥

ষষ্টিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! আদ্য পরম তত্ত্ব চিদ্‌ঘন পরম পদ এই-রূপেই বিরাজমান। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও হর প্রভৃতি মহাত্মগণ তাঁহাতেই অবস্থান করিতেছেন। অতএব নরাদি হর পর্য্যন্ত সকলের যে বিভূতির উৎকর্ষ দেখা যায়, জানিবে—তাহা সেই চিদ্‌ঘন ব্রহ্মতত্ত্বেই প্রতিষ্ঠিত। নরপতিগণ যেমন পার্থিব সুখে পরিতুষ্ট রহেন, ব্রহ্মাদি সকলেই সেইরূপ ব্রহ্মবিভূতি লাভ করিয়া শ্রুতিসম্মত আনন্দঘনতায় প্রকাশমান হন এবং আকাশগমনাদি বিবিধ ক্রীড়ায় ক্রীড়া করিয়া থাকেন। সেই ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইতে পারিলে জীবের মৃত্যু কিম্বা শোক কিছুই থাকে না; তাঁহাকে পাইলে জীবের প্রাণ ধারণার্থ ভোজনেচ্ছাদি দ্বারা পীড়িত হইয়া ক্লেশ ভোগ করিতে হয় না এবং কোনরূপ মায়ার বন্ধনেও জীব আবদ্ধ হইয়া রহে না। জীব যদি সেই অপার পরমাকাশস্বরূপ পরমাত্মার সত্তাসামান্য-স্থিতি ক্ষণেকের জন্যও বোধগম্য করিতে পারে, তাহা হইলেও

তৎক্ষণাৎ সে মুক্ত মুনি হইয়া থাকে। সে যদি নিখিল সংসারকর্ম্মেরও অনুষ্ঠান করে, তথাচ তাহাকে কেন এ কর্ম্ম করিলাম, বলিয়া অনুতাপ করিতে হয় না।

রামচন্দ্র কহিলেন,—হে প্রভো! মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্তাদি দ্বৈতভাব যাহাতে লয় প্রাপ্ত এবং যাহাতে মাত্র কেবলীভাবই প্রতিষ্ঠিত, তাহাই কি আপনার মতে সত্তাসামান্য, অথবা মনঃ প্রভৃতি সমুদায় বিশেষ-বিশিষ্ট সর্ব্বময় ঈশ্বরই সত্তাসামান্য বলিয়া উপদিষ্ট? ব্রহ্ম সর্ব্বদেহে বিরাজ করিয়া পান, ভোজন, গমন এবং অন্তরে জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তিকালে গ্রহণ করেন; তিনি সুষুপ্তি ও প্রলয়ে সংহার করেন, তুরীয়াবস্থায় সম্বিৎ ও সম্বেদ্যরূপে বিরাজ করেন, তিনিই আদ্যন্ত-বিরহিত, সদা সর্ব্বত্র অবস্থিত এবং মাত্র তত্ত্বজ্ঞান-লভ্য। সেই ব্রহ্মই সত্তাসামান্যরূপে নিখিল পদার্থে অধিষ্ঠিত এবং সমুদায় বস্তু-তত্ত্বরূপে বিরাজিত। আকাশে আকাশত্ব, শব্দে শব্দত্ব, স্পর্শে স্পর্শত্ব, ত্বকে ত্বক্‌ত্ব এবং রসে রসত্ব-রূপে তিনিই বিরাজিত। সেই ব্রহ্মই রসনেন্দ্রিয়রূপে রসনায়, রূপ-স্বরূপে রূপে, দর্শনেন্দ্রিয়রূপে দর্শনে এবং ঘ্রাণেন্দ্রিয়রূপে নাসিকায় অবস্থিত। গন্ধের গন্ধত্ব, দেহের দেহত্ব, ভূমির ভূমিত্ব, জলের জলত্ব, বায়ুর বায়ুত্ব, তেজের তেজস্ত্ব, ও বুদ্ধির বুদ্ধিত্বরূপে তিনিই বিরাজিত। মনে তিনি মনস্ত্বরূপে আছেন, অহঙ্কারে তিনি অহঙ্কারতারূপে বিরাজ করিতেছেন, সম্বিদে তিনি বুদ্ধিত্বরূপে অবস্থিত আছেন এবং চিত্তে তিনি চিত্ততারূপে অধিষ্ঠান করিতেছেন। তিনি বৃক্ষে বৃক্ষত্ব, পটে পটত্ব, ঘটে ঘটত্ব ও বটে বটত্বরূপে বিরাজিত। তিনিই চরের চরত্ব, অচরের অচরত্ব, পাষাণের পাষাণত্ব, চেতনের চেতনত্ব, অমরের অমরত্ব, নরের নরত্ব, তির্য্যগ্‌জাতির তির্য্যক্‌ত্ব এবং কৃমি কীটাদির কৃমিত্ব। যুগ, বৎসর ও মাসাদি ভেদে তিনিই কালের কালত্বরূপে অবস্থিত। ঋতুর ঋতুত্ব, ক্ষণের ক্ষণত্ব, ত্রুটির ত্রুটিত্ব ও নিমেষাদির নিমেষত্বাদিরূপে তাঁহারই অবস্থিতি। তিনিই শুক্লে শুক্লত্ব, কৃষ্ণে কৃষ্ণত্ব, ক্রিয়ায় স্পন্দশীলত্ব, এবং নিয়তির নিয়তিত্ব। স্থিতিতে স্থিতিরূপে, নাশে নাশরূপে এবং উৎপত্তিতে উৎপত্তিরূপে তিনিই বিরাজমান। বাল্যে বাল্যভাবে, যৌবনে যুবভাবে, জরায় জরভাবে

ও মৃত্যুকালে মৃত্যুরূপে তাঁহারই অবস্থান। সেই পরমেশ হইতে কোন পদার্থই স্বতন্ত্র নহে; ঊর্ম্মি ও সীকরাদি সহ জলের যেমন ভেদ-ভিন্নতা নাই, অর্থাৎ ঐ ঊর্ম্মি প্রভৃতি সকলই যেমন সেই জল-সামান্য, তেমনি পরমেশ্বরই সর্ব্ব পদার্থ; তাঁহা হইতে পদার্থপুঞ্জের স্বতন্ত্র কিছুই নাই। এই যে কিছু নানাত্ব-বৈচিত্র্য সকলই অসত্য। শিশু জন-কৃত অসত্য বেতাল-কল্পনার ন্যায় সেই সত্যরূপ পরম বস্তু হইতেই এই সকল মিথ্যা কল্পনার সৃষ্টি হইয়াছে।

হে মহাত্মন্! সেই যিনি সর্ব্বব্যাপী নিরঞ্জন, অহংস্বরূপ, তাঁহারই কর্তৃত্বে এই জগৎকল্পনা বিহিত হইয়াছে; তাঁহা হইতেই বিশ্বসংসার বিবিধ বিলাসে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। এই যত কিছু দেখিতে পাইতেছ, সকলই সেই অহংস্বরূপের বিবৃতি-বিস্তার। 'অহং' ব্যতীত আর কিছুই নাই। তুমি এইরূপই স্থির কর,—করিয়া শান্তমনে আপন মহিমায় সুখে অবস্থান কর।

ষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬০ ॥

একষষ্টিতম সর্গ।

রামচন্দ্র কহিলেন,—হে বিভো! এই যে গৃহ, নগর ও মণ্ডলাদি নিখিল জগৎ, ইহা সেই ব্রহ্মের স্বপ্নপ্রায় ভ্রান্তি-বিলসিত বিভূতি বৈ আর কিছুই নহে; সুতরাং ইহা অসন্ময় বা মিথ্যা। আমরা মর্ত্ত্য; ব্রহ্মাদি দেবগণ আমাদেরই ন্যায় দেহধারী; তাঁহাদের দৃষ্টিতেই বা কেন ত্রিজগৎ স্বপ্নসদৃশ ভ্রান্তি মাত্র বলিয়া প্রতীতিগোচর হয়, আর আমাদের দৃষ্টিতেই বা কেন এ জগৎ স্বপ্নবৎ অনুভূত না হইয়া সত্যরূপে দৃঢ়প্রত্যয় হইয়া থাকে? দীর্ঘকাল অনুবৃত্তি-দর্শনে আমাদেরই যে কেবল ইহাতে সত্যতা বোধ হইবার সম্ভাবনা, তাহা নহে; কেন না, ব্রহ্মাদি দেবগণ মর্ত্ত্যাপেক্ষাও

দীর্ঘায়ু; সুতরাং ইহার সত্যতা-বোধে তাঁহাদেরই দৃঢ়তা হওয়া অধিক সম্ভব; অথচ তাহা না হইয়া তাহার বিপরীত হয়, ইহার কারণ কি? আমার নিকট তাহা প্রকাশ করিয়া বলুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! আমরা এই সমুদায়কে সত্য বলিয়া ভাবি; কিন্তু ব্রহ্মাদি মুক্ত পুরুষেরা এ সমুদায়কে সত্য বলিয়া ভাবনা করেন না; এই সৃষ্টিসম্বন্ধে সত্যতা-বোধ তাঁহাদের নাই; এ কথা সত্য। দেখ, পদ্মযোনি ব্রহ্মা পূর্ব্বে যখন উপাসক অবস্থায় ছিলেন, তখন তত্ত্বজ্ঞানের অনুদয় নিবন্ধন তদীয় আত্মকৃত পূর্ব্বতন সৃষ্টি অস্মদাদির অনুভূত সৃষ্টির ন্যায় সত্য বলিয়া প্রতীত হইত; কিন্তু এ কল্পে তাঁহার সেই তৎকল্পীয় মিথ্যা জ্ঞান তত্ত্বজ্ঞানবলে বাধিত হওয়ায় তাঁহার দৃষ্টিতে সে সৃষ্টি অসম্ভব বলিয়াই অবধারিত। এ কথার অভিপ্রায় এই যে, যে অনুবৃত্তি বা সংস্কারপরম্পরা অবাধে চলিয়া আসিতেছে, তাহাই সত্যতা ভ্রম সুদৃঢ় করিবার হেতু; আর যাহা ব্যাহত হইয়া যায়, তাহা ঐরূপ দৃঢ়প্রত্যয়ের হেতু হয় না। ব্রহ্মা পূর্ব্বকল্পে অস্মদাদির ন্যায় অমুক্ত জীব ছিলেন; পরন্তু এ কল্পে তিনি মুক্ত জীব হইয়াছেন। যত কাল অজ্ঞানের অনুবৃত্তি, ততদিনই ঐ সত্যতা-বোধ ও সংসার-ভ্রম। যখন সম্যক্ জ্ঞানে অজ্ঞানের অভাব হয়, তখন ভ্রান্তির নিবৃত্তি ও অসংসার ঘটিয়া থাকে। এই স্বপ্নোপম প্রপঞ্চ-প্রতিভাস প্রজাপতির তত্ত্বজ্ঞানে বাধিত হয় এবং অজ্ঞ অস্মদাদির 'অহং' জ্ঞানে একীভূত ও প্রতিভাসিত হইয়া থাকে। এই জন্য আমরা বুঝি, এই সকলই সত্য। দেখ, স্বপ্ন প্রকৃত পক্ষে মিথ্যা; কিন্তু সুপ্ত ব্যক্তি স্বপ্নের মিথ্যাত্ব অনুভব করিয়া উঠিতে পারে না। এইরূপে ব্রহ্মাও কিঞ্চিৎকাল এ সমুদায়ের মিথ্যাত্ব বুঝেন, আবার বুঝিয়াও বুঝেন না। ফলে যতদিনে না আধিকারিক প্রারব্ধ শেষ হয়, তত দিন পর্য্যন্ত তাঁহার তত্ত্বজ্ঞানও প্রকৃত কর্য্যোপযোগী হয় না।

হে রাম! সাধারণ সুপ্ত জনের স্বপ্নে যাহা প্রতিভাস হয়, অস্মদাদি সমুদায় জীব-জগৎস্বরূপেই তাহা হইয়া থাকে এবং তাহার প্রবাহ— অনাদি অনন্তভাবেই বহিয়া চলে। এইরূপে জানিবে—ব্রহ্মারও যাহা

স্বপ্ন-প্রতিভাস উক্ত হইয়াছে, তাহাও এই নিখিল জীব-জগৎস্বরূপেই হয় এবং তাহার প্রবাহও অনাদি অনন্তরূপেই প্রবাহিত হইয়া থাকে। ভাবিয়া দেখ, বীজ হইতে বৃক্ষ হয়, বৃক্ষ হইতে ফল হয় এবং ফল হইতে বীজ হয়,—হইয়া ক্রমাগত আবার বৃক্ষ-ফল-বীজ হইয়া আসিতেছে। এই-রূপে একই বীজ যেমন স্বজন্য বৃক্ষের ফলরূপে পরিণতি ব্যতীত অন্য কিছুই নয়, তেমনি ঐ যে স্বপ্ন পুরুষ, তাহা হইতেই স্বপ্ন-পুরুষের আবির্ভাব হইতেছে। যে দ্রষ্টা স্বপ্নদশায় পুরুষাকার প্রত্যক্ষ করে, ঐ দ্রষ্টা ও দৃশ্য এই উভয়ই স্বপ্ন বৈ আর কিছুই নহে। দেখ, যাহার নিজের সত্যতা নাই, তাহা দ্বারা নিষ্পাদিত বস্তু, নিশ্চিতই অসত্য। অতএব কি জন্মান্তর, কি স্বর্গ নরকাদি, ইহারা অর্থক্রিয়ায় সমর্থ হইলেও ঐ সকল অসত্য পদার্থে সত্যতা-বোধ অসঙ্গতই বটে। তাই বলি-তেছি, এই সকল স্বাপ্ন পুরুষ-সাধিত প্রপঞ্চ; ইহাতে সত্যতা বোধ থাকিলেও তাহা পরিত্যাজ্য। ফল কথা, যদিও উহাতে সত্য বলিয়া ধারণা থাকে, তথাচ ওসকল কিছুই কিছু নহে; এইরূপ মিথ্যাবোধে সর্ব্বপ্রপঞ্চই পরিহার্য্য। প্রজাপতির এই যে স্বাপ্ন জগৎসৃষ্টি, ইহাও বস্তুতঃ বহুকালস্থায়ী নহে। ইহার দীর্ঘতা পূর্ব্বোল্লিখিত হরিশ্চন্দ্রাদি-স্বপ্নের ভ্রম-কল্পিত দীর্ঘতারই অনুরূপ। প্রজাপতির যে সৃষ্টি-বিস্তার, তাহার মিথ্যাত্ব বিষয়ে তদীয় নিমেষ-নির্ম্মিত মহাপ্রলয়ই প্রমাণ। জল যেমন দ্রবত্ববশেই আবর্ত্ত বিবর্ত্ত প্রভৃতি নানাকারে প্রকাশ পাইয়া থাকে, এই সৃষ্টি-পরম্পরাদি দৃশ্যের যাহা প্রকাশ, তাহাও তেমনি সেই চিৎতত্ত্বের অস্তিত্ববলেই উপলব্ধি করিতে হইবে। যখন ঐ চিৎতত্ত্বের জ্ঞান জন্মিবে—তখনই উহার মিথ্যাত্ব প্রতীত হইবে; সুতরাং এই সৃষ্টি-সমৃদ্ধি যদি স্বপ্নাকার বলিয়াই অবধারিত হইল—বাস্তব পক্ষে উহার সত্যতা একেবারেই অসম্ভব হইয়া পড়িল, তখন সসৃষ্টি প্রাজাপত্য পদ যে একান্তই অসৎ, ইহাই সম্ভবপর বলিয়া জানা গেল; অর্থাৎ নিরোধ নাই, উৎপত্তি নাই, বদ্ধ নাই, সাধক নাই, মুমুক্ষু নাই, মুক্তি নাই, ইহাই পরমার্থতা; এই এবম্বিধ বেদবচনার্থ ই সুসঙ্গত বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। প্রশ্ন হইতে পারে যে, ইহা যদি একান্তই অসন্ময় হইল, তাহা হইলে কিরূপে ইহার ব্যবহারযোগ্যতা বলা যায়? উত্তরে

বক্তব্য এই যে, যাহা যে ভাবে যে প্রকার দেখা যায়, তাহা সেই ভাবেই বিদ্যমান। ইহাই স্বাপ্ন বিভ্রমের রীতি; সুতরাং এ প্রকার প্রশ্ন লইয়া আর বাদানুবাদের প্রয়োজন নাই। অজ্ঞানে সকলই সম্ভব হয়, তাহার অঘটন-ঘটন-পটীয়সী শক্তি বিদ্যমান। জগতে এমন কিছুই নাই, যাহা ঐ অজ্ঞান বা ভ্রমের মহিমায় সম্ভবপর হয় না। দেখ, ভ্রমের ঘোরেই এই ত্রিভুবনে বিচিত্র বিবিধ বস্তু পরিদৃষ্ট হয়, যাহা কিছু অসম্ভব, তাহাও ভ্রমের প্রভাবে সম্ভবপর হইয়া থাকে। দেখ, জলাভ্যন্তরে অগ্নির অস্তিত্ব পরিদৃষ্ট হয়; যথা—সমুদ্রে বাড়বাগ্নি। শূন্যেও নগর নিরীক্ষিত হয়; যথা—বিমানবিহারী দেবাদির স্বর্গাদি লোক। শিলাবক্ষেও পদ্মের উৎপত্তি হইয়া থাকে; যথা—মৃত্তিকা-সম্পর্ক-শূন্য হিমালয় শৈলেও পাদপশ্রেণী। পুণ্য ফলস্বরূপ সকল প্রকার অভীষ্ট বস্তু, সমুদায় ব্যবহারযোগ্য দ্রব্য এবং সমগ্র পুষ্পসম্ভার একই স্থানে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহার প্রমাণ—কল্পপাদপ। শিলাও বৃক্ষবৎ ফল দান করিয়া থাকে; ইহার দৃষ্টান্তস্থলে চিন্তামণির নাম উল্লেখযোগ্য। শিলার অভ্যন্তরেও প্রাণিপুঞ্জের অবস্থান দেখা যায়। ইহার উদাহরণ দেখ, শিলামধ্যেও মণ্ডূক অবস্থান করে। প্রস্তর হইতেও জল নির্গম হইয়া থাকে; চন্দ্রকান্তমণিই ইহার নিদর্শন। নিমেষ মাত্রেও ঘট-পটের আবির্ভাব হয়; ইহার দৃষ্টান্ত স্বপ্নাবস্থা, স্বপ্নজ্ঞানেই উহা উপলব্ধ হইয়া থাকে। অসত্যেও সত্যজ্ঞান উৎপন্ন হয়। দৃষ্টান্তরূপে বলা যাইতে পারে—লোকে স্বপ্নাবস্থায় নিজের মরণ নিজেই অনুভব করে। আকাশে সহসা জলাবস্থান দেখিতে পাওয়া যায়; উদাহরণ দেখ—ভূতবৃন্দের অন্তরস্থিত জল। আকাশে চন্দ্রাতপবৎ জলের অবস্থিতি হয়; দৃষ্টান্ত—স্বর্গনদী গঙ্গা। স্থূলতম শিলাখণ্ডও আকাশে উড্ডীন হয়; ইহার প্রমাণ—সপক্ষ পর্ব্বতগণ। শিলামধ্য হইতেও যথেপ্সিত বস্তু প্রাপ্ত হওয়া যায়, এ সন্দেহ চিন্তামণিতেই নিরাস হইবে। যাহা চিন্তা করা যায়, তাহারই প্রাপ্ত হয়; দেবোদ্যানে যাও—কল্পতরুর প্রান্তে ইহার প্রমাণ পাইবে। আবার অন্য দিকে দেখ, চিন্তা করিলেও অর্থোৎপত্তি হইবে না। দৃষ্টান্ত স্থলে বলা যায়, তুমি যদি চিন্তা কর—লোকোৎপত্তি হউক, ব্রহ্মা বিনষ্ট

হউক, সমস্ত প্রপঞ্চ সত্য হউক, নিয়তি লোপ পাইয়া যাউক, এবং বেদ অপ্রমাণ হউক, তথাচ তাহার ফলপ্রাপ্তি হইবে না। আবার দেখ অচেতন পদার্থও কার্য্য করিয়া থাকে; যন্ত্রময় পুরুষ দেখিলেই তাহা বুঝা যাইবে। এইরূপ এবং অন্যান্য আরও অনেক প্রকার বিচিত্র ব্যাপার শাম্বরী বা গান্ধর্ব্বী মায়া-বিলাসেও পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। দেশ, কাল, ক্রিয়া, দ্রব্য, রত্ন ও পিশাচ প্রভৃতি হইতে যে অনন্ত বিচিত্র রচনাবিভ্রম বিলোকিত হইয়া থাকে, তাহাই গন্ধর্ব্বী মায়া হইতে উৎপন্ন। অর্থাৎ দূরত্ব বশে আকাশস্থ চন্দ্রের যে যে প্রাদেশিকতা দর্শন, আকাশস্থিত ঔৎপাতিক কবন্ধাদি, বিবিধ মন্ত্র প্রয়োগ, বিবিধ ঔষধাদি, অসাধারণ রত্নশক্তি, এবং পিশাচাবেশ প্রভৃতি হইতে যে যে বিচিত্র বিভ্রম দৃষ্টি হয়, তৎসমস্তই গন্ধর্ব্বজনিত বলিয়া প্রখ্যাত। ঐ সকল অসত্য হইলেও যেন সত্য হইতেই জাত বলিয়া ধারণা হয়। আবার দেখ, অসম্ভবও সম্ভব হইয়া থাকে; যেমন এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের নাশ যদিও অসম্ভব, তথাচ অবশ্যই হইবে, এইরূপ জ্ঞানে সম্ভব হইয়া থাকে। আবার এই যে বিশ্বসৃষ্টিপ্রভৃতিরূপ স্বপ্নবিভ্রম, ইহা সম্ভবপর হইলেও প্রলয়ে এবং তত্ত্বজ্ঞানোদয়ে অসম্ভব বলিয়া প্রতীত হয় বলিয়া তৎস্বরূপের শান্তি ঘটিয়া থাকে। যদি ব্রহ্মস্বরূপে দেখা যায়, তবে অসত্য কিছুই নাই, যদি জগৎস্বরূপে দৃষ্ট হয়, তবে সত্য কিছুই নাই। সুতরাং বলা যায়, এই যে সৃষ্টিস্বপ্ন, ইহাতে সর্ব্বত্র সকলই সম্ভব হইয়া থাকে। স্বপ্নে বুদ্ধি মগ্ন হইলে স্বপ্নদৃষ্ট সকল বস্তুই যেমন স্থির বলিয়া মনে হয়, তেমনি এই যে সৃষ্টিস্বপ্ন, ইহাতে সমস্তই স্থির ও যথার্থরূপে দৃষ্ট হইয়া থাকে। জীব ভ্রমের পর ভ্রমাক্রান্ত হয়, স্বপ্নের পর স্বপ্নাভিভূত হয়, তাহাতেই দৃঢ় প্রত্যয় আশ্রয় করিয়া থাকে। জানিবে—জীব এইরূপেই বিমুগ্ধ অবস্থায় অবস্থিত। যেমন মুগ্ধ মৃগ গর্ত্তমধ্যে পতিত হয় আবার নিজের দোষেই এক গর্ত্ত হইতে গর্ত্তান্তরে পতিত হইয়া থাকে, তেমনি জীবনিবহ সংসারগর্ত্তে পতনের হেতুভূত বিষয়বাসনাদি মোহজালে আচ্ছন্ন হইয়া দেহাদি বিবরে প্রবেশরূপ মোহে আবৃত হইতেছে।

একষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬১ ॥

দ্বিষষ্টিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রঘুনন্দন! এ সম্বন্ধে উদাহরণস্বরূপে তোমার নিকট এক পুরাবৃত্ত বর্ণন করিতেছি; শ্রবণ কর। এই প্রাচীন কাহিনী কোন এক মননশীল ভিক্ষুর সম্বন্ধে ঘটিয়াছিল। এক দেশে শম-দম ও বৈরাগ্যাদি-সম্পন্ন কোন এক পরিব্রাজক ছিলেন। তিনি নিরন্তর সমাধি অভ্যাসে নিরত থাকিতেন। তাঁহার নিজের আশ্রমোচিত যে শ্রবণাদি ব্যবহার, তাহারই প্রসঙ্গে তিনি সমস্ত দিন অতিবাহিত করিতেন। সমাধির অভ্যাসে তাঁহার চিত্ত বিশুদ্ধ হইয়াছিল। তিনি পূর্ব্ববাসনা পরিহার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। জল যেমন তরঙ্গাকার ধারণ করে, তেমনি তদীয় বিশুদ্ধ চিত্ত তৎকালে যাহার চিন্তায় নিমগ্ন হইত, সত্বরই সেইভাবে পরিণতি পাইত।

একদিন সমাধি হইতে ব্যুত্থিত হইয়া তিনি একাগ্রমনে স্বীয় আসনে উপবেশনপূর্ব্বক ক্রিয়াক্রম চিন্তা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। চিন্তায় চিন্তায় তৎক্ষণাৎ তদীয় মনে আপনা হইতেই এই প্রতিভার স্ফুরণ হইল যে, শাস্ত্রজ্ঞানহীন সাধারণ ব্যক্তিগণ যেরূপ কার্য্যের অনুসরণ করে, আমিও লীলাবশে তাদৃশ কার্য্যেরই ভাবনা করিতে থাকি। জলের স্রোত এক ভাবে বহিতে থাকিলে, সহসা যদি সে স্রোতের গতিবৈপরীত্য ঘটে, তাহা হইলে হঠাৎ যেমন তাহাতে আবর্ত্তের আবির্ভাব হইয়া থাকে, তেমনি সেই ভিক্ষুর চিত্তগতি চিন্তার প্রভাবে তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া গেল। তদীয় চিত্ত মুহূর্ত্ত মধ্যে এক সামান্য নরাকার কল্পনা করিয়া লইল। তিনি স্বীয় বাসনানুসারে চিন্তা করিলেন,—আমি জীবট নামক পুরুষ হইলাম। এইরূপ চিন্তার ফল ফলিল। তদীয় চিত্তরূপী নর তখন জীবট নাম গ্রহণ করিয়া কাকতালীয় ন্যায়ে অবস্থান করিতে লাগিল।

অনন্তর সেই জীবটরূপী স্বপ্ন-কল্পিত পুরুষ স্বপ্নযোগে এক নগর নির্ম্মাণ করিলেন; পরে পুরবীথী কল্পনা করিয়া সেই পুরমধ্যে অবস্থানপূর্ব্বক

বিহার করিতে লাগিলেন। ভ্রমর যেমন কমল-মধু পানে মত্ত হয়, তেমনি তিনি ঐ নগরে অবস্থান করিয়া মনের আনন্দে পানীয় পানে মত্ত হইলেন। পরে প্রগাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন। অনন্তর মন যেমন এক স্থান হইতে স্থানান্তরে প্রয়াণ করে, তেমনি সেই পুরুষ স্বপ্নযোগে বিপ্রত্ব লাভ করিলেন। তিনি দেখিতে পাইলেন, তাঁহার সেই বিপ্রত্ব বেদাদি পাঠ ও সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে পরিতুষ্ট হইয়াছে।

একদা ঐ অবস্থায় সেই বিপ্রবর দৈনিক পূজা ও আহ্নিকাদি কার্য্যের অনুষ্ঠানে পরিশ্রান্ত হইয়া পড়েন। তাঁহার আত্মতত্ত্ব জ্ঞান ও নিখিল ব্যবহার সংস্কাররূপে অন্তরে বিলীন হইয়াছিল; এই জন্য তিনি বৃক্ষবীজের অন্তর্নিহিত ভাবী শাখা-পল্লবাদির বীজের ন্যায় অবস্থানপূর্ব্বক নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। অতঃপর সেই বিপ্র স্বপ্নযোগে দেখিলেন,—তাঁহার আত্মা সামন্তরূপ ধারণ করিয়াছে। সেই সামন্ত আবার একদা আহারাদি সমাপনের পর গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন হইয়া দেখিতে পাইলেন,—তাঁহার রাজচক্রবর্ত্তিত্ব লাভ ঘটিয়াছে। লতা যেমন পুষ্পজালে পরিবৃত থাকে, তেমনি তিনি চারিদিকে বিবিধ ভোগসামগ্রী দ্বারা বেষ্টিত রহিয়াছেন। অনন্তর একদা দিবাকর অস্তগত হইলে সেই সার্ব্বভৌম নরপতি সুখে নিদ্রাভিভূত হইলেন। তিনি স্বপ্নে দেখিলেন,—তাঁহার স্ত্রীদেহে আসক্তি হইয়াছে। বৃক্ষাদি কার্য্য যেমন কারণ-বীজে অবস্থান করে, তেমনি তাঁহার নিজ দেহে অনিন্দিত সুন্দর স্ত্রীত্ব প্রকটিত হইয়াছে এবং তরু-মধ্য-গত রস যেমন মঞ্জরীর আকারে আবির্ভূত হয়, তেমনি তাঁহার আত্মা তখন সেই সুররমণীরূপে সমুদিত হইয়াছে। অনন্তর সেই রমণীমূর্ত্তি রতি-শ্রমে শ্রান্ত হইল এবং গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িল। অতঃপর স্বপ্নে দেখিল,—জলের সাম্যাবস্থা যেমন আবর্ত্তরূপ ধারণ করে, তেমনি মৃগী-নয়নের সৌন্দর্য্য লালসায় সেই রমণী মৃগীরূপ ধারণ করিয়াছে। মৃগীর লতা-ভোজনে বড় আশা ছিল, তাই সেই চকিত-নয়না হরিণীও একদা গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন হইয়া স্বপ্নযোগে দেখিল,—স্বীয় অভ্যাসবশে সে স্বয়ং লতামূর্ত্তি হইয়াছে। চিত্ত-স্বভাবে পশুরও স্বপ্ন দর্শন হইয়া থাকে। যাহা দেখা যায় বা শুনা যায়, চিত্ত তাহা স্মরণ করে। চিত্তের স্মৃতি-

লোপ কোন ক্রমেই হয় না। চিত্ত যথাশ্রুত ও যথাদৃষ্ট বস্তুর সংস্কার গ্রহণ করে বলিয়া সংস্কারে যেমন স্মৃতি, তেমনি স্বপ্নাবির্ভাবও ঘটিয়া থাকে। কাজেই সেই মৃগীর লতাপল্লবে আসক্তি ছিল বলিয়া সে পুষ্পফল-পল্লবময়ী বনদেবতাদিগের বন-মধ্যগত কোন এক বিখ্যাত লতাগৃহবৎ সু-শোভিতা লতার মূর্ত্তি ধারণ করিল। অনন্তর বীজান্তর্গত অঙ্কুর যেমন অপ্রকাশ অবস্থায় অবস্থান করে, তেমনি সেই লতা অন্তঃস্থিত সাক্ষিচৈতন্যযোগে নিদ্রাজাড্য সুষুপ্তি অনুভব করিয়া স্বপ্নোন্মুখী বুদ্ধির সাহায্যে অন্তরে সুস্পষ্ট আত্মচ্ছেদ অবলোকন করিল। পরে ভ্রমররূপে সংস্কার উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল বলিয়া সে স্বপ্নযোগে সংস্কার-বুদ্ধির সহায়তায় সুষুপ্তস্থ আত্মাকে ভ্রমরাকারে পরিণত হইতে দেখিল। অতঃপর নায়ক যেমন যুবতীজনে আসক্ত হইয়া বিহার করিতে থাকে, তেমনি সেই লতার পরিণতি ভ্রমর তথাকার বনলতাপুঞ্জে ও প্রফুল্ল কমলিনী-ক্রোড়ে সমাসীন হইয়া বিহার করিতে লাগিল। সেই ভ্রমর মুক্তালতাবৎ সুন্দর লতা-নিকুঞ্জের পুষ্পগুচ্ছোপরি পরিভ্রমণ করিয়া প্রিয়াজনের বিম্বাধর-নিভ সুস্বাদু সুরস পুষ্পমকরন্দ পান করিতে প্রবৃত্ত হইল। এইরূপে সে একদা মৃণালিনীর মৃণালে জড়িত হইয়া তাহার প্রতি আসক্ত হইয়া পড়িল। বস্তুতঃ কখন কখন জড়বুদ্ধি ব্যক্তির চিত্তও অনুরাগে আকৃষ্ট হইয়া থাকে। একদা কোন এক হস্তী সেই নলিনীকে দলিত করিতে আসিল। বস্তুতঃ এ ঘটনা প্রায়ই দেখা যায় যে, রম্য বস্তু নাশ করিবার জন্যই মূঢ়দিগের উদ্যম অধিক হইয়া থাকে। যাহা হউক, সেই হস্তী তৎক্ষণাৎ সেই নলিনীকে মর্দ্দিত করিল। তখন পদ্মনালের সহিত হস্তীর দন্তমধ্য-নীত ধান্যের ন্যায় ঐ ভ্রমর পিষ্ট ও চূর্ণ হইয়া গেল। সেই অবস্থায় ভ্রমর হস্তীর আকার-দর্শনে তাহা চিন্তা করিয়া তৎক্ষণাৎ আপনাকে মত্ত হস্তিরূপে দেখিতে পাইল। তখন ভ্রমর মত্ত হস্তী হইয়া শৃঙ্খলাবদ্ধ হইল এবং পরাধীনতার অশেষ ক্লেশ ভোগ করিতে করিতে শুষ্ক সাগরবৎ গভীর খাত-গর্ত্তে পড়িয়া গেল। ঐ সময় মনে হইল, জীব যেন শৃঙ্খলাদির বন্ধন অপেক্ষাও কঠোর সংসারে নিপতিত হইয়া পরাধীনতার দুঃখ-দৈন্য অনুভব করিতে লাগিল। ঐ হস্তী কালক্রমে মদবলে মত্ত হইয়া সতত সদর্পে

ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া বেড়াইতে লাগিল এবং সংগ্রামে স্বীয় প্রভুর প্রবল বিপক্ষদলকে দলিত করিয়া তদীয় প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিল। বিবেক-রূপী বায়ুর তাড়নায় জীবোপাধি দেহাদি অভিমান যেমন বিনষ্ট হইয়া যায়, তেমনি সেই হস্তী একদিন নৈশযুদ্ধে খড়্গ ও নিস্ত্রিংশ প্রহারে আহত হইয়া মৃত্যুগ্রস্ত হইল। ঐ হস্তী জীবদ্দশায় নিয়তকাল নিজ গণ্ডে ভ্রমরসন্নিবেশ দেখিয়া আসিয়াছে; তাই চিরকালের অভ্যাসবশে মরণ-কালেও সে অন্যান্য গজের গণ্ডস্থল হইতে ভ্রমরবৃন্দকে উড্ডীন হইতে দেখিয়া ভ্রমরাভ্যাসের সংস্কার উদ্বোধিত ও বদ্ধমূল হওয়ায় পুনরায় ভ্রমর হইয়াই জন্মগ্রহণ করিল। পূর্ব্ব বাসনার অনুবৃত্তিবশে সেই ভ্রমর বন-লতারাজির সেবা করিয়া পুনরায় পদ্মিনীর প্রান্তে উপস্থিত হইল। বস্তুতঃ যাহারা অজ্ঞানী, তাহাদের পক্ষে বাসনার দুরভ্যাস পরিহার করা বড়ই কঠিন কথা। যাহা হউক, সেই ভ্রমর হইয়াও তাহাকে আবার হস্তীর পদতলে পতিত, পিষ্ট ও চূর্ণ হইতে হইল। তখন নিকটে কতকগুলি কলহংস ছিল, তাহাদিগকে দেখিয়া সেই ভ্রমর তদুদ্‌বোধিত বাসনাবেশে কল-হংসাকারে পরিণত হইল। সেই হংস বহুকাল ধরিয়া বহুবিধ যোনি-পরম্পরায় পরিভ্রমণ করিতে করিতে পঞ্চাশীতিবার জন্ম গ্রহণ করিল। এইরূপে সে তাহার পরবর্ত্তী জন্মেও পুনরায় হংসযোনিই প্রাপ্ত হইল এবং অন্যান্য হংসদিগের সহিত বিচরণ করিতে লাগিল। একদা সে হংসসভার মধ্যে ব্রহ্মার বাহন হংসের গুণাবলী ও আকৃতি প্রকৃতির কথা শ্রবণ করিল। সেই শ্রবণ-জনিত-জ্ঞানে তাহার হৃদয়ে 'আমিও ব্রহ্মার হংস হইব' এই প্রকার বাসনার উদয় হইল। ঐ বাসনা অল্পমাত্র হইলেও পূর্ব্ববর্ণিত ময়ূরের অণ্ডরসে ময়ূরের আকৃতির ন্যায় উহা তাহার মনে ঘনীভূত হইয়া রহিল। ব্রহ্মার বাহন হংস হইবার চিন্তা ঐ হংসের মনে পুনঃপুন আন্দোলিত হওয়ায় তদাকার সংস্কার তাহার বদ্ধমূল হইল। ক্রমে ব্যাধিভরে আক্রান্ত হইয়া কালে সেই হংস মৃত্যুগ্রস্ত হইল। বাসনার অনুশীলনায় সংস্কার বদ্ধমূল ছিল বলিয়া পূর্ব্ব ভাবনার বশ-বর্ত্তিতায় সে তখন ব্রহ্মবাহন হংস হইয়া উৎপন্ন হইল। ব্রহ্মা প্রগাঢ় বিবেকশালী; হংস ব্রহ্মলোকে থাকিয়া তাঁহার নিকট বিবেক-বৈরাগ্য-

বিষয়ক অনেক উপদেশ প্রাপ্ত হইল। পরে তত্ত্বালোচনায় তাহার প্রবোধ প্রকাশ পাইল এবং লৌকিক ভোগ্য বস্তু-নিচয়ের সারবত্তা বুদ্ধি বিগলিত হইল। তখন হংস জীবন্মুক্ত পদে বিরাজ করিতে লাগিল।

এইরূপে সেই পূর্ব্ববর্ণিত ভিক্ষু ক্রমশঃ ব্রহ্মবাহন হংস হইয়া জীবদ্দশাতেই যখন নিরতিশয় আনন্দময় মোক্ষসুখ লাভ করিল, তখন যুগান্তে দ্বিপরার্দ্ধ কালের অবসানে ব্রহ্মার সহিত বিদেহমুক্তি প্রাপ্ত হইলে তাহার আর অধিক লাভ কি হইত? কেন না, তাহার যাহা লাভ হইয়াছিল, তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ অন্য কিছুই নাই।

দ্বিসপ্ততিতমঃ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭২ ॥

ত্রিষষ্টিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! সেই হংস ব্রহ্মার আসনভূত পদ্মের নালসমীপে লীলাবিলাসের অধিকার লাভ করিয়া একদা লীলাক্রমে ব্রহ্মার সহিত রুদ্রপুরে গমনপূর্ব্বক রুদ্রদেবের সাক্ষাৎকার লাভ করিল। সেখানে রুদ্রদেবের জ্ঞানযোগ ও ঐশ্বর্য্যাদি সমুদায় গুণোৎকর্ষ দেখিয়া সেই হংসের মনে এইরূপ একটা তন্ময়ভাব উপস্থিত হইল যে, আমিই এই রুদ্র। বাস্তবিক 'আমিই রুদ্র' এই প্রকারেই তাহার বুদ্ধি স্থির হইল। এখন এরূপ একটা আশঙ্কা হইতে পারে যে, সেই হংস জীবন্মুক্ত; তাহার রুদ্রত্ব স্পৃহা কেমন করিয়া হয় এবং কিরূপেই বা সেই ভাবনার অভ্যাসে দেহ ত্যাগ করিয়া রুদ্রদেহ ধারণ সম্ভবপর হইয়া থাকে? বলা বাহুল্য, এ আশঙ্কারে হৃদয়ে স্থান দিও না। কেন না, আদর্শে যেমন বস্তুর প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হয়, তেমনি রুদ্রের যাহা প্রতিবিম্ব, তাহাই তাহার দেহে প্রতি-বিম্বিত হইল; অপিচ ইহা যে তাহার জন্মান্তর ঘটনা, তাহাও বলা যায় না। তবে ইহাকে যোগীর ন্যায় মানস দেহকল্পনায় পূর্ব্ব-দেহের পরিহার মাত্র

বলা যাইতে পারে। গন্ধ যেমন পবনের অনুসরণ করে, অথবা পুষ্প যেমন স্তবকভাব ধারণ করিয়া থাকে, তেমনি ঐ হংস রুদ্রভূত দেহ ধারণ-পূর্ব্বক পূর্ব্বতন দেহ পরিহার করিল। অনন্তর কোটি কোটি রুদ্রগণের মধ্যে যে প্রধান গাণপত্য পদ, সেই পদে সে সমারূঢ় হইল। এইরূপে সেই হংস শিবপুরোচিত প্রসিদ্ধ আচার ব্যবহার অবলম্বন করিয়া রুদ্রালয়ে মহাসুখে বিহার করিতে লাগিল। হংসের ঐ যে সারূপ্য মুক্তি ঘটিল, তাহাতে বিশ্বসংহারাদি রুদ্রধর্ম্ম না রহিলেও রুদ্র-সম্বন্ধীয় জ্ঞান ও ঐশ্বর্য্যাদি লাভ করায় তাহার তখন রুদ্র-সাম্য ঘটিল। কাজেই সেই রুদ্রাকার হংস সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান ও ঐশ্বর্য্যের বিকাশে সুপ্রসিদ্ধ রুদ্রসাম্য লাভ করত রুদ্রবুদ্ধির প্রভাবে আপনার পূর্ব্বজন্ম-বিষয়ক অশেষ ঘটনা অবলোকন করিতে লাগিল। সেই ভগবান্ রুদ্র মায়াদি নিখিল আবরণ হইতে নির্ম্মুক্ত বিজ্ঞানমূর্ত্তি; তিনি তখন বিজন দেশে উপবেশন করিয়া আপনার স্বপ্নপ্রায় অনন্ত জন্মবৃত্তান্ত স্মরণপূর্ব্বক বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং আপনাকে লক্ষ্য করিয়া সবিস্ময়ে বলিতে লাগিলেন,—অহো! এই মায়ার কি বিচিত্র স্বভাব! আর কিই বা ইহার বিশ্ববিমোহিনী শক্তি বিস্তার! এই মায়া যদিও অসত্য, তথাচ যেমন মরুস্থলীতে ভ্রান্তিলব্ধ জল, তেমনি ইহা সত্যবৎ প্রতীয়মান। অদ্য আমার মনে হইতেছে, অগ্রে আমি পারমার্থিক অবস্থায় চিৎস্বরূপেই অবস্থিত ছিলাম; অনন্তর ঐ মায়ার বশীভূত হইয়াই 'আমি বহু হইব' এইরূপ ভাবনায় চিত্তস্বরূপ প্রাপ্ত হইলাম। যেমন ঐ চিত্তস্বরূপ লাভ ঘটিল, অমনি আমার সৃষ্টি সঙ্কল্প-বৃত্তি উন্মেষিত হইল। তৎপরে এ কথাও আমার বিলক্ষণ স্মরণ আছে যে, সেই সঙ্কল্পবশেই আমি সর্ব্বসম্পন্ন হই এবং তদবস্থায় চিদংশে সর্ব্বজ্ঞ ও জড়াংশে গগনাদি বিভাগে বিভক্ত হইয়া পড়ি।

অতঃপর যদৃচ্ছাবশে ব্যষ্টি সমষ্টি স্থূল দেহে চিদাভাসরূপে প্রবেশ করি এবং স্থূল পঞ্চভূত ও সূক্ষ্ম পঞ্চভূতন্মাত্রায় যে দেহ নির্ম্মিত হয়, তাহাতে আমি তদ্গত বাসনা-বৈচিত্র্যে চিত্রপটবৎ রঞ্জিত হইয়া জীবাকারে পরিণতি প্রাপ্ত হই। ঐ জীব—আমি অনাদি অনন্তকাল হইতে জন্ম-পরম্পরা অনুভব করিয়া আসিতেছি; কোন সৃষ্টিতে বৈরাগ্য ও

সমাধি-সাধনায় নৈপুণ্য সঞ্চয় করায় আমার মতি অক্ষুব্ধ রহিয়াছে; তখন আমি ভিক্ষুরূপে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলাম। সেই ভিক্ষু পদ্মাসনাদি বন্ধন করিয়া স্বীয় দেহ স্থির করিয়াছিল, কর-চরণাদি ইন্দ্রিয়গুলিকে নিরুদ্ধ রাখিয়াছিল। সেই অবস্থায় সে, ইহাই আমার ইষ্ট এবং মনোজ্ঞ, এইরূপ বিবেচনা করিয়া স্বেচ্ছায় ও সকামভাবে বাহ্য দেবতার মানস পূজাদির লীলার স্থিরত্ব বিধানে উপক্রান্ত হয়; পরে সেই অভ্যাস-ক্রমে ঐ ভিক্ষু অন্য যে কিছু মননাদি ভাব ভুলিয়া ও পরিত্যাগ করিয়া সেই সকাম বাহ্য মানস পূজাদিই প্রতিনিয়ত অনুভব করিতে থাকে। এইরূপে অনুভূতির কারণ এই যে, চিত্তে যখন যে প্রকার চমৎকৃতি দৃঢ়-ভাবে আশ্রয় লয়, তখন তাহারই বিশেষ অভ্যুদয় হইয়া থাকে। দেখ, বসন্ত-সমাগমে বল্লী যে রস পান করিয়া হরিদ্বর্ণে রঞ্জিত ও চমৎকার-শোভায় অন্বিত হয়, নিদাঘ-সমাগমে বল্লীর সেই পূর্ব্বরস শুষ্ক হইয়া যায়, তাহার আর সেই হরিদ্বর্ণের চমৎকারিতা দেখা যায় না; সেই বাসন্তী মনোহারিণী বল্লী তখন শুষ্ক ও জীর্ণ হইয়া পড়ে। এই-রূপে দেখা যায়, চিত্তে নূতন চমৎকৃতির উদয় হইলে পূর্ব্ব-চমৎকৃতি নষ্ট হয়; চিত্তে নূতন চমৎকৃতিই নূতন ভাবের অভ্যুদয় আনয়ন করে। যাহা হউক, অনন্তর সেই ভিক্ষু বাসনার বশে জীবট নামে ব্রাহ্মণ হইয়া জন্মগ্রহণ করে। ভিক্ষুর মনে মনে নানা বাসনা বদ্ধ-মূল হইয়াছিল; সেই জন্য পিপীলিকা যেমন বিবরমধ্যে বিচরণ করে, তেমনি সেই ভিক্ষু জীবটনামধেয় দ্বিজরূপে প্রাদুর্ভূত হইয়া নানা যোনিতে পরিভ্রমণ করিল। দ্বিজ জনের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা ছিল বলিয়াই সে আপনাকে দ্বিজরূপে দেখিতে পাইয়াছিল। দেখ, ভাব ও অভাব এই উভয়ের বিপর্য্যয় ঘটনায় কার্য্য-সম্বন্ধে অভ্যাস-নৈপুণ্যাদি যোগে যাহার বলাধিক্য হয়, তাহারই সবলে প্রাদুর্ভাব ও অন্যের তিরোভাব হইয়া থাকে। সেই বিপ্রসম্বন্ধেও এই নিয়ম প্রকাশ পাইয়াছিল। জীবট হইবার পর নিরন্তর তিনি সামন্ত-পদ প্রাপ্তির চিন্তা করিতেন বলিয়া পরে তাঁহাকে সামন্ত হইতে হয়। দৃষ্টান্ত পক্ষেও দেখা যায়, বৃক্ষ যে রস আকর্ষণ করে, পরে তাহাই ফলাকারে পরিণত হইয়া থাকে। সামন্ত-

অবস্থায় রাজ্যের জন্য তিনি প্রভূত ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতেন; এই নিমিত্ত পরবর্ত্তী কালে সার্ব্বভৌম নরপতির পদে সমাসীন হন। অনন্তর সেই সম্রাট্ ধর্ম্মানুশীলনার সঙ্গে সঙ্গে কামপ্রবৃত্তির অধীন হইয়া পড়েন; এই জন্য তাঁহাকে পরে সুরনারী-জন্ম গ্রহণ করিতে হয়। অনন্তর এই জন্মে মৃগনেত্রের সৌন্দর্য্য-লালসায় রঞ্জিত মৃগাকারে জন্ম লয়েন। অহো! জীবগত বাসনার মোহ কি কেবলই দুঃখের হেতুভূত? দেখ, সেই মৃগী মনে মনে লতা-ভোজনের লালসা পোষণ করিয়াছিল, সেই জন্য অবশেষে তাহাকে লতার আকারে পরিণত হইতে হইল। ভ্রমর সেই লতার পুষ্পগুচ্ছ দংশন করিল। লতার অন্তরে জ্ঞান ছিল বলিয়া চিরপরিচিত ভ্রমর-স্বরূপের ভাবনায় ভাবনায় সে তদাকারেই পরিণত হইল এবং আপনার সেই ছিন্ন লতাবয়বের উপরিভাগেই আপনাকে ভ্রমররূপে ভ্রমণ করিতে দেখিল। কোথা হইতে হস্তী আসিয়া ঐ ভ্রমরকে পদদলিত করিল; হস্তীর পদপীড়ন অনুভব করিয়া পরে সে হস্তীর আকার ধারণ করিল। এইরূপে পুনরপি অলি হইল; অনন্তর ক্রমে হংসযোনি পর্য্যন্ত নবতি যোনি যাবৎ বারম্বার এইরূপেই সে সংসার সঙ্কটে পড়িয়া পরিভ্রমণ করিতে লাগিল।

ঐ যে ভিক্ষুর কথা বলিয়া আসিলাম, ঐ সেই ভিক্ষুই আমি। আমিই এইরূপে স্বীয় ভ্রমবশতঃ এই অনন্ত সংসার পরম্পরায় বারম্বার ভ্রমণ করিতে করিতে এক্ষণে ইহার অন্ত সীমায় উপস্থিত হইয়া রুদ্র-মূর্ত্তিতে অবস্থান করিতেছি। এই যে বিবিধ বিচিত্র সংসার বনভূমি, ইহা অসত্য হইলেও সত্যবৎ প্রতীয়মান। আমি এই সংসার-বনেই কতবার না ভ্রমণ করিলাম! আমি কোন সৃষ্টিতে জীবটরূপে সংসারে ভ্রমণ করিয়াছি, কোন সৃষ্টিতে তদপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণরূপে এবং কোন সৃষ্টিতে বা বসুন্ধরার অধিপতিরূপে এ সংসারে আমাকে ভ্রমণ করিতে হইয়াছে। এই ত সেই আমি! আমি কখন পদ্মবনে হংস হইয়াছি, কখন বিন্ধ্য-কচ্ছে মত্ত মাতঙ্গ হইয়াছি, এবং কখন বা হরিণস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছি; এইরূপে এতকাল যাবৎ কত প্রকার অবস্থায়ই না পতিত হইয়াছি। সেই আদি সৃষ্টিকালে আমি সেই চিদেকরস পরম পদ হইতে পরিচ্যুত হইয়াছি। সেই হইতে অদ্য পর্য্যন্ত এ সংসারে আমার কতই না কাল কাটিয়া

গিয়াছে। কত অনন্ত সহস্র বর্ষ, কত অনন্ত চতুর্যুগ, কত অনন্ত দিন-যান, কত অসংখ্য ঋতু ও কত কত লোক-চরিত্র যে অতীত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা হয় না। ভিক্ষু দেহে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিবার প্রধান উপায় শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনাদির অভ্যাস; সেই অভ্যাস সুদৃঢ়ভাবে থাকিলেও প্রমাদবশে তাহা হইতে স্খলিত হওয়ায় বারম্বার অশেষ যোনিপরম্পরা পরিভ্রমণ করিয়া পরিশেষে ব্রহ্মার বাহন হংস হইয়াছিলাম। সেই অবস্থায় আমি রুদ্রসঙ্গ লাভ করি। সেই সঙ্গই আমার সাধুসঙ্গ হইল। সেই আমার পূর্ব্বতন অভ্যাস এখন তত্ত্বজ্ঞানে পরিণত হইল। জীব যে বিষয়ে দৃঢ় অভ্যাস করে, শত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়াও তাহা আসিয়া উপস্থিত হয়। অধিক কি মধ্যে সহস্র জন্ম ব্যবধান হইলেও সেই পূর্ব্বাভ্যাস আসিয়া জীবকে অনুসরণ করিতে থাকে। যদি সাধুসঙ্গ ঘটে, তাহা হইলে জীবের অশুভ চিন্তা নিবৃত্তি পায়। যে পুরুষ বাসনারাশি বর্জ্জন করিবার অভিলাষী, তাহার প্রাক্তন সাধু বাসনার অভ্যাস কালান্তরে সাধুসঙ্গ-লাভে উদয়োন্মুখ হইলেও বর্ত্তমানে উদ্যমের অপেক্ষা করিয়া থাকে। পুরুষের চেষ্টা ব্যতীত কেবলমাত্র সাধুসঙ্গ লাভ হইলেই সম্পূর্ণ সাধু বাসনার উদয় হয় না। পূর্ব্বতন সংস্কারবশে অশুভ বাসনার ন্যায় শুভ বাসনা প্রকাশ পাইলে কেবল তাহারই বলে পুরুষকার বিনাই যে অশুভ বাসনার নিবৃত্তি ঘটিবে, তাহা বলা যায় না। কেন না, তাদৃশ পুরুষ-প্রযত্ন সহসা দুর্ব্বাসনার ক্ষয় সাধনে সক্ষম নহে; বহু জন্ম-জন্মান্তরের পুরুষকার দ্বারা সদ্বাসনার যদি দৃঢ়তা জন্মে, তবেই তাহা দুর্ব্বাসনা ক্ষয় করিতে সক্ষম। নিরন্তর অভ্যাসের গুণ এই যে, যাহা এ জন্মে বা অন্য জন্মে অভ্যাস করা হয়, তাহা জাগ্রদবস্থায় মিথ্যা হইলেও সত্যস্বরূপে অনুভবগম্য হইয়া থাকে। ইহার দৃষ্টান্ত পক্ষে উল্লেখ করা যায়, মিথ্যা দেবতাদির উপাসনা প্রযত্নও জাগ্রৎ স্বপ্নাবস্থায় সত্যানুভব-যোগ্য দেবভাবাদির ফলদানে সমর্থ হইয়া থাকে। সুতরাং এ কথা নিশ্চয়ই যে, যদি পরমার্থ বিষয়ে শ্রবণ, মনন প্রভৃতি প্রযত্ন প্রকাশ করা যায়, তাহা হইলে যাহা প্রমাণগম্য পরমার্থ সত্যস্বভাব, তাহারই প্রাপ্তি পক্ষে উহা যে সাহায্যকারী হইবে, সে বিষয়ে আর বলিবার কি আছে? যাহা

দেবদেহেরও ভোগনিমিত্তক ক্রিয়া সঙ্ঘটন করায়, যাহা হইতে দেব-দেহ-লাভের ও দেব-দেহের ভোগাদি ক্রিয়া সাধিত হয়, তথাবিধ অনাত্ম-বিষয়ক শাস্ত্রীয় ভাবনাও সুখ-দুঃখের নিমিত্ত হইয়া সমুদিত হইতে থাকে। অতএব ঐরূপ অনাত্ম-চিন্তারূপ সর্ব্ববিধ ভাবনার উচ্ছেদ-সাধনই আত্যন্তিক অনর্থ-জয়। অঙ্কুর যেমন অলীক বিস্তারময় স্বীয় গুল্মভাব লাভ করে, তেমনি ঐ ভাবনাই স্বীয় আত্মাকে অসত্য দেহাকারে দর্শন করে। ফল কথা, ভাবনাই দেহাকারে পরিণত হইয়া থাকে, বাস্তব পক্ষে দেহ বলিয়া কোন কিছুই নাই। উহা কেবল ভাবনা মাত্র। ঐ ভাবনারে বা অনাত্মচিন্তাকে যদি বিশেষ করিয়া বিচার করা হয়, তাহা হইলে এ সংসারে আর কোন বস্তুরই অবশেষ থাকিবার নহে। ফল কথা এই যে, তখন, সর্ব্ববস্তুরই অনস্তিত্ব ঘটিয়া থাকে। ঐ যে ভাবনার উল্লেখ করিতেছি, উহার উচ্ছেদ সাধনও কৃচ্ছসাধ্য বা অসাধ্য নহে। কেন না, ভাবনা আপনা হইতেই নিত্য অস্তিত্ব-হীন। সুতরাং আমাদের সেই ভাবনা-ভ্রম নাই হউক, এই আকাশবর্ণসন্নিভ জগদাকার ভ্রম আমাদের প্রক্ষালিত হওয়ায় তাহার কেবল অসম্বেদনই বিশেষতঃ বিভাত হউক, আর জ্ঞানের অভাব নাই হউক, যদি তত্ত্বজ্ঞানবলে উহাকে বাধিত করিতে পারা যায়, তাহা হইলে রুদ্ধশক্তি সর্পের ন্যায় ইহার আর কোন শক্তিই থাকিবার নহে। কেন না, তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলে এই প্রকার বোধ হয় যে, এই যে অধিষ্ঠানস্বভাবা অসন্ময়ী জগদাকার-ভাবনা, ইহা কেবল কৌতুকের নিমিত্তই প্রবর্ত্তিত এবং ইহা মাত্রে প্রাতিভাসিক সত্তাতেই অবস্থিত। সুতরাং যাহা কেবল কৌতুকার্থই বিরাজিত, তাহা আর কিছুই করিতে সমর্থ নহে। অতএব বলা যায়, যদি তত্ত্বজ্ঞান থাকে, তবে ঐ ভাবনায় কিঞ্চিন্মাত্রও অনিষ্ট-সম্ভাবনা নাই। সুতরাং দেখা যায়, সকলই যখন কৌতুকের জন্য, তখন আমিও কৌতুকের নিমিত্তই উত্থিত হইয়া আমার সেই পূর্ব্ব সংসার সকল দর্শন করিতে থাকি, এবং সম্যক্ আলোক দান করিয়া সেই সেই উপাধি হইতে বিবিক্ত আত্মাকে একীভূত করিয়া লই। ফলে, আমি স্বস্বরূপেই অবস্থান করিতে থাকি।

সেই রুদ্র এইরূপ চিন্তা করিলেন,—করিয়া যেখানে সেই ভিক্ষু

সুপ্তাবস্থায় শবাকারে পতিত ছিলেন, সেই সৃষ্টির উদ্দেশে গমন করিলেন এবং সেই ভিক্ষুকে জাগরিত করিয়া স্বীয় চিত্তের অংশস্বরূপ তাহার চিত্তে নিজাংশ-রূপ চিদাভাস তত্ত্বজ্ঞ জীবকে যোজিত করিয়া লইলেন। তখন সেই ভিক্ষু আপনার সমস্ত ভ্রম স্মরণ করিলেন। জ্ঞানের আবির্ভাব নিবন্ধন বিস্ময়ের বিষয় না থাকিলেও সেই ভিক্ষু স্বীয় বহু জন্মজন্মান্তরীয় রুদ্র-জীবটাদি দেহ লাভ অতি অল্পকালের মধ্যেই হইল দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়া গেলেন। অতঃপর সেই রুদ্র এবং ভিক্ষু উভয়ে উত্থিত হইয়া চিদাকাশের কোন এক কোণগত ব্রহ্মাণ্ডান্তরে প্রয়াণ করিলেন। তখন তাঁহারা উভয়েই সেখানে প্রবেশপূর্ব্বক ভূর্লোকে গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং পরে সেই ভূর্লোকের অভ্যন্তরে জীবট যে দেশে যে গৃহ অধিকৃত করিয়াছিল, সেই দেশ ও দেশান্তর্গত সেই গৃহে তাঁহারা প্রবেশপূর্ব্বক দেখিলেন—জীবটের করে তরবারি আছে, জীবট সংজ্ঞাহীন ও শবের ন্যায় সুপ্ত অবস্থায় পতিত রহিয়াছেন। তখন সেই জীবটের সংসার-প্রদেশে সেই দুই রুদ্র ও ভিক্ষু নিজেদের দেহ, জীবট-বোধনের অভিপ্রায় এবং রুদ্রের কোটি সূর্য্য-সদৃশ প্রভা স্ব স্ব অন্তর্দ্ধান-শক্তিবলে গোপনে রাখিলেন। অনন্তর তাঁহারা সেই জীবটের চিত্তে আপনাদের চিদাভাসরূপ জীব-চেতনার যোজনা করিয়া দিলেন। অন্তরে তাঁহারা একরূপ হইলেও বাহিরে তখন তিনরূপে বিরাজ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের অন্তরে বোধ-বিকাশ ছিল, তথাচ বাহিরে তাঁহারা অজ্ঞানবৎ বিচরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের বিস্ময়ের লেশ মাত্র ছিল না; তথাচ বাহিরে তাঁহারা বিস্ময়ের ভাব ধারণ করিলেন এবং কিঞ্চিৎকাল চিত্রপুত্তলির ন্যায় মৌনভাব অবলম্বন করিয়া রহিলেন। অনন্তর ভিক্ষু, রুদ্র ও জীবট এই তিন জনে মিলিয়া চিদাকাশস্থিত জীবট-চিত্তের পরিণামস্বরূপ বিপ্র-সংসারে প্রবেশ করিলেন। তাঁহারা সেখানে গিয়া ক্রমে ক্রমে সেই ভূর্লোকস্থ ব্রাহ্মণাধিষ্ঠিত দ্বীপে উপস্থিত হইয়া মণ্ডল-মধ্যগত দেশে ও সেই দেশাভ্যন্তরস্থ ব্রাহ্মণের অধিকৃত গ্রামে এবং তদন্তর্গত ব্রাহ্মণের বাসগৃহে ক্রমশঃ উপনীত হইলেন। তাঁহারা তথায় গিয়া দেখিলেন—সেই ব্রাহ্মণ স্বীয় পোষ্য পরিজনে পরিবৃত হইয়া নিদ্রিত রহিয়াছেন।

তাঁহার পত্নী স্বীয় বহির্গত প্রাণের ন্যায় প্রিয় পতির কণ্ঠ আলিঙ্গন করিয়া আছেন। তদ্দর্শনে তাঁহারা তৎক্ষণাৎ সেই ব্রাহ্মণের চিত্তে চেতনার সঞ্চার করিয়া দিলেন। তাঁহাদের বাস্তব বিস্ময়ভাব না থাকিলেও সেকালে তাঁহারা বিস্ময়ের ভাব প্রকাশ করিলেন।

অনন্তর তাঁহারা যাহা চিদাকাশে বিরাজিত, চিত্তাকারে বিবর্ত্তিত ও চিতির পরিণামভূত, তথাবিধ সামন্ত-সংসারে প্রবেশ করিলেন। সেই সামন্ত-রাজের সংসার বড়ই সুন্দর। সেখানে তদধিষ্ঠিত ভুবনে, দ্বীপে ও মণ্ডলে ক্রমশঃ তাঁহারা উপনীত হইয়া দেখিলেন—মদমত্ত সামন্ত রাজা পর্য্যঙ্ক-পঙ্কজে সুপ্ত আছেন। তদীয় অঙ্গকান্তি কনকের ন্যায় সমুজ্জ্বল দেখা যাইতেছে। কোন কনককান্তি কামিনীর কুচকোটরে তাঁহার দেহ নিলীন আছে। তদ্দর্শনে তাঁহাদের মনে হইল, মধুপীর সহিত মধুপ যেন কোমল কমলকোষে সুপ্ত হইয়া রহিয়াছে; মঞ্জরীমালায় পরিশোভিত দ্রুমের ন্যায় সেই সামন্তরাজ অন্যান্য কান্তা-জনে পরিবৃত হইয়া রহিয়াছেন; তদ্দর্শনে তাঁহাদের মনে হইল,—সমন্তাৎ রত্নখচিত সুবর্ণ যেন দীপমালার মধ্যে থাকিয়া বিরাজ করিতেছে। রুদ্রদেব তৎক্ষণাৎ সেই সামন্তের চিত্তে চৈতন্য যোজিত করিলেন। তৎকালে তাঁহারা বহু হইলেও একীভাব প্রাপ্ত হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। বাহিরে তাঁহাদের বিস্ময়ের ভাব দেখা গেল; কিন্তু অন্তরে তাঁহারা বিস্ময়-বিরহিত-ভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

অতঃপর তাঁহারা আতিবাহিক দেহে সেই চক্রবর্ত্তী রাজ-সংসারে উপনীত হইলেন। সেখানে গিয়া তাঁহাকেও প্রবুদ্ধ করিয়া লইলেন। এইরূপে আতিবাহিক দেহে তাঁহারা অন্যান্য সংসারমধ্যে পরিভ্রমণ-পূর্ব্বক যে-যেখানে যে যে নিদ্রিতাবস্থায় ছিল, সেই সেইখানে গিয়া সেই সেই ব্যক্তিকে প্রবোধিত করিলেন। যাহারা মৃত্যুমুখে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহাদিগকে পুনরায় উজ্জীবিত করিয়া লইলেন। অতঃপর সকলেই তাঁহারা ব্রহ্মার বাহন হংসরূপ চিত্ত-পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বশেষে রুদ্রভাব লাভ করিলেন। তাঁহাদের চিত্তে চৈতন্য সংক্রামিত ও জ্ঞানৈশ্বর্য্য উপগত হইয়াছিল; এই জন্য তাঁহাদের সমস্ত দেহ শত

রুদ্রমূর্ত্তিতে পরিণত হইয়া বিরাজ করিতে লাগিল। ফল কথা, উল্লিখিতরূপে এক শত জীব ঐ ভাবে রুদ্রভাব লাভ করায় একশত রুদ্র বলিয়া গণ্য হইল। সেই সেই কল্পিত দেহ রুদ্র এবং সেই সেই রুদ্রের সংখ্যা একশত বলিয়া উল্লিখিত। মুক্ত চেতন রুদ্র একই অর্থাৎ সম্বিৎস্বরূপে এক বা অভিন্ন; পরন্তু তিনি বিভিন্ন দেহে বিভিন্ন চেষ্টায় বিলসিত। পরমেশ্বরের স্বরূপ এই প্রকার; তিনি এক অথচ ভিন্ন ভিন্ন রূপ কল্পনায় বহু। ফল কথা এই, সকল দৃশ্যই পরমেশ্বরের কল্পিত রূপ। পরমেশ রুদ্রদেহ সম্বিন্ময়; তিনি একরূপ হইয়াও বিভিন্ন দেহে বিভিন্ন রূপ কল্পনার নেতা। এই জন্যই তাঁহার শত রুদ্রমূর্ত্তির কল্পনা। শ্রুতিতে এই রুদ্রশতকের উল্লেখ আছে। এই সকল রুদ্রমূর্ত্তি নিরাবরণ ও চিন্ময়স্বরূপ; উহারাই এই প্রাতিভাসিক সংসারের আধার হইয়া সর্ব্বজগতের অন্তর্য্যামিরূপে বিরাজিত।

হে রাঘব! ভিক্ষুরুদ্রের কল্পিত শত জগতের মধ্যে যাহা এক্ষণে তোমার আমার অনুভবে অবস্থিত রহিয়াছে, এই জগৎ একাদশ বা ভ্রমর-রুদ্রের সংসার। ভ্রমর অর্থে—যে সংসার ভ্রমর হইয়া অনুভবগম্য হইয়াছে, এ সংসার—সেই সংসার। এই ভিক্ষুর ন্যায় যে জীবের অভিমুখে যে সংসার আবির্ভূত হয়, সে জীব সেই সংসার অনুভব করে; পরন্তু যাহারা তন্মধ্যগত অজ্ঞ জীব, তাহারা ঐ সংসারানুভবের মর্ম্ম বুঝিতে সক্ষম হয় না। অনভিজ্ঞ জীবগণ পরস্পর সর্ব্ব জীবের সম্মিলন দর্শন করিতে পারে না; কিন্তু যাঁহাদের মনে তত্ত্ববোধের উদয় হয়, তাঁহারাই সাগরে তরঙ্গরাজির একাকারতার ন্যায় সর্ব্ব জীবের একাকারত্ব অনুভব করিয়া থাকেন। অপ্রবুদ্ধ জীবগণ জগতের মাত্র স্থূলত্বগ্রাহী; এই স্থূলত্ব গ্রহণেই তাহারা তৃপ্তিশালী। অতএব তাহারা জড়াকার লোষ্ট্রখণ্ডের ন্যায়ই বর্ত্তমান। স্থূলতা দর্শনের অপগম হইলেই পরস্পর মিলন ঘটে। যেমন দ্রবত্ব বশতঃ জল ও তরঙ্গ পরস্পর মিলিত হয়, তেমনি প্রবুদ্ধ জীবনিবহও চৈতন্য-শক্তিযোগেই পরস্পর মিলন প্রাপ্ত হইয়া সেই চৈতন্য শক্তিরই মিলন দর্শন করে। এই উৎপন্ন সংসারে এই যে প্রত্যেকতঃ ভিন্ন ভিন্ন জীব-নিবহ দেখা যাইতেছে, ইহা প্রকৃত পক্ষে অসত্য হইলেও চিন্ময় ব্রহ্মের

সর্ব্বগামিত্ব প্রযুক্ত সত্যবৎ প্রতীত হয়; সুতরাং বলা যায়, জীব যখন সকল জীবের তত্ত্বস্বরূপ ব্রহ্ম সহ ঐক্যলাভে সক্ষম হয়, অর্থাৎ যখন সে বুঝিতে পারিবে, ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই নাই, সকলই তাঁহার কল্পিত রূপ এবং তিনিই জীব-পদবাচ্য, তখনই জীবের পরস্পর মিলন সংঘটিত হয়। বুঝিয়া দেখ, ভূমির যে যেখানেই খনন করা হয়, সেই সেইখানেই মৃত্তিকাপনয়নের পর অবশেষে যেমন সেই এক সর্ব্বব্যাপী আকাশই প্রকাশ পায়, তেমনি তত্ত্বদর্শন দ্বারা সর্ব্ব প্রপঞ্চ হইতে সত্যতা বুদ্ধি অপনয়ন কর, দেখিবে—সেই আকাশস্বরূপ চিদ্‌ব্রহ্মই বর্ত্তমান; তিনি ব্যতীত আর কিছুই নাই। দেখিবে—এই যে কিছু মিথ্যা প্রপঞ্চ, সকলই সেই চিন্মাত্রে পর্য্যবসিত। এই যে বিভাগময় প্রপঞ্চ, ইহাতে যেমন ভূতপঞ্চকের সত্তা অনুভূত হয়, তেমনি সেই চিদ্‌ব্রহ্মের সত্তাও সর্ব্বভূতে আত্মস্বরূপে অবস্থিত বলিয়া অনুভব কর। দেখ, শিল্পী ব্যক্তি কোন দারু কিম্বা শিলাস্তম্ভে নর-গজ-তুরগাদির প্রতিমূর্ত্তি খোদিত করিতে গিয়া অনুরূপ অস্ত্রের সাহায্যে তাহাতে রন্ধ্রাবকাশ করিয়া লয় এবং তন্মধ্যে নরাদির আকার-পরিচ্ছেদ বিভাগ করে; অবশেষে সেই দারু কিম্বা শিলাস্তম্ভই বিবিধ বিচিত্র শালভঞ্জিকারূপে প্রতিভাত হয়। পরন্তু বাস্তব পক্ষে সেই একই দারু বা শিলাস্তম্ভই বিরাজ করিতে থাকে। অথচ তাহাতে শালভঞ্জিকার অঙ্গসৌষ্ঠব ও বহু বিচিত্রাকৃতি প্রভৃতি স্পষ্টই উপলব্ধ হয়। এইরূপে দেখিলে দেখা যাইবে, এই যে বিশ্ব-বৈচিত্র্য, ইহা সেই একাত্মা চিদ্‌ব্রহ্মেই বিরাজ করিতেছে। উল্লিখিত দারু শিল্পাদিগত অবকাশ যেমন অস্ত্রাদির সাহায্যে বিরচিত হয়, তেমনি ঐ নির্ব্বিষয় বিশুদ্ধ ব্রহ্মে যে জগদাদিরূপে জ্ঞান, তাহাই জগতের নিদান; তাহা দ্বারাই এ জগৎ প্রকাশমান হয়। বস্তুতঃ বিদেকরস ব্রহ্মে যে জগদাকার জড়তা প্রতীত হইয়া থাকে, মিথ্যাজ্ঞান ব্যতীত তাহার কারণান্তর নাই।

হে রঘুনন্দন! ঐ প্রকার মিথ্যাজ্ঞানই বন্ধন আর ঐরূপ জ্ঞানের যে অপগম, তাহারই নাম মোক্ষ। এক্ষণে তোমার যাহা অভিপ্রেত হয়, করিতে পার। দেখ, কি সৃষ্টি, কি অসৃষ্টি, কি বন্ধন, কি মোচন,

সকলই ঐ প্রকার জ্ঞান ও অজ্ঞানময়; ফল কথা, সৃষ্টি বা বন্ধন ঐরূপ জ্ঞানেই প্রকাশমান আর ঐ জ্ঞানের অভাবেই সৃষ্টি বা বন্ধনের অভাব। স্থূল কথায় বলা যায়, মিথ্যা জ্ঞান ঘুচিয়া গেলেই জন্ম-বন্ধনও নিরস্ত হয়। বন্ধন ও মোক্ষ এতদুভয়ের যাহা সাক্ষী, তাহা এক—অভিন্ন। এক্ষণে ঐ উভয়ের মধ্যে যাহাতে তোমার রুচি, তাহাই তুমি স্থিরভাবে অবলম্বন কর। দেখ, অসম্বেদন মাত্রেই যাহা থাকে না, তাহার নাশের জন্য আবার আয়াস কিসের? কেবল মাত্র তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেই যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার প্রাপ্তিতেই বা বিলম্ব কি? তাহা তো হস্তগত বলিয়াই বুঝা উচিত। ফলে মিথ্যাজ্ঞানেই জগতের প্রকাশ; সুতরাং ঐ জ্ঞানমাত্রই যখন উহার স্বরূপ, তখন ঐ জ্ঞানাভাবেই উহার নাশ। আর ঐ জগদ্‌জ্ঞানের যাহা সাক্ষী চৈতন্য, উহা তো সর্ব্বদাই প্রাপ্য, ইহা বুঝিয়া যাহা ইষ্ট পথ, অবলম্বন করিতে পার। জলে যেমন কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লহরী দেখা যায়, তেমনি ঐ চিৎতত্ত্বেই এই জগৎ দর্শন হইয়া থাকে। হে রাম! উক্ত দৃষ্টান্ত ও দার্ষ্টান্তিকের মধ্যে পার্থক্য এই যে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লহরীতে ও জলে দেশ, কাল ও ক্রিয়া প্রভৃতির একত্ব আছে; কিন্তু চিৎতত্ত্বে সে সকল নাই। বিশদ কথা এই যে, জগৎ নাই ভাবিলেই জগতের অস্তিত্ব থাকে না—রজ্জুভুজঙ্গের ন্যায় মিথ্যা হইয়া যায়। ব্রহ্ম—স্বপ্রকাশ, আত্মরূপ চৈতন্যমাত্র; তিনিই অবিদ্যার আবরণে ঈষৎ প্রকাশিতবৎ হইয়া জগৎস্বরূপ ধারণ করিয়া ভাবান্তর গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া প্রতীয়মান হন। চিদাকার পরমাত্মার পারমার্থিক স্বরূপ—জ্ঞান; পরন্তু উহা জড় নহে। এই ত্রিজগৎ ভেদ-ক্লিষ্ট; শ্রুতি-প্রদর্শিত উপায় যোগে ইহার উপসংহার করিয়া লও। ইহা উপসংহৃত হইলে শ্রুতি-দর্শিত প্রকারে বাঙ্মাত্রেই অবস্থিত হইবে। এই বাঙ্মাত্রও ব্রহ্মে নাই। তিনি বাঙ্মাত্রেরও অতীত পরম শিব।

এইরূপে আত্মচৈতন্য ও জগৎ এই দুই উক্তি শব্দতঃ বা অর্থতঃ ভিন্ন নহে; ইহারা কখনই দুই হইতে পারে না। দেখ, যেমন জলের তরঙ্গ একটা শব্দ আর জল একটা শব্দ, এই দুই পৃথক্ শব্দের অর্থগত বস্তুতঃ ভেদ আছে বলিয়া নির্দ্দেশ করা অনুচিত, তেমনি জগৎ ও চৈতন্য,

এই দুই শব্দকে দুই পৃথক্ বস্তু বলিয়া ব্যবহার করাও অবৈধ। কেন না, ঐরূপ দ্বৈত ভেদ কদাচ নাই; কেবল অজ্ঞতাবশেই ঐ প্রকার দ্বৈত-ভেদের উপলব্ধি হইয়া থাকে। যখন জ্ঞানোদয় হয়, তখন আর ঐ দ্বৈত-ভেদাদি ব্যবহার কোনরূপে সঙ্গত হইতে পারে কি?

ত্রিষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬৩ ॥

চতুঃষষ্টিতম সর্গ।

রামচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন—হে মুনিবর! আপনি বলিতেছিলেন—জীবট ব্রাহ্মণাদি ও হংস প্রভৃতি সেই পূর্ব্ববর্ণিত ভিক্ষুর স্বপ্ন-শরীর। এক্ষণে বলুন, ভিক্ষুর সেই সকল স্বপ্ন-শরীরের অতঃপর কি অবস্থা ঘটিয়াছিল? অর্থাৎ উহারা কি সাধারণ স্বাপ্ন-শরীরের ন্যায় মিথ্যাভূত হইয়াছিল? অথবা কোনরূপে ব্যবহারযোগ্য হইয়াছিল?

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! ভিক্ষুর সেই স্বাপ্ন শরীর সমস্তই প্রবোধ প্রাপ্ত হইয়া রুদ্রে সহ সম্মিলিত হইয়াছিল। অনন্তর কৌতুকক্রমে সেই সকল রুদ্রাংশ রুদ্রের প্রেরণায় স্ব স্ব মায়াময় পূর্ব্বাপর সংসার সকল দর্শন করিয়া কৃতকৃত্য ও সুখসম্পন্ন হইয়াছিল। রুদ্র তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন—তোমরা নিজ নিজ স্থানে প্রস্থান কর এবং সেখানে স্ব স্ব কলত্রাদি সহ কিয়ৎকাল অবস্থান করিয়া ভোগবাসনা চরিতার্থ করিতে থাক। পরে মৎসকাশে আগমন করিবে। এখানে আসিয়া আমার অংশজাত গণস্বরূপ হইয়া মদীয় পুরীর ভূষণরূপে তোমরা বিরাজ করিতে থাকিবে। অনন্তর যখন মহা-প্রলয়-ঘটনায় এই জগদাভাস ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে, তখন আমরা সকলেই পরমপদে অবস্থান করিব।

ভগবান্ রুদ্র এই কথা কহিয়া সেই স্থান হইতে অন্তর্হিত হইলেন এবং সমস্ত রুদ্রের অন্তর্যামী সংসারদর্শী সাক্ষি-চৈতন্যরূপে তদন্তর্গত

জীবটাদি প্রত্যেক সংসারে গমন করিলেন। তৎকালে সেই সেই জীবট ব্রাহ্মণাদিও স্বস্বপদ প্রাপ্ত হইলেন। সেখানে তাঁহারা স্ব স্ব পুত্র-কলত্রাদির সহিত সংসারসুখ ভোগ করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিয়ৎকাল সুখ ভোগ করিবার পর দেহান্তে রুদ্রলোকে উপগত হইয়া তাঁহারা উত্তম রুদ্রগণমধ্যে সন্নিবিষ্ট হইবেন। ভাবী কালে কখন কখন তাঁহাদিগকে ব্যোমপ্রদেশে তারকাকারে দেখা যাইবে।

রামচন্দ্র কহিলেন,—সেই জীবট ব্রাহ্মণাদি সকলেই ভিক্ষুর সঙ্কল্প-স্বরূপ; তাঁহারা কিরূপে সত্যভাব প্রাপ্ত হইলেন? বস্তুতঃ সঙ্কল্প-বিষয়ের সত্যতা কোথায় থাকে?

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! অধিষ্ঠান চিদংশে যে সাঙ্কল্পিক সত্যতা, তাহাকে তুমি বিবেক-সাহায্যে পরিত্যাগ কর। অর্থাৎ সঙ্কল্পাংশে সত্যতা না থাকিলেও তাহার আশ্রয়ের সত্যতা বিদ্যমান। সঙ্কল্পের আশ্রয় বা অধিষ্ঠান চিদাত্মা। এ তত্ত্ব তুমি বিবেকবলে বিদিত হও। দেখ, সৎ ও অসৎসম্বলিত সাঙ্কল্পিক বিষয়ে যে সদতিরিক্ত রূপ, পূর্ব্বে বা উত্তরকালে তাহার অস্তিত্বই অসম্ভব। তবে যে অস্তিত্বের অভ্যুপগম হয়, তাহার কারণ সেই সর্ব্বাত্মময় ব্রহ্মপদ বৈ আর কিছুই নয়। ঐ অধিষ্ঠানস্বরূপ ব্রহ্মপদের সত্তা নিমিত্তই উহার অস্তিত্ব অভ্যুপগত হয় এবং তাহাতেই ভোক্তার অদৃষ্টোদ্‌বোধিত সাঙ্কল্পিক বিষয়ের ক্রিয়া-যোগ্যতা পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। স্বপ্নে কিম্বা মানস সঙ্কল্পনায় যাহা দেখা যায়, সে সকল সর্ব্ব-কালেই সেই অধিষ্ঠানস্বরূপ সৎ-চিৎ ব্রহ্মাত্মক-ভাবেই দেশ-কালাত্মকরূপে যেন দেশান্তরে প্রয়াণ করিয়াই তদধিষ্ঠানে বিরাজমান। অর্থাৎ চিদাত্মা সর্ব্বাত্মক ও সর্ব্বব্যাপী; তিনি সঙ্কল্পবলে সর্ব্বত্র সকল আকারে বিরাজ করিয়া থাকেন। কাজেই স্বপ্নদৃষ্ট ও সঙ্কল্প-কল্পিত পদার্থ 'অস্তি' বলিয়া ব্যবহার-যোগ্য হয়। আত্মা ও মন উভয়ই সর্ব্বগামী হইলেও উপদেশকাদি কারণ-কলাপ ব্যতীত এক দেশবাসীরা যেমন দেশান্তর লাভে সমর্থ হয় না, তেমনি স্বপ্নও জাগ্রৎ ও সুষুপ্তির অন্তরাল ভিন্ন অন্য কোন অবস্থায় লব্ধ হইবার নহে। ফলে কোন লোককে স্বীয় স্থান হইতে কোন অজ্ঞাত স্থানে যাইতে হইলে যেমন একজন পথোপদেশক, মনের স্থৈর্য্য ও চক্ষুরাদি

ইন্দ্রিয় বর্গের নৈপুণ্য বা কার্য্যক্ষমত্ব অপেক্ষা করে, তেমনি জীবের যাহা স্বপ্নাবস্থা, তাহা লাভ করিতে হইলেও জাগ্রৎ ও সুষুপ্তি অবস্থার অপেক্ষা করিয়া থাকে। জাগ্রৎ ও সুষুপ্তি অবস্থা ব্যতীত জীবের স্বপ্নাবস্থা কস্মিন্‌কালেও উপস্থিত হইতে পারে না। ফল কথা এই যে, চিৎকোষে সকল পদার্থই আছে, থাকিলেও দর্শনের উদ্বোধ ব্যতীত দৃষ্টিগোচর হয় না। যখন উহা উদ্বোধিত হয়, তখনই তাহা দেখা গিয়া থাকে।

হে রাম! চিৎকোষ—মায়ায় সকল বাসনাই বিদ্যমান; সুতরাং যখন যে বাসনার উদ্রেক হয়, তখন সেই বাসনার পুষ্টি হওয়ায় চিৎ সেই পদার্থই দর্শন করেন। এক্ষণে যে দশায় সঙ্কল্প ও স্বপ্ন এককালে দেখা যায়, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। অভ্যাসযোগের পরিপাক-দশাই সেই দশা। অভ্যাস যোগ ব্যতীত পরমপদ প্রাপ্তি বা ঐ স্বপ্ন-সঙ্কল্পের যুগপৎ দৃষ্টি ঘটিবার নহে। যাঁহারা ঈশ্বর, যোগ-বিজ্ঞানের ফল যাঁহাদের স্বতঃসিদ্ধ, তাঁহাদের সঙ্কল্পিত বিষয় লাভে তাৎকালিক অভ্যাসযোগের অপেক্ষা নাই। মায়াপটে যে সকল বিদ্যমান, শঙ্করাদি ঈশ্বরেরাই তৎ-সমস্ত প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। অন্যের তাহা দেখিবার যোগ্যতা নাই; কেন না, একাগ্রতাই যোগ নামে নিরূপিত। সেই যোগের সুদৃঢ় অভ্যাস ব্যতীত সত্যসঙ্কল্প হইতে পারা যায় না। আমাদের সম্মুখে অসংখ্য বস্তু বিদ্যমান অথচ আমরা সে সকল দেখিতে পাই না; কিন্তু মন গিয়া যে পদার্থে আসক্ত হয়, তাহাই আমরা দর্শন করি। মনের যাহাতে প্রসক্তি নাই, তাহা আমরা দেখি না। পণ্ডিতবর্গের অভিমত এই যে, যদি একাগ্র বা তন্নিষ্ঠ হয়, তবে সমুদায় অভীষ্টই সিদ্ধ হইয়া থাকে। দেখ, দক্ষিণ দিকে যাইতে যাইতে কে কবে উত্তরদিকে যাইয়া থাকে? সঙ্কল্পিত পদার্থের দৃঢ় অভ্যাসে সঙ্কল্পিত পদার্থই লাভ করা যায়। যাহা অসঙ্কল্পিত, তাহা তাহাতে লব্ধ হয় না। ফলে একনিষ্ঠাই সঙ্কল্পিত বিষয় লাভের একমাত্র উপায়। এইরূপ দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝিতে হইবে, যাহারা এইরূপ একাগ্র ভাব অবলম্বন করে যে, 'আমি অমুক হইব, অমুক বিষয় লাভ করিব বা অমুক কার্য্য সিদ্ধি করিব' তাহারা ভাবী কালে তাহাই হয়,

তাহাই লাভ করে এবং সেই কার্য্যই সিদ্ধ করিয়া থাকে। যাহারা ঐ প্রকার একাগ্র হইতে পারে না, তাহারা কিছুই হয় না বা কিছুই লাভ করিতে পারে না। পূর্ব্বে যে ভিক্ষু-জীবের কথা বলা হইয়াছে, সেই ভিক্ষু ঐ প্রকার একাগ্রতা অবলম্বন করিয়াছিলেন; তাই তিনি রুদ্রত্ব, সর্ব্বাত্মতা ও রুদ্রদেবের প্রসিদ্ধ সর্ব্বজ্ঞতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার কিছুই অপ্রাপ্ত ছিল না। তিনি তাদৃশ একনিষ্ঠা আশ্রয় করিয়াছিলেন বলিয়াই ঐরূপ ভাব উপগত হইয়াছিলেন। সেই আন্তরালিক জীবট প্রভৃতি সকলেই ভিক্ষুর সঙ্কল্প সমুৎপন্ন জীব; তাঁহারা যখন প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্ন হইয়াছিলেন, তখন তাঁহাদের জগৎও ভিন্ন ভিন্ন ছিল। ঐ সময় রুদ্রজ্ঞান তাঁহাদের ছিল না বলিয়া তাঁহারা পরস্পরকে পরস্পর দর্শন করিতে পারেন নাই। প্রথমতঃ রুদ্রের ইচ্ছানুসারেই অর্থাৎ প্রবুদ্ধ জীবের বাসনাক্রমেই ভেদ-জ্ঞান-সম্পন্ন অপ্রবুদ্ধ জীব-নিবহ আবির্ভূত হইয়া থাকে, তাঁহারই ইচ্ছায় জীব তদীয়-রূপ অধিগত হয় এবং বহু বিবিধ রূপধারীও হইয়া থাকে। সংসারে সুর, নর, বিদ্যাধর, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, পণ্ডিত, মূর্খ, এ সকলই ধ্যানের ফল। অর্থাৎ ঐ সকল হওয়া জীবের স্বেচ্ছা ও স্বীয় একাগ্রতার সাফল্যেরই পরিচয়। ধ্যান-ধারণাদি প্রযত্ন প্রভাবেই এক, অনেক, পণ্ডিত, মূর্খ, সুর ও নর প্রভৃতি সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। জীবের যে সর্ব্বস্বরূপ হইবার শক্তি, তাহার সাফল্য-ব্যাপারে প্রযত্ন অপেক্ষা করে। জীব আপনার ধ্যান-ধারণাদির সামর্থ্যে একত্ব বা বহুত্ব, অজ্ঞত্ব বা বিজ্ঞত্ব, সুরত্ব বা নরত্ব সকলই কাল ও ক্রিয়ানুসারে কিম্বা একই সময়ে সম্পাদন করিতে পারে। ইহার হেতু অনুসন্ধানে দেখা যায়, জীব পরামার্থ পক্ষে ব্রহ্মস্বরূপ; তাই সে অনন্ত এবং এই জন্যই তাহার সর্ব্বশক্তিমত্তা বিদ্যমান। ইহা ভিন্ন জীব যখন এক এক দেহাভিমানরূপে অস্ত বা পরিচ্ছেদসম্পন্ন, তখন উহার শক্তিও একই কার্য্যমাত্রে অবস্থিত। জীব আপনার উৎকট প্রবাহশালিনী ইচ্ছার প্রভাবে না হইতে পারে, এমন কিছুই নাই। ফলে তাহার পক্ষে সকলই হওয়া সম্ভবপর। ধ্যান-ধারণাদি যত্নগুণে তাহার যথা তথা অবস্থান হয়; সেই অবস্থান এক এবং অনেকরূপে ঘটিয়া থাকে। ধ্যান-ধারণাদি

প্রযত্নপ্রভাবেই অনেক যোগী ও যোগিনীরা দেশ, কাল ও ক্রিয়ানুসারে প্রাণিগণের প্রতি অনুগ্রহ ও নিগ্রহ লীলাদি আধিকারিক ক্রিয়াক্রমে অবস্থান করিয়া থাকেন। যোগিগণ যে ঐহিক ক্রিয়াকলাপ সমাধা করিয়া স্বগৃহে বা অন্য যে কোন স্থানে নানা দেহকল্পনায় অবস্থান করেন, তাহা অনেকবার অনেক প্রকারে দেখা গিয়াছে। সিদ্ধি-লাভের পর যোগীদিগের সেই দেহে বা অন্য কোন দেহে ভোগানুভব করিবার বাধা ঘটে না। দৃষ্টান্ত স্থলে বলা যায়, কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন গৃহে থাকিয়াও যোগ-প্রভাবে তস্করাদি অসৎ লোকের সমীপে আবির্ভূত হইতেন এবং তাহা-দিগকে ভয়প্রদর্শন করিয়া শাসন করিতেন। ভগবান্ বিষ্ণু ক্ষীরাব্ধি মধ্যে অবস্থান করেন এবং ভূতলে জন্ম গ্রহণাদি ব্যবহার করিয়া থাকেন। যোগিনীরা স্বর্গলোকে বাস করেন; কিন্তু পশু-পেয়াদি উপহার গ্রহণ করি-বার নিমিত্ত ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। দেবরাজ নিয়ত স্বর্গের সিংহাসন অলঙ্কৃত করিয়া বিরাজ করেন; এদিকে যজ্ঞাদি উপলক্ষে ভূতলেও অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। এই বর্ত্তমান যুগেই ভগবান্ জনার্দ্দন নিজে এক হইয়াও সহস্র মূর্ত্তি ধারণ করেন; আবার একমূর্ত্তি হইয়াও অবস্থান করেন। তাঁহার ভক্তসংখ্যা শত শত; জনার্দ্দন তাহাদিগের প্রণিপাতে পরিতুষ্ট হইয়া অনুগ্রহ বিতরণের জন্য মনুষ্যমূর্ত্তি ধারণ করিবেন। কুরুসভাস্থ দুর্য্যোধন প্রভৃতিকে মোহিত করিবার নিমিত্ত তিনি এক হইয়াও সহস্ররূপে প্রকট হইবেন। তিনি ভগবান্ একমূর্ত্তি হইয়াও মৎস্যাবতার-লীলায় বহুরূপে জগতের স্থিতি বিধান করেন। রাজর্ষি নিমি বিদেহতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি একাকীই সর্ব্ব প্রাণীর নয়নে বাস করিয়া একই কালে সকলের নিমিষ সম্পাদন করিতেছেন। এইরূপে ভগবান্ জনার্দ্দনও নিমেষবৎ এক হইয়া ষোড়শ সহস্র মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক একই সময়ে ষোড়শ সহস্র কামিনীরে উপভোগ করিবেন।

হে রাম! এই প্রকারে ঐ ভিক্ষুসঙ্কল্প-স্বরূপ জীবট ব্রাহ্মণাদিও রুদ্রের অনুজ্ঞা লইয়া স্ব স্ব পুরীমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহারা সেই সেই পুরীতে বহুকাল ভোগসুখের পর রুদ্রপুরীতে উপনীত হইবেন এবং সেখানে গণস্বরূপ লাভপূর্ব্বক দিব্য পরিচ্ছদে বিভূষিত হইয়া বিরাজ

করিবেন। তাঁহারা রুদ্রগণ সমভিব্যাহারে মহারত্ন-স্তবক-মণ্ডিত প্রফুল্ল নব কল্প-বল্লী-নিকেতনে, নানাবিধ লোকে ও কৈলাস-বৈকুণ্ঠ-ব্রহ্মাদি-পুরে বিহার করিতে লাগিলেন। কখন কখন গীত, বাদ্য ও নৃত্য-নিরতা বিদ্যাধরীদিগের মধ্যে অবস্থিত হইয়া দেবগণের নিকট নমস্কার প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন এবং সুধাময়ী চন্দ্রকলা মস্তকে ধারণ করিয়া শিবসম বিরাজ করিলেন।

চতুঃষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬৪ ॥

পঞ্চষষ্টিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন,—রাম! সেই ভিক্ষুর চিত্তে উল্লিখিতরূপ ভ্রম জন্মিয়াছিল। প্রাক্তন কর্ম্ম-বশে সে ভ্রমকে তিনি পরিপুষ্ট দেখেন এবং উত্তরোত্তর পৃথক্ ভাবে অনুভব করেন। প্রত্যেক জীবই উপাধি-পরিচ্ছিন্ন চিদাভাস; তাহাদের স্থিতি—মৃতি ও উৎপত্তিময়ী। ফলে মরণ-কালে স্বপ্নবৎ তাহাদিগের চক্ষে যেরূপ জগৎ দৃষ্টি-গোচর হয়, জন্মিবার পর মুক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত সেইরূপ জগৎই তাঁহারা বারবার অনুভব করিয়া থাকেন। আত্মা অপরিচ্ছিন্ন-স্বভাব হইলেও দেহপরিচ্ছিন্নবৎ ঐ সমুদায় অনুভব করেন। যতকালে না মোক্ষ লাভ ঘটে, ততকাল পর্য্যন্ত প্রত্যেক জীবকেই ঐ প্রকার মরণ ও স্বপ্ন দর্শনবৎ সংসার দর্শন করিতে হয়। পূর্ব্ব-বর্ণিত ভিক্ষুর আত্মার ন্যায় সকল দেহীই অপরিচ্ছিন্ন; তথাচ মোক্ষাবধি আকুলভাবে তাহারা দেহ মধ্যে অবস্থিত।

রামচন্দ্র! আমি এই ভিক্ষুর উপাখ্যান বর্ণন করিয়া, তোমার নিকট জীবতত্ত্ব বলিলাম। জীবমাত্রেরই ঐ ঐ দশা ঘটিয়া থাকে। মোক্ষ হইলে জীবত্ব চলিয়া যায়, তখন ব্রহ্মত্ব হইয়া থাকে। হে রঘুবর! ঐ পূর্ব্ব-বর্ণিত ভিক্ষুই যে কেবল পরম পদ হইতে প্রচ্যুত হইয়া মোহ হইতে মোহান্তরে উপনীত হইয়াছিলেন, তাহা নহে; জীবমাত্রই পরম পদ হইতে প্রচ্যুত ও মোহান্তর অধিগত; ইহা আমাদের প্রত্যহ স্বপ্ন-সম্বেদ্য। উচ্চ গিরিশিখর হইতে স্খলিত হইয়া প্রস্তরখণ্ড যেমন অধঃপতিত হয়, তেমনি পরমাত্মা হইতে স্খলিত হইয়া জীবও এই দৃঢ়স্বপ্ন দর্শন করিতে

করিতে এক মোহ হইতে অন্য মোহে গমন করে এবং এক স্বপ্ন হইতে পুনর্ব্বার অন্য স্বপ্ন অবলোকন করিয়া থাকে। জীব স্বপ্ন হইতে স্বপ্নান্তরে উপনীত হইয়া মায়ায় জর্জ্জরীভূত হইলেও সে কখন কখন কোথাও কোন কারণবশে এই জন্মাদি-দুঃখের মিথ্যাত্ব উপলব্ধি করিতে পারে। সুতরাং দেহাভিধানের প্রতি জীবের যে 'অহং' অভিমান, তাহাই বন্ধন আখ্যায় অভিহিত আর তাহার যে স্বাত্মলাভ, তাহাই মোক্ষ আখ্যায় নিরুক্ত।

রামচন্দ্র কহিলেন—অহো, জীবের কি বিষম মোহই না হয়! মায়ার কাণ্ড কতই না বিষম হইয়া থাকে! কিঞ্চিৎ মত্ত বা ভ্রান্ত লোকেরা নিদ্রিতাবস্থায় স্বাপ্ন মায়ায় বিবিধ বিষম বিকার ও সঙ্কট অনুভব করে, এবং ঐ সমুদায়কে সত্য বলিয়া ধারণা করিয়া লয়, ইহা যেমন আশ্চর্য্যের বিষয়, এই জীবের সংসার তাহা হইতেও অধিকতর আশ্চর্য্যের বিষয় নহে কি? ঘোর যামিনীরূপিণী মায়া বিবিধ আকার-বিকার উৎপাদন করে; মিথ্যা জ্ঞানই উহার স্বরূপ বলিয়া দেখা যায়। জীব এ হেন মায়ার মহিমায় অভিভূত হইয়া ভয়ঙ্কর দুঃখ-সঙ্কটে পতিত হয়; উহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, জীব নিজেও উহা সত্য বলিয়া মনে করে। হে ভগবন্! আপনি বলিয়াছেন, সর্ব্বত্রই সকল বিষয় সর্ব্বদা সম্ভবপর; আপনার এ কথা আমারও অনুভবগম্য হইতেছে। কিন্তু এক্ষণে আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, তথাবিধ গুণসম্পন্ন কোন মহাত্মা ভিক্ষু সত্যই কি কোথাও আছেন? অথবা আমাকে প্রবোধ প্রদান করিবার জন্য ঐরূপ একটা কিছু কল্পনা করিয়া বলিলেন? ইহা আপনার অন্তরে যোগ-দৃষ্টিবলে দর্শন করিয়া আমার নিকট ব্যক্ত করুন।

বশিষ্ঠ বলিলেন,—রাম! যদিই বা আমি ইহা কল্পনা করিয়া বলিয়া থাকি, তথাচ তাহা যখন আমি অন্তরে যোগপ্রভাবে দেখিয়াই কল্পনা করিয়াছি, তখন তাহা মিথ্যা হইতেই পারে না। যাহা হউক, অদ্য রাত্রিযোগে আমি সমাধিমগ্ন হইয়া এই ত্রিভুবনের সর্ব্বত্র পর্য্যবেক্ষণ করিব,—করিয়া আগামী দিন প্রভাতে তোমায় বলিব—এইরূপ ভিক্ষু কোথাও আছেন কি না?

বাল্মীকি কহিলেন—মুনিবর বশিষ্ঠ এইরূপ কথা কহিলে, সহসা সভাগৃহের অদূরে প্রলয়ক্ষুব্ধ মেঘ-নির্ঘোষ-গম্ভীর মধ্যাহ্ন ডিণ্ডিম-ধ্বনি প্রাদুর্ভূত হইল। তৎকালে সভাস্থ রাজন্যবর্গ ও পৌর-জানপদগণ সেই মুনিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠের পদপ্রান্তে রাশি রাশি পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতে লাগিলেন। ঐ অবস্থায় অনিলান্দোলিত কুসুমবর্ষী তরুরাজির ন্যায় তাঁহাদিগকে দেখা যাইতে লাগিল। সভায় অন্যান্য যে সকল প্রধান প্রধান মুনি ছিলেন, সভ্যগণগুলী তাঁহাদিগের প্রত্যেককেই পূজা করিয়া স্ব স্ব আসন হইতে উত্থিত হইলেন। এইরূপে পরস্পর প্রণাম ও প্রতি প্রণামের সঙ্গে সঙ্গে তখনকার মত সভাভঙ্গ হইল। পূর্ব্ব দিবসের ন্যায় খেচর ও ভূচরাদি যে সকল প্রাণী সভার কার্য্যে আসিয়া যোগদান করিয়াছিল, তাহারাও এখন স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিতে লাগিল। সভ্যগণ নিজ নিজ আহ্নিক ধর্ম্ম্যকর্ম্ম সমাধা করিতে লাগিলেন। কি ভূচর, কি খেচর, সকল প্রাণীই মুনিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ-বর্ণিত জ্ঞানশাস্ত্রের আলোচনা করিতে করিতে রাত্রি যাপন করিলেন। তাঁহাদের সে রাত্রি যেন ক্ষণকালের ন্যায় কাটিয়া গেল। বশিষ্ঠ মুনির মুখ-নির্গলিত রামকৃত প্রশ্নের উত্তর শ্রবণে পুনরায় তাঁহাদের ঔৎসুক্য হইয়াছিল; তাই তাঁহাদের আর নিদ্রা হইল না। কাজেই কখন রাত্রি প্রভাত হইবে, এই প্রতীক্ষায় তাঁহাদের সে রাত্রি যেন কল্পকালবৎ দীর্ঘ বলিয়াও কখন কখন বোধ হইতে লাগিল। এইরূপে কোনও প্রকারে তাঁহাদের সে রাত্রি অতীত হইল। অনন্তর যখন প্রভাকর-প্রকাশ দেখা গেল, স্ব স্ব কার্য্য সাধনের জন্য লোক সকল যেন ইতস্ততঃ যাতায়ত করিতে লাগিল, তখন আবার সভাধিবেশনের সূচনা হইল। কি ভূচর, কি খেচর, সকল প্রাণীই পুনরায় দশরথসভায় আগমন করিল এবং পূর্ব্ব দিবসের ন্যায় পুনর্ব্বার শাস্ত্রব্যাখ্যা শ্রবণ-লালসায় ক্রমরচিত সভাস্থানে উপবেশন করিল।

পঞ্চষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬৫ ॥

ষট্‌ষষ্টিতম সর্গ।

বাল্মীকি কহিলেন,—মুনিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রপ্রমুখ মুনিগণ সমভিব্যাহারে বিমানচারী সিদ্ধসম্প্রদায় আসিয়া সভাধিরোহণ করিলে, রাজন্যগণ ও অন্যান্য সামন্ত নরপতিগণ সকলেই স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন। অনন্তর রাম ও লক্ষ্মণ সভায় আসিয়া সমাসীন হইলেন। তখন সমস্তই নিস্তব্ধ হইল। সেই রাম-লক্ষ্মণাধিষ্ঠিত সমায়ত সভামণ্ডপ নিবাত-নিষ্কম্প পদ্মাকরবৎ মৌনভাব অবলম্বন করিল। অনন্তর মুনিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ কাহারও প্রশ্নবাক্যের প্রতীক্ষা না করিয়াই পূর্ব্ব উপক্রম অনুসারে বলিতে আরম্ভ করিলেন। বস্তুতঃ দয়ালু সাধুগণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই মানবের প্রবোধ জন্মাইয়া থাকেন।

বশিষ্ঠ কহিলেন—হে রাজন্! হে রঘুকুলাকাশের শশাঙ্ক, রামচন্দ্র! গত দিবস আমি জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত করিয়া বহুকাল যাবৎ সেই ভিক্ষুর সন্ধান লইয়াছিলাম। অনন্তর যখন বহু অন্বেষণ করিয়া কোথাও সেই ভিক্ষুকে পাইলাম না, তখন আমি তাঁহাকে দেখিব মনে করিয়া এই সপ্তদ্বীপ ও কুলাচলশালিনী সমগ্র পৃথ্বী বহুকাল ধরিয়া ভ্রমণ করিলাম এবং মনে মনে ভাবিলাম—আমি কেমন করিয়া বাহিরেও মনোরাজ্য প্রত্যক্ষ করি। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে রাত্রি যখন শেষ হইয়া আসিল, তখন পুনরায় আমি ধ্যানযোগে অন্বেষণ করিতে করিতে উত্তর দিকে গিয়া দেখিলাম—ঐ দিগ্‌বিভাগের এক প্রান্তসীমায় বাল্মীক-নামে এক জনপদ আছে। সেই জনপদের পর জিননামে এক দেশ রহিয়াছে। সেই দেশে এক বহু জনাশ্রয় বিহার আছে। তাহার মধ্যে এক কুটীর; সেই কুটীরাভ্যন্তরে দীর্ঘ-দৃক্ নামে এক কপিলকেশ ভিক্ষু সমাধি অবলম্বনার্থ অবস্থান করিতেছেন। তিনি একবিংশতি রাত্র ধ্যানস্থ হইয়া রহিবেন। পাছে অন্য কেহ তাঁহার সমাধিবিঘ্ন উৎপাদন করে, এই ভয়ে তিনি তাঁহার কুটীরদ্বার অর্গল দ্বারা দৃঢ়বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন।

পরে তন্মধ্যে তিনি সমাধিমগ্ন হইয়া আছেন। তদীয় ধ্যানভঙ্গ ভয়ে প্রিয়তম ভৃত্যগণ পর্য্যন্ত সে কুটীরে প্রবেশ করে না। এইরূপে তাঁহার সমাধি অবস্থায় একবিংশতি দিন অতীত হইয়াছে। বিধির বিধানে অদ্য তাঁহার বিদেহ-কৈবল্য লাভের দিন উপস্থিত। তিনি পরতত্ত্ব সাক্ষাৎ-কারের উদ্দেশে স্বীয় দেহ পরিত্যাগ করিবেন। বিধাতার নিয়ম এই-রূপই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ঐ ভিক্ষু ধ্যানমগ্ন হইয়া সহস্র বর্ষ অতিবাহিত করিয়াছিলেন। অনন্তর উল্লিখিত রূপে তিনি একবিংশতি রাত্র পর্য্যন্ত সমাধিস্থ হইয়া ছিলেন। প্রাক্তন কল্পেও এইরূপ আর একজন ভিক্ষু ছিলেন, আর এই কল্পে এই মৎকথিত দ্বিতীয় ভিক্ষু। এরূপ তৃতীয় ভিক্ষু আছেন কি না, তাহা তখন আমার জ্ঞানগম্য হয় নাই। আমার চতুর চিত্ত অলির ন্যায় এই জগৎপদ্মে পুনরায় পরিভ্রমণ করিয়া অন্বেষণ করিল; অন্বেষণে দেখা গেল—এই সৃষ্টিতেই তাদৃশ তৃতীয় ভিক্ষু বিদ্যমান। অতঃপর আমি লীলাবশে এই সৃষ্টি হইতে অন্যান্য সৃষ্টিগুলিও অনুসন্ধান করিয়া দেখিলাম। সেই সকল সৃষ্টিতেও এইরূপ তৃতীয় ভিক্ষু বিদ্যমান আছেন, বুঝিতে পারিলাম। যে সৃষ্টি চিদাকাশ-কোষে বিদ্যমান, তাহাতেই ঐ তৃতীয় ভিক্ষু বিরাজমান। ব্রহ্মনির্ম্মিত তত্রত্য সৃষ্টিতে এই বর্ত্তমান সৃষ্টির ন্যায় ভুবন-সন্নিবেশ আছে। সমুদায় সৃষ্টি-বিস্তারেই সেই সেই রূপ সন্নিবেশ এবং বর্ত্তমান সৃষ্টির অনুগুণ নিখিল পদার্থ বিদ্যমান রহিয়াছে। এই সৃষ্টিতে যে যে মুনি বা যে যে ব্রাহ্মণ এবং তাঁহাদের যে যে রূপ আচার ব্যবহার লক্ষিত হয়, ভবিষ্যৎ সৃষ্টিতেও সেই সেই প্রকার হইবে। ঐরূপ অনেকবার হইয়াও গিয়াছে। এই সভায় যে সকল মুনি ঋষি ও ব্রাহ্মণ আছেন, ইহাঁরাও বারম্বার এই প্রকার আচার-বান্ হইয়া থাকেন এবং ভবিষ্যতেও হইবেন। এই যে সকল আছেন, ইহাঁদের অনুরূপ আরও অনেক মুনি ঋষি ও ব্রাহ্মণ আছেন। এই যে এখানে নারদ রহিয়াছেন, ইনি পুনরায় অন্য নারদ হইবেন। ঐ যে ভিক্ষুর কথা কহিয়া আসিলাম, তিনিও অন্য ভিক্ষু হইবেন। এই বর্ত্তমান সৃষ্টির ব্যাস এবং শুক পুনর্ব্বার অন্য ব্যাস ও অন্য শুক হইবেন। তাঁহাদের জন্ম এবং কর্ম্ম প্রভৃতি এই বর্ত্তমান ব্যাস-শুকেরই অনুরূপ হইবে। এই

রূপ শৌনক আবার শৌনক হইবেন, তাঁহার ন্যায় ক্রতু, পুলহ, অগস্ত্য, ভৃগু ও অঙ্গিরা, ইহাঁরা সকলেও পুনঃপুন এইরূপ হইবেন। ইহাঁরা যে প্রকার হইবেন, এইরূপ অন্যান্য সকলেও হইবেন। তাঁহাদের রূপ এবং কার্য্যাদিও এইরূপ হইবে। বলা বাহুল্য এইরূপ যে একবার হইবে, তাহা নহে; চিরকাল ধরিয়াই এইরূপ হইয়া আসিতেছে এবং চিরকাল এইরূপই হইতে থাকিবে। কেন না, মায়ার মহিমা এইরূপই বটে। যতদিন মায়ার প্রসার বা মাহাত্ম্য-বিস্তার, ততদিনই এই সকল ঘটিতে থাকিবে। সাগরে যেমন তরঙ্গ, তেমনি এই সৃষ্টিপরম্পরায় সকলই বারবার বিবর্ত্তিত হয়। এই সকল সৃষ্টির মধ্যে কোন কোন সৃষ্টি পূর্ব্ব সৃষ্টির সমান, কোন কোন সৃষ্টি অর্দ্ধ-সমান। কোন কোন সৃষ্টি বা অংশবিশেষে সমান, এবং কতকগুলি বা সম্পূর্ণ বিসদৃশ বা অভিনব। মায়া এইরূপ মহৎদিগেরও মোহ জন্মাইয়া মোহিনী-রূপে বিস্তার পাইতেছে।

হে অনঘ! নিরবয়ব কালাত্মক ক্ষণমধ্যে ইচ্ছারূপিণী মানসী চেষ্টা হইতে পারে না; দেহাদি চেষ্টার তো কথাই নাই; তাহা তো সম্ভব-পরই নহে। সুতরাং ঐ সকলই ভ্রান্তির বিলাস ব্যতীত আর কিছুই নয়। পূর্ব্বোক্ত ভিক্ষু-চরিত্রে তাহার সুস্পষ্ট উদাহরণ অবলোকন কর। কোথায় সেই একবিংশতি অহোরাত্র, আর কোথাই বা সেই জীরটাদি-ঘটিত অনন্ত সৃষ্টিবৈচিত্র্য! বস্তুতঃ সকলই যে প্রতিভা বা ভ্রান্তির বিকাশ, ইহাই ভিক্ষু চরিত্রে প্রকট। যেমন জলোপরি পদ্ম বিকসিত হয়; তদুপরি বহু ভ্রমর গুঞ্জন করিতে থাকে, তেমনি এই যে কল্লোল কোলা-হলময় জগৎ, ইহাও ব্রহ্মপ্রতিভায় বিকাশ পাইতেছে। যেমন বহ্নি-কণা হইতে শিখাসমুদ্দীপ্ত মহাগ্নি প্রাদুর্ভূত হয়, তেমনি বিশুদ্ধ চৈতন্যময় জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম হইতে এই অবিশুদ্ধ জগৎসংসার সমুদ্ভূত হইয়াছে। ঐ ভিক্ষুর মনে যে প্রকার হইয়াছিল, সর্ব্বজীবের অন্তঃকরণেই সেই-রূপ প্রত্যেক জগৎ প্রতিভাস ও তদন্তর্গত জীবের চরিত্রাদি সমুদিত হইয়াছে, হইতেছে এবং হইবে। যে যাহা দেখে, সে তাহা সত্যই মনে করে; মিথ্যা বলিয়া তাহার ধারণা হয় না। চিদাত্মা সর্ব্বাত্মক; তদীয়

একত্ব হইতে সমস্তই প্রস্ফুরিত হয়; তাই জীব তদবলোকিত সকলই সত্য বলিয়া বুঝে। ফলে এই অধ্যস্ত সৃষ্টিতে চিদাত্মার সত্যতাই প্রকাশমান; কিন্তু অবিবেকবশে জীবের তাহা বোধগম্য হয় না। জীবের যখন বিবেক জন্মে ও তৎপরে আত্মতত্ত্ব বোধ সমুদিত হয়, তখন ঐ সকলেরই মিথ্যাত্ব নিশ্চিত হইয়া থাকে।

ষট্ষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬৬ ॥

সপ্তষষ্টিতম সর্গ

সে কালে রাজা দশরথ কহিলেন,—হে মুনিবর! সেই ভিক্ষু সমাহিত হইয়া যে স্থানে রহিয়াছেন, আমার এই সকল মন্ত্রী প্রভৃতি সেই-খানে গমন করিয়া তাঁহাকে সম্বোধিত ও সমাধি হইতে উত্থাপিত করিয়া এই স্থানে আনয়ন করুন।

হে রাজন্! সেই মহাভিক্ষুর দেহে এখন প্রাণ নাই, যাহা প্রাণ-স্থিতির কারণ, সেই অন্ন-রসাদি ভাগ শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। প্রাণহীন ভিক্ষু এক্ষণে বিবর্ণভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার জীবন ব্রহ্মার হংসত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল। তদবস্থায় জীবন্মুক্ত-পদে তিনি প্রতিষ্ঠিত হইয়া-ছিলেন। সেই ভিক্ষু এখন আর এ সংসারে নাই। সুতরাং আমি সঙ্কল্প দ্বারা তাঁহাকে আর উজ্জীবিত করিতে সক্ষম নহি; কেন না, যদি দেহ-ভোগ্য প্রারব্ধ কিছু থাকিত, তবেই আমার সঙ্কল্প সিদ্ধ হইতে পারিত। ভিক্ষু তাঁহার ভৃত্যবর্গকে এই বলিয়া নিষেধ করিয়াছিলেন যে, একমাস কাল তোমরা কুটীরদ্বার অর্গলমুক্ত করিও না। তাঁহার নিষেধ অনুসারে তদীয় ভৃত্যগণ তাঁহাকে দেখিবার ইচ্ছা অন্তরে পোষণ করিলেও অন্তরালে অবস্থান করিতেছিল। অনন্তর মাসান্তে ভৃত্যবর্গ সবলে অর্গল মোচন-

পূর্ব্বক সেই ভিক্ষুর দেহ কুটীরমধ্য হইতে নিষ্কাসিত করিয়া জলমধ্যে নিক্ষেপ করিল। তখন ভক্ত ভৃত্যগণ ভিক্ষুর পূজাদি ব্যবহার প্রবর্ত্তনের জন্য তদীয় প্রতিমূর্ত্তি-স্বরূপ এক শিলাপ্রতিমার প্রতিষ্ঠা করিল। এই-রূপে সেই ভিক্ষু বিদেহমুক্ত হইয়াছেন; সুতরাং যে শরীরে জীবন সঞ্চার নাই, তাহাতে প্রবোধ জন্মিবে কিরূপে?

এইরূপ প্রাসঙ্গিক প্রশ্নের প্রত্যুত্তর দিবার পর বশিষ্ঠ দেব পুনরায় প্রস্তুত কথার অবতারণা করিয়া কহিলেন,—এই গুণময়ী মায়া দুরধিগম্যা ও দুরত্যয়া। কিন্তু যখন সত্যাববোধ বা ব্রহ্মজ্ঞান হয়, তখন সেই জ্ঞানে উঁহাকে অনায়াসে নিরস্ত করা যায়। ঐ মায়ার প্রকৃত অস্তিত্ব নাই, তথাচ উহা দ্বারাই এই বিশ্ব বিরচিত হইয়াছে। সুবর্ণ যেমন হার-কেয়ূরাদি ভাবে প্রতিভাসিত হয়, তেমনি আত্মবোধের যৎকিঞ্চিৎ অন্যথা-ভাব-রূপ বিপর্য্যয় হইবামাত্রই এই সমস্ত প্রতিভাস আত্মাতেই সমুদিত হইয়া থাকে। মায়া শব্দমাত্রেই পরিজ্ঞাত; 'বাক্যমাত্রে আরম্ভ, সেই বিকার নামমাত্র' ইত্যাদি বেদবিহিত বচনাবলীর আলোচনায় বিচারদৃষ্টিতে দেখিলে উহা মিথ্যা বলিয়া অনুমিত হইবার পর পরমাত্মায় পর্য্যবসিত হইয়া যায়। জলে তরঙ্গরাজির ন্যায় ঐ মায়া ব্রহ্মসাক্ষাৎকার মাত্রেই বিনাশ প্রাপ্ত হয়। অবিবেক-বশে পরমাত্মাই জীবত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। তিনিই এই দৃশ্যময় দীর্ঘ স্বপ্ন হইতে স্বপ্নান্তরে প্রয়াণ করেন। বিবেকাগমে চিন্মাত্র আত্মায় সকলই পর্য্যবসিত হয়। অবিবেকে প্রতিভাসমান জীবাত্মা তখন স্বীয় বিবেকোদয়ে সমস্তই আত্মস্বরূপ বলিয়া অবলোকন করেন। যে যাহার প্রতিভাস, সে স্বীয় বোধোদয়ে তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই জীব আত্মারই প্রতিভাস; যখন আত্মবোধের উদয় হয়, তখন সে আত্মাতেই পর্য্যবসিত হইয়া যায়। এই আত্মাই করঞ্জ-গুল্ম-কাননাদি-পরিবৃত সংসারভাবে, প্রকাশ পাইয়া থাকেন। প্রাণিবর্গের প্রত্যেক সংসারমণ্ডল ভ্রান্তি হইতে প্রকাশমান। তুমি এ সংসারকে ভিক্ষুর স্বপ্নবৎ ভ্রান্তি-বিজৃম্ভিত বলিয়াই জানিও। পদ্মযোনি আদি-শরীরী; তাঁহা হইতেই অগ্রে এই জগৎস্বপ্ন সৃষ্ট হয়। অনন্তর তাহাই ব্যষ্টিক্রমে বা তদন্তর্নিবিষ্ট প্রত্যেক জীবে নিরূঢ় হইতে থাকে। ব্যষ্টি জীব-নিবহের

অস্বচ্ছ চিত্ত হইতে যাহা উত্থিত হয়, তাহা স্থির সত্যবৎ অবভাসিত হইয়া থাকে। আর পিতামহ ব্রহ্মার স্থায় চিত্তশুদ্ধি হইলে সকলই স্বপ্ন-বিলাসবৎ অসত্যাকারে আভাত হয়; ঐরূপ ভাব হইলেই এই জ্ঞান উপস্থিত হয় যে, ব্রহ্মই প্রত্যেক বিভিন্ন স্বরূপে ব্রহ্মাণ্ডকোটিবৎ কোটি কোটি হইয়া সমুদিত হন ও হইয়াছেন এবং তাহাই স্থিরীকৃত আছে। ব্যষ্টি প্রপঞ্চ, সমষ্টি প্রপঞ্চ, সাধারণ প্রপঞ্চ বা প্রত্যেক অসাধারণ প্রপঞ্চ,—যে রূপেই না কেন ঐ স্বপ্নপ্রায় মিথ্যা জীব স্ফুরিত হউক, সে অন্তরে যে প্রতিভানক্ষম দীর্ঘ স্বপ্নভ্রম দর্শন করে, তাহা ব্রহ্ম-বিশ্বাসরূপ তত্ত্বজ্ঞান হইতে প্রচ্যুত হইয়াই করিয়া থাকে এবং তদবস্থায় সত্তা মাত্রের আশ্রয়ে সুর-নর-তির্য্যগাদি-দেহে জরা-মরণ-দুঃখের ভাজন হইয়া থাকে। বিচিত্র সুকৃতিশালিনী জীব-চিৎশক্তি স্বীয় চিত্তাংশের স্পন্দনমাত্রেই অধোভাগে পাতাল এবং ঊর্দ্ধে স্বর্গসুখ ভোগ করিতে থাকেন। সেই যে প্রাগ্‌বর্ণিত পরমাত্মচিৎ, তিনি প্রাণ কল্পনা করিয়া তদধীন স্পন্দরূপে জীবনাম গ্রহণপূর্ব্বক আত্মার দেহাকার লাভ ও বহির্ভাগে গমন করিবার পর বিষয়াকার বিভ্রম লইয়া বিলুণ্ঠিত হইতেছেন। প্রত্যাগাত্মা কি চিত্তোপাধিরূপ ভ্রমাবৃত হইলেও পরমাত্মা বা ব্রহ্মস্বরূপ নহেন? অথবা পরব্রহ্মই কি সেই প্রত্যাগাত্মা হইতে পৃথগ্‌ভূত? দর্পণে যদি মুখের প্রতিবিম্ব পতিত হয়, তাহা হইলে কি মুখের মুখত্ব অপগত হইয়া থাকে? কিম্বা প্রতিবিম্ব হইতে মুখ একটা পৃথক্ কিছু হইয়া দাঁড়ায়? এইরূপ দৃষ্টান্তে দেখ, ঔপাধিক জীবনাম, দেবদত্তাদি দেহ নাম কিম্বা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়নাম ধারণ করিলেও কি পরমাত্ম ব্রহ্মের ব্রহ্মত্ব চলিয়া যায়? অথবা তিনি সেই সেই নামের উপযোগীই হন না? এতাবতা বুঝা যায়, উপাধিবশে পরমাত্মায় সকলই সম্ভব হয়। ইহা জীব, উহা দেহ, এ সকল কল্পিত হইলেও মূলতঃ পরমাত্মা বৈ আর কিছুই নয়। কেন না, সহস্র সহস্র অধ্যাসেও অধিষ্ঠান পরমাত্মার অন্যথা ঘটিবার নহে। এইরূপে জানিবে—জীব-ব্রহ্মের একতাই পরম পুরুষার্থ ফল। ঐরূপ ঐক্য দর্শনের ফলে জগদ্‌ব্যবহার দৃষ্টিতে দেখিলেও খণ্ডাকাশে মহাকাশের এবং জলে নির্ম্মল জলের স্থায় ব্রহ্মাংশরূপ ব্রহ্মে পরব্রহ্মেরই অস্তিত্ব উপলব্ধ

হইয়া থাকে; পরমার্থ দর্শনে যে হইবে, তাহার তো কথাই নাই। ভাবিয়া দেখ, মুখ হইতে দর্পণ যখন ভিন্ন, তখন প্রতিবিম্বরূপে মুখ্য তাহাতে অবস্থিত হওয়ায় তাহাকে অন্য বলিয়া ভ্রম হওয়া অসম্ভব নহে। পরন্তু এই জীবলোকে নিজ স্বাত্মস্বরূপ অভয় ব্রহ্মেরই মূর্ত্তামূর্ত্তস্বরূপ জগদাকারে প্রতিষ্ঠিত; কাজেই দর্পণগত প্রতিবিম্ববৎ উহার অন্যথা ভ্রম একেবারেই অসম্ভব। তথাচ বালকেরা যেমন দর্পণে আপন প্রতিবিম্ব দেখিয়া আতঙ্কে শিহরিয়া উঠে, তেমনি অভয় ব্রহ্মে আত্মস্থিতি জানিতে পারিয়াও আমার ভয়ের কারণ আছে ভাবিয়া জীব যে ভীত হয়, ইহা বড়ই বিস্ময়ের বিষয়। ভিন্নতা-বোধ বুদ্ধিরই একটা চঞ্চল অবস্থা-বিশেষ; বুদ্ধিস্পন্দন না ঘটিলে ভিন্নতা বুদ্ধি হয় না। সুতরাং সমাধি-অভ্যাসের ফলে যৎকালে বুদ্ধি-স্পন্দন নিবারিত হইয়া যায়, তখন ভেদ-বুদ্ধিরূপ সংজ্ঞা আপনা হইতেই বুদ্ধিতে বিলয় প্রাপ্ত হয়। ঘৃত যেমন হুত হইয়া প্রদীপ্ত পাবকে বিলয় পায়, তেমনি সেই বুদ্ধিও পূর্ণ ব্রহ্মাকার চরম সাক্ষাৎকাররূপ পরিণাম দ্বারা ব্রহ্মপদেই বিলয় পাইয়া যায়। কেন না, সেই সর্ব্বাত্মা ব্রহ্মে যে চিৎস্পন্দ প্রকাশিত হয়, তাহাই স্পন্দন, অস্পন্দন, জৃম্ভণ ইত্যাদি নানা নামে নিরূপিত হইয়া থাকে। বাস্তব পক্ষে উহাদের কেহই কিছু নহে; সকলই কল্পিত মাত্র। অতএব এখন আর এরূপ আশঙ্কা হইতে পারে না যে, এই তো অস্ত্র-দুর্ভেদ্য জগৎ—ইহা কিরূপে বোধমাত্রেই বিলয় প্রাপ্ত হয়? কেন না, এ জগৎও তো অবাস্তব চিৎস্পন্দ বৈ আর কিছুই নয়। স্পন্দন বা অস্পন্দন, এ জগতে বাস্তবিক কিছুই নাই; একত্ব দ্বিত্বও নাই। কেন নাই, তাহার কারণ এই যে, ভেদমাত্রেই কল্পনা-প্রসূত; কল্পনার মিথ্যাত্ব সর্ব্ববাদি-সম্মত। সুতরাং একমাত্র শুদ্ধ চিন্মাত্র সর্ব্ব-স্বরূপ ব্রহ্মই অবিকৃতভাবে বিরাজ করিতেছেন। জানিবে—তিনিই কেবল আছেন। যথার্থ বিচার দ্বারা নিখিল শব্দ ও শব্দার্থ একরস-স্বভাব বলিয়া বিদিত হইলে একমাত্র চিৎই পরমার্থ সত্য এবং তাহারই অস্তিত্ব উপলব্ধি হয়। তৎকালে এ প্রপঞ্চ কিছুই নাই, এরূপ জ্ঞানেরও অভাব হইয়া থাকে। সুতরাং যাহা ভাবজ্ঞান, তাহা

যে থাকে না, তাহার তো কথাই নাই। ভেদজ্ঞানেই সমুদায় ভেদের উৎপত্তি হয়; পরন্তু ভেদ প্রকৃতি বা মায়ারই চিহ্নবিশেষ। সুতরাং যখন অভেদ-বোধে সমস্ত ভেদবোধ তিরোহিত হইয়া যায়, তখন কেবল সেই এক পরমার্থ চিৎই অবশিষ্ট থাকেন; অন্য সকলই মিথ্যা হইয়া পড়ে। হে রাম! তুমিই অবোধবশে নানা হইয়াছ। ফল কথা, অবোধ নিবন্ধন এই বিবিধ ভ্রমজ্ঞানের ফলে তুমিও বিবিধরূপ ধারণ করিতেছ; ঐ অবোধ-নানাত্ব তোমার অন্তরে স্থান না পাইলে তুমি তো সেই বোধস্বরূপ পূর্ণ চিৎ হইয়াই প্রতিভাত হইতেছ। এ বিষয় তুমি যে কোন বিজ্ঞের নিকট জানিতে পার। যাহা হউক, ঐ বোধস্বরূপ পূর্ণ চিৎই পরমার্থ; সুতরাং জানিবে—তোমার, আমার কিম্বা অন্যের, সকলের পক্ষেই নিতান্ত নিঃশঙ্কভাব নিত্যকাল অবস্থিত। যখন নিঃশঙ্কভাবের উদয় হয়, তখন আর কি স্বপ্ন, কি জাগরণ, কি সুষুপ্তি, কি তুরীয়াবস্থা, কি বন্ধন, কি মোক্ষ, কি অন্যবিধ কল্পনা, কিছুই থাকে না। অবোধবশেই এই দ্রষ্টৃ, দৃশ্য, দর্শন—ত্রিপুটী জগৎ বলিয়া বিদিত। যখন অবোধও অসত্য, তখন তাহার শুদ্ধাত্মরূপ শান্তিই একমাত্র জগৎ-সংজ্ঞিতা। চিত্ত ও প্রাণাদি স্পন্দ সঙ্কল্প হইতেই হয়। যখন বোধোদয়ে সঙ্কল্পাভাব ঘটে, তখন স্পন্দও অস্পন্দ হইয়া যায়। ফল কথা, সঙ্কল্প না থাকিলে স্পন্দনও আর থাকে না। সঙ্কল্প-পথের অতীত চিৎ স্পন্দ ও অস্পন্দ এই উভয় হইতে অভিন্ন। চিদ্‌ব্রহ্মের অদর্শনেই দ্বৈতাদি সঙ্কল্প সমুদিত হয়, আর যখন তাহার সাক্ষাৎকার ঘটে, সেইক্ষণেই দ্বৈতাদি কল্পনা-বিরহিত চিদ্‌ব্রহ্ম মাত্রই অবশিষ্ট হইয়া থাকেন। চিদ্‌ব্রহ্মরূপ সুধাংশু-মণ্ডলে ঐ যে সঙ্কল্পরূপ কলঙ্ক-কালিমার স্ফুরণ দেখা যায়, উহাকে কলঙ্ক-কালিমা বলা যায় না। যিনি চিদ্ঘন ব্রহ্ম, তাঁহারই উহা ঘন-দেহ। তুমি সেই চিদ্ঘন ব্রহ্মের বিস্তীর্ণ পদে বিরাজ কর। দেখ, যদি সেই পূর্ণভাবে অবস্থান করা যায়, তবে সঙ্কল্পাদি সকলই সেই চিদ্ঘন ব্রহ্মের সহিত এক-রসতা প্রাপ্তির পর পৃথক্ সত্তা হইতে পরিচ্যুত হইয়া তোমারই আত্মস্বরূপে সত্তাবান্ হইয়া যাইবে। যাহা সমস্ত বস্তুর আত্মৈকরসতা আপাদন করিয়া দেয়, তুমি এই যুক্তিবলে সেই নির্দ্দোষ বোধ-সার অবলম্বন কর।

হে রাম! যদি সেই চিদ্ঘন ব্রহ্মপদ তোমার অধিগত হয়, তবে তুমি সঙ্কল্প-কলঙ্ক-হীন চিৎ-চন্দ্রবিম্বরূপেই বিরাজ করিতে থাকিবে। তখন ভাব ও অভাব তোমাতে ক্ষয় পাইয়া যাইবে। তুমি ভব্য হইবে; তোমার দ্বারা যে পদার্থ স্পৃষ্ট হইবে, তাহাও অমৃত হইবে। যাহা ভাব ও অভাবকল্পনার হেতুভূত, সেই চিন্ময়তাকে তুমি আশ্রয় কর এবং চিদ্ব্রহ্ম-সম উল্লাস-বিলাসের অভ্যন্তরে তুমি যথাসুখে বিশ্রাম করিতে থাক।

হে রাঘব! কি কল্পনা, কি অকল্পনা, কি স্পন্দাস্পন্দ, এ সকলই কেবল নামে মাত্র। তুমি তো অপার আনন্দ-সাগর; অন্য সকলই চিত্তের ভিন্ন ভিন্ন ভ্রম। অতএব তুমি পূর্ণ ও অপূর্ণ এই উভয় দশাকে সেই একমাত্র ব্রহ্মরূপেই সম্যক্‌ভাবে অবগত হও।

সপ্তষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬৭ ॥

অষ্টষষ্টিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রঘুনন্দন! তুমি মনের বিলাস পরিহার কর—করিয়া সুষুপ্ত-মৌনী হও এবং সকল প্রকার কল্পনামল হইতে মুক্ত হইয়া সেই পরম পদ অবলম্বনপূর্ব্বক অটল ও অচলভাবে অবস্থান করিতে থাক।

রামচন্দ্র কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! বাঙ্মৌন, ইন্দ্রিয়মৌন ও কাষ্ঠ-মৌন, এই ত্রিবিধ মৌনই আমি জানি; কিন্তু সুষুপ্তমৌন কি, তাহা আমার জানা নাই। আপনি সকল প্রকার মৌনব্যাপারে সক্ষম; অতএব সুষুপ্ত-মৌন কি? তাহা আমাকে বুঝাইয়া দিন।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রাম! মুনিগণ দুই প্রকার মৌনের বিষয়

উল্লেখ করিয়াছেন। তন্মধ্যে এক কাষ্ঠমৌন, দ্বিতীয় জীবন্মুক্ত-মৌন। যিনি কাষ্ঠমৌন অবলম্বন করেন, তাঁহাকে কাষ্ঠতপস্বী নামেও নির্দ্দেশ করা হয়। যিনি আত্মপর্য্যালোচনা না করায় তত্ত্বানুভবরূপ রসের অভাবে নীরস কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদি ক্রিয়ায় দৃঢ় নিশ্চয়বশে তদনুষ্ঠানে আসক্তি রাখিয়া হঠযোগাদি দ্বারা ইন্দ্রিয়গ্রাম জয় করিয়া মৌনভাব অবলম্বন করেন, তাঁহাকে কাষ্ঠ মৌনী বা কাষ্ঠতপস্বী নামে অভিহিত করা হয়। এ জগৎ যেরূপ ভাবে হইতে হয়, চিরকাল তেমনই ভাবে হইয়া আসিতেছে, এইরূপ অবধারণ করিয়া যথাযথ ব্রহ্মতত্ত্বের ভাবনায় যিনি পূতচিত্তে অবস্থান করেন, আর অন্যদিকে বাহ্যিক ব্যবহারে নিজেকে অপর সাধারণ তপস্বীর ন্যায় প্রদর্শন করান, পরন্তু অন্তরে নিতান্ত আনন্দরসের আস্বাদন করিতে করিতে পরম পরিতৃপ্তি অনুভব করিতে থাকেন, তাঁহাকে জীবন্মুক্ত-মৌনী বলা হয়। এই দুই শান্তভাবাবলম্বী মুনিবরের যে চিত্ত-নিশ্চয়রূপ ভাব, তাহাই মৌননামে নিরূপিত।

হে রাম! পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মৌনবিদ্গণ চারি প্রকার মৌনের নাম নির্দ্দেশ করিয়াছেন; যথা—বাঙ্মৌন, ইন্দ্রিয়মৌন, কাষ্ঠ-মৌন ও সুষুপ্ত-মৌন। ইহাদের মধ্যে বাক্য-নিরোধের নাম বাঙ্মৌন, ইন্দ্রিয়নিগ্রহের নাম ইন্দ্রিয়মৌন, আর সর্ব্ববিধ চেষ্টাপরিহারের নাম কাষ্ঠমৌন। এইরূপ বিভাগক্রম পর্য্যালোচনা করিলে মনো-নিগ্রহকেও মনোমৌন নামে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। কিন্তু মূর্চ্ছা ও সুষুপ্তিবশেই মনের মৌনভাব ঘটিয়া থাকে; সুতরাং তাহা পূর্ব্বোক্ত কাষ্ঠতাপসেই সম্ভবপর হইতে পারে বলিয়া কাষ্ঠ-মৌনেরই অন্তর্গত বলা যায়। কাজেই তাহা আর পৃথগ্‌ভাবে গণনীয় নহে। যাঁহারা জীবন্মুক্ত ব্যক্তি, তাঁহারাই আত্মতত্ত্বের অনুভব-কালে সুষুপ্ত মৌনভাব অবলম্বন করেন। পূর্ব্বে যে ত্রিবিধ মৌন উল্লিখিত হইয়াছে, একমাত্র কাষ্ঠ-তাপসেই তাহা লক্ষিত হইয়া থাকে। সুষুপ্ত-মৌন-দশায় তুরীয়াবস্থা বিদ্যমান। ফলে, উহাকে উক্ত ত্রিবিধাতীত চতুর্থাবস্থা বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়। যিনি জীবন্মুক্ত, ঐ অবস্থা তাঁহাতেই আছে; তাঁহারই উহা ঘটিয়া থাকে। সত্য বটে, উল্লিখিত ত্রিবিধ মৌনভাবে মৌনত্ব সিদ্ধি হইয়া থাকে, তথাচ ঐ বাঙ্মৌনাদি মৌনত্রয় মলিন মনেরই

দৃঢ় নিশ্চয়-রূপ বৈ আর কিছুই নয়। উহাতে জীবের বন্ধন ছেদন হয় না। জানিবে—ঐ এক কাষ্ঠতাপসই উক্ত ত্রিবিধ মৌনাবস্থায় অবস্থিত। এক্ষণে কাষ্ঠমৌনী তাপস কিরূপে সমাধিতে অবস্থান করেন, বলিতেছি; তিনি বলপূর্ব্বক ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করিয়া অন্তরে অহম্ভাবের স্মৃতি পরিহার করেন এবং বাহিরে দৃশ্য প্রপঞ্চ ও নামপ্রপঞ্চের সম্পর্ক রাখেন না; অপিচ অজ্ঞানাচ্ছন্ন আত্মাকে না দেখিলেও সুষুপ্তি অবস্থায় নিত্য আত্মদৃষ্টির অবিলোপে ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নিবৎ সাক্ষিমাত্র জ্যোতিতে সমুদায় বিষয় দর্শন করত অবস্থান করিতে থাকেন। পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ মৌনী যখন ব্যুত্থান লাভ করেন, তখন তাঁহাদের চিত্ত পূর্ব্বের ন্যায় চঞ্চল হয়। এই জন্য পণ্ডিতগণ ঐ ত্রিবিধ মৌনের প্রশংসা করেন না। আমি পূর্ণাবস্থা প্রসঙ্গে মৌনীদিগের মৌনাবস্থার লক্ষণ ও ফলাফলাদি তোমার নিকট ব্যক্ত করিলাম। ইহাতে সেই সেই মৌনাবলম্বী ব্যক্তিগণ সন্তুষ্ট বা অসন্তুষ্ট, যাহাই হউন; সে জন্য আমি চিন্তিত নহি। এক্ষণে যাহা জীবন্মুক্ত-লক্ষণ সুষুপ্তমৌন, তাহা বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। এই সুষুপ্তমৌন অপুনর্জ্জন্মা জীবেরই আয়ত্ত এবং ইহা শ্রবণ-মনোরম। যখন তত্ত্ব দর্শন সিদ্ধ হয়, তখন উহা বিশেষ যত্ন না করিলেও আপনা হইতেই সিদ্ধ হইয়া থাকে। এই মৌন পূর্ব্ব-মৌনত্রয়ের ন্যায় ক্লেশসাপেক্ষ নহে। ইহাতে প্রাণ-সংযমের আবশ্যকতা নাই এবং ঊর্দ্ধ, অধঃ ও মধ্য, এই তিন সঞ্চারভেদে ত্রিবিধ প্রাণকে সংযোজিত করিতে হয় না। সুষুপ্তমৌনের আবির্ভাবে ইন্দ্রিয়জ্ঞান বিষয়-লাভ-হর্ষে উল্লসিত হয় না এবং বিষয়ের অলাভে বা নিরোধক্লেশেও তাহাকে গ্লানি-সম্পন্ন হইতে হয় না। ঐ অবস্থায় নানাত্ব কল্পনার উদয় নাই বা তাহার প্রভুত্ব নাই। অথচ সে কল্পনার যে শান্তি হয়, তাহাও নহে। এই সমস্ত বৈচিত্র্য-কল্পনা তখন সম্পূর্ণভাবেই বিরাজ করিতে থাকে। তবে সুষুপ্ত-মৌনীর নিকট ঐ সকল সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয় না, তাঁহারা ভ্রম বলিয়াই অবধারণ করেন; সে সকলে তাঁহাদের নির্লেপ অবস্থাতেই অবস্থিতি হয়। কাজেই ঐ সমুদায় বৈচিত্র্য-কল্পনার প্রভুত্ব কিছুই সেই সুষুপ্ত-মৌনীর নিকট থাকে না। অপিচ সুষুপ্ত মৌনাবস্থায় চিত্তের যাহা চিত্ত্ব, তাহা অন্তর্হিত হইয়া যায়, অথচ মনের যে একেবারেই লয় ঘটে,

তাহা নহে; তাহার যে একটা প্রভুত্ব বা কর্তৃত্বাভিমান, তাহাই মাত্র লোপ হইয়া যায়। এই মৌনাবস্থা নানাত্ব-কল্পনার উপশম-স্থান; এবং চিত্ত অচিত্ত ও সৎ বা অসৎ বিভাগের অতীত, অযত্ন-সিদ্ধ বা স্বরূপাবস্থা মাত্র; ধ্যান করা হউক, বা না হউক, সকল সময়েই ইহা অপরিচ্ছিন্ন আত্মস্বরূপ;— আদি, অন্ত ও মধ্যাবস্থাদি-বিরহিত। এ জগৎ নানাত্ব ভ্রমময়; ইহা কেবল ভ্রমসমূহেই পরিপূর্ণ। বাস্তব পক্ষে এ জগৎ সেই যথাবস্থিত আত্মতত্ত্ব বৈ আর কিছুই নহে। আত্মতত্ত্ব ব্যতীত এ জগতের বৈচিত্র্যাদি অন্য কিছুই নাই। এইরূপ জ্ঞানযোগ অবলম্বন করিয়া সর্ব্ব সন্দেহ পরিহার-পূর্ব্বক যে অবস্থান, তাহাই সুষুপ্ত-মৌননামে নিরূপিত। একমাত্র শিব-স্বরূপ আত্মাই এই অনেকরূপে বিস্তার পাইতেছেন। তাঁহারই কর্তৃত্বে এই সমস্ত বিশ্ব ব্যাপ্ত রহিয়াছে। যে অবস্থায় এইরূপ জ্ঞান ঘটে, তাহারই নাম সুষুপ্ত-মৌন। ঐ আকাশ, আকাশ নহে; পরন্তু পূর্ণতাময়, সমস্তই আছে অথচ কিছুই নাই—ব্রহ্মস্বরূপেই অবস্থিত; তদতিরিক্ত রূপে নাই। এই প্রকারে যাঁহার চিত্ত উপশান্ত হইয়াছে, তাঁহাকে আমরা সুষুপ্ত-মৌনী নামে অভিহিত করিয়া থাকি। যে অবস্থায় সমস্তই শূন্য, নিরালম্ব, শান্তিময়, সদসৎ বিভাগের অতীত ও কেবলই জ্ঞপ্তিমাত্র হয়, তাহাই আমরা উত্তম মৌননামে নির্দ্ধারণ করিয়া থাকি। যাঁহার সম্বিৎ ভাব ও অভাবাদি বিশেষ বিশেষ অবস্থা অতিপাতিত করিয়া অবস্থান করে এবং ভ্রম হইতে সম্পূর্ণ নির্ম্মুক্ত হয়, বিজ্ঞগণের মতে তিনি উত্তম সুষুপ্তমৌনী নামে নির্ব্বাচিত। চিত্ত যাঁহার অত্যন্ত সাম্য লাভ করে—সমুদায় ভেদবৃত্তি বিরহিত হয়, তিনিই অক্ষয় মৌনাবস্থায় অবস্থিত। এ জগতে আমি নাই, অন্য কেহ নাই, কিছুই নাই, মনও নাই, মনের কল্পনা-বিকল্পনা নাই, এইরূপে বাধিত হইয়া জীবন্মুক্তের যে সম্বিৎ বা জ্ঞান দ্বারা প্রতিভাসের অভাব, তাহারই নাম অবিচ্ছিন্ন সুষুপ্ত-মৌন। এ জগতে সত্তাসামান্যবৎ সমস্ত পদার্থে আমিই আছি, অর্থাৎ 'অহং' মনোবৃত্তিতে চৈতন্যের প্রকাশ হইতেছে, সর্ব্বত্রই 'অহং' এই বৃত্তি আমি নহি; আমি সেই চৈতন্য; সমস্তই স্বস্তি বা মঙ্গলময় শব্দার্থমাত্র—সত্তাসামান্য ব্যতীত অন্য কিছুই নহে; এই প্রকার জ্ঞানই সুষুপ্ত-মৌন নামে নিরূপিত হইয়া থাকে। ঐ সুষুপ্ত-মৌন অবস্থায়

সর্ব্ববাধক আত্মাকার চরম বৃত্তি প্রমাহীন জ্ঞানকেও তাৎকালিক সম্বিৎ যেন গ্রাস করিয়া থাকে, এই জন্য তখন স্ব-পরাদি ভেদকল্পনা কিছুই না। ফলে ঐরূপ মৌনাবস্থায় সমস্ত জ্ঞানেরই অভাব হয়; সুতরাং উহা অনন্ত ও তুর্য্যাতীত, ইহা হইতেই সর্ব্ববিধ মৌনের বিস্তার হয়। জানিবে—ঐ সুষুপ্ত মৌনই অনন্ত বলিয়া প্রবোধ-সম্পন্ন; প্রবোধে অবিদ্যাকে বাধিত করে বলিয়া নির্ম্মল তুরীয়াবস্থ এবং পরে সেই অবিদ্যাবাধিকা বৃত্তিগুলিরও বাধা জন্মায় বলিয়া তুর্য্যাতীত। পূর্ব্বোল্লিখিত সপ্তবিধ জ্ঞানভূমিকার মধ্যে পঞ্চম ভূমিকাদি ত্রিবিধ ভূমিকা সমাধিরই ভেদস্বরূপ; যথা—সৌষুপ্ত সমাধি, তুর্য্যসমাধি ও তুর্য্যাতীত সমাধি; এই ত্রিবিধ ভূমিকা জাগ্রৎ এবং স্বপ্নাবস্থায়ও ঘটিয়া থাকে।

হে সাধো! তুমি ব্রহ্মভূত হইয়াছ; এখন তুমি তোমার এই ভৌতিক দেহ লইয়া সর্ব্বত্র নিপুণভাবে ব্যবহারপথের অনুবর্ত্তীই হও, আর ব্যবহার পরিহারপূর্ব্বক সমাধি-অবলম্বনেই অবস্থান কর। তোমার সকল সময়ে শান্তি বৃত্তি উপস্থিত; তুমি নিত্য তুর্য্যস্থ এবং বিদেহই বট। যিনি স্থূল ও সূক্ষ্মাকার বাধিত করিয়া আকাশবৎ শূন্য হইতে পারিয়াছেন, এইরূপ স্থিতি তাঁহারই হইয়া থাকে; অন্যের এরূপ ঘটে না। রামচন্দ্র! বর্ত্তমান কালে তোমারই এইরূপ ঘটিয়াছে। তুমি এখন 'ওঁ' এই শব্দ উচ্চারণ-পূর্ব্বক নির্ব্বাসনত্ব লাভ কর। 'আমি' 'তুমি' 'অন্য' এ সকল ভেদ তোমার নিকট অসত্য হইয়া যাউক। অর্থাৎ সমস্ত বস্তু আছে, এইরূপ প্রসিদ্ধি নাড়ীমধ্যে অনুভূয়মান স্বপ্নপ্রায় বুঝিয়া তুমি জীবন্মুক্ত ভাবে চিদাকাশ কোষে একনিষ্ঠ হইয়া থাক।

অষ্টষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬৮

রামচন্দ্র কহিলেন,—হে মুনিনায়ক! ইতিপূর্ব্বে কি জন্য আপনি রুদ্রের শতসংখ্যা কীর্ত্তন করিলেন? শত রুদ্রের কথা তো অপ্রসিদ্ধ। তবে কি প্রমথবৃন্দের সহিত গণনায় ঐ রুদ্র শতসংখ্যক বলিয়া উল্লিখিত অথবা তদ্ভিন্ন শতরুদ্র আছেন? ইহা আমার নিকট ব্যক্ত করুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! পূর্ব্বে ভিক্ষু যে শত স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, তাহাই শত শরীরাকারে অবস্থিত হইয়াছিল। এ রহস্য তুমি পূর্ব্বোল্লিখিত সেই সেই জন্মাদি প্রস্তাবেই বোধগম্য করিয়াছ; এই জন্য আমি আর বিশেষ করিয়া তাহা উল্লেখ করি নাই। ভিক্ষুর স্বপ্নাবস্থায় সেই যে সকল জীবটাদি আকার হইয়াছিল, তাহারাই গণ-শতসংখ্যায় বিখ্যাত হয়। সেই গণশতকই ভোগৈশ্বর্য্যের সাম্য নিবন্ধন রুদ্রাংশ বশে শত রুদ্ররূপে বিভাত হন। গণসমূহ রুদ্রের সেবক ও পার্ষদ; সুতরাং পরস্পর-বিরুদ্ধ স্বামি-ভৃত্য ভাব একত্র অসম্ভব হইলেও তাহারা যে মুখ্য রুদ্রশতত্ব লাভ করিয়া আবার যে গণশত হইয়াছিল, তাহার কারণ এই যে, তাঁহারা স্বয়ংসিদ্ধ রুদ্র হইলেও পূর্ব্বসিদ্ধ ঈশ্বরকোটিক রুদ্রের পরিচর্য্যাদি-ব্যাপারে গণমধ্যে গণিত হইত; তাহাদের কর্ম্মফল-স্বরূপ ভোগৈশ্বর্য্যের প্রাপ্তি রুদ্র দেবেরই অধীন ছিল।

রামচন্দ্র কহিলেন,—হে ভগবন্! সেই ভিক্ষুর চিত্ত এক; দীপ হইতে অন্যান্য দীপের ন্যায় তাহা হইতে কি রূপে শত চিত্ত আবির্ভূত হইল? ভিক্ষু স্বপ্ন-কৃত রুদ্র হইতে কি প্রকারে শততম রুদ্র সমুৎপন্ন হইল?

বশিষ্ঠ কহিলেন,—যাঁহাদের জ্ঞানৈশ্বর্য্য নাই, তাঁহাদের চিত্ত হইতে চিত্তান্তর হওয়া অসম্ভব কথা। পরন্তু যাঁহাদের যোগৈশ্বর্য্য আছে, যাঁহারা সত্যসঙ্কল্প হইয়াছেন, কল্পনারূপ সৃষ্টিকার্য্যে তাঁহাদেরই সামর্থ্য আছে। মদীয় আত্মা সর্ব্বগামী ও সর্ব্বব্যাপী, এই জ্ঞান যাঁহাদের সুদৃঢ়-

রূপে বিদ্যমান, তাঁহারা সর্ব্বাত্মা; তাদৃশ ব্যক্তিগণের ভাবনার বিষয়ীভূত বস্তু ভাবনামাত্রেই প্রথিত হইয়া থাকে।

রামচন্দ্র কহিলেন,—ভগবন্! আপনি যে ঐশ্বর্য্যাদির বিষয় উল্লেখ করিলেন, হরিহরাদি প্রসিদ্ধ দেবগণের যদি তাহা থাকে, তবে তন্মধ্যে সর্ব্ব-শক্তিশালী ঈশ্বর মহাদেব কি নিমিত্ত কপালমালায় মণ্ডিত, কি কারণ ভস্মবিলেপন-ধর দিগম্বর এবং কি জন্য শ্মশাননিবাসী ও স্ত্রীসহচর? তাদৃশ ঈশ্বরের মানুষযোনিতে অবতার স্বীকার করিবারই কি বা প্রয়োজন অর্থাৎ যিনি ঈশ্বর, তাঁহার আবার কামনা বা ইচ্ছা কি?

বশিষ্ঠ কহিলেন,—যাঁহারা সিদ্ধ এবং জীবন্মুক্ত-কলেবর, তাঁহাদিগের আর শাস্ত্রসঙ্গত ক্রিয়ানিয়ম বা লক্ষণালক্ষণ কি আছে? তাঁহাদিগের মঙ্গল বা অমঙ্গল এ উভয়ের মধ্যে তারতম্য কিছুই থাকে না; সকলই সুখস্বরূপ হয়। যাহারা অজ্ঞ জীব, তাহাদিগের ঐ সমস্ত ক্রিয়া-নিয়মাদি বিদ্যমান। রাগদ্বেষ ও লোভাদির সহস্র সহস্র দোষে অজ্ঞ জনের চিত্ত খণ্ডিত হইয়া যায়; এইজন্য বিধি-নিষেধের বশীভূত না হইয়া মৎস্যন্যায়ে দুর্ব্বলের পীড়া জন্মাইয়াই তাহারা জন্মাদি অশেষ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। যাঁহারা জীবন্মুক্ত বিজ্ঞ ব্যক্তি; তাঁহারা ইষ্ট কিম্বা অনিষ্ট বিষয়ে মগ্ন নহেন। কেন না, তাঁহারা জিতেন্দ্রিয় ও বাসনাতীত। যে সকল কার্য্য কাকতালীয়বৎ সহসা উপস্থিত হয়, তাঁহারা তৎসমুদায় করিয়া যান। কার্য্য করুন আর নাই করুন, কোন কিছুতেই তাঁহাদের আসক্তি বা আগ্রহের ভাব থাকে না। ঐ প্রকার কাকতালীয় নিয়মে মনুষ্যবৎ বিষ্ণুকেও জন্ম-কর্ম্ম ভোগ করিতে হয়। ত্রিনয়ন হর ও পদ্মজন্মা ব্রহ্মারও কর্ম্মভোগ হইয়া থাকে। তাঁহাদের নিকট কোনও কিছু নিন্দার পাত্র, বা অনিন্দার্হ নাই; অথবা হেয় কিম্বা উপাদেয়ও তাঁহাদের কিছুই নহে। তাঁহাদের আত্মীয় নাই, পরও নাই এবং এমন কোন কর্ম্মও নাই, যাহা সেই সকল সিদ্ধ জীবন্মুক্ত ব্যক্তিকে আবদ্ধ করিতে পারে। সৃষ্টির আদিতে অগ্নিপ্রভৃতির উষ্ণতাদি যেমন রূঢ় হইয়াছে, হরি ও হরাদির চরিত্র, বেশ ও ক্রিয়াদি নিয়মও তেমনি সৃষ্টির প্রথম হইতেই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এইরূপে দ্বিজাতিগণেরও কর্ম্ম-নিয়ম প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

যিনি মুখ্য ঈশ্বরেচ্ছারূপিণী অনাদি নিয়তি, তিনিই এই সকল কর্ম্মের ব্যবস্থাপিকা। কিন্তু যাহারা অজ্ঞ, অগ্নিপ্রভৃতির ক্রিয়াকলাপের ন্যায় তাহাদের ক্রিয়া নিয়ম সৃষ্টির প্রারম্ভে ঐরূপ রূঢ় হয় নাই। সৃষ্টির পর তাহারা সঙ্কেত ক্রমে বিভিন্ন ইহ পর কালের সুখ-দুঃখ-ফলজনক শাস্ত্রীয় এবং স্বভাব-কল্পিত অনুষ্ঠান সকল রাগাদিবশে নিজেরাই কল্পনা করিয়া লইয়াছে। অর্থাৎ অজ্ঞদিগের অনুষ্ঠিত ক্রিয়াফলও তাহারা স্ব স্ব কল্পনানুসারে পশ্চাৎ অনুভব ও ভোগ করিতে থাকে।

হে রাঘব! সদেহ-প্রসিদ্ধ চারি প্রকার মৌনের বৃত্তান্ত তোমায় বলা হইয়াছে; কিন্তু বিদেহ-মুক্ত-বিষয়ক মৌনের কথা তোমায় বলা হয় নাই। এক্ষণে সেই অবশিষ্ট মৌনের কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর। এই যে ভূতাকাশ, ইহা অপেক্ষা আত্মাকাশ-নামক চিদাকাশ নিতান্ত নির্ম্মল; তদ্ভাভাব প্রাপ্তিই পরম মঙ্গল-কর। যেরূপে তদ্ভাব লাভ করা যায়, বলিতেছি শ্রবণ কর। যাহাতে সম্যক্ জ্ঞান উৎপন্ন হয়, এহেন একনিষ্ঠ সমাধি এবং বিবেক-বিচারাদি-প্রসূত জ্ঞান দ্বারা যাঁহারা সম্যক্ অববুদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহারা সাংখ্যযোগী নামে নিরূপিত। ইহা ভিন্ন যাঁহারা প্রাণাদি বায়ু নিরুদ্ধ করিয়া পূর্ব্বোল্লিখিত হঠযোগাদির সাহায্যে অনাদি অনন্ত অনাময় ব্রহ্মপদে অধিরূঢ় হইয়াছেন, তাঁহারা যোগযোগী নামে নির্দ্দিষ্ট। যাহা সেই অকৃত্রিম শান্তপদ, তাহা সকলেরই প্রাপ্য। পরন্তু কেহ তাহা সাংখ্যা দ্বারা এবং কেহ বা তাহা যোগদ্বারা লাভ করিয়া থাকেন। যিনি সাংখ্য এবং যোগ এই উভয় পথকেই এক বলিয়া জানেন, তিনিই সেই শান্তপদের সাক্ষাৎকার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। তিনিই প্রকৃত জ্ঞানী পুরুষ; তাদৃশ জ্ঞানী পুরুষেরা দেখিয়া থাকেন, যাহা সাংখ্য দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়, যোগ দ্বারাও সেই পদ লব্ধ হইয়া থাকে। সুতরাং সাংখ্য এবং যোগ এই উভয়ই প্রাপ্য সম্বন্ধে এক। ঐ উভয় হইতেই তথাবিধ পদে স্থিতি লাভ করা যায়।

হে রাম! যাহাতে প্রাণ ও মন এই উভয়েরই বৃত্তি বিলয় ঘটে, এবং যাহা বাসনারূপ বাগুরা হইতে বহির্ভূত, জানিবে—সেই স্থিতিই পরম পদ। বহিরিন্দ্রিয়, অন্তরিন্দ্রিয় ও প্রাণাদির চেষ্টা এবং সে সকলের

পুঞ্জীভূত সংস্কার ও তদাত্মক চিত্ত এই সকলই সংসারের কারণ হইয়া থাকে। জ্ঞান কিম্বা যোগ দ্বারা ঐ সমুদায়ের একতর নাশ পাইলে সংসারেরও বিলয় ঘটিয়া থাকে। বালক যেমন বেতাল দর্শন করে, তেমনি মনই দেহকে দেখিয়া থাকে। ইহারই নাম সংসার; মনই সংসারের হেতু। সুতরাং মনের যদি লয় হয়, অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানরূপে পরিণতি ঘটে, তবে তাহার আর ঐ দেহ দর্শন ঘটে না। ফলে মনের শান্তিতেই সংসার শান্তি উপপন্ন হইয়া থাকে। মন অসৎ; তাহার অস্তিত্ব নাই; তদীয় উদয় কেবল মোহমাত্র। যেমন স্বপ্নাবস্থায় নিজের মৃত্যু দেখা যায়, তেমনি মনও মোহাবস্থায় দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই অলীক মন হইতেই এ সংসারের উদ্ভব; এই মন জ্ঞানে যখন বাধিত হইয়া যায়, তখন আমি বা আমার ইত্যাদি ভাব কোথায় থাকে? এবং ইহা উপদেশ্য, ইহা উপদেশ, এই উপদেশক, ইহা আমার বন্ধন, ইহা আমার মোক্ষ, এ সকল ভাবই বা কোথা হইতে আসিবে? ফলে মন যখন বাধিত হয়, তখন কিছুই কিছু নয়। সুদৃঢ় অদ্বৈত জ্ঞান, প্রাণাদির বিলয় এবং মনের বিলয়, এই কয়টীই মোক্ষ শব্দের অর্থ। ফলে উক্ত প্রকারত্রয়ই মোক্ষের কারণ।

রামচন্দ্র কহিলেন,—ভগবন্! প্রাণের বিলয় যদি মোক্ষের কারণ হয়, তাহা হইলে, আমি মনে করি, মৃত্যু হইলেই তো সর্ব্বজীবের মুক্তি হইতে পারে?

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! তত্ত্বজ্ঞান, মনের নাশ ও প্রাণের বিলয় এই তিনটীই মোক্ষের উপায়। কিন্তু ঐ উপায়ত্রয়ের মধ্যে মনের নাশই প্রধান সাধ্য; মনোলয় না হইলেই মুক্তি লাভ ঘটিবার নহে। সুতরাং যত শীঘ্র তাহা সম্ভব হয়, ততই মঙ্গলাবহ। আরও দেখ, মৃত্যু হইলেই যে প্রাণের লয় হয়, তাহা নহে। মৃত্যু একটা মূর্চ্ছা মাত্র; মূর্চ্ছাকালের ন্যায় মরণে ঐ প্রাণ গলিত সৈন্ধববৎ বাসনার আকারে অবস্থান করে। উৎপত্তিকালে পুনর্ব্বার উহার আবির্ভাব হইয়া থাকে। প্রাণ বহির্গত হইবার সমকালীন এ দেহের ঘুরঘুর ধ্বনি যখন নিবৃত্তি পাইয়া যায়,—যখন প্রাণ দেহকে পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করে, তখন বাসনা, কাম ও কর্ম্ম দ্বারা ভবিষ্যতে তাহার যে দেহ উপস্থাপিত হইবে, সেই দেহের আকার অনুভব

করিয়া সে বহিরাকাশে তথাবিধ দেহারম্ভের অনুকূল ভূতমাত্রা সহ সম্মিলিত হয়। অর্থাৎ প্রাণ এই দেহ পরিহারপূর্ব্বক ভাবনাময় দেহ আশ্রয় করিয়া বাহ্য বায়ুর সহিত আকাশে অবস্থান করে; একাকী অবস্থান করে না, সে বাসনাময় মনের সহিত একলোল হইয়া অবস্থান করে। প্রত্যেক জীবের বাসনা ও বাসনাময় মন ভিন্ন ভিন্ন; এইজন্য এক জীবের প্রাণ অন্য জীবের সহিত মিশ্রিত হয় না। দেহান্তরেও প্রাণ, বাসনাসহ সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। তাহার কারণ এই যে, ভাবী দেহের বাসনার সহিতই প্রাণ পূর্ব্বদেহ পরিহার করে। যেমন পুষ্পসৌরভ তিলে প্রবেশ করিয়া সেই তিলান্তর্গত তৈল সহ মিশিয়া যায়, তেমনি প্রাণও দেহান্তর-ঘটনায় তদীয় হৃদাকাশ ও তদন্তর্নিহিত বায়ুরাশির সহিত মিশ্রিত হইয়া থাকে। সুতরাং মৃত্যু হইলেই যে মন ও প্রাণের লয় হয়, এ কথা বলা যায় না। দেখ, জলপূর্ণ ঘট সাগরে মগ্ন হইয়া অদৃশ্য হইয়া যায়, এ কথা সত্য; কিন্তু তাহা যেমন বিনাশ প্রাপ্ত হয় না, তেমনি বাসনাসম্পৃক্ত মনও মরণ-ঘটনায় অদৃশ্যভাবে অবস্থান করে, তাহার একেবারে নাশ হয় না। সূর্য্য যেমন প্রভাহীন হইয়া অবস্থিতি করেন না, তেমনি প্রাণেরও মনের অভাবে অবস্থান ঘটনা সম্ভবপর নহে। যেমন তিত্তির পক্ষী তৃণান্তর না পাইয়া চঞ্চুমধ্য-গত তৃণাংশ বিসর্জ্জন করে না, তেমনি মনও জ্ঞান ব্যতীত প্রাণ পরিহার করে না। একমাত্র জ্ঞান হইলেই মন বাসনা হইতে বর্জ্জিত হয় এবং বাসনার অভাবে সে নিজেই নাশ প্রাপ্ত হয়। জ্ঞানোদয়ে মন প্রাণ হইতে স্পন্দ গ্রহণ করে না; মনের নিস্পন্দতায় একমাত্র শান্তিই অবশিষ্ট থাকে। জ্ঞানোদয়েই যে নিখিল বাসনার বিলয় ঘটে, তৎপ্রতি কারণ এই যে, তখন সমস্ত পদার্থেরই অস্তিত্ব লোপ পাইয়া যায়। এইরূপে দ্বৈত বাধ হওয়ায় বাসনারও বিনাশ হয়। এই সময় প্রাণ ও মন উভয়েরই বিলোপ ঘটিয়া থাকে। মন সে সময় প্রশান্ত হইয়া কদাচ আর দেহ ভাব দর্শন করে না। যে বাসনা আপনার নাশে পরম পদ লাভ করিবে, তাহারই নাম মন। কেন না, বাসনা মাত্রেই চিত্ত; বাসনার অভাবেই পরম পদ। বিজ্ঞগণের অভিমত এই যে, ঐ জ্ঞান সবাসন সমস্ত বস্তু নিরাকৃত করিয়া আত্মতত্ত্বে পরিণতি প্রাপ্ত হয় এবং সেই তত্ত্বই চরমে

অচল জ্ঞানরূপে অবস্থান করিয়া থাকে; ইহাই সংসারের পর্য্যন্ত। হে রাম! তত্ত্ব জ্ঞানোদয়ের পূর্ব্বতন সংসারভাব রজ্জুগত সর্পভ্রমের ন্যায় বিবেকমাত্রেই বিদূরিত হইয়া যায়। অদ্বৈত তত্ত্বের শ্রবণাদি অভ্যাস, প্রাণের নিরোধ ও চিত্তের ক্ষয়, এ সমুদায়ের মধ্যে একটী সিদ্ধ হইলে পরস্পর সকলই সিদ্ধ হইয়া থাকে। তালবৃন্ত দ্বারা ব্যজন করিতে করিতে সহসা তাহার স্পন্দন নিবৃত্ত হইলে বায়ুও যেমন শান্ত হয়, তেমনি প্রাণ-বায়ুর স্পন্দন ঘুচিয়া গেলে মনও শান্ত হইয়া থাকে। শরীর সত্ত্বে প্রাণ উৎক্রান্ত হইলে এইরূপ ক্রম হয়; আর যেখানে শাপাদি দ্বারা শরীর লয় পায়, তথাকার ক্রম এই যে, প্রাণবায়ু বাহ্যাকাশ-গত বায়ুর সহিত সম্মিলনে তদ্ভাব লাভ করে এবং সেই অবস্থায় এই দৃশ্যমান পদার্থ পরস্পরকে যথাবস্থরূপে অবলোকন করিতে থাকে। এই প্রাণবায়ু আকাশে যাদৃশ কর্ম্মোদ্ভাবিত সুর নর-পশু প্রভৃতির সবাসন দেহ দর্শন করে, তদনুরূপ ব্যবহারই ইহার অনুভূত হয়। বায়ুর স্পন্দন শান্ত হইয়া গেলে গন্ধ যেরূপে নিবৃত্তি পায়, মনের স্পন্দন শান্ত হইলেও প্রাণবায়ুর নিবৃত্তি সেই প্রকারই হইয়া থাকে। জীবের প্রাণ ও মন কখন পরস্পর বিযুক্ত হয় না, প্রত্যুত তিল-তৈলে সংক্রান্ত পুষ্পগন্ধবৎ উভয়ে মিলিত-ভাবেই অবস্থান করে। মনের যে স্পন্দন, তাহাই প্রাণ আর প্রাণের যে স্পন্দন, তাহাই মন; এই দুই পদার্থ পরস্পর রথ ও সারথিবৎ পরস্পর স্পন্দন সম্পাদন করে, কিম্বা অগ্নি ও উষ্ণতার ন্যায় আধার ও আধেয়ভাবে পরস্পর অবস্থান করিয়া থাকে। উহাদের মধ্যে একের অপায়ে উভয়েরই অপায় ঘটিয়া থাকে। উহারা স্ব স্ব বিনাশ দ্বারা উত্তম মোক্ষফল আনয়ন করিয়া দেয়। ফল কথা, প্রাণ ও মন বিনষ্ট হইয়া গেলে পরমোত্তম মোক্ষ লাভ হইয়া থাকে। অভ্যাসযোগে অদ্বৈত জ্ঞান গাঢ় হইলে দ্বৈতবোধ শান্ত হইয়া যায়; তখন মনও শান্তভাব লাভ করিয়া নিবৃত্ত হইয়া থাকে। প্রাণ যখন সেই মনেই লীন ও একীভাবে অবস্থিত, তখন মনের লয়ে তাহারও লয় সুনিশ্চয়। তুমি বিচার সহযোগে তোমার মনকে অনন্ত আত্মতত্ত্বময় করিয়া লইতে চেষ্টা কর। মন যদি আত্মতত্ত্বে লীন হয়, তাহা হইলে অবশেষে সেই একমাত্র আত্মতত্ত্ব স্থির হইয়া

থাকবে, যাহা পরম শ্রেয় এবং যাহা অজ্ঞান ও অজ্ঞানবাধক [আ]কার চিত্তবৃত্তির নিবৃত্তিঘটনায় অবশিষ্ট, সেই চিন্মাত্র পরম পদার্থেই প্রাণধারণা অবলম্বনপূর্ব্বক স্থির হইয়া থাক। উল্লিখিত একাত্ময় তত্ত্ব যতকালে না সুদৃঢ় হয়, তাবৎ পর্য্যন্ত তাহার অভ্যাস করা বিধেয়। ভাবনার প্রভাব এমনই যে, তাহার তীব্রতায় ভাবও অভাব হয় এবং অভাবও ভাব হইয়া থাকে। ফলে যাহা আছে বলিয়া ধারণা, তাহা নাই; আর যাহা নাই বলিয়া ধারণা, তাহাও আছে বলিয়া অবধারিত হইয়া থাকে। আহারের অভাবে শরীর যেমন ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, তেমনি যিনি প্রত্যাহার-পরায়ণ পুরুষ; তাঁহারও প্রাণ ও মন নির্ব্বিকল্প সমাধিযোগে লীন হইয়া থাকে। প্রাণের সহিত মনের লয় হইলে একমাত্র পরম বস্তুই অবশিষ্ট থাকেন। মন যাহাতে একতান হয়, চিরাভ্যাসে মনের অপরাপর অশেষ বাহ্যাকার ক্ষয় প্রাপ্ত হওয়ায় ক্ষণেকের মধ্যে মন সেই ভাবই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এইরূপে মন যখন ব্রহ্মে একতান হয়, তখন নির্ব্বিকল্প সমাধির পরিপাকদশায় মনের ব্রহ্মভাব প্রাপ্তি ঘটে। এই সমস্তই অবিদ্যা; অবিদ্যার অস্তিত্ব নাই এবং তত্ত্বজ্ঞানের অভ্যাস ব্যতীত পরম পদ প্রাপ্তিরও উপায়ান্তর দেখি না; প্রমাণ-প্রয়োগের সাহায্যে বুদ্ধিপূর্ব্বক ইহাই স্থির করিয়া তত্ত্বজ্ঞানেরই অভ্যাস করিবে। ধ্যান-ধারণাদির অবলম্বনেই তত্ত্বজ্ঞানের অভ্যাস দৃঢ় হইয়া উঠিবে। শরদাগমে জলদাবলী বিলীন হইলে তদনুগত তুষারপুঞ্জও যেমন নিবৃত্তি পাইয়া যায়, তেমনি মনের যখন শান্তি হয়, তখন এই সংসার-মরীচিকারও অবসান ঘটে।

হে রাম! চিত্তের নামই অবিদ্যা; সুতরাং বিচারালোচনায় মনকে ব্রহ্মাকারে পরিণামিত করিয়া তথাভূত মনের সাহায্যে চিত্তের উচ্ছেদ সাধন কর। চিত্তের পরিক্ষয় হইলে তদাধার আত্মার নির্ব্বিশেষ স্থিতি হয় এবং তাহাই পরম পদ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। অভাব বা নাশ পদার্থটাকে পরম পদ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয় না। মন পরম পদে মুহূর্ত্তমাত্র বিশ্রান্তি লাভ করিতে পারিলেই ব্রহ্মাকারে পরিণত হয় এবং তাহাতেই সে নিরতিশয় আনন্দাস্বাদ প্রাপ্ত হইয়া পুনর্ব্বার আর ব্যুত্থান

করিতে চাহে না। জ্ঞান ও যোগ দ্বারা এইরূপ পরম পদ-প্রাপ্তি-ফলই লব্ধ হইয়া থাকে। জ্ঞান দ্বারাই হউক, আর যোগ দ্বারাই হউক, তোমার চিত্ত যদি বিশ্রান্তি লাভ করিয়া ক্ষণেকের জন্যও তৎসত্তা প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলেও তোমার চিত্তের উৎপত্তি আর কখনই হইবে না। যে চিত্তে অবিদ্যা নাই, তাহাই সত্ত্বশব্দে অভিহিত। তাদৃশ চিত্তই সংসার-বীজ দগ্ধ করিয়া তাহার অঙ্কুরোৎপাদিকা শক্তি নষ্ট করিয়া দেয়। চিত্তে যখন সত্ত্বের উদয় হয়, তখন আর ব্রহ্মভাবের বিচ্ছেদ ঘটনা হয় না। কিন্তু তাদৃশ সত্ত্বনিষ্ঠ ব্যক্তি এ সংসারে বিরল। যে মহাত্মা সত্ত্বভাব উপগত হইয়াছেন, তাঁহার অবিদ্যা বিগলিত এবং বাসনাবাগুরা ছিন্ন হইয়াছে। অজ্ঞ জন সম্ভাবনা করিতে পারে না বলিয়া যাহা শূন্যপ্রায় এবং প্রাজ্ঞ-দর্শীর যাহা পরম জ্যোতিঃ, তিনি তাহাই অবলোকন করিয়া শান্তি লাভ করেন।

হে সুভগ! জীবন্মুক্ত অবস্থায় বর্ণিত ত্রিবিধ উপায় যোগ অভ্যাস করিতে করিতে যাহার জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তিরূপ ভ্রান্তি ও ভ্রান্তিবীজ-দর্শন বিগলিত হইয়া গিয়াছে এবং অবিদ্যার অপগমে যাহা দগ্ধ বস্ত্রবৎ প্রতিভাসমাত্রে অবশিষ্ট, তাদৃশ বিলীন মনই সত্ত্ব আখ্যায় অভিহিত। স্পর্শমণির সংসর্গে তাম্র সুবর্ণভাব প্রাপ্ত হইলে পুনর্ব্বার যেমন আর কলঙ্ক-মলীসম তাম্রভাব উপগত হয় না, বাসনাবীজ দগ্ধ হইয়া শক্তি-হীন হইলে ঐ মন তেমনি আর কখনই রাগ-দ্বেষাদি যোগে মলিন সংসার দর্শন করে না।

ঊনসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬৯

সপ্ততিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! উল্লিখিত বিচারালোচনায় অবিদ্যার অবসান হইলে জীব অজীব হয় এবং চিত্ত অচিত্ত হইয়া থাকে; সুতরাং সেই অবস্থা-কেই মোক্ষ নামে অভিহিত করা হয়। মৃগতৃষ্ণায় যেমন জলের অস্তিত্ব নাই, জল তাহাতে ভ্রমাত্মক, বিচারেই তাহার লয় হয়, তেমনি ঐ মন এবং তুমি আমি প্রভৃতি অহন্তাবও অসৎ; যদি ক্ষণকাল বিচার করা যায়, তাহা হইলেই উহার অপায় ঘটিয়া থাকে। এক্ষণে এই সংসাররূপ ভ্রান্তি-বিষয়ে জনৈক বেতালকৃত প্রশ্ন আমার স্মৃতিপথে সমুদিত হইল। আমি সেই প্রশ্নগুলি বলিতেছি, শ্রবণ কর।

পূর্ব্বে বিন্ধ্যাচলের মহারণ্যে এক বিপুলাকৃতি বেতাল বাস করিত। একদা ঐ বেতাল অবজ্ঞার সহিত কোন এক রাজার রাজ্যে বধযোগ্য প্রজা-দিগকে বিনাশ করিবার জন্য আগমন করিল। ইতিপূর্ব্বে এই বেতাল কোন এক সজ্জন রাজার রাজ্যমধ্যে বহুল বলি-উপহার প্রাপ্ত হইয়া নিত্য তৃপ্তভাবে সুখে বাস করিত। সে কালে ঐ বেতাল ক্ষুধিত হইলেও বিনা কারণে বা নিরপরাধে কাহাকে সম্মুখে পাইয়াও হনন করিত না। কেন না, সাধুপ্রকৃতি ব্যক্তিগণ ন্যায়দর্শীই হইয়া থাকেন। বেতাল যে দেশে বাস করিতেছিল, কালক্রমে সেখানে বধ্য জন দুর্ল ভ হইয়া উঠিল। তখন অগত্যা সেই বনবাসী বেতাল ন্যায় ও যুক্তির আশ্রয় লইয়া ক্ষুধার তাড়নায় আহারার্থ নগরান্তরে উপস্থিত হইল। সেখানে গিয়া দেখিল—তথাকার ভূপতি নিশাকালে দুষ্ট জনের অন্বেষণ ও তস্করাদির বধের জন্য বহির্গত হইয়াছেন। তাঁহাকে দেখিয়া সেই দারুণস্বভাব নিশাচর ঘন-ঘোর শব্দে কহিল,—রাজন্! আমি এক ভীষণপ্রকৃতি বেতাল; এক্ষণে আপ-নাকে প্রাপ্ত হইলাম। অতএব আপনি আর এখন কত দূর অগ্রসর হইবেন? আপনাকে অদ্য বিনষ্ট হইতে হইল। আপনি আমার অদ্যকার ভোজ্য হইলেন।

রাজা কহিলেন,—নিশাচর! যদি তুমি আমাকে এখন বল প্রকাশ

করিয়া অন্যায়পূর্ব্বক ভক্ষণ কর, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তোমার মস্তক সহস্রধা চূর্ণ হইবে।

বেতাল বলিল,—রাজন্! আমি অন্যায় করিয়া আপনাকে ভক্ষণ করিতেছি না; যাহা ন্যায্য, তাহাই আমি আপনাকে বলিয়াছি। রাজা আপনি; ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে সকল অর্থীর আশা পূর্ণ করাই আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্ম। অতএব হে রাজন্! আমার এই প্রার্থনা অসম্ভব প্রার্থনা নহে; আপনি ইহা পূরণ করুন। এক্ষণে আমি কতকগুলি প্রশ্ন আপনার নিকট করিতেছি, আপনি সে সমুদায়ের যথাযথ উত্তর প্রদান করুন।

এই সকল ব্রহ্মাণ্ড কোন্ সূর্য্যের রশ্মিসমূহের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পরমাণু?

কোন্ পবনে মহা গগন-রেণু স্ফুরিত হয়?

এক স্বপ্নের পর অন্য স্বপ্ন হয়, এই নিয়মে শত শত সহস্র সহস্র স্বপ্ন হইতেছে ও যাইতেছে; কিন্তু যিনি সেই সমুদায়ের প্রকাশক, তিনি আপনার স্বচ্ছতা ও সত্যতা পরিত্যাগ করিয়াও করেন না; কে তিনি?

কদলীস্তম্ভের অন্তরে এবং তদন্তরে তদন্তরে যেমন কেবলই বল্কল মাত্র; তেমনি কে সকলের অন্তরে অন্তরে আপনিই অণুরূপে বিরাজ করেন? ফলে কদলী-দলবৎ কে এই সকল অসার পদার্থের মধ্যগত সাররূপে অবস্থিত?

এই যে অতি মহৎ বলিয়া প্রসিদ্ধ ব্রহ্মাণ্ড, এবং এই যে তদন্তর্গত আকাশ, চতুর্দ্দশ ভুবন, সূর্য্যমণ্ডল ও সুমেরু শৈল, এ সকল কোন্ স্বস্বভাব অণুর পরমাণু?

স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতাল, এই জগৎত্রয় কোন অবয়বহীন সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম অথচ মহাগিরি প্রায় প্রকাণ্ড পদার্থের ঘনতর মজ্জাসার?

হে আত্মঘাতিন্, দুরাত্মন্! রাজন্! যদি তুমি এই মৎকৃত ছয়টী প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতে না পার, তাহা হইলে এই মুহূর্ত্তেই কৃতান্ত-কৃত জগৎগ্রাসের ন্যায় তোমাকে এবং তোমার রাজ্যস্থিত সমস্ত প্রকৃতি-পুঞ্জকে সবলে ফলের ন্যায় গ্রাস করিয়া ফেলিব।

সপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭০ ॥

একসপ্ততিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! বেতাল তাহার প্রশ্নগুলির উত্তর দিবার জন্য রাজাকে বলিলে, রাজা হাস্য করিয়া স্বীয় দশন-কিরণচ্ছটায় আকাশ ও আপনার পরিধেয় বসন উদ্ভাসিত করত সেই প্রশ্নাবলীর উত্তর প্রদানে উদ্যত হইলেন। রাজা কহিলেন,—হে বেতাল! এই যে তোমার আমার আশ্রিত ব্রহ্মাণ্ড, ইহা যেন একটা ফল; এই ফল অজর এবং ইহা উত্তরোত্তর দশ গুণাধিক ভূমি, জল, অনল ও অনিল প্রভৃতি ত্বগাবরণে আবৃত। এই প্রকার সহস্র সহস্র ফল যাহাতে প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান, তথাবিধ চঞ্চল পল্লবময় অতি বিস্তৃত বিপুল শাখা আছে; তাদৃশ সহস্র সহস্র শাখা প্রশাখাশালী এক অতি দুর্লক্ষ্য প্রকাণ্ড মহাবৃক্ষ বিরাজ করিতেছে। তাদৃশ সহস্র সহস্র বৃক্ষব্যাপ্ত অন্য অসংখ্য তরুগুল্ম-পরিবৃত এক অতি মহান্ কানন বিদ্যমান। তাদৃশ সহস্র সহস্র কানন-পরিব্যাপ্ত বিশাল বিস্তীর্ণ শৃঙ্গ আছে। তাদৃশ সহস্র সহস্র শৃঙ্গময় এক বৃহৎ পার্ব্বত্য প্রদেশ বিদ্যমান। তথাভূত সহস্র সহস্র প্রদেশ লইয়া মহাদেশ অবস্থিত। তাদৃশ সহস্র সহস্র মহাপ্রদেশ যাহার অন্তর্গত, এরূপ এক বৃহৎ দ্বীপ বিদ্যমান। ঐ দ্বীপ মহান্ হ্রদ ও নদনদী দ্বারা পরিব্যাপ্ত। ঐ প্রকার সহস্র সহস্র দ্বীপপুঞ্জ যথায় বিদ্যমান, তথাবিধ বিচিত্র রচনাময় এক মহা-পীঠও অবস্থিত। তাদৃশ সহস্র সহস্র মহাপীঠময় পৃথ্বী-পরিব্যাপ্ত এক অনন্ত বিস্তীর্ণ মহাভুবন বিদ্যমান। তথাবিধ সহস্র সহস্র মহাভুবন-সমন্বিত গগন-পীঠবৎ ভীষণাকার এক মহান্ অণ্ড অবস্থিত। তাদৃশ সহস্র সহস্র মহাণ্ড যথায় করণ্ডকরাজির ন্যায় বিরাজমান,তথাবিধ এক বিপুল জলাধার মহাসাগর অবস্থিত। তাদৃশ সহস্র সহস্র মহাসাগর যদীয় জঠরমধ্যগত জলরাশি, এবম্বিধ এক মহাপুরুষ বিরাজ করিতেছেন। ঐ মহাপুরুষ সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বোন্নত। তথাভূত লক্ষ লক্ষ মহাপুরুষ যদীয় বক্ষোবিলম্বিনী মালার ন্যায় অবস্থিত, তাদৃশ অপর এক পরম পুরুষ বিরাজিত আছেন।

তথাবিধ সহস্র সহস্র মহাত্মা মহাপুরুষ যদীয় মণ্ডলে কেশ ও রোমরাজির ন্যায় বিরাজমান, তাদৃশ এক মহান্ সূর্য্য অবস্থিত। এই এক মহাসূর্য্যই নিত্যোদিত, নিত্য উদ্ভাসিত ও নিত্য প্রতিষ্ঠিত। ইনি এক হইলেও সাধারণের দৃষ্টিতে বহুসংখ্যক। প্রত্যক্ দৃষ্টি হইতে অপর পরাক্ দৃষ্টিতে প্রতিভাসিত, এই সকল প্রাণিপুঞ্জের প্রত্যক্ষভূত রুদ্রাদি ব্রহ্মাণ্ড পর্য্যন্ত অসংখ্য কল্পনাই ঐ সূর্য্যের দীপ্তি। এই যে ব্রহ্মাণ্ড দৃশ্যমান, ইহা উহাঁর সেই দীপ্তিচ্ছটার ত্রসরেণু। উল্লিখিত প্রভাব-সম্পন্ন সূর্য্য বলিয়া যাঁহাকে বর্ণন করিলাম, তিনি চিদাত্মা। ঐ চিৎসূর্য্য এই নিখিল বিশ্বের তাপদাতা ও প্রকাশকর্ত্তা। ইনিই বিজ্ঞানাত্মা—জীব এবং ইনিই পরমাত্মা—ব্রহ্ম। এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডরূপ ভুবনাভোগ ইহাঁরই ত্রসরেণু। সৌরালোকে এ জগতের যেমন শোভা হয়, তেমনি সেই বিজ্ঞান চিৎসূর্য্যের দীপ্তিচ্ছটাতেই এই জগদাকার দিনশ্রীর প্রকাশ ও স্ফূর্ত্তি হইতেছে এবং জগতের সত্তা তাহাতেই প্রতিষ্ঠিত আছে।

হে বেতাল! মায়াশবল ব্রহ্মই এই ত্রিলোক-মণ্ডপ; উল্লিখিত মহাসূর্য্য এই ত্রিলোক-মণ্ডপেরই প্রকাশক। যিনি তত্ত্বজ্ঞানের মুখ্য অধিকারী, তাঁহার নিকট শাস্ত্রচর্চ্চা-জনিত সাক্ষাৎকার বিশেষ দ্বারা ঐ পরম সূর্য্য আত্মরূপে প্রথিত হইয়া থাকেন। যাহারা অনধিকারী, তাদৃশ প্রাণিবর্গের নিকট ইনি অস্ফুটরূপে বিরাজমান। অজ্ঞ লোকেরা জীব ও জগৎ এই উভয়ের ভেদভ্রমে ভ্রান্তিগ্রস্ত; পরন্তু যাঁহারা অভ্রান্ত, তাঁহারা একমাত্র পরমাত্মা ব্যতীত বাস্তব পক্ষে আর কিছুই আছে বলিয়া জানেন না বা দেখেন না। তাই বলিতেছি, হে বেতাল! তুমি গর্ব্ব পরিহার কর, শান্ত হও, তোমার প্রশ্নের আড়ম্বর পরিত্যাগ কর।

এক সপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭১ ॥

দ্বিসপ্ততিতম সর্গ।

রাজা কহিলেন,—হে বেতাল! কালসত্তা, আকাশসত্তা ও স্পন্দসত্তা, এই তিন সত্তাই চিন্ময়ী। উহারা চিন্ময়ী হইলেও অবিশুদ্ধা অর্থাৎ মায়া-সহায়া। যাহা কেবলই চেতন, তাহাই শুদ্ধসত্তা এবং তাহাই পরম পাবনী বলিয়া অভিহিতা। কাল অর্থে মহাকাল রূপিণী চিৎ, আকাশ অর্থে চিৎ-সম্বলিত মায়াকাশ, এবং স্পন্দ অর্থে ক্রিয়াশক্তি-প্রধান সূত্রাত্মা। যাহা ক্রিয়াশক্তি-প্রধান সূত্রাত্মা, বা মূল প্রাণাত্মা, তাহাতেই যেমন কুসুমাঙ্গে আমোদ বা সৌগন্ধ্য স্ফুরিত হয়, তেমনি এই সকল চলনশীল রজঃ অর্থাৎ নানা বিকার পরিস্ফুরিত হইতেছে। আরও একটু স্পষ্ট করিয়া বলি, তোমার যেন এরূপ সন্দেহ উপস্থিত হয় না যে, পরমাত্মাই যখন সমগ্র বস্তুতে অনুগত সত্তাস্বরূপ, তখন তাঁহাতে আবার যে কালাদি সত্তার পরিস্ফুরণ, এতাদৃশ আধার আধেয়-ব্যপদেশ কি প্রকারে সম্ভব? এই-রূপ সন্দিহান হইতে বলি না; তাহার কারণ এই যে, দেখ,—পুষ্প যেমন স্বীয় দেহে স্বতই আমোদরূপ ভেদ কল্পনা করিয়া অপনাতেই আপনি কল্পিতাত্মক আমোদ বা গন্ধরূপ আধেয় লইয়া বিরাজিত, তেমনি যাহা পর-মার্থ সত্তা, তাহাই আপনাতে কালাদি সত্তা-ভেদ কল্পনা করিয়া নিজাধারে নিজেই আধেয় হইয়া অবস্থান করিতেছে। ইহা হইল দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর। এক্ষণে তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর বলা হইতেছে। এই জগৎই একটা মহাস্বপ্ন; ব্রহ্ম ঈদৃশ মহাস্বপ্ন হইতে অন্য মহাস্বপ্ন উপগত হইলেও অবিকৃত। তিনি বরাবর একই ভাবে আছেন; তাঁহাতে স্বপ্নদোষ-জন্য সম্পর্ক নাই; তিনি নিঃসঙ্গ জ্যোতীরূপে বিরাজিত। এতাদৃশ বোধমাত্র নিবন্ধন ব্রহ্ম কেবল সর্ব্বত্রই শান্তভাবে বিতত। ইনি সেই সেই মহাস্বপ্নে নির্লিপ্ত। ইহাই তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর। চতুর্থ প্রশ্নের উত্তর যথা—কদলীস্তম্ভ যেমন অন্তরে অন্তরে পত্ররূপে প্রকাশ পাইয়া স্তম্ভাকার হয়; কিন্তু তাহার অন্তরে কেবল সেই পত্রই বিদ্যমান, এই বিশ্বও তেমনি অন্তরে অন্তরে ব্রহ্মেই বিবর্ত্তিত ও অবান্তর কারণে পরগতি-প্রাপ্ত হয়;

পরন্তু অন্তরে অন্তরে সেই সেই অণুই বিরাজ করিতেছে। অপিচ এরূপও বলা যায়, রম্ভাস্তম্ভের উপরের স্তর অসার, তন্নিম্নগত স্তর অসার ও ক্রমিক সূক্ষ্মাকার; এইরূপে যাহা সর্ব্বান্তর ও সর্ব্বাপেক্ষা অতি সূক্ষ্ম, তাহাই রম্ভাস্তম্ভের সার বলিয়া গণনীয়। উক্ত ক্রমানুসারে ব্রহ্মবিবর্ত্ত বিশ্বের পরিণামী দেহাবয়বে পঞ্চকোষমধ্যে ব্রহ্ম সর্ব্বাধিষ্ঠান ও সর্ব্বান্তর বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই বিবর্ত্ত বিশ্বস্থিতিস্তারাদি নিমিত্ত সেই ব্রহ্ম বস্তু সৎ, ব্রহ্ম, আত্মা, ইত্যাদি নানা নামে কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। পরন্তু যদি বাস্তব পক্ষে বুঝা যায়, তবে প্রতীত হওয়া যাইবে, সেই ব্রহ্ম বস্তু সর্ব্বধর্ম্ম-বিরহিত; তাহাতে কোন ব্যপদেশান্তর নাই, বা তাহা অন্য কোন কিছুই নহে। ভাবিয়া দেখ, পটের যাহা পটসত্তা, তাহা তন্তুসত্তায় পর্য্যবসিত হয়। এইরূপ অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত ক্রমে তন্তু-সত্তা কার্পাস-সত্তায়, তৎসত্তা ফলসত্তায়, তৎসত্তা গুল্মসত্তায় এবং তৎসত্তা বীজ, মৃৎ ও জলাদি-সত্তায়, এই এইরূপে যে যে সত্তা বিভাবিত হয়, সেই সেই সত্তা অনুভবরচিত আকার পরিহারপূর্ব্বক রম্ভাস্তম্ভবৎ সেই সেই অনুভবরূপ চিন্মাত্রেই পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। সুতরাং সেই নির্ম্মল চিন্মাত্রই এই জগদাকারে বিস্তৃত রহিয়াছে। ক্রমে সমুদায় সত্তা যে এক মহাসত্তায় গিয়া পরিসমাপ্ত হয়, সেই মহাসত্তাই শাস্ত্রবাক্যে চিৎ ব্রহ্ম নামে নিরূপিত। সুতরাং তিনিই সকলের সার, অন্য সমস্তই রম্ভাত্বকের ন্যায় অসার। পরমাত্মা সূক্ষ্ম ও সুদুর্লভ; তাই তিনি পরমাণু, আবার সেই পরমাত্মাই অনন্ত ও অসীম, তাই তিনি ব্রহ্মাণ্ডাদি মেরুগিরি যাবৎ সকলেরই মূলাধার। এই চতুর্থ প্রশ্নের উত্তর বলা হইল। অতঃপর পঞ্চম প্রশ্নের উত্তর যথা—এই ব্রহ্মাণ্ডাদি নিখিল জগৎ সেই অণু ও অনন্ত পুরুষেরই অণুস্বরূপ। সেই সেই আকারগত অণু হইতেও অণুতর পরিচ্ছিন্ন চিদংশ দ্বারা ঐ ব্রহ্মাণ্ডাদি পঞ্চক পরিচ্ছেদ্য। সুতরাং স্বপ্নাবলোকিত ব্রহ্মাণ্ডাদির ন্যায় উহারা স্বরূপ-বিরাহিত এবং সূক্ষ্মতম নাড়ীরন্ধ্রে বিভাসিত পরমাণুর ন্যায়ই বিরাজিত। ইহা পঞ্চম প্রশ্নের উত্তর। অতঃপর ষষ্ঠ প্রশ্নের উত্তর বলা যাইতেছে। উল্লিখিত ব্রহ্ম-পুরুষ চক্ষুরাদির অগোচর; তাই তিনি পরমাণু এবং তিনি সর্ব্বব্যাপী বলিয়া মহাগিরি। অধ্যারোপ-দৃষ্টিতে নিখিল মূর্ত্তামূর্ত্ত পদার্থই ঐ ব্রহ্ম-

পুরুষের অবয়বস্বরূপ, আবার অপবাদক্রমে তিনিই নিরবয়ব। হে সাধো! স্বর্গাদি জগৎত্রয় ঐ জ্ঞপ্তিস্বরূপেরই মজ্জা।

ও হে বেতাল! এই ভূলোকাদি নিখিল লোকই উল্লিখিত বিজ্ঞান-পুরুষের অন্তর্নিবিষ্ট; যাহা মজ্জা, তাহার মধ্যে স্থিতিই প্রসিদ্ধ; অতএব ত্রিজগৎ যখন উক্ত জ্ঞপ্তি পুরুষের অন্তরবস্থিত, তখন সু-প্রসিদ্ধ জগত্রিতয় অবশ্যই মজ্জানামে অভিহিত হইবার যোগ্য। এই ত ষষ্ঠ প্রশ্নের উত্তর বলা হইল। ওহে বালকবৎ অবোধ বেতাল! এই সকল যে বিজ্ঞানের লীলা-কৌশল এবং যাহার অধীনতায় এ সকলই প্রকাশমান, সে বিজ্ঞান তোমার অলজ্ঘ্য। তুমি ইহা অবগত হইয়া এবং আমার এই উক্তি তুমি শ্রবণ করিয়া নিজ স্বরূপ অনুভব কর এবং দর্প পরিহার করিয়া শান্ত হইয়া থাক।

দ্বিসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭২ ॥

ত্রিসপ্ততিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন—রাম! বেতাল রাজার মুখে তৎকৃত প্রশ্নোত্তর-ব্যপদেশে ঐ সকল তত্ত্ব কথা শ্রবণ করিয়া তদীয় বিচারক্ষম বুদ্ধিবলে বুঝিল যে, রাজা একজন পরম তত্ত্বজ্ঞানী। সুতরাং বেতালের তখন অন্তরে শান্তি হইল। বেতাল শান্ত-চিত্ত হইয়া সেই একমাত্র প্রশস্ত চরম বস্তু বুঝিতে পারিল। তাহার সেকালে ক্ষুধা তৃষ্ণা কিছুই রহিল না; সে সমস্তই ভুলিয়া গেল এবং সমাধিস্থ হইয়া অবস্থান করিতে লাগিল।

হে রাঘব! আমি তোমার নিকট বেতালকৃত প্রশ্নপরম্পরা এবং সেই সকল প্রশ্নের উত্তরে রাজার উক্তি তোমার নিকট ব্যক্ত করিলাম। রাজা যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, তদনুসারে জানিবে—এই বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড

সেই একমাত্র সুসূক্ষ্ম চিদণুতত্ত্বে অবস্থিত। এই বিশাল বিশ্ব বিবর্ত্ত-নিয়মে সেই চিৎপরমাণুর একাংশে অবস্থান করিতেছে; বিচারক্ষ উহার আর স্থায়িত্ব সম্ভব হয় না। দেখ, বালকেরা ভ্রান্তির ঘোরে ভয়ঙ্কর বেতাল-কলেবর কল্পনা করিয়া লয়; যখন ভ্রান্তি চলিয়া যায়, তখন কোথায় কোন্ অনন্তে তাহার বিলয় হয়। যেখানে তাহা লয় পায়, তাহাকেই তুমি সেই পরম পদ বলিয়া বুঝিয়া লও। যত কিছু বিষয় বা দৃশ্যজাল আছে, তাহা হইতে মনকে আকর্ষণ কর, নিশ্চল অন্তরাত্মায় প্রতিষ্ঠিত হও এবং যথোপস্থিত কর্ম্ম সকল নির্লিপ্তভাবে করিয়া যাও। এইরূপ করিলে তোমার শান্তি হইবে। হে মুনিকল্প, মননশীল! তুমি মনকে মনের সাহায্যে আকাশবৎ নির্ম্মল করিয়া লও এবং তোমার যে কিছু বৃত্তি, তাহা সেই একই বস্তুতে বিলীন করিয়া চিত্তের নিবৃত্তি বিধান কর। এইরূপ করিলেই তুমি সর্ব্বত্র ব্রহ্মভাব দেখিতে পাইয়া সর্ব্বত্র সমদর্শী হইতে পারিবে। যাহাতে ঐরূপ হওয়া যায়, তুমি এখন তাহাই হইবার চেষ্টা কর। এই ভাবে তোমার বুদ্ধি স্থির হউক; তুমি মোহ-বিরহিত হও। এইরূপ হইতে পারিলে আর যথালব্ধ বিষয়ের অনু-ধাবন করিলে নরপতি ভগীরথের ন্যায় অন্যের অসাধ্য কার্য্যও সুসাধ্য করা যায়। ভগীরথের পূর্ব্বতন সগর ও অংশুমান্‌প্রমুখ রাজন্যগণ যাহা সুসাধ্য বলিয়া বুঝেন নাই, ভগীরথ নিজের শান্তি, তৃপ্তি ও সমদর্শিত্ব প্রভৃতি গুণে গঙ্গাকে অবতারিত করিয়া সেই কার্য্য সুসাধ্য বলিয়া প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। এইরূপে যে ব্যক্তির চিত্ত সম্যক্ প্রকারে শান্ত হয়, অন্তঃ-করণবৃত্তি পরিতৃপ্ত হইয়া থাকে, এবং অন্তরে যিনি সম-সুখময় আত্মায় নিত্যকাল বিরাজ করিতে থাকেন, তাঁহার চেষ্টায় অতি দুর্লভ বাঞ্ছিত বিষয়ও সুসিদ্ধ হইতে পারে।

ত্রিসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত ৭৩॥

চতুঃসপ্ততিতম সর্গ।

রামচন্দ্র কহিলেন,—ভগবন্! নরপতি ভগীরথের চিত্তে পূর্ণতারূপ চমৎকৃতি অভ্যুদিত হইয়াছিল; তাই তিনি গঙ্গাকে অবতারিত করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার সেই গঙ্গাবতরণ-ব্যাপার সম্পন্ন হইয়াছিল কিরূপে? তাহা বর্ণন করুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! পূর্ব্বে এই সসাগরা ধরার অধীশ্বর, কোশলমণ্ডলীর তিলক, ভগীরথনামক জনৈক পরম ধার্ম্মিক রাজা ছিলেন। চিন্তামণির নিকট যেরূপ প্রার্থনাই কর, সঙ্কল্পমাত্রেই তাহা যেমন প্রাপ্ত হওয়া যায়, তেমনি প্রার্থিগণ সেই রাজার নিকট যে প্রার্থনাই জানাইত, তৎক্ষণাৎ তাহা প্রাপ্ত হইত। প্রার্থী জনের প্রার্থনা পূরণে তাঁহার বদনমণ্ডল সর্ব্বদাই প্রসন্ন থাকিত। সাধুগণের যাহাতে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ঘটে, তাহার জন্য নিয়তই তিনি ধন দান করিতেন। ভগীরথ যদি ধর্ম্মসঙ্গত-ভাবে কোন আয়-স্থানে তৃণ মাত্রও প্রাপ্ত হইতেন, তথাচ কামধেনুর ন্যায় সাদরে তাহা গ্রহণ করিতেন। হীরক-বেধের যন্ত্র যেমন অতি দুর্ভেদ্য হীরকখণ্ডকেও সচ্ছিদ্র করিয়া ফেলে, তেমনি ভগীরথ অতি প্রবল শত্রুদিগকেও শস্ত্রক্ষত এবং তাহাদের চেষ্টা-চরিত্রাদি ভেদ-ভিন্ন করিয়া দিতেন। তিনি সুযোগ মত দুর্জ্জনদিগকে বশীভূত করিয়া তাহাদের চরিত্র শোধন করিতেন। যখন তাঁহার দ্বারা শত্রু-দেশ আক্রান্ত হইত, তখন তদীয় প্রতাপে সমুজ্জ্বল যন্ত্রচক্রবৎ রথচক্রনেমি-রেখায় সেই সেই শত্রুবাসমণ্ডল অঙ্কিত হইয়া যাইত। তাঁহার দেহশ্রী ধূমহীন বহ্নির ন্যায় প্রতিভাত ছিল। তিনি শ্রান্ত হইয়াও দৈন্যানুভব করিতেন না। দিবাকর যেমন নিকেতনস্থ নৈশ অন্ধকার নিরস্ত করেন, সেই নরপতি তেমনি প্রজাপালনার্থ সতত সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিয়া পরিশ্রান্ত হইলেও প্রকৃতিপুঞ্জের দৈন্য দুঃখ দূর করিয়া দিতেন। তিনি আপনার অসাধারণ প্রতাপ পরাক্রমাদি প্রকাশ করিয়া শত্রুর সমীপে সমস্তাৎ যেন

অগ্নিকণধারা ছড়াইয়া দিতেন। তাঁহাকে দেখিয়া মনে হইত, তিনি যেন তখন মধ্যাহ্নে তৃণাদি মধ্যে অগ্নিচ্ছটার উদ্গিরণকারী সূর্য্যকান্তমণির সমুজ্জ্বল আকারে বিভাত হইতেন। সেই নরপতি সাধারণতঃ মৃদু ও স্নিগ্ধভাব অবলম্বন করিয়া সর্ব্ব সাধারণেরই মনস্তুষ্টি সম্পাদন করিতেন। স্নিগ্ধ সুধাকরের করস্পর্শে চন্দ্রকান্ত মণি যেমন দ্রবীভূত হয়, স্নিগ্ধ ব্রহ্মতত্ত্ব-বেদীর নিকট সেই ভগীরথের অন্তঃকরণও তেমনি আর্দ্র হইয়া যাইত। তিনি গঙ্গাকে মর্ত্ত্যে অবতারিত করিয়া গঙ্গাপ্রবাহরূপ জগদ্‌যজ্ঞো-পবীতের তৃতীয় গুণ পূর্ণ করিয়াছেন। বিশদ কথা এই যে, পবিত্রতা হেতু যজ্ঞোপবীত ত্রিগুণাত্মক; এ জগতের যজ্ঞোপবীতাকৃতি গঙ্গাপ্রবাহ স্বর্গে ও পাতালে দ্বিধারায় দ্বিগুণাত্মক ছিল। মহারাজ ভগীরথ গঙ্গাকে মর্ত্ত্যে আনয়ন করিয়া ত্রিধারায় ত্রিগুণাত্মক করিয়া দেন। যেমন সকল স্থানের অর্থিবর্গই ধন দ্বারা পূর্ণমনোরথ হয়, যেরূপে সেই রাজা নিজেই অর্থিবর্গের প্রার্থনা পূর্ণ করিতেন, তেমনি তিনি অগস্ত্য-শোষিত সাগর দুষ্পুর হইলেও গঙ্গাকে ভূতলে অবতারিত করিয়া তৎপ্রবাহে পূর্ণ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে ব্রহ্মশাপে তাঁহার স্বজাতি সগরপুত্রগণ পাতালগর্ভে নিপতিত হইয়াছিল। সেই লোকবন্ধু ভগীরথ সুরধুনীরূপ সোপান দ্বারা তাহাদিগকে ব্রহ্মলোকে আরোহণ করাইয়াছিলেন। তাঁহার নিরবচ্ছিন্ন অধ্যবসায় ছিল; তথাচ তিনি তপস্যা করিয়া বিরিঞ্চি, শঙ্কর ও জহ্নু মুনির আরাধনায় বারম্বার খিন্ন হইয়া পড়িতেন। এই লোকযাত্রা অতি দুঃখজনক; এতৎসম্বন্ধীয় বিচার আলোচনা করিতে করিতে একদা তোমার ন্যায় সেই নরপতির যৌবনেই অকস্মাৎ বৈরাগ্যোদয় হইল। মরুভূমিতে যেমন লতার উৎপত্তি, সেই বৈরাগ্যযোগে তেমনি তাঁহার চমৎকার বিচারবুদ্ধি জন্মিল। তিনি একান্তে বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন,—এই ত জগদযাত্রা! কোথায় ইহার সামঞ্জস্য! দেখিতেছি ইহা আকুলভাবেই ঘুরিয়া ফিরিয়া চলিতেছে। দিন যাইতেছে, রাত্রি কাটিতেছে, আবার দিন আসিতেছে, রাত্রি আসিতেছে; এইরূপে শত শত আদান প্রদান-ব্যবহারও পুনঃপুনঃ আবির্ভূত হইতেছে। যে কর্ম্মের ফলভোগ করিয়া একান্তই কটু তিক্ত বোধ হইয়াছে, জীব দেখিতেছে—সেইরূপ কর্ম্মই আবার আসিয়া উপস্থিত

হইতেছে। কিন্তু যাহা অপূর্ব্ব পরম পুরুষার্থ ফল, তাহা কোন জীবই দেখিতে পাইতেছে না। যাহা পাইলে সকলই প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিছুই আর অপ্রাপ্য থাকে না, তাদৃশ কার্য্যই আমি সুকৃতি বলিয়া মনে করি; তদ্ব্যতীত অপর সকল কর্ম্মই বিসূচিকামাত্র। ফল কথা, বিসূচিকাবৎ দুঃখই যে কর্ম্মের ফল, যে কার্য্য বারম্বার করা হয় বলিয়া পর্য্যুষিত হইয়া যায়, মূঢ়বুদ্ধি লোকই সেরূপ কর্ম্ম করিয়া লজ্জিত হয় না। কিন্তু কে এরূপ মূঢ়বুদ্ধি হইতে চায় এবং কেই বা বালকের ন্যায় ঐরূপ কর্ম্ম করিতে যায়?

অনন্তর অন্য দিন নরপতি ভগীরথ সংসারভয়ে একান্তই ভীত হইলেন। তাঁহার চিত্ত উদ্বেগাবেগে মগ্ন হইল। তিনি একদা তাঁহার ত্রিতল নামক গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন—ভগবন্! এই ত স্বর্গ-নরক ও নর-জন্মাদিরূপ মহারণ্য; এ অরণ্য অন্তঃসারশূন্য। ইহা ভ্রমণ-শীল জীবগণের রাগদ্বেষাদি সংসারবৃত্তি-স্বরূপ। এখানে দীর্ঘকাল ঘুরিয়া ঘুরিয়া আমরা অতিশয় খিন্ন হইয়াছি। হে বিভো! যাহা ভবসংসারের হেতুভূত, কি করিলে সেই জরা-মরণ-মোহাদিরূপ নিখিল দুঃখের অবসান হইতে পারে? তাহা আমার নিকট ব্যক্ত করুন।

ত্রিতল কহিলেন,—হে নিষ্পাপ নরনাথ! শ্রবণ-মননাদি উপায়-চতুষ্টয় চিরাভ্যস্ত হইলে অখণ্ড ব্রহ্মাকার মনোবৃত্তি আবির্ভূত হয়। তখন প্রত্যক্ তত্ত্বজ্ঞানে পরিপূর্ণ হইতে পারিলে সর্ব্ব দুঃখের অবসান হইয়া যায়, সমস্ত সংসারগ্রন্থি শিথিল হইয়া পড়ে; সংশয়ের লেশমাত্র থাকে না; যে কিছু কর্ম্ম-কার্য্য, সকলই সমত্ব প্রাপ্ত হয়। যিনি বিশুদ্ধ জ্ঞানময় আত্মা, তিনিই একমাত্র জ্ঞেয়। সেই আত্মাই নিত্যকাল সর্ব্বব্যাপী হইয়া বিরাজমান। তাঁহার উৎপত্তি-নাশ নাই; অস্তোদয় নাই।

ভগীরথ কহিলেন,—মুনীন্দ্র! জানি আমি—এ সংসারে কেবল সেই একই মাত্র পদার্থ আছেন—যিনি নির্ম্মল, নির্গুণ, শান্ত, অচ্যুত, চিন্মাত্র। দেহাদি অন্য কিছু নাই। সে সকলের কিছুই কিছু নহে। অর্থাৎ অন্য কিছুই আত্মা নহে, ইহা আমি আপনাদের উপদেশেই জানিয়া রাখিয়াছি। কিন্তু এই যে সদসদ্-বিবেক বোধ, ইহার মধ্যে যে প্রথম সদাত্মক বোধ,

ইহা আমার নিকট করগত আমলক ফলের ন্যায় স্পষ্টতঃ প্রকাশ পাই-তেছে না। অতএব ইতর অবভাস হেতু যে বিক্ষেপোদয় হয়, তাহার শান্তি কিরূপে হইবে এবং বিক্ষেপোপশমে কি করিয়া আমি ঐ একমাত্র আত্মজ্ঞানময়ই হইতে পারিব, তাহার উপায় এখন নির্দ্দেশ করিয়া দিউন।

ত্রিতল কহিলেন—রাজন্! এই রাজ্যাদিতে তোমার অভিমান আছে এবং সেই সেই বিষয়ে তোমার চিত্ত ধাবিত হইতেছে, এই জন্যই এইরূপ বিক্ষেপ তোমার উপস্থিত এবং এই বিক্ষেপবশেই স্পষ্টতঃ তোমার আত্মপ্রতিপত্তি হইতেছে না। যখন হৃদাকাশে নিরভিমানাদি জ্ঞান সমু-দিত হয়, তখন চিত্ত জ্ঞেয় বস্তু বিদিত হইতে পারিয়া তদেকনিষ্ঠ হইয়া থাকে। তাহাতে পূর্ণ স্বভাব উপগত হওয়া যায়; তখন আর জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না। পুত্র-কলত্রাদিতে আসক্তিরাহিত্য, মমতা-পরিহার, ইষ্টানিষ্টে নিয়ত কাল চিত্তের সমাবস্থা, প্রতিনিয়ত আত্মচিন্তা, আত্মদর্শন, নির্জ্জনে অবস্থানযোগ, জনসঙ্গ পরিহার, অধ্যাত্ম-জ্ঞান-নিত্যতা, এই সকলই জ্ঞানপদ-বাচ্য। এতদ্ভিন্ন অন্য সমস্তই অজ্ঞান।

হে রাজন্! জ্ঞানই সংসারব্যাধির ঔষধ। এ ঔষধে রাগ-দ্বেষাদি ক্ষয় পাইয়া যায়। যখন অহন্তাবের উপশান্তি ঘটে, তখনই এ ঔষধ লব্ধ হওয়া যায়।

ভগীরথ কহিলেন,—হে মহাভাগ! পর্ব্বতে যেমন বৃক্ষ থাকে, তেমনি এ কলেবরে অহন্তাব চিরপ্ররূঢ় হইয়া রহিয়াছে। কি উপায়ে এ অহন্তাবের পরিহার সম্ভবপর হইতে পারে?

ত্রিতল কহিলেন,—পৌরুষ প্রযত্ন দ্বারা ভোগবাসনা বা বিষয়ভাবনার বিসর্জ্জন করিতে পারিলে অহন্তাবের বিলয় হইতে পারে। আমার রাজ্য নাই, আমার প্রতি আর কেহই গৌরব প্রকাশ করিবে না; নিজে আমি প্রার্থীর প্রার্থনা পূর্ণ করিতাম, সেই আমি অদ্য কিরূপে ভিক্ষা করিব? আমার যাহারা শত্রু ছিল, তাহারা আমায় উপহাস করিবে, আর আমিই বা কি প্রকারে কদন্ন খাইয়া জীবন যাপন করিব? এইরূপ চিন্তাচর্চ্চার ফলে লজ্জা, ভয় ও অভিমানাদি-জনিত যন্ত্রণা-পিঞ্জর যত দিনে না অকিঞ্চন-রূপে ভগ্ন হইয়া যাইবে, অহঙ্কার ততদিনই স্পষ্টতঃ প্রকাশ পাইয়া নৃত্য

করিবে। যদি তুমি স্বীয় বুদ্ধির সাহায্য লইয়া এ সকল পরিহারপূর্ব্বক অটল অচলভাবে অবস্থান করিতে পার, তাহা হইলেই তোমার অহঙ্কার অপগত হইবে। তখন তুমি পরম পদ প্রাপ্ত হইবে—হইয়া তৎসারূপ্য লাভ করিতে পারিবে। ফল কথা এই যে, তুমি যদি রাজোচিত ছত্রচামরাদি চিহ্ন পরিহার করিয়া অতি অকিঞ্চন অবস্থায় উপনীত হইতে পার, কিম্বা শত্রুর করে সমগ্র রাজ্যৈশ্বর্য্য অর্পণ করিয়া দেহাভিমান বিসর্জ্জন-পূর্ব্বক শত্রুর নিকট ভিক্ষা লাভার্থ যাইতে পার, এমন কি সমস্ত ভয়, সংশয়, ইচ্ছা, চেষ্টা প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া পরিপূর্ণ হইতে পার এবং প্রষ্টব্য কিছুই নাই বুঝিয়া, আমি গুরু—আমাকেও তুমি পরিত্যাগ করিতে পার, তাহা হইলে তুমি মুমুক্ষু জনোচিত সর্ব্বোত্তম গুণে অন্বিত হইয়া উচ্চ পদবীতে আরোহণপূর্ব্বক সর্ব্বোত্তম ব্রহ্মময় হইতে পারিবে, তখন তোমার সর্ব্ব-দুঃখের অবসান হইবে।

চতুঃসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭৪ ॥

পঞ্চসপ্ততিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! অনন্তর নরনাথ ভগীরথ গুরুর বদন-বিনির্গত এবম্ভূত উপদেশাবলী শ্রবণ করিয়া মনে মনে আপনার কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লইলেন এবং সেই সেই কর্ত্তব্য সমাধা করিতে স্থিরসঙ্কল্প হইলেন। পরে কতিপয় দিবস অতীত হইল। তিনি সর্ব্বত্যাগী হইবার অভিপ্রায়ে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। এই যজ্ঞ উপলক্ষে ভগীরথ ব্রাহ্মণ, সজ্জন, বন্ধুবান্ধব ও অন্যান্য প্রার্থীদিগকে গো, ভূমি, হিরণ্য ও গজাশ্বাদি সমস্ত ধনসম্পত্তি বিতরণ করিলেন। তাঁহার সেই দানব্যাপারে পাত্রাপাত্র বিচার রহিল না; তিনি তিন দিবসের মধ্যে অর্থীদিগকে সর্ব্বস্ব দান করিয়া ফেলিলেন। তাঁহার তখন জীবনমাত্র অবশিষ্ট রহিল; তাহা ভিন্ন আমার বলিতে তাঁহার কিছুই আর রহিল না।

এইরূপে রাজা ভগীরথের [illegible]ন সকলই নিঃশেষ হইয়া গেল। তাঁহার অনুরক্ত প্রকৃতিপুঞ্জ ও তদীয় পুরবাসিগণ এই ব্যাপারে মনে মনে বড়ই খিন্ন হইল। তিনি তাঁহার সমগ্র রাজৈশ্বর্য্য তৃণের ন্যায় তুচ্ছজ্ঞান করিয়া সীমান্ত-সন্নিহিত কোন এক শত্রু নরপতির করে স্বয়ংই সমর্পণ করিলেন। শত্রুপক্ষ অনায়াসে আসিয়া তাঁহার রাজধানী অধিকার করিয়া বসিল। তখন তিনি কৌপীন মাত্র পরিধান করিয়া নিজ রাজ্যমণ্ডল হইতে বহির্গত হইলেন। ভগীরথ বহুদূরে গমন করিলেন। তথায় গিয়া ধৈর্য্যের সহিত তত্রত্য অরণ্য মধ্যে বাস করিতে লাগিলেন। সেখানে তাঁহাকে ভগীরথ বলিয়া চিনিবার কেহই নাই এবং ভগীরথ নামে কেহ রাজা ছিলেন বা আছেন, এরূপ সংবাদও কাহারও বিদিত নহে।

এই প্রকারে তাঁহাকে সেখানে বহুদিন বাস করিতে হইল না; অতি অল্পকালের মধ্যেই তাঁহার সর্ব্ববাসনা ক্ষয় পাইয়া গেল। তিনি পরম শান্তি প্রাপ্ত হইলেন এবং সতত আত্মাতেই বিশ্রান্তি লাভ করিতে লাগিলেন। এই অবস্থায় ভগীরথ পৃথিবীর সমস্ত দ্বীপ পরিভ্রমণ করিলেন। একদা যদৃচ্ছাক্রমে তাঁহার সেই পূর্ব্বপরিত্যক্ত রাজ-ধানীতে গিয়া তিনি উপস্থিত হইলেন। তখন তাহা তাঁহার শত্রুর অধিকৃত ছিল। সেই রাজধানীতে গিয়া উপস্থিত হইয়া সেখানকার শ্রেণীবদ্ধ বিবিধ ভবনে ভ্রমণ করিয়া তিনি পুরবাসী ও মন্ত্রিবর্গের নিকট ভিক্ষা চাহিতে লাগিলেন। পুরবাসিগণ ও অমাত্যগণ তাঁহাকে দেখিয়া চিনিতে পারিলেন। তাঁহাদের সেই পূর্ব্ব রাজা উপস্থিত হইয়াছেন দেখিয়া বিষাদভরে তাঁহারা তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন। যে শত্রু-রাজা তাঁহার রাজ্য অধিকার করিয়া-ছিলেন, তিনিও আসিয়া তৎকালে তাঁহাকে কহিলেন,—প্রভো! আপনার রাজ্য আপনি গ্রহণ করুন। কিন্তু ভগীরথ এ প্রার্থনায় কর্ণপাত করিলেন না; রাজ্যগ্রহণে তিনি সম্পূর্ণ অশ্রদ্ধা দেখাইলেন; রাজ্য গ্রহণ তো দূরের কথা, প্রাণ-ধারণোপযোগী যৎকিঞ্চিৎ আহারসামগ্রী ব্যতীত তাহাদের নিকট হইতে তিনি একগাছী তৃণ পর্য্যন্তও লইলেন না; কিয়দ্দিন অবস্থানের পর সেস্থান হইতে অন্যত্র চলিয়া গেলেন। তাঁহার গমনের পর সকল লোকেই 'হায় হায়' করিয়া বলিতে লাগিল—অহো! এই

সেই আমাদের মহারাজ ভগীরথ! তাঁহার এখন এই দশা! এই বলিয়া সকলেই বিষাদভরে শোক প্রকাশ করিল।

অন্যদিন সেই উপশান্তচেতা আত্মবিশ্রান্ত ভগীরথ স্বীয় গুরুদেব আত্মারাম ত্রিতল মুনির নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন। গুরুগৃহে গিয়া গুরু-দেবের পাদ-বন্দনাদি করিলেন। অনন্তর তাঁহার সহিত কিয়ৎকাল পর্ব্বতে, কাননে, গ্রামে, নগরে ও জনপদে অবস্থান করিলেন। গুরু এবং শিষ্য উভয়েই সমভাব লাভ করিয়াছেন; উভয়েই আত্মাতে বিশ্রাম করিয়া সুস্থ হইয়াছেন। তাঁহারা ভাবিতেন,—দেহ ধারণ একটা বিনোদ-ব্যাপার মাত্র। তাঁহাদের মনে হইত—এ দেহ থাকিলেই বা আমাদের কি? আর না থাকিলেই বা কি? এ দেহের থাকা না থাকা উভয়ই আমাদের নিকট তুল্য-মূল্য। এইরূপ কৃতনিশ্চয় গুরু-শিষ্য এক বন হইতে অন্য বনে এবং অন্য বন হইতে অপর কোন বনে গিয়া কাল কাটাইতে লাগিলেন। তাঁহারা এমন এক প্রকার আনন্দ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন যে, সিদ্ধগণ তাঁহাদিগের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া অণিমাদি অষ্টৈশ্বর্য্য অর্পণ করিলেও তাহা তাঁহারা তৃণের ন্যায় তুচ্ছ বোধে পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহাদের মনে হইয়াছিল, স্বীয় কর্ম্মানুসারেই এই দেহ-প্রাপ্তি ঘটিয়াছে। কাজেই প্রারব্ধ কর্ম্মবশে আয়ুর পরিমাণকাল যাবৎ অনিচ্ছা সত্ত্বেও এ দেহ স্বীয় কর্ম্মানুসারে ধারণ করিয়া থাকিতেই হইবে। অর্থাৎ স্বকৃত কর্ম্মের ফলে এ দেহ হইয়াছে; যতদিনে না কর্ম্মের শেষ হয়, ততদিন ইহা থাকিবে। কর্ম্মের যখন শেষ হইবে, তখন ইহা আপনা হইতেই নষ্ট হইয়া যাইবে। এই প্রকার নিশ্চয় করিয়া তাঁহারা অবস্থান করিতে লাগিলেন।

সেই দুই মননশীল মহাত্মা স্ব স্ব প্রাক্তন কর্ম্মানুসারে সুখ বা দুঃখ যাহাই উপস্থিত হউক, তাহাকেই অভিনন্দন করিতেন। কেন না, যাহা সম অপেক্ষাও সম, তথাভূত ব্রহ্মে একরসীভূত হইয়া তাঁহারা পরম শান্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

পঞ্চসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭৫ ॥

ষট্‌সপ্ততিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! একদা কোন এক রাজ্যের রাজা কালগ্রাসে পতিত হইলেন। তিনি অনপত্য ছিলেন। তাঁহার মৃত্যু হওয়ায় রাজামাত্য ও প্রকৃতিপুঞ্জ দুঃখিত হইল এবং রাজ্যের পালনমর্য্যাদা নষ্ট হইল ভাবিয়া প্রমাদ গণিল। অনন্তর সেই রাজ্যের প্রজাসাধারণ তাহাদের রাজার আসনে বসাইবার নিমিত্ত কোন এক গুণলক্ষ্মী-সম্পন্ন যোগ্য ব্যক্তির অনুসন্ধান করিতে লাগিল। ক্রমে তাহারা দেখিল—মুনিবেশধারী ভিক্ষাচারী রাজা ভগীরথ সে দেশে উপস্থিত আছেন। তাঁহাকে পাইয়া তাহারা সৈন্যমণ্ডলী দ্বারা সম্বর্দ্ধনা সহকারে আনয়নপূর্ব্বক মহীপতি-পদে মনোনীত করিল। অবিলম্বে ভগীরথ সেনা-পরিচ্ছদে পরিপূর্ণ হইলেন। মনে হইল, বর্ষাকালীন সরোবর যেন সহসা জলপূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি যদৃচ্ছাক্রমে রাজকীয় গজে আরোহণ করিলেন। তখন 'জয় জগৎরক্ষক ভগীরথের জয় হউক' এইরূপ জনরব উত্থিত হইয়া মহাগিরির মহাগুহাশ্রেণী পর্য্যন্ত পরিপূর্ণ করিল। ভগীরথ মনোবৃত্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক এইরূপে রাজ্য পালন করিতে লাগিলেন।

এই সময় ভগীরথের অমাত্য-পুরোহিতাদি পূর্ব্ব প্রকৃতিবর্গ বহুমানপুরঃসর তৎসমীপে আগমন করিলেন এবং তাঁহাকে এই প্রকার বলিতে লাগিলেন। প্রকৃতিবর্গ নিবেদন করিলেন,—রাজন্! আপনি আমাদিগেরই অধীশ্বর ছিলেন। আপনার যে শত্রু রাজাকে আপনি নিজ রাজ্য পুরস্কার দিয়াছিলেন, তিনি কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন। অতএব আপনি আপনারই নিজ রাজ্য গ্রহণ করুন এবং তাহার পালন-পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন। এ রাজ্য আপনার পরিত্যাজ্য নহে। দেখুন, বিনা প্রার্থনায় যে বস্তু করস্থ হইয়া থাকে, তাহাকে পরিত্যাগ করা কোন ক্রমেই কর্ত্তব্য নহে।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! ভগীরথ বীতরাগ, বিমৎসর, বিগত-বিস্ময়, যথালব্ধ কর্ম্মকুশল, সমদর্শী, শান্তমনা ও পরিমিত হিত-সত্যবাদী ছিলেন। তিনি প্রজাবর্গের ঐরূপ প্রার্থনায় সম্মত হইয়া সপ্ত সাগর-চিহ্নিত মেদিনীর শাসনভার গ্রহণ করিলেন। যজ্ঞীয় অশ্বের অন্বেষণার্থ তদীয় প্রপিতামহগণ পৃথ্বী খনন করিয়া সাগরাকার করিয়াছিলেন। অশ্বের অনুসন্ধানে তাঁহারা পাতাল পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন। সেখানে কপিল মুনির ক্রোধানলে তাঁহাদিগকে ভস্মীভূত হইতে হয়। ভগীরথ শুনিয়াছিলেন,—গঙ্গাজলই তাঁহার পিতৃপুরুষগণের উদ্ধারের এক মাত্র উপায়। কিন্তু তৎকালে স্বর্গনদী ভূতলে প্রবাহিতা ছিলেন না। বিশেষতঃ ভগীরথের পিতৃপুরুষগণের ন্যায় আরও অনেকের পিতৃপিতামহগণ গঙ্গাজল না পাইয়া দুর্গতি ভোগ করিতেছিলেন। যে দিন হইতে ভগীরথ গঙ্গাজলের উল্লিখিত মাহাত্ম্য শ্রবণ করিলেন, সেই দিন হইতেই তিনি স্বর্গ হইতে ভূতলে গঙ্গাকে অবতারিত করিবার জন্য নিয়মাবলম্বন করিলেন। ভগীরথ মন্ত্রিগণের হস্তে স্বীয় রাজ্যভার অর্পণ করিয়া পুনরায় অরণ্যবাসী হইলেন এবং কঠোর তপঃ সাধনা করিতে লাগিলেন।

এইরূপে সেই ভগীরথ রাজা সহস্র বর্ষ যাবৎ কঠোর তপস্যা করিয়া ব্রহ্মা, শঙ্কর ও জহ্নু মুনিকে পুনঃপুন আরাধনা করিয়া পৃথিবীর সহিত গঙ্গার সংযোগ সাধন করেন। তখন হইতে শিব-শিরোবিহারিণী বিমল তরঙ্গ-ভঙ্গ-শালিনী ত্রিপথগামিনী গঙ্গা, স্বর্গবাসী মহাত্মগণের প্রভূত পুণ্য-পরম্পরার ন্যায় নভস্তল হইতে ভূতলে অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহার ফেনপুঞ্জ যেন হাস্যচ্ছটার ন্যায় পরিদৃষ্ট হইল। তিনি ধর্ম্মসন্ততির ন্যায় প্রতিভাত হইয়া মহীপতি ভগীরথের আসমুদ্র কীর্ত্তি-বিস্তারের বীথিকারূপে ভূতলে শোভা পাইতে লাগিলেন।

ষট্‌সপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭৬ ॥

সপ্তসপ্ততিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রাঘব! রাজা ভগীরথ যেমন জীবনের শেষাবস্থায় বুদ্ধিযোগে স্বীয় দৃষ্টি স্থির রাখিয়া রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন, তুমিও তেমনি তোমার দৃষ্টি স্থির রাখিয়া শান্তচিত্ত, সমদর্শী, ও স্বচ্ছ ভাবে যখন যে কার্য্য উপস্থিত হইবে, করিতে থাক। এ সকল বিভব পরিত্যাগ করিয়া—মন হইতে এ সকলের আসক্তি উন্মুলিত করিয়া মন নিরোধপূর্ব্বক রাজা শিখিধ্বজের ন্যায় আত্মারাম হইয়া অচলভাবে আত্মাতেই অবস্থান করিতে থাক।

রামচন্দ্র কহিলেন,—ব্রহ্মন্! কে ঐ শিখিধ্বজ রাজা? কেমন করিয়াই বা তিনি সেই পরম পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন? মদীয় বোধ বৃদ্ধির জন্য আমাকে এ কথা প্রকাশ করিয়া বলুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! পূর্ব্বকল্পীয় দ্বাপরযুগে যে দম্পতি রাজা ও রাণী হইয়া জন্মিয়াছিলেন, এই বর্ত্তমান কল্পেও তাঁহারা সেইভাবেই উৎপন্ন হইবেন। তাঁহাদের নাম শিখিধ্বজ এবং চূড়ালা। চূড়ালা রাজা শিখিধ্বজের পত্নী। এই পতি-পত্নী পূর্ব্বের ন্যায় এই কল্পেও পরস্পর পরস্পরের প্রতি প্রণয়াসক্ত হইবেন।

রামচন্দ্র তৎশ্রবণে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে ভগবন্ বক্তৃবর! পূর্ব্বে যাহা যে প্রকার হইয়াছিল, এই বর্ত্তমানেও তাহা সেইরূপই হইবে এবং ভবিষ্যতেও সেইরূপই হইবার সম্ভাবনা, এ কেমন কথা? ইহা কেন হইবে, কারণ কি? এ তত্ত্ব আমায় বুঝাইয়া বলুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! জগদ্বিধাতা ব্রহ্মাদি দেবগণ সত্যসঙ্কল্প; তাঁহাদের সঙ্কল্প কখন ব্যর্থ হইবার নহে। এই সঙ্কল্পই নিয়তি বা সৃষ্টি-নিয়ম। এই সৃষ্টিনিয়মই ঐ প্রকার স্থিতির কারণ। সৃষ্টি-নিয়তির ক্রম এইরূপ দেখা যায় যে, কোন কোন সৃষ্টি বহু ও বহুবার হয়, কোন কোন সৃষ্টি একেবারে হয় না; কিন্তু পরে হইয়া থাকে। আবার কোন

কোন সৃষ্টি বহুবার হয় না, একবারই হইয়া থাকে। দেখ, একই আম্র-বৃক্ষে বারম্বার বহু আম্রফল উৎপন্ন হয় এবং সেই সকল ফল পূর্ব্বেরই অনুরূপ হইয়া জন্মে। স্কন্ধ-বট যেমন একরূপে উৎপন্ন না হইয়াও একবারই হয়। কিন্তু তাহা ছেদন করিয়া ফেলিলে পুনর্ব্বার তাহাতে হয় না, এই মনুষ্যসংসারের সৃষ্টিব্যবস্থাও সেইরূপই। সাদৃশ্য-পরম্পরায় অন্যান্য বস্তু পূর্ব্ব পূর্ব্ব সন্নিবেশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সরোবরে যেমন সদৃশ এবং বিসদৃশ উভয়বিধ তরঙ্গের উৎপত্তি দেখা যায়, এ সংসারেও সৃষ্টিনিয়ম তেমনি দৃষ্ট হইয়া থাকে। বর্ণিত শিখিধ্বজাদির সংসারের ব্যবস্থাও সেইরূপই জানিতে হইবে। এই জন্যই বলিয়াছি যে, ভূতপূর্ব্ব রাজা শিখিধ্বজের ন্যায় এই বক্ষ্যমাণ কথার নেতা রাজা শিখিধ্বজও সেইরূপই মহাতেজা হইবেন। এক্ষণে তাঁহার বৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর'।

পূর্ব্বে সপ্তম মনুর অবসান ও অষ্টম মনুর অধিকার কাল প্রবর্ত্তিত হইলে দ্বাপর যুগে জম্বুদ্বীপের অন্তর্গত সুপ্রসিদ্ধ বিন্ধ্যাচলের অদূরে উজ্জয়িনীনগরে শিখিধ্বজ নামে এক শ্রীমান্ রাজা ছিলেন। তিনি কুরু-বংশীয় রাজন্যগণের অন্যতম। তাঁহার ধৈর্য্য, ঔদার্য্য, শম, দম ও ক্ষমা প্রভৃতি অশেষ গুণ ছিল। তিনি একজন বিখ্যাত বীর, সদাচারী এবং সত্য ও সুমিষ্টভাষী ছিলেন। ধর্ম্ম্য কর্ম্মে তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। তিনি সর্ব্বযজ্ঞের আহরণকর্ত্তা, সমস্ত ধনুর্দ্ধারীগণের জেতা এবং বাপী, কূপ ও তড়াগ প্রভৃতির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তাঁহার দেহ অপূর্ব্ব শ্রীসম্পন্ন ছিল। এই সমগ্র পৃথিবীর তিনিই একমাত্র ভরণকর্ত্তা ছিলেন। তাঁহার আকৃতি দেখিতে কোমল ও স্নিগ্ধ মধুর ছিল। লোকশাস্ত্রে তিনি সবিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তাঁহার হৃদয় প্রীতির আকর ছিল। তিনি শান্ত, সুন্দর ও সুভগ ছিলেন। তাঁহার প্রতাপ ছিল, পরাক্রম ছিল, ধর্ম্মবাৎসল্য ছিল, বিনয় ছিল, অন্যে বিনয় শিক্ষা করিতে পারে, এরূপ বাক্‌পটুতা ছিল। তিনি সর্ব্ব সম্পদের দাতা ও ভোক্তা ছিলেন। সতত সৎসঙ্গ করাই তাঁহার অভ্যাস ছিল। সর্ব্বদা তিনি বেদবাণী শ্রবণ করিতেন। সর্ব্ব বিষয়েই তাঁহার অভিজ্ঞতা ছিল; কিন্তু অভিজ্ঞতার

অভিমান তাঁহার ছিল না। স্ত্রৈণাদি যে কিছু ব্যসন আছে, সে সকল তিনি তৃণবৎ তুচ্ছজ্ঞানে বর্জ্জন করিতেন। তাঁহার বাল্যকালেই পিতৃ-বিয়োগ হয়। পিতা তাঁহার মাত্র মণ্ডলাধিপতি ছিলেন; কিন্তু সেই শূরবর শিখিধ্বজ রাজা সেই অবস্থায় স্বীয় বাহুবীর্য্যের আশ্রয়ে মাত্র ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রম কালেই দিগ্‌বিজয় করিয়া সম্রাট্‌ আখ্যা লাভ করেন। এ ভূমণ্ডল একমাত্র তাঁহারই সাম্রাজ্য-সম্পত্তি হয়। সেই ধীশক্তি-সম্পন্ন রাজা শিখিধ্বজ মন্ত্রিগণ সমভিব্যাহারে অসঙ্কোচে রাজ্য কার্য্য করিতেন; প্রজারঞ্জন করিতেন। তাঁহার কীর্ত্তিচ্ছটায় দিগ্‌দিগন্ত শুক্লীকৃত হইয়াছিল।

তিনি সাম্রাজ্যলক্ষ্মী লাভ করিবার কিয়দ্দিন পরে তাঁহার যখন পূর্ণ যৌবন উপস্থিত, তখন একদা বসন্ত কাল প্রাদুর্ভূত হইল। ঋতুরাজের আগমনে পুষ্পপুঞ্জ প্রস্ফুটিত হইল। চন্দ্রকর উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তরু-শাখারূপ অন্তঃপুরের অভ্যন্তরে মঞ্জরীজালরূপ দোলায় চড়িয়া শ্রেণীবদ্ধ মধুপমিথুন পরস্পর আনন্দ-সঙ্গীতে নিমগ্ন হইল। সৌরভশোভী পুষ্প-স্তবক সকল বিতানবৎ বিরাজ করিতে লাগিল। মধুর মলয়ানিল মন্দ মন্দ বহিয়া চলিল এবং কদলী-কন্দলীর জলপ্রায় তল ও পল্লবদলে নাচিয়া নাচিয়া বেড়াইতে লাগিল। এমনই সুন্দর সুখকর কালে সহসা সেই রাজাধিরাজের অন্তরে কান্তা-বিলাসের বাসনা জাগিয়া উঠিল। তাঁহার মন কুসুমসৌরভে মত্ত ও বসন্ত-বিভাত বনের ন্যায় রাগপল্লবিত হইয়া-ছিল; কাজেই সে মন তাঁহার আর কান্তা ব্যতীত অন্যত্র আসক্ত হইল না। তিনি ভাবিতে লাগিলেন—কবে আমি উদ্যানবন-দোলায় কিম্বা লীলাকমলিনী-তটে পর্য্যঙ্কোপরি হেমকমল-মুকুলগুনী কুঙ্কুমাঙ্কিতা প্রণয়িনী কামিনীকে মদীয় অঙ্কে স্থাপন করিব? ভ্রমর যেমন কমলবল্লীর দোলায় ভ্রমরীকে গ্রহণ করে, তেমনি কবে আমি মদীয় ভূজলতার অভ্যন্তরে আমার চঞ্চলা অবলাকে আবদ্ধ করিব? ইন্দুবৎ সুন্দরী কামিনী কবে আমার জন্য মদনতাপে পরিতপ্ত হইয়া মৃণালহার, কুন্দ-কুসুম ও কুসুমিত লতাগৃহের জন্য লালায়িত হইবে?

রাজা শিখিধ্বজ এইরূপ চিন্তাক্রান্ত হইয়া পুষ্পপুঞ্জ চয়ন করিতে করিতে বনান্তে কুসুম-কাননে বিহার করিতে লাগিলেন। কখন বন-

রাজি,• কখন উপবনভূমি, কখন লীলা কমলিনী, কখন বল্লীবেষ্টিত ভবনশ্রেণী এবং কখন কখন বা বিবিধ উদ্যান-ভূমিতে ভ্রমণ করিতে করিতে উৎকণ্ঠার সহিত বন ও উপবন-বিন্যাসের বর্ণনাময় নানাবিধ শৃঙ্গারগর্ভ কথায় কাল কাটাইতে লাগিলেন। কখন বা তিনি মনে মনে চঞ্চল কুণ্ডলশোভিনী হারোজ্জ্বল দেহধারিণী উন্নতস্তনী কুমারীমূর্ত্তি-সকল কল্পনা করিয়া তাহাদের সুখ্যাতি ও সাদর সৎকার করিতে লাগিলেন। কখন কখন বা সেই সকল কুমারীকে কল্পনায় বেশ ভূষা অর্পণ করিয়া শিখিধ্বজ সাজাইতে লাগিলেন। তাঁহার সুবিজ্ঞ মন্ত্রিবর্গ রাজার তাদৃশ অবস্থা দেখিয়া তদীয় মনঃসঙ্কল্প ও স্থিরাভিপ্রায় বুঝিতে পারিলেন। বস্তুতঃ ইঙ্গিতাকার অবগত হওয়াই মন্ত্রিত্ব। যাহা হউক, মন্ত্রিগণ তখন স্থির করিলেন—রাজার বিবাহ লক্ষণ পরিদৃষ্ট হইতেছে। এইরূপ স্থির করিয়া তাঁহার অনুরাগ ও গুণশীলাদির আলোচনা করত তদীয় বিবাহ জন্য নবযৌবনশালিনী সুরাষ্ট্ররাজ-নন্দিনীকে প্রার্থনা করিলেন। সুরাষ্ট্র-রাজ সে প্রার্থনায় সম্মত হইলেন। তখন রাজা শিখিধ্বজ স্বীয় প্রতি-মূর্ত্তি তুল্য সেই আত্মানুরূপিণী সুরাষ্ট্ররাজনন্দিনীর পাণিপীড়ন করিলেন। রাজনন্দিনীর নাম চূড়ালা; চূড়ালা তাঁহার পতি শিখিধ্বজের ন্যায়ই সৌন্দর্য্যের খনি। যেমন পতি সুন্দর, তেমনি পত্নী সুন্দরী। চূড়ালা রাজা শিখিধ্বজকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইয়া প্রফুল্ল পদ্মিনীবৎ সুশোভিত হইতে লাগিলেন। দিনকর যেমন কমলিনীকে বিকসিত করিয়া থাকেন, তেমনি সেই রাজা শিখিধ্বজ ইন্দীবরাক্ষী চূড়ালাকে প্রীতি ও অনুরক্তি বশে প্রফুল্ল করিয়া তুলিলেন। সেই নবদম্পতির অনুরাগ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তাঁহারা পরস্পর পরস্পরের চিত্ত পরস্পরকে অর্পণ করিয়া একপ্রাণ ও একমন হইয়া পড়িলেন। হাব ভাব ও বিলাস প্রভৃতি বিবিধ শৃঙ্গারচেষ্টায় চূড়ালার বিশেষ শোভা হইয়াছিল। চূড়ালা সেই সমুদায়ে সুশোভিত হইয়া নবলতিকার ন্যায় নিজের অঙ্গসৌষ্ঠবে নিজেই শোভা পাইতে লাগিলেন। রাজমন্ত্রিগণ রাজার চিত্তানুবর্ত্তী হইলেন। তাঁহারা রাজার জন্য বিবিধ ভোগ্য বস্তু সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। রাজা তাঁহার ধর্ম্মজ্ঞ মন্ত্রিগণের উপর সমস্ত ভার অর্পণ

করিলেন। ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রিবর্গ প্রার্থিগণকে যথেষ্ট ধন-বিতরণ করিতে লাগিলেন। রাজা শিখিধ্বজ, তখন হইতে প্রজাপালন ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হইলেন। তাঁহার প্রজাগণ সুব্যবস্থিত রহিল। তিনি তাহাতে সুখী হইলেন।

এইবার রাজা শিখিধ্বজ নিশ্চিন্তমনে দয়িতা সহ নানাস্থানে বিহার করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। রাজহংস যেমন কমলিনীর সহিত কেলি করে, তেমনি সেই রাজা নিজ প্রণয়িণী সহ নানা লীলা খেলা করিতে লাগিলেন। তিনি কখন আপনার অন্তঃপুরে, কখন দোলায়, কখন লীলা-কমলিনী-তটে, কখন উদ্যানে, কখন বিবিধ বিহার স্থানে, কখন নিকুঞ্জে, কখন পুষ্পপুঞ্জরচিত রম্য ভবনে, কখন কদম্ব-বনভূমিতে, কখন চন্দনাগুরু-সুবাসিত পথপ্রান্তে, কখন মন্দারদাম-লোলা কদলী কন্দলীতরুরাজিস্থ তল-ভাগে, কখন পুরান্তে, বনান্তে বা দিগন্তে, কখন সরোবরসমূহে, কখন জঙ্গল-জালে এবং কখন বা জম্বু ও জম্বীরজাতীয় বিবিধ বৃক্ষ-শোভিত কানন-প্রান্তে প্রিয়া সহ বিহার করিতে লাগিলেন। বর্ষাকালে মেঘমেদুর আকাশতল ও শস্যশ্যামল ভূতল যেমন রম্য শোভা ধারণ করে, তেমনি সেই কান্তিযুক্ত দম্পতির পরস্পরের প্রতি পরস্পরের ব্যবহার অতীব আহ্লাদজনক হইল। তাঁহারা পরস্পর কদাচ বিযুক্ত হইতেন না; সেই পতিপত্নী, যে কার্য্যই করিতেন, তাহাই তাঁহাদের উভয়ের প্রীতি-জনক হইত। তাঁহারা পরস্পর পরস্পরের নিকট হইতে নিখিল কলা-বিদ্যার অভিজ্ঞতা প্রাপ্ত হইলেন। তাহাতে তাঁহাদের গুণপরম্পরার পরস্পর সমতা হইল। তাঁহারা পরস্পর মিত্রভাব লাভ করিয়া যেন একই দেহ-স্বরূপ হইলেন। তাঁহাদের উভয়ের হৃদয়ে উভয়েই বাস স্থাপন করিলেন; তাহাতে মনে হইল, যেন, একই অখণ্ড জীব। দুইটী দেহে সংক্রান্ত হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। যেমন ব্রাহ্মণবালক শাস্ত্রাদিষ্ট দ্বাদশ বর্ষকাল মধ্যেই গুরুর নিকট হইতে বেদবিদ্যার শিক্ষা লাভ করেন, তেমনি সেই রাজপত্নী চূড়ালা বিচক্ষণ ব্যক্তির নিকট সমুদায় শাস্ত্রার্থ ও নিখিল চিত্র শিল্পাদিনৈপুণ্য শিক্ষা করিয়াছিলেন। এক্ষণে রাজা শিখিধ্বজ পত্নী চূড়ালার নিকটেই যাবতীয় নৃত্য গীত ও অন্যান্য সমস্ত কলাশাস্ত্র শিক্ষা করিয়া সেই সেই বিষয়ে সুপণ্ডিত হইলেন। যেমন

অমাবস্যা দিনে চন্দ্র ও সূর্য্য পরস্পর মিলিত ও পরস্পরের কলায় সঙ্গত হইয়া বিরাজ করেন, সেই পতি-পত্নীও তেমনি পরস্পর পরস্পরের কলা-বিদ্যায় অভিজ্ঞ হইয়া এক অভিন্ন হৃদয়ে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তাঁহারা পরস্পর অনুরক্ত-হৃদয়ে দুগ্ধমিশ্র জলের ন্যায় একরস হইয়া গেলেন। পুষ্প ও গন্ধের ন্যায় এবং ধরাবতীর্ণ হর-গৌরীর ন্যায় সেই দম্পতি অভিন্ন-হৃদয়ে বিরাজ করিতে লাগিলেন। বিদগ্ধতায় তাঁহাদের বুদ্ধি সুন্দর হইয়াছিল। তাঁহারা সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া মনে হইত যেন, কোন কার্য্য সাধনের জন্য কমলা ও কমলাপতি ভূমণ্ডলে প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন। তাঁহাদের উভয়ের প্রতি উভয়ের প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। তাই প্রসন্নতা ও মাধুর্য্য সর্ব্বদাই তাঁহাদের বিরাজ করিত। একত্র বা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে কেহ কোন সন্দিগ্ধ বিষয় বা শাস্ত্রার্থ রহস্য জিজ্ঞাসা করিলে, তাঁহারা উভয়ে একই সময়ে তাহার সদুত্তর প্রদান করিতে পারিতেন। তাঁহারা উভয়েই গুরু, দ্বিজ ও বিজ্ঞ ব্যক্তির প্রতি প্রিয়-হিত বিনয় ব্যবহার করিয়া তাঁহাদের অনুবর্ত্তন করিতে লাগিলেন। সেই দম্পতি সমস্ত লৌকিক ও শাস্ত্রীয় রহস্য বিদিত ছিলেন। উভয়েই কলা-কলাপে অভিজ্ঞ এবং উভয়েরই শৃঙ্গারাদি নবরস বিলসিত। তাঁহাদিগকে দেখিয়া অনেক সময় মনে হইত, যেন স্নিগ্ধ সুন্দর কৌমুদী-সুধাকর ভূতলে উদিত হইয়াছেন।

হে রাম! সেই অনুপম সৌন্দর্য্যশালী রাজ-দম্পতি এইরূপে স্বীয় অন্তঃপুরে রতি ভোগ-বিলাসে বিহার করিতে লাগিলেন। মনে হইল, যেন সত্য-লোকস্থ গভীর সরোবরে মৃদুমন্দগামী হংসমিথুন মদনমদে মত্ত হইয়া বিচরণ করিতে লাগিল।

সপ্তসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত ৭৭॥

অষ্টসপ্ততিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! সেই রাজদম্পতির প্রেম অতি প্রগাঢ় হইয়াছিল। তাঁহারা বহু বর্ষাবধি ঐরূপে প্রত্যহ অত্যধিক যৌবন-লীলায় নিরবচ্ছিন্ন ভাবে বিহার করিতে লাগিলেন। বৎসরের পর বৎসর যাইতে যাইতে ক্রমে অসংখ্য বর্ষ অতীত হইল। অনন্তর জলকুম্ভ বিদীর্ণ বা সচ্ছিদ্র হইলে তাহা হইতে যেমন ক্রমশঃ জল গলিত হয়, তেমনি তাঁহাদের যৌবনজলও এক একটু করিয়া গলিত হইতে লাগিল। তখন তাঁহাদের চমক ভাঙ্গিল। তাঁহারা প্রথমে এইরূপ বিচার করিতে লাগিলেন যে, এই ত দেহ; ইহা জলের তরঙ্গনিকরের ন্যায় ভঙ্গুরস্বভাব। দেহী এই দেহ লইয়াই এ সংসারের ব্যবহারপথে ভ্রমণ করিতেছে। ফল পাকিলে সে ফলের পতন যেমন অবশ্যই হয়, তেমনি এ দেহেরও বিয়োগ অবশ্যই ঘটিবে। কেন না, স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, কমল-দলোপরি তুষার-কুলিশ-পতনের উপক্রমের ন্যায় জরা এ দেহ অধিকার করিবার জন্য উন্মুখী হইয়া রহিয়াছে। করতলগত জলের ন্যায় আয়ু অনবরত গলিত হইয়া যাইতেছে। এ অবস্থায় বর্ষাকালীন অলাবু-লতার ন্যায় কেবল এক ভোগতৃষ্ণাই বৃদ্ধি পাইতেছে। বর্ষাকালের গিরিনদী-নির্গত জলবেগের ন্যায় এ যৌবন অতিক্রত ছুটিতেছে। ইন্দ্রজাল যেমন অসত্য, এই দেহাদিও তেমনি অসত্য; ইহা যেন জীর্ণ হইয়াই অবস্থিত। এখন ধনুশ্চ্যুত শরনিকরের ন্যায় সুখসমূহ কোথায় পলায়ন করিতেছে। গৃধ্র যেমন আমিষোপরি পতিত হয়, তেমনি আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক, এই ত্রিবিধ দুঃখ এবং তৃষ্ণা হৃদয়ে আপতিত হইয়া ব্যথা জন্মাইতেছে। বর্ষার বৃষ্টিধারা পতনে জলে যেমন বুদ্বুদাবলী উদ্ভূত হয়, আর সে সকল যেমন এই আছে, এই নাই, তেমনি এই ক্ষণভঙ্গুর দেহাদিও এই আছে এই নাই, অর্থাৎ ইহারা জলবিম্ববৎ উৎপন্ন মাত্রেই ধ্বংসশীল। কদলীতরুর গর্ভ যেমন অসার, এই দেহব্যবহারের অভ্যন্তরও

তেমনি বিচারে অসার বলিয়াই প্রতিপন্ন। অভিমানিনী রমণী যেমন স্বামীকে সপত্নীর প্রতি অনুরক্ত দর্শনে সত্বর পলায়ন করে, তেমনি এই যৌবনও অতি শীঘ্র চলিয়া যায়। কালক্রমে বৃক্ষরস শুষ্ক হইয়া যাইবার ন্যায় মন ইষ্ট বিষয়ের অলাভে সহসা দুর্ম্মনায়মান হইয়া পড়ে। এ সংসারে এমন শিব সুন্দর চিরস্থির কোন্ পদার্থ আছে, যাহা পাইয়া চিত্ত আর জননমরণাদি দুঃখদশায় সন্তপ্ত হয় না!

তাঁহারা পতিপত্নী এইরূপ বিচার-আলোচনা করিয়া আধ্যাত্ম-শাস্ত্রকেই ভবরোগের মহৌষধ বলিয়া নির্ণয় করিলেন এবং দীর্ঘকাল ধরিয়া তাহারই আলোচনা করিতে লাগিলেন। এই যে সংসারবিসূচিকা, একমাত্র আত্মজ্ঞান জন্মিলেই ইহার শান্তি ঘটিয়া থাকে। এইরূপ নিশ্চয় করিয়া সেই রাজদম্পতি আত্মজ্ঞানেই তৎপর হইলেন। তাঁহাদের মন প্রাণ তদেকতান হইল। তাঁহারা তন্নিষ্ঠ ও তৎপর হইয়া জ্ঞানবিদ্গণের শরণাপন্ন হইলেন। আত্মজ্ঞানের অর্চ্চনাই তাঁহাদের কার্য্য হইল। তাঁহারা সর্ব্বতোভাবে আত্মজ্ঞান লাভেরই চেষ্টা করিতে লাগিলেন। আত্মজ্ঞান পাইবার জন্য সুদৃঢ় অভ্যাস যোগ অবলম্বন করিলেন; পরস্পর পরস্পরকে সে বিষয়ে বোধ জন্মাইবার প্রয়াস পাইতে লাগিলেন; উভয়েই সেই পরমাত্মায় প্রীতি স্থাপন করিলেন এবং উভয়েই অধ্যাত্ম-শাস্ত্রের সম্যক্ চিন্তা ও শ্রবণাদি করিতে লাগিলেন।

হে রাম! যাহা সংসারসাগর-তরণের প্রধান উপায়, তথাবিধ রম্য পদময় শাস্ত্রার্থ অধ্যাত্মবেদিগণের মুখে প্রতিনিয়ত শ্রবণ করিয়া রাজপত্নী চূড়ালা দিনযামিনী এমনই ভাবে আত্মবিচার করিতে লাগিলেন যে, আমি দেহব্যাপারে নিবিষ্ট থাকি আর নাই থাকি, বিমল বুদ্ধিযোগে আত্মাকে একবার বিচার করিয়া দেখি। আমি—চেতনধাতু; এই কার্য্য-কারণ-সঙ্ঘাতে আমি কি? কিরূপে কোথা হইতে আমি এই ব্যামোহ দশা প্রাপ্ত হইলাম? এ মোহ বাস্তব পক্ষে কাহার? কি জন্য কেন এ মোহের আবির্ভাব? কোথায় কি হইতে ইহার উৎপত্তি? এ মোহ-ধর্ম্ম কাহার? যিনি আত্মা, তিনি তো অসঙ্গস্বভাব; সুতরাং এ ধর্ম্ম আত্মার নহে। আত্মায় যে মোহ উপলব্ধি হয়, তাহা কেবল

জড়দেহের সংসর্গে আরোপমাত্র ব্যতীত বাস্তব কিছুই নহে। কর্ম্মেন্দ্রিয়-সমূহকে দেহাতিরিক্ত বলা যায় না; কর্ম্মেন্দ্রিয়বৎ জ্ঞানেন্দ্রিয়গণকেও দেহেরই অংশ বলিয়াই নির্দ্দেশ করা হয়। সুতরাং তাহাও দেহের ন্যায় জড় বৈ আর কিছুই নয়। সঙ্কল্পশক্তিশালী মনও পরবশ্য বলিয়া জড়ই। রজ্জুযন্ত্র-যোগে পাষাণখণ্ড যেমন চালিত হয়, তেমনি নিশ্চয়াত্মক বুদ্ধির সাহায্যেই এ দেহ চালিত হইয়া থাকে। এক্ষেত্রে রজ্জুযন্ত্র যেমন জড়, তেমনি ঐ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিও জড়মাত্র। খাত যেমন নদীর প্রবাহ-প্রবর্ত্তক, তেমনি অহঙ্কারই ঐ বুদ্ধির চালক; কিন্তু সেই অহ-ঙ্কারও অসার; কাজেই শবের ন্যায় জড়। বালক যেমন ভ্রমাত্মক যক্ষের উৎপাদক, তেমনি জীবই উহার জনক। যিনি জীব, তিনি চেতনা-কাশ; এবং প্রাণোপাধিতে প্রকাশমান হইয়া হৃদয়ে বিরাজমান। এই জীব সর্ব্বান্তর্যামী বিশ্বচৈতন্য দ্বারা পরিব্যাপ্ত এবং বিষয় প্রকাশে মলিন সাক্ষিস্থানীয়। উক্ত বিশ্বচৈতন্যই জীবরূপে সমস্ত তত্ত্ব অবগত হইতে-ছেন। যাহা অতি প্রাচীন—যারপর নাই পুরাতন, সেই চিৎস্বরূপ আত্মা দ্বারাই জীবও জীবিত রহিয়াছে। বায়ু দ্বারা সৌরভ যেমন জীবিত থাকে এবং খাত যেমন নদী-প্রবাহের স্থিতিনিদান, তেমনি চেত্য অর্থাৎ বিষয়-ভ্রমযুক্ত চিৎস্বরূপই জীবের জীবন। মিথ্যা জড় বিষয়াংশের অধ্যাস-বশেই চিৎস্বভাব জড়প্রায় হইয়াছেন। অগ্নি যেমন জলমধ্যে মগ্ন হইয়া আপন ভাস্বর রূপ পরিত্যাগ করে, তেমনি একাদ্বয় মহাচিৎও স্বকল্পিত বিষয়ের মধ্যগত হইয়া—স্বীয় স্বচ্ছরূপ পরিহার করিয়া এই জীবাকারে প্রথিত হইতেছেন। এই জন্যই চিত্তাংশে চিৎস্বভাব হইতে বৈলক্ষণ্য লাভ করিয়াই যেন এই ঘট, পট, মঠ, ইত্যাদি সকল চিদাকার সহ একরসীভূত বলিয়া বোধ হয়। ফলে, যাহা চিৎসত্তা, তাহাই ঘটাদির সত্তা; ঘটাদি যদি ধ্বংস পাইয়া মৃদাদিতে লয় প্রাপ্ত হয়, তবে ঐ চিদাকারই আবার ঘটের অভাব; পটের অভাব, ইত্যাদি রূপে সত্তা পরিহারপূর্ব্বক অভাবরূপে প্রথিত হইয়া থাকেন। পরন্তু চিৎস্বভাবে চেত্য বিষয়ের যদি একাগ্রতা জন্মে, তবে ঐ বাসনোপস্থাপিত চিৎস্বভাবের বিষয়ে ঔৎসুক্যবশতঃ যে সদসদ্-রূপ উৎপন্ন হয়, তৎসকলই ক্ষণমধ্যে স্ব স্ব পূর্ব রূপ পরিহার করিয়া

ক্ষণেকের মধ্যেই সাক্ষাৎ চিদাকারতা উপগত হইয়া থাকে। এইরূপে যাহা সাক্ষাৎ চিৎস্বরূপ, তাহাই চেত্য বিষয়ে উন্মুখ হইয়া অবিদ্যার আবরণে অধ্যাস পরম্পরাক্রমে জড়, শূন্য ও অসৎ হইয়া পড়িয়াছে। মূল অবিদ্যাবরণের ভঙ্গ হইলে উহা চৈতন্য দ্বারা প্রবোধিত হইয়া থাকে।

রাজপত্নী চূড়ালা এইরূপ বিচার করিতে লাগিলেন। অবিদ্যার আবরণ ভঙ্গ করিয়া চিৎ কিরূপে কোন্ উপায়ে এই দৃশ্য স্বপ্ন পরিহারপূর্ব্বক প্রবোধ প্রাপ্ত হইতে পারেন, তাহাই তাঁহার চিন্তনীয় হইল। তিনি ক্রমে ক্রমে আত্মতত্ত্ব বুঝিতে পারিলেন। চূড়ালা ভাবিতে লাগিলেন,—অহো! আমার কি অপার সৌভাগ্য! যাহা নির্ম্মল জ্ঞেয় বস্তু, অদ্য বহু কালের পরে তাহা আমি জানিতে পারিলাম। এই চিৎস্বরূপ আত্মতত্ত্ব অবগত হইলে পুরুষার্থ হইতে কখনই কাহারও প্রস্খলন ঘটে না। মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, এ সকলই দেখিতেছি চিতের বিলাস মাত্র। চিৎ ব্যতীত এ সকল পৃথক্ পদার্থ নহে। এ সংসারের সমস্তই অলীক অসত্য প্রপঞ্চ; দেখিতেছি—এ সকলই কেবল ভ্রান্তির খেলা—ভ্রান্তির কল্পনা। এক মাত্র মহাচিৎই বিরাজ করিতেছেন। তিনি মহাসত্তা নামে নিরূপিত। সেই মহাচিৎ বা মহাসত্তায় কলঙ্ক নাই, বৈষম্য নাই; তাহা সম, শুদ্ধ ও অহং বৃত্তির উপরে প্রকাশমান। বিশুদ্ধ সম্বিৎই তাহার আকার। তিনি সৎ, অচ্যুত, ও পরম শিবস্বরূপ। মূল অবিদ্যাবরণ তাঁহা হইতে একেবারেই দুরাপাস্ত হইয়াছে। অবিদ্যা তাঁহাকে কখনই আচ্ছন্ন করিতে পারে না। এই জন্যই তিনি বিমলা বলিয়া নির্দ্দিষ্টা এবং এইজন্যই তিনি নিত্যোদিতা। বেদান্তাদি সমস্ত মোক্ষশাস্ত্রে ঐ মহাচিৎই ব্রহ্ম ও পরমাত্মা প্রভৃতি নামে নিরূপিত। চিত্ত, চেত্য ও চেতন, এই ত্রিপুটী মহাচিৎ হইতে অভিন্ন বস্তু। কেন না, ঐ সাক্ষীভূত মহাচিৎই উক্ত চিত্ত প্রভৃতি ত্রিপুটীর চৈতন্য-প্রতিপাদন-কর্ত্রী। ঐ ত্রিপুটী স্বয়ং কিছুই করিতে সক্ষম নহে; উহা সেই মহাচিৎ কর্ত্তৃক চেতিত হইয়াই কর্ত্তৃত্ব লাভ করে, মহাচিৎ পরিচ্ছেদাদি দ্বারা সিদ্ধ নহেন এবং ত্রিপুটীর আবির্ভাব হইবার বহুপূর্ব্ব হইতেই উনি স্বতঃসিদ্ধ আদ্য চিৎ বলিয়া বিখ্যাত হইতেছেন। জ্ঞানাতীত চিত্ত্বই ঐ সাক্ষীভূতা মহা-

চিত্তের অখণ্ড রূপ। ইনিই মন ও বুদ্ধি প্রভৃতি ইন্দ্রিয় এবং ঐ সকল ইন্দ্রিয়ের বিষয়াকারে প্রকাশিত। চিদাত্মা যখন মনোবুদ্ধি প্রভৃতি বিবর্ত্তাকারে প্রমাতৃভাব উপগত হন, তখন তাঁহাতে এই জগদাকার ভৌতিক পদার্থের সত্তা জলে তরঙ্গ, কণা ও কল্লোলাদি কল্পনার ন্যায় পরিস্ফুরিত হয়। এই যে জগৎ আছে বলিয়া ভাসমান হইতেছে, এই ভাসমানতা উল্লিখিত মহাচিত্তেরই রূপান্তর মাত্র। কেন না, যেমন স্ফটিক মণি নির্লিপ্ত ভাবে প্রতিবিম্ব গ্রহণ করে, ঐ মহাচিৎও তেমনি ভাবে অসঙ্গ হইয়াই জগৎ প্রতিবিম্ব ধারণ করিতেছেন। তাঁহারই নাম জগৎসত্তা এবং সেই জগৎসত্তা ব্যবহারিক ও প্রাতিভাসিক ভাবে স্ব স্ব অধিষ্ঠানের অনুসরণ করিয়া সমুদিত হইয়াছে। মহাচিত্তের যে জগদ্বিবর্ত্তকারিণী অদ্বিতীয় শক্তি, সেই শক্তি হেতুই এই জগৎসত্তা বর্ত্তমান। কিন্তু ইহা মায়া ভিন্ন আর কিছুই নহে। কেন না, জগৎসত্তা এতদীয় আশ্রয় চিৎসত্তার আয়ত্ত বলিয়া অভিন্ন। স্বর্ণালঙ্কারাদির ভগ্নাবস্থায় তৎসমুদায়ের বৈচিত্র্য যেমন স্বর্ণেই বিলয় পায়, এবং শেষে যেমন তাহা স্বর্ণসত্তার স্বরূপেই প্রকাশ প্রাপ্ত হয়, তেমনি এই জগৎসত্তাও অন্তিম দশায় সেই চিৎসত্তায় প্রকাশমান হয়। জগৎসত্তারূপ আত্মাকে সেই চিৎসত্তাই অনুভব করিতে থাকেন। যেমন স্বপ্ন ও ইন্দ্রজালাদি ব্যাপারে নিজের চিত্তই দ্রবাকারে পরিণত অর্থাৎ জলরূপী হইয়া সমুদ্রাদির আকারে প্রসিদ্ধি লাভ করে, তেমনি মহাচিৎসত্তাই জগদাকারে প্রথিত হইয়া থাকেন। যেমন চিৎস্বরূপ আত্মাই স্বপ্নে জলাকার ধারণ করেন, তেমনি অহঙ্কারাতীত চিৎ বস্তুই 'অহং' 'আমি' ইত্যাদি রূপে পরিস্ফুরিত হইতেছেন। কাজেই জন্ম বল, জরা বল, মরণ বল, সদ্‌গতি বা অসদ্‌গতির কথাই বল, এই সমস্ত প্রথা এ জগতে একান্ত পক্ষে অসম্ভব। পরমার্থতঃ পূর্ণ চিদাত্মার 'অহং' ব্যতিরিক্ত অণুমাত্র অন্য কিছুই নাই। এই অহম্ভাবের যখন সীমা নাই, তখন 'অহং' ভাব ব্যতীত যাহা কিছু প্রতিভাসমান হয়, তাহা চিন্মাত্রই। সেই চিন্মাত্র 'অহং'স্বরূপের জন্ম মরণাদি নাই। ঐ চিদাদিত্য অতীব নির্ম্মল; উহা অচ্ছেদ্য, অভেদ্য এবং অদাহ্য।

অহো! অদ্য আমার কি সৌভাগ্য যে, এতকাল পরে আমি শান্ত নির্ব্বৃত হইতে পারিলাম। এখন আমার ভ্রম গিয়াছে; আমি নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছি। মন্থনের পর মন্দর উত্তোলিত হইলে সমুদ্র যেমন নিশ্চল-ভাবে অবস্থান করে, তেমনি নিশ্চলরূপে আমি অদ্য অবস্থান করিতে পারিয়াছি। এতদিনে বুঝিতে পারিলাম যে, আত্মাকাশে দৃশ্যাভাস কিছুই নাই। ঐ আকাশ অতি নির্ম্মল ও অপ্রচ্যুত-স্বরূপ। উহা অবাধ, অগাধ, ও অনন্ত। উহাতে কালিক পরিচ্ছেদ নাই। কোন দেশ বা বস্তুকৃত পরিচ্ছেদ উহাতে অসম্ভব। আব্রহ্ম স্তম্ব পর্য্যন্ত সমস্ত প্রাণীর কর্ম্ম, কর্ম্মফল ও তৎসাধন ব্যাপার নিষ্ফল-সাধন বা বৃথা চেষ্টা মাত্র; কেন না, ঐ সমস্তই আত্মাকাশ। তদ্ব্যতীত ঐ সকল আর কিছুই নহে। এই সুরাসুর-পরিবৃত নিখিল জগৎই আত্মাকাশময়; সুতরাং উহার কৃত্রিমতা কোথায়? যেমন কুলালাদি-নির্ম্মিত মৃন্ময় সেনা মৃত্তিকা মাত্রই, তেমনি ঐ দ্রষ্টৃ-দৃশ্যময়ী জগৎসত্তা, একমাত্র সেই চিন্মাত্রময়ীই। এই একত্ব, দ্বিত্ব, ইহা, তাহা, আমি ও আমি নাই, এই সকল ভাব একটা সম্মোহ বা ভ্রম মাত্র। এ সমস্ত ভাব কাহার? কি নিমিত্ত কোথা হইতে আসিয়া ইহারা উপস্থিত হয়? আমার তো এখন ভ্রম বা মোহ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। আমি এখন অনন্ত, অক্লেশ ও একান্ত শান্ত হইয়াছি। আমার সর্ব্ব সন্তাপ অপগত হইয়াছে। আমি নির্ব্বাণ পদ প্রাপ্ত হইয়াছি। কণ্ঠগত বিস্মৃত চামীকরবৎ আমি সহসা প্রাপ্ত 'অহং'স্বরূপেই অবস্থান করিতেছি। চেতনরূপে, অচেতনরূপে, ভোক্তৃরূপে বা ভোগ্যরূপে, যে রূপেই হউক, যাহা যাহা প্রসিদ্ধ আছে, সে সকলই সদা স্বপ্রকাশ আত্মার অতিরিক্ত নহে। যাহা সতত স্বপ্রকাশ আত্মা, তাহাই ব্রহ্ম এবং তাহাই চিদাকাশরূপে ভাসমান আমি। রজ্জুতে যেমন সর্পের অস্তিত্ব নাই, তেমনি চিদাকাশে ঐ ঐ সকলের কিছুই নাই। তাহাতে আমিত্ব নাই, ভাব নাই, অভাব নাই, কোন কিছুই নাই। ঐ চিদাকাশ শান্ত, সর্ব্ব-নিরবলম্ব, কেবল ও পরমস্বরূপ সর্ব্বমূল।

তখন শিখিধ্বজমহিষী চূড়ালা এই প্রকার বিচার-পরায়ণ হইলে তাঁহার আত্যন্তিক মোহ নিবৃত্তি হইয়া গেল। মোহাপগমে তিনি পরম

আত্মতত্ত্ব জানিতে পারিলেন। প্রবোধ উদিত হওয়ায়, তদীয় হৃদয় হইতে রাগ, দ্বেষ, ভয় ও মোহ প্রভৃতি তমোগুণের যাবতীয় কার্য্য তিরোহিত হইল। তিনি শারদীয় নভোমণ্ডলের ন্যায় নির্ম্মল শান্তরূপে সুশোভিত হইতে লাগিলেন।

অষ্টসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭৮॥

ঊনাশীতিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! চূড়ালা ঐরূপে অনুদিন আত্মারাম হইয়া অবস্থান করায় ক্রমে তাঁহার স্বাভাবিক আত্মপ্রতিষ্ঠায় অবস্থিতি হইল। চূড়ালার রাগ গেল, আসক্তি গেল, এবং সুখ-দুঃখাদি সমুদায় দ্বন্দ্বভাব তিরোহিত হইল। তিনি সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিলেন। চূড়ালা তখন হইতে কোন বস্তু গ্রহণ বা বর্জ্জন করিতেন না। তাঁহার অন্তরাত্মা পরমাত্ম-লাভরূপ মহালাভে পূর্ণানন্দে পরিপূর্ণ হইল। তাই তাঁহার সমস্ত সন্দেহ-জাল ছিন্ন হইয়া গেল এবং সংসার-মহাসাগরের পরপার-প্রাপ্তি করায়ত্ত হইয়া উঠিল। দীর্ঘকাল হইতে তাঁহার বহু ভ্রান্তি ও বহু শ্রান্তি জন্মিয়াছিল, এক্ষণে জ্ঞান লব্ধ হওয়ায় সে সকল ভ্রান্তি চলিয়া গেল এবং তিনি নিরতিশয় আনন্দময় পরম পদে বিশ্রান্তি লাভ করিলেন। তখন সর্ব্ববিধ উপমার তিনি অতীত হইলেন এবং নিখিল বাগ্‌বিষয়ের অতিবর্ত্তিনী হইয়া উঠিলেন।

এইরূপে সেই বরবর্ণিনী রাজরাণী চূড়ালা অতি অল্পকালের মধ্যেই বেদ্য বিষয় বিদিত হইলেন। যেমন অজ্ঞান ব্যক্তির হৃদয়ে এই জগৎসম্বন্ধীয় স্পন্দ বিভ্রম অকস্মাৎ সমুদিত হয়, তেমনি যিনি তত্ত্বজ্ঞানবান্ মহাত্মা, তাঁহার হৃদয়ে ভ্রমাদি আপনা হইতেই বিলয় পাইয়া যায়। যাহা সকল প্রকার দ্বৈতভাব হইতে বর্জ্জিত; সেই শান্ততম ব্রহ্মপদে চূড়ালা তখন বিশ্রাম লাভ করিয়া শারদীয় স্বচ্ছ মেঘমালার ন্যায় সুন্দর শোভা ধারণ

করিলেন। তাঁহার সমস্ত সম্ভ্রম তিরোহিত হইয়া গেল। বৃদ্ধা গাভী যেমন [illegible]াং তৃণ-জলাদিময় দুরারোহ শৈলাগ্রভাগে আরোহণ করিয়া অনাকুল-ভাবে অবস্থান করে, তেমনি সেই শিখিধ্বজসহধর্ম্মিণী চূড়ালা জাগ্রদাদি নিখিল অবস্থায় একই ভাবে প্রকাশমান আত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাতেই অনাকুলভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তাঁহার স্ববিবেকে নিয়ত দৃঢ় অভ্যাস ছিল; তাই তত্ত্বজ্ঞানের অভ্যুদয়ে তাঁহার আত্ম-প্রকাশ হইল। তিনি তাহাতে নবোদ্গত লতিকার ন্যায় রম্য শোভা ধারণ করিলেন।

একদা রাজা শিখিধ্বজ স্বীয় সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী প্রণয়িনী চূড়ালাকে অপূর্ব্ব শোভায় সুশোভিত দেখিয়া সবিস্ময়ে প্রসন্নমুখে জিজ্ঞাসা করিলেন,—অয়ি কৃশাঙ্গি! চন্দ্র উদিত হইলে কিম্বা উত্তম প্রজারঞ্জক রাজা শাসনভার গ্রহণ করিলে পৃথিবীর যেমন শোভাসমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাইয়া থাকে, তেমনি দেখিতেছি—তুমি যেন পুনর্ব্বার নব যৌবন প্রাপ্ত হইয়া কিম্বা বারম্বার বেশভূষাদি দ্বারা সবিশেষ বিভূষিত হইয়া সমধিক শোভায় শোভমান হইতেছ। অয়ি প্রিয়ে! মনে হইতেছে, তুমি যেন সুধাসার পান করিয়া কিম্বা প্রাপ্য পদ প্রাপ্ত হইয়া অথবা যেন আনন্দের প্রবাহে আপূরিত হইয়াই অত্যধিক বিরাজ করিতেছ। অয়ি কান্তে! আমি দেখিতেছি, তুমি কান্তি ও শান্তিময় সুন্দর দেহযষ্টি ধারণ করিয়া কুমুদকান্তকেও অধঃ-কৃত করিয়াছ। তোমার কি এক অনির্ব্বচনীয় শোভাই না হইতেছে! দেখিতেছি, তুমি ভোগকৃপণ নহ। তোমার চিত্ত শমদমাদি গুণ-সম্পন্ন হইয়াছে। উহা বিবেক অর্জ্জন করিয়া সমভাব লাভ করিয়াছে। উহার গাম্ভীর্য্য এবং অচাপল্য প্রতিষ্ঠা পাইয়াছে। অয়ি প্রাণপ্রিয়ে! আমি দেখিতেছি, তোমার মন জগৎকে তৃণবৎ তুচ্ছ বোধ করিয়াছে, এবং অনন্ত, সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও সৌম্যভাবাপন্ন হইয়াছে। অয়ি মহাভাগে! তোমার চিত্তে আর জড়ভাব নাই। উহা নির্জ্জল মরুপ্রায় ও পূর্ণতাবশতঃ ক্ষীরাব্ধিবৎ শোভা ধারণ করিয়াছে। এক্ষণে কোনওরূপ বিভব বা বিভব-জনিত আনন্দের সহিত তোমার চিত্ত তুলিত হইতে পারে না। তোমার পূর্ব্বের দেহ বালকদলী ও মৃণালাঙ্কুরের ন্যায় কোমল ও অচাপল ছিল;

এক্ষণে সেই দেহেই তোমার তেজের আধিক্য ঘটিয়াছে বলিয়া মনে হয়—তুমি যেন কতই না উন্নতি প্রাপ্ত হইয়াছ। তোমার দেহাদি সমস্তই পূর্ব্বের ন্যায়ই আছে, তথাচ শিশির-শেষের লতার ন্যায় কি যেন কি এক ভাবান্তর প্রাপ্ত হইয়া যেন এক নূতন ব্যক্তির ন্যায় হইয়া গিয়াছ। তবে কি তুমি পীযুষ পান করিয়াছ? কিম্বা সাম্রাজ্য-লক্ষ্মী লাভ করিয়াছ? অথবা রসায়নাদি প্রয়োগ, মন্ত্রশক্তি বা কোন যোগশক্তির সহায়তায় মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়াছ? হে নীলোৎপলনিভ-নয়নে! তুমি কি কোন নূতন রাজ্যের অধীশ্বরী হইয়াছ? কিম্বা চিন্তামণি তোমার হস্তগত হইয়াছে? অথবা এই ত্রিভুবন অপেক্ষা উৎকৃষ্টতম অন্য কোনরূপ দুর্লভ সামগ্রী তুমি লাভ করিয়াছ? ইহা আমি জানিতে ইচ্ছা করিতেছি।

চূড়ালা কহিলেন,—আমি মূঢ় জন-প্রসিদ্ধ দেহাত্মবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়াছি। যাহাতে নামরূপাদি কিছুই নাই, তত্ত্বজ্ঞানের সহায়তায় তথাবিধ ব্রহ্মাত্মতা অধিগত হইয়াছি। এই কারণেই আমি আপনার বর্ণিত-রূপ শ্রীমতী হইয়াছি। মন্ত্র এবং রসায়নাদির সাধনায় যে অকিঞ্চিৎকর আকারাদি লাভ হয়, তাহা আমি তুচ্ছ বোধে প্রাপ্ত হই নাই; তাই আমার এরূপ শ্রী হইয়াছে। যাহা পরিচ্ছিন্ন ও অসত্য, তথাবিধ সকল বস্তু আমি পরিত্যাগ করিয়া যাহা অপরিচ্ছিন্ন সত্য, তথাবিধ পরম বস্তুকে আমি প্রাপ্ত হইয়াছি। এই জন্যই আমার এ হেন শ্রী হইয়াছে। যাহা সৃষ্টি-দৃষ্টিতে দেখিলে কিঞ্চিৎ বস্তুর আকারে পরিদৃশ্যমান হয় এবং প্রলয় দৃষ্টিতে দেখিলে যাহা কিছুই নহে বলিয়া প্রতীয়মান হইয়া থাকে, তথাবিধ বস্তুকে আমি কূটস্থ ভূমানন্দ-স্বভাবে অবস্থিত বলিয়া অবগত হইতে পারিয়াছি। এই জন্যই আমি শ্রীমতী হইয়াছি। যাহা ভোগের বস্তু, তাহাকে আশানুরূপ ভোগ করিয়া দূরে পরিহার করিলে অন্তরে যেমন সন্তোষ হয় ও মনের আকাঙ্ক্ষা মিটিয়া যায়, তেমনি আমি ভোগ না করিয়াই সন্তুষ্ট হইয়াছি। কোনরূপ হর্ষ বা বিষাদে আমি আবিষ্ট হইতেছি না; এইজন্যই আমি এই প্রকার শ্রীমতী হইয়াছি। আমি এক্ষণে আকাশবৎ স্বচ্ছহৃদয়ে হৃদয়াধিদেবতা ব্রহ্মকে বিলোকন করিয়া রাজ-ভোগে অনুরাগ পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহাতেই অনুরাগ স্থাপন করিতে

পারিয়াছি। এই জন্যই আমার এই দেহের এইরূপ অসাধারণ শ্রীসম্পত্তি হইয়াছে। আমার এ দেহ আসনে, উদ্যানে কিম্বা গৃহাদিতে যেখানেই থাকুক, আমি স্বয়ং কিন্তু পূর্ণাত্মাতেই অবস্থান করিতেছি। দেহের ভোগ —ভূষণাদি, মনের ভোগ—সম্মানাদি কিম্বা তাহার অলাভে লজ্জাদি এ সমুদায়ে আমার আর এখন আস্থা নাই। কাজেই আমি ঈদৃশ অভূতপূর্ব্ব শ্রীধারণে সক্ষম হইয়াছি। একমাত্র আমিই এ জগতের প্রভু অথচ আমার কিছু মাত্র রূপ নাই; এইরূপে আমি এখন আত্মমাত্রেই সন্তোষ লাভ করিতেছি; সেই জন্যই আমার এইরূপ শ্রীসম্পদ্ লাভ ঘটিয়াছে। অধিষ্ঠান-দৃষ্টিতে এই দেহাদিই আমি আর আরোপ-দৃষ্টিতে এ দেহাদি আমি নহি; এইরূপে আমিই সকল অথচ আমি কিছুই নহি, ঈদৃশ দৃঢ় সংস্কার আমার হইয়াছে বলিয়াই অদ্য এমন দেহশোভা আমার ঘটিয়াছে। সুখ, দুঃখ, অর্থ, অনর্থ; বা অন্য কোন প্রকার স্থিতি, কোন কিছুতেই আমার প্রার্থনা বা আকাঙ্ক্ষা নাই, আমি অনর্থ পরিহারের বাসনাও পোষণ করি না; সুখ বা দুঃখ যখন যাহা ঘটুক, তাহাতেই আমার সন্তোষ আছে বলিয়া আমি এইরূপ শ্রীসম্পন্ন হইয়াছি। যাহার প্রভাবে আমার রাগ-দ্বেষাদি ক্ষয় পাইয়া গিয়াছে, সেই স্বীয় প্রজ্ঞা ও শাস্ত্রদৃষ্টি সখীর ন্যায় সর্ব্বদাই আমার সঙ্গে সঙ্গে রহিয়াছে। আমি তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়াই সংসার-পথে ভ্রমণ করিতেছি। আর আমার এমন সমস্ত সখী আছে, যাঁহাদের প্রজ্ঞা ও শাস্ত্রদৃষ্টির গুণে রাগ-দ্বেষাদি ক্ষয় পাইয়া মন্দীভূত হইয়াছে; আমি সেই সকল সখীর সঙ্গে নিত্য নিত্য ক্রীড়া করিয়া থাকি; এই জন্যই আমার এরূপ শ্রীলাভ হইয়াছে। এ জগতে আমি চক্ষুর আলোক, অন্যান্য ইন্দ্রিয়বর্গ ও মনের সাহায্যে যাহা কিছু দেখিতেছি, সে সকল দৃশ্যজাল অকিঞ্চিৎকর—সকলই সর্ব্বতোভাবে মিথ্যা প্রপঞ্চ বৈ আর কিছুই নহে। আমি অন্তরে অনুভব-দৃষ্টিতে এখন এই প্রকারই দেখিতেছি। অপিচ ঐ সকল মিথ্যা প্রপঞ্চের অন্তরে সদা সেই নিষ্প্রপঞ্চ বস্তুও দর্শন করিতেছি। এইরূপে মদীয় বোধ-বিকাশ হইয়াছে বলিয়া চিত্ত আমার নির্ম্মল হইয়া গিয়াছে। এই জন্যই এখন আমি অন্তরে বাহিরে কি এক অনির্ব্বচনীয় পরম স্বরূপ সন্দর্শন করিতেছি। হে স্বামিন্!

এই নিমিত্তই আমি পরম মঙ্গলশ্রী লাভ করিয়াছি। এই শ্রী আমার অনন্ত কাল অনপায়িনী হইয়া থাকিবে।

উনাশীতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭৯ ॥

অশীতিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! বরবর্ণিনী চূড়ালা বিশ্রান্তি লাভ করিয়াছিলেন; তাই তিনি সরল ও উদারভাবে রাজার নিকট সকল কথা কহিলেন; কিন্তু রাজা শিখিধ্বজ তাঁহার বাক্যের তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে পারিলেন না। তিনি না বুঝিয়া উপহাসের সহিত কহিলেন,—অয়ি প্রিয়ে! তুমি এতক্ষণ কতকগুলি অসম্বদ্ধ বাক্য প্রয়োগ করিলে। এইরূপ বাক্য-বিন্যাসে তোমার কোন দোষ আছে বলিয়া বলিতেছি না; কেন না, তোমার বয়স অল্প; বুদ্ধি এখনও পরিপক্ক হয় নাই! কাজেই অন্যে সহজে বুঝিতে পারে, এরূপ বাক্যপ্রয়োগের কৌশল কোথা হইতে জানিবে? তুমি রাজার নন্দিনী, সতত রাজভোগেই তোমার অনুরক্তি। তুমি সেই ভোগানুরক্তি লইয়াই কাল কাটাইতে থাক। তোমার কথা-গুলি যে সম্পূর্ণই প্রলাপ, তাহা আমি এইবার একে একে দেখাইতেছি। ভাবিয়া দেখ,—তুমি বলিয়াছ, আমি এ সকল আকার পরিহার করিয়া যাহা নিরাকার, তাহাই পাইয়াছি এবং হইয়াছি; সে জন্য আমি এরূপ শ্রীমতী। তোমার এ কথা প্রলাপ বৈ আর কি? কেন না, যাহার কোনও আকার নাই, সে তো শূন্যময়; সুতরাং যাহা শূন্য, তাহার আবার শোভা-সম্পত্তি কি? তোমার আর এক কথা এই যে, আমি ভোগ না করিয়াই ভোগ-তৃপ্ত আছি; ইহাও প্রলাপ বাক্য। দেখ, আমি অভুক্ত ভোগ্য পদার্থে পরিতৃপ্ত থাকি, এই বলিয়া যে ব্যক্তি ভোগ বিসর্জ্জন দেয়, ক্রোধের উদয়ে আসন-শয়নাদি পরিত্যাগের ন্যায় তাহার ঐরূপ ভোগত্যাগ কি শোভা পায়? তুমি বলিয়াছ, আমি একাকী আকাশবৎ শূন্য-হৃদয়ে

বিহার করিতেছি। তোমার এই কথাও অসমীচীন; কেন না, যে ব্যক্তি নিজের ভোগ্যাদি ও ভোগসাধন ধনাদি বিসর্জ্জনপূর্ব্বক একাকী আকাশে বিহার করে, তাহার আবার শোভা কি? ঐ রূপ স্থিতি তো আমি পিশাচের স্থিতি বলিয়াই মনে করি। যে ব্যক্তি অতি ধীরপ্রকৃতি, যাহার অতি বড় ধৈর্য্যবল আছে; সে সকলে শীত, উষ্ণ, ক্ষুধা-তৃষ্ণাদি দুঃখ সহ্য করিতে পারে বটে; কিন্তু তাহা তাহার শোভা বৃদ্ধির কারণ নহে। এই দেহাদি আমি নহি, আমি অন্য প্রকার, আমি কিছুই নহি; অথচ আমিই সকল, আমিই সকলপ্রকার; এ সমস্ত কথা স্পষ্টতই প্রলাপ। এরূপ প্রলাপ যাহারা বলে, তাহাদের আবার শোভার অবসর কোথায়? যাহা দেখিতেছি, তাহা কিছুই নহে। আর যাহা কিছুই নয়, শূন্য—এই সকল প্রপঞ্চ হইতে অন্য প্রকার, তাহাই দেখিতেছি! এরূপ উক্তি নিতান্তই অসম্বদ্ধ প্রলাপ বৈ আর কি হইতে পারে? অতএব যাহার প্রলাপ প্রয়োগ এবম্বিধ, তাহার শোভা কিরূপে হইবে? যাহা হউক, এই জন্যই তোমায় বলিতে হয়, তুমি অপক্কবুদ্ধি বালিকা; মতি তোমার চঞ্চলা। অথবা তুমি ঐ যে সকল কথা কহিলে, ঐ সমস্ত তোমার একটা বিনোদ-ক্রীড়া মাত্র। অয়ি বিলাসিনি সুন্দরি! আমি বিলক্ষণ জানি, সুন্দরীরা ক্রীড়াকৌতুক করিবার জন্য বিবিধ আলাপ প্রলাপের অবতারণা করিয়া থাকে।

রাজা শিখিধ্বজ প্রিয়তমা চূড়ালাকে এইরূপ বলিলেন; বলিবার সময় এক-একটু হাসিলেন; অনন্তর উচ্চ হাস্য করিয়া কথার উপসংহার করিলেন। এদিকে মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত হইল। তদ্দর্শনে তিনি স্নান করিবার নিমিত্ত গাত্রোত্থানপূর্ব্বক অন্তঃপুর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তখন চূড়ালা ভাবিলেন—হায়, কি কষ্টের কথা! আত্মতত্ত্ব কি, রাজা তাহা জানেন না; তাই তিনি আত্মবিশ্রান্তি লাভে সক্ষম হন নাই। কাজেই আমার কথার মর্ম্ম রাজা বুঝিলেন না। এই ভাবিয়া চূড়ালা কিঞ্চিৎ খিন্ন হইলেন। অনন্তর তিনিও স্বকার্য্য-সাধনে মনোনিবেশ করিলেন।

রামচন্দ্র! তৎকালে সেই রাজদম্পতি পরস্পর ঐ রূপ বিভিন্ন অভি-প্রায় লইয়া পার্থিবলীলায় কাল কাটাইতে লাগিলেন। ক্রমে বহুবর্ষ অতীত

হইয়া গেল। একদা সেই নিত্য তৃপ্তিমতী চূড়ালার চিত্তে দেবতার ন্যায় আকাশদেশে গমনাগমন করিবার ইচ্ছা হইল। ইচ্ছা মাত্র সেই নৃপনন্দিনী, খেচরত্ব সিদ্ধি লাভ করিবার জন্য সকল প্রকার ভোগসুখে জলাঞ্জলি দিয়া বিজন প্রদেশের আশ্রয় লইলেন। এই সময় রাজা শিখিধ্বজ কোন এক শত্রু নরপতিকে জয় করিবার অভিপ্রায়ে তিন বৎসরের জন্য স্বীয় রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গিয়াছিলেন; সুতরাং একাকিনী চূড়ালার তখন একান্তসাধনায় কোনই বাধা ঘটে নাই। সেই অবস্থায় তিনি আসন বন্ধনপূর্ব্বক স্বীয় দেহাবয়ব স্থির রাখিয়া ভ্রূমধ্যে ঊর্দ্ধগত প্রাণবায়ুর নিরোধ অভ্যাস করিতে করিতে খেচরত্ব সিদ্ধির অনুকূল যোগসাধন করিতে লাগিলেন।

রামচন্দ্র কহিলেন,—হে বিভো! কি স্থাবর, কি জঙ্গম, নিখিল জগৎই ক্রিয়া-নিষ্পন্ন; ক্রিয়া ব্যতীত কোনও কিছু উৎপন্ন হইতে দেখা যায় না। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য—ঐ ক্রিয়াখ্য স্পন্দনিষ্পত্তি কিরূপে হয়? কিরূপেই বা ঐ ক্রিয়াখ্য বস্তুর উৎপত্তি অনুভূত হইয়া থাকে? তাহা আমার নিকট প্রকাশ করিয়া বলুন। আর এক কথা জিজ্ঞাস্য এই যে, গগনে গমনাদি-রূপ সিদ্ধি সকল কোন্ প্রযত্নময় দৃঢ়াভ্যাস-নিষ্পাদ্য স্পন্দ-বিলাসের ফল? আত্মজ্ঞ অনাত্মজ্ঞ উভয়বিধ লোককেই সাধনায় লিপ্ত হইতে দেখা যায়। তন্মধ্যে কেহ বা কৌতুকের জন্য এবং কেহ বা সিদ্ধির জন্য সাধনায় তন্ময় হইয়া থাকে। এখন জিজ্ঞাসা এই যে, কোন্ প্রকারের লোক সিদ্ধি লাভ করে?

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! এ জগতের সর্ব্বত্রই সাধ্য বা সাধনার বস্তু ত্রিবিধ; যথা—উপাদেয়, হেয় এবং উপেক্ষ্য। যাহা নিজের অনুকূল, তাহার নাম উপাদেয়, যাহা প্রতিকূল, তাহা হেয় আর যাহা অনুকূলও নহে, প্রতিকূলও নহে, তাহাই উপেক্ষ্য। হে সুমতে! যাহা সাক্ষাৎ বা পরম্পরা-ক্রমে সুখের সাধন, তাহাই উপাদেয়বোধে গ্রাহ্য। যাহা সুখের বিরোধী, তাহা হেয়জ্ঞানে অগ্রাহ্য; অপিচ যাহা না হেয়, না উপাদেয়, তাহাই উপেক্ষ্য। নিখিল পদার্থের এই তিন বিভাগ অজ্ঞদিগের পক্ষেই ব্যবস্থেয়। যিনি জ্ঞানী, তাঁহার পক্ষে এরূপ কোন ব্যবস্থাই নাই; কেন না, তাঁহার—

দৃষ্টিতে সমস্তই আত্মময়; কাজেই জ্ঞানীর পক্ষে ঐ তিন বিভাগ সম্পূর্ণই অসম্ভব। তবে আত্মদর্শী পুরুষ কখন কখন উপেক্ষার সহিত এই বিশ্ব অবলোকন করেন, অথবা একেবারেই দর্শন করেন না। আত্মজ্ঞানীর পক্ষে যাহা উপেক্ষার বিষয়, মূঢ়ের নিকট তাহাই উপাদেয়বোধে গ্রহণীয়। আর যিনি বৈরাগ্যযুক্ত, তাঁহার নিকট উহা হেয় বা পরিত্যাজ্য। এক্ষণে সিদ্ধিক্রম কিরূপে হয়, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। যেমন বসন্ত-সমাগমে ভূতল প্রফুল্ল হইয়া উঠে, তেমনি দেশ, কাল, ক্রিয়া ও দ্রব্য সাধনায় জীব এ সংসারে সর্ব্ববিধ সিদ্ধিলাভে আহ্লাদিত হইয়া থাকে। উক্ত দেহাদি-চতুষ্টয়কে সিদ্ধিলাভের প্রতি কারণ বলা হয়। উহাদের মধ্যে যোগ মন্ত্রাদি-রূপ ক্রিয়াই প্রধান; অন্য সকল সহকারী। উল্লিখিত কারণচতুষ্টয়ের মিলন হওয়ায় শীঘ্রই সিদ্ধি লাভ করা যায়। পরন্তু উহাদের মধ্যে একতরের অভাবঘটনায় সিদ্ধিলাভে বিলম্ব ঘটিয়া থাকে। উড্ডামরতন্ত্র ও যোগিনী-কল্পাদি বহু গ্রন্থে বিবিধ সিদ্ধিলাভের উপায় বর্ণিত আছে। সে সকলের মধ্যে গগনে গমনাগমনের জন্য গুটিকাসিদ্ধি, অঞ্জনসিদ্ধি, পাদুকাসিদ্ধি ও খড়্গসিদ্ধি প্রভৃতি অনেক উপায় নির্ণীত হইয়াছে। তোমার প্রশ্নের বিস্তৃতরূপে উত্তর প্রদান করিতে হইলে, ঐ সকলের বিবরণ যথাযথ বলিতে হয়। কিন্তু তাহা যদি বলি, তবে যাহারা তত্ত্বজিজ্ঞাসু নহে, তাদৃশ শ্রোতৃ-বর্গের সেই সেই সিদ্ধি-বিষয়ে কদাচিৎ অভিলাষোদয় হইতে পারে। প্রবৃত্তিবশে সেরূপ হইলে মহান্ দোষ ঘটিবারই সম্ভাবনা। বিশেষতঃ তুমি সবিস্তার আত্মতত্ত্ব শ্রবণ করিতে সমুৎসুক হইয়াছ, ঐ সকল বিষয় শ্রবণ করিলে তোমারও সেই আত্মতত্ত্ব শ্রবণরূপ প্রকৃত অর্থের বিঘ্ন ঘটিতে পারে; অতএব ঐ সমুদায়ের নিরূপণ এখানে অনুচিত বলিয়াই মনে করি। রত্নসিদ্ধি, মন্ত্রসিদ্ধি, ঔষধিসিদ্ধি ও তপঃসিদ্ধি প্রভৃতিও শাস্ত্রে নির্ণীত হইয়াছে। অর্থাৎ রত্ন, মন্ত্র, ও ওষধি প্রভৃতি দ্বারাও এক প্রকার সিদ্ধ হওয়া যায়; কিন্তু ঐ সকলের বিস্তার আত্মতত্ত্ব নিরূপণের অন্তরায়। শ্রীশৈল প্রভৃতি স্থানে সত্বর সিদ্ধিলাভ ঘটে বটে; কিন্তু কৃতকৃত্য পুরুষের নিকট ঐ সমস্ত বিস্তার তুচ্ছ এবং প্রকৃত বিষয়ের বিঘ্ন মাত্র। অতএব যখন শিখিধ্বজ রাজার উপাখ্যান প্রসঙ্গই উত্থাপিত

হইয়াছে, তখন প্রাণাদি বায়ুর নিরোধবিষয়ক সিদ্ধির কথাই বর্ণন করি, শ্রবণ কর।

হে রাম! পবনাভ্যাস বা প্রাণায়াম করিতে হইলে অগ্রে যম-নিয়মাদি যোগাঙ্গসমূহের শিক্ষা করা প্রয়োজন। অনন্তর অন্তরের নিখিল বাসনা বিসর্জ্জন করিতে হয়। পশ্চাৎ স্থানকাদি নামক যে সকল আসন আছে, পায়ু প্রভৃতি বায়ুর দ্বার নিরুদ্ধ করিয়া তৎসমস্ত আয়ত্ত করিতে হয়। অর্থাৎ সিদ্ধাদি করিয়া যত কিছু আসন আছে, সে সমুদায়ে উপবেশন-পূর্ব্বক কায়, শির ও গ্রীবাদি সম ও নিশ্চল রাখিয়া নাসাগ্র নিরীক্ষণাদি যোগশাস্ত্রোল্লিখিত ক্রিয়াক্রম সকল অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। হে সুব্রত রাম! এইরূপে হিত মিত মেধ্য ভক্ষ্য ভক্ষণ এবং শুদ্ধাচারী হইয়া সৎ-শাস্ত্রের অনুশীলনায় মনঃসন্নিবেশ করিতে হয়। শুদ্ধাচার, মেধ্য ভক্ষ্য গ্রহণ, শাস্ত্রার্থের চিন্তন, সদাচারে অবস্থান, সাধুজনের সঙ্গ, সর্ব্ব বিষয়-বর্জ্জন, সুখাসনে উপবেশন, কিয়ৎকাল প্রাণায়াম অভ্যাস, কোপ-লোভাদির পরিহার ও সর্ব্বভোগে বৈরাগ্য যখন সুসিদ্ধ হয় এবং যখন প্রাণ-বায়ুর রেচক, কুম্ভক ও পূরক সম্যক্‌রূপে অভ্যস্ত হইয়া উঠে, তখন প্রাণের উপর যোগীর প্রভুত্ব জন্মে। ভৃত্যগণ যেমন প্রভুর অধীন থাকিয়া কার্য্য সাধন করে, প্রাণাদি বায়ুও যোগীর অধীনতায় নিযন্ত্রিত থাকিয়া তখন তদীয় কার্য্যসাধনে তৎপর হয়। হে রাঘব! প্রাণাদি বায়ু যদি বিজিত হইয়া অধীন হয়, তাহা হইলে রাজ্য হইতে মোক্ষ পর্য্যন্ত সমস্ত সম্পদই সকল অধিকারীর পক্ষেই সুলভ হইয়া উঠে। ফলে প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যানাখ্য বায়ু বশ হইলে সকল প্রকার লাভই লভ্য হইয়া থাকে। জীবের দেহ মধ্যে যে সুষুম্নানাম্নী নাড়ী আছে, উহা চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত দ্বিসপ্ততি শাখায় বেষ্টিত বলিয়া পরিমণ্ডলাকার এবং নাড়ী-নিচয় এবং অন্ত্রসমূহকেও বেষ্টন করিয়া বিরাজমান। এই জন্য উহাকে আন্ত্রবেষ্টনিকা নামেও নিরূপিত করা হয়। উহা মর্ম্ম স্থানে অবস্থিত এবং শত শত নাড়ীর আশ্রয়রূপে বিরাজিত। ঐ নাড়ী মূলাধার হইতে রন্ধ্র পর্য্যন্ত সপ্ত চক্রে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া বহির্গত হইয়াছে। উহা মূলাধারে সার্দ্ধ ত্রিবলয়াকারে বেষ্টিত কুণ্ডলিনী শক্তির আধার। বীণার

মূলভাগে যে তন্ত্রাবর্ত্তক রেখা থাকে, সেই রেখার কিম্বা জলের যেমন আবর্ত্তন, তাহার ন্যায় ঐ আন্ত্রবেষ্টনিকার আকার। যদি লিখিয়া দেখাইতে হয়, তবে উহা অর্দ্ধ ওঙ্কারের প্রতিকৃতিবৎ কুণ্ডলাকারে অবস্থিতরূপেই লিখিতে হয়। এই আন্ত্রবেষ্টনিকা যে কেবল মনুষ্যদেহেরই অন্তর্গত, তাহা নহে; সুর, অসুর, নর, মৃগ, পক্ষী, যক্ষ, রাক্ষস, সকল প্রাণীরই শরীরে উহা বিরাজমান। এক কথা বলিতে হইলে বলা যায়, সামান্য কীট হইতে আরম্ভ করিয়া মহনীয় ব্রহ্মা পর্য্যন্ত সকল প্রাণীর শরীরেই ঐ আন্ত্রবেষ্টনিকা বিরাজ করিতেছে। শীতে শীত নিবারণার্থ সুপ্ত সর্প যেমন নিজ দেহ কুণ্ডলাকারে রাখিয়া দেয়, ঐ আন্ত্রবেষ্টনিকাও তেমনি মণ্ডলাকারে অবস্থান করে। উহার বর্ণ শুভ্র এবং উহা কল্পাগ্নিস্খলিত চন্দ্রবিম্ববৎ বলয়াকারে বিরাজিত। অথবা জঠরানলে গলিত মস্তকস্থিত চন্দ্র যেমন বিলয় পাইয়া মূলাধারে ঘনীভূত ভাবে কুণ্ডলাকারে অবস্থিত, জানিবে—ঐ আন্ত্রবেষ্টনিকাও তেমনি বদ্ধ কুণ্ডলাকারে বিরাজিত। উরুমূলের সন্ধি হইতে ভ্রূমধ্য পর্য্যন্ত যে সকল রন্ধ্র আছে, তৎসমস্ত স্পর্শ করিয়া, ঐ আন্ত্রবেষ্টনিকা বা সুষুম্না মনোবৃত্তির সহায়তায় অন্তরে চঞ্চল ও বাহিরে প্রাণাদি বায়ুবেগে নিরন্তর স্পন্দিত হইয়া থাকে। উহার অভ্যন্তরে কদলীকোষবৎ কোমল মূলাধারে যে পরা শক্তি স্ফুরিত হয়, তাহার গতি বীণার মূলগত দুর্লক্ষ্য তন্ত্রীবেগের ন্যায় বিরাজমান। উহাই পরম সূক্ষ্ম শব্দব্রহ্মাত্মিকা স্ফূর্ত্তি; এবং উহাই প্রাণসঙ্গে নাভি, হৃদয় ও কণ্ঠদেশ হইতে উত্তরোত্তর পরিস্ফুট হইয়া দেখিতে দেখিতে মধ্যমা, বৈখরী প্রভৃতি ভেদ সকল ভজনা করিয়া থাকে। উহা কুণ্ডলাকার ধারণ করে বলিয়া কুণ্ডলীনামে অভিহিত হয়। উহাকেই প্রাণিবর্গের পরম শক্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে। প্রাণ, ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি প্রভৃতির শক্তিসমষ্টির সত্তাস্ফূর্ত্তি উহা হইতেই সাধিত হয় বলিয়া উহাকেই বেগবিধানকর্ত্রী বলা যায়। উহাই স্বীয় মুখে অনবরত প্রাণবায়ুকে ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত ও অপান পবনকে অধোভাগে নিঃসারিত করিয়া রুষিতা ভুজঙ্গীর ন্যায় সর্ব্বদা শ্বাস প্রশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছে। যৎকালে হৃদয়স্থ প্রাণপবন কুণ্ডলিকা দ্বারা

আকৃষ্ট হয়,—হইয়া অপানবৃত্তিতে কুণ্ডলিনীপদে প্রয়াণ করে, তখন অপঞ্চীকৃত ভূততন্মাত্র হইতে সমুৎপন্ন অন্তঃকরণগত জীবসম্বিৎ—স্মৃতি, সঙ্কল্প, অধ্যবসায়, অভিমান ও রাগ দ্বেষাদি ভেদে অন্তরে সমুদিত হইয়া থাকে। পদ্মে যেমন মধুকরী, তেমনি ঐ কুণ্ডলিনী জীবদেহে বিষয়সন্নিকর্ষশালী চক্ষুরাদির বশে সমুদিত হইয়া ভোক্তার অদৃষ্ট-দৃষ্ট যে যে প্রকার সামগ্রীবৈচিত্র্যে পরিস্ফুরিত হইতে থাকে, সেই সেইরূপে সেই সেই ইন্দ্রিয়যোগে অর্থবিশেষের স্ফূর্ত্তি ও তৎফলভোগরূপিণী সম্বিৎ আবির্ভূত হয়। এই মৃদু চক্ষুরাদি দ্বারা অগ্রে যেরূপে বিষয় স্পর্শ সংঘটিত হইবে, কুণ্ডলিনী সেইরূপেই বেগে স্ফুরিত হইতে থাকিবে। হৃদয়কোষে যে সকল নাড়ী আছে, তাহারা ঐ কুণ্ডলিনীতে সম্যক্ নিবদ্ধ রহিয়াছে। যেমন নদীনিচয়ের গতি বিভিন্নমুখী হইলেও এক অনন্ত সাগরেই তাহাদের পতন হয়, তেমনি নাড়ীনিচয় বিভিন্ন বিষয়ে চক্ষুরাদির দ্বারস্বরূপ হইলেও ঐ কুণ্ডলিনীতেই তাহারা বিস্তীর্ণ ও বিলীন হইয়া থাকে। ঐ কুণ্ডলিনী প্রাণস্বরূপে ঊর্দ্ধগমনে উৎসুক হয় এবং অপান-স্বরূপে অধোগমনে উন্মুখ হইয়া থাকে। এইরূপে সাধারণভাবে অবস্থিত হওয়ায় উহা সাধারণী হইয়াছে। এইভাবে সকল সম্বিদের বীজ ঐ কুণ্ডলিনীই।

রামচন্দ্র কহিলেন—ভগবন্! চিৎশক্তি সর্ব্বত্র অবস্থিত। এজন্য সর্ব্বত্র তাঁহার সমান প্রকাশ হওয়াই সমুচিত। কিন্তু আপনার কথা এই যে নাড়ীমূলগত কুণ্ডলিনীপদার্থে তদীয় উদয় পরিদৃষ্ট হয়। ইহার কারণ কি? তাহা ব্যক্ত করুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে পবিত্র! চিৎশক্তি সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সর্ব্ব-পদার্থে সর্ব্বরূপে বিরাজ করেন বটে; কিন্তু উনি যখন ভূততন্মাত্রের অধীন হইয়া পড়েন, তখন কোন কোন স্থলে উহাঁর উদয় দৃষ্ট হইয়া থাকে। যেমন সৌরাতপ সর্ব্বত্র বিদ্যমান রহিলেও ভিত্তি প্রভৃতি স্থানে অধিক স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়, তেমনি চিৎপদার্থও দেহবিশেষে সমধিক স্ফুরিত হইয়া থাকে। উপাধিমালিন্যের তারতম্যে চিতের প্রকাশ ও অপ্রকাশ সংঘটিত হয়। সেই অনুসারেই দেহবিশেষে চিতের অদর্শন, কোন

কোন দেহে অধিক স্ফুরণ এবং কোন কোন দেহে উহার উচ্ছেদ কল্পনা হইয়া থাকে। তপ্ত জলে শৈত্য যেমন বিনষ্টভাবে দৃষ্ট হয়, তেমনি ঐ চিৎপদার্থ মৃত্তিকা ও শিলাদিপদার্থে অবিদ্যাজড়তায় অভিভূত হইয়া বিনষ্টাকারে দৃষ্ট হইয়া থাকেন। চিৎশক্তি সুর-নরাদি দেহে বিস্পষ্ট-ভাবে, এবং পাদপাদি স্থাবর পদার্থে প্রচ্ছন্নাকারে অবস্থিত আছেন। সুতরাং উক্ত দ্বিবিধ পদার্থে তিনি প্রকাশ ও অপ্রকাশভাবে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকেন। সর্ব্বত্র অনভিভূত-অবস্থাতেই তাঁহার বিজৃম্ভণ হইয়া থাকে।

হে অনঘ! নরাদি ও পশু স্থাবর প্রভৃতির দেহে ঐ চিৎসম্বিৎ নিরন্তর যেরূপ তারতম্য অনুসারে সমুদিত হইয়া থাকেন, তাহা তোমায় আবার আমি ক্রমশঃ বলিতেছি, শ্রবণ কর। এই যে চেতন অচেতন ভূতবৃন্দ এবং এই যে নিখিল নভোমণ্ডল, এ সকলই চিন্মাত্র সন্মাত্র এবং আকাশবৎ শূন্যমাত্র। এই চিন্মাত্র সন্মাত্র নির্ব্বিকার ও নিরাময়। চিৎই মায়াকল্পিত এক দেশে আকাশাদি সূক্ষ্ম ভূতের ক্রমিক আধ্যাস-বশে ভূততন্মাত্রপঞ্চক-রূপে অবস্থান করিতেছেন। প্রাণ, মন, বুদ্ধি, জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় এই পঞ্চ প্রকারে প্রকাশমান লিঙ্গ দেহক ঐ তন্মাত্রপঞ্চকই ধারণ করিতেছে। লিঙ্গদেহে প্রতিবিম্বরূপে প্রবেশ-পূর্ব্বক ঐ চিৎই এক দীপ হইতে যেমন শত দীপ সমুৎপন্ন হয়, তেমনি শত শত হইয়া সমুদিত হইতেছেন। তুমিও এইরূপে স্বীয় সম্বিৎকে অন্তর্ভূত জন্মাদি বিকার ও জাগ্রদাদি অবস্থাভেদে গ্রহণ করিয়া জীব-ভাব প্রাপ্ত হইতে লক্ষ্য করিতেছ। তোমারও নিজ দেহ এই অনাময় বস্তু; পরন্তু প্রতিবিম্বরূপে তন্মাত্র পঞ্চকে আবিষ্ট বলিয়া পঞ্চভাবে অভি-ব্যক্ত হইতেছে। একই সম্বিৎ লিঙ্গশরীরে প্রতিবিম্বিত হয় বলিয়া যেন দ্বিধাভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। ফলে জীব যেন একটী স্বতন্ত্র পদার্থ বলিয়াই ভ্রম হইতেছে। ঐ সম্বিৎ সঙ্কল্পমাত্র উপলক্ষ্য করিয়া প্রথমতঃ পঞ্চবিধ তন্মাত্ররূপে অবস্থান করেন। অনন্তর সেই সমুদায়ের কিয়দংশে লিঙ্গদেহ ও কিয়দংশে বাহ্য ব্রহ্মাণ্ডস্বরূপ হইয়া থাকেন। দেহ এবং বিষয়াদি বাহ্য ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্ভূত। বিশদভাবে বলা যায়, তন্মাত্র পঞ্চ-কের কিয়দবশিষ্ট তন্মাত্র জীবের সুর-নরাদি আকৃতির অনুসরণক্রমে

সঙ্কল্প ফলরূপ স্বীয় সত্তামাত্রেই পঞ্চীকরণভাবে স্থূলদেহত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কতক বা পশুত্ব স্থবরত্বাদি এবং কতক বা সুবর্ণভাবাদ্ধি খর্পরান্ত ব্রহ্মাণ্ডভাব ধারণপূর্ব্বক তদন্তর্ভূত ভুবনযোগ্যতা প্রাপ্ত হয়। অপিচ কতক অংশ দেশত্বাদি ভাব এবং কতক বা দ্রব্যত্বাদি ভাব পরিগ্রহ করিয়া থাকে। অতএব হে রঘুনন্দন রাম! এইরূপে এই দৃশ্য জগৎ যে তন্মাত্রপঞ্চকেরই প্রস্পন্দ বা কার্য্য, ইহাই প্রতিপন্ন হইল এবং এই জন্যই চিৎসম্বিৎ সর্ব্বত্র সর্ব্বাধিষ্ঠানরূপে গণনীয়। প্রভেদ এই যে, প্রাণাদি পঞ্চক-ঘটিত সুর নরাদি দেহে চিৎসম্বিৎ মুখ্য চেতননামে বিরাজিতা; পশ্বাদির দেহে জড় চেতন নামে অবস্থিতা এবং স্থাবরাদি পদার্থে জড় নামে প্রসিদ্ধ হইয়া বিরাজমানা। এই শেষোক্ত পদার্থসমূহে লিঙ্গদেহের অন্তরে সম্বিৎমাত্র থাকে; এই জন্য উহাদের চৈতন্য সাধারণ লোকলোচনের গোচরীভূত সহজে হয় না বলিয়াই উহা জড় আখ্যায় অভিহিত হইয়া থাকে। চিৎ উক্ত ত্রিবিধ দেহে কিরূপে তারতম্যক্রমে অবস্থান করেন? তাহার দৃষ্টান্ত এই যে, যেমন দিবসে ঘৃত সমুদ্র বিলীন অর্থাৎ দ্রবীভূত হয়; সায়ংকালে শিশির সমাগমে ক্রমশঃ ঘনীভাব লাভ করিয়া বেলাতটে নিশ্চলভাবে অবস্থান করে, দ্রবপ্রদেশে তরঙ্গাকারে চঞ্চল থাকে এবং কিঞ্চিৎ ঘন প্রদেশে কিঞ্চিৎ চঞ্চল ও অত্যন্ত ঘন দেশে স্থলবৎ অচল ও অটলভাবে বিরাজ করে, তেমনি ঐ যে চিতের কথা কহিতেছি, তিনিও নর, পশু ও স্থাবরাদি দেহপঞ্চকের কোথাও কিঞ্চিৎ চঞ্চলাকারে এবং কোথাও বা অত্যন্ত জড়ভাবে অবস্থান করিতেছেন। ভাবিয়া দেখ, সমুদ্রের কোথাও চাঞ্চল্য এবং কোথাও বা নৈশ্চল্যাদি বিবিধ ভেদ পরিদৃষ্ট হইলেও তাহাকে কি সমুদ্র বলিয়া ব্যবহার করা হয় না? এইরূপে দেখিলে স্থাবরাদি ভাবেও চিৎস্বরূপের কোনই হানি দেখা যায় না। ফল কথা, ঘৃতসমুদ্র ঘনভাব ধারণ করুক, বা তরলাকারে পরিণত হউক, কোন ভাবেই তাহার যেমন সমুদ্রত্বের ব্যাঘাত নাই, তেমনি কি স্থাবর, কি জঙ্গম, কোন অবস্থাতেই চৈতন্যের হানি সম্ভব নহে। সুতরাং জানিবে—সুর-নর বা তির্য্যক্ প্রভৃতিতে চৈতন্য অব্যাহতভাবেই অবস্থিত। অথবা ঐ জড়াজড় বিকল্প অধ্যস্ত

পঙ্ককেরই ধর্ম্ম ; উহাতে চিতের ধর্ম্ম বলা যায় না ; কেন না, চিৎপদার্থের ধর্ম্ম কিছুই নাই। উক্ত পঙ্ককে স্বভাবতই এই প্রকার বহু বিকল্প দৃষ্ট হইয়া থাকে। দেহাদির আকারে পরিণত উল্লিখিত পঙ্ক প্রাণধারণার অধীন স্পন্দ ও চৈতন্যবশে জীবরূপে চেতন হয়। শৈলাদি জড়স্বরূপ ; স্থাবর প্রভৃতি বাহ্য বায়ুর অধীনতায় স্পন্দিত হইয়া থাকে ; পরন্তু অন্তরে উহাদের চেতনা আছে। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, একই বস্তু ঐরূপ বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন হয় কেন ? উত্তরে বলা যায়, এ আপত্তির কোনই মূল্য নাই ; ইহা অকিঞ্চিৎকর। কেন না, ভাবই বল, আর অভাবই বল, সকলই পূর্ব্ব বাসনার অনুযায়ী। বলিবে, বাসনার বিপর্য্যয় ঘটনা কেন হয় ? এ আপত্তিও অফলোদয়-বিধায়িনী। যে আপত্তি উত্থাপন করিলে অনাপত্তি ফল ফলিয়া থাকে, সেইরূপ আপত্তি উত্থাপন করাই সমীচীন ; নচেৎ বৃথা আপত্তি উত্থাপনে ফল কিছুই নাই। ভাবিয়া দেখ, এইত আকাশ আছে, ইহাকে কি কেহ মুষ্টিক্ষেপ্য করিতে সক্ষম হইয়া থাকে ? সুতরাং বলা যায়, বাসনা সত্ত্বে সকলই সম্ভব হয় আর বাসনাক্ষয়ে আপত্তি অনাপত্তি এ উভয়ের কিছুই থাকিবার নয়। বিশদার্থ এই যে, স্বভাব বলিতে যাহা স্বাত্মক ভাব, তাহাই বুঝা যায়। ঐ ভাব কিরূপে বিরুদ্ধ বিকল্পাত্মক হইবে ? কেন না, বিরোধ পরসাপেক্ষ আর যাহা স্বাত্মক ভাব, তাহা অনন্যাপেক্ষ। স্বকীয় ভাবে স্বভাব বুঝাইলে তাহাও স্বমাত্র সাপেক্ষ ; পরন্তু পরসাপেক্ষ নহে। অতএব পরসাপেক্ষ বিকল্পের স্বস্বরূপ নিমিত্ত হইতে পারে কিরূপে ? এইরূপ আপত্তি যদি পূর্ব্বোক্ত স্বভাবের উপর তুমি উত্থাপন কর, তাহা হইলে স্বভাব পরিত্যাগ করিয়া বাক্যের উপর অনুযোগ করিতে হয় ; কিন্তু এরূপ করিবে কিরূপে ? কারণ দেখ, কেবল বাক্যই চিৎ ও জড়াদি শব্দস্বরূপ এবং বাক্যই তাহাদের ভেদ-বিজ্ঞাপক। বাক্য তাহার আপন পুনরুক্তি নিরাসের জন্যই নিজের অর্থ ঐ ভাবে বিবর্ত্তিত করিয়াছে। সেই জন্যই চৈতন্য এবং জাড্য, এই উভয় বিরুদ্ধ বলিয়া বোধ হইতেছে। এইরূপে শীতোষ্ণাদি ধর্ম্ম ও হিমাগ্নি প্রভৃতি ধর্ম্মি-নিষ্ঠ বাক্যই বা কোথায় ? সকলই এবম্প্রকার —এইরূপেই সকল পরিদৃশ্যমান। অথবা পূর্ব্বেও বাক্য পর্য্যনুযোজ্য

নহে; কেন না, বাসনাকল্পিত বিকল্পবৎ পূর্ব্বোক্ত পঞ্চকার্থের উহা অনুবাদক বলিয়া তদধীন; কিন্তু বাসনার অংশগ্রাহী সেই সেই বিরুদ্ধ বিকল্পভাবে বিকারগ্রস্ত লিঙ্গাত্মক পঞ্চকের স্থিতিই পর্য্যানুযোজ্য; অর্থাৎ তথাবিধ স্থিতির উপরই অনুযোগ করা কর্ত্তব্য। স্থিতিই বা পর্য্যানুযোজ্য হইবে কেন? যখন পূর্ব্ব পূর্ব্ব সহস্র সহস্র বিকল্প বাসনারই অনুসারক, তখন যে বিজ্ঞ ব্যক্তি বিরুদ্ধ বিকল্পনার মূল অনুসন্ধানে সমুৎসুক হন, তাঁহার পক্ষে বাসনার উপরই আপত্তি বা অনুযোগ উত্থাপন করা কর্ত্তব্য। কেন না, বাসনাই চিত্তকে ইতস্ততঃ বিবিধ বিরুদ্ধ সহস্র সহস্র বিকল্পনায় লইয়া যাইতে বিক্ষিপ্ত হইয়া উঠে। উক্ত পঞ্চক জীবের তির্য্যগাদি অশুভ এবং সুরনরাদি শুভভাবে প্রবুদ্ধ ও সুপ্ত বাসনাবস্থায় অবস্থিত। সুতরাং বাসনার প্রতিই বিকল্পকারণ বিষয়ের পর্য্যনুযোগ করা বিধেয়। যেখানে পর্য্যনুযোগের ফল ফলে, সেইখানেই অনুযোগ বা আপত্তি উত্থাপন উচিত; নতুবা শূন্যে মুষ্টিক্ষেপ করিলে কি ফল হইতে পারে? বাসনার উপর অনুযোগে তাহার ক্ষয় করিতে হয়; কিন্তু স্বভাবাদির উপর অনুযোগে ফল কিছুই নাই। বাসনার ক্ষয়ে যখন পূর্ণাত্মতা লাভ করা যায়, তখন মেরুগিরির সুবর্ণরাশিও তৃণাগ্রবৎ তুচ্ছ হইয়া যায়। আর বিবেকনিষ্ঠ দেবাদি ভোগশালী দেহও কীটাদিবৎ তুচ্ছতর হইয়া পড়ে। অতএব সুপ্ত ও জাগ্রদবস্থাপন্ন বাসনার তারতম্য অনুসারেই উল্লিখিত পঞ্চকে স্থাবরাদি বৈচিত্র্য ঘটিয়া থাকে। যথা—কাহারও কাহারও বাসনা প্রসুপ্ত বা বিলীন-প্রায়; যেমন—স্থাবর জাতি। কাহারও কাহারও বাসনা প্রবুদ্ধ; যেমন —সুরনর প্রভৃতি। কাহারও কাহারও চিত্ত বাসনায় কলুষিত; যেমন —তির্য্যগাদি। কেহ কেহ বা বাসনামুক্ত; যেমন—মোক্ষগামিগণ। মোক্ষ-গামীরা বাসনারে একেবারেই বিসর্জ্জন দিয়াছেন। বাসনার অস্তিত্বই তাঁহাদের নিকট নাই। বাসনার বৈচিত্র্য নিমিত্তই সুর-নরাদির কর-চরণাদি আকাশতল ও ভূতল গমনাদি বিচিত্র ব্যবহারের উপযোগী। ঐ কর-চরণ প্রভৃতি কর্ম্মেন্দ্রিয়শালী সুর-নরাদির স্ব স্ব সম্বিৎসমূহেই নরাদি-যোগ্য ব্যবহারোচিত মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত, নেত্র, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, রসনা ও স্পর্শাদি আন্তর ও বাহ্য করণরূপ সংজ্ঞা বাসনানুসারেই হয়। প্রত্যেক

প্রাণীতে তাহাই স্বভাবরূপে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। এইরূপে পশুগণের চতুষ্পাদ, পুচ্ছ ও শৃঙ্গদ্বয়, পক্ষীর চঞ্চু, পক্ষযুগল ও পুচ্ছাদি, সর্পাদির ফণা ও পুচ্ছ প্রভৃতি এবং কৃমিকীট-সমূহের ব্যবহারযোগ্য দেহাদি সংজ্ঞা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। স্থাবরাদিরও যে সংজ্ঞা আছে, তাহাও ঐ ঐ রূপ জানিতে হইবে।

হে সাধো! ঐ যে বিচিত্র সুর-নরাদি পঞ্চকরাশির বিষয় বলা হইল, উহারা আদি, অন্ত ও মধ্য, এই অবস্থাত্রয়ে সবিকার ও জড় এবং অধিষ্ঠান সম্বিৎস্বরূপে অবিকার ও অজড়রূপেই পরিস্ফুরিত হইতেছে। সমষ্টি গোচররূপে অভিব্যাপ্ত কোন এক সঙ্কল্পরূপ পরমাণুই সংসার-রূপ আকাশতরুর বীজ; আর তাহাতেই উক্ত পঞ্চক বিদ্যমান। ফল কথা,—সঙ্কল্প হইতেই সৃষ্টি আর তাহা হইতেই সুর-নরাদি পঞ্চকের উৎপত্তি। অতএব হে মহীপতে রাম! দেখ, এ কি বিস্ময়াবহা মায়া! ঐ যে আকাশতরুর কথা বলিলাম, ইন্দ্রিয় উহার পুষ্প, ইন্দ্রিয়ের অবয়বই সেই পুষ্পরাজির অবয়ব এবং বিবিধ ইচ্ছারূপিণী ভ্রমরী উহার উপর বিরাজমান। কর্ম্মেন্দ্রিয়নিচয় চঞ্চল; তাহাদের ক্রিয়াই ঐ পুষ্পরাজির মঞ্জরী। পবিত্র স্বর্গাদি লোকই সে তরুর শাখা; মেরু প্রভৃতি করিয়া যে সকল শৈল আছে, তাহারা উহার মূলাবয়ব। সুনীল জলদজাল পত্রপঙ্ক্তি এবং দশদিকই ঐ তরুর চঞ্চলাকৃতি লতা। আর বর্ত্তমান ও ভাবী চতুর্ব্বিধ দেহই উহার উত্তম উত্তম ফল।

হে রাম! উক্ত পঞ্চবীজময় পঞ্চকতরু স্বভাবতই প্রাদুর্ভূত ও কাল-ক্রমে আপনা হইতেই ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, অপিচ নিজেই নানারূপ লাভ করে এবং যত কাল জড়তা, তত কালই প্রকাশ পাইতে থাকে। কিন্তু যখন বিবেকনেত্রে দৃষ্টিপাত করা যায়, তখন সমুদ্রে তরঙ্গের যেমন শান্তি হয়, তেমনি উহার শান্তি হইয়া থাকে। পরাগ্‌দৃষ্টিবশতঃ জড়তা-তেই ঐ তরুর উন্নতি, আর প্রত্যগ্‌দৃষ্টিবশতঃ বিবেকেই উহার শান্তি। এ শান্তি সমুদ্রে তরঙ্গের ন্যায়ই ঘটিয়া থাকে।

রামচন্দ্র! যে পঞ্চক লন্মাবধি বিবেকের বশতাপন্ন হইয়া থাকে, এ সংসারে তাহাদের আর কখনই জন্ম হয় না, এবং তাহাদিগকে দেহ

ধারণ করিয়া পরে আর মরণযাতনাদি ভোগ করিতে হয় না; অন্যের পক্ষে সংসারে বারম্বার গমনাগমনই হইতে থাকে; তাহাদের সে দুঃখ-ভোগের নিবৃত্তি কখনই ঘটে না।

আশীতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৮০ ॥

একাশীতিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! এই যে স্থূল দেহাত্মক পঞ্চক, ইহারই অভ্যন্তরে মূলাধার মধ্যে সেই পূর্ব্ববর্ণিত কুণ্ডলিনী আছেন। তাঁহাতেই লিঙ্গদেহাত্মক পঞ্চকের উপাদান ভূতসূক্ষ্ম প্রথমে প্রাণাদি পঞ্চকরূপে স্ফুরিত হয়। সেই কুণ্ডলিনী প্রাণাদি বায়ুধর্ম্মে ও স্বীয় ধর্ম্মে স্পন্দ, স্পর্শ ও সম্বিৎ এই ত্রিবিধ কল্পনায় প্রাদুর্ভূত হইয়া কল্পনাদি ব্যাপার-রূপ উপাধিযোগে কলা, চিৎ, জীব, মন, সঙ্কল্প, বুদ্ধি, অহঙ্কার, পুর্য্যষ্টক ও লিঙ্গ এই এইরূপ নানা নাম ধারণ করেন। উহাদের মধ্যে তিনি কলনা বা কল্পনাকার্য্যে কলা, চেতনাকার্য্যে চিৎ, জীবন কার্য্যে জীব, মননক্রিয়ায় মন, সঙ্কল্পক্রিয়ায় সঙ্কল্প, বোধকার্য্যে বুদ্ধি এবং অহম্ভাবনায় অহঙ্কার হইয়া বিরাজমান। এইরূপে সেই কুণ্ডলিনীই পুর্য্যষ্টক আখ্যা লাভ করেন। তিনিই জীবদেহে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জীবশক্তিরূপে বিরাজমান রহিয়াছেন। ঐ কুণ্ডলিনীই স্পন্দশক্তি যোগে অধোদিকে বহিয়া থাকেন, সমানাকারে নাভিমধ্যে বিরাজ করেন, এবং উদানরূপে উপরি-ভাগে বহিতে থাকেন। অপানের নিম্নাকর্ষণ ও উদানের ঊর্দ্ধাকর্ষণ, এইরূপে উভয়তঃ আকৃষ্যমাণ হইয়া মধ্যবর্ত্তী সমান স্থিরভাবে অবস্থান করে। অর্থাৎ অপান ও উদান কর্ত্তৃক উভয়ত্র আকৃষ্ট হইয়াও ঐ কুণ্ডলিনী সমানাকারে নিশ্চলভাবে অবস্থিতা। ফলে এইরূপে তিনি লিঙ্গ দেহকে বহির্নির্গত হইতে দেন না। যদি ঐরূপ যত্নে উহাকে ধারণ করা না হয়, তাহা হইলে জীবসম্বিৎ অস্ত সর্ব্বপ্রযত্নে আকৃষ্যমাণ হইলেও অধোদিকে নির্গত হইয়া যায়। জীবসম্বিৎ সবলে অধোদিকে নির্গমন

করিলে লোকের মৃত্যু হইয়া থাকে। যুক্তি বা যোগ বলে ধারণ করা না হইলে ঐ জীবসম্বিৎ সমস্তই ঊর্দ্ধগামী হয়, পরে সবলে নির্গত হইলে পুরুষ মৃত্যু-কবলিত হইয়া থাকে। এ জন্য মুনি, ঋষি ও যোগসিদ্ধ পুরুষেরা বলিয়া থাকেন যে, যদি প্রাণ ও অপানের গতি নিরুদ্ধ করিতে অভ্যাস করা যায়, তাহা হইলে সমান বৃত্তির প্রাবল্য ঘটে এবং তাহারই প্রভাবে ইতর সাধারণ বৃত্তিগুলি বশীভূত হওয়ায় ব্যাধিক্ষয় ও মৃত্যু-বিজয়সিদ্ধি সংঘটিত হয়। দেহমধ্যে একশত প্রধান নাড়ী আছে, আর সেই সকল নাড়ীর শাখা নাড়ী যে কত আছে, তাহা সংখ্যা করা দুরূহ। উহাদের মধ্যে প্রধান নাড়ীর বিকলতায় প্রধান রোগ জন্মিয়া থাকে, আর সামান্য শাখানাড়ীগুলির কফ ও পিত্তাদির বৃদ্ধিঘটনায় ব্যাপার-ব্যতিক্রম হইলে সামান্য সামান্য রোগ উৎপন্ন হয়।

রামচন্দ্র কহিলেন;—হে মুনীন্দ্র! এ দেহে আধিব্যাধি প্রভৃতি কোথা হইতে উৎপন্ন হয় এবং কি কারণেই বা বিনষ্ট হইয়া যায়, তাহা আমার নিকট যথাযথ বর্ণন করুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! আধিব্যাধিই এ সংসারে সর্ব্বদুঃখের মূল; তাহার যখন উপশম ঘটে, তখনই সুখ আর তাহার সমূলে উচ্ছেদনই মোক্ষ আখ্যায় অভিহিত। মনুষ্য-দেহে আধিব্যাধি কখন কখন একইকালে আসিয়া উপস্থিত হয়, কখন বা পর্য্যায়ক্রমে উপস্থিত হয়, আবার কখন বা পরস্পর পরস্পরের কারণরূপে উপস্থিত হইয়া থাকে। যাহা দৈহিক দুঃখ, তাহারই নাম ব্যাধি; আর যাহা মানসিক ব্যথা, তাহারই নাম আধি। এই আধি-ব্যাধি উভয়েরই মূল অজ্ঞান। যখন তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়, তখন ঐ উভয়েরই ক্ষয় সুনিশ্চয়। তত্ত্বজ্ঞানের অভাবে মূঢ় লোকেরা রাগ-দ্বেষ প্রভৃতিতে আসক্ত হয়, তাহাদের ইন্দ্রিয়-সংযম থাকে না; কাজেই ইহা পাইলাম, ইহা পাইলাম না, ইহা আমাকে পাইতে হইবে, এই প্রকার চিন্তা-জড়তায় তাহারা আক্রান্ত হইয়া থাকে। প্রতীকারের উপায় তাহাদের অপরিজ্ঞাত থাকে; তাই ঐ অজ্ঞানরূপ আধি ঘন মোহ উৎপাদন করিয়া বর্ষাকালীন মিহিকার ন্যায় প্রাদুর্ভূত হয়। চিত্ত জয় না করিতে পারিলেই অদম্য ইচ্ছার উদ্রেক হইয়া থাকে; সেই জন্য দোষগুণ-বিচারের অভাব,

কুভোজ্য ভোজন, শ্মশানাদি দুর্দেশে গমনাগমন, নিশীথ প্রদোষাদি অযোগ্য কালে আহার, বিহার বা অন্য প্রকার ব্যবহার, দুষ্ক্রিয়ায় অনুরক্তি, দুর্জনের সহ বসতি, দুর্ভাবের ভাবনা, এবং ব্যাঘ্র বিষ সর্প ও তস্করাদি-ভয়ে অবসাদ ঘটে। এই সকল কারণে এবং অন্যান্য কারণে নাড়ী-নিচয়ের রন্ধ্রে রন্ধ্রে অন্নরসের অপ্রবেশে তাহাদের ক্ষীণতা বা অধিক অন্নরসের প্রবেশে কফ ও পিত্তাদির প্রকোপে প্রাণের ব্যাকুলতা কিম্বা আঘাতাদি দ্বারা দেহের বৈকল্য ঘটিলে ব্যাধি আসিয়া উপস্থিত হয়। বর্ষা ও নিদাঘে নদীর আকার-পরিবর্ত্তনের ন্যায় তাহাতেই দেহের পরিবর্ত্তন ঘটে।

হে রঘুবংশ্য! এই পঞ্চীকৃত ভূতময় প্রাণীর আধি ব্যাধি এইরূপেই উদ্ভূত হইয়া থাকে। এক্ষণে ঐ আধি-ব্যাধির ক্ষয় কিরূপে করা যাইতে পারে, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর।

এ সংসারে ব্যাধি দুই প্রকার—সামান্য ও দৃঢ়। তন্মধ্যে ক্ষুধা তৃষ্ণা ও স্ত্রী পুত্রাদির লালসাবশে যে ব্যবহারিক পীড়া উৎপন্ন হয়, তাহাই সামান্য আর যাহা জন্মাদিবিকারের মূলীভূত, তাহাই দৃঢ়। যদি অভিমত অন্নপান বা স্ত্রীপুত্রাদি ইষ্ট বস্তু প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা হইলে সামান্য ব্যাধির শান্তি সম্ভবিতে পারে। ফলে আধিক্ষয়ে তদুৎপন্ন ব্যাধিরও বিনাশ হইয়া থাকে।

হে রাঘব! আত্মজ্ঞানের উদয় ব্যতীত সার বা দৃঢ় ব্যাধির বিনাশ কিছুতেই হইতে পারে না। বুঝিয়া দেখ, লোকে যদি ব্যবহার-দৃষ্টিতে রজ্জু বলিয়া দৃঢ় বোধ স্থাপন করে, তবেই রজ্জুতে সর্প ভ্রম নিরাকৃত হইয়া যায়। প্রাবৃট্‌কালের নদী যেমন সমুদায় তট-বল্লীর উচ্ছেদ সাধন করে, তেমনি সমস্ত সার ব্যাধি-ক্ষয়ই নিখিল আধি-ব্যাধি-বিলাসের মূলোচ্ছেদক হইয়া থাকে। ব্যাধি সকলের মধ্যে যে ব্যাধি আধি-জাত নহে, তাহার চিকিৎসা অনায়াসেই করা যাইতে পারে। চিকিৎসাশাস্ত্রে যে সকল দ্রব্য ও মন্ত্রাদির উল্লেখ আছে, অন্যত্র যে সকল শুভ স্বস্ত্যয়নাদির অনুষ্ঠান বিহিত রহিয়াছে, বা প্রচীন পরম্পরাগত যে সকল চিকিৎসা-প্রণালী প্রচলিত আছে, সেই সমুদায় দ্বারাই ঐ ব্যাধির শান্তি ঘটিয়া থাকে।

রামচন্দ্র! তীর্থপ্রভৃতিতে স্নান এবং যে সকল পাপব্যাধি-হর মন্ত্র, ঔষধি ও বৃদ্ধপরম্পরাগত চিকিৎসা শাস্ত্র আছে, সেই সকলই তোমার বিদিত; সুতরাং তোমাকে এ বিষয়ে কি উপদেশ প্রদান করিব?

রামচন্দ্র কহিলেন—প্রভো! আধি হইতে ব্যাধির উৎপত্তি হয় কিরূপে? এবং কোনওরূপ দ্রব্যাদির আসাদন ব্যতিরেকে কেবলমাত্র মন্ত্রোচ্চারণ ও পুণ্যার্জ্জনরূপ উপায় দ্বারাই বা ঐ ব্যাধির উপশম কিরূপে হইতে পারে?

বশিষ্ঠ কহিলেন—রাম! চিত্ত ক্ষুব্ধ হইলে দেহেরও ক্ষোভ জন্মিয়া থাকে। শরার্ত্ত হরিণ যেমন প্রকৃত পথ পরিত্যাগ করিয়া ভয়ে অপথে বিপথে ধাবিত হয়, তেমনি ক্রুদ্ধ ব্যক্তি সম্মুখের পথ দেখে না; না দেখিয়া অপথের অনুসরণ করিয়া থাকে। ঐরূপ সংক্ষোভবশে প্রাণবায়ুও সমভাব পরিহার করিয়া অযথাভাবে বহিতে থাকে। হস্তী জলে প্রবিষ্ট হইলে জল যেমন ক্ষুব্ধ হইয়া আপন প্রবাহপথ পরিহারপূর্ব্বক তটের উপর উচ্ছলিত হইয়া উঠে, সংক্ষোভবশে প্রাণবায়ুও তেমনি সমভাব পরিত্যাগ করিয়া অসমভাবে বহিতে থাকে। রাজা যথেচ্ছাচার হইলে বর্ণাশ্রম ক্রম যেমন বিশৃঙ্খল হইয়া উঠে, তেমনি নাড়ীনিচয়ও প্রাণ-পবনের বৈষম্যে কফপিত্তাদির প্রকোপবশে বিষমভাবে অবস্থান করে। প্রাণবায়ু দেহকে যদি ক্ষুব্ধ করিয়া তুলে, তাহা হইলে কখন পূর্ণ বেগবতী এবং কখনও বা জলহীনা স্থিরা নদীর ন্যায় নাড়ীগণও কখন পূর্ণভাবে বেগগামী এবং কখনও বা রিক্তাবস্থায় স্থিরগতি হইয়া থাকে। প্রাণ-বায়ুর যদি সঞ্চার-ব্যতিক্রম ঘটে, তাহা হইলে ভুক্ত অন্নাদিও কদাচিৎ কুজীর্ণ, কচিৎ অজীর্ণ এবং কখন কখন বা অতিজীর্ণ হইয়া দোষের আকার হয়। নদীর বেগ যেমন জলোপরিস্থ কাষ্ঠ-খণ্ডপ্রভৃতিকে এক দিক্ হইতে অন্য দিকে লইয়া যায়, তেমনি সমানাখ্য প্রাণবায়ু ভুক্ত পীত অন্ন জলাদিকে রসাকারে পরিণামিত করিয়া নিজাশ্রয় শরীরাভ্যন্তরে সঞ্চারিত করিয়া থাকে। সঞ্চরণকালে যে অন্ন নিরুদ্ধ হইয়া দেহে অবস্থান করে, ধাতুবৈষম্য-রূপ পরিণামস্বভাবে তাহাই শেষে ব্যাধির আকার ধারণ করে। এইরূপে আধি হইতে ব্যাধির আবির্ভাব ঘটে এবং আধির বিনাশ হইলে ব্যাধিরও

বিনাশ ঘটিয়া থাকে। অধুনা মন্ত্রবলে যেরূপে ব্যাধি বিনষ্ট হয়, তাহার প্রণালী বলিতেছি, শ্রবণ কর। হরীতকী ফল উদরগত হইলে তাহা যেমন রেচকের কার্য্য করিয়া থাকে, প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ দেবগণের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ মন্ত্রবীজ সকলও সেই সেই দেবতার ভাবনাবলে ব্যাধিরূপে পরিণত সমস্ত নাড়ীস্থ অন্নরসাদির উৎসারণ ও পাচনক্রিয়া ঘটাইয়া থাকে। উক্ত মন্ত্রবীজ—'য' 'র' 'ল' 'ব' ইত্যাদি; অর্থাৎ বায়ুবীজ 'যং' বহ্নিবীজ 'রং' পৃথ্বীবীজ 'লং' এবং বরুণবীজ 'বং' ইত্যাদি। এই সকল বীজে সেই সেই দেবতার ভাবনায় ব্যাধি বিনষ্ট হইয়া থাকে।

হে সাধো! সাধুসেবা অতি বিশুদ্ধ পুণ্যকার্য্য; তাহার প্রভাবে মন কষিত কাঞ্চনবৎ নির্ম্মল হইয়া উঠে। পরিপূর্ণ সুধাকরের উদয় হইলে এ জগতে যেমন প্রফুল্লতা প্রকাশ পায়, তেমনি যখন চিত্তশুদ্ধি ঘটে, তখন এ দেহে আনন্দ উপচিত হয়। এইরূপে যখন সত্ত্বশুদ্ধি হয়, তখন প্রাণবায়ু যথাযথ ক্রমে প্রবাহিত হইতে থাকে। তাহার ব্যতিক্রম-ঘটনা কিছুতেই হয় না। তৎকালে প্রাণপবন ভুক্ত-পীত অন্নজলাদি জীর্ণ করিয়া ফেলে; তাহাতে ব্যাধি বিনষ্ট হইয়া যায়। আমি কুণ্ডলিনীর কথাপ্রসঙ্গে আধিব্যাধির যেরূপে উৎপত্তি লয় হয়, তাহাই তোমায় বলিলাম। এক্ষণে প্রকৃত প্রস্তাবের অনুসরণ করিতেছি, শ্রবণ কর। যাহার নামান্তর পুর্য্যষ্টক ও লিঙ্গদেহ, প্রাণাখ্য কুণ্ডলিনী সেই জীবের পরমাধার। তিনি শক্তি নামে নিরূপিতা। পূরক যোগে উল্লিখিত কুণ্ডলিনী যখন কূর্ম্মনাড়ীতে অর্থাৎ কণ্ঠকূপের অধোভাগে বক্ষোগত নাড়ী-বিশেষে স্থিরত্ব প্রাপ্ত হয়, দেহ তখন সুমেরুর ন্যায় গুরুভার হইয়া থাকে। ইহাতেই গরিমাসিদ্ধি হয়। প্রাণ পূরকযোগে মূলাধার হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত সমাগত হইলে আকাশগতিরূপিণী সিদ্ধি ঘটিয়া থাকে। দরিদ্র ব্যক্তির ইন্দ্রত্ব পদ প্রাপ্তির ন্যায় আকাশগামী অভ্যাস-বিলাস-যোগে যোগিগণ উন্নত অবস্থায় উপনীত হইয়া উচ্চ পদ লাভ করিয়া থাকেন। মস্তক ও কপালের সন্ধিকপাটের বহির্ভাগে যে দ্বাদশাঙ্গুলি-পরিমিত ষোড়শান্ত নামে স্থান আছে, সেখানে কুণ্ডলিনী শক্তি যখন নাড়ী-রোধক রেচক প্রয়োগে ঊর্দ্ধে আকৃষ্যমাণ হইয়া ব্রহ্মনাড়ী সুষুম্নার

অন্তর্নিবিষ্ট প্রাণের প্রবাহবশে মুহূর্ত্তমাত্র অবস্থান করে, তখন ব্যোম-বিহারী সিদ্ধসম্প্রদায়ের সাক্ষাৎকার লাভ ঘটিয়া থাকে।

রামচন্দ্র কহিলেন—ব্রহ্মন্! অস্মাদৃশ ব্যক্তিবর্গের চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয়বর্গ স্বর্গীয় নহে; সুতরাং তাহার সন্নিকর্ষ হইলেও সিদ্ধগণের সাক্ষাৎকার লাভ অসম্ভব; অতএব দিব্য চাক্ষুষ প্রভার সন্নিধান ব্যতীত ষোড়শান্ত স্থানে প্রাণ ধারণ মাত্র সিদ্ধবর্গের সাক্ষাৎকার লাভ সম্ভবপর হইতে পারে কিরূপে? তাহা আমার নিকট প্রকাশ করিয়া বলুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—সিদ্ধগণ বায়ুভূত; তাঁহারা অজ্ঞানাশ্রয় ভূচর পুরুষের ইন্দ্রিয়যোগে অদিব্য উপায়ে দৃষ্টিগোচর হইবার নহেন; এই যে কথা তুমি কহিলে, ইহা অসত্য নহে; পরন্তু হে রঘুনন্দন! যোগাভ্যাসে মনের নির্ম্মলতা হইলে ঐ স্বপ্নপ্রায় স্বার্থক ব্যোমচর সিদ্ধগণও দূরগত বুদ্ধি ও নেত্রযোগে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকেন। অর্থাৎ ভূচর মনুষ্যেরা চক্ষুর সাহায্যে আকাশচর সিদ্ধ গন্ধর্ব্ব প্রভৃতিকে দর্শন করিতে না পারিলেও জ্ঞানচক্ষুর সাহায্যে স্বপ্নোপমানে ঐ সকল দূরস্থ সিদ্ধ প্রভৃতিকে দর্শন করিতে সক্ষম হইয়া থাকে। স্বপ্নে যেমন বিনা চক্ষুতেই জ্ঞান সিদ্ধ হয়, তেমনি জ্ঞাননেত্রেই সিদ্ধ-সন্দর্শন ঘটিয়া থাকে। স্বপ্নাপেক্ষা সিদ্ধলাভের বিশেষত্ব এই যে, স্বপ্নে যাহা দৃষ্ট হয়, তাহা অলীক; আর সিদ্ধ জন-সমাগমে যে সংবাদ-বরাদি ফললাভ ঘটে, তাহা সত্য সত্যই অনুভূতিগোচর হয়। রেচকাভ্যাস যোগ অবলম্বন করিবার ফলে প্রাণবায়ু মুখ হইতে বহির্ভাগে দ্বাদশাঙ্গুলি-পরিমিত প্রান্তদেশে স্থিরত্ব লাভ করিলে পর শরীর-প্রবেশরূপিণী সিদ্ধি সংঘটিত হয়।

রামচন্দ্র কহিলেন—ব্রহ্মন্! আপনি যে সিদ্ধি লাভে দৃষ্ট বস্তুর স্থিরার্থতার কথা কহিলেন,—ইহাতে স্বভাবকেই হেতু বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে হইবে। এই সমগ্র জগৎই মায়াময়; কাজেই উহার স্থিতি অনিয়তবর্ত্তিনী। এ জগতের স্বভাব অস্থিরতাই। একথা আপনারই মুখে বহুবার প্রকাশ পাইয়াছে। এ সম্বন্ধে ঘটের পটাকারত্ব প্রাপ্তির

ন্যায় বহুবিধ দৃষ্টান্তও আপনি দেখাইয়াছেন। এখন আপনি বলুন—একমাত্র স্বভাবই নিয়ত স্থিতিশীল হয় কেন? আমার আশা আছে, আপনি আমার প্রশ্নে বিরক্ত হইবেন না। কেন না, বক্তৃগণ সর্ব্বদাই দয়াপরবশ; প্রশ্নকর্ত্তার প্রশ্ন যতই উৎকট হউক, তাহাতে তাঁহারা খিন্ন হন না।

বশিষ্ঠ কহিলেন—রামচন্দ্র! আত্মার স্বভাবনাম্নী শক্তি যেভাবে পরিস্ফুরিত হয়, সৃষ্টির আদিতে সেই ভাবেই তাহা স্থিতি লাভ করিয়া থাকে; ইহা নিশ্চয়ই। ঈশ্বর সত্যসঙ্কল্প; তাই যাবৎ সৃষ্টি, তাবৎই ঐ স্বভাব-নিয়মের অবস্থিতি। প্রলয়ে উহা অনবস্থ। সুতরাং নিয়তি-ভঙ্গ বাদে বিরোধ কিছুই নাই। অবিদ্যার বস্তুত্ব নাই; কাজেই বস্তুশক্তি দেশকাল ভেদে ভিন্ন হইয়া থাকে। ইহার দৃষ্টান্ত দেখ, শরৎকালে কামরূপাদি দেশে ধান্যাদি ফল জন্মিতে দেখা যায়। বিবিধ অনিয়ত স্বভাবে অবস্থিত এই যে নিখিল দৃশ্য বিরাজিত, এতৎসমস্তই ব্রহ্ম—ব্রহ্ম-স্বভাবেই নিয়ত একরূপ। অগ্নির ঊর্দ্ধজ্বলনাদি নিয়ম দেখা যায় কেন? বুঝিতে হইবে, সেই একই ব্রহ্ম প্রাণিবর্গের বিবিধ কর্ম্ম ও কর্ম্মফল ভোগাদির ব্যবহারার্থ কিঞ্চিৎকালের জন্য প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ স্থিতি-নিয়মে নিয়ত হইয়া প্রকাশমান হন মাত্র।

রামচন্দ্র কহিলেন—ভগবন্! যোগিগণ কি প্রকারে সূক্ষ্ম ছিদ্রাদি পথে ও আকাশাদি দেশে গমনাগমনের নিমিত্ত অণিমা মহিমা প্রভৃতি সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকেন? কিরূপে তাঁহারা অণুত্ব ও স্থূলত্ব প্রাপ্ত হন?

বশিষ্ঠ কহিলেন—রাম! প্রণিধানপূর্ব্বক শ্রবণ কর। কাষ্ঠ ও ক্রকচ, এই উভয়ের সঙ্ঘর্ষ-ঘটনায় যেমন দ্বিধাভিন্নতা সম্পন্ন হয়, তেমনি প্রাণ ও অপান পবনের সংঘর্ষবশেও স্বভাবতঃ জঠরানল উদ্দীপিত হইয়া থাকে। একমাত্র স্বভাবকেই উহার প্রতি কারণ বলা যায়। আমাশয় ও পক্বাশয় এই দুই স্থূল মাংসখণ্ড দেহযন্ত্রের জঠরদেশে নাভির ঊর্দ্ধ ও অধোভাগে পরস্পর সংশ্লিষ্ট-মুখে অবস্থিত। ঊর্দ্ধে আকাশগত এবং অধোদিকে জলমগ্ন উক্ত মাংসভাগদ্বয় নিম্নে জল ও ঊর্দ্ধে বায়ু দ্বারা আকৃষ্যমাণ হইয়া বেতস লতাকুঞ্জের ন্যায় কম্পিত অবস্থায়

অবস্থিত হয়। পদ্মরাগময় আধারপাত্রের মধ্যে যেমন মুক্তাবলী শোভা পায়, তেমনি ঐ মাংসের অধোগত ভস্ত্রাভাগের মূলীভূত মূলাধারে পূর্ব্ববর্ণিত কুণ্ডলিনী লক্ষ্মীরূপে বিরাজ করেন। জপ করিবার কালে রুদ্রাক্ষমালার আবর্ত্তনায় যেমন অব্যক্ত শব্দ উত্থিত হয়, তেমনি ঐ কুণ্ডলিনীও প্রাণ ও অপানপবনের উদ্গিরণ ও নিগিরণ-ঘটনায় 'সল্ সল্' ইত্যাকার অব্যক্ত শব্দ উদ্ভাবন করে এবং দণ্ডাহত ভুজাঙ্গীর ন্যায় ঊর্দ্ধমুখে বিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। বৈধ এবং অবৈধ ক্রিয়াই যেমন প্রাণি-বর্গের স্বর্গ ও নরক গমনাদির হেতুভূত, তেমনি ঐ কুণ্ডলিনীই স্পন্দ-ধর্ম্মিণী হইয়া প্রাণ ও অপান পবনের ঊর্দ্ধ ও অধোগতির প্রতি হেতু হয়। বিশদার্থ এই যে, কুণ্ডলিনীর স্পন্দন হইলেই প্রাণ ও অপানের ঊর্দ্ধাধো-গতি হইয়া থাকে। ঐ কুণ্ডলিনীই হৃদয়পদ্মের ষট্‌পদী এবং উহাই জ্ঞানরূপ মধুর বিবোধন-ব্যাপারে সূর্য্যসদৃশী। যেমন বাহ্য বায়ুর প্রবাহে তরু পত্ররাজি কম্পিত হয়, তেমনি ঐ কুণ্ডলিনীই জ্ঞান, কর্ম্ম, ও ইন্দ্রিয়াদি শক্তি এবং পূর্ব্বোল্লিখিত হৃৎপদ্ম প্রভৃতিকে হৃদয়স্থ আন্তর বায়ু দ্বারা পরিচালিত করিয়া থাকে। এই যেমন বিশাল বাহ্যাকাশ পরিস্ফুরিত হয় এবং ইহাতে স্বভাবতই বায়ু সকল সুদৃঢ় কাষ্ঠ, পাষাণ ও কোমল তৃণপর্ণ প্রভৃতি গ্রাস করে এবং কালবশে জীর্ণ করিয়া ফেলে, তেমনি অন্তরাকাশেও প্রাণপবনসমূহ ভুক্ত অন্নরসাদি জীর্ণ করিয়া থাকে। সেই পূর্ব্বোল্লিখিত হৃদয়পদ্মপ্রভৃতি, প্রাণপবন-যোগে আহত হইয়া লোহকারের ভস্ত্রার ন্যায় তরলায়মান হয়। বসন্ত ঋতুর সমাগমে পাদপান্তর-প্রবিষ্ট পার্থিব রস যেমন পল্লব, মঞ্জরী ও পুষ্প ফলাদি রূপে পরিণত হয়, তেমনি হৃদয়ের অন্তঃপ্রবিষ্ট তরলায়মান অন্নের প্রথম পরিণতি রস, রস হইতে রক্ত, রক্ত হইতে মাংস, মাংস হইতে ত্বক্, ত্বক্ হইতে মেদ, মেদ হইতে মজ্জা, মজ্জা হইতে অস্থি এবং অস্থি হইতে শুক্র, এইরূপ বিচিত্র কার্য্যে একের অন্যরূপে পরিণতি হইয়া থাকে। তন্মধ্যে সর্ব্বরসের জীর্ণতাপরম্পরায় চরম ধাতুপরিণতি পর্য্যন্ত ঐ বায়ু সপ্ত ধাতুস্থানে পরপর পরিণামসিদ্ধি নিমিত্ত প্রতি-ক্ষণেই অনল উদ্ভাবন করে। এই দেহ স্বভাবতঃ শীতবাতাত্মক হইলেও

যৎকালে ঐ জঠরানল সর্ব্বাঙ্গে সঞ্চারিত হইয়া প্রদীপ্ত হয়, তখন সূর্য্যোদয়ে ভুবনের ঔজ্জ্বল্য ও উষ্ণতার স্থায় উহা উষ্ণ ভাব লাভ করিয়া থাকে। যোগিগণ উক্ত সর্ব্বদেহব্যাপী জঠরানলকে তারকাকারে ধ্যান করিয়া থাকেন। পদ্মে ভ্রমরস্থিতির ন্যায় যোগিগণের চিন্তায় তাঁহাদের হৃদয়পদ্মে ঐ অনল তারকাকারে অবস্থানপূর্ব্বক দেহের সর্ব্বত্র তেজোরূপে বিচরণ করিতে থাকে। ঐ তেজ যখন চিৎস্বরূপে চিন্তিত হয়, তখন উহা জ্ঞানালোক প্রকাশ করে। বলিতে কি, যে সকল পদার্থ দূর দূরান্তরে অবস্থিত, তৎসমুদায়েরই উহা সাক্ষাৎকার সিদ্ধি প্রদান করিয়া থাকে। যে বস্তু লক্ষ যোজন দূরে অবস্থিত আছে, তাহাও উহার সাহায্যে নেত্রপথে পতিত হইয়া থাকে। সমুদ্রজলই যেমন বাড়বাগ্নির ইন্ধন, তেমনি হৃৎসরোবর-কোষস্থ জঠরাগ্নির সন্নিহিত শরীরগত অন্নরসরূপ জলই উহার শুষ্ক ইন্ধনস্বরূপ। ঐ স্বচ্ছ শীতল অন্নরসময় জল ইন্দুর অংশভূত। ঐ ঐন্দবাংশই শরীরগত বাড়বাগ্নিবৎ বহ্নির উত্থান স্থান। এইরূপে এ দেহ অগ্নীষোমাত্মক বলিয়া অভিহিত। বহির্জগতেরও অগ্নি-সোমাত্মকতা প্রসিদ্ধ। যে কিছু উষ্ণতা, তৎসমস্তই তেজ, অগ্নি ও অর্ক আখ্যায় অভিহিত, আর যে কিছু শৈত্য জাড্য, সমস্তই সোমনামে নিরূপিত; কাজেই এ জগৎ এইরূপেই অগ্নীষোমাত্মক বলিয়া প্রথিত। যাহা হইতে এবম্বিধ জগৎ নিষ্পন্ন হয়, সেই মায়াশবল ব্রহ্মও বিদ্যা ও অবিদ্যারূপে সদসদাত্মক। তন্মধ্যে বিদ্যা সূর্য্য ও অগ্নিস্থানীয় এবং অবিদ্যা বা অজ্ঞান জাড্য প্রভৃতি সোমস্থানীয়।

রামচন্দ্র কহিলেন,—হে বাগ্মিবর মুনিশ্রেষ্ঠ! বুঝিলাম, বায়ুরূপ সোম হইতে অগ্নির আবির্ভাব হইয়াছে। কিন্তু সোমের আবির্ভাব কিরূপে হয়, তাহা আমার নিকট ব্যক্ত করুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! অগ্নি এবং সোম, ইহারা উভয়ে পরস্পর কার্য্য-কারণ ভাবে অবস্থিত এবং যুগপৎ ও পর্য্যায়ক্রমে পরস্পর পরস্পরের পরাজয়ৈষী; ইহারা উৎপত্তি-ব্যাপারে বীজাঙ্কুরবৎ পরস্পর পরস্পরের উপাদানভূত এবং দিবা ও রাত্রির ন্যায় উহাদের পরস্পরের স্থিতি পরস্পরের নিমিত্ত। উহারা ছায়া এবং আতপবৎ পরস্পর পরস্পরকে

ব্যাহত করিয়া থাকে। ইহাদের যুগপৎ উপলব্ধিকালের স্থিতি ছায়াতপের ন্যায় এবং ক্রমোপলব্ধি কালের স্থিতি দিন ও রাত্রির অনুরূপা। উহাদের কার্য্য-কারণ ভাব দুই প্রকার। এক ভাব সৎস্বরূপ পরিণামজনিত এবং দ্বিতীয় ভাব ধ্বংসরূপ পরিণামজাত। উল্লিখিত কার্য্য-কারণ ভাব অবগত হইবার এক দৃষ্টান্ত স্থল বীজ ও অঙ্কুর; বীজাঙ্কুরের একটীর ভাব হইলে তাহা হইতে অপরটীর ভাব হইয়া থাকে। এই কার্য্য কারণ ভাব সৎস্বরূপের পরিণতি হইতেই নিষ্পন্ন। আর ধ্বংসপরিণাম বিদিত হইবার দৃষ্টান্ত—দিবস ও রজনী। উহাদের মধ্যে একের বিনাশে অপরের উৎপত্তি আপনা হইতেই হইয়া থাকে। এই কার্য্য-কারণভাব ধ্বংস-পরিণামজাত বলিয়া বিদিত। মৃত্তিকা ও ঘট এই উভয়ের পরিণতি যেমন প্রত্যক্ষ, দিবস ও রজনী এতদুভয়ের বিনাশ-পরিণতিও তেমনি অনুপলব্ধি প্রমাণসিদ্ধ। যাহারা এইরূপ দুর্যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, যাহা কার্য্য করে, তাহাই কারণ, কারণের কার্য্যকারিতা তাহাতে অভিনিবেশরূপ আস্থা-স্থাপনেই দেখা গিয়া থাকে। যাহা প্রকাশমাত্রেই ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, তাদৃশ দিবসের রাত্রিনির্ম্মাণে আস্থা বিদ্যমান নাই; সুতরাং উহার কর্ত্তৃত্বও নাই। এইরূপে রাত্রিরও দিনকর্তৃত্ব নাই। এতাবতা একের অভাবই অন্যের ভাব, এইরূপে অভাবই যখন পরিণাম, তখন উহাদের কার্য্য-কারণ ভাবের মূল কিছুই নাই। এইরূপে অচেতন মৃত্তিকাদিরও ঘটাদি নির্ম্মাণে অনাস্থা দেখা যায়; কেন না, আস্থা চেতনেরই ধর্ম্ম। মৃত্তিকাদি অচেতন, তাহাদের সে ধর্ম্ম নাই। বিশেষতঃ দেখ, মৃত্তিকা মর্দ্দন না করিলে তাহা হইতে ঘটোৎপত্তি হয় না, অন্য দিকে মৃত্তিকা মর্দ্দিত করিলে মৃত্তিকা নষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং কি করিয়া তাহা সৎস্বরূপে পরিণত হইতে পারে? আরও দেখ, মৃত্তিকা ও ঘট ব্যতীত উভয়ানুগত মৃত্তিকা নামে যে তৃতীয় কোন কিছু আছে, তাহাও অসম্ভব। কেন না, তাহা একেবারেই নাই। আর বীজাঙ্কুরের বিষয় দেখিলে দেখা যাইবে, বীজাদি স্থিতিকালে, নষ্টোন্মুখ হইয়া, নষ্ট হইতে হইতে, কিম্বা নষ্ট হইয়া পরে যে অঙ্কুরোৎপাদন করে, তাহা নহে; কেন না, স্থিতিকালে যদি অঙ্কুর জন্মাইত, তাহা হইলে কুশূলেও অঙ্কুর হইত, আর উল্লিখিত দ্বিতীয়

ও তৃতীয় কল্প—নাশ হইতে হইতেও নাশোন্মুখতা; সে দুই কল্পেও বীজের অঙ্কুরোৎপত্তি হইতে পারে না। কেন না, তখন সে আপনাকেই রক্ষণ করিতে অক্ষম। সুতরাং সে কিরূপে কোন্ যুক্তিবলে অন্যকে উৎপাদন করিবে? চতুর্থ কল্প—নষ্ট হইয়া করা। ইহা সকলের অনুভব-বিরুদ্ধ। এতাবতা বলা যায় যে, কাহারও কিছুই উৎপত্তি বা নাশ নাই, পরন্তু স্বভাবতই সমস্ত উৎপন্ন হয় ও নাশ পায়। এ বিষয়ে যাহারা অবিবেকী, তাহারাই কার্য্য-কারণভাব কল্পনা করে। ইহাই দুর্যুক্তিবাদীরা বলিয়া থাকেন; কিন্তু এইরূপে কার্য্য-কারণভাবে অনাস্থা দেখাইয়া যে সকল দুর্যুক্তিবাদী স্বভাবাতিরিক্ত জগৎকর্ত্তা অস্বীকার করে, তাহারা স্বানুভব গোপন করিয়া থাকে এবং অনুভব-বিরুদ্ধ বাক্য প্রয়োগ করে; এই জন্যই তাহাদিগকে অনাদর করিয়া তর্কস্থান হইতে বহিস্কৃত করাই কর্ত্তব্য।

হে রঘুনন্দন! অভাবও প্রত্যক্ষবৎ প্রমাণের কার্য্য করে। দৃষ্টান্ত দেখ, অগ্নির অভাবই শীতের প্রতি প্রমাণ। ইহা সর্ব্বপ্রাণি-সাধারণেরই বিদিত। অগ্নি ধূমরূপে আকাশগত হইয়া মেঘাকৃতি ধারণ করিয়া থাকে। এ ক্ষেত্রে অগ্নি সদ্রূপ পরিণামবশে সোমের প্রতি কারণ হয়। আবার অভাব-পরিণাম দ্বারাও অগ্নি সোমের কারণ হইয়া থাকে। কেন না, বিনষ্ট অগ্নি শৈত্য সমুৎপাদনপূর্ব্বক বায়ুতে যখন বিলীন হয়, তখন সে বিনাশপরিণাম সোমের কারণ হইয়া থাকে। বাড়বাগ্নি সপ্ত সমুদ্রের সলিলরাশি পান করিয়া ধূমোদ্গার করিতে করিতে মেঘাকার ধারণ ও সপ্ত সাগরের জলরাশি উৎপাদন করিয়া থাকে। এইরূপ সূর্য্যদেব কৃষ্ণ-পক্ষে অমাবস্যাবধি নিশাকর চন্দ্রকে বারম্বার গ্রাস করেন। সারস পক্ষী যেমন ভুক্ত মৃণাল উদ্গিরণ করে, তেমনি তিনি পুনরায় শুক্লপক্ষে চন্দ্রকে উদ্গিরণ করিয়া থাকেন। চন্দ্র যে কালের মুখবৎ প্রতিভাত হয়, তাদৃশ বসন্ত এবং গ্রীষ্মকালের সমাগমে প্রাণ অর্থাৎ উষ্মা সহ বায়ু ভৌম রস পান করিয়া বর্ষাকালের উদয়ে অভ্রাকারে পীনতা প্রাপ্ত হয় এবং বর্ষণ দ্বারা পুনর্ব্বার জগদাকার শরীর পূর্ণ করিয়া থাকে। অথবা আধ্যাত্মিক প্রাণই অপানমুখ হইতে অন্ন-পানাদি উদরে আসিলে তদীয় অম্ব-

তোপম রস পান করিয়া পীনত্ব লাভ করে এবং অভ্রবৎ পরিব্যাপ্ত সর্ব্ব-নাড়ীনিচয়ে আগমনপূর্ব্বক শরীরকে পূর্ণ করিয়া আপ্যায়িত করিতে থাকে। ইহারই নাম সোমপরিণাম। যদি মনে কর, বায়ু ভৌম রস শোষণ করে না; কিন্তু অর্করশ্মিসমূহই তাহাকে পান করে। কেন না, রাত্রিতেও উষ্মরূপে তাহাদের সত্তার অভাব নাই; সুতরাং তাহারাই তো উদাহরণ স্থল। এই অভিপ্রায়ে বলা যাইতেছে, ঊর্দ্ধে আদিত্যরশ্মিই জল শোষণ করিয়া থাকে। এইরূপে কল্পনা করিলেও দেখা যায়, জল সৎ-স্বরূপ পরিণামক্রমেই সূর্য্যরশ্মিত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ঐ জলই আবার অগ্নির কারণরূপে প্রতিভাত হয়। জলের যখন শৈত্য দ্রবত্ব নষ্ট হইয়া উষ্ণতা ও রুক্ষতার উদয় হয়, তখন ঐ জল অগ্নিরূপে পরিণত হইয়া থাকে। এইরূপ বিনাশ পরিণামক্রমে জল অগ্নির কারণ হয়। অগ্নির বিনাশে সদ্রূপ পরিণাম নিশাকর এবং নিশাকরের বিনাশে সদ্রূপ পরিণাম হুতাশন; ইহাই সূক্ষ্মদর্শীদিগের অভিমত। যেমন দিবস নাশ পাইয়া রাত্রি হয়, তেমনি হুতাশন বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া সোম হইয়া থাকে। আলোক ও অন্ধকার, ছায়া ও আতপ, এবং দিন ও রাত্রি, ইহাদের মধ্যে বা সন্ধিদশায় যে একটা সন্মাত্র বিশেষ রূপ আছে, তাহা প্রাজ্ঞগণের দুর্জ্ঞেয়। বলিবে —আলোক ও অন্ধকারের যে সন্ধি, তাহাতে তো নাই আলোক, নাই অন্ধকার; সুতরাং উহা শূন্যরূপ। যখন উহা শূন্যরূপ, তখন তো উহাতে উভয়বিলক্ষণ কোনরূপই নাই। ইহার উত্তরে বলা যায় যে, উহা অশূন্য-রূপ। কেন না, উক্ত সন্ধি আলোক ও অন্ধকারের পরস্পর সংলগ্ন আকৃতি। আলোক ও অন্ধকার যেমন স্বরূপতঃ নিরপেক্ষ এবং ভাব ও অভাবরূপে অবস্থিত, সন্ধি অবস্থাতেও উহাদের সেইরূপই অবস্থান। এ জগতে আলোক ও অন্ধকার দ্বারা যেমন দিন যামিনী সম্পাদিত হয়, তেমনি চৈতন্য এবং জাড্য এই উভয় যোগেই ভূতবৃন্দ ব্যাপারবান্ হইয়া থাকে। সূর্য্যমণ্ডলগত অমৃত যেমন জলময় বিম্বে প্রতিবিম্বক্রমে মিশ্রিত হইয়া শীতল ইন্দুকলেবর নির্ম্মাণ করে, এই জগৎ তেমনি চিদ্‌ব্রহ্মে জড় মায়াযোগে নির্ম্মিত হইয়াছে।

হে রাঘব! জানিও,—অনল ও সূর্য্য স্বতঃ প্রকাশমান চিৎস্বরূপ

এবং সোমশরীর তমোরূপ জড়াত্মক। যেমন বাহিরে গগনগত দিবাকরের উদয় দর্শনে নৈশ অন্ধকার নিরস্ত হয়, তেমনি বিমল চিৎসূর্য্য হৃদাকাশে দৃষ্ট হইলে এ সংসারের মূল তমঃ তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হইয়া যায়। যেমন রাত্রিযোগে চন্দ্রের উদয় হইলে তাহাতে সৌর কররাশি প্রবেশপূর্ব্বক চন্দ্রধর্ম্মে আক্রান্ত হয়; সে কালে উহারা চন্দ্রের সত্তায় সত্তাবান্ ও স্বীয় সত্তায় বিচ্যুত হইয়া থাকে; ফলেও তখন সৌর প্রভাপুঞ্জের অভাবই সর্ব্বজনের অনুভবগম্য হয়, তেমনি প্রত্যগাত্মা নিজেই ঐ জড়াত্মক সোমদেহরূপে দৃষ্টিগোচর হন, তখন চিৎ সেই জড়ময়রূপে প্রকাশমান হইলেও জড়ধর্ম্মে আক্রান্তবৎ প্রতীয়মান হইয়া থাকেন। তৎকালে তাঁহার জড়সত্তাই মাত্র জ্ঞাত হওয়া যায়। চিৎসত্তার প্রকাশ কিছুই থাকে না; তখন তাঁহার সত্তা যেন অসত্তাই হইয়া পড়ে। সৌর প্রভাময় অগ্নি চন্দ্রমণ্ডলে প্রবেশ করিয়া প্রতিবিম্বরূপ চন্দ্রকে প্রকাশিত করিয়া থাকে; এ দিকে চৈতন্যও জড়াকারে দেহে আবিষ্ট হইয়া জীবিতকাল পর্য্যন্ত আমি, আমার, ইত্যাদি ভাবনারূপ প্রভা প্রকাশ করিয়া থাকেন। যেমন সৌর প্রভাই অবিবেকিতাবশে মানুষের নিকট ইন্দুর আকার উপগত হয়, তেমনি চিদ্‌ব্রহ্মই 'আমি মানুষ' এবম্প্রকার অধ্যাসদোষে দেহগত জীবভাব লাভ করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ চিৎ অক্রিয়; তাঁহার সঙ্কোচ-উপাধি কিছুই নাই। কেবল চিতের উপলব্ধি হওয়াও অসম্ভব। দীপের সাহায্যে আলোকের যেমন জ্ঞান হয়, দেহরূপ উপাধিযোগে ঐ চিতের তেমনি জ্ঞান হইয়া থাকে। এই কারণেও চিতের দেহধর্ম্মত্ব ভ্রম উৎপন্ন হয়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে দেখা যাইবে, দেহ-ধর্ম্মাদি তাঁহার কিছুই নাই। অজ্ঞানাবৃত চিতের বিষয় উন্মুখীভাব; তাহাতেই তাহার লাভ; আর সেই লাভই অনর্থমূলক সংসার। অপিচ বিষয়ের বিসর্জ্জনে যে কল্যাণ লাভ, তাহারই নাম নির্ব্বাণ। দেহাভাবে আত্মার স্ফূরণ থাকে না এবং আত্মার অস্ফূরণেও দেহের অস্তিত্ব দেখা যায় না, এই কারণ ভিত্তি ও আলোকবৎ ঐ পরস্পর সাপেক্ষভাব দেহ-দেহীকে অগ্নি ও সোমময় বলিয়াই বিদিত হইবে।

হে রাঘব! উপাধি নিবৃত্তি ঘটিলে যৎকালে নিরতিশয় আনন্দা-

বির্ভাবের ঐকান্তিক সিদ্ধি সংঘটিত হয়, তখন কেবল অগ্নির আর যখন জড়তার আতিশয্য ঘটে, তখন কেবল সোমের স্থিতি হইয়া থাকে। প্রাণ পবন উষ্ণপ্রকৃতি অগ্নি আর অপান শীতপ্রকৃতি শশী; উহারা ছায়া ও আতপের ন্যায় বিপরীত স্বভাবে উভয় পথে প্রবাহিত হইয়া থাকে। আদর্শে যেমন প্রতিবিম্ব থাকে, তেমনি উষ্ণস্বভাব প্রাণাগ্নিও শীতল অপানে অবস্থান করে। সূর্য্য যেমন আপন প্রভায় বাহিরে স্বীয় প্রতিবিম্বকে উদ্ভাসিত করে, মূল প্রাণ কুণ্ডলিনীস্বরূপ চিদগ্নিও তেমনি মূলাধার হইতে কণ্ঠাবধি চতুর্দ্দলাদি পদ্মপত্র-স্থিত পরাদি বৈখরী পর্য্যন্ত বাক্যময় সোমকে স্বীয় অনুভূতি বা স্ফূর্ত্তি দ্বারা উদ্ভাবিত করে। সৃষ্টির আদিতে মায়াসম্বলিত ব্রহ্মসম্বিৎ যেমন শীতোষ্ণাদির বিবিধভাবে অগ্নী-ষোম নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন, এক্ষণে ব্যষ্টি জীবদেহের সৃষ্টিতেও সেই সম্বিৎ সেইরূপ অগ্নীষোম নামে বিরাজ করিতেছেন। কৃষ্ণপক্ষে অগ্ন্যাত্মক সূর্য্য সোমের শুভ্র পঞ্চদশ কলাকে প্রতিপৎ হইতে আরম্ভ করিয়া গ্রাস করেন; পরন্তু একমাত্র ধ্রুবানাম্নী চিৎকলাকে অবশিষ্ট রাখেন; আবার শুক্ল পক্ষের অভ্যুদয় হইতে ক্রমশঃ সেই উষ্ণীভূত কলাকলাপ উদ্গিরণ করেন। তৎকালে ক্রমে ক্রমে সেই কলাকলাপে পরিপূর্ণ হইয়া ধ্রুবানাম্নী কলা পূর্ণচন্দ্রাকারে প্রতিভাত হয়। এইরূপে হৃদয়স্থ প্রাণসূর্য্য অপানাখ্য সোমের মুখ-নাসিকাপথে লব্ধপ্রবেশ শীত পঞ্চদশ কলা গ্রাস করে, মুখের বহির্ভাগে ধ্রুবানাম্নী এক কলা অবশিষ্ট রাখে এবং পুনর্ব্বার সেই সকল উষ্ণ কলা উদ্গিরণ করিয়া থাকে। পরে কলাকলাপে পূর্ণকায় হইয়া পূর্ব্বোক্ত ধ্রুবা কলা বাহিরে অপানাখ্য সোমাকারে পরিণত হয়। তন্মধ্যে বাহিরে প্রাণ ও অপানের সন্ধিকাল পৌর্ণমাসী; অন্তরে কিন্তু অমাবস্যা; অন্তরালভাগে ইড়াপিঙ্গলার প্রত্যেক ঊর্দ্ধ ও অধোভাগে প্রত্যেক শাখা নাড়ীতে প্রাণসূর্য্যের প্রবাহক্রমে দুই অয়ন, মেষাদি দ্বাদশ মাস এবং সেই সেই মাসের অন্তরালে সংক্রান্তি সকল নিষ্পন্ন। এইরূপে অপানরূপ সোমের প্রবাহক্রমেও চৈত্রাদি মাস, বিষ্কম্ভাদি যোগ এবং অন্যান্য পর্ব্ব সকল নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। ইহা যোগিগণের প্রত্যক্ষ।

মুখ হইতে বহির্দ্দেশে সোমরূপ অপানের ধ্রুবানাম্নী ষোড়শী কলা প্রাণোদ্গীর্ণ কলাকলাপে পূর্য্যমাণ হইয়া ক্ষণকাল প্রাচীদিকে সমুদিত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় বিতস্তিমাত্র হয়। তুমি কুম্ভকযোগে ঐ স্থানে মনের ধারণা সম্পাদনপূর্ব্বক স্থিরভাবে অবস্থান কর। যে হৃদাকাশে সোমই সূর্য্যত্ব প্রাপ্ত হইয়া শুদ্ধ প্রকাশময়রূপে বহির্ভাগে অবস্থান করে, তুমি তথায় স্থিরভাবে অবস্থান কর। উষ্ণস্বভাবকে অগ্নি ও চিদাদিত্য এবং শীতস্বভাবকে সোম নামে অভিহিত করা হইয়াছে। যথায় এই সোম-সূর্য্য বা শৈত্য ঔষ্ণ্য পরস্পর প্রতিবিম্বভাবে অবহিত আছে, তুমি তথায় স্থিরভাবে অবস্থান কর।

হে অনঘ! দেহ মধ্যে সোম সূর্য্য ও অগ্নির পরস্পর সংক্রান্তিসংযোগ কিরূপে হয়, তাহা তুমি বিদিত হও। অর্থাৎ বসন্ত, গ্রীষ্ম, বর্ষা ও শরৎকালে ক্রমশঃ উষ্ণতায় শীত গ্রাস করে, তাই সোমের অগ্নিসংক্রান্তি হয়; এইরূপে শরৎ, হেমন্ত ও শীতকালে ঐ উষ্ণতাকে ক্রমশঃ শীতে গ্রাস করে; এই জন্য অগ্নির সোমসংক্রান্তি ঘটে এবং তাহাদের সন্ধিদ্বয় ও বিষুবদ্বয়ই সূর্য্যের মেষাদিতে সংক্রান্তি হয়। এই প্রকারে জীবদেহেও জঠরাগ্নি অপানশৈত্য গ্রাস করে, তাহাতে সোমের অগ্নিসংক্রান্তি ঘটে এবং প্রাণাগ্নিকেও বহিঃশৈত্য গ্রাস করিলে সোমসংক্রান্তি ঘটিয়া থাকে। ইত্যাদি ক্রমে তুমি এ দেহের সোম, সূর্য্য ও অগ্নিসংক্রান্তির বিষয় অবগত হও। ইহা জানিলে তখন তোমার নিকট এই বাহ্য জগতের যাবতীয় বস্তু তৃণতুল্য হেয় বলিয়া বোধ হইবে।

হে রাম! বাহিরের সংবৎসর, সংক্রান্তি ও উত্তরায়ণাদি কালের ন্যায় অন্তরেও যদি গতিভেদ-ভিন্ন প্রাণ ও অপানপবন যোগে ঐ সম্বৎসর-সংক্রান্তি-প্রভৃতিকে প্রত্যক্ষানুভূত ঘটাদিবৎ স্পষ্টতঃ পরিজ্ঞাত হইতে পার, তাহা হইলে তুমি একজন প্রকৃত যোগী হইয়া বিরাজ করিবে। পরন্তু আমি যাহা উপদেশ দিলাম, ইহা ভিন্ন অন্য কোন কিছুর আশ্রয় লইয়া অন্য ব্যাসঙ্গে যদি প্রবৃত্ত হও, তবে আর তোমার শোভার সামগ্রী কিছুই থাকিবে না।

একাশীতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৮১ ॥

দ্ব্যশীতিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! এক্ষণে শ্রবণ কর—যোগিগণের দেহ স্থূল ও সূক্ষ্মভাব লাভ করে কিরূপে?

সন্ধ্যাকালের মেঘমধ্যগত বিদ্যুদ্বিকাশের ন্যায় হৃৎপদ্মের ঊর্দ্ধ কর্ণিকায় যে বহ্নিকণা বিদ্যমান, তাহা দেখিতে হেম-ভ্রমরবৎ সমুজ্জ্বল। সাধারণতঃ বাত্যাযোগে অগ্নি যেমন জ্বলিত হয়, তেমনি বর্দ্ধনোপায় জ্ঞান দ্বারা ঐ বহ্নিকণা সত্বর বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। উহা বৃদ্ধি পাইয়াও অন্য অগ্নির ন্যায় দেহকে দগ্ধ করে না; পরন্তু সম্বিৎস্বরূপ বলিয়া সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশাতিশয্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অনন্তর অগ্নিকৃত সুবর্ণের দ্রবীভাবের ন্যায় সেই হৃৎপদ্ম কর্ণিকার অগ্নিও কর-চরণাদি অঙ্গসমূহ সহ সমস্ত দেহ গলিত করিয়া ফেলে; ফলে দেহের পার্থিব গন্ধভাগ ও কাঠিন্যকে তদুপাদান জলীয় ভাগে উপসংহৃত করিয়া লয়। ঐ জঠরাগ্নির তখনকার প্রভা যেন প্রত্যূষে আকাশে প্রথমোদিত দিবাকরের ন্যায় দেদীপ্যমান। অনন্তর সেই অগ্নি নিজ নৈসর্গিক শক্তিযোগে জলের শৈত্যস্পর্শে অক্ষম হইয়া উপসংহার-যুক্তিতে জলকেও শোষণ করিয়া লয়। এইরূপ ক্রমে ঐ অগ্নি দেহ হইতে পৃথক্ হইয়া মনোরূপ আতিবাহিক দেহে অবস্থান করে। বাত্যাযোগে হিম যেমন অন্তর্হিত হয়, ঐ অগ্নি তেমনি প্রাণবায়ুর পরিস্পন্দ বশতঃ পার্থিব ও জলীয় এই দুই দেহ পরিত্যাগ করিয়া কোথায় বিলীন হইয়া যায়। যেমন ধূমরেখা অগ্নি হইতে নির্গত হইয়া ক্রমশঃ অগ্নি সহ সম্পর্কহীনভাবে আকাশে অবস্থান করে, তেমনি তখন কুণ্ডলিনী শক্তি মূলাধারস্থ সুষুম্নানাড়ী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আতিবাহিক দেহাকাশে বিরাজ করিয়া থাকেন। তিনি মনোবুদ্ধিময় জীবাদি-ঘটিত লিঙ্গদেহে ঐ সময় 'অহং' ভাবকে স্থাপন করেন। নগর হইতে বিনির্গত ধূমলেখার অভ্যন্তরে যেমন সূক্ষ্ম জ্যোতিঃপ্রভা অবস্থান করে, তেমনি তাঁহারও অন্তরে চিৎ-প্রকাশ ও স্বেচ্ছাবিহার-চমৎকার স্ফুরিত হয়। তদবস্থায় তিনি সূক্ষ্মতম

মৃণালচ্ছিদ্রে, শৈলে, সামান্য তৃণে, ভিত্তি প্রদেশে, উপলখণ্ডে, আকাশে, বা ভূতলে সর্ব্বত্রই যথেচ্ছভাবে অবাধে প্রবেশ ও নির্গম করিতে পারেন।

রামচন্দ্র! চর্ম্মনির্ম্মিত ভস্ত্রা যেমন জল তুলিবার কালে কূপে নিক্ষিপ্ত হইবা মাত্র পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, তেমনি যোগিগণের জীবশক্তিরূপিণী কুণ্ডলিনী রসভরে সর্ব্বথা পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। চিত্রকর যেমন অগ্রে মনে মনে রেখা কল্পনা করে; পরে সেই রেখাই অঙ্কিত করিলে বাহিরে কোন আকৃতি প্রাপ্ত হয়, তেমনি সেই যে রসপূর্ণা জীবশক্তি, তিনিও পূর্ব্বসংহৃত পার্থিব ভাগকে যাদৃশাকারে রচনা করিতে ভাবনা করেন, যোগশক্তিবশে তাদৃশ বাহ্যাকারই ধারণ করিয়া থাকেন। মাতৃগর্ভস্থ কললজালে জীবশক্তি যেমন সুসূক্ষ্ম অস্থি, হস্ত ও পদাদি অঙ্কুরাকারে অবস্থিত, তেমনি ঐ কুণ্ডলিনী শক্তিও অনন্তর অন্তরে দৃঢ়তর ভাবনার প্রভাবে ভাবী দেহের অস্থি প্রভৃতির আকার ধারণ করেন। হে রাঘব! জীবশক্তি স্বীয় ইচ্ছামত যেরূপ আকার ও পরিমাণ চিন্তা করে, তদনুসারে সুমেরু হইতে সামান্য তৃণ পর্য্যন্ত সমস্ত আকারই সে ধারণ করিয়া থাকে।

রামচন্দ্র! এই তুমি আমার নিকট যোগসাধ্য অণিমাদি সিদ্ধির কথা শ্রবণ করিলে, এক্ষণে আবার শ্রুতিমধুর জ্ঞানগম্য বিষয় শ্রবণ কর।

এ জগতে সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর এক মাত্র শুদ্ধ, সৌম্য, শান্ত, চিন্মাত্র বস্তু আছেন। তাঁহাকে লক্ষ্য করা যায় না; তিনি এ জগৎ বা জগৎ-ক্রিয়া নহেন। সেই চিৎই যখন মায়ার আবেশে আমি বহু হইব, জন্মিব, ইত্যাদি রূপ সঙ্কল্প করিয়া নিজে নিজেকে অধ্যাসক্রমে উপচিত করেন, তখন তিনি মলিনভাব লাভ করিয়া জীব আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। বালক যেমন কল্পিত ভূত যক্ষাদি দেখিয়া ভীত হয়, মূঢ় জীব তেমনি সঙ্কল্পের ভ্রমে পতিত হইয়া এই মিথ্যাময় দেহের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া থাকে। ইহাই জীবের স্থূলভাব। যখন জ্ঞানময় দীপের আলোক বিকীর্ণ হইয়া পড়ে, তখন ঐ জীবের সঙ্কল্পভ্রম শারদীয় নীরদের ন্যায় বিলীন হইয়া যায়। হে রাঘব! সর্ব্ব সঙ্কল্প ক্ষয় পাইয়া গেলে তৈলাভাবে প্রদীপের ন্যায় এ দেহও তখন নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়। নিদ্রা নিরস্ত হইলে লোকে যেমন আর স্বপ্ন সন্দর্শন করে না, তেমনি সত্য বস্তু সম্যক্

হৃদয়ঙ্গম হইলে জীবও আর দেহদর্শী হয় না। জীব অসত্যকে সত্য বলিয়া ভাবনা করে, তাই সে দেহবদ্ধ হয়। কিন্তু যখন একমাত্র সত্য বস্তুরই ভাবনা করে, তখন সেই শ্রীমান্ জীব বিদেহ হইয়া নিরবচ্ছিন্ন শান্তিসুখই প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

হে রাম! যাহা বস্তুত আত্মা নহে, তাদৃশ অনাত্মা দেহাদিতে যে আত্মভাবনা, তাহাই হৃদয়ের দারুণ তমঃ। সে তম এই উদীয়মান দিবাকরের করযোগেও নিরাকৃত হইবার নহে। 'আমি সর্ব্বব্যাপী নিরঞ্জন আত্মস্বরূপ' এইরূপ প্রকৃত আত্মবুদ্ধিরূপ আদিত্যের যদি উদয় হয়, তাহা হইলেই ঐ তমঃ নিরস্ত হইতে পারে। অন্যান্য আত্মবেদিগণও যাহা যেরূপে ভাবনা করেন, দৃঢ়তর ভাবনার বলে তাহা সেইরূপই দেখিয়া থাকেন। হে রাঘব! প্রগাঢ়তর ভাবনার প্রসাদে মূঢ় জনেরাও বিষকে অমৃত এবং অমৃতকে বিষ করিতে পারে। এইরূপে ভাবনার বলে এ জগতে না হয়, এমন কার্য্য নাই। দৃঢ় ভাবনায় যাহা যেরূপে ভাবনা করা যায়, শীঘ্রই তাহা সেইরূপে নিষ্পন্ন হয়। ইহা বহুবারই প্রত্যক্ষগোচর হইয়াছে। যদি সত্য ভাবনায় দেখা যায়, তবে এ দেহ দেহই হইয়া থাকে। আর যদি মিথ্যা বলিয়া ভাবনা করা যায়, তবে এ দেহ ব্রহ্মাকাশেই পরিণত হয়।

হে রাম! তুমি সাধু হইয়াছ; অণিমাদি সিদ্ধির হেতুভূত জ্ঞান-যোগ তোমার শ্রবণ করা হইয়াছে। এক্ষণে অন্য যুক্তি শ্রবণ কর। যেমন বায়ু পবন হইতে পুষ্পামোদ ঘ্রাণেন্দ্রিয়ে যোজিত হয়, তেমনি জীব পরদেহ হইতে নিঃসৃত হইয়া রেচক প্রাণায়ামের অভ্যাসবশে অপর দেহে স্থাপিত হইতে পারে। কিন্তু সে কালে পূর্ব্ব দেহটা কাষ্ঠ ও লোষ্ট-বৎ নিষ্পন্দ অবস্থায় পরিণত হইয়া অবস্থান করে। ফলে তখন সেই পরকীয় দেহে জীবাত্মার কোনও প্রকার আস্থা বা শ্রদ্ধা থাকে না। যেমন জলসেচক ব্যক্তি নিজ করস্থিত কুম্ভোদক দ্বারা যে কোন তরু বা লতাকে সেক করিতে ইচ্ছা করে, তাহাকেই সেক করিয়া থাকে, তেমনি জীব পরকীয় দেহের ভোগ-সম্পদাদি ভোগ করিবার নিমিত্ত আপন ইচ্ছায় যে কোন দেহে জীব ও বুদ্ধিতে আদর করিয়া থাকে। কি স্থাবর, কি জঙ্গম, যে দেহে ইচ্ছা, জীব তাহারই অন্তর্নিবিষ্ট হয়। যোগী ব্যক্তি

উল্লিখিত রূপে পরকীয় দেহে সিদ্ধিসম্পদ্ ভোগ করিয়া স্বীয় পূর্ব্বতন কলেবর থাকিলে তাহাতেই পুনরায় প্রবেশ করেন; নচেৎ অন্য যে দেহ অভিপ্রেত হয়, তৎক্ষণাৎ তাহাতেই প্রবেশ করিয়া থাকেন। অথবা তিনি পরদেহের ভোগ সম্পাদনপূর্ব্বক স্বীয় অন্তঃকরণের বিপুলতায় সমস্ত জগৎ আপূরিত করিয়া চরাচর নিখিল দেহাদি প্রতিবিম্ব-উপাধি, তৎপ্রবিম্ব জীব, তদ্‌বিম্বোপাধি সত্ত্বাদি গুণ এবং তদবচ্ছিন্ন চিদাকার বিম্বসমষ্টি, ইত্যাদি সর্ব্বব্যাপিনী স্বাত্মসম্বিত্তি দ্বারা পরিপূর্ণ ভাবে অবস্থান করেন।

হে রঘুনন্দন! তৎকালে ঐ যোগৈশ্বর্য্যশালী ব্যক্তি নিত্য নির্দ্দোষ আত্মতত্ত্ব অধিগত হইয়া যাহা যাহা আকাঙ্ক্ষা করেন, অচিরাৎ তৎসমস্তই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এইরূপ হইলেও তাদৃশ বিদিততত্ত্ব ব্যক্তিগণ কদাচ অল্পসিদ্ধির আদর করেন না; কিন্তু যাহা নিরাবরণত্ব, তাহাই তাঁহারা নিরতিশয় আনন্দময় পরম পদ বলিয়া বিদিত হন।

দ্ব্যশীতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৮২ ॥

ত্র্যশীতিতম সর্গ

বশিষ্ঠ কহিলেন,—পূর্ব্ববর্ণিত রাজপত্নী চূড়ালা উল্লিখিতরূপে প্রাণ-ধারণাদি সুদৃঢ় অভ্যাস করিতে করিতে অণিমা মহিমাদি যোগৈশ্বর্য্য-সমূহে সমন্বিতা হইলেন। সেই অবস্থায় তিনি কখন গগনপথে গমন, কখন সমুদ্রগর্ভে প্রবেশ এবং কখনও বা পৃথ্বীমণ্ডল পর্য্যটন করিতেন। তাঁহার মোহমালিন্য ও ত্রিবিধ তাপ উপশান্ত হইয়াছিল; সুতরাং তিনি অমল শীতল গঙ্গাজলপ্রবাহের ন্যায় অমল ও শীতল হইয়া সে কালে বসুধাপীঠে বিচরণ করিতেন। চূড়ালা যোগৈশ্বর্য্যবলে লক্ষ্মীর ন্যায় পতির বক্ষস্থল ও মন

হইতে কদাচ বিযুক্ত হইতেন না। অথচ তিনি সকল সময়, সকল রাজ্যে—সকল জগতে বাস করিতেন। শ্যামা চূড়ালা বিদ্যুদ্‌বিমণ্ডিতা মেঘমালার ন্যায় ব্যোমপথে ভ্রমণ করিতেন। তাঁহার দেহালঙ্কার বিদ্যুতের ন্যায় সমুজ্জ্বল ছিল। তিনি তাদৃশ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া কখন গিরিশ্রেণীতে এবং কখন বা ভূতলে বিচরণ করিতেন। মুক্তার অভ্যন্তরগত সূত্রের ন্যায় চূড়ালা নিজের ইচ্ছামত কাষ্ঠে, তৃণে, উপলে, প্রাণিদেহে, গগনে, অনলে, অনিলে, সলিলে, সর্ব্বত্র অবাধে প্রবেশ করিতেন। তিনি কদাচিৎ মেরুর উপরিস্থ শৃঙ্গসমূহের উপর, কদাচিৎ লোকপালগণের নগরে এবং কখন বা দিক্ ও আকাশোদরে যে সকল ভুবনরন্ধ্র আছে, সেই সমুদায়ে মনের সুখে বিহার করিয়া বেড়াইতেন। তাঁহার এমনই ঐশ্বর্য্য মাহাত্ম্য হইয়াছিল যে, তাহাতে তিনি অনায়াসেই সর্ব্বভূতের ভাষাতত্ত্ব বুঝিতে পারিতেন। ঐরূপ বুঝিবার সামর্থ্য ছিল বলিয়াই চূড়ালা—তির্য্যক্, ভূত, পিশাচ, নাগ, সুর, অসুর, বিদ্যাধর, অপ্সর ও সিদ্ধগণের সহিত সম্ভাষণাদি ব্যবহার করিতে পারিতেন।

এইরূপে সেই রাজপত্নী চূড়ালা ব্যবহারপরায়ণ হইয়া বহুদিন বহুযত্নে বহু প্রকারে ভর্ত্তাকে আত্মজ্ঞানামৃত লাভের জন্য বহু উপদেশ প্রদান করিলেন। কিন্তু তাঁহার ভর্ত্তা সেই শিখিধ্বজ রাজা কিছুতেই আত্মতত্ত্ব বিদিত হইতে পারিলেন না। তিনি এইরূপই বুঝিয়া লইলেন যে, আমার গৃহিনী এই চূড়ালা কেবল কলাবিদগ্ধা, মুগ্ধা ও বালিকা মাত্র। বেদাদি বিদ্যা কি প্রকার, তাহা যেমন বালকে বুঝিতে পারে না, তেমনি রাজা শিখিধ্বজ এতদিনেও তাঁহার তাদৃশ গুণবতী পত্নী চূড়ালাকে জানিতে পারিলেন না। ফলে আত্মতত্ত্ব তো দূরের কথা, তাঁহার প্রিয়া চূড়ালা যে কি অসামান্য গুণে গুণবতী হইয়াছিলেন, তাহাও তাঁহার জানিবার শক্তি হইল না। শূদ্রকে যেমন যাগক্রিয়া দেখাইতে নাই, তেমনি সেই চূড়ালা আত্মবিশ্রান্তি লাভে অক্ষম সেই শিখিধ্বজ রাজাকেও নিজের সিদ্ধিসম্পদ প্রদর্শন করিতে পারেন নাই।

রামচন্দ্র কহিলেন,—হে প্রভো। রাজা শিখিধ্বজ যখন সেই মহতী

সিদ্ধযোগিনী চূড়ালার তাদৃশ উপদেশ-প্রযত্নেও প্রবোধ প্রাপ্ত হইলেন না, তখন অপরে কিরূপে প্রবোধ প্রাপ্ত হইবে ?

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রঘুবর ! বিজ্ঞান লাভ করিবার জন্য গুরুর শরণাপন্ন হওয়া কর্ত্তব্য, ইত্যাদি শাস্ত্রব্যবস্থা মাত্র পালনই গুরুকৃত উপদেশ-ক্রম ; পরন্তু ইহা অনধিকারী শিষ্যের জ্ঞান উৎপাদন করিতে পারে না। যে শিষ্য চতুর্ব্বিধ সাধনসম্পন্ন হইয়া পবিত্রান্তঃকরণ হইতে পারেন, তাঁহার বিশুদ্ধ প্রজ্ঞাই জ্ঞানলাভের প্রতি কারণ হইয়া থাকে। আত্মজ্ঞানের অনুপযোগী শাস্ত্রবাক্যে কিম্বা কোন পুণ্যপ্রভায় আত্মতত্ত্ব অবগত হওয়া যায় না। সর্প যেমন সর্পের পদ পরিজ্ঞাত হইতে পারে, তেমনি আত্মাই আত্মাকে অবগত হইতে পারেন।

রামচন্দ্র কহিলেন,—হে মুনে ! জগতের স্থিতি-প্রকৃতি যদি এমনই হয়, তবে গুরুর উপদেশনামক ক্রমই যে আত্মজ্ঞান লাভের কারণ হইয়া থাকে, এরূপ কথার অর্থ কি ?

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম ! বহু পরিজন-পরিবেষ্টিত ব্রাহ্মণের ন্যায় বিন্ধ্যারণ্যে জনৈক বহু ধনধান্য-সম্পন্ন বণিক্ বসতি করিত। ঐ বণিক্ অত্যন্ত কৃপণ ছিল। সে একদা ভ্রমণে বহির্গত হইলে দৈবাৎ তৃণগুচ্ছময় বিন্ধ্যকানন মধ্যে তাহার একটী কপর্দ্দক পতিত হয়। তাহাতে নিতান্ত কৃপণস্বভাব বলিয়া বণিক্ সেই একটী মাত্র কপর্দ্দকের নিমিত্ত তিন দিন পর্য্যন্ত ক্রমাগত তত্রত্য সমস্ত তৃণ-তুষাদি পরিষ্কার করিতে লাগিল। সে মনে মনে চিন্তা করিল,—যদি আমি এই কপর্দ্দকটী প্রাপ্ত হই, তাহা হইলে ইহা দ্বারা কোন একটী দ্রব্য কিনিয়া কোন ক্রেতার নিকট বিক্রয় করিলে আমার চারিটি কপর্দ্দক হইতে পারিবে। পরে তাহা হইতে আটটী ; এইরূপে কালক্রমে তাহা হইতে অন্যূন শত, সহস্র এবং দুই সহস্রটী পর্য্যন্ত কপর্দ্দক হইবার সম্ভাবনা। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে সেই বণিক্ রাত্রি দিন নিরলসভাবে খিন্নমনে সেই বিন্ধ্য-জঙ্গলে কপর্দ্দকের অনুসন্ধান করিতে লাগিল। কিন্তু তাহার সেই কার্য্যে লোকে যে কত হাস্য পরিহাস করিতে লাগিল, তাহা সে বুঝিয়াও বুঝিল না।

অনন্তর ক্রমাগত তিন দিন ধরিয়া চেষ্টা করিবার পর সেই বণিক্

তথাকার সেই জঙ্গল হইতে পূর্ণচন্দ্রবিম্ব-সদৃশ এক মহা চিন্তামণি প্রাপ্ত হইল। তাহা পাইয়া অন্তরে সে পরম পরিতোষ লাভ করিল। পরে গৃহে আসিয়া সমস্ত সংসারভোগ প্রাপ্ত হইল। তাহার দারিদ্র্য প্রভৃতি সমস্ত অনর্থ ঘুচিয়া গেল। বণিক্ মহাসুখে নির্ব্বৃতচিত্তে গৃহে বাস করিতে লাগিল।

রামচন্দ্র! আমি যে বণিকের কথা কহিলাম, ঐ বণিক্ যে প্রকারে একটা কপর্দ্দকের অনুসন্ধান করিতে করিতে অবশেষে অমূল্য মহা-চিন্তামণিরত্ন লাভ করিয়াছিল, গুরুর উপদেশক্রমে শাস্ত্রালোচনা করিলেও তেমনি আত্মতত্ত্বজ্ঞান লাভ করা যায়। গুরুর উপদেশে এক শব্দে পরোক্ষ জ্ঞানের অন্বেষণ করিতে করিতে অন্য অপরোক্ষ নিত্য জ্ঞানেরও লাভ হইয়া থাকে। ব্রহ্ম সর্ব্বেন্দ্রিয়ের অতীত; এবং শাস্ত্রাদি শ্রবণ ও সেই জন্য যে বোধাদি, তাহা ইন্দ্রিয়প্রযোজ্য চিত্তবৃত্তি। হে অনঘ! গুরুর উপদেশবশে শাব্দ বৃত্তিই সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। সেই শাব্দ বৃত্তির মধ্যগত অতি স্বচ্ছ চরম বৃত্তিতে নিত্য অপরোক্ষ ব্রহ্মের স্ফূর্ত্তি; তাহাতে শিষ্যবুদ্ধির স্বচ্ছতা ও ব্রহ্মস্বভাব, এই উভয়ই প্রযোজক। সুতরাং গুরুর উপদেশে আত্মতত্ত্ব লাভ হইতে পারে না; উপদেশ তৎপ্রতি কারণ নহে। এ কথা সত্য; কিন্তু অন্যদিকে আবার গুরূপদেশ বিনা আত্মতত্ত্বজ্ঞান হইতেও পারে না। কপর্দ্দকের অন্বেষণ বিনা কে বল চিন্তামণি লাভ করিত? সেই বণিক্ অন্বেষণ করিতে গিয়াছিল বলিয়াই তো মণিলাভে সক্ষম হইয়াছিল। সুতরাং তৎপ্রাপ্তির জন্য নিজের যত্ন চেষ্টারও বিশেষ প্রয়োজন। অকারণও কখন কখন কারণ হইয়া থাকে। ঐ কপর্দ্দক কারণ না হইয়াও চিন্তামণি লাভের প্রতি কারণ হইয়াছিল। যেমন কপর্দ্দকের অন্বেষণ করিতে করিতে সেই বণিকের চিন্তামণি লাভ হইল; এই নিমিত্ত বলা যায়, গুরূপদেশ ব্যতিরেকেও কখন কখন তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে।

হে রাঘব! দেখ, এই বিশ্ববিমোহিনী মায়া মহৎ ব্যক্তিদিগকেও মোহিত করিয়া থাকে। ঐ মায়ার মাহাত্ম্যেই লোকে যত্ন করিয়া এক বস্তু অন্বেষণ করে, অন্য ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে হেতু ত্রিভুবনে

ইহা দেখা যায় এবং শুনাও যায় যে, লোকে এক কাজ করে, আর অন্য ফল প্রাপ্ত হয়; অতএব আত্মতত্ত্ব লব্ধ হইবার পর প্রারব্ধশেষে উপনীত এই জগদ্ভ্রম নির্লিপ্তভাবে উপেক্ষায় অতিবাহিত করিয়া দেওয়াই পরম মঙ্গল।

ত্র্যশীতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৮৩ ॥

চতুরশীতিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! সন্তান মরিয়া গেলে লোকে যেমন শোকমোহে অভিভূত হইয়া এ সংসার অন্ধকারময় অবলোকন করে, সেই শিখিধ্বজ রাজাও তেমনি তত্ত্বজ্ঞানরূপ বিশ্রামস্থান না পাইয়া নিতান্ত মোহমগ্ন হইয়া পড়িলেন। দুঃখানলে তদীয় অন্তঃকরণ অহরহ দগ্ধ হইতে লাগিল। সুতরাং তাঁহার যে সকল মন্ত্রী ও আত্মীয়বর্গ ছিলেন, তাঁহারা তখন তৎসমীপে রত্নাদি বিভূতিসম্ভার আনয়ন করিলেও তিনি সে সমস্ত অগ্নিশিখাবৎ জ্ঞান করিয়া তাহাতে অনুরক্ত হইতে লাগিলেন না। ব্যাধ-নিক্ষিপ্ত শর হইতে দৈবক্রমে রক্ষা পাইয়া মৃগাদি জন্তু যেমন কোন এক নির্জ্জন প্রদেশের আশ্রয় লয়, তেমনি সেই শিখিধ্বজ রাজাও একান্তে, দিগন্তে, নির্ঝরে, কিম্বা কোন গুহাগহ্বরেই কেবল অনুরক্তি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তৎকালে ভৃত্যগণ আসিয়া তোমার ন্যায় সেই রাজাকে অনুনয় বিনয় সহকারে সান্ত্বনা দানপূর্ব্বক প্রবুদ্ধ করিয়া দৈনিক কার্য্যকলাপ নির্ব্বাহ করাইতে লাগিলেন। রাজা শিখিধ্বজ উৎকট বৈরাগ্য অবলম্বন করিলেন। পরিব্রাজক সাধুর ন্যায় তাঁহার চিত্ত শান্ত হইল। তিনি বিপুল ভোগে, রাজ্যসম্পদে, কিছুতেই অনুরক্তি দেখাইতেন না; প্রত্যুত তাহাতে খেদানুভবই করিতেন। তখন হইতে ব্রাহ্মণ ও স্বজনগণকে তিনি গো, ভূমি ও হিরণ্যাদি দান, দেহশুদ্ধি ও চিত্তশুদ্ধি নিমিত্ত কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদি তপস্যা এবং নানাতীর্থ ও দেবমন্দির প্রভৃতিতে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। যে স্থান রত্নের

আকর রহে, তাহা খনন করিয়া রত্নপ্রার্থী ব্যক্তি যেমন মনের শান্তি পাইতে পারে না, তেমনি সেই রাজা শিখিধ্বজ ঐ সকল করিয়াও অণুমাত্র চিত্ত শান্তি প্রাপ্ত হইতে পারিলেন না। তখন সেই মহারাজ অহর্নিশা চিন্তানলে শুষ্ক হইতে লাগিলেন এবং এই ভবব্যাধির ঔষধ কি, তাহা চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি চিন্তাক্রান্ত ও দীনভাবাপন্ন হইয়া নিজ রাজ্য ও অতুল বিভব বিষের ন্যায় জ্ঞান করিতে লাগিলেন। রাজ্যৈশ্বর্য্য সম্মুখে থাকিলেও তৎপ্রতি তখন তাঁহার দৃষ্টি পতিত হইল না।

একদিন রাজা শিখিধ্বজ নির্জ্জনে চূড়ালাকে নিজের নিকটে প্রাপ্ত হইয়া মধুর বাক্যে বলিলেন,—অয়ি প্রিয়ে! আমি বহুকাল রাজ্যভোগ করিলাম। এ সংসারে যে কিছু বিভবসামগ্রী আছে, তাহাও আমি বহুদিন ভোগ করিয়া দেখিলাম; কিন্তু এখন আর আমার সে সমুদায়ে অনুরাগ নাই। আমি সংসারের সকল বিষয়েই বৈরাগ্যযুক্ত হইয়াছি। ইচ্ছা হইতেছে, এখন আমি বনে গিয়া বাস করি। অয়ি কৃশাঙ্গি! যিনি বনবাসী মুনি, তাঁহাকে না সুখ, না দুঃখ, না বিপদ্, না সম্পদ, কিছুই আসিয়া আক্রমণ করিতে পারে না। দেশভঙ্গ হউক, তাহাতেও বনবাসীদিগের উদ্বেগ নাই; সংগ্রামে লোকক্ষয় হইবারও তাঁহাদের সম্ভাবনা দেখি না। সুতরাং এই সকল কারণে রাজত্ব অপেক্ষাও বনবাসীদিগের সুখ অধিক বলিয়াই আমি মনে করি। অয়ি বরাননে! তুমি যেমন আমার প্রীতি উৎপাদন কর, তেমনি এখন সেই বনবীথীই আমার আনন্দদায়িনী হইয়াছে। বনরাজিরও শোভাসম্পত্তি আমি তোমার তুল্যই দেখিতেছি। উহারা স্তবকরূপ স্তন ধারণ করিতেছে; রক্তবর্ণ পল্লবদলই উহাদের পাণির ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে; মঞ্জরীজাল হারগুচ্ছের স্থান অধিকার করিয়াছে; সুচঞ্চল শুভ্র অভ্র বসনশোভা ধারণ করিয়াছে; পরাগপুঞ্জে অঙ্গরাগের কার্য্য হইতেছে; পুষ্পপুঞ্জ অলঙ্কার হইয়াছে; ভোগযোগ্য স্বর্ণশিলা নিতম্বতটের শোভা ধারণ করিয়াছে; তরঙ্গরূপ মুক্তামণ্ডিত নদীই উহাদের মুক্তামালা; লতাবল্লীই বয়স্যা; ভ্রমরশ্রেণীই নয়নতারা; পুষ্প-পরিবৃত লতারাজিই অঙ্গযষ্টি এবং অতিমুগ্ধ মৃগকুলই পুত্র-পরিবার; উহারা স্বভাবতই উদ্দাম সৌগন্ধশালিনী এবং তোমারই ন্যায় ঐ বনরাজি ক্ষুধিতদিগকে

ফল ভোজন বিতরণ করিয়া থাকে। ভাবিয়া দেখ, একান্তে অন্তঃকরণ যেমন পবিত্র ও নির্ব্বৃত থাকে,শশিবিম্বে কিম্বা ব্রহ্মধামে অথবা ইন্দ্রভবনেও সেরূপ হইবার নহে। অতএব হে তম্বি! আমি বনগমনের যে শুভ মন্ত্রণা করিয়াছি, তাহাতে তুমি বাধা প্রদান করিও না। দেখ, যাহারা পতিব্রতা নারী, তাহারা স্বপ্নেও কখন স্বামীর সঙ্কল্পে বিঘ্ন উৎপাদন করে না।

চূড়ালা কহিলেন,—নাথ! যে কালে যাহা করা উচিত, তাহা করিলেই শোভা হইয়া থাকে। অকালে কৃত কার্য্য কখনই ফল প্রসব করে না। দেখুন, বসন্তকালেই পুষ্পের শোভা হয় এবং শরৎকালেই ফল শোভা পাইয়া থাকে। যাঁহারা জরাজীর্ণদেহ বর্ষীয়ান্ ব্যক্তি, বনে বাস করা তাঁহাদের পক্ষেই উচিত; কিন্তু তাই বলিয়া যাঁহারা যুবক, তাঁহারাও বনাশ্রয় গ্রহণ করিবেন, এরূপ কখনই সম্ভবপর নহে। অতএব আপনার বনবাসেও আমার অভিরুচি নাই। মহারাজ! আমি বলি, যতদিনে না আমরা যৌবনহীন হই, ততদিন গৃহের শোভাই বর্দ্ধন করিতে থাকি। দেখুন, তরুরাজি যতদিন পুষ্পসম্পদে পরিপূর্ণ থাকে, ততদিন তাহারা স্বীয় আশ্রয়েরই শোভা সম্পাদন করে। আমাদের যখন বার্দ্ধক্য আসিবে, কেশপাশ পলিত হইবে, শ্বেত কুসুম-রাজিতা লতার সহিত জরা সমভাব লাভ করিবে, তখন সরোবর হইতে হংসের ন্যায় এ গৃহ হইতে আমরা বন গমন করিব। হে নৃপতে! আপনি যদি অসময়ে প্রজাপালন পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে মহাপাপ হইবে। বিশেষতঃ অসাময়িক কার্য্য করিতে দেখিলে প্রজাবর্গও আপনাকে নিবারণ করিবে। কেন না, অকার্য্য হইতে প্রভুকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য ভৃত্যগণ তাহাদের সম্মিলিত শক্তি প্রয়োগ করিয়া থাকে। এই নিয়মই চলিয়া আসিতেছে।

শিখিধ্বজ কহিলেন,—অয়ি পদ্মপলাশ-লোচনে! আমি তোমার স্বামী: আমার অভীষ্ট বিষয়ে তুমি আর বিঘ্ন উৎপাদন করিও না। আমি এখান হইতে সেই দূরস্থ বিজন বনে গিয়াই রহিয়াছি, ইহাই তুমি অবধারণ করিয়া লও। তোমায় বলি, সুন্দরি! তুমি এখনও বালিকা;

তোমার অবশ্য এখন বনগমন করা উচিত নহে। অয়ি কোমলাঙ্গি! তুমি স্ত্রীলোক, তোমার তো কথাই নাই; যাহারা পুরুষ, তাহাদের পক্ষেও বনবাস কষ্টসাধ্য। স্ত্রীজাতি যদি কঠিনও হয়, তথাচ বনে বাস করিতে তাহারা সমর্থা নহে। দেখ, বনে যে সকল পুষ্পমঞ্জরী উৎপন্ন হয়, তাহারা উপবনোৎপন্ন পুষ্পমঞ্জরী হইতে কঠিন হইলেও শস্ত্রাঘাত সহ্য করিতে অবশ্য কিছুতেই সক্ষম হয় না! অতএব প্রজাপালন পরিত্যাগ করিতে হইবে ভাবিয়া তোমার যে আশঙ্কা হইয়াছে, সেই আশঙ্কা নিরাসের জন্য বলি, তুমিই প্রজাবর্গের পালনকর্ত্রী হইয়া এ রাজ্যে বাস কর। তোমার পক্ষে ঐরূপ কার্য্য করাই উচিত; কেন না, স্বামী যদি কোথাও গমন করেন, তবে তাঁহার অনুপস্থিতে কুটুম্ব-পোষণের ভার গ্রহণ করাই স্ত্রীর কর্ত্তব্য ব্রত।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাজা শিখিধ্বজ তখন সেই চন্দ্রাননা পত্নী চূড়ালাকে এই কথা কহিয়া স্নান-কার্য্য সমাধা করিবার জন্য উত্থিত হইলেন এবং সন্ধ্যোপাসনাদি নিত্য ক্রিয়া সকল নির্ব্বাহ করিলেন। অনন্তর সমস্ত জনের সুদুর্গম বনে গমনোদ্যত রাজা শিখিধ্বজের ন্যায় দিবাকর এ জগতের প্রজা-পর্য্যবেক্ষণ-ব্যাপার পরিত্যাগ করিয়া অস্তাচলে গমন করিলেন। তখন দিবাকরের প্রভাও আপনার বিস্তৃত রূপ সংহার করিয়া তাঁহার অনুগমন করিল। মনে হইল, পতির প্রতি একান্ত অনুরাগিণী চূড়ালা যেন পতিকে নিজ গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতে দেখিয়া স্বীয় সমস্ত বিলাসবৈভব পরিহারপূর্ব্বক তাঁহার অনুসরণ করিতে উদ্যতা হইলেন। দেখিতে দেখিতে শ্যামা যামিনী আসিয়া ভস্মধূসর ভুবন ব্যাপ্ত করিয়া ফেলিল। মনে হইল, কৃষ্ণকান্তি যমুনা যেন স্বীয় সখী গঙ্গাকে শিরে ধারণ করিতে দেখিয়া ভস্ম-ভূষিত মহাদেবকে আলিঙ্গন করিতে উদ্যতা হইলেন। যমুনার ব্যবহার দেখিয়াই যেন মণ্ডলিত দিগঙ্গনারা তমালতরুরূপ বালককে ক্রোড়ে লইয়া সান্ধ্য মেঘাকার দন্ত বিকাশ করিতে করিতে জ্যোৎস্নারূপ হাস্যচ্ছটা বিস্তার করিতে লাগিল। দিনপতি ও দিনশ্রী এই দুই দম্পতি অপর পারের দেবোদ্যানময় নিজাবাস সুমেরুপ্রদেশে বিহার করিতে গমন করিলেন। এদিকে মেরুর এ পারে নিশা ও নিশানাথ রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

তাঁহাদের রতিস্থান নিদাঘজনক পাপ ও তজ্জনিত চণ্ডাতপে পরিবর্জ্জিত হইয়াছিল। এমন সময়ে গগনরূপ সৌধতলে বিকীর্ণ তারকানিকুর পরিদৃশ্যমান হইল, যেন দিগ্‌বধূগণ মাঙ্গলিক লাজাঞ্জলি বর্ষণ করিল। কামিনীরূপিণী যামিনী চন্দ্ররূপ আননে, তিমিররূপ শ্যামবর্ণে ও পদ্ম-মুকুলরূপ স্তনমণ্ডলে সুশোভিতা হইল এবং নিজ নাথের আগমনাশায় তদীয় উদয়ের প্রতীক্ষা করিতে করিতে শ্রান্ত হইয়া কুমুদাদি-কুসুমের বিকাশে হাস্যচ্ছটা বিস্তার করত স্বীয় যৌবনের সাফল্য ভোগ করিতে লাগিল।

ইত্যবকাশে রাজা শিখিধ্বজ সন্ধ্যোপাসনাদি সমাপনান্তে স্বীয় প্রিয়া চূড়ালার সহিত শয্যায় শয়ন করিলেন। ক্রমে নিশীথকাল আসিল। জনপদ সকল নিস্তব্ধ হইল। লোক সকল গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িল। পদ্মোপরি ভ্রমরীর ন্যায় চূড়ালা বস্ত্রাবৃত কোমল শয্যায় শয়ন করিয়া গাঢ় নিদ্রায় নিমগ্ন হইলেন। রাহুর বদন যেমন চন্দ্রকে মোচন করিবার কালে ধীরে ধীরে চন্দ্রপ্রভাকে প্রাচী দিকে পরিত্যাগ করে, রাজা শিখিধ্বজ সেইরূপে তখন সুখসুপ্তা স্বীয় দয়িতাকে ক্রোড় হইতে উঠাইয়া পরিত্যাগ করিলেন। লক্ষ্মী-কান্তিশালী উদ্দাম-কল্লোলময় ক্ষীরাব্ধি হইতে নারায়ণ যেমন উত্থিত হইয়া থাকেন, তেমনি সুখ-শয়ানা প্রণয়িনীর যে অর্দ্ধ-বস্ত্রাবৃত শয্যায় তিনি শয়ন করিয়াছিলেন, সেই শয্যা হইতে তখন উত্থিত হইলেন। অনন্তর রাজা তাঁহার ভৃত্যামাত্যদিগকে জানাইলেন যে, আমি তস্কর ও অন্যান্য দুষ্টবর্গের শাসন করিবার জন্য রাত্রিযোগে নগর হইতে নির্গত হইতেছি, এই বলিয়া এবং সেই সেই কার্য্যে অপর অনুচরদিগকে নিযুক্ত করিয়া তিনি নিস্পৃহ-মনে পুরী হইতে বহির্গত হইলেন। নদ যেমন সহায়ান্তরের অপেক্ষা না করিয়াই সাগরে প্রবেশ করে, রাজা শিখিধ্বজও তেমনি স্বীয় রাজ্যমণ্ডল হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া একাকীই ভীষণ অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তিনি নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার কালে 'হে রাজলক্ষ্মি! তোমায় আমার নমস্কার।' এই বলিয়া নমস্কার করিয়া গেলেন। রাজা ক্রমে ক্রমে প্রগাঢ় অন্ধকারময় গুহাকীর্ণ গভীর বন ও নিশা উভয়ই অতিক্রম করি-

লেন। অনন্তর প্রভাত হইল। রাজা শিখিধ্বজ সেই শূন্য অরণ্যানী ও দীর্ঘ দিবস অতিবাহিত করিয়া সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে কোন এক বন-ভূমিতে গিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। তিনি সমস্ত দিন উপবাসী ছিলেন। সুতরাং দিবাকর অদৃশ্য হইলে স্নানাদি কার্য্য সমাধা করিয়া যৎকিঞ্চিৎ ফল-মূল ভক্ষণপূর্ব্বক সে রাত্রি যাপন করিলেন। পুনর্ব্বার প্রভাত হইল। তিনি গাত্রোত্থান করিয়া দ্রুত গমনে কত রাজ্য, কত গিরি, কত পুরী ও কত নদী অতিবাহিত করিলেন। এইরূপে ক্রমাগত তাঁহার দ্বাদশ রাত্রি অতিক্রান্ত হইল। অনন্তর যেখান হইতে পুর-জনপদ প্রভৃতি অতিদূরে বর্ত্তমান, সেই দুর্গম কানন-পরিবৃত মন্দরাচলের তটে গিয়া তিনি উপনীত হইলেন। দেখিলেন—সেখানে অগণিত বিশাল বৃক্ষ বিরাজ করিতেছে। ঐ সকল বৃক্ষ তত্রত্য বাপীজলে প্লাবিত হইয়া পুষ্টাকৃতি ধারণ করিয়াছে। ঐ সকল বাপীজল বংশপ্রণালী-যোগে প্রতিহত হইয়া সশব্দে প্রবাহিত হইতেছে। সেখানে কত শীর্ণ বেদী ও শীর্ণ আলয় দৃষ্ট হইল। তাহাতে পূর্ব্বে যে তথায় দ্বিজাতিগণের আশ্রম ছিল, তাহাই প্রতীত হইতে লাগিল। সেখানে কত সিদ্ধ-সেবিত লতাকুঞ্জ বিরাজিত। তথায় একটী ক্ষুদ্র প্রাণীরও সঞ্চার নাই। সেখানে যে সকল বৃক্ষ ও বল্লী আছে, তৎসমস্ত প্রাণি-বর্গের প্রাণধারণোপযোগী ফলে ফুলে পরিপূর্ণ। তথাকার এক পবিত্র প্রদেশে রাজা শিখিধ্বজ নিজের আবাসের জন্য এক পর্ণশালা নির্ম্মাণ করিলেন। পর্ণশালাটী মঞ্জরীমণ্ডিত লতায় পাতায় প্রস্তুত হইল। যেস্থানে তাঁহার বাস-কুটীর হইল, তাহা এক সমতল ভূমি; তাহার নিকটে জল আছে; চারিদিক্ শাদ্বলে শ্যামীকৃত রহিয়াছে এবং কত স্নিগ্ধ শীতল ফল-কুসুমশালী বৃক্ষরাজি তথায় বিরাজ করিতেছে। রাজার সেই পর্ণশালা বিদ্যুদ্-বিজড়িত নীল জলদজালাবৃত বর্ষাকালীন পঞ্জরের ন্যায় শোভিত হইল।

রাজা শিখিধ্বজ তাঁহার সেই পর্ণশালা মধ্যে মসৃণ বেণুদণ্ড, ফলভোজনের পাত্র, পুষ্পভাণ্ড, কমণ্ডলু, অক্ষমালা, অর্ঘ্যপাত্র, শীত নিবারণের উপযোগী কন্থা এবং কুশাসন ও মৃগচর্ম্ম সংগ্রহ করিয়া স্থাপন করিলেন। বিধাতা যেমন স্বীয় সৃষ্ট ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে নানা প্রকার ব্যবহারাদির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন,

তিনিও তেমনি স্বীয় তপস্যার উপযোগী আরও নানাবিধ দ্রব্যসম্ভার আনিয়া তথায় রাখিয়া দিলেন। তৎকালে রাজা দিবসের প্রথম যামে প্রাতঃসন্ধ্যাদি সমাধা করিয়া জপ করিতেন, দ্বিতীয় যামে পুষ্প চয়ন এবং ফলমূল ও কুশ-কাষ্ঠাদি সংগ্রহ করিয়া আনিতেন; তৃতীয় যামে স্নানান্তে দেবার্চ্চনা করিতেন। অনন্তর দিবসের শেষ ভাগে বনের স্বয়ম্পতিত ফল ও কন্দ-মৃণালাদি ভোজন করিয়া পরে আবার জপে নিরত হইতেন। সেই জপ-ব্যা[illegible]ই সেই জিতচিত্ত রাজার রাত্রিকাল অতিবাহিত হইয়া যাইত।

এইরূপে সেই মালবাধীশ্বর শিখিধ্বজ মন্দরাচলের তটান্তে পূর্ব্বোক্ত-রূপে পর্ণকুটীর নির্ম্মাণপূর্ব্বক আত্মস্থ হইয়া অখিন্নমনে কাল কাটাইতে লাগিলেন। তিনি ক্ষণেকের জন্যও তাঁহার সেই পূর্ব্বানুভূত ভোগ-বিলাস স্মরণ করিলেন না। বস্তুতঃ হৃদয়ে যদি একবার বৈরাগ্যোদয় হয়, তবে কাহাকে—কোন্ দরিদ্র ব্যক্তিকেই বা রাজ্যলক্ষ্মী প্রলোভিত করিতে সক্ষম হইয়া থাকে? বলা বাহুল্য, বৈরাগ্য জন্মিলে অতি বড় দরিদ্র ব্যক্তিও ইন্দ্রপদ তুচ্ছ বলিয়া মনে করে।

চতুরশীতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৮৪ ॥

পঞ্চাশীতিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র! এইরূপে সেই শিখিধ্বজ রাজা বনা-ভ্যন্তরে পর্ণকুটীরে অবস্থান করিলেন। অনন্তর তদীয় পত্নী চূড়ালা গৃহে থাকিয়া কি করিয়াছিলেন, তাহা এক্ষণে শ্রবণ কর।

সেই অর্দ্ধরাত্রে রাজা শিখিধ্বজ চূড়ালাকে পরিত্যাগ করিয়া দূর বনে গমন করিলে ত্রাস-স্তপ্তা হরিণীর ন্যায় চূড়ালা ভয়ে জাগিয়া উঠিলেন—উঠিয়া দেখিলেন—পতি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার শয্যা শূন্য রহিয়াছে। যেমন সূর্য্য বা চন্দ্র অন্তর্হিত হইলে গগন-

মণ্ডলের আর শোভাসম্পদ থাকে না, তেমনি রাজা চলিয়া গেলে সে শয্যার শোভাবৈভবও তিরোহিত হইয়া গিয়াছে। মহালতিকার পত্রাদি যেমন কুৎসিত ক্ষার-কর্দ্দমাক্ত জলে সিক্ত হইলে ম্লান হইয়া যায়, তেমনি সেই চূড়ালার বদনমণ্ডলও তখন ম্লান হইয়া গেল। অঙ্গরূপ পল্লবদল নিরুৎসাহ হইয়া পড়িল। এইরূপে তিনি অতীব খিন্ন হইয়া পড়িলেন এবং নীহার-ধূসরা দিবসশ্রীর ন্যায় ব্যাকুল, আবিল ও অপ্রসন্ন হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। চূড়ালা তখন কিঞ্চিৎকাল শয্যাতলে উপবেশনপূর্ব্বক ভাবিতে লাগিলেন—অহো! কি কষ্টের বিষয়! প্রভু রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া গৃহ হইতে বন গমন করিলেন। অতএব আর আমি এখন এখানে থাকিয়া কি করিব? যাই—আমি তাঁহারই নিকট যাই। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে; ভর্ত্তাই স্ত্রীর প্রথম গতি। সুতরাং তাঁহারই আমি শরণ লই।

রাজমহিষী চূড়ালা এইরূপ ভাবিয়া চিন্তিয়া ভর্ত্তার অনুগমন করিবার জন্য উত্থিত হইলেন এবং বাতায়ন-মার্গে নির্গত হইয়া অম্বরপথে গমন করিলেন। সিদ্ধযোগিনী চূড়ালা বায়ুর সাহায্যে বায়ুপথ আকাশে যাইতে যাইতে নিজ মুখশ্রী দ্বারা সিদ্ধবর্গের মনে দ্বিতীয় চন্দ্রভ্রম উৎপাদন করিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তিনি যাইতে যাইতে সেই রাত্রিতে স্বীয় পতিকে দেখিতে পাইলেন। তাঁহার পতি প্রথমে যে অবস্থায় নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছিলেন, তাহাই তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। তিনি দেখিলেন—তাঁহার পতি খড়্গপাণি হইয়া একান্তে ভ্রমণ করিতেছেন। যে কালে বেতালাদি ভ্রমণ করে, সেই কালে তিনিও বেতালবৎ অবতীর্ণ হইয়াছেন। চূড়ালা পতিকে তথাবিধ অবস্থায় ভ্রমণ করিতে দেখিয়া নিজে গগনপথে থাকিয়াই তদীয় অখণ্ডনীয় ভবিষ্যৎ বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। শিখিধ্বজ যে জন্য যথায় যেরূপে যখন যত দিন যেরূপ ফলোদয় প্রাপ্ত হইবেন এবং যে প্রকারে তাঁহার ভূমানন্দ লাভ ঘটিবে, তৎসমস্তই চূড়ালার ভাবনার স্থান অধিকার করিল। তিনি যোগবলে ভর্ত্তার অবশ্য-ভবিতব্যতা সমস্তই প্রত্যক্ষ করিলেন—করিয়া সে সকলের যথাযথ সংঘটনের নিমিত্ত আর অধিক দূর গমন করিলেন না। ফলে তিনি ভাবিলেন—যাহা হইবার, তাহা অবশ্যই হইবে, তাহা তো

অন্যথা করিবার উপায় নাই ; সুতরাং কেন আর বৃথা গমন করি, আমি গমন হইতে বিরত হই। এ সময়ে পতির অনুগমনে আমি নিবৃত্ত হইলাম বটে ; কিন্তু অনতিবিলম্বেই যে আমাকে স্বামীর অনুগমন করিতে হইবে, ইহাই নিয়তির নির্ব্বন্ধ—নিশ্চিতই।

চূড়ালা এই প্রকার ভাবিয়া চিন্তিয়া পুনর্ব্বার অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং শম্ভুশিরে যেমন চন্দ্রলেখা, তেমনি তিনি শয্যায় শয়ন করিয়া রহিলেন। অনন্তর প্রভাতে সেই রাজপত্নী সমস্ত পৌরজনকে এই প্রকার আশ্বাস প্রদান করিলেন যে, সম্প্রতি তোমাদের রাজা কোন বিশেষ কারণে রাজধানী হইতে অন্যত্র গমন করিয়াছেন। শীঘ্রই তিনি প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। পৌরজনকে এইরূপ আশ্বাস প্রদান করিয়া চূড়ালা রাজধানীতেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। শস্যপালিকা যেমন ক্ষেত্রের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া পক্ক শালিধান্য রক্ষা করে, তেমনি রাজবালাও সর্ব্বত্র সমান দৃষ্টি রাখিয়া স্বামীরই নীতি অনুসারে স্বামীর সেই বিশাল রাজ্য পালন করিতে লাগিলেন। এইরূপে সেই পতি-পত্নী পরস্পর পরস্পরের মুখাবলোকন করিতে পাইলেন না। তদবস্থায় একজনে রাজ্যশাসন এবং অপরে বনে বাস করিতে লাগিলেন। এইভাবে সেই রাজদম্পতির বহুকাল অতীত হইয়া গেল। রাজা শিখিধ্বজের বনবাসে এবং রাজমহিষী চূড়ালার স্বগৃহে অবস্থানে বহুদিন, বহু পক্ষ, বহু মাস, বহু ঋতু ও বহু বৎসর অতিক্রান্ত হইল। অধিক কি বলিব, বনে ও গৃহে বাসকালীন তাঁহাদের উভয়ের অষ্টাদশ বর্ষ অতিবাহিত হইয়া গেল। অনন্তর আরও বহু বর্ষ অতীত হইলে রাজা বন-তরুকোটরে বাস করিয়া জরাক্রান্ত হইলেন। জরাবিকার অবস্থায় বনে বাস করিতে করিতে নরপতির যখন বহু বর্ষ অতীত হইল, তখন তাঁহার বাসনার অবসান ঘটিল। চূড়ালা এতদিন নরপতির বাসনা-পরিপাকেরই অপেক্ষা করিতেছিলেন ; এক্ষণে তাঁহার বাসনা অপসৃত হইয়াছে জানিতে পারিয়া তিনি বুঝিলেন—এই আমার সময় উপস্থিত ; অতএব এইবার আমি স্বামীর সকাশে গমন করি। এইরূপ বিচার করিয়া চূড়ালা তাঁহার স্বামীর আশ্রয়স্থান মন্দরতটে যাইতে ইচ্ছা করিলেন। কেন

না, তিনি প্রথম হইতেই জানিতেন যে, তদীয় স্বামীর তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্তি তাঁহার উপদেশেই হইবে। এইরূপ জানা ছিল বলিয়াই ইচ্ছামাত্র সেই রাত্রিতেই চূড়ালা অন্তঃপুর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং আকাশ-পথ অতিক্রম করিতে লাগিলেন। তিনি আকাশপথে যাইতে যাইতে অনেক সিদ্ধাভিকারিকা দেখিতে পাইলেন। ঐ সকল অভিসারিকার পরিধেয় বসন কল্পতরু হইতে উৎপন্ন। উাহারা রত্নস্তবকে বিভূষিত; উহাদের নিবাসস্থান নন্দনকানন; উহারা কান্ত জনের প্রতি একান্ত অনুরাগিণী। চূড়ালা আকাশে যাইতে যাইতে যে বায়ু ভোগ করিতে লাগিলেন, উহা চন্দ্রকলাস্পর্শী এবং তুষারশীকরবর্ষী। প্রধান প্রধান সিদ্ধগণের গাত্রে যে সকল মন্দারমালা, হরিচন্দন বা কস্তূরী প্রভৃতি সুগন্ধ দ্রব্য ছিল, তৎসমুদায়ের সংসর্গ বশতঃ ঐ বায়ু অলৌকিক সৌরভে চতুর্দ্দিক্ আমোদিত করিয়া তুলিতেছিল।

এইরূপে চলিতে চলিতে চূড়ালা অম্বরান্তরে উপনীত হইলেন। অনন্তর নির্ম্মল জ্যোৎস্না তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। ঐ জ্যোৎস্না যেন চন্দ্রমণ্ডলরূপ অমৃতাব্ধির মহতী তরঙ্গপরম্পরা! চূড়ালা যাইতে যাইতে মেঘান্তরালে গিয়া দেখিলেন,—মেঘে বিদ্যুৎপুঞ্জ বিজড়িত রহিয়াছে। সে সকল বিদ্যুৎ বারেকের তরেও স্বীয় পতি অম্বুধর হইতে বিযুক্ত হইতেছে না। সে দৃশ্য দেখিয়া চূড়ালা বারম্বার তাহার প্রতি তাকাইতে লাগিলেন; আর মনে মনে বলিতে লাগিলেন—অহো, কি আশ্চর্য্যের বিষয়! আমি বিবেকিনী হইয়াছি, তথাচ আমা হেন নারীর মনও এ দৃশ্য-দর্শনে উৎকণ্ঠিত হইতেছে! এতদিনে বুঝিলাম যে, দেহীদিগের স্বভাব আমরণ একইভাবে থাকে; জীবদ্দশায় তাহার আর সম্পূর্ণ বিলয় ঘটে না। বুঝি বা সেই জন্যই আমার মনের এইরূপ উৎকণ্ঠা! সে উৎকণ্ঠা এই যে, কবে আমার সেই প্রণয়প্রবণ সিংহস্কন্ধ স্বামীকে আমি পুনর্ব্বার নয়নগোচর করিব? দেখিয়া থাকি, মঞ্জরী-মাল্য-মণ্ডিতা লতা তাহার পতি পাদপকে ক্ষণেকের তরেও পরিত্যাগ করে না; তাই বুঝি আমার ন্যায় বিবেকশালিনী রমণীর মনও উৎকণ্ঠিত হয়। এই যে বিশিষ্ট দেবযোনি-জাত সিদ্ধকামিনীরা অভিসারিকার বেশে প্রিয়-

জনের উদ্দেশে প্রয়াণ করিতেছেন, এইরূপে আমি কবে গিয়া আমার প্রাণপতির সহিত মিলিত হইব? মনে আমার এখন এই কথাই কেবল জাগিতেছে। এ বড়ই বিস্ময়ের বিষয় যে, আমি বিবেকগুণে প্রবুদ্ধ হইয়াছি, তথাচ এই মৃদু মন্দ গন্ধবহ, এই শীতল সুধাকর-কর, এই সকল বনাবলী আমায় উৎকণ্ঠিত করিয়া তুলিয়াছে। রে মূর্খ চিত্ত! কেন তুই অন্তরে বৃথা নৃত্য করিতেছিস্? হে সাধো! তোমার সেই ব্যোম-নির্ম্মলা বিবেকিতা এখন কোথায় গেল? অথবা হে সখে, চিত্ত! এ দোষ তোমার নহে; তুমি তো নিজের ভর্ত্তার জন্যই উৎকণ্ঠিত হইয়াছ! তুমি উৎকণ্ঠিত হইয়াই কাল কাটাইতে থাক, তোমার উৎকণ্ঠায় আমার কি আসিয়া যাইবে?

চূড়ালা চিত্তকে এইমাত্র বলিয়া অবশেষে নিজের দেহের উদ্দেশে বলিলেন—হে নারীদেহ! তুমি যে তোমার স্বামীর দেহ আলিঙ্গন করিবার জন্য এত অধিক উৎকণ্ঠিত হইয়াছ, দেখিতেছি তোমার সে উৎকণ্ঠা বৃথা। কেন না, তোমার ভর্ত্তা এখন জরাগ্রস্ত; সুতরাং তিনি তোমার প্রতি নিরপেক্ষ হইয়াছেন; তোমার জন্য তাঁহার আর কিছু-মাত্র ঔৎসুক্য নাই। আমার বেশ মনে হইতেছে, তিনি এখন তপস্বী হইয়াছেন। তাঁহার দেহ কৃশ হইয়াছে। তিনি বাসনারে বিসর্জ্জন দিয়াছেন। মনে হয়, রাজ্যাদি ভোগ হইতে তাঁহার মন বিরত হইয়াছে। মন তাঁহার নির্ম্মল হইয়াছে। বর্ষাকালের নদী যেমন মহানদে মিলিত হইলে আর স্বতন্ত্রভাবে থাকে না, বোধ হয় তদীয় বাসনাবল্লীও এখন সেইরূপ হইয়াছে। তিনি এখন একান্তে আসক্ত, একাত্মা ও নীরস হইয়াছেন। তাঁহার বাসনা শান্ত হইয়া গিয়াছে। মনে হইতেছে, তিনি যেন এখন একটা শুষ্ক বৃক্ষবৎ বিরাজ করিতেছেন। হে চিত্ত! তিনি যদি ঐ অবস্থায় থাকিতে হয় থাকুন, তথাপি তোমার উৎকণ্ঠা কি? আমি যোগবলে ভর্ত্তার মতি উদ্বুদ্ধ করিয়া প্রারব্ধ শেষ-ভোগের জন্য উৎকণ্ঠিত পতিকে তোমার সহিত মিলিত করিয়া দিব; অতএব তুমি আর উৎকণ্ঠিত হইও না। ভর্ত্তা মুনিবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন। আমি তাঁহার কল্পনাহীন মনের সমীকরণ করিয়া পুনরায় তাঁহাকে রাজকার্য্যে নিযুক্ত

করিব। তখন আমরা পতিপত্নী উভয়ে চিরদিন সুখে বাস করিতে থাকিব। অহো! অদ্য আমার বড় সৌভাগ্য যে, আমি বহুকাল পরে শুভ মনোরথ লাভ করিলাম। আমি ভাবিতাম, আমার স্বামী তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া আমারই ন্যায় বাহ্য ও আভ্যন্তর বিষয়ের চিন্তা করিয়া মত্তুল্য পদে প্রতিষ্ঠিত হউন। আমার সে ভাবনার ফল ফলিতে চলিল। তিনি এখন সেইরূপই হইতে চলিলেন। আমার সকল আনন্দ মধ্যে ইহাই একমাত্র শ্রেষ্ঠ আনন্দ যে, অতঃপর আমি সমান মনোবৃত্তির সঙ্গাস্বাদ অনুভব করিতে পারিব। যত কিছু আনন্দ, তন্মধ্যে সমান মনোবৃত্তির আস্বাদ-সুখই সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

চূড়ালা এই প্রকার চিন্তা করিতে করিতে আকাশপথে যাইতে লাগিলেন। পথে কত দেশ, কত পর্ব্বত, কত মেঘ, কত দিগন্ত-অতিক্রান্ত হইয়া গেল। অনন্তর তিনি সেই মন্দরকন্দরে গিয়া উপনীত হইলেন। এই মন্দরপ্রদেশেই তদীয় পতি তপস্যা করিতেছিলেন। চূড়ালা আকাশচারিণী হইয়াই অলক্ষিতভাবে তত্রত্য বনাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। বায়ুর গতি যেমন স্পন্দনেই অনুমেয়, তেমনি তাঁহার গতিও তরুলতার স্পন্দনমাত্রেই অনুমিত হইল। তিনি যাইতে যাইতে দেখিলেন—তাঁহার পতি-দেব সেই বনের কোন অংশবিশেষে পর্ণকুটীর প্রস্তুত করিয়া তন্মধ্যে অবস্থান করিতেছেন। তাঁহাকে দেখিয়া চূড়ালার মনে হইল, তিনি যেন দেহান্তর পরিগ্রহ করিয়াই বিরাজমান। চূড়ালা দেখিতে লাগিলেন,—তাঁহার স্বামীর আর সে শরীর নাই। যাহা হার, কেয়ূর, কটক ও কুণ্ডলাদি দ্বারা সতত সুশোভিত থাকিত এবং যাহার কান্তিচ্ছটা সুমেরুর ন্যায় স্বর্ণোজ্জ্বল ছিল, তাহা এখন দুর্ব্বল ও কৃষ্ণবর্ণ হইয়া গিয়াছে; যেন একটা জীর্ণ পর্ণের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে। তাঁহার সেই স্বর্ণকান্তি পতি অদ্য যেন কজ্জল-জলে স্নান করিয়াছেন। তিনি যেন চন্দ্রমৌলির দ্বারপাল ভৃঙ্গীশবৎ বিরাজ করিতেছেন। পরিধানে তাঁহার চীরাম্বর শোভা পাইতেছে। তিনি নিস্পৃহ ও শান্ত হইয়া একান্তে অবস্থান করিতেছেন। যিনি রাজরাজেশ্বর শিখিধ্বজ, আজ তিনি ভূতলে বসিয়া পুষ্পের মালা গাঁথিতেছেন; জটা তাঁহার মস্তকের মুকুট হইয়াছে।

পীনস্তনী সুন্দরী চূড়ালা স্বামীকে তথাবিধ অবস্থায় অবস্থিত দেখিয়া কিঞ্চিৎ বিষণ্ণ হইলেন এবং মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন,—আহা! প্রকৃত আত্মজ্ঞান-লাভের অভাব কি বিষম মূর্খতা! মূর্খতার প্রকাশেই এই সকল দশা আসিয়া উপস্থিত হইয়া থাকে। এই আমার প্রিয় পতি শ্রীমান্ রাজা যখন হৃদয়ের গাঢ় মোহে অভিভূত হইয়া এ দশা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তখন অদ্যই যাহাতে এই পর্ণশালায় প্রাণনাথ আমার বিদিত-বেদ্য হইয়া ভোগ-মোক্ষ-লক্ষ্মী লাভ করিতে পারেন, তাহা আমি অবশ্যই করিব। অধুনা তাঁহাকে আমার সর্ব্বোৎকৃষ্ট বোধ প্রদান করিতে হইবে; এই জন্য আমার এই বর্ত্তমান রূপ পরিহারপূর্ব্বক অপর কোন রূপে আমি তাঁহার সমীপে প্রয়াণ করি। এইরূপ ভাবে যাইবার কারণ এই যে, উনি যদি পাছে মনে করেন যে, এই আমার পত্নী; এতো বালিকামাত্র। বালিকা ভাবিয়া পতি আমার কথামত কার্য্য নাও করিতে পারেন; অতএব এখন আমি তাপসের রূপ ধারণ করি এবং সেইরূপে ক্ষণেকের মধ্যে উহাঁকে প্রবোধিত করিয়া লই। স্বামী অদ্য বৈরাগ্যবশে চিত্তশুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন, ইহাঁর নির্ম্মল চিত্তে আত্মতত্ত্ব প্রতিভাসিত হইবার সময় উপস্থিত হইয়াছে।

চূড়ালা ইহা স্থির করিয়া জনৈক ব্রাহ্মণ-বালকের রূপ ধারণ করিলেন। তিনি ক্ষণকাল কিঞ্চিৎ মাত্র ধ্যানস্থ হইলেন; সেই ধ্যানেই তাঁহার স্ত্রীমূর্ত্তি পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। জল ও জলতরঙ্গে বস্তুগত্যা প্রভেদ না থাকিলেও তাহাদের ব্যবহারিক ভেদের ন্যায় স্ত্রী-পুরুষ প্রকৃত অভিন্ন হইলেও তাহাদের ব্যবহারতঃ ভেদানুসারে স্ত্রীমূর্ত্তি রূপান্তরিত হইয়া পুরুষমূর্ত্তি ধারণ করিল। তখন চূড়ালা ব্রাহ্মণ-বালকের রূপ ধরিয়া বনমধ্যে উপস্থিত হইলেন। চূড়ালার বদন মৃদু মন্দ হাস্যে বিকসিত হইয়া উঠিল। রাজা শিখিধ্বজ সম্মুখে সেই ব্রাহ্মণবালককে দেখিতে পাইলেন, দেখিয়া বুঝিলেন—বনান্তর হইতে সমাগত সেই ব্রাহ্মণ-বালক যেন সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমতী তপস্যা! তাঁহার দেহপ্রভা গলিত কাঞ্চন-বৎ গৌরবর্ণ। গলে তাঁহার মুক্তার মালা; স্কন্ধে শুভ্র যজ্ঞোপবীত; পরিধানে শুক্ল বস্ত্রযুগ্ম; করে পবিত্র কমণ্ডলু ও অক্ষসূত্র। সেই বিপ্র-

বালক মস্তকস্থ কেশপাশে ও সেই প্রদেশের উদ্ভাসক দেহপ্রভায় মধুকর-কুলাবৃত কমলের ন্যায় সুশোভিত হইতে লাগিলেন। তাঁহার বদনমণ্ডল কুণ্ডল দ্বারা উদ্ভাসিত হওয়ায় তিনি যেন নবোদিত দিনপতির ন্যায় বিরাজমান এবং শিখাদেশে মন্দারকুসুম গ্রথিত হওয়ায় শশাঙ্ক-যুক্ত শৃঙ্গশালী উদয়াচলবৎ দেদীপ্যমান। তদীয় দেহকান্তি দেখিলে মনে হয়, তাহা যেন শান্তির লীলাস্থলী। ব্রাহ্মণবালক তেজস্বী এবং ইন্দ্রিয়-বিজয়ী। তাঁহার ললাটে শুভ্রবর্ণ ভস্মতিলক বিরাজমান; উহা যেন সুমেরুগত পূর্ণ শশধরের ন্যায় মনোহর। সে তিলকে তাঁহার কতই না সৌন্দর্য্য হইয়াছে!

তপস্বী শিখিধ্বজ সেই ব্রাহ্মণবালককে দেখিয়া মনে করিলেন—নিশ্চয়ই এই কোন দেবকুমার আসিয়াছেন। ইহা ভাবিয়া পাতুকা পরি-ত্যাগপূর্ব্বক সসম্ভ্রমে তাঁহার প্রত্যুদ্গমন করিলেন এবং কহিলেন,—হে দেবকুমার! আপনাকে আমার নমস্কার। এই আসন; এখানে উপ-বেশন করুন। এই বলিয়া অঙ্গুলি দ্বারা নির্দ্দেশপূর্ব্বক পত্রাসন প্রদর্শন ও তাঁহার করতলে পুষ্পরাশি অর্পণ করিলেন। সে দৃশ্য দেখিয়া মনে হইল, চন্দ্র যেন কুমুদখণ্ডের পল্লবে প্রালেয়-পাত করিলেন। ব্রাহ্মণকুমার কহিলেন,—রাজর্ষে! আপনাকে আমার নমস্কার। এই বলিয়া তিনি পুষ্পরাশি গ্রহণপূর্ব্বক পত্রাসনে উপবেশন করিলেন।

অনন্তর শিখিধ্বজ কহিলেন,—হে মহাভাগ দেবকুমার! আপনি কোথা হইতে আগমন করিতেছেন? আপনার দর্শন লাভ করিয়া আমি আমার দিনসাফল্য মনে করিলাম। হে মানদ! এই অর্ঘ্য, এই পাদ্য, এই সকল পুষ্প এবং এই সকল গ্রথিত মালা; আপনি গ্রহণ করুন। আপনার সুখোপবেশন হউক।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র! তপস্বী শিখিধ্বজ সেই ব্রাহ্মণবালকের বেশধারিণী প্রিয়তমা পত্নীকে এই বলিয়া যথাবিধি পাদ্য, অর্ঘ্য ও মাল্যাদি সমর্পণ করিলেন। তখন ব্রাহ্মণরূপিণী চূড়ালা রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—হে তাপস! আমি এই ভূতলের বহু স্থান ভ্রমণ করিয়াছি; কিন্তু আপনার নিকট যেমন পূজা পাইলাম, এরূপ আর কোথাও প্রাপ্ত

হই নাই। হে অনঘ! আপনার এই অনুরূপ কোমল বিনীতভা দেখিয়া মনে হইতেছে, নিশ্চয়ই আপনি অতি দীর্ঘজীবী হইবেন। হে সাধো! আপনি ফলের সঙ্কল্প দূরে পরিহার করিয়া নির্ব্বাণলাভের জন্য প্রশান্তমনে তপঃসঞ্চয় করিতেছেন তো? হে সৌম্য! আপনি সাম্রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া এই মহারণ্যের সেবারূপ যে শান্ত ব্রত অবলম্বন করিয়াছেন, ইহা অসিধারার ন্যায় সাবধানেই সেবনীয়।

শিখিধ্বজ কহিলেন,—ভগবন্! দেবতা আপনি; আপনার যে সকল বিষয়ই বিদিত, তাহাতে আর বিস্ময়ের ভাব কি আছে? আপনি যে সকল অলোক-সামান্য শোভাচিহ্ন ধারণ করিতেছেন, উহাই আপনার দেবভাবের পরিচায়ক। আমার মনে হইতেছে, ভবদীয় সকল অঙ্গই শশাঙ্ক হইতে সম্ভূত। তা যদি না হইবে, তবে সাক্ষাৎমাত্রেই সুধা-সেকের শক্তি আপনার কোথা হইতে আসিল? হে সৌম্য! আমার এক প্রিয়তমা পত্নী আছেন, তিনিই অধুনা মদীয় রাজ্য পালন করিতেছেন। দেখিয়াছি—তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আপনারই দেহের অনুরূপ। যাহা হউক, শুভ্র জলদজাল যেমন গিরিশৃঙ্গ আবৃত করে, তেমনি আপনার এই যে শান্ত, সৌম্য, কমনীয় বপু, ইহাকে আপনি আপাদমস্তক এই পুষ্প-মালায় প্রচ্ছাদিত করুন। আপনার এই কলেবর নিষ্কলঙ্ক শশাঙ্কপ্রতিম কুসুমদলের ন্যায় কমনীয়; আমার মনে হয়, ইহা যেন এই দিনকর-তাপে ম্লান হইতেছে। হে দেব! আমি দেবতার পূজার নিমিত্তই এই সকল শুভ্র পুষ্প চয়ন করিয়া রাখিয়াছি; ভবদীয় অঙ্গসঙ্গ লাভ করিয়া এক্ষণে উহা সার্থক হউক। অদ্য ভাগ্যবশে ভবাদৃশ মহানুভব ব্যক্তি অভ্যাগত হইয়াছেন। আপনার পূজায় আমার জীবন কৃতার্থ হউক। অভ্যাগত ব্যক্তি সজ্জনের নিকট দেবতা অপেক্ষাও পূজ্যতম। হে বিমলেন্দু-বদন! কে আপনি? কাহার নন্দন? কি জন্য আপনার শুভা-গমন? দয়া করিয়া এ সকল প্রশ্নের সদুত্তর দানে মদীয় সংশয় ছেদন করুন।

ব্রাহ্মণ কহিলেন,—রাজন্! আপনি যাহা জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহা যথাযথ বলিতেছি; বস্তুতঃ বিনীত প্রশ্নকর্ত্তাকে কোন্ ব্যক্তি বঞ্চিত করিতে

পারে? শ্রবণ করুন; এই জগতীমণ্ডলে নারদ নামে এক বিশুদ্ধাত্মা মুনি আছেন। তিনি পুণ্যলক্ষ্মীর সৌম্য বদনের তিলকস্বরূপ। একদা সেই মুনি সুমেরুগুহায় ধ্যানাবলম্বনে অবস্থিত ছিলেন। তাঁহার অধিষ্ঠিত হেমময় সুমেরুপ্রস্থে প্রবল তরঙ্গশালিনী মন্দাকিনী প্রবাহিত হইতেছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া মনে হইতেছিল, যেন সুমেরুলক্ষ্মীর কণ্ঠলম্বিনী হারলতা বিরাজমানা। একদিন সমাধি ভঙ্গ হইলে মুনিবর সেই মন্দাকিনীর তীরে একটা বলয়শিঞ্জনময় লীলা-কলকলরব শ্রবণ করিলেন। তৎশ্রবণে কিঞ্চিৎ কৌতুকাক্রান্ত হইয়া তিনি তাহার তত্ত্ব জানিবার জন্য যদৃচ্ছা ক্রমে সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন; দেখিলেন—রম্ভা, তিলোত্তমা প্রভৃতি অপ্সরোগণ নদীজলে নগ্নভাবে নিমগ্ন; সে প্রদেশে পুরুষ নাই; কাজেই রমণীরা সকলেই তথায় নিঃশঙ্ক হইয়া জলকেলি-ব্যাপারে সমাসক্ত। তাহারা তাহাদের কনক-কমল-কোরকবৎ কুচ-মণ্ডলে পরস্পর সংসক্ত হইয়া ফল ফুল-শোভিত দ্রুমরাজির ন্যায় বিরাজমানা। সেই অপ্সরোগণ গলিত স্বর্ণ-রসধারার কান্তিসংস্থানবৎ স্বচ্ছ সমুজ্জ্বল উরুযুগল দ্বারা যেন মদনমন্দিরের স্তম্ভশ্রেণী সুসজ্জিত করিয়া রাখিয়াছে। যদীয় স্বচ্ছ সলিলে সুধাকরের স্বচ্ছ প্রতিবিম্ব তরঙ্গে তরঙ্গে প্রতিভাসিত; সেই গগনচারিণী মন্দাকিনীও আজ যেন সেই অপ্সরোগণের লাবণ্যরস-প্রবাহের নিকট সলজ্জ। অপ্সরাদিগের নিতম্বভূমি যেন মদনের দেবোদ্যান-ভ্রমণের রথচক্র, অথবা তাহা যেন মদনপুরীর প্রাচীর কিম্বা সেতুর ন্যায় সুদৃঢ়। সে সেতুর গাত্রে মন্দাকিনীর স্রোত প্রতিহত হইয়া মার্গান্তরে প্রবহমাণ। অপ্সরাদিগের দেহ অতি স্বচ্ছ; সে দেহের প্রতিবিম্ব পরস্পরের দেহে পতিত হইয়া এক অপূর্ব্ব শোভার আধার হইয়াছে। এইরূপে প্রত্যেক দেহেই প্রত্যেকের দেহ দেখা যাইতেছিল বলিয়া, তাহারা প্রত্যেকেই কালরূপ কল্প-বৃক্ষ হইতে সমুৎপন্ন বিশ্বরূপের ন্যায় বিরাজ করিতেছিল। প্রভবাদি ষষ্টি সম্বৎসর ঐ কাল-কল্পবৃক্ষের শাখা, পক্ষ উহার পল্লবদল, বসন্তাদি ছয় ঋতু উহার ক্ষুদ্র শাখা এবং দিবসশ্রী উহার কলিকা। অব্যক্ত আকাশরূপ অরণ্য-দেশে আলোকরূপ কুসুম-রজে ঐ কাল-কল্পবৃক্ষের উৎপত্তি।

প্রস্ফুরিত দেবগণে উহা পরিব্যাপ্ত, সপ্ত সাগর উহার আলবাল, এবং নিস্তব্ধ বিহঙ্গকুল উহার প্রতিশাখায় নিলীন। সেই কালকল্প-বৃক্ষ এমনই ভাবে প্রতিভাত। মন্দাকিনীর জলোপরি কত কমলকোরক ভাসিতেছিল; অপ্সরোগণ স্ব স্ব স্তনস্তবকের সমস্পর্দ্ধী বলিয়া সে সকল উৎপাটন করিয়া মনের আবেগে তাহাদের দলরাজি পর্য্যন্ত ছেদন করিয়া ফেলিল। অপ্সরাদিগের দোদুল্যমান অলকাবলী, কেশকলাপ ও নয়নতারা, এ সকলই যেন মধুকরমালা। মন্দাকিনীর তীরদেশ সর্ব্বভূতের সুদুর্লভ, ফুল্ল-কমলদলে আমোদিত, পদ্মিনী-পল্লবে আবৃত ও শীতল জলপ্রবাহে প্রক্ষালিত; মনে হয়, কোষসঞ্চয়ী দেবগণ যেন নির্জ্জন সুমেরুকন্দরের এ হেন নিভৃত নিরাপদ স্থান অবলোকন করিয়া সুধাকরের কলাসমূহকে একত্র সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছেন। সুতরাং উহারা তো অপ্সরা নহে; উহারা যেন সেই সুরগণ-সুরক্ষিত চন্দ্রকলাই।

নারদ মুনির মন সহসা সেই কমনীয় রমণীমণ্ডল অবলোকন করিয়া আনন্দিত হইল—কিঞ্চিৎ চঞ্চল হইয়া উঠিল। সে মন বিবেকভাগ আশ্রয় করিতে সমর্থ হইল না। তদীয় চিত্ত আনন্দে আবেলিত হইল। প্রাণপবন ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। হৃষ্ট, সমুল্লসিত, মুনির তখন মদন-সংক্ষোভ উপস্থিত হইল। রস-পরিপূর্ণ ফল, প্রাবৃট্‌সমুদিত মেঘ, পাদপের সদ্যোভগ্ন কিশলয়, তুষারশীকরবর্ষী শশাঙ্ক কিম্বা দ্বিধাখণ্ডিত মৃণালের ন্যায় সেই মুনি তখন ক্ষরিতধাতু হইলেন।

শিখিধ্বজ কহিলেন,—দেবর্ষি নারদ একজন বহুজ্ঞ জীবন্মুক্ত ব্যক্তি; তাঁহার কোন ইচ্ছা নাই, অপরাধ নাই; চরিত্রবলে তিনি অতুলনীয়। কি অন্তরে, কি বাহিরে, সর্ব্বত্রই তিনি আকাশবৎ সুনির্ম্মল; তথাচ এ হেন মুনির মদন-ক্ষোভ হইল কেন?

চূড়ালা কহিলেন,—রাজর্ষে! এই ত্রিজগতে সমুদায় ভূতজাতির, এমন কি দেবাদিরও দেহ স্বভাবতই দ্বৈতভাবাপন্ন। কি অজ্ঞ, কি বিজ্ঞ, দেহ-পাত না হওয়া পর্য্যন্ত জগতে সকলের শরীরই সুখ-দুঃখময়। যেমন দীপাগমে আলোকের এবং চন্দ্রোদয়ে সমুদ্রের বৃদ্ধি হয়, তেমনি তৃপ্তি প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ পদার্থে সুখের বৃদ্ধি হইয়া থাকে এবং মেঘাবরণে অন্ধ-

ক্ষারের ন্যায় ক্ষুধা প্রভৃতি কোন কোন পদার্থে দুঃখ বৃদ্ধি ঘটে, এ বিষয়ে স্বভাবই একমাত্র কারণ। যাহা নির্ম্মল সত্যস্বরূপ আত্মতত্ত্ব, তাহা যদি নিমেষের তরেও বিস্মৃত হওয়া যায়, তবেই বর্ষাকালীন মেঘের ন্যায় স্থূল অলীক প্রপঞ্চ প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। প্রতিনিয়ত অনুসন্ধানের ফলে নিমিষের তরেও যাঁহার স্বরূপবিস্মৃতি না ঘটে, প্রপঞ্চ-রূপ পিশাচের উদয় তাঁহার অন্তরে কখনই হইতে পারে না। আলোকে ও অন্ধকারে অহোরাত্রের ব্যবস্থার ন্যায় সুখে ও দুঃখেই শরীরের ব্যবস্থা। তবে অজ্ঞ ও তত্ত্বজ্ঞ এই উভয়ে ভেদ-ভিন্নতা এই মাত্র যে, অজ্ঞ ব্যক্তির সুখদুঃখ দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি বশতঃ বসনে কুঙ্কুমরাগবৎ চিত্ত-ভূমিতে প্রগাঢ়-ভাবে সংসক্ত, আর যিনি তত্ত্বজ্ঞানী, তাঁহার চিত্তে সুখ-দুঃখ জ্ঞানের প্রসাদে একেবারেই অসংলগ্ন। স্ফটিকে যেমন পদ্মরাগ ও ইন্দ্র নীল প্রভৃতি মণির বর্ণ বিম্বিত হয়, কিন্তু সে সকলে তাহা সংলগ্ন হয় না, যিনি তত্ত্বজ্ঞ, তাহাঁর চিত্তে সুখদুঃখ সম্পৃক্ত হইবার ভাবও প্রায় ঐরূপই। স্ফটিকের সম্মুখে যে পদার্থ থাকে, তাহারই প্রতিবিম্ব স্ফটিকে পতিত হয়; কিন্তু যিনি জীবন্মুক্ত তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ, জ্ঞানের প্রসাদে তাঁহার হৃদয়ে পূর্ব্বোক্ত সুখদুঃখের ছায়াস্পর্শও হয় না। দৃশ্য বস্তুর সম্বন্ধ-মাত্রেই অজ্ঞ জনের বুদ্ধি গাঢ়ভাবে রঞ্জিত হয়; কাজেই দৃশ্য বস্তুর অভাব ঘটিলেও বুদ্ধির যে সেই একটা রঞ্জিত ভাব, তাহা কিছুতেই ঘুচে না। বস্ত্র কুঙ্কুমাক্ত হইলে তাহারও রক্তবর্ণ হইয়া উঠে। কুঙ্কুম নষ্ট হইয়া গেলেও সে কুঙ্কুমরঞ্জন বসন হইতে অপগত হয় না। অজ্ঞদিগের যে বিষয়রঞ্জনা, তাহারও ভাব ঐরূপই। এই বিষয়-রঞ্জনা ও তাহার অসম্ভাবনা, এই দ্বিবিধ ভাবেই বন্ধ ও মোক্ষের ব্যবস্থা। বাসনার অবসানই মুক্তি আর যাহা সুদৃঢ় বাসনা, তাহারই নাম বন্ধন।

শিখিধ্বজ কহিলেন,—প্রভো! দূরস্থ বা নিকটস্থ, ইষ্ট বা অনিষ্ট এই দ্বিবিধ বিষয়ের প্রাপ্তি বা অপ্রাপ্তি-নিবন্ধন সুখ বা দুঃখের আবির্ভাব হয় কিরূপে? তাহা আমার নিকট ব্যক্ত করুন। আপনার বাক্য অতি উদার, অতি নির্ম্মল ও বহু অর্থময়। ময়ূর যেমন মেঘধ্বনি

শুনিয়া শুনিয়া তৃপ্তিশেষ পায় না, তেমনি আপনার কথাও যতই শুনি, আমার আর শুনিবার সাধ মিটে না।

চূড়ালা কহিলেন,—প্রকৃত সুখের উৎপত্তি নাই; কারণ, সুখ আত্মারই অন্তর্নিবিষ্ট। তবে তাহার যে আবির্ভাব-তিরোভাব, তাহা লইয়াই উৎপত্তি-অনুৎপত্তি কথা প্রচলিত। সেই যে আবির্ভাব-তিরোভাব, তাহা বুদ্ধিরই আবির্ভাব-তিরোভাব হইতে ঘটিয়া থাকে। দেহ, অক্ষি ও হস্তাদি দ্বারা যখন সন্নিহিত এবং শব্দ ও অনুমানাদির সাহায্যে যখন দূরগত ইষ্ট বস্তুর অনুভূতি হয়, তখন অপরিচ্ছিন্ন স্বতত্ত্বানভিজ্ঞ সুখসম্বিৎ হৃদয়ে উল্লসিত হইয়া উঠে। হৃদয়ের ক্ষোভনিবন্ধন সেই সুখসম্বিদ্ ক্ষুব্ধ হইয়া প্রাণাধার জীবের প্রতি স্বতই আবির্ভূত হইয়া থাকে। ফলে সেই সুখ চৈতন্য জীব-চৈতন্যে সম্মিলিত হয়; তদনুক্রমে জীব আপনাকে সুখী বলিয়া বিবেচনা করে। জীব হৃদয়ে অবস্থিত; দেহে প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের সহিত জীবের যে সম্পর্ক, তাহা নাড়ীযোগেই হইয়া থাকে। ফল কথা, দেহে কতিপয় নির্দ্দিষ্ট নাড়ী আছে, তাহারা জীব ও ইন্দ্রিয়ের সংযোজক। যেমন তরুমূলে জল সেক করিলে সেই জল তরুর শাখাদি সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপ্ত করিয়া থাকে, তেমনি সুখসম্বিদে সংক্ষুব্ধ জীব, বিষয়সম্বন্ধ-প্রবণ প্রাণ-পবনময় নাড়ীনিচয়কে আক্রমণ করে। জীবের সুখ বা দুঃখানুভব বিষয়ে শরীরে নাড়ীপথ এক প্রকার নহে; তাহা বিভিন্ন দেহে বিভিন্ন প্রকার। তা যদি না হইবে, তবে যখন সুখানুভব, তখন স্বস্থভাব আর যখন দুঃখানুভব, তখন অস্বস্থ-ভাব দৃষ্ট হয় কেন? ফল কথা, যে নাড়ীর সহিত জীবের সংযোগ ঘটিলে স্বস্থভাব হয়, তৎসহ-যোগে অস্বস্থ ভাব হওয়া অসম্ভব। সুতরাং স্বাস্থ্য ও অস্বাস্থ্য নিবন্ধন সুখ দুঃখ নাড়ী বিভিন্ন বলিয়াই প্রতিপন্ন। দৃষ্টান্ত দেখ, ধনী লোকের বিহারপথ আর নীচ লোকের পল্লীপথ কি এক হইতে পারে? জীব যখন নাড়ীপথে প্রবেশ না করে, তখন সে শান্তভাবে অবস্থিত হয়। সেই শান্তভাবে অবস্থানকালেই তাহাকে মুক্ত আখ্যায় অভিহিত করা যায়। আর যখন যখন বায়ুপূর্ণ নাড়ীসহ জীবের প্রগাঢ় সম্বন্ধ, তখন তখনই জীব বদ্ধ নামে নিরূপিত। জীবের বন্ধন আর কিছুই নহে;

সুখ ও দুঃখানুভূতির নিমিত্ত তাহার যে বিক্ষোভ, তাহাই বন্ধন আর তাদৃশ বিক্ষোভের অভাবই জীবের মুক্তি। এইরূপে সংসরণ ও অসংসরণ-ক্রমে বন্ধ ও মোক্ষ এই দ্বিবিধভাবেই জীবের অবস্থিতি। দুষ্ট ইন্দ্রিয় বর্গ যতক্ষণ না সুখ-দুঃখ-দশা আনয়ন করে, জীব ততক্ষণই স্বরূপানন্দ শান্ত ভাবে অবস্থান করিতে থাকে। সুধাকর-দর্শনে সমুদ্র যেমন উৎফুল্ল হইয়া উঠে, সুখ দুঃখ দেখিয়া জীবও তেমনি উল্লসিত হইয়া থাকে। আমিষদর্শনে মার্জ্জার যেমন চঞ্চল হয়, তেমনি সুখ বা দুঃখোপায় দর্শনে জীব বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠে। জীবের তাদৃশ বিক্ষোভের হেতু—সুখাদির প্রতি অনুরাগ-আকর্ষণ। সুখাদির প্রতি যে অনুরাগ-আকর্ষণ জন্মে, তৎপ্রতি কারণ একমাত্র মূর্খতা। জীব যখন আত্মজ্ঞানের গুণে মায়ামল হইতে মুক্ত হয়, তখন তাহার জ্ঞানরূপে প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকে। এইরূপে প্রতিষ্ঠা হইলে জীবের আর সুখ-দুঃখাদি কিছুই থাকে না। তখন জীবের শান্তি বা মুক্তি লাভ হইয়া থাকে। সুখাদি যে কিছু পদার্থ, সমস্তই অলীক; এই অলীক সুখাদির সহিত আমার কোনই সম্বন্ধ নাই; এই যে আমার ঈদৃশরূপে অবস্থান, ইহাও মিথ্যা বৈ আর কিছুই নহে; জীবের যখন এই প্রকার জ্ঞান সমুদিত হয়, তখন তাহার নির্ব্বাণ প্রাপ্তি ঘটে। এই নির্ব্বাণই জীবের শান্তি। যাহা অনাত্মস্বরূপ, তাহাই অলীক। সুখাদি অনাত্ম বস্তু; কাজেই তাহাও অলীক বৈ আর কিছুই নয়। এইরূপ তত্ত্বজ্ঞান যখন আবির্ভূত হয়, জীব তখন সুখানুভবে লিপ্ত হয় না। সে কালে তাহার কেবল শান্তিলাভই হইয়া থাকে। ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কিছুই নাই; দৃশ্যমান যে কিছু পদার্থ, সকলই সেই এক চিদাকাশ ব্রহ্মসত্তায় পর্য্যবসিত। জীব যখন এইরূপে স্থিরনিশ্চয় হয়, তখন তৈল-পরিহীন প্রদীপের ন্যায় তাহার নির্ব্বাণ লাভ ঘটে। ফলে সুখাদি স্নেহ-পদার্থ নিঃশেষিত হইলেই জীব-দীপ নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়। সকল জগৎই একাদ্বয় ব্রহ্ম, এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে জীব এ জগৎকে ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া বুঝিতে পারে; তখন এই দৃশ্যমান পদার্থের অস্তিত্বে তাহার বিশ্বাস বিলুপ্ত হয়। সুতরাং জীবের আর তখন কোন ক্ষোভই থাকে না। বাস্তব পক্ষে জীবের কিন্তু কোনই বন্ধন নাই এবং তাহার

বিক্ষোভ-ভ্রম কিছুই হইতে পারে না। তবে কথা এই যে, আদ্য জীব হিরণ্যগর্ভের কল্পনানুসারেই প্রথম জীবের বন্ধ-মোক্ষ নির্দ্দিষ্ট; সেই অনুসারে ইদানীন্তন কাল যাবৎ বন্ধ-মোক্ষ ব্যবস্থা প্রচলিত।

শিখিধ্বজ কহিলেন,—হে দেবকুমার! সুখসঞ্চার-যোগ্য নাড়ী-নিচয়ে জীবের সম্পর্ক ঘটিলেও বীর্য্য বিচ্যুত হইবে কেন?

চূড়ালা কহিলেন,—স্ত্রীপিণ্ড দর্শনে পূর্ব্বতন রাগ-বাসনার উদ্বোধনে জীব চঞ্চল হইয়া পড়ে। তাহার চাঞ্চল্য ঘটিলেই শরীরস্থ প্রাণ প্রভৃতি পবন বিচলিত হয়। যেমন বায়ুর চালনায় কুসুমাদির সৌগন্ধ্য স্থানচ্যুত হয় অথবা যেমন মেঘবৃন্দ হইতে বারি বহির্গমন করে, তেমনি তাহাতেই মজ্জাসার চরম ধাতু শুক্র নাড়ীপথে স্বতই অধোগত হয়।

শিখিধ্বজ কহিলেন—হে দেবপুত্র! আপনি সর্ব্ব বিষয়ে অভিজ্ঞ; ভাবাভাব বা পদার্থের গতাগতি সকলই আপনার বিদিত। তত্ত্বজ্ঞানের পূর্ব্বাবস্থায় সাংসারিক পদার্থের ব্যবস্থা কিরূপ, তাহা যে আপনি বিশেষ-রূপে অবগত আছেন, ইহা আপনার নিজের কথাতেই প্রকাশ পাই-তেছে। অতএব ইতিপূর্ব্বে আপনি যে স্বভাবের কথা কহিয়া আসিয়া-ছেন, ঐ স্বভাব কাহাকে বলে, বলুন।

চূড়ালা কহিলেন—রাজন্! সৃষ্টির প্রথম অবস্থার ব্রহ্মাই যেমন ঘট, অবট ও পটাদিরূপে ব্রহ্মে স্ফুরিত হইয়াছিলেন, এই যে বর্ত্তমান কাল, ইহাতেও সেইরূপ ব্যবস্থাই প্রচলিত আছে। তবে কথা হইতেছে, ব্রহ্মের এই যে ঘটপটাদিরূপে অভিব্যক্তি, ইহা কাকতালীয়বৎ, জলবুদ্বুদের উৎপত্তি-লয়বৎ এবং ঘুণাক্ষরবৎ হইয়া থাকে। এইরূপ হওয়ার নামই পণ্ডিতগণের মতে স্বভাব। সেই স্বভাবের সহায়তা লইয়াই এ জগতের প্ররূঢ়ি। তাহারই জন্য এ জগতে নানাবিধ বিকার-রূপ দেহ প্রকাশ পাইতেছে এবং স্বভাববশেই কোন কোন দেহ বাসনার অবসানে পুনরুৎপত্তির হেতুভূত হয় না; আবার এরূপও দেখা যায় যে, সুদৃঢ় বাসনার বশে কত কত দেহ বারম্বার উৎপন্ন হইতেছে। এইরূপ উৎ-পত্তির মূলেও ঐ স্বভাবের প্রভাবই বিদ্যমান।

পঞ্চাশীতিতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৮৫॥

ষড়শীতিতম সর্গ।

চূড়ালা কহিলেন,—রাজন্! আত্মস্বভাব-বশেই এই বিশাল বিশ্বের উৎপত্তি, বাসনা-বশেই ইহার স্থিতি এবং ধর্ম্ম ও অধর্ম্মবশেই ইহার প্রতিষ্ঠা। হে মুনে! বাসনারে ক্ষয় করিতে পারিলে জীব আর ঐ ধর্ম্মাধর্ম্মের বশতাপন্ন হয় না এবং তদবস্থায় তাহার আর এ ভাবে জন্ম গ্রহণও করিতে হয় না। এ বিষয় আমরা বিশেষ অনুভব করিয়াই দেখিয়াছি।

শিখিধ্বজ কহিলেন,—হে বক্তৃবর! আপনি অতি উদার ও মহার্থময় কথাই কহিতেছেন। ইহা যুক্তিযুক্ত, নিগূঢ়ার্থ-ব্যাঞ্জক ও পরমার্থ-সম্পন্ন। হে সুন্দর! অদ্য আপনার এই বাগ্‌বিভূতি শ্রবণ করিয়া আমার অন্তর যেন সুধাপানে শীতল হইয়া উঠিল। যাহা হউক, অধুনা আপনার উৎপত্তি-বিবরণ কি প্রকার, তাহা সংক্ষেপতঃ আমার নিকট প্রকাশ করিয়া বলুন। তৎপশ্চাৎ আপনার এই জ্ঞানগর্ভ বাণী শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ করিব। সেই যে ব্রহ্মনন্দন নারদ মুনির কথা হইতেছিল; সেই মুনি কোথায় বীর্য্যপাত করিলেন, তাহার বিবরণ যথাযথ ব্যক্ত করুন।

চূড়ালা কহিলেন,—রাজন্! মুনিবর তখন আপনার মনোরূপ মত্ত মতঙ্গজকে শুদ্ধ বুদ্ধিরূপ রশ্মিযোগে বিবেকরূপ বিপুল আলানে বন্ধন করিয়া ফেলিলেন। তাঁহার পার্শ্বে একটা স্ফটিকময় উজ্জ্বলকান্তি কুম্ভ ছিল। পরে তিনি তাহারই মধ্যে সেই বীর্য্য স্থাপন করিলেন। তাহাতে মনে হইলে, যেন একটী চন্দ্রের উপর আর একটী চন্দ্র স্থাপিত হইল। তাঁহার সেই দ্রবময় বীর্য্য প্রলয়াগ্নি-তাপে গলিত বিধুর দ্রব-সন্নিভ। উহা যেন পারদাদি দিব্য রসসমূহের অনুরঞ্জন। এইরূপই তখন প্রতীত হইল। বিধাতা যেমন সঙ্কল্পময় সুধারাশি দিয়া সুধার সাগর পূরণ করেন, তেমনি সেই নারদ মুনি তখন সেই সুমেরু প্রদেশের ঊর্দ্ধভাগে স্বীয় সঙ্কল্পানুসারে বীর্য্যদ্বারা কুম্ভ পূরণ করিলেন। তদীয় বীর্য্যাধার সেই কুম্ভ চারিদিকে স্থূলাকার; তাহার মধ্যভাগ

অতি গভীর। ঐ কুম্ভ অতি দৃঢ়; উহার আঘাতে পাষাণও চূর্ণ হইতে পারে। মুনিবরের সেই বীর্য্য ঐ কুম্ভমধ্যেই গর্ভাকারে পরিণত হইয়া একমাসে বর্দ্ধিত হইল। মনে হইল, যেন সুধা-সমুদ্রগর্ভে সুধাময় চন্দ্র বা চন্দ্রপ্রতিবিম্ব প্রতিভাত হইল। মুনির মন সে গর্ভে স্নেহপ্রবণ হইয়া উঠিল। সুতরাং তৎকালে অগ্নিতে আহুতি দান প্রভৃতি কার্য্যে তাঁহার যত্ন শ্লথ হইয়া পড়িল। অনন্তর মাস যেমন পূর্ণ চন্দ্রকে প্রসব করে অথবা বসন্তকাল যেমন পুষ্প উৎপাদন করে, তেমনি সেই কুম্ভ কাল-ক্রমে একটী শিশু সন্তান প্রসব করিল। ঐ সন্তানের নয়ন কমলদলবৎ; উহা সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গে পরিপূর্ণ। ঐ শিশুটী কুম্ভগর্ভ হইতে নিস্ক্রান্ত হইলে মনে হইল, যেন সেই কুম্ভ-কোটর-গত অপর কোন ক্ষুদ্রাকার সাগর হইতে অন্য এক অক্ষয় পূর্ণচন্দ্রের প্রাদুর্ভাব হইল। অনন্তর সেই শিশু কিয়দ্দিনের মধ্যেই ক্রমশ বর্দ্ধিতকায় হইয়া শুক্লপক্ষীয় শশাঙ্ক সদৃশ অঙ্গসৌষ্ঠবে সুশোভিত হইয়া উঠিল। ক্রমে নারদ মুনি সেই শিশুর যথাবিধি সংস্কার করিলেন এবং এক পাত্র হইতে পাত্রান্তরে যেমন দ্রব্য স্থাপন করে, তেমনি তাহাতে বিদ্যাধন নিহিত করিলেন। ফল কথা, নিজের যে সকল বিদ্যা আয়ত্ত ছিল, তৎসমস্তই সেই শিশুকে তিনি অধ্যয়ন করাইলেন। মুনিবরের চেষ্টায় অল্প দিনের মধ্যেই সেই শিশু সর্ব্ববিদ্যায় সুপণ্ডিত হইয়া উঠিল। নারদমুনি তাহাকে যেন নিজের প্রতিবিম্ব করিয়া তুলিলেন। সন্ধ্যাকালে স্ফটিকাচলে সমুদিত নক্ষত্রপতি যেমন শোভিত হইয়া থাকেন, সেই পুত্রের সংসর্গে নারদ মুনিও তেমনি শোভা পাইতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি সেই পুত্র সমভিব্যাহারে ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। সেখানে গিয়া নারদ ব্রহ্মাকে নমস্কার করিলে, তাঁহার সেই পুত্রও যথারীতি ব্রহ্মাকে বন্দনা করিল। তখন সেই নারদ-নন্দন বেদাদি বিদ্যা কিরূপ অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাহা পরীক্ষা করিয়া ব্রহ্মা তাঁহাকে স্বীয় ক্রোড়ে স্থাপন করিলেন। অনন্তর কমলযোনি আশীর্ব্বাদ করিয়া তাঁহার সেই পৌত্রকে কুম্ভ নামে অভিহিত করিলেন। তাঁহার আশীর্ব্বাদেই তৎক্ষণাৎ সেই কুম্ভ সর্ব্বজ্ঞ ও জ্ঞানবিশারদ হইয়া উঠিলেন।

হে সাধো! আমিই সেই কুম্ভ; আমি কুম্ভ হইতে জন্মিয়াছি বলিয়াই আমার কুম্ভ নাম প্রথিত। মহামুনি নারদ আমার পিতা, আর নিখিল লোকপিতামহ ব্রহ্মা আমার পিতামহ। আমি পিতার সহিতই এ যাবৎ সেই ব্রহ্মপুরে সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিতেছি। চতুর্ব্বেদ আমার সুহৃৎ; তাহারা আমার ক্রীড়াসহচর। গায়ত্রী আমার মাতৃস্বসা; সরস্বতী আমার মাতা। আমি ব্রহ্মলোকেই বাস করি। ব্রহ্মার পৌত্র বলিয়া আমার সেখানে সুখের অভাব নাই। আমি ইচ্ছানুসারে এ জগতের সর্ব্বত্র বিচরণ করিয়া থাকি। জগতে বিহার করা আমার একটা লীলামাত্র। আমি পরিপূর্ণ, তাই কার্য্যতঃ আমার কোনই বিহার নাই। আমি এ মহীমণ্ডলে বিচরণ করিলেও ধরায় আমার পাদস্পর্শ হয় না। আমার অঙ্গসকল রজঃস্পর্শ করে না বা আমার দেহ কোন গ্লানিযুক্ত হয় না। অদ্য আমি আকাশপথে যাইতেছিলাম; সেই সময় আপনি আমার দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছিলেন। এই জন্য এ স্থানে অবতরণ করিয়া আপনাকে সমস্ত বিষয় বলিলাম।

হে বনবাসের গুণ, ফল ও চিত্তশুদ্ধির অভিজ্ঞ! আমি উল্লিখিত রূপে জন্মাদি লাভ করিয়া যেরূপে যে যে বিষয় অনুভব করিয়াছিলাম, তাহা আপনার প্রশ্নানুসারে, সমস্তই বর্ণন করিলাম। লোকে যাহারা কৃত প্রশ্নের সম্যক্ উত্তর প্রদানে সুনিপুণ, তথাবিধ সাধুগণ সাধুগণের জিজ্ঞাসিত বিষয়ের যথাযথ উত্তর প্রদান না করিয়া থাকিতে পারেন না।

বাল্মীকি কহিলেন,—ভরদ্বাজ! মুনিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ এই সকল কথা কহিতেছেন, ইত্যবসরে দিবা অবসান হইল। দিবাকর সায়ন্তন বিধি সমাধার জন্য অস্তাচলচুলা অবলম্বন করিলেন। সভাসদ্‌গণ পরস্পর পরস্পরকে অভিবাদনপূর্ব্বক সন্ধ্যাকালীন স্নানোপাসনাদি সম্পাদন করিবার জন্য স্ব স্ব আসন হইতে উত্থিত হইলেন। অনন্তর রাত্রি প্রভাতে পুনরায় সকলে সৌর কিরণের সঙ্গে সঙ্গে সভাগৃহে আসিয়া প্রবেশ করিলেন।

ষড়শীতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৮৬॥

সপ্তাশীতিতম সর্গ।

শিখিধ্বজ কহিলেন,—যেমন অলক্ষ্যগতি প্রবল বায়ুবেগে পর্ব্বতোপরি মেঘবৃন্দ পরিচালিত হয়, আমি মনে করি—আপনিও সেইরূপে মদীয় পুণ্যপুঞ্জ বলেই এ স্থানে উপনীত হইয়াছেন। হে সাধো! ভবদীয় প্রত্যেক বাক্যে সুধার ধারা ক্ষরিত হইতেছে। আপনার সহিত মিলিত হইয়া অদ্য আমি প্রকৃতই ধন্য ব্যক্তিগণের অগ্রগণ্য হইয়াছি। সাধুসমাগমে অন্তর যেমন শীতল হয়, রাজ্য-লোভাদি কোন ভাবই চিত্তকে আমার তেমন শীতল করিতে পারে না। যে সাধুসমাগমে অনন্ত ব্রহ্মানন্দ-রসও সূক্ষ্মাত্মাকারে বিজৃম্ভিত হয়, তাহাতে বিষয়সুখের কল্পনা তো কেবল তুচ্ছ কল্পনামাত্র।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—ভূপতি শিখিধ্বজ এইরূপ বলিতে আরম্ভ করিলে মুনিকুমার-বেশিনী চূড়ালা তদীয় কথায় বাধা প্রদান করিয়াই কহিতে লাগিলেন। চূড়ালা কহিলেন,—এক্ষণে আপনার এই বিবক্ষিত বিষয় হইতে আপনি ক্ষান্ত হউন। হে সাধো! আপনার জিজ্ঞাসিত সকল বিষয়ই আমি বর্ণন করিয়াছি, অধুনা আপনি বলুন,—কে আপনি? এ পর্ব্বতে আপনার কার্য্য কি?" এবং কত দিনই বা আপনি এ ভাবে এই বনবাসে অতিবাহিত করিবেন? তপস্বী লোকেরা সত্য কথাই কহিয়া থাকেন; মিথ্যা কথা তাঁহাদের সম্পূর্ণই অবিদিত; সুতরাং আমি ভরসা করি, আপনার এই বনবাসের উদ্দেশ্য আপনি আমার নিকট সত্য করিয়াই ব্যক্ত করিবেন।

শিখিধ্বজ কহিলেন,—আপনি দেবকুমার; কোন লোকবৃত্তান্তই আপনার অবিদিত নাই। আপনি সমস্ত রহস্যই যথাযথ জানিতে পারিতে-

ছেন ; সুতরাং ভবৎসমীপে আমি এ সম্বন্ধে আর অধিক কি কহিব ? অথবা আপনি সকল বিষয় বিদিত থাকিলেও সংক্ষেপে আমার বৃত্তান্ত আপনার নিকট বর্ণন করিতেছি। মহাশয়! আমি সংসারভয়ে ভীত হইয়া এই বনমধ্যে বাস করিতেছি। আমি শিখিধ্বজ নামে রাজা ছিলাম ; রাজ্যৈশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া অধুনা এখানে অবস্থান করিতেছি। হে তত্ত্বজ্ঞ! এ সংসারে পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করিতে হইবে, সেই ভাবনায় আমি একান্তই ভীত হইয়াছি। সংসারে থাকিলে বারম্বার সুখ-দুঃখ, জন্ম-মরণ ঘটিয়া থাকে। এই জন্য আমি এই বনবীথি আশ্রয় করিয়া তপস্যা করিতেছি। কিন্তু দরিদ্র যেমন নিধিলাভে সক্ষম হয় না, তেমনি আমি দিগ্‌দিগন্তে ভ্রমণ করিয়া এবং কঠোর তপস্যা আচরণ করিয়াও একমাত্র বিশ্রান্তি লাভ করিতে পারিতেছি না। হে সাধো! আমার সমুদায় যত্ন বিফল হইয়া যাইতেছে। আমি অসহায় হইয়া পড়িয়াছি। পূর্ণতা লাভে সক্ষম হইতেছি না। পূর্ব্বে রাজত্ব করিবার কালে আমি যে সকল সাধু-সঙ্গ লাভ করিতে পারিতাম, এখানে আমার তাহাও রহিত হইয়াছে। আমি কোন ফলই পাইতেছি না। এই বনমধ্যে থাকিয়া ঘুণক্ষত বৃক্ষের ন্যায় আমি শুষ্ক হইয়া যাইতেছি। সম্যক্‌রূপে তপস্যাচরণ করিলেও নিরন্তর কেবল দুঃখের উপর দুঃখরাশি আসিয়া আমায় আকুল করিয়া তুলিতেছে। ভাগ্যগুণে অমৃত যেন আমার নিকট বিষে পরিণত হইয়াছে।

চূড়ালা কহিলেন,—আমি এ সম্বন্ধে একদা পিতামহ ব্রহ্মার নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, আমার জিজ্ঞাসিত বিষয় এই ছিল যে,—প্রভো! জ্ঞান ও কর্ম্ম, এ উভয়ের মধ্যে কোন্‌টী উত্তম, তাহা আমাকে বলুন। পিতামহ তৎশ্রবণে বলিয়াছিলেন,—বৎস! উক্ত উভয়ের মধ্যে জ্ঞানই পরম মঙ্গলকর। কেন না, জ্ঞান জন্মিলেই নিশ্চয় কৈবল্যসিদ্ধি ঘটিয়া থাকে। ক্রিয়া কেবল কাল কাটাইয়া দেয় এবং উহা স্বর্গাদি ফল প্রদান করিয়া চিত্তবিনোদন করে মাত্র। হে পুত্র! যাহারা জ্ঞানদৃষ্টি লাভে অক্ষম, ক্রিয়া কেবল তাহাদেরই জন্য নির্দ্দিষ্ট ; তাহারাই ক্রিয়ার আশ্রয় লয়। ফলে যাহার পট্টবস্ত্রের অভাব আছে, সে কি কম্বল

পরিত্যাগ করিয়া থাকে ? অজ্ঞ লোকের বাসনাই সার, তাই তাহাদের ক্রিয়াফল লাভ হয়। যিনি তত্ত্বজ্ঞ, তাঁহার বাসনার লেশমাত্র নাই। সুতরাং সমস্ত ক্রিয়াই তাঁহার নিকট নিষ্ফল হইয়া পড়ে। যেমন অশুভ লতা ফলবতী হইলেও জলসেকের অভাবে ফলহীন হইয়া যায়, তেমনি সকল ক্রিয়াই বাসনার অবসানে নিষ্ফল হইয়া থাকে। যেমন পরবর্ত্তী ঋতুর সমাগমে বর্ত্তমান ঋতুর কোনই চিহ্ন থাকে না, তেমনি বাসনার ক্ষয় হইয়া গেলে ক্রিয়া-ফলেরও সম্পূর্ণ বিলয় ঘটে। হে পুত্র ! বাসনা বর্জ্জিত-ক্রিয়া শরলতার ন্যায় স্বভাবতই নিষ্ফলা। তাহার ফল কোন কালেই ফলে না। যে বালক যক্ষ-ভাবনা করে, তাহারই যক্ষ দর্শন হয়। এইরূপ দুঃখবাসনাগ্রস্ত মূঢ় ব্যক্তিই দুঃখ দর্শন করে। শরলতা ফুল্ল হইয়াও যেমন ফল প্রসব করে না, তেমনি তত্ত্বজ্ঞের নিকট বহ্বারম্ভ শুভ বা অশুভ ক্রিয়াও ফলবতী হয় না। যে বাসনা অজ্ঞদশায় অহঙ্কারাদিরূপে প্রতীয়মান হয়, তখন তাহাও বস্তুতঃ থাকে না। মূঢ়তা বশতঃ মরুস্থলী মধ্যে মহাজলাশয়ের উদয়ের সম্ভাবনার ন্যায় ঐ বাসনা মিথ্যাই সমুদিত হইয়া থাকে। 'সমস্তই ব্রহ্ম' এই ভাবনা করিতে করিতে মূর্খতা যাহার ক্ষয় পাইয়া গিয়াছে, তাহার আর বাসনার উদয় হয় না। ফলতঃ যে ব্যক্তি মরুপ্রদেশ বলিয়া বুঝিতে পারে, তাহার কি আর তাহাতে জলাশয় জ্ঞান হয় ? জীব যদি বাসনারে বর্জ্জন করিতে পারে, তাহা হইলেই জরামরণহীন অক্ষয় পদে তাহার স্থান হয় ; তাহাকে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। সবাসন মনই জ্ঞেয় আর যাহা বাসনাবিহীন মন, তাহাই জ্ঞানশব্দের অভিধেয়। ঐ জ্ঞান দ্বারা যদি জ্ঞেয় পদ লাভ করা যায়, তাহা হইলে জীবকে আর কখনই জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না। চূড়ালা আবার কহিলেন,—হে রাজর্ষে ! ব্রহ্মাদি মহাপুরুষেরাও জ্ঞানকেই পরম মঙ্গল বস্তু বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন ; সুতরাং আপনি কেন অজ্ঞানবান্ হইয়া অবস্থান করিতেছেন ? রাজন্ ! এই যে দেখিতেছি, আপনার আশ্রমে এখানে কমণ্ডলু, ওখানে দণ্ড, ঐ আপনার আসন রহিয়াছে, এ সকলই তো অনর্থবিলাস ; হে মহীপতে ! আপনি এ সমুদায়ের প্রতি অনুরক্তি দেখাইতেছেন কেন ? আমি কে ? এ জগৎ কোথা হইতে আসিল ? কিরূপে কোথাই বা ইহার লয় হয় ? আপনি এ সকল

বিচার করিতেছেন না কেন? কেন আপনি অজ্ঞ জনের ন্যায় অবস্থান করিতেছেন? রাজন্! পরাবরদর্শী তত্ত্ববেদিগণের পদানুসরণপূর্ব্বক কিরূপে বন্ধ-মোক্ষ সংঘটিত হয়, তাহা আপনি জিজ্ঞাসা করিতেছেন না কেন? এই গিরিগুহার গহ্বরে কেন আপনি অনর্থক তপস্যার ক্লেশ ভোগ করিতে করিতে জীবন কাটাইয়া কীটবৎ বিরাজ করিতেছেন? সমদর্শী সাধুগণের সঙ্গ করিতে হয়, সাধুসেবায় কাল কাটাইতে হয়; সাধুজনের নিকট পরমার্থ-বিষয়ক প্রশ্ন করিতে হয়, তাঁহারা সেই বিষয়ের মীমাংসা করিয়া সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া দিলে যে বিচারযুক্তি লাভ হয়, তাহাতেই মোক্ষ লাভ ঘটিয়া থাকে। অতএব আপনাকে এই উপদেশ প্রদান করিতেছি যে, এই তপস্যাদি বহির্ম্মুখী দুশ্চেষ্টা আপনি পরিত্যাগ করুন এবং বনবাসী কোন না কোন সাধুর সঙ্গে বাস করিয়া ভূগর্ভস্থ কীটবৎ নিশ্চলভাবে অবস্থান করিতে থাকুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাজা শিখিধ্বজ সেই দেবরূপিণী রমণীর নিকট ঐরূপে প্রবোধ প্রাপ্ত হইয়া অশ্রু-ক্লিন্ন-বদনে বলিতে লাগিলেন,—হে দেবনন্দন! আমি আপনার প্রসাদে অদ্য বহুদিনের পর প্রবুদ্ধ হইলাম। আমি মূর্খ; তাই এতদিন সাধুসঙ্গ না করিয়া একাকী বনে আসিয়া বাস করিতেছি। কি অপূর্ব্ব ঘটনা! অদ্য আমার সর্ব্ব পাপ বিদূরিত হইয়া গেল। আপনি আজ আমায় প্রবোধ প্রদান করিলেন। হে সৌম্যবদন! আপনি আমার গুরু, পিতা ও মিত্র; আমি আপনার শিষ্য; ভবৎপদযুগলে আমি নমস্কার করি। আমার প্রতি আপনি কৃপা বর্ষণ করুন। যাহাকে আপনি পরম উদারতম বলিয়া বিদিত আছেন, যাঁহাকে জানিলে আর শোক করিতে হয় না, এবং যাঁহা পাইয়া আমি পরম শান্তি লাভ করিতে পারি, আমাকে আপনি সেই ব্রহ্মের বিষয় উপদেশ প্রদান করুন। ঘটজ্ঞান, পটজ্ঞান ইত্যাদি করিয়া জ্ঞানের বিভাগ অনেক আছে। এই সকল জ্ঞানের মধ্যে সংসার-তারক পরম জ্ঞান কি?

চূড়ালা কহিলেন,—রাজর্ষে! যদি আমার বাক্য আপনার নিকট উপাদেয় বলিয়া বোধ হইয়া থাকে, তবে আমার জ্ঞানানুসারে আমি বলিতেছি। অশ্রদ্ধাশীল শ্রোতার নিকট, স্থাণুসম্মুখে কাকের ন্যায়

বৃথা বাক্যব্যয় আমি কখনই করি না। যাহার নিকট বক্তার বাক্য উপাদেয় বলিয়া বোধ হয় না, হেলার সহিত যে ব্যক্তি বক্তাকে জিজ্ঞাসা মাত্র করে, তাহার নিকট কোন কিছু বলা আর অন্ধকারে চক্ষুরুন্মীলন করা উভয়ই সমান হইয়া থাকে; সুতরাং তাদৃশ অশ্রদ্দধান ব্যক্তির নিকট কোন কিছু সাধুকথা না বলাই উচিত।

শিখিধ্বজ কহিলেন,—মহাপুরুষ! আপনি যে কথাই বলিতেছেন, সমস্তই আমি বিনা বিচারে বেদবাক্যের ন্যায় উপাদেয় বলিয়া বোধ করিতেছি। আমার এ কথা সম্পূর্ণ সত্য।

চূড়ালা কহিলেন,—পিতৃভক্ত পুত্র যেমন কোনরূপ কারণানুসন্ধান না করিয়াই পিতৃবাক্য গ্রহণ করিতে থাকে, তুমি তেমনি আমার কথিত কথাগুলি কোন প্রকার হেতু বা উপাদানের অনুসন্ধান না করিয়াই শুনিয়া যাও। অর্থাৎ আমি যাহা বলি, বিনা বাক্যব্যয়ে তাহা শ্রবণ করিতে থাক। পরে ইহাই শুভ বলিয়া ভাবনা কর; এবং শ্রুতিমধুর গীতিকার ন্যায় মদীয় কথা প্রীতির সহিত শ্রবণ করিয়া যাও। আমি তোমার নিকট এক উত্তম বিষয় বর্ণন করিতেছি। এইরূপ উপদেশ প্রাপ্ত হইলে অদ্য বহুকালের পর ভবদীয় উদয়োন্মুখী বুদ্ধির বিকাশ হইবে। যাহা শ্রবণে মহামতিগণ সদ্যই ভবভয় হইতে উদ্ধার পাইতে পারেন, আমি এক্ষণে সেই মনোহর কথার অবতারণা করিতেছি, শ্রবণ কর।

সপ্তাশীতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৮৭ ॥

অষ্টাশীতিতম সর্গ।

চূড়ালা কহিলেন,—কোন এক দেশে জনৈক শ্রীমান্ পুরুষ বাস করেন। জল ও বাড়বানল পরস্পর-বিরোধী; সাগর যেমন ঐ দুই বিরোধী পদার্থের ভাজন, তেমনি সেই শ্রীমান্ পুরুষ নিত্য বিরুদ্ধ ঔদার্য্য-বৈরাগ্য প্রভৃতি গুণ ও লক্ষ্মীর নিকেতন। তিনি অস্ত্রবিদ্যায় কুশল,

চতুঃষষ্টি কলায় সুনিপুণ এবং ব্যবহারবিষয়ে বিচক্ষণ। ঐ পুরুষ সর্ব্ব-সঙ্কল্পের প্রান্ত সীমায় উপনীত হইলেও ব্রহ্মপদ লাভে সক্ষম হন নাই। বাড়বাগ্নি যেমন সাগরশোষণে তৎপর, তেমনি তিনি অশেষ যত্নসাধ্য চিন্তা-মণি-সাধনায় ব্যাপৃত। অনেক কাল অতীত হইল। সেই পুরুষ বহু অধ্যবসায় করিলেন। তাঁহার অসীম অধ্যবসায়ের ফলে চিন্তামণি সিদ্ধ হইল। বস্তুতঃ যাঁহারা অতি বড় অধ্যবসায়শীল, তাঁহাদের কোন্ সিদ্ধিই বা না করায়ত্ত হইয়া থাকে? আরও দেখা যায়, যাহার সহায়সম্পদ্ কিছুই নাই, সে যদি বুদ্ধিপূর্ব্বক নিরলসভাবে নিরন্তর চেষ্টা বা যত্ন করিতে থাকে, তবে তাহারও কার্য্যসিদ্ধি অবাধে হইতে পারে। যাহা হউক, উদয়াদ্রির শিখিরস্থিত ব্যক্তি যেমন সেই স্থানোদিত চন্দ্রকেও দূরস্থ বলিয়া মনে করে, তেমনি সেই পুরুষ সম্মুখে চিন্তামণি লাভ করিয়াও তাহাকে দুষ্প্রাপ্য বলিয়া ধারণা করিল। যেমন অতি দীন দরিদ্র ব্যক্তি হঠাৎ রাজ্যলাভ করিলেও সহসা সেই রাজ্য-লাভে প্রত্যয় করিতে প্রস্তুত হয় না, তেমনি সেই পুরুষ নিখিল মণির মধ্যে শ্রেষ্ঠতম মণি সেই চিন্তামণিকে লাভ করিয়াও 'পাইলাম' বলিয়া নিশ্চয় করিতে পারিল না। সে, সেই সম্মুখাগত মহামণির প্রতি উপেক্ষা দেখাইয়া অতি দুঃখে অথচ কেমন এক প্রকার বিস্ময়ের ভাবে বিভোর হইয়া ভাবিতে লাগিল,—এই কি মণি? না—এ তো মণি নয়; যদি ইহা মণিই হইবে, তবে ইহা আমার নয়নগোচর হইবে কেন? আচ্ছা, এ মণি একবার আমি স্পর্শ করিয়া দেখি, না—ইহা স্পর্শ করা হইবে না; কেন না, এ হতভাগ্য স্পর্শ করিলে, হয় তো ইহা পলাইয়া যাইবে। আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, এত অল্প কালের মধ্যে কখনই এরূপ মহামণির সিদ্ধি-লাভ সম্ভবপর নহে। কেন না, শাস্ত্রবাক্যে উল্লিখিত আছে যে, জীবনান্ত চেষ্টা করিলেই তবে এই প্রকার মহামণির সিদ্ধি হওয়া সম্ভব হইতে পারে। আমি অতি দরিদ্র কি না? তাই ভ্রমাচ্ছন্ন-নয়নে আমি এই অঙ্গার-লতা-সদৃশী রত্নপ্রভা দ্বিচন্দ্রাকারে দর্শন করিতেছি। আমার ঈষৎপরিমাণ ভাগ্যলক্ষ্মী কোথা হইতে সহসা অতি স্ফীত হইয়া উঠিবে যে, এই মুহূর্ত্তেই আমি এমন মহাসিদ্ধি-জনক মহামণি লাভ করিতে পারিব? অল্প কাল মধ্যেই যাঁহাদের ভাগ্যলক্ষ্মী সম্মুখীন হইয়া থাকে,

তাদৃশ সৌভাগ্য-সম্পন্ন মহাপুরুষ এ জগতে অতি বিরল। আমি অল্প-ভাগ্য ও অল্প তপস্যাযুক্ত; বলিতে কি, সমস্ত দুর্ভাগ্যেরই আমি নিকেতন। মাদৃশ ক্ষুদ্র ব্যক্তির এইরূপ সিদ্ধিসম্ভাবনা কোথায়?

সেই মূঢ় পুরুষ এই প্রকার নানা তর্কবিতর্ক করিয়া সময় কাটাইল এবং স্বীয় মূর্খতাবশে সেই মণি গ্রহণে কিছুমাত্র প্রয়াস করিল না। বস্তুতঃ যাহার ভাগ্যে যাহা নাই, তাহার পক্ষে তাহা লাভ করা কোন ক্রমেই সম্ভব হইয়া উঠে না। এই জন্যই সেই দুর্বোধ ব্যক্তি সম্মুখে চিন্তামণি প্রাপ্ত হইয়াও হেলায় হারাইয়া ফেলিল।

এইরূপে বুদ্ধিহারা হইয়া সেই পুরুষ নিজের ভ্রান্ত সিদ্ধান্তে স্থির হইয়া রহিলে, সেই সম্মুখাগত মহামণি কোথায় উড়িয়া গেল! বস্তুতঃ যে অবজ্ঞা বা উপেক্ষা করে, সিদ্ধিসমূহ তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া থাকে। শর যেমন শিঞ্জিনী পরিত্যাগ করে, সিদ্ধি সকল তেমনি তাদৃশ অবজ্ঞা-কারীকে পরিত্যাগ করিয়া যায়। সিদ্ধি সকল যখন চলিয়া যাইতে উদ্যত হয়, তখন মানবের বুদ্ধি শুদ্ধি বিনষ্ট করিয়াই চলিয়া যায়। আবার সিদ্ধি যখন যে শ্রদ্ধাশীল পুরুষের নিকট আগমন করে, তখন তাহার বুদ্ধিশুদ্ধি সকলই সে আনিয়া দেয়। যাহা হউক, সিদ্ধি চলিয়া গেলে আবার সে পুরুষ মহামণি লাভের জন্য যত্ন করিতে লাগিল। বস্তুতঃ যাহারা অধ্যবসায়শালী লোক, তাহারা কখনই স্বীয় কার্য্যসাধনে ক্লেশানুভব করে না, বারম্বার মনো-রথ বিফল হইলেও চেষ্টা করিতে থাকে। যাহা হউক, এইবার সেই পুরুষ অধ্যবসায়ের ফলে সম্মুখে দেখিল—একটী অখণ্ড উজ্জ্বল কাচমণি বিদ্যমান। কতকগুলি পরিহাস-রসিক প্রতারক লোক পূর্ব্ব হইতেই অজ্ঞাতসারে সেই কাচখণ্ড তৎসম্মুখে রাখিয়া দিয়াছিল। সেই পুরুষ আপনার মূর্খতা-বশতঃ ঐ কাচখণ্ডকেই চিন্তামণিবোধে উপাদেয় বলিয়া বুঝিল। অজ্ঞ-লোকের ধারণা বাস্তবিকই বিপরীত। তাহারা মোহের ঘোরে মৃত্তিকা-খণ্ডকেও স্থানভেদে সুবর্ণ বলিয়া বুঝিয়া লয়। মোহের মাহাত্ম্য এতই যে, মোহাচ্ছন্ন লোক অষ্ট সংখ্যাকে ষট্ সংখ্যা, শত্রুকে মিত্র, রজ্জুকে ভুজঙ্গ, স্থলকে জল, পীযূষকে বিষ এবং চন্দ্রকেও দ্বিত্ববিশিষ্ট বলিয়া বুঝিয়া থাকে। যাহা হউক, সেই পুরুষ তখন সেই কাচখণ্ড করায়ত্ত করিয়া

নিজের পূর্ব্বে যে কিছু ঐশ্বর্য্য ছিল, সমস্তই হারাইল, সে বুঝিয়া লইল—এই যে চিন্তামণি প্রাপ্ত হইলাম, ইহা হইতেই আমি সমস্ত ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইব। অতএব অপর ধনাদি দ্বারা আমার আর কোন্ প্রয়োজন সাধিত হইবে? এ দেশ কেবল পাপী জন-বহুল; ইহা অসুখের আকর এবং কর্কশ। এ দেশে আমার প্রয়োজন কি? আমার গৃহ ত প্রায় গিয়াছে; বন্ধু বান্ধবও তো গতপ্রায়, তবে আর সে সকল দিয়া আমার প্রয়োজন কি আছে? আমি এখন কোন দূরদেশে গিয়া এই মণিবরের সহায়তায় প্রচুর সম্পদ্ উপার্জ্জন করি, আর নিজের ইচ্ছানুসারে সুখে কাল কাটাইতে থাকি।

এইরূপ স্থির করিয়া সেই মূঢ় পুরুষ সেই কাচমণি গ্রহণপূর্ব্বক কোন এক বিজন বনে গিয়া উপস্থিত হইল। অনন্তর কিয়ৎকাল অতীত হইলে তাহার স্বীয় মূর্খতার ফলে কজ্জলপর্ব্বতবৎ অতি মলিন ঘোর বিপদ আসিয়া তাহাকে আক্রমণ করিল; বস্তুতঃ মূর্খতার প্রভাবে যাদৃশ ক্লেশ জন্মিয়া থাকে, জরা কিম্বা মরণেও তেমন ক্লেশ ঘটে না। শিরোগত কেশকলাপবৎ মলিনীভূত মূর্খতা সর্ব্বাপদেরই মস্তকোপরি বিরাজিত।

অষ্টাশীতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৮৮ ॥

ঊননবতিতম সর্গ।

চূড়ালা কহিলেন—হে ভূপতে! অনন্তর অপর এক রম্য বৃত্তান্ত শ্রবণ করুন। হে সাধো! এই বৃত্তান্ত ভবদীয় বুদ্ধিবিকাসের পরম উপায়। বিন্ধ্যারণ্যে এক হস্তী আছে। ঐ হস্তী মহাযূথপতিদিগেরও যূথপতি। উহাকে দেখিলে প্রতীতি হয়, যেন অগস্ত্য মুনির প্রসাদে বিন্ধ্যাদ্রি স্বয়ং ঐ মহতী হস্তিমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। উহার দুইটী দশন; দশন দুইটী শুভ্র ও অতিদীর্ঘ। উহা সুমেরু গিরিকেও উৎপাটন করিতে সক্ষম; ঐ দশনদ্বয় বজ্রাগ্নি-শিখা অথবা প্রলয়ের কালাগ্নি সদৃশ

অতি ভীষণ। পূর্ব্বে মুনিবর অগস্ত্য যেমন বিন্ধ্যগিরিকে আবদ্ধ রাখিয়াছিলেন এবং উপেন্দ্র যেমন বলিকে বন্ধন করিয়াছিলেন, তেমনি সেই বিশালমূর্ত্তি হস্তীকে হস্তিপক লৌহশৃঙ্খলে সুদৃঢ়রূপে আবদ্ধ রাখিয়াছিল। সেই শৃঙ্গলাবদ্ধ হস্তী হস্তিপকের অঙ্কুশাঘাতে সদাই পীড়িত হইয়া নিতান্ত যন্ত্রণা প্রাপ্ত হয়। পূর্ব্বে ত্রিপুর যেমন হর-শরানলে ব্যথিত হইয়াছিল, তেমনি সেই হস্তী অঙ্কুশের তাড়নায় একান্তই ব্যথিত হইত। ঐ অবস্থায় হস্তী তিন দিন যাবৎ হস্তিপকের দৃষ্টির অগোচরে অবস্থান করিল। হস্তী বন্ধনক্লেশে বড়ই ক্লিষ্ট হইয়াছিল; সেই জন্য সে সেই অবকাশে তাহার পাদশৃঙ্খল ছেদন করিবার জন্য চেষ্টিত হইয়া বদন-সঞ্চালনে কিঙ্কিণীধ্বনি করিতে লাগিল। এইরূপ করিতে করিতে একদিন ঐ হস্তী মুহূর্ত্তদ্বয়ের মধ্যে তাহার সেই বিশাল দন্তযুগ দ্বারা সযত্নে শৃঙ্খলজাল ভগ্ন করিয়া ফেলিল। হস্তিপক দূর হইতে হস্তীর সেই নিগড়চ্ছেদনব্যাপার অবলোকন করিল; মনে হইল, হরি যেন মেরুশিখর হইতে বলি কর্ত্তৃক স্বর্গ-দলন-কার্য্য দেখিতে লাগিলেন। অনন্তর হরি যেমন বল্লির মস্তকোপরি পতিত হইয়াছিলেন, তেমনি সেই হস্তিপক এক তালতরুর উপর আরোহণপূর্ব্বক লম্ফ প্রদান করিয়া সেই হস্তীর মস্তকে পতিত হইল। কিন্তু ঘটনাক্রমে সেই হস্তিপক হস্তীর মস্তকের উপর পতিত না হইয়া বাতাহত পক্ক তালফলবৎ ব্যাকুলভাবে ভূতলে পড়িয়া গেল। তাহাকে তদবস্থায় পতিত দেখিয়া হস্তীর দয়া হইল। বস্তুতঃ তির্য্যগ্ জাতির মধ্যেও প্রকৃত সদ্গুণশালী সাধু পুরুষের অভাব হয় না। হস্তী ভাবিল,—পতিত ব্যক্তিকে পদদলিত করায় আমার পৌরুষ কিছুই নাই। এই ভাবিয়া হস্তী, শত্রু হইলেও সেই হস্তিপককে প্রাণে মারিল না; সে কেবল নিগড়ব্যূহ ভেদ করিয়া ধাবিত হইল। মনে হইল, জলরাশি যেন বৃহৎ সেতু ভঙ্গ করিয়া ছুটিয়া চলিল। সূর্য্য যেমন গগনের মেঘবৃন্দ ভেদ করিয়া গমন করেন, তেমনি সেই হস্তী নিগড়বন্ধন ছেদন করিয়া দয়ার্দ্রভাবে প্রস্থান করিল। গজরাজ গমন করিলে সেই পতিত হস্তিপকের দেহ সুস্থ ও মন স্থির হইল। কিঞ্চিৎ পরে হস্তিপক গাত্রোত্থান করিল। তাহার দেহের ও মনের ব্যথা গজরাজের সঙ্গে সঙ্গে

চলিয়া গেল। হস্তিপক একটা উন্নত তরু হইতে পতিত হইয়াছিল, তথাচ তাহার দেহ ভগ্ন হইল না; বস্তুতঃ দুরাত্মাদিগের দেহ এমনই দুর্ভেদ্য বটে! প্রাবৃট্ কালের প্রারম্ভে মেঘবৃন্দ যেমন উত্তরোত্তর উপচিত হয়, তেমনি কুকর্ম্মফলেই অসাধুদিগের বল বৃদ্ধি হইয়া থাকে। যাহা হউক, সেই হস্তিপক তখন তাদৃশ গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হইয়াও হস্তীকে ধরিয়া আনিবার জন্য গমনে অধিকতর উৎসাহিত হইল। কিন্তু তাহার সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়া গেল। হস্তী তাহার অভিমত দিকে প্রস্থান করিল।

অনন্তর লব্ধ নিধি হারাইয়া গেলে ধনাঢ্য ব্যক্তি যেমন দুঃখিত হয়, তেমনি সেই গজরিপু হস্তিপক হস্তীকে না পাইয়া বড়ই দুঃখিত হইল। রাহু যেমন মেঘান্তরিত সুধাকরকে গ্রাস করিবার নিমিত্ত অন্বেষণ করে, তেমনি সেই হস্তিপক তখন তথাকার বনমধ্যে গজরাজের অনুসন্ধান করিতে লাগিল। বহু কাল অনুসন্ধান করিল। অবশেষে একটা অরণ্যের মধ্যে সেই হস্তীকে সে দেখিতে পাইল। হস্তীকে দেখিয়া মনে হইল, সে যেন সংসারক্ষেত্র হইতে অবসর লইয়া তরুতলে বিশ্রাম করিতেছে। অনন্তর গজের সেই বিশ্রামস্থানের চারিদিকে হস্তিপক অন্যান্য লোকের সাহায্যে গজবন্ধনোপযোগী সামগ্রী-সম্ভার আনয়নপূর্ব্বক তদীয় বন্ধন জন্য একটা খাত খনন করিল। তদ্দর্শনে মনে হইল, বিধাতার কর্ত্তৃত্বে ভুবলয়ের চতুর্দ্দিকে যেন সমুদ্রখাত খনিত হইল। ধূর্ত্ত হস্তিপক খাতের উপরিভাগ নূতন লতাপাতা দিয়া ঢাকিয়া রাখিল। সে দৃশ্য দেখিয়া মনে হইল, শরৎ যেন শূন্যতাময় সূত্রজালে অম্বরতল ঢাকিল। পরে কিয়দ্দিন অতীত হইলে, সেই হস্তী বনে বিচরণ করিতে করিতে হঠাৎ একদিন সেই লতাচ্ছন্ন খাতে পতিত হইল। বোধ হইল, শুষ্ক সাগরে যেন একটা পর্ব্বত পড়িয়া গেল। হস্তিপক যে খাত খনন করিয়াছিল, উহা পাতালপ্রদেশের ন্যায় ভীষণ; দেখিতে যেন একটা শুষ্ক সাগর। হস্তী সেই খাতমধ্যে পতিত হইয়া হস্তিপকের শৃঙ্খলে পুনরায় আবদ্ধ হইল। এখন দেখুন,—হস্তী যদি পূর্ব্বেই তাহার শত্রুকে পদপীড়নে মারিয়া ফেলিত, তাহা হইলে আর এরূপ ক্লেশ প্রাপ্ত হইত না। বস্তুতঃ

যে মানব ঐ বিন্ধ্যগিরিবাসী গজের ন্যায় নিজের মূর্খতায় সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াও ভাবী বিপদের প্রতিকার সাধন না করে, তাহার এইরূপই দুঃখ হইয়া থাকে। ঐ বারণরাজ প্রথমে বন্ধনমুক্ত হইয়া ভাবিয়াছিল,—আমি নিগড় হইতে মুক্ত হইয়াছি। আমার আর কোনই ভাবনা নাই। এই ভাবিয়া সে তুষ্ট হইয়াছিল। এইরূপে তুষ্টির সীমায় গিয়াছিল বলিয়াই আবার তাহাকে বন্ধনদশায় পতিত হইতে হইল। হস্তী দূরস্থ হইয়াও বন্ধন হইতে মুক্তি পাইতে পারে নাই। অতএব দেখা যায়, মূর্খতা কোথায় না অনিষ্ট উৎপাদন করিয়া থাকে ?

হে মহাত্মন্! আপনি বাস্তবিক বদ্ধ নহেন; তথাচ যে 'আমি বদ্ধ' এইরূপ ভাবিতেছেন, এই ভাবনা মূর্খতা। এই মূর্খতাই বিষম বন্ধন। তাই বলিতেছি, আপনি এরূপ মূর্খতাকে পরিত্যাগ করুন এবং মুক্তি লাভের জন্য জানিয়া রাখুন যে, এই ত্রিজগৎই বন্ধন-কারণ; ইহা আত্মা হইতেই উৎপন্ন এবং ইহা আত্মা ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। এইরূপ ধারণা যখন বলবতী হইবে, তখন একমাত্র আত্মাই অবশিষ্ট বলিয়া অনুভূত হইবেন। আত্মা তখন আর বদ্ধ রহিবেন না। তিনি মুক্ত হইবেন। অন্যথা যদি ঐরূপ মূর্খতাজালে জড়িত থাকেন, তবে তিনিই আবার নিখিল দুঃখের উদ্ভবভূমি হইয়া উঠিবেন।

উননবতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৮৯ ॥

নবতিতম সর্গ।

শিখিধ্বজ কহিলেন,—হে দেবনন্দন! আপনি মণিসাধক পণ্ডিত পুরুষ ও বিন্ধ্যগিরিবাসী হস্তীর উপাখ্যান বর্ণন করিয়া মদীয় জ্ঞানলাভের যে উপায় প্রকটন করিয়াছেন, তাহা পুনর্ব্বার বিস্তারক্রমে কীর্ত্তন করুন।

চূড়ালা কহিলেন,—মহারাজ! আপনার হৃদয়রূপ গৃহের চিত্তরূপ ভিত্তিতে আমি যে কথারূপ চিত্র অঙ্কন করিয়াছি, অধুনা সে চিত্র বিচিত্র ব্যাখ্যারূপ বর্ণযোগে আরও অধিক প্রস্ফুট করিয়া তুলিতেছি; আপনি শুনিতে থাকুন। প্রথমে আমি যে রত্নসাধকের কথা কহিয়াছি, যিনি শাস্ত্রজ্ঞানে সুপণ্ডিত অথচ তত্ত্বজ্ঞান-লাভে অক্ষম, হে মহারাজ! জানিবেন—আপনিই সেই রত্ন-সাধক। রবি যেমন মেরুগিরির সংস্থান বিষয়ে অভিজ্ঞ, আপনিও তেমনি সমগ্র শাস্ত্রতত্ত্বে সুপণ্ডিত। পরন্তু সলিলে যেমন শিলা বিশ্রান্ত হয় না, তেমনি তত্ত্বজ্ঞানে আপনি বিশ্রাম লাভ করিতে পারেন নাই। হে সাধু পুরুষ! আপনার সেই অকৃত্রিম সর্ব্বত্যাগকেই আপনি চিন্তামণি বলিয়া জানিবেন। চিন্তামণি নিখিল দুঃখের অন্ত-কারক, আর ঐ সর্ব্বত্যাগও সর্ব্বদুঃখের বিনাশক। আপনি বিশুদ্ধ বুদ্ধির যোগে ঐ সর্ব্বদুঃখহর সর্ব্বত্যাগরূপ চিন্তামণির সাধনায় তৎপর রহিয়াছেন। হে পবিত্র! যদি বিশুদ্ধভাবে সর্ব্বত্যাগ করিতে পারা যায়, তবে সমস্তই লব্ধ হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য, সর্ব্বত্যাগই উত্তম সাম্রাজ্য; ঐ চিন্তামণি হইতে আর বিশেষ কি লাভ হইবার সম্ভাবনা?

হে সাধো! যাহা জগতের সমগ্র ঐশ্বর্য্যকেও তুচ্ছ করে, এবং যাহাতে অধ্যাত্ম-বিদ্যারূপ নিরতিশয় আনন্দ লাভ হইয়া থাকে, আপনার সেই সর্ব্বত্যাগ সিদ্ধি ঘটিয়াছে। আপনি পুত্র, কলত্র ও বন্ধু-বান্ধবাদির সহিত সমস্ত রাজ্যই পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন। ব্রহ্মা যেমন নিজ রাত্রি সমাগত হইলে সমগ্র বিশ্ব-সৃষ্টি-ব্যাপার পরিহার করেন, এবং গরুড় যেমন গজকচ্ছপ লইয়া পৃথিবীর প্রান্তে বিশ্রাম করিতে গিয়াছিলেন, আপনিও তেমনি স্বীয় দেশ হইতে অতি দূরে এ আশ্রমে আগমন করিয়াছেন। আপনি সর্ব্বত্যাগে সক্ষম হইয়াছেন, সত্য; কিন্তু শরতের স্বচ্ছ সমীর—নীরদ ও নীহার প্রভৃতি কলঙ্ক ত্যাগ করিলেও গগনে যেমন স্বীয় সূক্ষ্ম সত্তা পরিত্যাগ করে না, আপনিও তেমনি 'অহং' ভাবরূপ অবিদ্যার এখনও পরিহার করিতে পারেন নাই। ঐ যে 'অহং' অভিমান, উঁহারই নাম মন; ঐ মন যদি হৃদয় হইতে অপগত হয়, তবে এ জগৎ পূর্ণ পরমানন্দ ব্রহ্মরূপেই পর্য্যবসিত হইয়া উঠে। কিন্তু আপনার এখনও

'অহং' অভিমান আছে; তাই সেই পূর্ণ পরমানন্দ ব্রহ্মভাব অদ্যাপি আপনার উপস্থিত হয় নাই। আকাশ যেমন মেঘবৃন্দে সংস্পৃষ্ট না হইলেও তাহারই দ্বারা আবৃত, আপনিও তেমনি ত্যাগ ও অত্যাগ এই বিবিধ বিকল্পেই বিজড়িত। যাহা মহান্ অভ্যুদয়রূপ পরমানন্দ, ভবৎ-কৃত এই সর্ব্বত্যাগ তাহা নহে। তাহা এক অনির্ব্বচনীয় বস্তু; সে বস্তু পাইতে হইলে বহুদিন ধরিয়া বহু আয়াসের প্রয়োজন। প্রবল প্রভঞ্জন-প্রবাহে অরণ্যস্পন্দ যেমন বর্দ্ধিত হয়, তেমনি ভাবনার প্রভাবে ভবদীয় সঙ্কল্প যখন ক্রমশঃ স্ফীত হইয়া উঠিবে, তখন আপনার এই সর্ব্বত্যাগ কোথায় চলিয়া যাইবে! ফলে আবার আপনাকে সমস্ত রাজ্য সমৃদ্ধির জন্য সমুৎসুক হইতে হইবে। যে ব্যক্তি অন্তরে চিন্তাকে একটুকুও অবসর প্রদান করে, তাহার সর্ব্বত্যাগিতা সিদ্ধি কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? ফলে যে পাদপে সমীরস্পন্দ সংলগ্ন হয়, সে পাদপের নিস্পন্দতা ঘটিবে কিরূপে? পণ্ডিতগণের মতে চিন্তা চিত্তশব্দের অভিধেয়; সঙ্কল্প উহার নামান্তর। ঐ চিন্তা যতকাল স্ফুরিত হইতে থাকিবে, ততকাল চিত্ত-ত্যাগের সম্ভাবনা কোথায়?

হে সাধো! চিন্তা-সমাক্রান্ত চিত্তই ক্ষণেকের মধ্যে ত্রিজগৎরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে। সেই চিত্ত যে পর্য্যন্ত অবস্থিত থাকে, ততক্ষণ আর নিরঞ্জন সর্ব্বত্যাগ-সিদ্ধি কিরূপে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে? যেমন গ্রাম্য পক্ষী কোন কিছুর শব্দ শুনিলে তৎক্ষণাৎ কোথায় উড়িয়া যায়, তেমনি সঙ্কল্প গ্রহণ করিবামাত্র ঐ ত্যাগবুদ্ধি অন্তঃকরণ হইতে লুকায়িত হয়। সর্ব্বস্ব-পরিত্যাগের ফল হইল—চিন্তা-শূন্যতা; এই চিন্তাশূন্যতা দ্বারাই সর্ব্বত্যাগ সমাদৃত হইয়া থাকে। 'আপনি চিন্তা-শূন্যতা দ্বারা সর্ব্বত্যাগের সৎকার করিতে পারেন নাই; কাজেই আপনার সর্ব্বত্যাগও উল্লিখিত চিন্তা-শূন্যতাকে সঙ্গে লইয়া চলিয়া গিয়াছে। বস্তুতঃ যত্ন করিয়া ডাকিয়া আনিয়া যথাযোগ্য সমাদর না করিলে, কাহারই বা না দুঃখ হইয়া থাকে? আপনি মনে করুন—আপনি সযত্নে সর্ব্বত্যাগকে আনয়ন করিলেন, কিন্তু তাহার যোগ্য সমাদর করিলেন না; কাজেই সে আপনার নিকট অবস্থান করিবে কেন?

হে কমলদল-নয়ন! আপনার সেই সর্ব্বত্যাগরূপ চিন্তামণি অন্তর্হিত হইয়াছে! আপনি এক্ষণে সঙ্কল্পরূপ নয়নযুগ দ্বারা তপস্যারূপ কাচমণির প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছেন। জলপ্রতিবিম্বিত চন্দ্রের প্রতি সত্য চন্দ্রবোধ স্থাপনের ন্যায় দৃষ্টিবিভ্রম-বশেই আপনার এই তপোরূপ দুঃখ সমুদিত হইয়াছে; আপনি ঈদৃশ দুঃখে উপাদেয় বুদ্ধি স্থাপন করিতেছেন। আপনি সর্ব্বাগ্রে বাসনা-বিরহিত ও অনাসক্ত হইয়া সর্ব্বত্যাগিতা সিদ্ধি লাভ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন বটে; কিন্তু তাহা করিয়াও অবশেষে বাসনাময় তপস্যার আশ্রয় লইয়া কেবল দুঃখেরই পথ পরিষ্কার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কি আদি, কি মধ্য, কি অন্ত, সর্ব্বত্রই আপনার ঐ তপঃক্রিয়া বিষম ফল উৎপাদন করিবে। যাহা অনায়াস-সাধ্য অপার আনন্দের বিষয়, তাহা পরিত্যাগ করিয়া যে ব্যক্তি ক্লেশ-সাধ্য পরিমিত পদার্থের নিমিত্ত সাধনায় প্রবৃত্ত হয়, তাহাকে প্রতারক আত্মঘাতী নামেই নিরূপিত করা যায়। আপনি সর্ব্বত্যাগসিদ্ধি লাভ করিবার চেষ্টা করিয়াও অরণ্যমধ্যে তপঃক্লেশকর অজ্ঞানে জড়িত হইয়া পড়িয়াছেন; কাজেই সর্ব্বত্যাগসাধন আপনার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে।

হে সাধুশীল! আপনি প্রভূত দুঃখময় রাজ্যবন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিয়া অধুনা বনবাসাভিধেয় দৃঢ়-বন্ধনে আবার বদ্ধ হইয়াছেন। রাজকার্য্যে আপনার যে চিন্তা ছিল, এখন তাহা অপেক্ষাও শীত, বাত ও আতপাদিজনিত ক্লেশচিন্তা আপনার দ্বিগুণ হইয়া উঠিয়াছে। যাঁহারা বনবাসক্লেশের অভিজ্ঞ নহেন, তাঁহাদের পক্ষে বনবাস আমি ভববন্ধন হইতেও অধিক ক্লেশজনক বলিয়া মনে করি। হে সাধো! আপনার ধারণা হইয়াছিল, 'আমি একটা চিন্তামণি প্রাপ্ত হইয়াছি' কিন্তু আমি বুঝিতেছি, আপনি একখণ্ড স্ফটিক মণিও লাভ করেন নাই।

হে পদ্মাক্ষ! পূর্ব্বে যে মণিরত্নের কথা বলা হইয়াছে, আপনার এই বর্ত্তমান কার্য্যকলাপকেই আমি সেই কথার সমানরূপে সম্যক্ বর্ণন করিলাম। অধুনা মদ্বর্ণিত এই মণিকাচ দৃষ্টান্তের বিষয় নিজে নিজে আপনি বিচারালোচনা করিয়া দেখুন,—দেখিয়া যাহা সুবিমল তত্ত্ব বলিয়া

অবধারিত করিবেন, তাহাই আপনার চিত্তকোষে সুদৃঢ়ভাবে গাঁথিয়া রাখুন।

নবতিতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৯০ ॥

একনবতিতম সর্গ।

চূড়ালা কহিলেন,—হে রাজবর্য্য! অধুনা সেই বিন্ধ্যাচলবাসী হস্তীর বিস্ময়করী বার্ত্তা বলিতেছি, তত্ত্বজ্ঞানলাভের নিমিত্ত আপনি ইহা শ্রবণ করুন।

রাজন্! সেই যে বিন্ধ্যবনের হস্তী, সেই হস্তীই এই ভূতলবাসী আপনি। সেই হস্তীর সেই দুইটী শুভ্র দন্ত—আপনার বিবেক এবং বৈরাগ্য। সেই যে হস্তিপক হস্তীকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছিল, তাহা আপনার অজ্ঞান। বস্তুতঃ অজ্ঞানই আপনাকে আক্রমণ করিয়া দুঃখ প্রদান করিতেছে। রাজন্! ভাবিয়া দেখুন,—হস্তিপক যেমন অতি প্রবল হস্তী অপেক্ষা হীনবল হইয়াও কৌশলে তাহাকে আবদ্ধ করিতে পারে, আপনি তেমনি প্রভূত শক্তি ধারণ করিলেও আপনা অপেক্ষা হীন-বল মূর্খতা আপনাকে দুঃখ হইতে দুঃখে এবং ভয় হইতে ভয়ে উপনীত করিতেছে। বলিয়াছি—লৌহ শৃঙ্খলের বজ্রবন্ধনে হস্তী বন্ধন প্রাপ্ত হইয়াছিল; তাহা দ্বারা বুঝিতে হইবে, আপনি আশাপাশে আবদ্ধ ও বিপন্ন হইয়াছিলেন। আশাকে লৌহশৃঙ্খল অপেক্ষাও বৃহৎ, বিষম ও কঠিন বলা যায়; কেন্ না, বহুদিনের ব্যবহারে লৌহশৃঙ্খল ক্রমশঃ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়; কিন্তু আশার পক্ষে সেরূপ আশা করা যায় না। আশা তাহা হইবার নহে; সে উত্তরোত্তরই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। বলিয়াছি—হস্তীর শত্রু হস্তিপক দূর হইতে সেই হস্তীকে দেখিয়াছিল। এ কথার অর্থ এই যে, অজ্ঞানই ক্রীড়ার নিমিত্ত আপনাকে একাকী বদ্ধাবস্থায় অবলোকন করিল। বলিয়াছি—হস্তী তাহার শত্রুকৃত শৃঙ্খলবন্ধন ছেদন

করিয়াছিল। ঐ কথার অর্থ এই যে, আপনি ভোগস্থান রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া অকণ্টক দেশে আগমন করিলেন। হে সাধো! শৃঙ্খলবন্ধন কখন না কখন ভগ্ন করা যাইতে পারে; কিন্তু মনের যাহা ভোগতৃষ্ণা, তাহাকে নিবারণ করিয়া রাখা বড়ই শক্ত কথা। হস্তীর শৃঙ্খলবন্ধন ছেদন করিবার কালে হস্তিপক পড়িয়া গিয়াছিল, এই যে কথা বলিয়াছি, এ কথার অর্থ—আপনি যখন রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আইসেন, তখন আপনার অজ্ঞান পতিত হইয়াছিল। বস্তুতঃ লোকে যখন বিরক্ত হইয়া ভোগাশা বিসর্জ্জন করিবার ইচ্ছা করে, তখন বৃক্ষচ্ছেদনকালে বৃক্ষবাসী পিশাচবৎ অজ্ঞান কম্পিত-কায় হয়। যখন বিবেকী ব্যক্তি ভোগরাশি বিসর্জ্জন করিয়া নিরাকুলভাবে অবস্থান করে, তখন বৃক্ষ ছিন্ন হইবার পর তত্রত্য পিশাচবৎ অজ্ঞান পলায়ন করে। ক্রকচাদি অস্ত্র দ্বারা বৃক্ষ ছেদিত হইলে তথাকার কুলায় যেমন পড়িয়া বিশীর্ণ হইয়া যায়, ভোগরাশি বিদূরিত করিলে অজ্ঞানও তেমনি কোথায় পতিত ও প্রস্থিত হইয়া থাকে। আপনি যখন বনে আগমন করেন, তখন আপনার অজ্ঞান শ্লথ হইয়াছিল, এ কথা সত্য; কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানরূপ মহাসি দ্বারা তাহা তখনও একেবারে নিহত হয় নাই। সেই জন্যই অজ্ঞান আবার আসিয়াছিল,—আসিয়া আপনাকে অভিভূত করিয়াছিল—বনমধ্যে তপস্যারূপ খাতে আপনাকে ফেলিয়া দিয়াছিল। ভবদীয় রাজ্য পরিত্যাগ কালে আপনি যদি উপস্থিত অজ্ঞানকে নিহত করিতে পারিতেন, তাহা হইলে, অজ্ঞান ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াও পুনরায় আপনার প্রতি অনিষ্টাচরণ করিতে পারিত না। সেই হস্তীর শত্রু হস্তিপক হস্তীকে অভিভূত করিবার জন্য যে খাত প্রস্তুত করিয়াছিল, বলিয়াছি; তাহার তাৎপর্য্য এই যে, অজ্ঞান আপনাকে তপস্যার ক্লেশ প্রদান করিল। হে নৃপবর! তৎকালে হস্তিপক যে সকল গজবন্ধন বস্তু প্রাপ্ত হইয়াছিল, তৎসমস্ত ঐ অজ্ঞান-রাজ্যেরই অভ্যন্তরস্থ।

হে সাধক! আপনি গজ নহেন; তথাচ গজেন্দ্র হইয়া এই ঘোর অরণ্যে অজ্ঞানবৈরী কর্তৃক সবলে নিক্ষিপ্ত হইয়াছেন। সেই যে খাতবলয় নূতন নূতন লতায় পাতায় আচ্ছন্ন হইয়াছিল বলিয়াছি, তাহা সজ্জনদিগের

শমদমাদি বৃত্তি দ্বারা আবৃত তপঃক্লেশ ব্যতীত আর কিছুই নহে। রাজন্! পাতালে যেমন বলি বদ্ধ হইয়া অবস্থান করিতেছেন, আপনি তেমনি এই-রূপে এখনও এই দুঃখময় তপঃখাত মধ্যে বদ্ধ রহিয়াছেন। স্থূল কথা, নিজে আপনি সেই হস্তী, আশা আপনার বন্ধননিগড়, মোহ আপনার শত্রু, খাতবলয় দারুণ বন্ধন এবং এই ভূতলই সেই বিন্ধ্যবন। এইরূপে এই আপনারই বৃত্তান্ত সকল বর্ণিত হইল। এক্ষণে সেই রিপুর নাশ নিমিত্তই যাহা করিতেছেন, করুন, বিলম্ব করিবেন না।

একনবতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৯১ ॥

দ্বিনবতিতম সর্গ।

চূড়ালা কহিলেন,—রাজন্! পূর্ব্বে যে আপনি মনস্ত্যাগের উপায়-সম্বন্ধে কোনই উপদেশ প্রাপ্ত হন নাই, এমন কথা অবশ্য হইতে পারে না; কেন না, আপনার পত্নী চূড়ালা বিদিতবেদ্যা ও নীতিনিপুণা; তিনি আপনাকে পূর্ব্বে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, তদনুসারে জ্ঞানার্জ্জন আপনি কি নিমিত্ত পূর্ব্বে করেন নাই? সেই যে আপনার মহিষী চূড়ালা, তিনি একজন তত্ত্বজ্ঞানীদিগের প্রধানা। তিনি যাহা করেন বা বলেন, তৎ-সমস্তই সত্য; সুতরাং হে সাধো! সে সকল সমাদরের সহিত সম্পাদন করাই কর্ত্তব্য। অথবা হে রাজন্! সেই চূড়ালার কথানুসারে কার্য্য করা আপনার যদি অনভিপ্রেতই হইয়াছিল, তবে নিজের বুদ্ধিতে যে সর্ব্বস্ব ত্যাগ অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, তাহাই বা কেন না স্থির করিয়া রাখিলেন?

শিখিধ্বজ কহিলেন,—রাজ্য, রত্ন, রমণী, দেশ, গৃহ, সকলই তো আমি পরিত্যাগ করিয়াছি। তথাপি আমার সর্ব্বস্বত্যাগে অকৃতকার্য্যতার কথা উল্লেখ করিতেছেন কেন?

চূড়ালা কহিলেন,—রাজন্! রাজ্য, রত্ন, রমণী, রাজচ্ছত্র বা বন্ধু বান্ধব, এ সকল তো আপনার নহে; সুতরাং সে সকলের ত্যাগ আবার আপনার

করা হইল কি? আর সর্ব্বস্বত্যাগই বা আপনি কি করিয়াছেন? বুঝিয়া দেখুন, সর্ব্বোত্তম যে বিষয়রাগ, তাহা আপনার এখনও অপরিত্যক্ত রহিয়াছে। সুতরাং সেই বিষয়রাগ যদি বর্জ্জন করিতে পারেন, তবেই আপনি সম্পূর্ণ বিশোকপদ প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

শিখিধ্বজ কহিলেন,—সেই সকল রাজ্য যদি আমার না হয়, তবে এই যে সকল শৈলবৃক্ষাদি-পরিবৃত বন, এ সমস্ত তো আমার; আমি এক্ষণে এই সকল পরিত্যাগ করিলাম।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—বশীকৃতেন্দ্রিয় রাজা শিখিধ্বজ ঐ কথা কহিয়া কুম্ভের প্রেরণায় তৎক্ষণাৎ সেই কাননের প্রতি আস্থা পরিত্যাগ করিলেন। মনে হইল, বর্ষা যেন নদীতটের সমস্ত ধূলিজাল মুহূর্ত্তমধ্যে ধুইয়া ফেলিল। অর্থাৎ রাজার যে সেই বনপ্রদেশে আমার বলিয়া একটা অভিমান ছিল, তাহা তিনি নিমেষমধ্যেই মার্জ্জিত করিয়া ফেলিলেন এবং দৃঢ়নিশ্চয় হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন রাজা শিখিধ্বজ এই কথা কহিলেন যে, আমি এই পর্ব্বত, পাদপ ও কান্তার-সমন্বিত কানন হইতে বাসনার উচ্ছেদ করিলাম। অধুনা নিশ্চয়ই আমার সর্ব্বত্যাগ-সিদ্ধি সংঘটিত হইল।

কুম্ভ কহিলেন—এই যে গিরিতট, কানন, কান্তার, জল ও পাদপ দেখা যায়, এ সকলও তো আপনার নহে; তবে আর সর্ব্বত্যাগ-সিদ্ধি কিরূপে আপনার সিদ্ধ হইল বলিব! বিষয়রাগ সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্; তাহা এখনও অপরিত্যক্ত ভাবে রহিয়াছে। এই বিষয়রাগ আপনি সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করুন; দেখিবেন—তখন আপনার বিশোক পদ প্রাপ্তি ঘটিবে।

শিখিধ্বজ কহিলেন—বুঝিলাম, এ সকলও আমার নহে; এই যে স্থল, জল ও পর্ণশালাযুক্ত আশ্রম, ইহাই আমার। আমি এক্ষণে ইহাও পরিত্যাগ করিলাম।

বশিষ্ঠ কহিলেন—রামচন্দ্র! কুম্ভবাক্যে প্রবোধিত জিতেন্দ্রিয় শিখিধ্বজ এই সকল কথা কহিয়া নিমেষমাত্র ধ্যানপূর্ব্বক বিশুদ্ধ বুদ্ধির আশ্রয়ে সেই আশ্রম হইতেও বাসনারে বিসর্জ্জন দিলেন; মনে হইল,

বায়ু যেন আত্মসংলগ্ন ধূলিকণা পরিত্যাগ করিল। শিখিধ্বজ কহিলেন—আমি এই বল্লী, বৃক্ষ ও পর্ণশালাময় আশ্রম হইতে বাসনারে নিবৃত্ত করিলাম। নিশ্চয়ই অধুনা আমার সর্ব্বত্যাগ সিদ্ধ হইল।

কুম্ভ কহিলেন—এই বৃক্ষ, বল্লী, স্থল, জল, পর্ণকুটীর, এ সকল তো আপনার কিছুই নহে। সুতরাং সর্ব্বত্যাগ সিদ্ধি আপনার কিরূপ হইল? বিষয়রাগ এ সকল হইতেও অধিক; তাহা তো এখনও আপনার অপরিত্যক্ত আছে। এই বিষয়রাগ যদি আপনার সম্পূর্ণ অপগত হয়, তবে আপনার বিশোক পদপ্রাপ্তি ঘটিতে পারিবে।

শিখিধ্বজ কহিলেন,—যদি এইরূপই হয়, এ সকল যদি কিছুই আমার নয়; তবে এই যে কুটীর এবং এই কুটীর-মধ্যগত এই যে সকল ভিত্তি, ও মৃগচর্ম্ম প্রভৃতি দ্রব্য সামগ্রী, এ সকলও আমার নহে; আমি এ সমস্ত পরিত্যাগ করিলাম।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—বিশুদ্ধহৃদয়, শমগুণাবলম্বী রাজা শিখিধ্বজ এই কথা কহিয়া আসন হইতে উত্থিত হইলেন। মনে হইল, মেঘ যেন গিরিশৃঙ্গ হইতে অভ্যুদিত হইল। দিনমণি যেমন স্বীয় পথে অবস্থান করিয়াই সমস্ত জগৎকার্য্য প্রত্যক্ষ করেন, তেমনি সেই কুম্ভ আসনস্থ হইয়াই তৎকালে রাজার সেই কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া কিঞ্চিৎ হাস্য করিলেন। কুম্ভ ভাবিলেন—রাজা যাহা করিতেছেন, করুন; ইঁহার পক্ষে এই কার্য্যই পবিত্র। এই ভাবিয়া তিনি মৌনাবলম্বন করিয়াই রাজাকে দেখিতে লাগিলেন। রাজা তাঁহার সমস্ত ব্যবহার-যোগ্য সামগ্রীসম্ভার আশ্রম হইতে বাহির করিয়া একত্র রাখিলেন। সে দৃশ্য দেখিয়া মনে হইল, সাগরের মধ্যগত নিম্নভূমি যেন উপরের উন্নত ভূভাগ হইতে বৃষ্টি-জলাদি আহরণ করিয়া একত্র স্থাপন করিল। দিনেশ যেমন স্বীয় কর প্রদানপূর্ব্বক সূর্য্যকান্ত মণিকে প্রজ্বালিত করেন, তেমনি রাজা শিখিধ্বজ তখন সেই সমস্ত দ্রব্য একত্র সংগ্রহপূর্ব্বক অগ্নিসংযোগে জ্বালাইয়া দিলেন। প্রলয়ের প্রভাকর যেমন স্বীয় কিরণ-দহনে এ জগৎ দগ্ধ করিয়া সুমেরু-শৃঙ্গে উপবেশন করেন, তেমনি তিনি সেই সকল দ্রব্য, দহনে দগ্ধ করিয়া নিজাসনে উপবিষ্ট হইলেন। পরে বলিলেন,—অয়ি পতিপ্রিয়ে,

অক্ষমালে! এতকাল ধরিয়া তুমি আমার কার্য্য সাধন করিয়াছ; পরকে ক্লেশ দিয়া নিজের অর্থ সাধনের বুদ্ধি আমার এত দিন যায় নাই, সেজন্য তোমাকে আমি যথেষ্ট কষ্ট দিয়াছি। কিন্তু এখন আমার সেই পূর্ব্ব ভ্রম দূর হইয়া গিয়াছে। তুমি আর এখন আমার কোন উপকারকরী হইবে না। আমি চিরকাল মন্ত্রাটবী মধ্যে ভ্রমণ করিতেছি, কার্য্যপথে বিহার করিয়াছি, সমস্ত ধর্ম্মস্থানই দেখিয়াছি; অতএব আর না—হে সখি! এখন আমি বিশ্রাম করি। এই বলিয়া রাজা শিখিধ্বজ স্বীয় অক্ষমালা অগ্নি-মধ্যে নিক্ষেপ করিলেন। মনে হইল, প্রলয়ের মহাবাত্যা যেন গগনগত নির্ম্মল তারকারাজি উৎপাটনপূর্ব্বক কল্পাগ্নিমধ্যে নিক্ষেপ করিল। অনন্তর রাজা আবার বলিলেন,—হে মৃগাজিন! তুমি বনের মৃগ হইতে বিচ্যুত; আমিও একটা নরমৃগ, তাই তোমাকে এতকাল অজ্ঞানবশেই আসনরূপে কল্পনা করিয়া আসিয়াছিলাম। তোমার দ্বারা আমার উপকার যথেষ্টই হইয়াছে। এক্ষণে প্রস্থান কর, পথে তোমার মঙ্গল হউক। ঐ যে নক্ষত্র-মণ্ডিত আকাশ, উহা তোমারই সাদৃশ্য ধারণ করিতেছে; তুমিও অনলে দগ্ধ হইয়া আকাশরূপেই পরিণত হও। এই বলিয়া রাজা সেই মৃগাজিন অগ্নিমধ্যে নিক্ষেপ করিলেন। মনে হইল, প্রবল বাত্যা যেন আবির্ভূত হইয়া সাগর হইতে শৈলরাজি উত্তোলনপূর্ব্বক দাবানলে নিক্ষেপ করিল। তৎপরে আবার বলিলেন,—হে সাধুশীল, কমণ্ডলো! তুমি সুকৃত, আমার তুমি যথেষ্ট উপকার করিয়াছ। কিন্তু আমি তোমার সে উপকারের প্রত্যুপকার করিতে পারি নাই। কি সৌহৃদ্য, কি মনোহারিত্ব, কি সৌজন্য, কি স্থৈর্য্য, ও কি সাধুত্ব, সমস্তেরই তুমি পরম আস্পদ। যে অনলে পরিশোধিত হইয়া তুমি আসিয়াছিলে, এখন সেই অনলেই গমন কর। তোমার পন্থা মঙ্গলময় হউক। এই বলিয়া শিখিধ্বজ তাঁহার সেই কমণ্ডলু বহ্নিতে বিশুদ্ধ করিয়া কোন এক শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণকে অর্পণ করিলেন। ফলে, যাহা উত্তম বস্তু, তাহা কোন সাধু বা অগ্নিকে অর্পণ করাই কর্ত্তব্য। অনন্তর রাজা বলিলেন,—হে আমার আসন! মূর্খের গতি যেমন গুপ্ত পাপেই লিপ্ত হয়, তুমি তেমনি সতত গুপ্ত অধোদেশেই অবস্থান করিয়াছ; সুতরাং মূর্খের ন্যায় তোমার দাহ-ক্লেশ ভোগ

করাই সমুচিত। তুমি এই বহ্নিতে ভস্মীভূত হইয়াই নিজের অবয়ব নাশ কর। এই বলিয়া তিনি তাঁহার সুকোমল আসনখানি অগ্নিমধ্যে নিক্ষেপ করিলেন। শিখিধ্বজ আত্মশুদ্ধি লাভের জন্য—স্বয়ং চিদ্‌ব্রহ্মে বিশ্রাম করিবার নিমিত্ত ঐ সকল বস্তু বহ্নিমধ্যে বিসর্জ্জন দিলেন; মুখে বলিলেন, —যাহা ত্যাজ্য বস্তু, শীঘ্রই তাহা পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। অন্যথা ঐ সকল বস্তু রক্ষা করিয়া স্তূপাকার করিলে কেবল উপাদেয় বস্তুরই উপচয় করা হয়। তাই এ সমস্ত বস্তু সত্বর আমি অনলে নিক্ষেপ করিয়া ফেলিলাম। অধুনা অগ্নিদেব ইহাদিগকে যদি ভস্মীভূত করিয়া ফেলেন, তবেই আমি সুখী হইব। এই বলিয়া কুম্ভের প্রতি বলিলেন,—হে সাধো! আমি নিষ্ক্রিয় হইবার অভিপ্রায়েই এ সকল উপকরণ বর্জ্জন করিলাম। এ জন্য মনে আমার কোন খেদই হয় নাই। বস্তুতঃ যাহা অযোগ্য বস্তু, তাহা বহন করিতে কেই বা প্রস্তুত হইয়া থাকে?

রাজা শিখিধ্বজ এই সকল কথা কহিলেন,—পরে ঝটিতি প্রজ্বলিত পাবকমধ্যে সেই সকল বনবাসীর ব্যবহার্য্য ভোজন-ভাজনাদি দ্রব্য সামগ্রী যুগপৎ নিক্ষেপ করিলেন। মনে হইল, কাল যেন প্রজ্বলিত প্রলয়ানলে এ জগৎ দগ্ধ করিয়া ফেলিল।

দ্বিনবতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৯২ ॥

ত্রিনবতিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাজা শিখিধ্বজ পূর্ব্বে তাঁহার অজ্ঞ মনের বৃথা সঙ্কল্পে সেই বনমধ্যে শুষ্ক তৃণকুটীর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহাও দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর সেখানে আর যে যে দ্রব্য-সামগ্রী ছিল, সে সকলও তিনি সর্ব্বত্র সমবুদ্ধি অবলম্বনপূর্ব্বক ত্যাগ, নিক্ষেপ ও ভঙ্গ করিলেন। নিজের বসন-ভূষণ বা অন্য খাদ্য সামগ্রী

যাহা কিছু ছিল, সে সকলও তিনি সন্তুষ্টমনে অনলে নিক্ষেপ করিলেন। তাঁহার আশ্রমে ভীষণ অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। সেখানে আর জনপ্রাণী দৃষ্টি-গোচর হইল না। সে আশ্রম বীরভদ্র-বিধ্বস্ত দক্ষযজ্ঞ-ভূমির ন্যায় প্রতীত হইতে লাগিল। অগ্নিদগ্ধ নগরী হইতে লোক সকল যেমন ভীত চকিত হইয়া পলায়ন করে, তেমনি সে আশ্রমের মৃগকুল রোমন্থ-ব্যাপার পরিহার-পূর্ব্বক সত্বর অগ্নিভয়ে তথা হইতে পলায়ন করিল। ভীষণ বহ্নি প্রজ্বলিত হইয়া শুষ্ক কাষ্ঠরাশির সঙ্গে সঙ্গে রাজা শিখিধ্বজের সমগ্র দ্রব্য সামগ্রী ভস্মীভূত করিয়া ফেলিল। দহ্যমান দ্রব্যাদির নিমিত্ত রাজার কিছুমাত্র মমতা রহিল না। তিনি শূন্য-দেহে সন্তুষ্ট-মনে বলিতে লাগিলেন,—হে দেবকুমার! আমি এই সমস্ত বস্তুর প্রতি কিছুমাত্র বাসনা রাখিতেছি না; আমার এখন সর্ব্বত্যাগ সিদ্ধ হইয়াছে। আমি সর্ব্ব ত্যাগ করিয়া অবস্থান করিতেছি। অহো! আমি বহুদিনের পর শুদ্ধ ও কেবল হইয়াছি। আমার অনায়াসেই বোধপ্রাপ্তি ঘটিয়াছে। এ সকলই ত সঙ্কল্পক্রম; ইহাদের মধ্যে সারবস্তু কি আছে? বন্ধনের হেতুভূত এই বিবিধ বস্তু সকল যখন যখন পরিত্যাগ করা যায়, তখন তখনই মন পরম নির্ব্বৃতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আমি এখন শান্তির সন্ধান পাইয়াছি; নির্ব্বৃত হইয়াছি, সুখিত হইয়াছি এবং জয়যুক্ত হইয়াছি। আমার সমস্ত বন্ধন ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে। আমি সর্ব্বত্যাগে সক্ষম হইয়াছি। হে দেবপুত্র! আমি দিগম্বর, দিগাবাস ও দিক্‌প্রতিম হইয়াছি। আমার মহাত্যাগের আর কি অবশেষ আছে?

কুম্ভ কহিলেন—রাজন্, শিখিধ্বজ! সর্ব্বত্যাগ বলিতে যাহা বুঝায়, আপনার এখনও তাহা করা হয় নাই। সুতরাং সর্ব্বত্যাগ-জনিত যে পরমানন্দ, সে আনন্দের বৃথা অভিনয় আপনি করিবেন না। বাস্তবিক আপনি এখনও সর্ব্বত্যাগী হইতে পারেন নাই। যাহা সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম রাগ বা বাসনা, তাহা আপনার এখনও অপরিত্যক্ত রহিয়াছে। এই রাগ বা বাসনারে যদি একেবারেই পরিত্যাগ করিতে পারেন, তবেই আপনার বিশোক পদ প্রাপ্তি ঘটিতে পারে।

বশিষ্ঠ কহিলেন—হে মহাভুজ, কমলনেত্র, রামচন্দ্র! সেই রাজা

কুম্ভের মুখে ঐ কথা শ্রবণ করিয়া কিঞ্চিৎ চিন্তা করিলেন; পরে বলিলেন—হে দেবনন্দন! আমি অন্য সমস্তই পরিত্যাগ করিয়াছি, এক্ষণে আমার এই ইন্দ্রিয়বর্গ-পরিপূরিত রক্ত-মাংসময় দেহমাত্র অবশিষ্ট আছে। অতএব উচ্চ স্থান হইতে নিম্নে নিপতিত হইয়া আমি এই দেহ বিনষ্ট করি; এইরূপ করিলেই আমার সর্ব্বত্যাগ সিদ্ধি হইবে, আমি সর্ব্বত্যাগী হইতে পারিব।

বশিষ্ঠ কহিলেন—রাজা শিখিধ্বজ" এই কথা কহিয়া স্বীয় দেহ পরিত্যাগ করিবার জন্য যেমন গাত্রোত্থান করিলেন, অমনি কুম্ভ শশব্যস্ত-ভাবে বলিলেন—রাজন্! সে কি কথা! আপনি নিরপরাধ দেহকে কেন মহাগর্ত্তে নিপাতিত করিতে উদ্যত হইতেছেন? মূঢ়বুদ্ধি বলীবর্দ্দই কুপিত হইয়া নিজের সন্তান নষ্ট করিয়া থাকে। দেখুন, আপনার এই জড় দেহ অতি দীন ও মূকস্বভাব। ইহা হইতে আপনার তো কোনই অনিষ্ট সম্ভাবনা নাই। অতএব আপনি ইহাকে অনর্থক পরিত্যাগ করিবেন না। এই দেহ মূকস্বভাব; ইহা নিশ্চল হইয়া আত্মাতেই অবস্থিত আছে। জলোপরি ভাসমান কাষ্ঠখণ্ড যেমন তরঙ্গ-তাড়নায় পরি-চালিত হয়, তেমনি এই দেহ অন্যের সাহায্যে চালিত হইয়া থাকে। মত্ত তস্কর পলাইবার কালে পার্শ্বস্থ দুর্ব্বল ব্যক্তিকে হস্তের সম্মুখে প্রাপ্ত হইলে যেমন প্রহার করিয়া চলিয়া যায়, তেমনি অন্য একজন ব্যক্তিই এই দেহকে ক্লেশ দিয়া থাকে। অতএব সেই অন্য ব্যক্তিকেই সবলে নিগ্রহ করা কর্ত্তব্য। সুখ-দুঃখাদির উদ্ভবস্থান বলিয়া এ দেহকে কখনই দোষী বলা যায় না। দেখুন, ফলবান্ বৃক্ষ বায়ুবেগে স্পন্দিত হয়; সেই স্পন্দনে তাহার ফলপতন হইয়া থাকে। এই ফল-পতন-জনিত অপরাধে বৃক্ষকে কখনই অপরাধী করা যায় না; কেন না, বায়ু প্রবাহিত হইয়াই বৃক্ষ হইতে ফল-কুসুমাদি পাতিত করিয়া থাকে। অতএব বায়ুকেই দোষী বলা সঙ্গত; বৃক্ষের তাহাতে দোষ কি আছে? এইরূপে দেখা যায়, এ দেহ অপরের দোষেই দোষী; অপরের সাহায্যেই সুখ-দুঃখাদির আধার সুতরাং দেহকে দোষী করা যায় কিরূপে?

হে পদ্মাক্ষ! তুমি দেহত্যাগ করিলেও তোমার সর্ব্বত্যাগ

সিদ্ধ হইবে না। বরং তাহাতে বিষময় ফলই উৎপাদন করিবে। তুমি দেহকে উচ্চ স্থান হইতে পরিত্যাগ করিতে যাইতেছ, তোমার এ চেষ্টা বৃথা! এইরূপে দেহত্যাগ করিলে, দেহের পীড়নকর্ত্তাকে অবশ্য পরিত্যাগ করা হইবে না; সে থাকিয়াই যাইবে। মত্ত গজ-কৃত বৃক্ষোৎপাটনের ন্যায় যে তোমার এই দেহকে নিগৃহীত করিতেছে, সেই পাপকে যদি পরিহার করিতে পার, তবে তোমার বাস্তবিক মহাত্যাগ সিদ্ধি সংঘটিত হইবে; তাহাকে ত্যাগ করিতে পারিলেই তোমার দেহাদি সমস্তই পরিত্যাগ করা হইবে। নচেৎ এইরূপে পুনঃ পুন দেহাদির পরিহার করিলেও পুনঃপুন ইহা উৎপন্ন হইতে থাকিবে।

শিখিধ্বজ কহিলেন—হে সৌম্য! এই দেহের পরিচালনকর্ত্তা কে? কে এই দেহাদির জন্মকর্ম্মের মূলস্বরূপ? কাহাকে ত্যাগ করিতে পারিলে সমস্ত পরিত্যক্ত হইবে? তাহা আমাকে বিশেষ করিয়া বলুন।

কুম্ভ কহিলেন,—হে সাধুশীল! দেহত্যাগ, রাজ্য-বর্জ্জন বা উটজাদির দাহন, এ সকল করায় সর্ব্বত্যাগ করা হয় না। পরন্তু যাহা সর্ব্বস্বরূপ এবং যাহা হইতে সকলের সমুদ্ভব, তথাবিধ একটী মাত্র সর্ব্বময় বস্তুর বর্জ্জন করিলেই সর্ব্বত্যাগ করা হয়।

শিখিধ্বজ কহিলেন—হে সর্ব্বতত্ত্ববিদ্গণের বরণীয়! যাহা সর্ব্বময়, সতত সর্ব্ব জনের যাহা পরিহেয়, তথাবিধ একটী বস্তু কি? তাহা আমার নিকট বিশদরূপে বিবৃত করুন।

কুম্ভ কহিলেন—হে সাধো! জানিবেন—চিত্তই সর্ব্বময় বস্তু; চিত্তেরই সর্ব্ববস্তু সহ সম্বন্ধ। এই চিত্ত না জড়, না অজড়, কিছুই নহে। জীব ও প্রাণ ইত্যাদি এই ভ্রান্ত চিত্তেরই নামান্তর। চিত্তকেই সর্ব্বময় নামে অভিহিত করা হয়। চিত্তই ভ্রম বলিয়া বিদিত। জানিবেন—চিত্তই নর, চিত্তই এই জগজ্জাল; চিত্তকেই সমস্ত বলিয়া বর্ণনা করা হয়। হে রাজন্! বৃক্ষের কারণ যেমন বৃক্ষবীজ, তেমনি ঐ চিত্তই নিখিল রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, দেহ, আশ্রম, ইত্যাদি সমুদায়েরই বীজ। এই সর্ব্বমূলীভূত চিত্ত পরিত্যাগ করা যদি সম্ভবপর হয়, তাহা হইলে সমস্তই পরিত্যক্ত হইয়া থাকে। অতএব হে ভূপ! চিত্ত-পরিত্যাগেই যখন সর্ব্বত্যাগের

সম্ভাবনা, এবং তাহাকে ত্যাগ করিতে না পারিলে যখন তাহা সম্ভবপর হইয়া উঠিবে না, তখন চিত্তত্যাগই নিশ্চয় সর্ব্বত্যাগের উপায়। কি ধর্ম্ম, কি অধর্ম্ম, কি রাজ্য, কি কানন, এ সকল হইতে দুঃখ ভোগ কেবল চিত্তবান্ ব্যক্তিরই ঘটিয়া থাকে। যাহার চিত্ত নাই, তাহারই পরম সুখ-স্বস্তি। ক্ষুদ্র বীজ যেমন বিশাল বৃক্ষের আকারে পরিণত হয়, তেমনি এই অতি সূক্ষ্ম চিত্তই জগদাকারে বিবর্ত্তমান হইতেছে। বৃক্ষ যেমন বায়ুভরে, গিরি যেমন ভূমিকম্পে এবং ভস্ত্রা যেমন কর্ম্মকারের যত্নে পরিচালিত হয়, তেমনি এই দেহ চিত্তযোগেই চালিত হইয়া থাকে। সর্ববিষয়ের ভোগ, জন্ম-জরা ও মরণাদি দেহ ধর্ম্ম এবং শমদমাদি মহা-মুনি-ধর্ম্ম, এ সমুদায়ের সুদৃঢ় পেটিকা এই চিত্তই। এই সর্ব্বময় চিত্তই জগৎ ও দেহাদিরূপে বিবর্ত্তমান।

হে মুনিবৃত্তিশালিন্! ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যক্রমে এই চিত্ত—মন, বুদ্ধি, মহৎ, অহঙ্কার, প্রাণ ও জীব ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন নামে নিরূপিত হইয়া থাকে। এই সর্ব্বময় চিত্ত সর্ববিধ আধিব্যাধির সীমান্ত প্রদেশে উপনীত হইতে পারে। এবম্বিধ চিত্ত-পরিত্যাগেই সর্ব্বত্যাগ সিদ্ধ হইয়া থাকে। হে ত্যাগবেদি-গণের বরেণ্য! চিত্তের যে পরিত্যাগ, তাহাই বুধগণের মতে সর্ব্বত্যাগ। ঐ চিত্তত্যাগ সুসাধিত হইলেই সত্যস্বরূপের অনুভব হইয়া থাকে। চিত্ত-পরিত্যাগেই এই দ্বৈতপ্রপঞ্চের বিলয় ঘটে। তাহাতে একত্বমাত্রেরই পর্য্যবসান হয়। ঐ একত্বই পরম শান্তির আলয় এবং উহাই অতি স্বচ্ছ অনাময়। এই সংসারশস্য-সম্পদের ক্ষেত্র ঐ চিত্তই। ক্ষেত্র যখন অক্ষেত্র হইয়া যায়, তখন আর শস্যোৎপত্তির সম্ভাবনা কোথায়? জলের যেমন তরঙ্গভাবে বিবর্ত্তন হয়, এই বিচিত্র চেষ্টাশালী চিত্তের তেমনি ভাব ও অভাবরূপে বিলসিত পদার্থাকারে বিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। যেমন সাম্রাজ্য-প্রাপ্তি ঘটিলে পার্থিব লাভের আর কোন লাভই অবশিষ্ট থাকে না, সমস্ত লাভেই লাভবান্ হওয়া যায়, তেমনি চিত্তের উচ্ছেদসাধনরূপ সর্ব্বত্যাগ সিদ্ধ হইলে সমস্তই লব্ধ হইয়া থাকে।

হে সর্ব্বত্যাগে সমুদ্যত ভূপতে! তোমার নিকট অন্য ব্যক্তি যেমন ত্যাগের বিষয়ীভূত, তেমনি তুমিও তো অন্য ব্যক্তির ত্যাজ্য বস্তু; অতএব

তোমাকে যখন অপরের ত্যাজ্য আত্মাকে গ্রহণ করিতে হইতেছে, তখন তোমার সর্ব্বত্যাগ সিদ্ধি সংঘটিত হইল কোথায়? ফলে, পরিচ্ছিন্ন আত্মারে লইয়া সর্ব্বত্যাগে কৃতকার্য্য হওয়া কথনই সম্ভাব্য নহে। যিনি প্রকৃত পক্ষে সর্ব্বত্যাগে সক্ষম হইয়াছেন, তিনি মুক্তার অভ্যন্তরে স্থানপ্রাপ্ত সূত্রের ন্যায় কালত্রয়েই এই সমগ্র জগৎকে নিজের অভ্যন্তরে গ্রহণ করিয়া থাকেন। যিনি সর্ব্বত্যাগ করিয়াছেন, তিনি সর্ব্বত্যাগে শূন্যস্বরূপ হইলেও সূত্রে যেমন মুক্তাবলী, তেমনি এই ত্রৈকালিক সমগ্র জগৎ তাঁহাতেই যেন গ্রথিতাকারে বিরাজিত। যিনি সমস্ত পরিত্যাগ করিলে তৈলপরিহীন প্রদীপের ন্যায় বিলীনভাবে বিরাজ করেন, তৈলশালী প্রদীপের ন্যায় তিনি প্রকাশ পাইয়া থাকেন। সমস্ত দ্রব্য সামগ্রী পরিত্যাগপূর্ব্বক আপনি যেরূপে একক হইয়া অবস্থান করিতেছেন, এইরূপে মদীয় কথানুসারে সর্ব্বত্যাগে সক্ষম হইলেই বিজ্ঞানস্বরূপে বিরাজ করিতে পারিবেন।

রাজন্! আপনার সমস্ত ব্যবহার্য্য বস্তু দগ্ধ হইয়াছে, অথচ আপনি যাহা, তাহাই আছেন, প্রকারান্তর হইয়া যান নাই। এই দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া বলা যায়, আপনি যদি আমার কথানুসারে সর্ব্বত্যাগী হইতে পারেন, তবে আপনিই সেই পরম পুরুষার্থ নির্ব্বাণপদরূপে পর্য্যবসিত হইবেন। ঐ পুরুষার্থ আপনা হইতে পৃথক্ একটা কিছুই হইবে না। যাহা সর্ব্বত্যাগ, তাহারই নাম শূন্যাত্মা; ইহা নিখিল জ্ঞানের আশ্রয়রূপেই বিরাজমান। আকাশ যেমন রবি-শশী প্রভৃতির অধিষ্ঠান, এই আত্মাই তেমনি অসীম অনন্ত মহাজ্ঞানরাশির আধার। সর্ব্বত্যাগরূপ সুমিষ্ট রস যদি একবার পান করা যায়, তাহা হইলে, নির্লেপ আকাশে যেমন কোন বাস্তব ঘাত-প্রতিঘাত সম্ভবপর হয় না, তেমনি সেই সর্ব্বত্যাগী ব্যক্তিকে কোনওরূপ জরা-মরণ-জনিত ভয় আসিয়া বাধা প্রদান করিতে পারে না। যাহা নির্ম্মলাভ মহত্ত্ব, একমাত্র সর্ব্বত্যাগই তাহার কারণ। যদি এরূপ সর্ব্বত্যাগ করিতে পারেন, তবে যাহা অনন্ত অবিনশ্বর জ্ঞানভূমি, তৎস্বরূপেই আপনি বিরাজ করিতে পারিবেন। যাহা পরম আনন্দ, তাহা এই সর্ব্বত্যাগই। ইহা ভিন্ন আর সমস্তই নিদারুণ দুঃখ।

আপনি এই প্রকার সর্ব্বত্যাগই অঙ্গীকার করুন,—করিয়া যেরূপ ইচ্ছা করিতে থাকুন। যে ব্যক্তি উক্তরূপ সর্ব্বত্যাগ করিতে সক্ষম হন, তাঁহার নিকট সমস্তই আসিয়া উপস্থিত হইয়া থাকে। দৃষ্টান্ত স্থলে বলা যায়, জল অনলেও যেমন প্রবেশ করে, জলধিতেও তেমনি প্রবেশ করিয়া থাকে। যে জ্ঞানে আত্মপ্রসাদ আনয়ন করে, তাহা ঐ সর্ব্বত্যাগের মধ্যেই বিরাজিত রহিয়াছে। সর্ব্বত্যাগ যদিও শূন্যস্বরূপ, তথাচ তাহারই মধ্যে জ্ঞান বিদ্যমান, ইহার নিদর্শন এই যে, ভাণ্ডাভ্যন্তরের যাহা শূন্যভাগ, তাহাতেই রত্নাদি বস্তুর অবস্থান। এই বিষয় কলিকালের দিনেও শাক্যমুনি একমাত্র সর্ব্বত্যাগের ফলেই সুমেরুবৎ অচল অটল হইয়া নিঃসঙ্গমনে অবস্থান করিয়াছেন।

মহারাজ! সর্ব্বত্যাগই সর্ব্ব সম্পদের আস্পদ। যে, যৎকিঞ্চন বস্তুর গ্রাহক নহে, তাহাকে সমস্ত বস্তুই প্রদান করা হয়। ফলে, যে ব্যক্তি আত্মাকে পরিচ্ছিন্নভাবে গ্রহণ করে না, সে তাহাকে অপরিচ্ছিন্ন অনন্তরূপেই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তাই বলিতেছি, হে ভূপতে! আপনি সমস্ত পরিত্যাগপূর্ব্বক যদি শান্ত, সুস্থ, আকাশবৎ স্বচ্ছ হইতে পারেন, তবেই যেমন ইচ্ছা, সেইরূপই সম্ভবপর হইতে পারিবেন। হে সাধো! অগ্রে ত্যাজ্য বিষয় মনে মনে বিচার করিয়া লউন, পরে উহা পরিত্যাগ করুন। অনন্তর ক্রমশঃ মনকে বিসর্জ্জন দিউন; অবশেষে 'আমি ত্যাগ করিলাম', এই প্রকার অভিমানী অহঙ্কারকেও পরিত্যাগ করুন।

ত্রিনবতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৯৩ ॥

চতুর্নবতিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—কুম্ভ ঐ প্রকার বলিলে, উদারচেতা রাজা শিখিধ্বজ অন্তরে চিত্ত-ত্যাগের বিষয় বারম্বার বিচার করিয়া বলিলেন,—যাহা হৃদাকাশের বিহঙ্গ এবং হৃদয়-পাদপের মর্কট, আমি সেই মনকে ভূয়োভূয়ঃ নিরস্ত করিতেছি, কিন্তু সে মন আমার আবার ফিরিয়া আসিতেছে। ধীবর যেমন মৎস্য ধরে, তেমনি আমি এই মনকে ধরিয়া রাখিতে জানি বটে; কিন্তু হে সদাশয়! মূর্ত্ত দ্রব্যের ন্যায় ইহাকে যে কিরূপে পরিত্যাগ করিতে হয়, তাহা আমি জানি না। সুতরাং হে ভগবন্! অগ্রে মৎসমীপে চিত্তস্বরূপ কি, তাহা বর্ণন করুন। অনন্তর ইহার ত্যাগোপায় কীর্ত্তন করিবেন।

কুম্ভ কহিলেন,—মহারাজ! জানিবেন—বাসনাই চিত্তের স্বরূপ। চিত্ত বাসনারই নামান্তর মাত্র। ইহার পরিত্যাগ অতি সহজেই সুসম্পাদ্য হইতে পারে। এই চিত্ত-পরিত্যাগ রাজ্যলাভ হইতেও সমধিক সুখের বিষয়। বুঝি বা কোমল কুসুম হইতেও ইহা মনোরম। নীচ জনের সাম্রাজ্য লাভ এবং তৃণের সুমেরুভাব ধারণ যাদৃশ, মূর্খের নিকট এই চিত্ত-পরিত্যাগ তেমনি অসাধ্য। এ বিষয়ে আর সন্দেহ করিবার অবসর কিছুই নাই।

শিখিধ্বজ কহিলেন,—ভবদীয় কথানুসারে বুঝিলাম, চিত্ত বাসনাময়; পরন্তু উহা অতীব চঞ্চলস্বরূপ। আমি মনে করি, এই চিত্তকে ত্যাগ করা, বজ্রাস্ত্রকে গলাধঃকরণ করা অপেক্ষাও কঠিন কথা। হে মুনে! এই চিত্তই দেহযন্ত্রের পরিচালক, হৃদয়পদ্মের মধুকর, মোহমারুতের আকাশ, জগৎ-কমলের মূল মৃণাল এবং দুঃখদাহকর দহনস্থানীয়। এ সংসার চিত্ত-পুষ্পের সৌরভ। সুতরাং এবম্বিধ সর্ব্বানর্থের মূলীভূত চিত্ত যাহাতে অনায়াসে পরিত্যক্ত হইতে পারে, তাহার আপনি উপায় নির্দ্দেশ করুন।

কুম্ভ কহিলেন,—হে সাধো! এই চিত্তের যে সমূলে সমুচ্ছেদ, তাহারই নাম সংসারক্ষয়। এতাদৃশ সংসার-ক্ষয়কেই দূরদর্শিগণ চিত্ত-ত্যাগ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

শিখিধ্বজ কহিলেন,—হে সদাশয়! আমিও মনে করিতেছি যে, চিত্তের পরিত্যাগ অপেক্ষা চিত্তকে একেবারে নাশ করিয়া ফেলাই কার্য্য-সিদ্ধির যথাযথ উপায়। দেখুন, ব্যাধি উপস্থিত হইলে তাহার প্রতি শতধা মমতা ত্যাগ করিলেও যতক্ষণ ব্যাধি আছে, ততক্ষণ তাহার অভাব অনুভব হইবে কিরূপে? ফলে ব্যাধির যদি অভাব অনুভব করিতে হয়, তবে তাহার সম্পূর্ণ উচ্ছেদ সাধন করাই কর্ত্তব্য।

কুম্ভ কহিলেন,—চিত্ত যেন একটা পাদপ, তাহার বীজ অহম্ভাব। ঐ চিত্ত-পাদপ অহম্ভাবরূপ বীজ হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়াই শাখা, পল্লব ও ফল-কুসুমশালী হইয়া পড়িয়াছে। এই চিত্ত-পাদপকে তুমি সমূলে উন্মূলিত করিয়া ফেলো এবং আকাশের ন্যায় শূন্যমনে অবস্থান করিতে থাক।

শিখিধ্বজ কহিলেন,—মুনিবর! চিত্তের মূল বা অঙ্কুর কি? উহা কোথা হইতে জন্মিল? উহার শাখা বা কাণ্ড কাহাকে বলা যায়? কিরূপেই বা ঐ চিত্ত-পাদপের উন্মূলন হইতে পারে?

কুম্ভ কহিলেন,—এই চিত্ত অজ্ঞান হইতেই আবির্ভূত; সুতরাং ইহা অজ্ঞানস্বরূপ। পরমাত্মার মায়াক্ষেত্রই ঐ মায়াময় চিত্তের ক্ষেত্র। ফলে, মায়া হইতেই উহার উদ্ভব। প্রথমোৎপন্ন মায়াক্ষেত্র হইতে 'আমি' ইত্যাকার নিশ্চয়াত্মক অনুভব হয়, তাহাই উহার অঙ্কুর আখ্যায় অভিহিত। ঐ নিশ্চয়াত্মক নিরাকার অনুভব বুদ্ধি নামে নির্দ্দিষ্ট। এই বুদ্ধিনামক অঙ্কুরের সঙ্কল্পরূপ স্থূলভাব ধারণই চিত্ত বা মন; ইহাই মনীষিগণের মত। শূন্যস্বরূপ জীব উহারই অন্তর্গত। উহা মিথ্যা চিত্তধর্ম্মের অনুসন্ধায়ক; সুতরাং মিথ্যা। এইরূপে এই অস্থি ও স্নায়ুরসে রঞ্জিত দেহ পূর্ব্বোল্লিখিত চিত্তবৃক্ষের কাণ্ড। অঙ্কুর উৎপন্ন হইবার কালে মূল স্তম্ভ হইতে স্কন্ধাগ্র পর্য্যন্ত যে স্পন্দ, তাহাই উহার বাসনা। ইন্দ্রিয়গ্রাম ঐ চিত্ত-পাদপের দূরবিসর্পিণী দীর্ঘ শাখা। ভাব ও অভাব-জনিত শুভাশুভ ফলে পরিপূর্ণ ভোগজাল ঐ চিত্ত-পাদপের অবান্তর

শাখা প্রশাখা। রাজন্! আপনি প্রতিক্ষণ এবম্বিধ চিত্ত-পাদপের শাখা প্রশাখার উচ্ছেদ সাধনপূর্ব্বক উহার মূলভাগ উৎপাটন করিতে যত্ন প্রকাশ করুন।

শিখিধ্বজ কহিলেন,—মুনিবর! আমি কোন্ উপায় অবলম্বন করিব? কিরূপে ঐ চিত্ত-পাদপের শাখা প্রশাখা ছেদন করিয়া নিঃশেষভাবে মূলোৎপাটন করিয়া ফেলিব?

কুম্ভ কহিলেন,—ঐ চিত্ত-পাদপের বাসনারূপিণী বহুতর শাখা প্রশাখা বিদ্যমান। বিচারজ্ঞানে আসক্তির পরিবর্জ্জনপূর্ব্বক ঐ সকলের ভাবনা দূরীভূত করিতে পারিলে, উহাদের উচ্ছেদ হইতে পারে। চিত্তে যাঁহার আসক্তি নাই, যিনি অনাসক্ত হইয়া মৌনভাবে একমাত্র শান্ত পদেরই বিচারালোচনা করিতে থাকেন, অর্থাৎ আত্মাই আছেন, তিনিই সত্য, আর সমস্তই অসত্য, এবম্বিধ বিচারে যিনি তৎপর, যিনি যথাপ্রাপ্ত কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, যাহা করেন, তাহা অনিচ্ছার সহিত করিয়া থাকেন এবং আপন পুরুষকার প্রভাবে চিত্ত-পাদপের শাখাসমূহ কর্ত্তন করিয়া যিনি অবস্থান করিতে পারেন, ঐ চিত্ত-পাদপের মূলোৎপাটনে তিনিই সম্পূর্ণ সমর্থ। এইরূপে উহার মূলোৎপাটন করাই প্রধান কার্য্য। অতএব আপনি সর্ব্বাগ্রে চিত্ত-পাদপের মূলোৎপাটনেই যত্নবান্ হউন। হে মহাবুদ্ধে! ঐ কার্য্যই মুখ্য কার্য্য; সুতরাং অগ্রে চিত্তরূপ কণ্টক-বনের মূলভাগই দগ্ধ করিয়া ফেলুন। এইরূপ করিলেই আপনি চিত্ত-বিরহিত হইতে পারিবেন।

শিখিধ্বজ কহিলেন,—কোন্ প্রকার অনলে এই অহম্ভাবরূপ চিত্ত-পাদপের বীজ দগ্ধীভূত হইতে পারে?

কুম্ভ কহিলেন,—কে আমি? কোন্ প্রকারে এই আকার ধারণ করিলাম, এবম্বিধ আত্মবিচারই দীপ্ত অনল; এই অনল দ্বারাই চিত্ত-পাদপের বীজ দগ্ধ করা যায়।

শিখিধ্বজ কহিলেন,—আমি নিজে নিজে বুদ্ধিযোগে অনেক বিচার করিয়াছি; বিচারে বুঝিয়াছি—আমি না জগৎ, না পৃথ্বী, না বনরাজি-বিরাজিত অদ্রিতট, না কানন, না পত্র-স্পন্দাদি, না মাংসশোণিতাস্থিময় দেহাদি,

এ সকলের কিছুই আমি নহি। কেন না, ঐ সকল হইল জড় পদার্থ। অপিচ, আমি না কর্ম্মেন্দ্রিয়, না জ্ঞানেন্দ্রিয়, না মন, না বুদ্ধি, না অহঙ্কার; এ সকলের কিছুই নহি। কেন না, এ সকলই জড় পদার্থ; কিন্তু আমি তো জড় নহি। হে মুনে! কনকে যেমন কটকত্ব, চিদাত্মায় 'আমি' 'তুমি' ভাবও সেইরূপই। সেই চিন্ময় আত্মাই এই ব্রহ্মাণ্ডাদি সমগ্র জড় বস্তুবর্গের সন্নিবেশ; তিনিই সমস্ত শব্দাদি বিষয়ের আদিভূত। আকাশে বিশাল বৃক্ষের অবস্থিতির সম্পূর্ণ অসম্ভাবনার ন্যায় তাঁহাতে এই সমস্ত জড় বস্তুর স্বতন্ত্রভাবে অবস্থান কোন ক্রমেই সম্ভবপর নহে। হে প্রভো! জানি আমি এইরূপেই 'আমিত্ব' মলের প্রক্ষালন করিতে হয়; কিন্তু এ তত্ত্ব বিদিত হইয়াও—যিনি অন্তরে একরস প্রত্যক্ষ সাক্ষী চৈতন্য, তাঁহাকে আমি বিদিত হইতে পারিতেছি না বলিয়াই চিরদিন দুঃখ-দহনে সন্তাপ ভোগ করিতেছি।

কুম্ভ কহিলেন,—হে বিমলস্বভাব, মহীপতে! উল্লিখিত দেহাদি জড় বলিয়া তুমি যদি তাহা না হও, তবে স্থির করিয়া বল দেখি—তুমি কে?

শিখিধ্বজ কহিলেন,—বিজ্ঞবর! যাহা নির্ম্মল চিন্ময় আত্মজ্ঞান, আমি তাহাই বটি। তাঁহারই সত্তায় এই বাহ্য জড় বস্তুবর্গ অনুভূতি-গোচর হইয়া ইষ্ট ও অনিষ্ট বিভাগে বিভক্ত হইতেছে। যদিও আমি ঐরূপই; তথাচ অকারণে বা কোনও অজ্ঞাত কারণে নিশ্চয়ই আমাতে মল সংক্রামিত রহিয়াছে। বুঝি বা এইজন্যই আমি সেই পরমপদের সন্ধান প্রাপ্ত হইতেছি না। মুনিবর! এই যে মনের কথা কহিলাম, উহা আমার অনাত্মীয়; অথচ উহাকে আমি ক্ষালন করিয়া ফেলিতে পারিতেছি না; সেইজন্যই দারুণ দুঃখভোগ আমার হইতেছে।

কুম্ভ কহিলেন,—হে মহাভুজ! আপনাতে যে মহামল সংক্রামিত রহিয়াছে, উহা সৎই হউক, আর অসৎই হউক, উহাতেই আপনি সংসারী হইয়া অবস্থান করিতেছেন; অতএব ঐ মহামল কি, স্পষ্ট করিয়া নির্দ্দেশ করুন।

শিখিধ্বজ কহিলেন,—অহম্ভাবকে চিত্ত-পাদপের বীজ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ঐ অহম্ভাবই আমার মল। এই মল কিরূপে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করিতে হয়, সে উপায় আমি জানি না; যদিও বারম্বার উহাকে বর্জ্জন করিতেছি, তথাচ আবার আসিয়া উপস্থিত হইতেছে।

কুম্ভ কহিলেন,—রাজন্! কারণ হইতে যে কার্য্যের উৎপত্তি, তাহা সর্ব্বত্রই অবিসম্বাদী। যাহা কারণ হইতে অনুৎপন্ন, তাহা অসত্য। দৃষ্টান্ত স্থলে বলা যায়—যেমন দ্বিচন্দ্র; দ্বিচন্দ্রের অস্তিত্ব কোথাও নাই; উহা মিথ্যা। এই সকল চিন্তা করিয়া আপনি সমুদায়ের বীজানুসন্ধান করুন। ফল কথা এই যে, যেমন অহম্ভাব হইতে মন প্রভৃতির আবির্ভাব, তেমনি অহম্ভাবের আবার আবির্ভাব কোথা হইতে হয়, তাহা এখন নির্ণয় করিয়া বলুন।

শিখিধ্বজ কহিলেন,—মুনিবর! আমার মনে হয়, যাহা 'আমি' ইত্যাকার জ্ঞান, এই জ্ঞানই অহম্ভাবের কারণ। এইজন্য বলি, হে বিজ্ঞ! আমার যাহাতে এবম্প্রকার জঘন্য জ্ঞান নিরস্ত হয়, তাহার উপায় আপনি নির্দ্দেশ করুন। যাহা আত্মচৈতন্য, তাহা চেত্যভাবে ভাবিত হইতেছে বলিয়াই আমি এই দেহাদি-ভাবে বিভোর হইয়া নিরন্তর কেবল দুঃখভোগের নিমিত্তই অবস্থিত রহিয়াছি। সুতরাং হে মুনে! আমার অযথা জ্ঞানের উপশান্তির নিমিত্ত আপনি এই চেত্যভাব নিরসনের উপায় নিরূপণ করুন।

কুম্ভ কহিলেন,—রাজন্! আপনি যদি চিত্তের চেত্যভাব উপগত হইবার পক্ষে চেত্যকেই কারণ বলিয়া জানিয়া থাকেন, তবে আপনার অভিপ্রায় কি, তাহা প্রকাশ করিয়া বলুন। আপনার কথা শুনিয়া পরে ভবৎকথিত কারণ যে প্রকৃত নহে, তাহা আপনাকে অবগত করাইয়া দিব। যাহা কারণ নহে, অথচ আপনার নিকট জ্ঞেয়-জ্ঞানরূপ চেত্য-চৈতন্যের কারণ হইয়া দণ্ডায়মান, আপনি তাহা প্রকাশ করিয়া বলুন।

শিখিধ্বজ কহিলেন,—হে মুনে! এই যাহা দেহাদি অর্থাৎ বাহ্য ও আধ্যাত্মিক পদার্থের সত্তা, তাহাই আমার ধারণায় জ্ঞেয়-জ্ঞানরূপ

চেত্য-চৈতন্যের কারণ বলিয়া প্রতিভাত। বায়ু থাকিলেই স্পন্দ হয় বলিয়া বায়ু যেমন স্পন্দের কারণ হয়, তেমনি দেহাদি বস্তু বিদ্যমান আছে বলিয়াই অহন্তাব জ্ঞান দেহাদিরূপে প্রকাশ পাইতেছে। তবে ঐ যে বস্তু সত্তা, উহা আবার অমূর্ত্ত বস্তুর জ্ঞান হইবার কালীন অসত্যরূপে প্রতীত হইয়া থাকে। দেহাদি বস্তুসত্তার অসত্তা অবগত হইলে চিত্তবীজ অহন্তাব জ্ঞান উপশান্ত হয়। কিন্তু আমি দেহাদি বস্তুর সত্তা অবগত হইতে পারিতেছি না। তাহা যাহাতে আমার হৃদয়ঙ্গম হয়, আপনি তাহারই উপদেশ প্রদান করুন।

কুম্ভ কহিলেন,—রাজন্! দেহাদি বস্তু যদি প্রকৃত পক্ষে থাকিত, তবেই তাহার সত্তা হইতে পারিত, দেহাদি বস্তু বা তৎসত্তা তো একেবারেই নাই; সুতরাং আপনি অবগত হইবেন কিরূপে?

শিখিধ্বজ কহিলেন,—মুনে! যাহার স্বরূপ স্পষ্টই উপলব্ধিগোচর হইতেছে, সেই কলনাত্মক বস্তু অসৎ হইল কিরূপে? ফলে দেহাদি তো স্পষ্টতই দেখা যায়, ইহার অপলাপ করা হইতেছে কিরূপে? ভাবিয়া দেখুন, যাহা অন্ধকার, তাহার আবার প্রকাশ হইবে কি প্রকার? হে মুনে! এই হস্ত-পদাদি-বিশিষ্ট দেহ তো প্রত্যক্ষই রহিয়াছে। ইহা কার্য্যফলে উল্লসিত ও সততই অনুভূত হইতেছে। অতএব এ দেহ নাই; এ আপনার কিরূপ কথা, বুঝিলাম না।

কুম্ভ কহিলেন,—রাজন্! যে কার্য্যের কারণ বিদ্যমান নাই, তেমন কার্য্য কিছুই নাই, তবে যে বিনা কারণে কার্য্যের জ্ঞান হয়, তাহা ভ্রম মাত্র। এই যে দেহাদিরূপ কার্য্য, ইহাও কারণ বিনা ঘটে নাই, কারণ না থাকিলে ইহা প্রত্যক্ষগোচরও হইত না। ফলে যাহার বীজ নাই, তেমন দ্রব্য কুত্রাপি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন কি? কারণ বিনা কার্য্যের যে সৎস্বরূপে অনুভূতি, তাহা মরু-মরীচিকা-জলের ন্যায় দ্রষ্টার ভ্রমবশতই ঘটিয়া থাকে। ফল কথা, এই অবিদ্যমান দেহাদি কেবল মিথ্যা ভ্রমবশতই বিদ্যমান বলিয়া জানিবেন। জানিবেন—যে যত্ন করিয়া তথ্য নির্ণয় করিতে প্রস্তুত নহে, তাহারই নিকট মরুমরীচিকা-জল সত্যরূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে।

শিখিধ্বজ কহিলেন,—দ্বিতীয় চন্দ্রবিম্ব প্রভৃতি একেবারেই মিথ্যা, তাদৃশ মিথ্যা বস্তুর কারণ অন্বেষণার্থ কেই বা প্রয়াস পাইয়া থাকে? বন্ধ্যানন্দনের সর্ব্বাঙ্গে কাহারই বা অলঙ্কার শোভা দেখিবার জন্য সাধ হয়?

কুম্ভ কহিলেন,—রাজন্! এই যে অস্থিপঞ্জরময় দেহাদি—ইহাকে কারণ বিনাই কার্য্য বলা হয়। আপনি এতাদৃশ কার্য্যকে অবিদ্যমান বলিয়াই অবগত হইবেন।

শিখিধ্বজ কহিলেন,—এই যে হস্ত-পদাদি-বিশিষ্ট দেহ সর্ব্বদাই দেখা যাইতেছে, পিতাকে ইহার কারণ বলা যাইতে পারে না কি?

কুম্ভ কহিলেন,—রাজন্! পিতা যেআছেন, তাহার সত্যতা সম্বন্ধে প্রমাণ কি? যখন কারণ নাই, তখন পিতাও তো নাই। দেখুন, যাহা অসৎ বস্তু হইতে জাত, তাহা তো অসৎ বলিয়াই নির্দ্দিষ্ট। যে সকল কার্য্য পদার্থ, তাহাদের কারণই বীজনামে নিরূপিত। বীজ ভিন্ন অঙ্কুরোৎপত্তি কখনই সম্ভবপর নহে। কার্য্যের যাহা কারণ-বীজ, তাহা এ জগতের কুত্রাপি অনুসন্ধানে মিলে না। বীজের অভাবে কার্য্যের অস্তিত্ব নাইই বলিতে হইবে; তবে যে অহৈতুক কার্য্যের জ্ঞান জন্মে, সে কেবল ভ্রান্তি বৈ আর কিছুই নহে। কারণ বিনা কার্য্য যখন সত্য সত্যই নাই, তখন তাহার জ্ঞান যে ভ্রান্তি, এ কথা আর বিশেষ করিয়া বলিতে হইবে কি? অকারণ কার্য্যের অনুভব—দ্বিতীয় চন্দ্র, মরুগত জল ও বন্ধ্যানন্দনেরই অনুরূপ।

শিখিধ্বজ কহিলেন,—এ জগতে পুত্র, পিতা ও পিতামহ, এই সকলের মধ্যে পিতামহই সর্ব্বপ্রথম; ফলে যিনি হিরণ্যগর্ভ, তিনিই সকলের আদি; তাঁহাকেই কেন এই ত্রিজগদুৎপত্তির কারণ বলা হয় না?

কুম্ভ কহিলেন,—রাজন্! যিনি আদ্য পিতামহ আখ্যায় অভিহিত, তিনিও তো নাই। কারণের অভাবে কোন পদার্থেরই অস্তিত্ব নাই; পিতামহের সত্তা স্বীকার করিব কিরূপে? তাঁহার তো কারণ একেবারেই নাই। এ জগতের বিধাতৃরূপে পিতামহ সকলের প্রত্যক্ষ হন বটে, কিন্তু তিনি সেই মায়োপাধিক পরমাত্মা বৈ আর কেহই নহেন।

পরমাত্মা হইতে পিতামহ সম্পূর্ণ অস্বতন্ত্র; তবে যে সেই চিন্ময় আত্মা হইতে তিনি স্বতন্ত্ররূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকেন, তাহা মরু-মরীচিকায় জলের ন্যায় ভ্রান্তি প্রযুক্ত প্রতীতিই বলা যায়। আর পিতামহের যে কার্য্যকারিতা, তাহাও ভ্রান্তিময়, বৈ আর কিছুই নয়। আমার উপদেশে আপনি হয় তো এখন বুঝিতে পারিয়াছেন যে, পিতামহ হইতে এ জগতের উৎপত্তি, সম্পূর্ণই মিথ্যা; ঐ যে মিথ্যা ধারণা ছিল, তাহা বোধ হয় এখন আপনার চলিয়া গিয়াছে। অবশিষ্ট যে ভ্রমটুকু এখনও আপনার রহিয়াছে, তাহা ক্রমে নিরাস করিয়া দিতেছি।

হে ভূপ! জানিবেন—চিদাত্মাই সর্ব্বোপরি সর্ব্বপ্রধান দেবতা; এই যে ব্রহ্মাদি তৃণস্তম্ব পর্য্যন্ত নিখিল জগৎ-পরম্পরা, ইহা চিদাত্মরূপে চিদাত্মাতেই পরিস্ফুরিত হইতেছে। সেই চিদাত্মারই এই পদ্মযোনি প্রভৃতি নাম নিরুক্তি। তাঁহাতেই এ সকলের অভিব্যক্তি। এই সকল বুঝিয়া সুঝিয়া বিচারালোচনা করিয়া দেখিলে, দেখা যাইবে—একমাত্র শান্ত শিব ব্রহ্মই সর্ব্বরূপে বিরাজ করিতেছেন।

চতুর্নবতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৯৪ ॥

পঞ্চনবতিতম সর্গ।

শিখিধ্বজ কহিলেন,—মুনে! ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্য্যন্ত এ জগৎ যদি একটা ভ্রম বলিয়াই বিজৃম্ভিত, তবে ইহা অর্থক্রিয়ায় সমর্থ হইল কিরূপে? এবং কিরূপেই বা ইহা দুঃখের কারণ হইল?

কুম্ভ কহিলেন,—অত্যন্ত শৈত্যবশে শিলাত্ব প্রাপ্ত হইলে, সলিলের যেমন কাঠিন্য অনুভব-গম্য হয়, তেমনি এই যে জগদ্‌ভ্রম, ইহাও সত্যাকারে ভাবিত হইতেছে বলিয়াই সুদৃঢ় সত্য হইয়া অর্থক্রিয়ায় সমর্থ ও দুঃখের হেতুভূত হইতেছে। এই ঘনীভূত অজ্ঞান যখন শ্লথ হইতে থাকে, তখন

জগদ্ভাবও ক্রমশঃ নষ্ট হয়; ইহাই বুধমণ্ডলীর অভিমত। অজ্ঞান অপসৃত না হইলে এই জগদ্ভাবের অপগম কখনই হইবার নহে। যদি বাহ্য বুদ্ধি-বৃত্তি ক্ষীণ করা যায়, তবেই অজ্ঞান নষ্ট হইতে পারে। অজ্ঞান অপসারিত করিয়া পরম পদের সাক্ষাৎকার প্রাপ্ত হইতে পারিলেই বাহ্য দৃষ্টির উপশম ঘটিয়া থাকে। লৌকিক ব্যাপারেও প্রত্যক্ষ করা যায়, যে পদার্থ পূর্ব্বাপেক্ষা ক্রমশঃ সূক্ষ্মভাব লাভ করিতেছে, তদীয় পূর্ব্ব-ভাব ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ হইয়া সম্পূর্ণই লয় পাইয়া থাকে। এইরূপ ক্রমে অজ্ঞানের উন্মূলন করিতে পারিলেই আপনি সেই আদিভূত পূর্ণ ব্রহ্ম-রূপে অবস্থান করিতে পারিবেন। তাই বলিতেছি,—রাজন্! আপনি এই জগতের সত্তা মৃগতৃষ্ণা-সলিলের সত্তার ন্যায়ই অবধারণ করুন। পিতামহের অভাবে এই ক্ষিতি প্রভৃতি ভূতসন্ততি অসতী বা মিথ্যাই হইয়া থাকে। বস্তুতঃ যাহা প্রকৃত অসিদ্ধ, তাহার দ্বারা কোন কিছু সিদ্ধ করিবার চেষ্টা কস্মিন্ কালেও সিদ্ধ হইবার নহে। এই উপলভ্যমান ক্ষিতি প্রভৃতি ভূতপঞ্চক মরীচিকা-জলের ন্যায় প্রকাশমান; বিচার করিতে বসিলে শুক্তিতে রজতজ্ঞানের ন্যায় ইহা বিলীন হইয়া যায়। কারণ ব্যতিরেকে কার্য্য হয় না, এরূপ নিয়ম থাকিলেও যে কার্য্য-সত্তা উপলব্ধ হয়, তাহা কেবল মিথ্যা জ্ঞানেরই খেলা। মিথ্যা দৃষ্টি লইয়া যে বস্তু প্রত্যক্ষ করা যায়, তাহার সত্তা কুত্রাপি সম্ভব হইতে পারে না। দেখিয়াছেন কি, মরীচিকা-জল দ্বারা কেহ ঘট পূর্ণ করিতে পারিয়াছে?

শিখিধ্বজ কহিলেন—যিনি অজ, অনন্ত, অব্যক্ত, অচ্যুত, শান্ত, শূন্য-স্বরূপ ব্রহ্ম, তিনিই কেন আদিবিধাতা পিতামহের কারণ নহেন?

কুম্ভ কহিলেন—যাহা আদি, তাহাই কারণ, যাহা পরবর্ত্তী, তাহাই কার্য্য; কিন্তু ব্রহ্মের পূর্ব্বত্ব পরত্ব নাই। কাজেই তাঁহাকে কারণ বা কার্য্য কিছুই বলা চলে না। তিনি সর্ব্বাতীত; তাঁহার কর্ত্তৃত্ব, কর্ম্মত্ব বা কারণত্ব নাই, উপাদান বা নিমিত্ত কারণও নাই। তিনি বিচারাতীত, জ্ঞানাতীত। তাঁহার কর্ত্তৃত্ব হইবে কিরূপে? কাজেই কারণ নাই বলিয়া এ জগৎ যখন কর্ম্ম হইতে পারিল না, তখন ইহাকে আপনি এমনই ভাবে ভাবনা করুন

যে, ইহাতে দ্বৈত-পরিচ্ছেদ নাই, আদি ও অন্তরূপ দেশ ও কাল-পরিচ্ছেদ নাই; ইহা একমাত্র সেই সচ্চিদেকরস ব্রহ্মই। যিনি তর্কের অতীত, জ্ঞানের অতীত, শিব, শান্ত ব্রহ্ম, তিনি কিরূপে কর্ত্তা বা ভোক্তা হইতে পারেন? তাই বলিতেছি, এ সকল কিছুই ব্রহ্মকৃত নহে; এই জগদাদিরও বিদ্যমানতা নাই। আপনিও কর্ত্তা বা ভোক্তা নহেন। সেই যে শান্ত শিব অজ ব্রহ্ম, আপনি তাহাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কারণ ব্যতিরেকে এ জগৎ কার্য্য নহে; তবেই যে অকারণ ইহা কার্য্য বলিয়া অবধারণ, তাহা কেবল ভ্রান্তিরই বিজৃম্ভণ। অকার্য্য বলিয়া এ জগতের সত্তাও নাই। এইরূপে দেখিলে এই সৃষ্টিও কিছুই নাই। এ জগৎ কোন কারণ-সম্ভূত কার্য্য নহে; কাজেই এই জগদাখ্য বস্তুর অভাবই প্রতিপন্ন হইতেছে। অতএব ইহাকে সিদ্ধ বলিয়া অবধারণ করিতে কে যাইবে? ফলে, তত্ত্বদর্শী ব্যক্তি এদিকে অগ্রসরই হন না। অতএব উল্লিখিত জ্ঞান যখন নাই, তখন অহন্তারের আবার কারণ কি? ফলে তাহাও তো নাই। এতাবতা বুঝিতেছি, আপনি এখন অবশ্যই বিশুদ্ধ হইয়াছেন, মুক্ত হইয়াছেন। আপনার নিকট বন্ধ-মুক্তির কথা এখন অকিঞ্চিৎকর।

শিখিধ্বজ কহিলেন—প্রভো! আমি বুঝিলাম, আপনি সুযুক্তি-সম্বলিত উপদেশই দিয়াছেন। বুঝিলাম—কারণের অভাবে কর্ত্তার সত্তা অনুমিত হয় না। এই যে পরিদৃশ্যমান বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড, ইহাকেও আমি এখন ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন দেখিতেছি না; কর্ত্তার অভাবে ক্রিয়াধীন জগতের সত্তা থাকাও সম্ভবপর নহে। চিন্তাদি দুঃখের কারণ নহে; অহন্তাবাদিও কিছুই নহে। এখন আমি বিশুদ্ধ হইলাম, জ্ঞানী হইলাম, শিব ও শান্তিময় হইলাম। বুঝিলাম—একমাত্র চিৎসত্তা ব্যতীত চেত্য নামে কোন কিছুই নাই। সেই চিৎ আমিই; অতএব আমাকেই আমি নমস্কার করি। ভবদভিব্যক্ত যুক্তি লইয়া বিচার করিলে, ইহাই প্রতীত হয় যে, 'আমি' 'তুমি' প্রভৃতি সমস্ত দৃশ্যই মিথ্যা। আমি বড়ই বিস্ময়ের বিষয় মনে করিতেছি যে, অদ্য বহুদিনের পর এই দিক্ দেশ ও কালাদি-অবচ্ছিন্ন বিবিধ ক্রিয়াময় জগদ্বস্তু যেন আমার কাছে বিলয় পাইয়া গিয়াছে। এক-

মাত্র অনশ্বর শান্ত ব্রহ্মই বিরাজিত আছেন। অহো! আমি শান্ত হইলাম, নির্ব্বাণ পাইলাম, পরিপূর্ণরূপে অবস্থিত হইলাম। আমি যাইতেছি না, প্রকট হইতেছি না, অস্তমিত হইতেছি না; একই ভাবে আছি। আপনি যেমন চিদেকরসরূপে যথাস্থিত হইয়া রহিয়াছেন, এই ভাবেই থাকুন। আমিও সেই শিব শুভ পাবন, অবাঙ্মনস-গোচর আত্মস্বরূপ হইয়াই রহিলাম।

পঞ্চনবতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৯৫ ॥

ষণ্ণবতিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—এইরূপে সেই শিখিধ্বজ রাজা আত্মবিশ্রান্তি প্রাপ্ত হইয়া প্রশান্তমনে নির্ব্বাত নিস্পন্দ দীপশিখার ন্যায় অচল অটল-ভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন কুম্ভ দেখিলেন—নরপতি নির্ব্বিকল্প সমাধি অবস্থায় উপনীত হইয়াছেন। তিনি স্বীয় মনকে ব্রহ্ম-ভাবে পরিণামিত করিয়া ব্রহ্মৈকরস-বিগাহনে সমুৎকণ্ঠিত হইয়াছেন। তদ্দর্শনে কুম্ভ তাঁহাকে এইরূপ বক্ষ্যমাণ বাক্যে প্রবোধ প্রদান করিলেন যে,—হে সাধো! আপনি অধুনা অজ্ঞাননিদ্রা হইতে উত্থান করিয়াছেন, আপনার প্রবোধোদয় হইয়াছে; আপনি—না অস্তমিত, না অনস্তমিতভাবে যথাকর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া যাউন। রাজন্! অধুনা আপনি জীবন্মুক্ত হইয়াছেন। কল্পিত পরিচ্ছিন্ন ভাব আপনার চলিয়া গিয়াছে। কোন অনিষ্টাশঙ্কা এক্ষণে আর আপনার নাই। আপনি হঠাৎ স্ফুরিত অপরিচ্ছিন্ন পূর্ণাত্মরূপে বিরাজ করিতেছেন।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—কুম্ভ কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়া রাজা শিখিধ্বজ সম্যক্ জ্ঞান প্রাপ্ত হইলেন। এতকাল ধরিয়া তিনি মোহের পেটিকায় আবদ্ধ ছিলেন। এখন তাহা হইতে নিষ্ক্রমণপূর্ব্বক অতীব শোভা ধারণ করিলেন। শিখিধ্বজের আত্মা মুক্ত ও বুদ্ধি বিশ্রান্ত হইল। তিনি

দৃশ্য পদার্থনিবহের অসত্তা উপলব্ধি করিয়া পুনরপি কুম্ভসমীপে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে মদীয় জ্ঞানানন্দ-দায়িন্! আমি এখন প্রায় পূর্ণজ্ঞান হইয়াছি; তথাচ প্রকৃত জ্ঞান সুদৃঢ় করিয়া রাখিবার অভিপ্রায়ে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসিতেছি। আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, যাহা অবিদ্যাবৃত, শিব, শান্ত, নিরাভাস পদ, তাহাতে এই দ্রষ্টা, দৃশ্য ও দর্শনাভিধেয় জগতের প্রত্যয় হয় কেন?

কুম্ভ কহিলেন,—রাজন্! আপনার ইহা উত্তম প্রশ্ন। আপনি তত্ত্বজ্ঞান লাভে পূর্ণ শোভা ধারণ করিলেও এখনও আপনার ঐ বিষয় যথাযথ বিদিত হয় নাই। অতএব ঐ তত্ত্ব এক্ষণে শ্রবণ করুন। এই চরাচরাত্মক যে কিছু বস্তু দেখা যাইতেছে, প্রলয়ে এ সকলই নষ্ট হইয়া যায়। সে কালে এমন একটা গম্ভীর নিশ্চলভাব পরিশিষ্ট থাকে যে, তাহা না আলোক, না অন্ধকার, কোনরূপেই নিরূপণীয় নহে। মহাকল্পের অবসানকালীন সেই যে বিশাল ভাব, তাহাই সার বস্তু বলিয়া বিদিত এবং তাহাই শান্ত নির্ম্মল চিদ্বস্তুরূপে প্রকাশমান। তাহাতে কোনও রূপ কলঙ্কলেশ নাই; তাহা কেবল পরমোত্তম জ্ঞানময়। সেই শান্ত শুভ অতি নির্ম্মল বস্তুই বিশাল উজ্জ্বল পরমাত্মক তেজ এবং তাহাই নিশ্চল জ্ঞপ্তিস্বরূপ। ঐ অনিন্দ্য শিব বস্তুর বৈষম্য দোষ নাই এবং উহা কাহারও তর্ক বা জ্ঞানগম্য নহে। পরিপূর্ণ স্থির ব্রহ্মবস্তু বলিতে তাঁহাকেই বলা যায়। তিনি সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম, স্থূলাদপি স্থূল এবং শ্রেষ্ঠাদপি শ্রেষ্ঠ। তাঁহার সূক্ষ্মতা এত যে, পরমাণু পার্শ্বে সুমেরুর ন্যায় এই সূক্ষ্ম আকাশ তাঁহার নিকট অতীব স্থূল বলিয়া প্রতীয়মান হয়। অন্য দিকে তিনি এত বড় স্থূল যে, তাঁহার সম্মুখে এ জগৎ কোথাও পরমাণুবৎ অতি সূক্ষ্ম এবং কোথাও বা একেবারেই অপ্রতীত। এবম্বিধ মায়াশবল ব্রহ্মরূপ অধিষ্ঠানে এই বিশ্বের যে বিস্ফুরণ, ইহা সেই পদ্মনাভের নাভিকমল-জাত ব্রহ্মার অহম্ভাবরূপ জ্ঞানেরই অধ্যাস বলিয়া অবগত হইবেন। অর্থাৎ যিনি সেই বিরাট আত্মা, তিনিই এই জগদাকারে বিরাজমান। বায়ু ও বায়ুস্পন্দ যেমন অভিন্ন এবং শূন্যত্ব ও আকাশত্ব যেমন পার্থক্যহীন, তেমনি ঐ চিন্মাত্র ও অহম্ভাবও পৃথক্ত্ব-বর্জ্জিত। দেশ-কাল-

পরিচ্ছিন্ন জলমধ্যে তরঙ্গ যেমন অবস্থিত, তেমনি দেশ-কালাদিরূপে অপরিচ্ছিন্ন পরব্রহ্মেও কারণ ব্যতিরিক্ত জগৎ বিরাজিত। যেমন দেশ-কাল-পরিচ্ছিন্ন সকারণ সুবর্ণমধ্যে কটক কুণ্ডলাদির অবস্থিতি, তেমনি দেশকাল-পরিচ্ছেদ-হীন পরব্রহ্মে এ জগতের অবস্থান। ব্রহ্মই সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ; তিনিই এই বিশ্ব-সাম্রাজ্যের মহারাজ। এই ব্রহ্মই কেবল অবিনশ্বর। ইহাঁতে দ্বৈতভাব নাই। ইনি নির্ম্মল ও শান্ত-স্বরূপ। এই বিশাল বিশ্ব ইহাঁর নিকট তৃণবিন্দুবৎ প্রতিভাত। সত্য স্বরূপ পরমেশের সত্তাযোগেই এ জগতের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। আত্মস্বরূপ ঈশ্বরের সত্তাজ্ঞানেই এই জগৎসত্তা অনুভবগোচর হয়।

হে নৃপ! এই যে বিশাল বিশ্ব দেখিতেছেন, এতদভ্যন্তরে সেই চৈতন্যরূপ আত্মাই একমাত্র সার পদার্থ। এই চিৎসার বস্তুর দ্বিতীয় কেহই নাই। ইহা একক পদার্থ। দ্বৈত কল্পনা সম্পূর্ণ মিথ্যা; এক-মাত্র শান্ত, সৌম্য, অক্ষয়, অব্যয়, পূর্ণ, আত্মতত্ত্বই কেবল প্রতিভাত। ঐ সর্ব্বময় আত্মতত্ত্বই সর্ব্বদা সর্ব্বভাবে সমুদিত। ইনি অদৃশ্য এবং অলভ্য; তাই ইনি না কার্য্য, না কারণ। ইনি প্রত্যক্ষাদির গম্য নহেন। ইনি এক অনির্ব্বচনীয় অপূর্ব্ব বস্তু; এই নির্ম্মল আত্মাই সর্ব্বস্বরূপ, সূক্ষ্ম অনুভবাত্মক। যাঁহার কোন আখ্যা নাই, যিনি ব্যবহারদশায় আখ্যা-সম্পন্ন হইয়া থাকেন। পরমার্থ দর্শনে যিনি নিরাভাস, প্রভাময় এবং প্রকৃত সৎ হইয়াও যিনি ব্যবহার-দশায় অসৎরূপে উপলভ্যমান, সেই আত্মতত্ত্ব জগতের কারণ হইবেন কিরূপে? ঐ বিশাল আত্মবস্তু হইতে কোন প্রমাণাদির উৎপত্তি হওয়াও অসম্ভব। তিনি না কর্ত্তা, না কর্ম্ম, না কারণ, কিছুই নহেন। তিনি সত্য, অখণ্ড, চিদ্‌ঘন। স্বানুভব তাঁহার স্বরূপ; তিনি নিরাভাস। হে মুনিবৃত্তে! সেই পরব্রহ্ম হইতে কোন পদার্থই উৎপন্ন হয় না। এই যে পরিচ্ছিন্ন কারণবিহীন জগৎ, ইহা সেই দেশ কালাদি পরিচ্ছেদ-পরিহীন পরব্রহ্ম হইতে অভিন্ন।

শিখিধ্বজ কহিলেন,—মুনে! জলাদিতে সকারণ তরঙ্গাদির অবস্থিতির ন্যায় পরব্রহ্মে কারণ ব্যতিরিক্ত জগৎ বা অহন্তাদি বিদ্যমান, আপনার এই বিষম দৃষ্টান্তের মর্ম্ম তো আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।

কুম্ভ কহিলেন—হে মহীপতে! এই জগৎ বা অহন্তাব, এ সমস্ত যে কিছুই নহে—সম্পূর্ণই অসত্য; ইহা বোধ হয়, আপনি এখন হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন। এই দৃশ্যমান জগৎশব্দের অর্থহীন অন্য এক শিবময় জগৎ বিদ্যমান। উহা সূক্ষ্মতম আকাশে আকাশ দ্বারাই নির্ম্মিত। আকাশে যেমন শূন্যতা, তেমনি ঈশ্বরে এ জগতের প্রতিষ্ঠা। এই জগৎ স্বীয় সত্যস্বরূপেরই অনুরূপ; অন্য কোনও রূপের তুলনীয় নহে। এ জগৎকে এইরূপেই জানিতে হয়। এইরূপ জ্ঞানে এ জগৎ শিবময় হইয়া উঠে। সম্যক্ স্বরূপে অবগত হইলে, স্থানভেদে বিষও অমৃতবৎ কার্য্যকর হয়। যথাযথ জ্ঞানের অভাব নিবন্ধনই এ জগৎ দুঃখদায়ক ও অমঙ্গলময় হইয়া থাকে। বিষ জ্ঞানে অমৃত পান করিলেও তাহা বিষবৎ কার্য্যক্ষম হইয়া উঠে। এই চিন্ময় মহেশ্বর যে অবস্থায় যেরূপ জ্ঞান করেন, তদবস্থায় তেমনি রূপ অচিরাৎ ধারণ করিয়া থাকেন। তিমিরাদি নেত্র-রোগগ্রস্ত ব্যক্তিবর্গের নিকট বহ্নিশিখা বিচিত্রাকারে প্রতিভাত হয়; কিন্তু উহার স্বরূপের অন্যথাভাব একটুকুমাত্রও ঘটে না। ভ্রান্ত তাহারা; তাই ভ্রমের ঘোরে তাহাদের নিকট উহা ভিন্নাকারে প্রতীত হয়। এইরূপে দেখা যায়, এই ব্রহ্মসত্তা ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের নিকট ভিন্ন জগদাকারে বিভাবিত হইলেও উহা যে প্রকৃত সত্তা, তাহাই আছে; তাহার অন্যথা ভাব ঘটে নাই। ব্রহ্ম সদাই চিৎস্বরূপে বিরাজমান; কিন্তু তিনি স্বীয় স্বরূপ ভুলিয়া যান; তাই দেহ, দেহী, জগৎ, ইত্যাদি ইত্যাদিরূপে লক্ষিত হইয়া থাকেন। ফল কথা, তিনি সেই একই শিব শান্ত কেবলরূপে বিরাজিত। তাঁহাতে জগৎ বা অহন্তাবাদি লইয়া প্রশ্ন উত্থাপন করা একান্তই অবৈধ। যাহা সৎ, তদ্‌বিষয়ক প্রশ্ন উত্থাপনই সুশোভন। দেখিবামাত্র যাহার সত্তা অনুভূতিগোচর হয় না, তথাবিধ বিষয়ের প্রশ্ন উত্থাপনে ফল তো কিছুই নাই। সুবর্ণত্বের সত্তা যেমন অপ্রত্যক্ষ, পরন্তু কেবল সুবর্ণ-পদার্থের সত্তা চক্ষুর গোচর হয়, ঈশ্বরেও তেমনি জগৎ বা অহন্তাবাদি ভিন্ন অন্য কোন বিষয়ই জিজ্ঞাস্য নাই। ফলে তাঁহাতে জগদাদি বিষয়ই জিজ্ঞাসার বিষয়, তদ্‌ব্যতীত আর জিজ্ঞাস্যের কিছুই নাই। এতাবতা কথা এই, কারণ নাই; কাজেই জগৎ বলিয়া কিছুই নাই। সেই একাদ্বয় ব্রহ্মই

জগদ্ভাবে বিবর্ত্তমান। ব্রহ্মের যে প্রকৃত স্বরূপের অস্ফুরণ, তাহাই এই জগদাকারে প্রকাশমান। এই যে সকল ভাব পদার্থ দেখা যায়, এতৎ-সমস্ত মায়াময় ঈশ্বরেরই অবস্থান্তর বৈ আর কিছুই নয়। এই ভাব-পদার্থ সকল সেই মায়াময় ঈশ্বর দ্বারাই পরিচালিত হইয়া স্ত্রীপুরুষানু-মানবৎ পঞ্চভূত সহযোগে চমৎকারিতা উৎপাদন করিতেছে। কেবল চিন্মাত্রই মায়িক চিন্মাত্রে পরিবৃত হইয়া বিবিধাকারে তত্তৎকার্য্য-ভাবে পরিচ্ছিন্ন হইতেছে। ঐ চিন্মাত্রই যখন কেবল অপরিচ্ছিন্ন অজ্ঞান-স্বরূপে ভাসমান হইতে থাকেন, তখনই অপূর্ব্ব ভাব ধারণ করেন। তদীয় পূর্ণ ভাব দ্বারাই যাবতীয় বাহ্য বস্তু পরিপূর্ণ হইতেছে। এই সকল বাহ্য বস্তু তাঁহারই পূর্ণ ভাবের অংশ বৈ আর কিছুই নহে। চিন্ময় আত্মায় কেবল চিৎস্বরূপই প্রতিভাসমান। সেই চিৎ-স্বরূপের অস্ফুরণই এই সৃষ্টির আকারে অনুভূয়মান। সৃষ্টির পূর্ব্বক্ষণে চিৎ তদীয় স্বস্বরূপ পরিহার না করিয়া নিজেই মনোরূপী হইয়া থাকেন। ঐ মনোরূপ নিরাময়, অনন্ত, অনাদি ও তেজোময়। অনন্তর তিনি স্থূলত্ব-কল্পনায় অবভাসিত হইয়া বিরাটভাব ধারণপূর্ব্বক নিজেই সেই সেই নিজাকার নিরীক্ষণ করেন। তাঁহার সেই আকার তদীয় স্বরূপ হইতে কিছুমাত্র ভিন্ন নহে বলিয়া সৎই। যাহা হউক, পরে তিনি ভাবনার প্রাবল্যে ভূতভাব ধারণপূর্ব্বক ক্ষণমধ্যেই দৃশ্যভাব ধারণ করিয়া থাকেন। যিনি শান্ত, স্বভাবতই নাম-রূপ-বর্জ্জিত, অনির্ব্বচনীয় স্বপ্রকাশ, জ্ঞানস্বরূপ, সেই একমাত্র আত্মতত্ত্বই ঐরূপে মায়াদৃষ্টিরূপ জগদাকারে পরিস্ফুরিত হইতেছেন। সুতরাং তিনিই সর্ব্বভাবে বিরাজমান।

ষণ্ণবতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৯৬॥

সপ্তনবতিতম সর্গ।

কুম্ভ কহিলেন,—রাজন্! সদা শান্ত ব্রহ্ম হইতে কোন বস্তুই জন্মিতেছে না বা তাহাতে কিছুই লয় পাইতেছে না; সুতরাং দেশকালাদি-পরিচ্ছিন্ন সুবর্ণে যেমন জন্য-জনকত্ব ভাব বিদ্যমান, তেমনি ব্রহ্মে ও জগতে কার্য্য-কারণ ভাব বিদ্যমান নাই। ঐ ব্রহ্ম সদাই স্বীয় সত্তায় অবস্থিত। তিনি কাহারও বীজ বা কারণ নহেন। যিনি ব্রহ্ম, তিনি বিশুদ্ধ জ্ঞান-স্বরূপ। শুদ্ধ জ্ঞান ব্যতিরিক্ত ব্রহ্মে আর কিছুই নাই। এই জগৎ বা অহন্তাবাদি সকলই সেই অনন্ত ব্রহ্ম।

শিখিধ্বজ কহিলেন,—হে মুনে! বুঝিলাম—শান্ত শিব ব্রহ্মে জগৎ বা অহন্তাবাদি কিছুই নাই। কিন্তু বুঝিতেছি না, তাঁহাতে সৃষ্টি-বিষয়ক অনুভব থাকে কিরূপে? অতএব উহা আমার নিকট প্রকাশ করিয়া বলুন।

কুম্ভ কহিলেন,—সেই চিৎ অনাদি অনন্ত জ্ঞানময়। এই ভুবনাদি তাঁহার কলেবর। তিনি অতি স্বচ্ছ, জ্ঞানাতীত ও শূন্য হইয়াও পরিপূর্ণ। তিনি কোন বাহ্য বস্তু নহেন; শূন্যতাও নহেন। কেবল জ্ঞানস্বরূপ চৈতন্যই তিনি। জলের দ্রবত্ব যেমন কারণ-হীন, তেমনি সেই চিতের অচিন্তাবও কারণ-বর্জ্জিত অনন্ত, ঈশ্বরস্বরূপ। তিনি আপনাতেই সমভাবে বিরাজমান। কেন না, তদীয় সত্তা বা স্বচ্ছভাবের ব্যবচ্ছেদক কিছুই নাই এবং তাঁহার বিরোধী অসত্তা বা অস্বচ্ছভাবের প্রতিযোগীও কেহই নাই। কাজেই তাঁহাতে অস্বচ্ছ ভাবের সম্পূর্ণ অভাব বলিয়া কেবল স্বচ্ছ ভাবই নিয়ত বিরাজিত। তদীয় স্বচ্ছ চিৎস্বরূপ অস্বচ্ছ জগদ্ভাবের কারণ বলিয়া কল্পনা করা যায় না। কেন না, তাহা হইলে 'তিনি কূটস্থ অদ্বয়' এইরূপ শ্রুতিবাক্যের বিরুদ্ধ কল্পনা হইয়া পড়ে। তিনি সেই একাদ্বয় শান্ত চিৎ, ইহাই শ্রুতির অভিমত। ফল কথা, যাঁহাকে কোনওরূপে ইঙ্গিত করিয়া উঠা যায় না, যাঁহার আকৃতি কীদৃশী,

তাহাও বলিবার যো নাই; সুতরাং তিনি কিরূপে এই দৃশ্যমান বিশ্বের কারণ বলিয়া বর্ণিত হইবেন? এতাবতা ইহাই স্থির যে, ব্রহ্ম কোন কার্য্যেরই কখন কারণ বা বীজ হইতে পারেন না; কাজেই এই সৃষ্টি যে অসৎ, ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত। এই দৃশ্যমান সমস্ত বস্তুই চিত্তের সহিত অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ সম্পন্ন; এতই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যেন, ইহা চিদ্ঘনরূপেই উত্থিত। কাজেই বারবার বলিতেছি, অহম্ভাব ও জগৎ শব্দ প্রভৃতি কখনই কার্য্য নহে; কার্য্য থাকিলে কারণ নিশ্চয়ই থাকিত; তাহা তো নাই। এই দ্বৈতাদি চিজ্জড়াংশ আকাশ-কুসুমবৎ অলীক কল্পনা মাত্র। এ কথাও বলা যায় না যে, এ জগৎ চিদ্রূপ হয় হউক, চিদ্রূপ ব্রহ্মাই চিদ্রূপ জগতের কারণ। কেন না, তাহা হইলে এ জগৎ নিত্য হইয়া পড়ে। ইহার আর কখনই নাশ সম্ভাবনা থাকে না; কেন না, বিনাশ-দশাতেও সেই নিত্য চিতের বিদ্যমানতা থাকিয়া যায়। চিতের নাশ চিদ্রূপই; তাহা অন্য নিরপেক্ষ, এরূপ কথাও বলা যাইতে পারে না। কেন না, তাহা হইলে চিদ্রূপ জগতের নাশ চিদ্রূপ, কিরূপে স্বীয় উৎপত্তি বা স্বপ্রতিযোগীর প্রকাশকারী হইতে পারে? যিনি সাক্ষী চৈতন্য, তাঁহার দ্বারা উদ্ভব ও অভাব, এতদুভয়ের অনুভব হওয়া তো সম্ভব নহে; কেন না, চিৎ কখনই চিতের বিষয় হইতে পারে না; সুতরাং ঐ উদ্ভব ও অভাবধর্ম্মী জগৎ জড় বস্তু। এইরূপে জগতের জড়ত্ব সিদ্ধি হওয়ায় কারণাভাবে সর্ব্বদাই ইহার উদ্ভব ও অভাব হইতে থাকে। কেন না, ঐরূপ উদ্ভব ও অভাব নিবারণ করে, এমন তো কেহই নাই। পক্ষান্তরে কথা এই, এ জগৎ যে এরূপে আপনার উদ্ভব ও অভাবধর্ম্মী, তাহারও তো প্রমাণ কিছুই নাই এবং উহা অনুভবেরও বিরোধী হইয়া পড়ে। অতএব এই অনুভব-বিরুদ্ধ প্রমাণ-পরিহীন জগতের নিয়ত উদ্ভব-অভাব অঙ্গীকার না করিয়া বরং যাহা বিবেকী বিদ্বৎসমাজের অনুভবগম্য, অথচ শ্রুতিবাক্যের অবিরুদ্ধ, সেই অখণ্ড চিৎস্বরূপেরই অঙ্গীকার করা হয় না কেন? ঐরূপ অঙ্গীকারে বাধার বিষয় তো কিছুই নাই। তবে বলিবে—চিৎ অচিৎ ইত্যাদি ইত্যাদি নানাভাবের বিকাশ হইতেছে কেন? উত্তরে বলিব—ঐরূপ বিকাশ চিত্তেরই বিচিত্র লীলামাত্র বৈ আর কিছুই

নহে। এক সেই চৈতন্যসত্তাই আছেন। দ্বিত্ব বা একত্ব কিছুই নাই। তাই বলিতেছি, রাজন্! আপনি জানিবেন—এই বাহ্য জগতের সত্তায় একান্তই অসদ্ভাব; ইহাই বটে নিশ্চিত। এ বিষয় লইয়া ভাবনা করা অসম্ভব; তাই আপনার অহম্ভাবনাও অস্তমিত। যখন অহম্ভাবনারই অভাব, তখন চিত্ত আবার কে? তাহাও তো নাই। এই সকল যুক্তি-জালের বিস্তারে প্রতিপন্ন হইল যে, 'অহং'রূপ চিত্তের বিদ্যমানতা নাই বলিয়া দৃশ্য জ্ঞানরূপ ভেদও কিছুই নাই। একমাত্র পরমাকাশময় চিৎই আছেন। তিনি বাসনা-বিহীন, শান্তমনা ও মৌনী। তিনি সদেহ হউন, বা বিদেহ হউন, সকল পদার্থেই অচলের ন্যায় অচলভাবে বিরাজমান। এইরূপে জড় পদার্থ যখন একেবারেই অসিদ্ধ, শুদ্ধ চিৎই যখন উপলভ্য-মান, তখন চিত্তে 'অহ'মিত্যাকার পদার্থ-সত্তা নাই-ই। বেদার্থচিন্তায় দেখা যায়, একমাত্র ব্রহ্মই অনুভূতি-বিষয়। তিনিই জ্ঞানময় ও একমাত্র সত্যস্বরূপ। সুতরাং চিত্তনামক পদার্থ কোথায় বিদ্যমান?

অতএব যিনি নির্ম্মল, কার্য্য-কারণাদি অবস্থার অতীত, শাশ্বত, অনেক হইয়াও এক এবং আদি-মধ্য-বিরহিত, সেই ব্রহ্মই কেবল আছেন। আপনিই সেই ব্রহ্ম। এই সকল জগৎও তিনিই।

সপ্তনবতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৯৭ ॥

অষ্টনবতিতম সর্গ

শিখিধ্বজ কহিলেন,—চিত্ত নাই, এ বোধ আমার এখনও সম্যক্ সমুদিত হয় নাই; অতএব যেরূপ যুক্তি প্রদর্শন করিলে ঐরূপ বোধ আমার প্রস্ফুট হইতে পারে, তাহা আপনি নির্দ্দেশ করুন। বলিতে কি, আমি উহা এখনও ভাল করিয়া বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই।

কুম্ভ কহিলেন,—রাজন্! সত্যই তো চিত্তনামে কোথাও কখন কিছুই বিদ্যমান নাই। যাহা চিত্তনামে প্রতীত, তাহা সেই অক্ষয় ব্রহ্ম বলিয়াই বিদিত। এই চিত্তাদি সমগ্র বিশ্ব অজ্ঞানস্বরূপ; অজ্ঞানের যখন বাধ হইয়া যায়, তখন উহার অসত্তাই হইয়া পড়ে। কাজেই 'আমি' 'তুমি' 'সে' ইত্যাদিরূপ কল্পনা তাহাতে কিরূপে তিষ্ঠিয়া থাকিবে? জগৎ নাই, যাহা কিছু বিদ্যমান, সমস্তই সেই ব্রহ্ম। সেই সর্ব্বময় ব্রহ্ম কাহারই বা বোধগম্য হইবার যোগ্য? মহাপ্রলয়ের পর যখন সৃষ্টির প্রারম্ভ হয়, এ জগতের বিদ্যমানত্ব তত্ত্বদর্শীদিগের নিকট তখনও স্বীকৃত নহে। কাজেই চিত্ত ও জগৎ বলিয়া যে নির্দ্দেশ, তাহা কেবল আপনাকে বুঝাইবার নিমিত্তই করা হইয়াছে। উপাদান বা নিমিত্ত প্রভৃতি কারণ নাই, এবং নিখিল ভাবপদার্থের যে উৎপত্তি, তাহাও কারণ ব্যতিরেকে হইবার যো নাই। এই হেতু বলা যায়, এই অজ্ঞানবুদ্ধি-বিলসিত জগৎ প্রকৃত-পক্ষেই নাই। সুতরাং এই যে কিছু বস্তু বিদ্যমান, এতৎসমস্তই ব্রহ্ম; তদ্ব্যতীত এ সকল আর কিছুই নহে। শ্রুতি স্মৃতি প্রভৃতিতে যিনি কর্ত্তা, যিনি ভোক্তা, যিনি মহেশ্বর, ইত্যাদিরূপে সেই নামরূপ-বর্জ্জিত আত্ম-দেবেরই যে কর্তৃত্ব নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাহা কেবল অদ্বৈত-বোধ নিমিত্ত একমাত্র তাঁহারই সর্ব্বকর্তৃত্বাদির প্রশস্তি নির্দ্দেশ মাত্র। ফলে সে নির্দ্দেশও সত্য বলিয়া বলা যায় না। কেন না, তাহা বলিলে, তিনি নিষ্ক্রিয়, নিষ্কল, ইত্যাদি তাত্ত্বিক শ্রুতি ও তত্ত্ববেদিগণের অনুভবের সহিত বিরোধ আসিয়া পড়ে। বাস্তব কথা এই যে, যাঁহার নাম নাই, আকৃতি নাই, যাঁহাতে কোনও প্রতিঘাত নাই, তথাবিধ ঈশ্বরই এ জগতের নির্ম্মাণ করিতেছেন, এরূপ কথা কেবল উপহাস্য-মূলক। যাহাদের বুদ্ধি-শুদ্ধি নাই, তাহাদের মুখেই এরূপ কথা শোভা পায়। হে নৃপ! সমস্ত যুক্তি ও প্রমাণ দ্বারা দেখা গিয়াছে, চিত্ত বস্তুতঃ নাই। অধিক বলিব কি, এই বিশাল জগৎই যখন নাই, তখন তদন্তর্ভূত চিত্তাদি তো দূরের কথা। বাসনামাত্রই চিত্ত; যদি বাসনীয় বিষয় থাকে, তবেই তো ঐ বাসনার সম্ভাবনা করা যায়। কিন্তু বাসনীয় জগৎই যখন নাই, তখন ঐ বাসনা বা চিত্তের অস্তিত্ব থাকিবে কিরূপে? বলিবে—তবে এই প্রতিভাস-

মান বস্তুবর্গ কি? উত্তর এই—ইহা কেবল আত্মাই আপনাতে আপনি প্রকাশমান। এই মায়োপাধিক আত্মা নিজেই নিজের চিত্ত, জগৎ, ইত্যাদি নামনিচয় কল্পনা করিয়াছেন। এই বাসনার বিষয়ীভূত দৃশ্যমান জগৎই যখন কারণের অভাব-নিবন্ধন অনুৎপন্ন, তখন চিত্তের উপস্থিতি অসম্ভব কথা নহে কি? এই জন্যই বলা যায়, এই যে কিছু প্রতিভাসমান, এতৎ-সমস্তই চিদাকাশময় পরমাকাশ এবং সকলই সেই অনন্ত বিশুদ্ধ জ্ঞান-স্বরূপ। আমি, তুমি, জগৎ, ইত্যাকার বোধ বাস্তব নহে; উহা সর্ব্বা-নর্থের হেতুভূত। ঐ বোধ আমার নিকট মিথ্যা স্বপ্নরূপেই প্রতীত। বাসনা-কার্য্য জগৎ নাই বলিয়া বাসনাও নাই; সুতরাং বাসনাময় চিত্ত কিরূপ এবং কোথা হইতেই বা তাহার উৎপত্তি? যাহাদের জ্ঞান নাই, তাহারাই এই দৃশ্যমান জগৎ ও চিত্ত এই প্রকার অনুভব করিয়া থাকে। কিন্তু আমার দৃষ্টিতে এ জগৎ অসৎ; ইহার কোনই আকার নাই, এবং ইহা পূর্ব্বেও প্রাদুর্ভূত হয় নাই। কারণ নাই; কাজেই সৃষ্টির পূর্ব্ব-সময়েও ইহা যে উৎপন্ন, তাহা নহে। শাস্ত্রে প্রমাণিত হইয়াছে এবং লৌকিক-দৃষ্টিতেও দেখা যাইতেছে, এই বলিয়া দৃশ্য বস্তু যে অনাদি ও উৎপত্তি-নাশ-বর্জ্জিত নিত্য পদার্থ, এ কথা অবশ্য বলা যাইতে পারে না। এ জগৎ আকার-সম্পন্ন স্থূল বস্তু; ইহার স্বরূপ তত্ত্বদর্শনে কিছুই থাকিবার নয়; কাজেই লৌকিক প্রত্যক্ষ বা শাস্ত্র প্রমাণ দ্বারা জগতের যে মহাপ্রলয়াদি নাই, সে কথাও বলিতে পারা যায় না। প্রসিদ্ধ ত্রিবিধ প্রলয়ের অস্তিত্ব বিষয়ের অনুকূলে শাস্ত্রীয় প্রমাণ, লৌকিক প্রত্যক্ষ ও বেদার্থ-সিদ্ধান্তই বলবৎ প্রমাণ। কাজেই উহা নাই, এরূপ কথা উন্মত্ত-জনোচিত। যাহার নিকট লোকানুভব, শাস্ত্র ও বেদ প্রামাণ্য বলিয়া সমাদৃত নহে, তাদৃশ অসৎ লোকের সংসর্গে সাধু ব্যক্তি বাস করেন না। এই দৃশ্য প্রপঞ্চের প্রতি নিরাকার বস্তু কারণ হইতে পারে না।

হে মুনিব্রত! এ জগৎ তত্ত্বদর্শনে ব্রহ্মরূপেই প্রতীয়মান; ইহা ব্যবহার-দশায় মূর্ত্তিসম্পন্ন থাকে বলিয়া ব্যবহার কার্য্য করিবার যোগ্য হয়। এ বিষয়ে বিরোধ কিছুই নাই। সুতরাং যিনি অপ্রতিহত, অনন্ত অবয়ব-বিভাগ-বিরহিত, নিরাকার, শান্ত, সর্ব্বময় ব্রহ্ম, তাঁহারই স্বতঃপ্রকাশ সৃষ্টি ও

প্রলয়রূপে প্রকাশমান। ঐ ব্রহ্মই স্বীয় দেহকে ক্ষণমধ্যে জগদাকারে অনুভব করেন এবং ক্ষণমধ্যেই তথাবিধ অনুভব হইতে নিবৃত্ত হইয়া নিরাকার ব্রহ্মরূপে বিরাজ করিয়া থাকেন। অতএব জগদাদি বুদ্ধি বাস্তবিক নাই, চিত্তাদি নাই, চিত্তাদির অভাবও নাই, এবং দ্বৈতাদি কল্পনাও নাই। এই নিখিল প্রপঞ্চই মাত্র ব্রহ্ম। এইরূপে অবগত হইতে পারিলে এ জগৎ প্রশান্ত হয়। যিনি নিরধিষ্ঠান অনাদি ব্রহ্ম, তিনিই তখন যথাবস্থরূপে বিভাত হইতে থাকেন। এই জগৎ অজ্ঞলোকেরই অনুভব-লব্ধ; কিন্তু ইহা একান্তই অসৎ। সুতরাং ইহাকে নানা বা অনানা কিছুই বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না। তাই বলিতেছি, আপনি উল্লিখিত প্রকারে বুদ্ধি যোগ অবলম্বন করুন এবং লৌকিক-ব্যাপারে সম্পূর্ণ লিপ্ত রহিয়াও কাষ্ঠখণ্ডবৎ নিশ্চলভাবে অবস্থিত হউন।

অষ্টনবতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৯৮ ॥

নবনবতিতম সর্গ।

শিখিধ্বজ কহিলেন,—মহামুনে! ভবৎপ্রসাদে আমার মোহ নষ্ট হইয়াছে; আমি বিস্মৃত পরম বস্তুর স্মৃতি লাভ করিতে পারিয়াছি। আমার সন্দেহ-জাল ছিন্ন হইয়াছে। আমি আত্মবিশ্রান্ত ও আত্মবান্ হইতে পারিয়াছি। যাহা জানিবার বস্তু, তাহা আমি জানিতে পারিয়াছি; মায়া-মহার্ণব উত্তীর্ণ হইয়াছি; মহা মৌনব্রত অবলম্বন করিতে পারিয়াছি। অধুনা শান্ত হইয়াছি, নিরাময় হইয়াছি, তত্ত্বজ্ঞ হইয়াছি, এই ভাবে অনন্তরূপে আমি অবস্থিত আছি। বড়ই আশ্চর্য্য! এতকাল ধরিয়া আমি এই অগাধ সংসারসাগরে ভাসিয়া বেড়াইয়াছি, কূল পাই নাই, আশ্রয় পাই নাই; কিন্তু অধুনা এমন এক স্থান পাইয়াছি, যাহা অচল, যাহার ক্ষয় কখনই নাই।

হে মুনিবর! সম্প্রতি আমি বুঝিতে পারিলাম, এই অহম্ভাবাদি জগত্ত্রয় বাস্তবিকই নাই। মূর্খতার ফলে অজ্ঞানবশে এ ত্রিজগৎ বাস্তবাকারে প্রতীত হইয়া থাকে। কিন্তু আমি এ সকলের রহস্য বুঝিয়াছি। তাই সমুদায়কে আমি সেই একমাত্র ব্রহ্ম বলিয়াই বিদিত হইতে পারিয়াছি।

কুম্ভ কহিলেন,—হে মুনিব্রত রাজন্! যথায় জগতের অস্তিত্ব নাই, তথায় 'আমি' 'তুমি' ইত্যাদি ভাবের বিকাস গন্ধর্ব্বনগরীর ন্যায় কিছুতেই সম্ভবপর হয় না। যাহা হউক, আপনি শান্তমনে মৌনী হইয়া থাকুন এবং যথাযথ লৌকিক কার্য্যকলাপ সম্পাদনপূর্ব্বক প্রশান্ত পয়োধির ধীর স্থির আবর্ত্ত-স্পন্দবৎ অবস্থান করুন। এই যাহা কিছু আছে—দেখিতে পাইতেছেন, এতৎসমস্তই সেই একমাত্র শান্ত ব্রহ্মস্বরূপ। 'এই আমি' 'এই জগৎ' এই দুই শব্দযোগে যে বিষয় প্রতিপাদিত হয়, তাহা বাস্তবিকই আকাশবৎ শূন্যময়। এই সংসার-সংজ্ঞায় যে কিছু বস্তু বিকাশ পাইতেছে, তৎসমস্ত চিত্তেরই বৈচিত্র্য মাত্র। সুবর্ণ হইতে বলয়াকার বুদ্ধি যখন চলিয়া যায়, তখন স্বর্ণবলয় মাত্র স্বর্ণ বলিয়াই বোধ হয়। এইরূপ দৃষ্টান্তে বুঝিতে হইবে, এই যে জগদাদি পদার্থ-পরম্পরা আছে, এতৎসমুদায়ের প্রতি সেই সেই বিশিষ্ট বুদ্ধি তিরোহিত হইয়া গেলে, একমাত্র ব্রহ্মই বিদ্যমান থাকেন। সমষ্টিভূত অহম্ভাবের ন্যায় ব্যষ্টিভূত অহম্ভাবও আপনা হইতে সমুৎপন্ন সঙ্কল্প মাত্র বৈ আর কিছুই নহে। সমষ্টি ও ব্যষ্টিভূত বন্ধ ও মুক্তি উল্লিখিত অহম্ভাবেরই আদান এবং বর্জ্জনের আয়ত্ত হইয়া থাকে। ফলে, অহম্ভাবের সঙ্কল্পই সর্ব্বানর্থকর বন্ধনের হেতু এবং ঐ প্রকার সঙ্কল্পের অভাবই বিমল মোক্ষের কারণ। মোক্ষ কি? সতত সত্যরূপে প্রতিভাত বন্ধ, মোক্ষ ও সঙ্কল্প শব্দার্থের যে সাক্ষিভূত স্বরূপজ্ঞান, তাহাই সদ্‌ব্রহ্ম এবং কেবলীভাব বলিয়া কথিত। এই কেবলীভাবই মোক্ষ। অহম্ভাব-জ্ঞানের অভাবই সিদ্ধি এবং অহম্ভাবের জ্ঞানই বিপত্তি। তাই বলিতেছি, 'সেই আমি—আমি নহি' এবম্প্রকার বিশুদ্ধ জ্ঞান লাভ করিয়া আপনি এক্ষণে আত্মস্বরূপে অবস্থান করিতে থাকুন। অহম্ভাব-জ্ঞানের অভাবরূপ যে সঙ্কল্পভাব, তাহাই

সম্যক্ জ্ঞান; এই জ্ঞান লাভ করিতে পারিলে অসদাকার সঙ্কল্প ক্ষয় পাইয়া অভীষ্ট সাধন করে। যাহা অপ্রতর্ক্য শিব ব্রহ্মভাব, তাঁহাতে কারণতা থাকিতে পারে না। তাই কারণাভাবে কার্য্য-পদার্থের অভাবই নিশ্চিত। যখন কার্য্য পদার্থের অভাব সুসিদ্ধ, তখন তদ্বিষয়ক জ্ঞানও অসিদ্ধ। সুতরাং কারণাভাবে অহন্তাব একেবারেই নাই। যখন অহন্তাবই নাই, তখন সংসারই বা কি এবং কাহারই বা সংসার? কাজেই সংসারও নাই; সকলই পরব্রহ্মে পর্য্যবসিত। এই যাহা কিছু প্রতিভাসিত, সমস্তই আত্মায় সৎস্বরূপে অবস্থিত। শিলাসমুৎকীর্ণবৎ সকলই তাঁহাতে অচলভাবে বিরাজিত। আপনি এ জগৎকে পরব্রহ্মের রশ্মিরাজি বলিয়াই জানিবেন। সঙ্কল্প নষ্ট হইলে সঙ্কল্পিত নগরাদিও যেমন নষ্ট হইয়া যায়, কিছুই থাকে না, সকলই অলীক হইয়া পড়ে, তেমনি জানিবেন—তত্ত্ববোধের অভ্যুদয়ে এ জগৎ আকাশকোশবৎ স্বচ্ছ সদসন্ময় হইয়াই প্রতিভাত হয়। এ জগৎ প্রতিবিম্ব-পুরুষের ন্যায় স্পন্দমান; ইহার বাস্তব স্পন্দন কিছুই নাই। ইহা শান্ত ও মনন-বিরহিত। এইরূপে যিনি জগদবলোকন করেন, তিনিই যথার্থ দ্রষ্টা। প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান যখন লাভ হয়, তখন এই বাহ্যরূপ ও অন্তর্গত মনোরূপ সমস্তই অসার হইয়া পড়ে। ইহাই বুধগণের অভিমত। তখনকার যে অবস্থা, তাহাই নির্ব্বাণ নামে নিরূপিত। যেমন স্পন্দ-বিরহিত বায়ু, আকাশগত প্রকাশ এবং বলয়াদি সংস্থান-বর্জ্জিত সুবর্ণ, তেমনি এ জগৎ ব্রহ্মস্বরূপে বিরাজিত; জগতের আকার এইরূপই আপনি বুঝিয়া লউন। এই বাহ্যরূপ ও অন্তর্গত মনোরূপ অসার অসৎপ্রায়; ইহারা যে জগৎপ্রত্যয় করিয়া দেয়, তাহা ব্রহ্মেরই রূপ ব্যতীত আর কিছুই নয়। যেমন সাগরের অনন্ত তরঙ্গরাশি তরঙ্গনামে পৃথক্ নিরূপিত না হইয়া একমাত্র জলাকারেই প্রতীত হয়, তেমনি ব্রহ্মও সৃষ্টিশব্দে নির্দ্দিষ্ট না হইয়া সৃষ্টি-বিরহিত একমাত্র বস্তু বলিয়াই প্রতীতিগোচর হইয়া থাকেন। সৃষ্টিশব্দ ব্রহ্মে প্রযুক্ত না হইলেই ব্রহ্ম শাশ্বতরূপে প্রতিভাত হন। ব্রহ্মশব্দের অর্থ বুঝিতে গেলে সৃষ্টিশব্দের অর্থ বুঝিবার প্রয়োজন হয়, আবার সৃষ্টি-শব্দার্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলেও ব্রহ্ম-শব্দার্থ অবগত হইতে হয়। যাবতীয় শব্দ বা শব্দার্থ-ভাবনা পরিহার করিতে পারিলে ব্রহ্ম বিশুদ্ধ চিদাকাশ

হইয়া বিরাজ করেন। তখনই ইনি ব্রহ্মশব্দে অভিহিত হইয়া থাকেন। পক্ষান্তরে জগৎ ও ব্রহ্ম শব্দের অর্থদ্বয় প্রতীত হইবার পর যখন অখণ্ড অর্থের অববোধ সম্যক্ সুসিদ্ধ হয়, তখন একটা অজর শান্তভাবই অবশিষ্ট থাকে। ঐ যে ভাব, উহা বাক্যের অগোচর।

হে ভূপ! এই সমগ্র জগতের যথাবস্থিত স্বরূপ পাষাণবৎ অচল ব্রহ্মমাত্রই। অজ্ঞানের মহিমায় এ জগৎ যখন সর্ব্বময় জ্ঞানস্বরূপ হইতে বিশ্লিষ্ট থাকে, তখনও ইহা সেই এক আত্মস্বরূপেই বিরাজ করে। ফলে ব্রহ্ম ও জগৎসত্তা একই বস্তু; উহা কখন স্বতন্ত্র নহে।

নবনবতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৯৯ ॥

শততম সর্গ।

শিখিধ্বজ কহিলেন,—হে মহামতে! আপনার কথানুসারে বুঝিলাম,—পরম কারণ যাদৃশ, কার্য্য—এই জগৎও সেইরূপই। ফল কথা, রাজার আশঙ্কা এই যে, জগৎ ও ব্রহ্মসত্তা যখন একই, তখন ব্রহ্মকারণ হইতে সমুৎপন্ন এই জগৎ-কার্য্য সত্য না হইবে কেন?

কুম্ভ কহিলেন,—যাহা কারণ, তাহারই কার্য্যোৎপত্তি হইয়া থাকে। কিন্তু যাহা আদৌ কারণই নহে, তাহার তো কার্য্যোৎপত্তি হইতেই পারে না। যে ব্রহ্মের কথা কহিয়া আসিতেছি, তাঁহার তো কোনই কারণভাব নাই, সুতরাং তাঁহার কার্য্য আছে, এরূপ সম্ভাবনা হইতেই পারে না। বিদ্যমান সমস্ত বস্তুই শান্ত অজ ব্রহ্ম। কারণোৎপন্ন কার্য্য কারণবৎ হইয়া থাকে সত্য, কিন্তু যাহা অনুৎপন্ন, তাহাতে সাদৃশ্য আসিবে কোথা হইতে? বল দেখি, যাহার বীজ নাই, তাহার উৎপত্তি কিরূপে হইবে? যাহার কোন নাম নাই বা যাহার স্বরূপ নির্ব্বাচন করা সম্ভাব্য নহে, তাহার বীজত্ব হইবে কিরূপে? ইহাতে কারণের প্রমাণ্য দেশ-কালাদি নাই, কাজেই

কারণও অসিদ্ধ। কেন না, কার্য্য সকল দেশকালাদি-বশেই সকারণ বলিয়া প্রমাণিত হয়। যদীয় কর্তৃত্বাদি কিঞ্চিৎ ধর্ম্মও নাই, তথাবিধ ব্রহ্ম যে প্রমাণগোচর, সেই প্রমাণ-সাহায্যে নিমিত্ত বা উপাদান কারণের প্রমাণ নিরূপণ করা সম্ভাব্য হইবে কিরূপে? যিনি না কর্ত্তা, না কর্ম্ম, না কারণ, সেই শান্তিময় ব্রহ্মে কারণতা অসম্ভব কথা। সুতরাং এ জগৎ কারণহীন। এই জগৎশব্দের অর্থ ব্রহ্মস্বরূপই; ইহাই আপনি বুঝিবেন। যাহারা অসম্যগ্‌দর্শী, এ জগৎ তাহাদের নিকটই বিশালভাবে পর্য্যবসিত। যিনি অজর, অনাময়, শান্ত, অব্যয়, চিৎ, তাহাই প্রমাণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। ঐরূপ প্রমাণযোগেই এ জগৎ শান্ত শিব সৎ ব্রহ্মরূপে পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। বুধমণ্ডলীর অনুভব এই যে, চিত্তনিরুক্ত ব্রহ্ম-স্বভাবের অন্যথাভাবই নানাশব্দে নিরূপিত হয়।

হে নৃপ! জানিবেন—চিত্ত নাশস্বভাব ও নাশাত্মক। ফল কথা, কল্পনা সকল ক্ষণে ক্ষণে মনোমধ্যে সমুদিত ও অস্তমিত হয়; তাই মানিয়া লইতে হয়,—চিত্তের ক্ষণে ক্ষণে ধ্বংস প্রাপ্তি ঘটে। যাহার প্রতিক্ষণেই ধ্বংস, তাহাকেই চিত্ত আখ্যায় অভিহিত করা হয়। সঙ্কল্প সকল সুসিদ্ধ হইলেই তাহাদের ধ্বংস প্রাপ্তি ঘটে। নামমাত্রেই যাহার অভাব অঙ্গীকৃত হয়, সেই ব্রহ্মস্বরূপের মিথ্যা অপ্রতীতি যদি বিশ্বশব্দে নিরূপিত করা হইয়া থাকে, তবে তাহার বিদ্যমানতা হইবে কিরূপে? দেখুন— যে ব্যক্তি হস্ত উত্তোলন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছে যে, আমি শূদ্র, তাহার ব্রাহ্মণত্ব হইবে কিরূপে? সে ব্রাহ্মণত্ব কি প্রকারই বা হইবে? সান্নিপাতিক বিকার রোগে ধাতু কুপিত হওয়ায় যে ব্যক্তি স্পষ্ট বাক্যে বলে যে, আমি মরিলাম, তাহার মৃত্যু সন্নিকটই জানিবেন। ঐ ব্যক্তির ক্ষণিক জীবনও ভ্রম মাত্র বলিয়াই অবধারিত। এতাবতা বুঝিতে হইবে, চিত্ত বা জগৎ নামে কোন বস্তুই নাই; তবে যে উহা আছে বলিয়া প্রতীত হইতেছে, তাহা মরীচিকা-জল, দ্বিতীয় চন্দ্র, বালকল্পিত বেতাল ও অলাতচক্রবৎ ভ্রান্তিময় বলিয়াই বিদিত হইবেন। যাহার স্বরূপ কেবলই ভ্রান্তিময়, তাহা সত্য হইবে কিরূপে? বস্তুতঃ যাহা অজ্ঞানময় ভ্রান্তি, তাহাকেই চিত্তনামে অভিহিত করা হইয়াছে। যাহা অজ্ঞান, তাহাই চিত্ত

নাম ধারণ করিয়াছে। উল্লিখিত চিত্ত অসৎ হইয়াও সতের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে। ঐ অজ্ঞান আত্মস্বরূপেরই অস্ফুরণ, আর যাহা আত্মস্বরূপের স্ফুরণ, তাহারই নাম জ্ঞান। এতাদৃশ জ্ঞান লাভ করিতে পারিলেই পূর্ব্বোক্ত অজ্ঞান ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। মরুমরীচিকায় যে জলপ্রতীতি, তাহা একটা ভ্রান্তি মাত্র। এই প্রকার সম্যক্ জ্ঞান উপস্থিত হইলেই ঐ অসৎ ভ্রান্তি নিরস্ত হইয়া থাকে। এই নিদর্শন অনুসারে বলা যায়, 'ইহা চিত্ত' এই প্রকার ধারণা বদ্ধমূল হইলেই উল্লিখিত অজ্ঞান সুদৃঢ় হইয়া উঠে। পরন্তু যখন 'চিত্ত নাই' এইরূপ জ্ঞান অভ্যুদিত হয়, তখনই চিত্ত সমূলে বিনাশ পাইয়া থাকে। রজ্জুতে ভুজঙ্গ-বুদ্ধি অজ্ঞান-ভ্রান্তিরই ফল; কিন্তু ইহা ভুজঙ্গ নহে, এইরূপ জ্ঞান যখন হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়, তখনই উহা বিনষ্ট হইয়া যায়। এইরূপে দেখিতে গেলে চিত্ত আত্মাতেই অজ্ঞান ভ্রমে উৎপন্ন হয়, আবার যখন চিত্ত নাই বলিয়া দৃঢ় জ্ঞান জন্মে, তখন অজ্ঞানের ফল—আমি, চিত্ত বা মন, এ সমুদায়ের কিছুই থাকিবার নয়। চিত্ত বা অহম্ভাবময় দেহ এ জগতে কিছুই বিদ্যমান নাই। থাকিবার মধ্যে কেবল সেই একমাত্র নির্ম্মল চিদাত্মাই বিদ্যমান। এই চিৎ বিমূঢ় বা মায়াকলুষিত দশায় এই সঙ্কল্প বা চিত্তাদির উদ্ভাবন করিয়াছেন। ইনি যখন প্রবুদ্ধ হইয়া সঙ্কল্প বর্জ্জন করেন, তখনও চিত্তাদি সমস্তই তাঁহার পরিত্যক্ত হয়।

হে মহাভুজ! সঙ্কল্প যাহার উপস্থাপক, সঙ্কল্পের অভাব হইলে ঝঞ্ঝাবেগে দীপশিখার ন্যায় ক্ষণমধ্যেই তাহা নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়। সমগ্র সাগর যেমন কেবলই জলময়, তেমনি এই নিখিল জগৎই আত্মতত্ত্ব-পরিপূর্ণ অনন্ত ব্রহ্মসত্তাময়। ব্রহ্মসত্তা ভিন্ন এ জগতে আর কিছুই বিদ্যমান নাই। না আমি; না তুমি, না চিত্ত, না আকাশ, না ইন্দ্রিয়, কিছুই তো নাই; আছেন মাত্র সেই একাদ্বয় স্বচ্ছ আত্মা। তাঁহারই অস্তিত্ব কেবল বিদ্যমান। সেই আত্মাই ঘটাদির আকারে বিবর্ত্তমান হইয়া সেই-সেইরূপে পরিদৃষ্ট হন। 'এই চিত্ত' 'এই আমি' এরূপ কল্পনা অকিঞ্চিৎ-কর। এই ত্রিভুবনের কুত্রাপি কিছুই জাত বা মৃত হয় না। মাত্র চিৎ-প্রকাশই সদসদাকারে ভাবিত হইয়া থাকেন। এই সকলই আত্মা; তিনি অনন্ত এবং সতত প্রকাশময়। তাঁহাতে না দ্বিত্ব, না একত্ব, না ভ্রান্তি,

না মরণাদি-ভীতি, কিছুই নাই। হে সখে! আপনি সমস্ত ইন্দ্রিয় দ্বারা সর্ব্বত্রই সৎ অনন্তরূপে অবস্থিত আছেন। হে মহামতে! সত্যই আপনি সংসারদহনে দহ্যমান হইতেছেন না; কোথাও আপনি লিপ্তও নহেন। আপনি নির্লেপ ও নির্ব্বিকার।

হে সুহৃৎ! তোমার তো কিছুই নষ্ট হইতেছে না, বৃদ্ধি পাইতেছে না; তুমি স্বচ্ছ অম্বরাকার ও কেবল-স্বরূপ। ইচ্ছাশক্তি, অনিচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি সমস্তই তুমি। বস্তুতঃ কিরণরাজি ব্যতীত চন্দ্রকে উপলব্ধি-গোচর করা যায় না। যাঁহার আদি নাই, অন্ত নাই, যিনি সতত একই ভাবে বিরাজিত, যদীয় জন্ম, বৃদ্ধি বা বিকারধর্ম্ম নাই, যাঁহাতে কোন কলঙ্ক-লেপ নাই, এই বিশাল জগজ্জাল যাঁহার একটা আংশিক লীলামাত্র, যিনি সমস্তের আদিভূত এবং সৎস্বরূপে বিরাজিত, সেই আত্ম-তত্ত্ব তুমিই।

শততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১০০ ॥

একাধিক শততম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন—রাম! মুনিবর কুম্ভের তথাবিধ অকৃত্রিম উপদেশা-বলী মনে মনে আলোচনা করিয়া রাজা শিখিধ্বজ ক্ষণমধ্যেই আত্ম-পদে তন্ময় হইয়া পড়িলেন। তাঁহার মন ও নয়ন নিমীলিত হইল। বচন শান্ত হইয়া গেল। দেহ নিস্পন্দ হইল। তাঁহাকে দেখিয়া মনে হইল, তিনি যেন একটী শিলাসমুৎকীর্ণ প্রতিকৃতি মাত্র। হে মহাভুজ! অনন্তর মুহূর্ত্ত কাল যাবৎ ঐ অবস্থায় অবস্থান করিয়া শিখিধ্বজ প্রবুদ্ধ হইলেন। তাঁহার নয়নযুগল উন্মীলিত হইল। তখন কুম্ভরূপধারিণী চূড়ালা তাঁহাকে কহিলেন,—যাহা বিশুদ্ধ, নির্ম্মল, অনন্ত আত্মতত্ত্ব, তাদৃশ শয্যায় শয়ন করিয়া আপনি নির্ব্বিকল্প সুখ-শান্তি লাভে সক্ষম হইয়াছেন তো? অন্তরে আপনি প্রবুদ্ধ হইতে পারিয়াছেন তো? আপনার ভ্রান্তি-

জাল নিরস্ত হইয়াছে তো? যাহা জানিবার বিষয়, তাহা আপনি জানিতে পারিয়াছেন তো? যাহা দ্রষ্টব্য, তাহা আপনার দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছে তো?

শিখিধ্বজ কহিলেন,—ভগবন্! যাহা সকলের ঊর্দ্ধে বিরাজিত এবং পরম আনন্দের আধারভূত, সেই অনন্ত মহাপদটী আমি ভবৎপ্রসাদে দর্শন করিয়াছি। যাঁহারা বেদ্য বিষয় বিদিত হইয়াছেন, তথাবিধ সাধু-মহাত্মাদিগের সঙ্গ লাভ কি অপূর্ব্ব সুধাময় ব্যাপার! তাহা কতই না সারবান্ ফল প্রদান করিয়া থাকে? আমি জন্মাবধি এতকাল যাবৎ যে মহাসুধার স্বাদানুভব করিতে পারি নাই, আজ ভবদীয় সঙ্গলাভে আমার ভাগ্যে তাহাই ঘটিল। সাধুসঙ্গের মাহাত্ম্য প্রকৃতই ধন্যবাদার্হ। হে কমলনয়ন! এই অপূর্ব্ব সুধাময় আত্মতত্ত্ব পূর্ব্বে আমি অধিগত হইতে পারি নাই কেন, তাহা আমার নিকট স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করুন।

কুম্ভ কহিলেন—ভোগ-বাসনা বিসর্জ্জন দিয়া মন যখন উপশান্ত হয়, এবং সর্ব্বেন্দ্রিয়ের ভোগ-বাসনা যখন চরিতার্থ হইয়া যায়,—কোন বিষয়ের জন্য কোনই আকাঙ্ক্ষা যখন থাকে না, নির্ম্মল উপদেশ সকল তখনই চিত্তে সংলগ্ন হইয়া থাকে। শুদ্ধ শুভ্র বস্ত্রে যেমন কুঙ্কুমরঞ্জনা, তেমনি চিত্তে নির্ম্মল উপদেশের সংসক্তি। আপনার দেহে বাসনাময় অনন্ত ভোগরাশি সঞ্চিত ছিল, সে সকল ভোগ এখন আপনার পূর্ণ হইয়াছে বলিয়া ভবদীয় দেহ হইতে অদ্য সমস্ত মল গলিত হইয়া গিয়াছে।

হে কমলাক্ষ! যেমন অপক্ক ফল বৃক্ষ হইতে সহজে পতিত হয় না, তেমনি ভোগবাসনার অপরিপাক অবস্থায় দৈহিক মল সম্পূর্ণতঃ অপসৃত হইতে পারে না। হে সখে! মৃণাল তুল্য কোমল পদার্থে লগ্ন হইবামাত্র বাণ যেমন অনায়াসে বিদ্ধ হয়, তেমনি বাসনা যখন পূর্ণ হইয়া যায়, সকলই ফুরাইয়া যায়, তখনই নির্ম্মল গুরূপদেশ মনোমধ্যে অনায়াসে প্রবিষ্ট হয়। আপনার বাসনারাশি পূর্ণ হইয়াছে; তাই যোগ্য আধার জ্ঞানে আমি আপনাকে উপদেশ প্রদান করিলাম। হে প্রশস্তমতে! আপনিও সেই কারণেই বোধ প্রাপ্ত হইতে পারিয়াছেন।

আপনার অজ্ঞান অপগত হইয়া গিয়াছে। অদ্য আপনি সত্য সত্যই প্রবুদ্ধ হইতে পারিয়াছেন। অধুনা সাধুসঙ্গরূপ উপায় যোগে আপনার সর্ব্ব শুভাশুভ কর্ম্ম ক্ষয় প্রাপ্ত হইল। রাজন্! অদ্য প্রভাতেও 'আমি চিত্ত' এইরূপ অজ্ঞানে আপনি মগ্ন ছিলেন। এক্ষণে আমার নিকট উপদেশ পাইয়াই আপনি প্রবুদ্ধ হইলেন; আপনার অজ্ঞান বিদূরিত হইয়া গেল। ভবদীয় চিত্ত ক্ষয় পাইল। আপনি অন্তর হইতে বাসনাময় চিত্তকে বিদূরিত করিতে পারিয়াছেন। সঙ্কল্পময় মন যতকাল হৃদয়ে অবস্থান করে, অজ্ঞান ততক্ষণই বিদ্যমান থাকে। কিন্তু চিত্ত যখন চিত্তরূপে পরিব্যক্ত হইয়া উঠে, তখন জ্ঞান আপনা হইতেই বিকাশ প্রাপ্ত হয়। দ্বিত্ব ও একত্ব জ্ঞানই চিত্ত আখ্যায় অভিহিত; এই চিত্তই অজ্ঞান। এই চিত্তরূপ অজ্ঞানের যে বিলয়প্রাপ্তি, তাহাকেই বলে পরমগতি। হে ভূপতে! আপনি চিত্ত পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রবুদ্ধ হইয়াছেন; মুক্তি পাইয়াছেন। চিত্তত্যাগে সমর্থ হইয়াছেন। যাহা সত্তা-অসত্তা উভয়াত্মক, সেই অসৎপদ আপনি পরিত্যাগ করিয়াছেন। আপনার শোক নাই, ক্লেশ নাই; আপনি নিঃসঙ্গ, নিরাময়, অনন্য, মহোদয় ও মৌনযুক্ত মুনি হইয়া নির্ম্মল আত্মস্বরূপে অবস্থিত হউন।

শিখিধ্বজ কহিলেন,—ভগবন্! যদি এইরূপই হয়, তাহা হইলে বলা যায় যে, কেবল মূর্খ ব্যক্তিরই চিত্ত এবং চিত্ত জন্য ক্রিয়া আছে। আর যিনি প্রবোধবান্ হইয়া তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছেন, হে প্রভো! তাঁহার আর চিত্ত থাকিতে পারে না। এখানে আমার প্রশ্ন এই যে, তত্ত্বজ্ঞানীদিগের যদি চিত্ত নাই থাকে, তবে ভবাদৃশ নির্ম্মনস্ক জীবন্মুক্ত ব্যক্তিবর্গ এই লৌকিক ব্যবহারপরম্পরা সম্পাদন করেন কি করিয়া? তাহা আমার নিকট প্রকাশ করুন। আপনার এতৎসম্বন্ধীয় উপদেশ জ্যোতির ন্যায় আমার হৃদয়ের তিমির সম্যক্ অপসারিত করিয়া দিউক।

কুম্ভ কহিলেন,—রাজন্! আপনি তত্ত্বজ্ঞানী হইয়াছেন। আপনার কথা সকলই সত্য বটে। যেমন শিলাপৃষ্ঠে অঙ্কুরোৎপত্তি হইবার নয়, তেমনি জীবন্মুক্ত ব্যক্তিগণের চিত্তও থাকিবার নহে। পরন্তু আমার মতে এই চিত্ত বলিতে পুনর্জন্মবিধায়িনী বাসনাকেই বুঝায়। যিনি

তত্ত্ববিৎ, তাঁহার সে বাসনা নাই। সুতরাং চিত্তও তাঁহার নাই। তত্ত্ববিদ্‌গণ যাদৃশ বাসনার বশে লৌকিক ব্যবহার সমাধা করেন, তথাবিধ বাসনা দ্বারা পুনর্জ্জন্ম-সঙ্ঘটন হইতেই পারে না। তত্ত্বজ্ঞানীর সে প্রকার বাসনা সত্ত্বসংজ্ঞায় অভিহিত। যিনি জিতেন্দ্রিয় জীবন্মুক্ত মহাত্মা, তিনি ঐ সত্ত্বসংজ্ঞিত বাসনায় বিরাজ করিয়া অসঙ্গভাবে লৌকিক ব্যবহার সমাধা করিয়া থাকেন। তাদৃশ পুরুষেরা কদাচ পুনর্জ্জন্মজনক চিত্তে বিরাজ করেন না। মোহমগ্ন চিত্তই চিত্ত আর যাহা প্রবুদ্ধ চিত্ত, তাহাই সত্ত্ব আখ্যায় অভিহিত। অপ্রবুদ্ধ ব্যক্তিগণই চিত্তস্থ আর প্রবুদ্ধ ব্যক্তিগণই সত্ত্বস্থ। চিত্ত পুনরায় জন্ম লয়; কিন্তু সত্ত্ব আর জন্মগ্রহণ করে না।

হে ভূপতে! অপ্রবুদ্ধ চিত্তেরই বন্ধন ঘটে; পরন্তু প্রবুদ্ধ চিত্তের তাহা নাই। আপনি অধুনা সত্ত্বসংজ্ঞিত চিত্তেই অবস্থান করিতেছেন। আপনার মহাত্যাগ-সিদ্ধি ঘটিয়াছে। আপনি মহাত্যাগী হইয়াছেন। আপনার চিত্তত্যাগ-ব্যাপার সম্পূর্ণরূপেই হইয়াছে। ইহা আমি বিশেষরূপেই বুঝিতে পারিয়াছি। রাজন্! আপনি পুনর্জ্জন্মজননী বাসনা হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইয়া বিরাজ করিতেছেন। আমি মনে করি, আপনার মন আকাশবৎ স্বচ্ছ হইয়া গিয়াছে। সে মনের মালিন্য কিছুমাত্র নাই। আপনি অধুনা লব্ধশান্তি ও সর্ব্বত্র সমাবস্থ হইয়াছেন। পূর্ব্বে যে সর্ব্বত্যাগের সূচনা আপনি করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা সুসম্পন্ন হইয়াছে।

হে সাধো! যাদৃশ বুদ্ধি উপদিষ্ট বিষয় অবধারণ করিতে সমর্থ হয়, সেই পরম বোধময়ী মেধাবতী বুদ্ধিতে যে এই প্রকার চিত্তত্যাগ, ইহা অতি বড় তপস্যা বা দানাদিরই পরিপাক। এই চিত্ত-পরিত্যাগ কার্য্যই স্বর্গ এবং ইহাই যথার্থ মোক্ষ। তপস্যা করিয়া কে কতটুকু দুঃখ পরিহার করিতে পারে? কিন্তু বলিতে কি, এই চিত্তত্যাগ আত্যন্তিক দুঃখেরই নিবারক। ইহা হইতে যে একটা সমতাময় সুখ সমুৎপন্ন হয়, তাহার ক্ষয় কোন কালেই হয় না। এই সুখ পরম মহৎ; ইহা স্বর্গাদি সুখবৎ ধ্বংসস্বভাব নহে। স্বর্গাদি সুখের আবির্ভাব

আছে, তিরোভাব আছে, ত্রৈকালিক সত্তা তাহার নাই। সে সুখের সত্তা বর্ত্তমানেই স্বপ্নপ্রায় পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। স্বর্গের আনন্দমাত্রা কতটুকু? সে আনন্দ আবার কয় জনের ভাগ্যেই বা ঘটিয়া থাকে? ফল কথা, সে সুখও অনিশ্চিত। যাহারা আত্মসিদ্ধি প্রাপ্ত হইতে পারে না, তাহাদের প্রতিই ক্রিয়াকাণ্ড শুভ ফল উৎপাদন করিয়া থাকে; সুতরাং সেই ক্রিয়াকাণ্ড লইয়াই তাহাদিগকে কাল কাটাইতে হয়। ফলে, যে ব্যক্তি সুবর্ণ-লাভে সমর্থ হয় না, পিত্তল পাইলে সে কি তাহা পরিত্যাগ করিয়া থাকে? আপনার সম্বন্ধে বলি, চূড়ালাপ্রভৃতির সঙ্গগুণে অনায়াসেই আপনি আত্ম-জ্ঞান লাভ করিতে পারেন; সুতরাং কি নিমিত্ত এই তপস্যাময় অনর্থকরী ক্রিয়ায় মগ্ন রহিয়াছেন? এই কুক্রিয়া, আশ্রমাদি কল্পনা বিশেষ দ্বারা সম্পাদনীয়। এমন কার্য্যে লিপ্ত হওয়া উচিত হয় না। ভাবিয়া দেখুন—এই তপস্যাদি কার্য্যের ফল-ভোগকাল—মধ্যভাগ মাত্র সুখসম্পাদক; কিন্তু ইহার আদ্য ভাগ—যে পর্য্যন্ত ফল ভোগ হয় নাই, তাহা বহু ক্লেশ-কর। আবার ফলভোগ হইয়া যাইবার পর যে দুঃখ, সেই দুঃখই আসিয়া উপস্থিত হয়। তবে আপনার সম্বন্ধে বলিতে পারি, আপনি যে এত দিন ধরিয়া তপস্যা করিয়াছেন, তাহা আপনার নিষ্ফল হয় নাই; কেন না, তাহাতে ভোগবাসনা পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। তাই আপনি আত্মলাভে সক্ষম হইয়াছেন। এই তপস্যারূপ বিকল্পাংশ আত্মজ্ঞানেই পর্য্যবসিত হইয়াছে। এখন আর তপঃসাধনায় আপনার কোনই প্রয়োজন নাই। যে আত্মজ্ঞান আপনি পাইয়াছেন, তাহাতেই আপনি স্থিরভাবে অবস্থান করিতে থাকুন। জানিবেন—নির্ম্মল চিদাকাশ হইতেই এ সকল বাহ্য ভাবপদার্থ প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। এ সকল তাঁহাতেই দেখা যাইতেছে এবং বিলয় পাইতেছে। ইহা কার্য্য, আর ইহা অকার্য্য, এই প্রকার সঙ্কল্প সকল সেই ব্রহ্মাম্বুধিরই অম্বুবিন্দু। হে সখে, শিখিধ্বজ! আপনি বিফল কর্ম্মের পরিবর্জ্জন করুন; পূর্ণ ব্রহ্মের আশ্রয় লউন। দেখুন,—যাহার ভাগ্যে স্বামিলাভ ঘটে নাই, সে রমণী স্বীয় ভাবী স্বামীর প্রতি অন্য কিছু না চাহিয়া কেবল তাঁহাকেই প্রার্থনা করে। এরূপ প্রার্থনার উদ্দেশ্য এই যে, স্বয়ং স্বামীকে পাইলে তদধীন অন্য সকলই সহজপ্রাপ্য

হইয়া উঠে। ইহা দ্বারা বুঝিতে হইবে, পরম প্রেমাস্পদ নিরতিশয় আনন্দমূর্ত্তি আত্মার নিকট অন্য কোন প্রিয় বস্তু প্রার্থনা করা অপেক্ষা, কেবল তাঁহাকে প্রার্থনা করাই কর্ত্তব্য। কারণ তাঁহাকে পাইলে আর কোন কিছুই অপ্রাপ্য থাকে না। বিজ্ঞ মহাত্মগণ সঙ্কল্প-কল্পিত ভাব-সমূহকে আপদের আস্পদ বলিয়াই মনে করেন। তাঁহাদের ধারণায় ঐ সকল পদার্থ জলবিম্বিত রবির ন্যায় অকিঞ্চিৎকর বলিয়াই প্রতিভাত। তাঁহারা আত্মাকেই চাহেন; তাহা ভিন্ন অন্য কিছুই তাঁহাদের প্রার্থনীয় নাই। অতএব যে সকল কর্ম্ম, স্বর্গ বা মোক্ষফলের উৎপাদক, তৎসমস্ত পরিত্যাগপূর্ব্বক আপনি সমভাবে অবস্থান করিতে থাকুন। এই যে বাহ্য পদার্থপুঞ্জ দেখা যায়, এতৎসমুদায়ের অসদংশ পরিত্যাগ করিয়া যাহা সদংশ, তাহাই আপনি গ্রহণ করুন। সর্ব্বত্র বীতস্পৃহ হউন এবং তদবস্থায় নিশ্চল নিস্পন্দ হইয়া অবস্থান করিতে থাকুন। জানিবেন—যাহার চিত্ত স্পন্দিত হয় না, এই সংসারভাব-প্রবাহ তাহার নিকট উপস্থিত হইতে পারে না। স্বাভাবিক কুপ্রবৃত্তির উত্তেজনায় যে বিপদ আসিয়া উপস্থিত হয়, পুরুষের বিবেকবুদ্ধির উদয়ে সে বিপদ আর তিষ্ঠিতে পারে না।

হে ভূপ! এ জগতে যত প্রকার দুঃখ আছে, একমাত্র চিত্তচাঞ্চল্য তাহার মূল। যাহার চিত্ত অচল, অস্পন্দ, সম্পূর্ণ, স্থির, শান্ত, সে জন নিত্য-কালই মহানন্দে নিমগ্ন। তিনি সম্রাটের ন্যায় সাম্রাজ্য সুখের অনু-ভাবক। হে তত্ত্বজ্ঞবর! আপনি চিত্তস্পন্দ ও স্পন্দাভাব এই উভয়কেই একীভূত করিয়া শাশ্বত ব্রহ্মপদে একত্ব লাভ করুন এবং তাহাতে যথাসুখে বিরাজিত হউন।

শিখিধ্বজ কহিলেন,—ভগবন্! আপনি সকল সংশয়েরই অপনো-দনে সক্ষম। অতএব স্পন্দ ও স্পন্দাভাবের একত্ব কিরূপে হইতে পারে, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। এ বিষয়ে আমি সন্দিগ্ধ হইয়াছি।

কুম্ভ কহিলেন,—একমাত্র জলই যেমন সাগর, তেমনি এই দৃশ্যমান সমস্ত জগৎই সেই এক চিন্মাত্র। বারি যেমন তরঙ্গতাড়নায় স্পন্দিত

হয়, তেমনি ঐ চিন্মাত্রই বুদ্ধিবৃত্তি যোগে স্পন্দিত হইয়া উঠেন। ব্রহ্ম খ্, সত্ত্ব ইত্যাদি নানা নামে ঐ চিন্মাত্রকেই নির্দ্দেশ করা হয়। মূঢ়েরা ঐ চিন্মাত্রকেই জগদাকারে অবলোকন করে। ঐ চিৎস্পন্দ হইতেই এই নিখিল সংসারের আবির্ভাব। বিন্ধ্যাদিরূপ পরিস্পন্দ শব্দস্পন্দ-সম দ্বিতীয় পরিস্পন্দ। চিত্তের উক্ত প্রকার স্পন্দ এবং স্পন্দরাহিত্য এই উভয়কে একই ভাবে ভাবিতে পারিলে স্বচ্ছ নিরাময় আত্মাই পর্য্যবসিত হইয়া থাকেন। এ সংসার ঐ চিৎস্পন্দ ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। সম্যক্‌-দর্শীর দৃষ্টিতে ইহা বিলীন হইয়াই থাকে। রজ্জুতে ভুজঙ্গবুদ্ধির ন্যায় অসম্যক্‌দর্শীর দৃষ্টিতেই ইহা স্ফুরিত হয়। যিনি স্পন্দশালিনী চিৎ, তাঁহারই নাম সৃষ্টি। আর যখন ঐ চিৎ স্পন্দবিরহিত হন, তখনই উনি অনন্ত বিশালাকারে বিকাশমান হইয়া থাকেন। সেকালে তিনি তুরীয় পদেরও অতীত হন। এই কারণ তাঁহার সেই সময়ের স্বরূপ বাক্‌পথেরও অতিবর্ত্তী। শাস্ত্রসমালোচনা ও সাধুসঙ্গ প্রভৃতি উপায় অবলম্বন করিয়া সুদৃঢ় অভ্যাস করিতে করিতে চিত্ত যখন চন্দ্রবৎ নির্ম্মল হইয়া উঠে, চিত্তের অনন্ত বিশালভাব তখনই সমুদিত হইয়া থাকে। চিত্তের ঐ ভাব কেবল নিজেরই অনুভব-লভ্য। যাঁহারা নিজের স্বরূপ অনুভব করিতে পারিয়াছেন, তাঁহাদের আত্মানুভবই উক্ত স্বরূপ-বর্ণনে সমর্থ। আপনি আপনার স্বরূপানুভব করিতে পারিয়াছেন; তাই অনাদি-মধ্য আত্মস্বরূপের অনুভবে আপনি সক্ষম হইয়াছেন।

হে সাধুশীল! যাহা ভেদ-বিরহিত, রূপ-পরিশূন্য, মহান্‌ চিদাত্মা, আপনি তাহাই হইয়াছেন। আপনার শোকের বিষয় কিছুই নাই। আপনি এখন হইতে এমনই ভাবে শোক-বিরহিত হইয়া বিরাজ করিতে থাকুন।

একাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১০১ ॥

কুম্ভ কহিলেন,—হে ভূপতে, শিখিধ্বজ! এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড যেরূপে উত্থিত ও বিলীন হইতেছে, তাহা সকলই আপনার নিকট কহিলাম। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! আপনি ইহা শুনিয়া এবং বুঝিয়া যথেচ্ছ অবস্থান করুন। পরম পদ এখন আপনার স্পষ্টতই দৃষ্ট হইয়াছে। আমি এক্ষণে স্বর্গধামে গমন করি। অদ্য স্বর্গের একটা পর্ব্বদিবস; এই উপলক্ষে নারদ মুনির তথায় আসিবার কথা আছে। তিনি ব্রহ্মলোক হইতে আসি-বেন, আসিয়া যদি আমায় সেখানে না দেখেন, তবে আমার উপর তিনি রুষ্ট হইতে পারেন। বস্তুতঃ গুরুজনকে রুষ্ট করা শিষ্ট জনের কর্ত্তব্য নহে। এক্ষণে যাইবার কালে বলিয়া যাই—আপনি হৃদয়ে সঙ্কল্পকে আর অণুমাত্র স্থান দিবেন না। কোন বিষয়ের বাঞ্ছা রাখিবেন না; সতত এমনই ভাবে কাল কাটাইতে থাকুন। যাহা যাহা বলিলাম, জানিবেন—সেই সকলই সুপুণ্য সার কথা।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—গমনোদ্যত কুম্ভের সেই কথা শুনিয়া পুষ্পপাণি রাজা শিখিধ্বজ যেই মাত্র সপ্রমাণ প্রত্যুত্তর প্রদান করিতে উন্মুখ হইলেন, অমনি কুম্ভ সে স্থান হইতে অন্তর্দ্ধান করিলেন। স্বপ্নের বস্তু স্বপ্নভঙ্গে যেমন আর দেখা যায় না, তেমনি সেই কুম্ভকে রাজা শিখিধ্বজ আর দেখিতে পাইলেন না। কুম্ভ চলিয়া গেলে রাজা বিস্ময়াপন্ন হইলেন; কুম্ভকেই মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন; ভাবনায় ভাবনায় তন্ময় হইয়া চিত্রলিখিত পুত্তলিকার ন্যায় নিস্পন্দ হইয়া রহিলেন। তাঁহার ভাবনার বিরাম নাই। তিনি ভাবিতে লাগিলেন,—বিধাতার কি অপূর্ব্ব লীলা-খেলা! কুম্ভ মুনির মূর্ত্তি ধরিয়া তিনিই নিশ্চয় অদ্য আমায় এরূপ জ্ঞান দান করিয়া গেলেন। এত দিনের বহু পরিশ্রমে—বহু আয়াসেও যাহা আমার লব্ধ হয় নাই, কুম্ভ আমায় তাহাই দিয়া গেলেন। কোথায় সেই ব্রহ্মার পৌত্র নারদকুমার কুম্ভ, আর কোথায়ই বা আমার ন্যায় একজন মর্ত্ত্যবাসী মানব! ফলে এখানে আসিয়া তাদৃশ কুম্ভ মুনির পক্ষে আমাকে উপদেশদানে অনুগৃহীত করা সম্পূর্ণই অসম্ভব কথা। তাই

ভাবিতেছি,—আমার শুভাদৃষ্টই অদ্য আমায় এরূপ জ্ঞান প্রদান করিয়াছে। কি অপূর্ব্ব যুক্তি-সম্বলিত উপদেশ আমি কুম্ভের নিকট পাইলাম! এত দিন মোহনিদ্রায় নিমগ্ন ছিলাম; কিছুই জানিতাম না। আজ আমার সেই মোহনিদ্রা কাটিয়া গিয়াছে। আমি প্রবোধ প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহা কার্য্য, আর ইহা অকার্য্য, এই প্রকার অসত্য ভ্রান্তিচক্রে পড়িয়া এতকাল আমি ক্রিয়াকাণ্ডরূপ কি এক কুকর্দ্দমেই মজিয়া ছিলাম! এখন আমার ভ্রম গিয়াছে। আমি শান্ত, শুদ্ধ, শীতল পথে উপস্থিত হইয়াছি। এই শান্তিময় পথ যেন রসায়ন হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। উহা আমার বাসনা-বিরহিত সত্ত্বময় মনকে শীতল করিয়া দিতেছে। অদ্য আমি শান্ত হইলাম, নির্ব্বাণ পাইলাম, কেবল-সুখের অধিকারী হইলাম। এখন আর তৃণাগ্রেও আমার বাসনা নাই। আমি যথাবস্থ-ভাবেই অবস্থিত হইলাম।

রাজা শিখিধ্বজ এই এইরূপ চিন্তা করিয়া একেবারেই বাসনাহীন হইলেন। তিনি শিলাসমুৎকীর্ণ মূর্ত্তির ন্যায় নিশ্চল হইয়া মৌনাবলম্বনে অবস্থান করিতে লাগিলেন। অনন্তর নির্ব্বিকল্প সমাধিতে নিমগ্ন হইয়া গিরিশৃঙ্গবৎ অচল অটলভাবে বিরাজ করিলেন। তিনি নির্ম্মল আত্মভাব প্রাপ্ত হইলেন এবং সমরস ও চিরবিশ্রান্ত-বুদ্ধি হইয়া অচিরাৎ বীতভয় ও অখণ্ড আত্মস্বভাবে লব্ধবিশ্রাম হইয়া রহিলেন।

দ্ব্যধিক শততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ২০২ ॥

ত্র্যধিকশততম সর্গ

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! ভূপতি শিখিধ্বজ ঐরূপে নির্ব্বিকল্প সমাধি অবস্থায় কাষ্ঠ কিম্বা কুড্যের ন্যায় অচলভাবে অবস্থিত রহিলেন। এ দিকে এক্ষণে চূড়ালার বৃত্তান্ত শ্রবণ কর। চূড়ালা সেই যে কুম্ভবেশ ধরিয়া স্বামী শিখিধ্বজকে প্রবোধিত করিবার পর তথা হইতে অন্তর্দ্ধান

করিলেন, তাহার পর তিনি নভোমণ্ডলে উত্থিত হইয়া মায়া-পরিকল্পিত দেবপুত্রের মূর্ত্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক সুন্দরী মনোমোহিনী রমণীমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। অনন্তর ব্যোমপথে প্রয়াণ করিয়া স্বীয় রাজধানীর অন্তঃপুর মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। কিঞ্চিৎকাল পরেই তথাকার লোক সকল তাঁহাকে দেখিতে পাইল। তিনি পূর্ব্ববৎ রাজকার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর তিন দিন অতীত হইল। পরে তিনি যোগবলে পুনরায় কুম্ভবেশ ধারণপূর্ব্বক আকাশপথে শিখিধ্বজের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তত্রত্য কাননাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন—রাজা নির্ব্বিকল্প সমাধিতে মগ্ন হইয়া বৃক্ষবৎ নিশ্চলভাবে অবস্থিত রহিয়াছেন। রাজাকে সেই অবস্থায় দেখিয়া চূড়ালা মনে মনে আলোচনা করিতে লাগিলেন—ভাগ্যগুণে এই রাজা এখন আত্মপদে বিশ্রাম লাভ করিয়াছেন। ইনি স্বচ্ছ, সম ও শান্ত-ভাবে রহিয়াছেন। আমি এখন ইহাঁকে প্রবোধিত করি। নতুবা এখনই ইনি দেহত্যাগ করিবেন। কিন্তু তাহা আমার অভিপ্রেত নহে। ইনি রাজ্যে বা বনে যেখানেই থাকুন, কিঞ্চিৎকাল দেহ ধারণ করিয়া থাকেন, এবং পরে আমরা উভয়ে একই সঙ্গে এক সময়ে দেহত্যাগ করিয়া কৈবল্য পদ লাভ করি, ইহাই আমার ইচ্ছা। এ সময় আরও একটা প্রধান কথা এই যে, আমি ইহাঁকে যে উপদেশ দিয়াছি, তাহাতে সপ্তভূমিকা পর্য্যন্ত পৌঁছিবার সামার্থ্য ইহাঁর হয় নাই। সেখানে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই হয় তো ইনি দেহত্যাগ করিয়া বসিবেন; তাহাতে জীবন্মুক্তি-জনিত যে একটা পরম সুখ, তাহা আর ইহাঁর ভাগ্যে ঘটিবে না। অতএব অভ্যাসযোগে ইহাঁকে এখন প্রবোধিত করাই আমার কর্ত্তব্য। চূড়ালা এই ভাবিয়া স্বামীর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং একটা বিকট সিংহনাদ করিলেন। সেই ভীষণ সিংহনাদে বনবাসীদিগের অন্তর ভীতিসঙ্কুল হইল। কিন্তু ভূয়োভূয় সিংহনাদ করিলেও শিখিধ্বজের অন্তর কিছুমাত্র চঞ্চল হইল না। তখন চূড়ালা হস্তযোগে তদীয় দেহ চালিত করিতে লাগিলেন, রাজা চালিত হইলেন, ভূতলে পড়িয়া গেলেন; অথচ তাঁহার বাহ্যজ্ঞান সঞ্চারিত হইল না। তখন কুম্ভরূপিণী চূড়ালা ভাবিলেন,—আমার স্বামী আত্মপদে পরিণত হইয়া স্বয়ং ভগবান্ হইয়া উঠিয়াছেন। এক্ষণে ইহাঁকে

প্রবোধিত করিয়া লওয়া সহজ কার্য্য নহে। কিন্তু প্রবুদ্ধ তো করিতেই হইবে; কি উপায়ে করি? অথবা কি জন্যই বা এই মহাত্মাকে প্রবোধিত করিব? ইনি এইভাবেই ক্রমশঃ বিদেহ মুক্তি প্রাপ্ত হইয়া যথাসুখে অবস্থান করিতে থাকুন। এই নারীদেহ পরিত্যাগ করিয়া আমিই না কেন একেবারে চিরতরে পরব্রহ্মে লীন হইয়া যাই?

বুদ্ধিমতী চূড়ালা এইরূপ ভাবিলেন,—ভাবিয়া তাহাই করিতে উদ্যতা হইলেন; কিন্তু পরক্ষণে আবার ভাবিলেন,—না, সহসা এ দেহ ত্যাগ করা হইবে না; আমি আর একবার দেখি, এ রাজার অন্তরে যদি বাসনা-সংস্কারের কণিকা অণুমাত্রও থাকে, তবে যথাকালে ইনি আবার প্রবোধও পাইতে পারেন। প্রবুদ্ধ হইলে জীবন্মুক্তের ন্যায় ইনি বিহার করিতে পারিবেন। আর যদি একান্তই প্রবোধ প্রাপ্ত না হন, এই অবস্থাতেই মুক্ত হইয়া যান, তবে তখন আমিও তো এতৎসহ সমত্ব পাইতে পারিব। এবার চূড়ালা এইরূপ চিন্তা করিয়া পতিকে স্পর্শ করিলেন। জানিলেন,—পতির বাহ্য চৈতন্যের হেতু সত্ত্বশেষ এখনও বিদ্যমান। তখন তদ্দর্শনে চকিতভাবে বলিলেন—এখনও তো ইঁহার বোধ-কারণ সত্ত্বশেষ আছে, দেখিতেছি।

রামচন্দ্র জিজ্ঞাসিলেন,—ব্রহ্মন্! চিত্ত যাঁহার একেবারেই শান্ত হইয়া গিয়াছে। কাষ্ঠ-পাষাণবৎ যদীয় জড়ত্ব প্রাপ্তি ঘটিয়াছে, তথাবিধ ধ্যানস্থ ব্যক্তির সত্ত্বশেষ কিরূপে পরিজ্ঞাত হওয়া গেল?

বশিষ্ঠ কহিলেন,—যেমন বীজমধ্যে পুষ্পফল, তেমনি হৃদয়মধ্যে সত্ত্বশেষ বিদ্যমান। পরমাণুর ন্যায় ঐ সত্ত্বশেষ সহজলক্ষ্য নহে। উহা হইতেই প্রবোধ সঞ্চার হইয়া থাকে। যাঁহার চিত্তে স্পন্দ নাই, দ্বৈতাদ্বৈত কোনও বিকাশ নাই; চৈতন্যই একমাত্র সৎ ও স্পন্দ-বিরহিত আছে, তথাবিধ যোগীর দেহ যতকাল সমভাবে থাকে, হৃষ্ট, ম্লান, অস্তমিত বা উদিত না হইয়া সমভাবেই অবস্থিত হয়, তাহার সত্ত্বশেষের অস্তিত্ব অনুমিত হইয়া থাকে। যে জন দ্বিত্ব একত্বাদি ভাবনায় কলুষীকৃত থাকে, তাহার দেহ স্পন্দযুক্ত হয় এবং কালবশে প্রকারান্তর হইয়া থাকে। কিন্তু যাহার ঐ প্রকার স্পন্দ নাই, তাহার কিছুই হইবার নহে। তবে

কথা এই, যতকাল তদীয় শুদ্ধ বাসনাকণার ভোগাবসান হইতে বিলম্ব থাকে, ততকাল সে ঐ একই ভাবে অবস্থান করে। বসন্তকাল যেমন বিবিধ কুসুমের আকর, চিত্তস্পন্দই তেমনি এই নিখিল জগৎস্থিতির নিদান। যতদিন পুনর্জ্জন্মের বীজ থাকে, ততদিন চিত্ত একদেহ হইতে দেহান্তরে গমন করে, এবং হর্ষ কোপাদি বিকারও তাহার থাকিয়া যায়; ঐ বিকারসমূহকে কিছুতেই বশতাপন্ন করা যায় না। চিত্তের যখন প্রশমন ঘটে, তখন দেহ হইতে নির্ব্বাসন চিত্তও চলিয়া যায়। আকাশে বস্তু-প্রতিঘাতবৎ সে দেহে তখন কোন বিকারই সংসক্ত হয় না। অচঞ্চল স্থির জল সমভাবে অবস্থিত হইলে তাহাতে যেমন তরঙ্গাদির উদয় হয় না, তেমনি সত্ত্বগমূহ সাম্যভাব উপগত হইলে চিত্তে আর কোনওরূপ ক্রোধাদির বিকার থাকে না। যতকালে না প্রারব্ধ ভোগবাসনার অবসান ঘটে, ততকাল দেহ সেই একভাবে অবস্থান করে। আর যখন প্রারব্ধ ভোগের বিশুদ্ধ বাসনা-কণা শনৈঃ শনৈঃ সমাপ্তি প্রাপ্ত হয়, তখন দেহও আর থাকে না। যে পর্য্যন্ত না বাসনাকণার অবসান হয়, সে পর্য্যন্ত বিশুদ্ধ সত্ত্বের উপলব্ধি হইবার নহে। যে দেহে সত্ত্ব নাই, চিত্ত নাই, চৈতন্য নাই, সে দেহ আতপ-তাপে হিমের ন্যায় পঞ্চভূতে মিশাইয়া যায়। রাজা শিখিধ্বজের দেহে চিত্ত নাই সত্য, কিন্তু তাহার সত্ত্ব রহিয়াছে; তাই দেহ তেজঃপুঞ্জে পরিপুষ্ট এবং কোনওরূপ গ্লানির অস্পৃষ্ট। বরাঙ্গনা চূড়ালা তথাবিধ স্বামিদেহ দেখিয়া নিজে দেহত্যাগ হইতে বিরত হইলেন; ভাবিলেন,— আমি ইহার হৃদয়-মধ্যগত বিশুদ্ধ চিৎতত্ত্বে প্রবেশ করি এবং তথায় গিয়া সেই ভাবেই অবস্থানপূর্ব্বক এখনই ইহাঁকে প্রবোধিত করিয়া লই। আমি যদি এ সময়ে ইহাঁকে প্রবোধ প্রদান না করি, তবে ইহাঁর প্রবুদ্ধ হইতে বহু কাল বিলম্ব হইবে। ততদিন আমাকে একাকী থাকিতে হইবে। অতএব আমি এখনই ইহাঁকে প্রবোধিত করিয়া লই। চূড়ালা এই ভাবিয়া স্বীয় দেহপিঞ্জর পরিহারপূর্ব্বক স্বামীর অনাদি অনন্ত চিৎতত্ত্বে অবস্থান করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি সত্ত্বমাত্রাবস্থিত স্বামীর চৈতন্য-স্পন্দ সম্পাদন করিয়া আপন দেহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মনে হইল, পক্ষিণী যেন নিজ নীড়ে আগমন করিল। তার পর

কুম্ভাকৃতি ধারণ করিয়া তত্রত্য কুসুমকাননে প্রবেশ করিলেন এবং মধুকরের ন্যায় ধীরে ধীরে গুন্‌গুন্‌ স্বরে সামগান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বসন্তকালীন শিশিরাহত পদ্মিনী যেমন পুনরায় প্রবুদ্ধ হইয়া উঠে, তেমনি সেই সামগান শ্রবণে রাজার দেহে সত্ত্বগুণময়ী বিশুদ্ধ চিৎ আবার জাগিয়া উঠিলেন। অনন্তর রাজা শিখিধ্বজ আপন সত্ত্বসম্পদ লাভ করিয়া দৃষ্টি উন্মীলিত করিলেন; মনে হইল, দিবাকর যেন কমলিনীকে প্রবোধিত করিয়া লইলেন। তিনি নয়ন মেলিয়া দেখিলেন—কুম্ভ সম্মুখে সামগানে নিরত;—যেন মূর্ত্তিমান্ সামবেদ আসিয়াই উপস্থিত! রাজা তাহা দেখিয়া মনে মনে বলিলেন,—আহা! আজ আমি ধন্য হইলাম। আমার আনন্দের দিন উপস্থিত। মুনিবর কুম্ভ অদ্য আপনা হইতেই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। এই বলিয়া শিখিধ্বজ কুম্ভের উদ্দেশে পুষ্পাঞ্জলি বর্ষণ করিলেন; বলিলেন, প্রভো! আমার অদ্য বড়ই সৌভাগ্যের দিন! কারণ আমি আবার আপনার পবিত্র চিত্তের স্মরণীয় হইয়াছি। অথবা পরের প্রতি সর্ব্বদা অনুগ্রহ প্রকাশ করাই মহাত্মগণের স্বভাব। তাই বুঝি, আপনি আমায় পবিত্র করিতেই আসিয়াছেন। নতুবা আপনার দ্বিতীয় বার আগমনের আর কি কারণ আছে, তাহা বলুন।

কুম্ভ কহিলেন,—হে অনিন্দ্য-স্বভাব! আমি যে দিন হইতে আপনার নিকট হইতে চলিয়া গিয়াছি, সেই দিন হইতেই চিত্ত আমার আপনারই সঙ্গে অবস্থান করিতেছে। সেই দিন হইতে আমি আর রম্য স্বর্গে বাস করি না, আপনারই সমীপে অবস্থান করিতেছি। কারণ চিত্ত যে বিষয়ের অভিলাষ করে, তাহা সদাই তৎসমীপে ধাবিত হয় এবং ঐ অভিলষিত বস্তু, সমস্ত রম্য বস্তু অপেক্ষা সার বলিয়া প্রতীয়মান হইয়া থাকে। আমার মনে হয়, এ জগতে তোমা হেন বিশ্বাসী বন্ধু আমার আর নাই; অথবা আত্মীয়, সুহৃৎ, সখা, বা শিষ্যও আমার তোমার ন্যায় কেহই নাই।

শিখিধ্বজ কহিলেন,—অহো, আপনি সঙ্গহীন হইয়াও যখন আমার সঙ্গ কামনা করিতেছেন, তখন নিশ্চয়ই আমার কুলাচলে আজ পুণ্য-পাদপের ফল ফলিয়াছে। প্রভো! এই বন আছে, বৃক্ষ আছে, আর

আমি আপনার আজ্ঞাবহ ভৃত্য সসম্ভ্রমে আপনার সমাদর করিতেছি, স্বর্গে বাস করা আপনার যদি অভিপ্রেত না হয়, তবে আপনি এইখানেই অবস্থান করুন। হে সাধো! আপনার প্রদত্ত যোগ-যুক্তিবলে আমি যে আত্মবিশ্রান্তি প্রাপ্ত হইয়াছি, এরূপ বিশ্রামসুখ স্বর্গেও আছে বলিয়া আমি মনে করি না। এই প্রকাশময় নির্ম্মল আত্মবিশ্রাম আপনিও প্রাপ্ত হইয়াছেন; সুতরাং স্বর্গে কিম্বা ভূপৃষ্ঠে যেখানেই হউক, সর্ব্বত্রই আপনি একই ভাবে বিহার করিতে পারেন।

কুম্ভ কহিলেন,—রাজন্! যাহা মহানন্দময় পরম পদ, আপনি তাহাতে বিশ্রাম লাভ করিয়াছেন তো? ভেদজ্ঞান-ময় দুঃখ পরিহারে সক্ষম হইয়াছেন তো? সঙ্কল্প সকল আপাতরম্য; ইহা ইহতে অনুরাগ আপনার একেবারেই গিয়াছে তো? সংসারের যাবতীয় বিষয়ভোগ আপনার নিকট নীরস ও অসার বলিয়া মনে হইতেছে তো? আপনি এখন হেয় বা উপাদেয়বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া সমভাবে অবস্থানপূর্ব্বক অনুদ্বিগ্ন-মনে যথালব্ধ বিষয় ব্যবহার করিতেছেন তো?

শিখিধ্বজ কহিলেন,—ভগবন্! যাহা দৃশ্যাতীত বিষয়, ভবৎপ্রসাদে তাহা আমি দেখিতে পাইয়াছি; সংসারের চরম সীমায় উপনীত হইয়াছি। যাহা লব্ধব্য বিষয়, তাহাও নিঃসন্দেহে অধিগত হইয়াছি। বহু কালের পর অদ্য আমি লব্ধবিশ্রাম ও নিরাময় হইতে পারিয়াছি। যাহা লব্ধব্য বস্তু, তাহা আমি লাভ করিয়াছি। আমি চির-পরিতৃপ্ত হইয়াছি। আমার আর কোনও বিষয়ে কোনও আকাঙ্ক্ষাই নাই। অধুনা আমায় উপদেশ প্রদান করিবারও কিছুই অবশিষ্ট নাই। আমি ত্রিতাপ মুক্ত হইয়াছি। যাহা জানিবার, তাহা আমার জানা হইয়াছে। যাহা ত্যাগ করিবার, তাহাও আমি ত্যাগ করিয়াছি। যাহা প্রাপ্তব্য, আমি প্রাপ্ত হইয়াছি। তত্ত্ব, পরত্ব, সত্ত্ব, সকলই আমার। আমি সংসার হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছি। মোহ, ভয় বা অনুরাগ সকলই আমার গিয়াছে। আমি নিত্যোদিত ও সম, সর্ব্ব ও শান্তভাবে অবস্থিত আছি। নিজেই আমি সর্ব্বময় হইয়াছি। কোনরূপ সঙ্কল্পের লেশও আমার নাই। আমি আকাশ-কোশবৎ বিশদ ও সমভাবেই সর্ব্বত্র বিরাজ করিতেছি।

ত্র্যধিক শততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১০৩ ॥

চতুরধিকশততম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র! সেই বিদিতবেদ্য কুম্ভ ও শিখিধ্বজ কাননমধ্যে থাকিয়া পরস্পর ঐরূপ অধ্যাত্মবিষয়ক অপূর্ব্বালাপে তিন মুহূর্ত্ত কাল কাটাইয়া দিলেন। অনন্তর তথা হইতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক তাঁহারা গিরিতটে, সারস-মুখরিত সরোবরে, নন্দনে ও অন্যান্য কানন প্রদেশে বিচরণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে উভয়ে নানা স্থানে নানা বনে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বিবিধ অধ্যাত্মকথার আলোচনা করিতে করিতে একাদি ক্রমে আট দিন অতিপাতিত করিলেন।

একদা কুম্ভ কহিলেন,—রাজন্! চলুন, আমরা অপর কোন পার্ব্বত্য বনে গমন করি। রাজা সে প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। তখন উভয়ে একযোগে তথা হইতে নির্গত হইয়া নানাবিধ বনে, জঙ্গলে, নদীতটে, সরোবরে, লতাকুঞ্জে, গিরিশিখরে, গভীর গহনে, নদীসমূহে, নানা গ্রামে, নগরে, নানা জন্তু-নিনাদিত শৈলকুঞ্জে, বিবিধ তীর্থে, ও দেবায়তনে, ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা তখন সমসত্ত্ব, সমোৎসাহ ও সদা সমু-ভাবাপন্ন হইয়া অবস্থিত ছিলেন। উভয়েই সমবুদ্ধি হইয়া সেকালে একযোগে দেব ও পিতৃগণের অর্চ্চনায় নিরত হইলেন। উভয়ে একত্রে আহার করিতে লাগিলেন। তাঁহারা কখন আতপ-তাপিত এবং কখন বা তুষারশীত দেশে অক্লান্তমনে বাস করিতে লাগিলেন। সেই স্নিগ্ধহৃদয় দম্পতি পরস্পর সৌহৃদ্য-সহকারে কখন তমাল-বনখণ্ডে এবং কখন বা মান্দার বনে বিচরণ করিতে লাগিলেন।

হে রাঘব! বাত্যা যত বড়ই হউক, সে যেমন সুমেরু-শৈলকে কাঁপাইয়া তুলিতে পারে না, তেমনি 'এই গৃহ, এই গৃহ নহে' এই প্রকার কোনও বিকল্পকল্পনাই তাঁহাদের চিত্তকে সমাকৃষ্ট করিতে সক্ষম হইল না। সেই বন্ধুদ্বয় কোথাও ধূলি-ধূসরিত, কোথাও চন্দন-চর্চ্চিত এবং কোথাও বা ভস্ম-ভূষিত হইয়া বিহার করিতে লাগিলেন। তাঁহারা কোথাও দিব্য বসন, কোথাও বিচিত্র বস্ত্র, কোথাও তরু-বল্কল এবং কোথাও বা মুকুট পরিয়া কাল কাটাইলেন। রাজা শিখিধ্বজ

কিয়দ্দিনের মধ্যেই সমচিত্ত ও সত্ত্বপূর্ণ হইয়া কুম্ভ মুনির তুল্যতা প্রাপ্ত হইলেন।

অনন্তর মানিনী চূড়ালা দেখিলেন,—শিখিধ্বজ দেবকুমারের স্থায় শোভা ধারণ করিতেছেন। তদ্দর্শনে তিনি মনে মনে ভাবিলেন,—এই স্বামী আমার এখন অদীনভাবে অবস্থিত। এই বনভূমিও রমণীয়। এখানে আমাদের এই যে জীবন্মুক্তভাবে অবস্থিতি, ইহা অনায়াসকরী; ইহাতে কামের বঞ্চনা নাই। কিন্তু জীবন্মুক্ত মাহাত্মগণ যথাপ্রাপ্ত বিষয়সমূহের উপভোগ করিয়া থাকেন। যাঁহারা তাহা করেন না, একমাত্র ভোগনিবৃত্তি-ব্যাপারেই যাঁহাদের আগ্রহ প্রকাশ পায়, তাঁহারা মূঢ়তার কার্য্যই করিয়া থাকেন। ফলে প্রারব্ধ ক্রমে যখন যেরূপ ভোগ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহাই তখন উপভোগ করা কর্ত্তব্য। এই আমার উদারমতি পতি রাজা শিখিধ্বজ এখানে উপস্থিত। ইহাঁর অন্তরে কোনই দুঃখ নাই, গ্লানি নাই; ইনি যুবা পুরুষ। এই যে ভবন, ইহাও কুসুমসমূহে সমলঙ্কৃত। এরূপ অবস্থায় উপনীত হইয়া যে রমণী পতির সঙ্গে রতিসুখ অনুভব না করে, সে হউক না জীবন্মুক্ত—তথাচ প্রারব্ধ কর্ম্মের প্রতি অবজ্ঞা-প্রকাশরূপ অপকর্ম্মে সে যে অপরাধিনী হইবে, সে বিষয়ে কোনই সংশয় নাই। যাহার কোন দুঃখ নাই, তথাবিধ কোন্ রমণী ঈদৃশ পুষ্পলতাময় ভবনে আপন স্বামীকে সমীপে পাইয়াও নিজের মনোরথ না পূরণ করিয়া লয়? বস্তুতঃ যে তাহা করে না, তাহাকে ধিক্কারযোগ্যই বলা যায়। যে সতী কুলস্ত্রী বিজনে নিজের অনিন্দিত পতিকে প্রাপ্ত হইয়াও স্বীয় অভীষ্ট সাধন না করে, তাদৃশ দুরাঙ্গনা সর্ব্বথা ধিক্কারেরই যোগ্যা। যাহা অনিন্দার্হ ভোগ, তাহা ত্যাগ করিয়াই বা ফল কি আছে? বস্তুতঃ যিনি বেদ্য বিষয় বিদিত হইতে পারিয়াছেন, আপনার প্রারব্ধ কর্ম্মবশে যেরূপ বিষয় ভোগ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা তাঁহার ভোগ করাই কর্ত্তব্য। সুতরাং আমার পতি যাহাতে এ কাননে আমার সহিত রতিসুখ ভোগ করেন, আমি স্বীয় প্রজ্ঞাবলে অধুনা সেইরূপ উপায়ই অবলম্বন করি।

কুম্ভরূপিণী চূড়ালা এইরূপ চিন্তা করিয়া সেই কাননকুঞ্জে অবস্থানপূর্ব্বক পতির সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন। মনে হইল, কোকিল

কামিনী যেন কোকিলকে কত কি বলিতে লাগিল। চূড়ালা কহিলেন,—অদ্য মধুমাসের শুক্লপক্ষীয় প্রতিপৎ তিথি; এই দিনে স্বর্গপুরে ইন্দ্রভবনে এক বিরাট দেবসভা হইবে। সে সভায় পিতার নিকট আমাকে উপস্থিত থাকিতেই হইবে। অতএব যথানিরূপিত নিয়ম লঙ্ঘন করা কোন ক্রমেই কর্ত্তব্য নহে। সেখানে গমন করা নিয়তিরই নির্দ্দিষ্ট নিয়ম। অতএব তাহা লঙ্ঘন করা আমার পক্ষে কখনই সমুচিত নহে। তুমি এইখানেই থাক; অত্রত্য নবকুসুমিতা বনস্থলীতে থাকিয়া একাকী ক্রীড়া করিতে করিতে আমার জন্য প্রতীক্ষা কর। সায়ং সময় উপস্থিত হইলে আমি আবার নিশ্চয়ই তোমার নিকট আসিব। স্বর্গে বাস করা অপেক্ষা আমি তোমার সমীপে অবস্থান করা অধিক আনন্দপ্রদ বলিয়া মনে করি।

কুম্ভ এই বলিয়া স্বীয় সুহৃৎ শিখিধ্বজকে কল্পতরুকুসুমের কমনীয় মঞ্জরী প্রীতি-উপহারের ন্যায় প্রদান করিলেন। রাজা বলিলেন—আপনি অচির কালমধ্যেই আগমন করিবেন; আগমনে যেন আপনার বিলম্ব না হয়। তিনি এই কথা বলিবামাত্র সেই মুহূর্ত্তেই কুম্ভ সেই কানন-স্থলী হইতে শারদ জলদের ন্যায় দ্রুতবেগে গগনমণ্ডলে আরোহণ করিলেন। তিনি ব্যোমপথে যাইতে যাইতে স্বীয় গলবিলম্বিনী কুসুম-মালা হইতে পুষ্পাঞ্জলি বিকিরণ করিয়া যাইতে লাগিলেন। সে দৃশ্য দেখিয়া মনে হইল, হিম-সজ্জময় মেঘ যেন বায়ুবেগে চারিদিকে তুষারপুঞ্জ বর্ষণ করিতে লাগিল। ময়ূর যেমন উৎফুল্ল-নেত্রে মেঘ সন্দর্শন করে, তেমনি সেই শিখিধ্বজ রাজা তখন বিস্ফারিত-নেত্রে যতদূর দৃষ্টি চলে, ততদূর কেবল কুম্ভকেই তাকাইয়া দেখিতে লাগিলেন। বস্তুতঃ বুদ্ধিমান্ জনের সঙ্গ হইতে বিযুক্ত হইয়া থাকা বড়ই কষ্টকর হইয়া থাকে।

অনন্তর কুম্ভ যখন যাইতে যাইতে শিখিধ্বজ রাজার দৃষ্টিপথ অতিক্রান্ত হইলেন, তখন নভোমণ্ডলেই স্বীয় কুম্ভদেহ পরিহারপূর্ব্বক কমনীয় কামিনী মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। তাহা দেখিয়া মনে হইল, আবর্ত্ত-ভাবের প্রশমনে জলশ্রী যেন স্বীয় শান্ত-মধুর কান্ত মূর্ত্তি ধারণ করিল। পরে তিনি আকাশপথ বাহিয়াই স্বীয়পুরে উপনীত হইলেন। তাঁহার সেই

সুন্দরী পুরী মঞ্জরিত কল্পতরুর ন্যায় পতাকারাজি-বিরাজিত হইয়া স্বর্গের ন্যায় সুরম্য হইয়াছিল। তিনি সেই পুরীমধ্যে প্রবেশ করিলেন। মনে হইল, যেন বসন্তলক্ষ্মী অলক্ষিতভাবে পুষ্পবল্লী-বিমণ্ডিত তরুবনে আসিয়া বাস করিল।

চূড়ালা তথায় গিয়া সমস্ত রাজকার্য্য সত্বর নির্ব্বাহ করিলেন। অনন্তর তিনি বৃক্ষ হইতে ফলপুষ্পের ন্যায় সহসা আসিয়া শিখিধ্বজ-সমীপে আপতিত হইলেন। চূড়ালা স্বামীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া নিজ মুখ ম্লান করিলেন। তদ্দর্শনে মনে হইল, নিশা যেন কমলকে ম্লান করিল অথবা শিশিরকালের নিশাকর যেন নীহারজালে আবৃত হইয়া কিঞ্চিৎ ম্লানভাব ধারণ করিলেন। রাজা শিখিধ্বজ তাঁহাকে তাদৃশাকারে আসিতে দেখিয়া উত্থিত হইলেন এবং খিন্নমনে সমাদরের সহিত কহিলেন—হে দেবপুত্র! আপনাকে নমস্কার করি; বলুন দেখি, আপনাকে এরূপ বিমনার ন্যায় দেখা যাইতেছে কেন? আপনি কুম্ভ; আপনার এরূপ সংরম্ভ পরিত্যাগ করাই কর্ত্তব্য। অতএব তাহাই করুন; বিষাদ বিদূরিত করিয়া এই আসনে সমাসীন হউন। যাঁহারা বেদ্য ব্রহ্মতত্ত্ব বিদিত হইয়াছেন, তাঁহারা কখনই হর্ষ বা বিষাদকৃত বিকারে অভিভূত হইবার নহেন। বস্তুতঃ পদ্ম কি কখন জলার্দ্র হইয়া থাকে?

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাজা শিখিধ্বজ ঐরূপ বলিলে কুম্ভ সেই আসনে উপবেশনপূর্ব্বক বিশীর্ণ বংশীরবের ন্যায় বিষণ্ণবাক্যে বলিতে লাগিলেন— যতদিন দেহ আছে, সেই পর্য্যন্ত যে সকল তত্ত্বদর্শী সমচিত্তে অবস্থিত থাকিয়া কর্ম্মেন্দ্রিয় ক্রিয়ার সাফল্য সাধন না করে, তাহারা শঠ নামেরই যোগ্য। হে রাজন্! যাহারা অতত্ত্বজ্ঞ, তাহারাই সমচিত্ততার অভাব-নিবন্ধন ইন্দ্রিয়নিগ্রহে সমর্থ হয় না। পরন্তু তত্ত্বজ্ঞানীরা সে বিষয়ে সম্পূর্ণ সক্ষম। দেখ, তিলমাত্রেই তৈল এবং দেহমাত্রেই কর্ম্মেন্দ্রিয়-দশা; কিন্তু যে ব্যক্তি না ঐ দেহদশা প্রাপ্ত হয়, অসি দ্বারা আকাশচ্ছেদন-কার্য্যেই তাহার আসক্তি হইয়া থাকে। তত্ত্বজ্ঞানীর কার্য্য এই যে, দেহের সমস্ত লাভ করিয়া দৈহিক কার্য্য-দশায় তিনি কোনও রূপ কষ্ট বোধ করেন না। ক্লেশানুভব না করিয়া যদি দৈহিক কার্য্য

সম্পাদন করা হয়, তবে তাহাতে দোষ কি? ব্রহ্ম বিষয়ে চিত্তের যে একাগ্রতা, তাহা দ্বারাই সমস্ত লাভ হইয়া থাকে। পরন্তু কর্ম্মেন্দ্রিয়ের নিগ্রহ করিয়া উহা লাভ করা যায় না। অতএব যদি কর্ম্মেন্দ্রিয়ের কার্য্য করা যায়, তবে তো ঐ সমস্তবিষয়ক হানি কিছুই হইবার নহে। যতদিন না দেহের অবসান হয়, ততদিন কেবল কর্ম্মেন্দ্রিয়-যোগেই যথাকালে যথাযথ ব্যবহার সম্পাদন করা কর্ত্তব্য। কিন্তু বুদ্ধীন্দ্রিয় দ্বারা কদাচ কিছুই কর্ত্তব্য নহে। হিরণ্যগর্ভ হইতে আরম্ভ করিয়া যাবতীয় তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তিরাই দৈহিক কার্য্য দশার অনুগমন করিয়া থাকেন। এ নিশ্চয় নিয়তি দ্বারাই নিরূপিত। জল যেমন জলধির দিকেই ছুটিয়া থাকে, তেমনি কি তত্ত্বজ্ঞানী, কি অতত্ত্বজ্ঞানী, কি এই নিখিল দৃশ্যপ্রপঞ্চ, সকলই সেই নিয়তির পথে ধাবমান। ফলে নিয়তির অধীন নহে, এমন কেহই নাই। যতদিন দেহ বিদ্যমান থাকে, ততদিন পর্য্যন্ত তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি অন্তরে সমবুদ্ধি স্থাপনপূর্ব্বক কর-চরণাদি সঞ্চালনরূপ বাহ্যিক ব্যাপারে নিয়তই নিয়তির আদেশ পালন করেন; কিন্তু যাহারা অজ্ঞানান্ধকারে নিমগ্ন, তাহারা সুখের পর দুঃখ, দুঃখের পর সুখ, এইরূপ দশাবিপর্য্যয়ে জর্জ্জরিত হইয়া নিরন্তর তদগত-মনে কেবল নিয়তিরই আদেশ পালন করিয়া যায়। তাহাদের নিকটও নিয়তি খণ্ড-বিখণ্ডরূপে প্রতিভাত নহে। তাহারাও জন্মের পর জন্ম, তার পর জন্ম, এইরূপ ক্রমে লক্ষ লক্ষ জন্ম পরিগ্রহ করিয়া থাকে। জীবগণ ইহা বিলক্ষণরূপেই জানে যে, সুখের দশায় এইরূপে থাকিতে হয়; আর দুঃখের দশায় এইরূপে থাকিতে হইবে। সুখ-দুঃখ-দশায় এই এই রূপে অবস্থান নিয়তিরই অলঙ্ঘনীয় লীলা-বিলাস। নিয়তির এ হেন লীলা—কি অজ্ঞ, কি বিজ্ঞ, সর্ব্ববিধ প্রাণীর উপরই সমানভাবে প্রতিষ্ঠাপন্ন।

চতুরধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১০৪ ॥

পঞ্চাধিক-শততম সর্গ।

শিখিধ্বজ কহিলেন,—হে তত্ত্ববেদিগণের অগ্রণী, কুম্ভ-মুনে! আপনি যে বিষয় ব্যাখ্যা করিলেন, উহাতে আপনার এরূপ উদ্বেগ প্রাপ্তি হইবার কারণ কি? হে মহাভাগ! তাহা আমার নিকট ব্যক্ত করুন।

কুম্ভ কহিলেন,—রাজন্! শ্রবণ করুন। আপনার কাছে আমার মনের কথা সকলই বিশদ করিয়া বলিতেছি। আজি স্বর্গধামে গিয়াছিলাম, তাহা আপনি জানেন। সেখানে অদ্য যে যে ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহাই অগ্রে স্পষ্ট করিয়া বলি। কেন না, সুহৃজ্জনের নিকট দুঃখের কথা ব্যক্ত করিলে জলবর্ষণে জলধর যেমন লঘু হয়, তেমনি দুঃখও কথঞ্চিৎ লঘুত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সুহৃদ্ ব্যক্তি দুঃখের বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেও কতক-ফল-যোগে জলের ন্যায় চিত্ত অনেক নৈর্ম্মল্য ধারণ করিয়া থাকে; দুঃখ যেন অনেকাংশে লঘু হইয়াই যায়। যাহা হউক, এখন প্রকৃত প্রস্তাব শ্রবণ করুন। আমি আপনার হস্তে সেই পুষ্পমঞ্জরী অর্পণ করিয়া এ স্থান হইতে আকাশে উঠিলাম; পরে আকাশ ভেদ করিয়া ক্রমে স্বর্গধামে গিয়া উপস্থিত হইলাম। সেখানে দেবেন্দ্রের সভায় আমার পিতা উপস্থিত ছিলেন। তিনি তাঁহার কর্ত্তব্য শেষ করিয়া উত্থানকালে আমায় বিদায় দিলেন। আমি এক্ষণে আসিবার জন্য স্বর্গধাম পরিত্যাগ-পূর্ব্বক নভোমণ্ডলে অবতরণ করিলাম। পরে বায়ুপথে সূর্য্যাশ্বগণের সঙ্গে সঙ্গে কিয়দ্দূর অতিবাহিত করিতে লাগিলাম। ক্রমে সূর্য্যদেব অন্য পথে প্রধাবিত হইলেন। আমি তাঁহার সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া অন্য পথ অবলম্বনপূর্ব্বক সাগরবৎ আকাশপথে ভাসিয়া ভাসিয়া এই আশ্রমের দিকে আসিতে লাগিলাম। তখন সম্মুখে দেখিতে পাইলাম, মুনিবর দুর্ব্বাসা তত্রত্য জলময় মেঘমণ্ডলী ভেদ করিয়া আগমন করিতেছেন। তাঁহার মেঘ-বসন পরিধান এবং করযুগলে বিদ্যুদ্বলয় সুশোভন। মেঘচ্যুত জলধারায় তদীয় গাত্র-চন্দন ধৌত হইয়া যাইতেছে; মনে হইল, যেন কোন অভিসারিকা কামিনীর ন্যায় তিনি চলিয়া

আসিতেছেন। ভূতলে যে তরুচ্ছায়া-পরিবৃতা ভাগীরথী প্রবাহিতা হইতেছেন, মুনিবর স্বীয় সন্ধ্যাবন্দনাদি সম্পাদন করিবার জন্য তাহারই দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন। তাঁহার তদভিমুখে গমন দেখিয়া মনে হইল, যেন তিনি নিজ প্রিয়তমা তপোলক্ষ্মীর দিকেই ধাবমান। আমি আকাশ-পথে চলিতে চলিতে সেই মুনিকে নমস্কার করিলাম এবং বলিলাম,—হে মুনীন্দ্র! আপনি নীলাভ্র-বসন পরিয়াছেন; সুতরাং আপনাকে একটী নীলবসনা অভিসারিকা কামিনীর ন্যায়ই অবিকল দেখা যাইতেছে। হে মানদ! আমার এই কথা শুনিবামাত্র সেই মুনি ক্রুদ্ধ হইয়া আমার প্রতি অভিশাপ প্রদান করিলেন; বলিলেন,—যা তুই, আমাকে যেমন এই পরিহাসোক্তি করিলি, ইহার ফলে তুই রাত্রিকালে স্তন-কেশবতী হাবভাব-বিলাসিনী রমণী হইবি। সেই ক্রুদ্ধ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের মুখে তাদৃশ অশুভ বাক্য শ্রবণ করিয়া আমি কত কি ভাবিতে লাগিলাম; ইতিমধ্যে সেই মুনি তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন; তাঁহাকে আর দেখিতে পাইলাম না। হে সাধো! এই জন্যই আমার মন উদ্বিগ্ন হইয়াছে। আমি উদ্বিগ্ন-চিত্তে নভোমণ্ডল হইতে এখানে আগমন করিয়াছি। আমার এই দুঃখ-কাহিনী আপনার নিকট ব্যক্ত করিলাম। আমার ভাবনা হইতেছে, রাত্রিকালে কিরূপে আমি নারী হইব এবং নারী হইয়া কিরূপেই বা দীর্ঘ নিশা যাপন করিব? নিশাকালে স্তন-কেশবতী রমণী হইব, ঐ কথা পিতাকেই বা আমি কেমন করিয়া কহিব?—এ কথা শুনিয়া তিনিই বা কি বলিবেন? অহো! সংসারে ভবিতব্য বিষয়ের গতি কি বিষম! কি বিচিত্র! আহা, কি দুঃখ! কামাতুর দেবকুমারগণ এখনই আমাকে লইয়া পরস্পর কলহের সূচনা করিবে। আমি নিশায় কামিনী হইব; কামিনী হইয়া কেমনে দেব, বিপ্র ও অন্যান্য গুরুজন সমীপে লজ্জানম্রভাবে অবস্থান করিব?

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! সেই চূড়ালা এই কথা কহিয়া কিঞ্চিৎকাল মৌনাবলম্বনে অবস্থান করিলেন; পরে ধৈর্য্যগুণে চিত্ত সমাহিত করত আবার কহিতে লাগিলেন,—অজ্ঞের ন্যায় কেনই বা আমি শোক করি? ইহাতে আমার আত্মক্ষতি হইবার সম্ভাবনা কি আছে? আমি যদি স্ত্রী

হই, তবে তাহাতে আমার কি? আমার দেহেরই তাহাতে পরিবর্ত্তন ঘটিবে। কিন্তু এই দেহ তো আমা হইতে স্বতন্ত্র বস্তু; সুতরাং ইহা যাহা হয় হউক, আমার ক্ষতি কি?

শিখিধ্বজ কহিলেন,—হে দেবকুমার! আপনি চরমে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন, উহাই উত্তম। পরিদেবনায় ফল কিছুই নাই! দেহের অবস্থাবিপর্য্যয় ঘটে ঘটুক, ইহার উপর যেরূপ দশা আপতিত হইতে হয় হউক, তাহাতে হানি কিছুই দেখি না; কেন না, আত্মা তো তাহাতে লিপ্ত হইবার নহেন। এই দেখুন না কেন, যত কিছু সুখ-দুঃখ, সকলই কেবল এক দেহের উপরই আপতিত হইতেছে। এই সুখ দুঃখ-পাতে দেহীর তো কোনই হানি নাই। এ সকল ঘটনার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া আপনার আর খেদানুভব করা কর্ত্তব্য নহে। এই ব্যাপারে আপনি যদি খেদানুভব করেন, তবে আর কে বলুন লোকের এবম্বিধ খেদ অপনয়ন করিয়া দিবে? আর কাহাকেই বা শাস্ত্রার্থ-বিচারকদিগের পুরোভাগে বিরাজ করিতে দেখিব? ফল কথা, আপনি যে প্রকৃতই খেদানুভব করিতেছেন, ইহা আমি এখনও মনে করি না। লোকাচারের অনুবর্ত্তন করিতে হয়, আপনি তাই করিতেছেন। এ হেন বিষম দশায় পড়িয়া সাধারণ লোকে খেদানুভব করে, তাই বুঝি আপনিও ইহা করিলেন! কিন্তু আমি বেশ বুঝিতেছি, আপনার এই খেদ বাহ্যিক; ইহা কখনই আন্তরিক নহে। আপনি এক্ষণে সমতা উপগত হউন, পূর্ব্বে যেমন খেদশূন্য ছিলেন, এখনও তেমনি ভাবে অবস্থান করুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—সেই বন্ধু-যুগল বনের মধ্যে এমনই ভাবে পরস্পর খিন্ন হইয়া পরস্পরকে আশ্বাস প্রদান করিলেন। অনন্তর জগতের প্রদীপ দিনমণি অস্তাচলে চলিলেন। সে দৃশ্য দেখিয়া মনে হইল, দিননাথ যেন কুম্ভের কামিনীত্ব বিধান করিবার জন্যই অস্তমিত হইলেন। সে ঘটনায় আরও মনে হইল, স্নেহাপগমে প্রদীপ যেন নির্ব্বাপিত হইয়া গেল। অপিচ জগদ্বাসী নর-নারীর কার্য্য-কলাপের সঙ্গে সঙ্গে সরোবরের কমলকুল তখন সঙ্কুচিত হইল। পথিকদিগের সঙ্গে সঙ্গে পথ সকল অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়া গেল। যে সকল পথিক সে কালে স্ব স্ব গৃহে উপনীত

হইতে পারিল না, তাহাদের বধূগণের বিরহার্ত্ত হৃদয় শোকান্ধকারে আচ্ছন্ন হইল। সন্ধ্যার সমাগমে বিহঙ্গমকুল চারিদিক্ হইতে আসিয়া স্ব স্ব কুলায়ে আশ্রয় লইল। তারকা-রত্ন-রাজি-রাজিত ভুবন যেন মীন, রত্ন ও বিহঙ্গ-সংগ্রহকারী কৈবর্ত্তকুলের সমস্ত উপগত হইল। সরোবরে কুমুদ-কুসুম ফুটিয়া উঠিল। আকাশে নক্ষত্ররাজি যুগপৎ বিকাশ পাইল। তখন যেন কুমুদ ও নক্ষত্র উভয়ে উভয়কে উপহাস করিতে লাগিল। মধু-লোভে মধুপকুল কুমুদবনে পতিত হইল। চক্রবাক-মিথুন সন্ধ্যা-সমাগমে পরস্পর বিয়োগবিধুর হইয়া মনের দুঃখে করুণকণ্ঠে চিৎকার করিতে লাগিল। সুধাকর সমুদিত হইলেন।

এ হেন সময়ে সেই বন্ধুযুগল—শিখিধ্বজ ও কুম্ভ গাত্রোত্থানপূর্ব্বক সন্ধ্যাদেবীর বন্দনা করিয়া পরে লতাকুঞ্জে উপবেশন করিলেন এবং স্ব স্ব নিয়মিত জপকার্য্য সমাধা করিতে লাগিলেন। অনন্তর কুম্ভ ধীরে ধীরে স্ত্রীমূর্ত্তি ধারণ করিলেন এবং সম্মুখস্থ শিখিধ্বজকে সম্বোধন করিয়া বাষ্প-গদ্‌গদ-কণ্ঠে কহিতে লাগিলেন,—রাজন্! এই বুঝি আমি রমণী হইলাম। আহা, লজ্জায় মরিয়া গেলাম! বুঝি আমি পতিত হইলাম। আমার অঙ্গ-যষ্টি যেন গলিত হইয়া গেল। প্রভো! চাহিয়া দেখুন, সন্ধ্যার অন্ধকার-পুঞ্জের ন্যায় এই আমার কেশ-কলাপ বাড়িয়া উঠিল। নৈশ তিমির-স্তোমের মাঝে মাঝে নক্ষত্ররাজি যেমন বিরাজ করে, তেমনি আমার এই কেশপাশের মধ্যে মধ্যে মুক্তামালা ঝল্‌মলীকৃত হইতেছে। এই দেখুন, —এইবার বুঝি আমার বক্ষস্থলে স্তনযুগল উত্থিত হইল। মনে হয়, যেন বসন্তকালের দুইটী কমল-কোরক ঊর্দ্ধমুখে উঠিয়া পড়িল। এই দেখুন, —রমণী-জনোচিত অঙ্গাবরণের ন্যায় বসন আমার আগুল্‌ফ লম্বিত হইয়া সকল অঙ্গ ঢাকিয়া ফেলিল। সখে! দেখুন, দেখুন, আমার সর্ব্বাঙ্গ হইতে কত রত্ন, ভূষণ ও মাল্যাদি প্রাদুর্ভূত হইল—যেন তরুগাত্রে পুষ্পরাজি প্রস্ফুটিত হইয়া পড়িল। এই দেখুন, আমার মস্তকে চন্দ্রকরবৎ শুভ্র পট্টবস্ত্র সুশোভিত হইল। হে মানী জনের মানপ্রদ! রমণীজনের যে যে চিহ্ন থাকা উচিত, এই দেখুন,—অদ্য আমার সেই সকল চিহ্নই ফুটিয়া উঠিল। কি কষ্ট! কি দুঃখ! কি করিব? কোথায় যাইব?

আমি যে এখন সম্পূর্ণই রমণী হইয়া পড়িলাম। হে সাধো! নিতম্ব-বিম্বের গুরুভার-বহনের ক্লেশ আমি এখন অন্তরেও উপলব্ধি করিতেছি। এইরূপে আমি সর্ব্বথা নারী হইয়াই গিয়াছি।

কুম্ভ সেই কাননকুঞ্জের মধ্যে বসিয়া এই কথা কহিতে কহিতে খিন্ন-মনে মৌনাবলম্বী হইলেন। রাজা শিখিধ্বজও তাঁহার অবস্থা দেখিয়া বিষাদবৈরস্য ধারণ করিলেন। অনন্তর মুহূর্ত্তমাত্র তূষ্ণীম্ভাবে রহিয়া পরে বলিতে লাগিলেন,—আহা কি কষ্টের কথা! সেই এই মহাসত্ত্ব-শালী পুরুষ এক্ষণে সম্পূর্ণ বরাঙ্গনা হইয়া পড়িলেন। হে সাধো! আপনাকে আর কি বুঝাইব? আপনি বিদিতবেদ্য মহাশয়; নিয়তির গতি আপনার বিলক্ষণই বিদিত। অতএব এই অবশ্যম্ভাবী ঘটনার জন্য আপনি আর শোক করিবেন না। জানিবেন—এই এই বিশেষ বিশেষ ঘটনা জীবন্মুক্ত ব্যক্তিগণের মাত্র দেহের উপরই আপতিত হইয়া থাকে। তাঁহাদের চিত্তের উপর এই সকল ঘটনা কখনই প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। এই জন্য তাঁহাদের ইহাতে শোকও নাই, হর্ষও নাই। যাহাদের তত্ত্ব-বুদ্ধি নাই, তাহাদের চিত্তে গিয়া এ সকল ঘটনা একান্ত আসক্ত হয় বলিয়া তাহারাই ধৈর্য্য হারাইয়া থাকে।

কুম্ভ কহিলেন,—রাজন্! নিয়তির অলঙ্ঘনীয় লীলাই সিদ্ধ হউক। আমি আপনার কথানুসারেই অবস্থান করি। যামিনীযোগে রমণী হইয়াই কাল কাটাইতে থাকি। নিয়তির নির্দেশ কেহই লঙ্ঘন করিতে পারে না। আমিও তাহা করিতে চাহি না। এইরূপ নির্ণয় করিয়া তাঁহারা পরস্পর মনঃকষ্টের লাঘব করিলেন এবং একই শয্যায় শয়ন করিয়া সে রাত্রি অতিবাহিত করিলেন। প্রবল উৎকণ্ঠাবশে তাঁহাদের নিকট সে রাত্রি অতি দীর্ঘ বলিয়া অনুভূত হইল। অনন্তর রাত্রি প্রভাতে কুম্ভ তাঁহার যুবতী স্ত্রীমূর্ত্তি পরিহার করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় দীর্ঘ কেশ ও কুচকুম্ভাদি-বিরহিত, পুরুষমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিলেন। তিনি দিবসে কুম্ভরূপে এবং রাত্রিকালে রমণীরূপে স্বামীর সমীপে বাস করিতে লাগিলেন। কুম্ভ নিশাযোগে নারী-ধর্ম্মিণী হইয়া বনান্তে বিহার করেন এবং দিবসে বন্ধুবর রাজার সহিত কুম্ভরূপে কাল কাটাইতে থাকেন। এইরূপে সেই রমণী-

শিরোমণি চূড়ালা স্বামী সহ বন্ধুভাবে কৈলাস, মন্দর, সুমেরু ও সহ্য প্রভৃতি শৈলসমূহের সানুদেশে যথেচ্ছ ভাবে বিহার করিয়া বেড়াইলেও তদীয় যোগসমৃদ্ধির অপচয় কিছুই ঘটিল না।

পঞ্চাধিক শততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১০৫ ॥

ষড়ধিক শততম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! কতিপয় দিবস অতিপাতিত হইলে কুম্ভরূপিণী চূড়ালা একদিন স্বামীকে বলিলেন,—হে কমল-দলনয়ন ভূপাল! আমার কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে, তাহা আপনি শ্রবণ করুন। আমি প্রতিদিন নিশাযোগে নারী হইয়া অবস্থান করিয়া থাকি। আমার অধুনা এইরূপ ইচ্ছা হইয়াছে যে, আমি আমার নারী-ধর্ম্মের সাফল্য সম্পাদন করি। অতএব বিবাহবন্ধনে কোন যোগ্য ভর্ত্তাকে আত্মসমর্পণ করাই আমি শ্রেয়স্কর বলিয়া মনে করিতেছি। আমার ধারণা—এ ত্রিজগতে আপনিই একমাত্র উপযুক্ত ভর্ত্তা। অতএব নিশায় নারী-অবস্থায় আপনিই আমায় বিবাহ করিয়া ভার্য্যারূপে গ্রহণ করুন। হে সাধো! ভবাদৃশ প্রিয় সুহৃদের সংসর্গে আমি অনায়াসলভ্য রমণী-জনোচিত সুখ সম্ভোগ করিতে ইচ্ছা করিতেছি। আপনি ইহাতে বাধা জন্মাইবেন না। সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে এই সাধনাসুন্দর সুখ পর্য্যায়ক্রমে চলিয়া আসিতেছে। এ সুখ যদি স্বতই আসিয়া উপস্থিত হয়, তবে ইহা ভোগ করিবার পক্ষে দোষ কি আছে? আমরা তো সকল ব্যাপারেই ইচ্ছা, অনিচ্ছা, উভয়ই বিসর্জ্জন দিয়া ইষ্ট কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকি।

শিখিধ্বজ কহিলেন,—হে সখে! এইরূপ কার্য্য সম্পাদনে শুভাশুভ কিছুই দেখি না। অতএব তোমার যাহা অভিপ্রেত হয়, করিতে পার। আমার চিত্ত সমত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। আমি এই সমগ্র ত্রিজগৎকেই আত্মস্বরূপে দর্শন করিতেছি; সুতরাং যেরূপ ইচ্ছা করিতে পার, আমার আপত্তি নাই।

কুম্ভ কহিলেন,—মহীপতে! যদি এইরূপই আপনার অভিমত হয়, তবে অদ্যই শুভ লগ্ন উপস্থিত। অদ্য শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমা তিথি। ইহা পূর্ব্ব দিনই আমি গণনা করিয়াছি। হে মহাভুজ! পূর্ণচন্দ্র সমুদিত হইলে অদ্য রাত্রি-কালেই আমাদের উভয়ের বিবাহ-ব্যাপার সম্পাদিত হইবে। অতএব চলুন, আমরা মহেন্দ্রাচলের কোন এক মনোরম মণিময় কন্দরে গমন করি। সেই সুন্দর কন্দরই আমাদের বিবাহের যোগ্য স্থান। সেখানে সর্ব্বদাই রত্নের প্রদীপ প্রজ্বলিত হইতেছে। তাহার বহির্দেশে যে সকল উন্নত পাদপ আছে, তাহারা সতত পুষ্প-ফলভরে অবনত এবং কত কত বন-কুসুম-শালিনী লতাকামিনী তথায় নৃত্য ব্যাপারে নিরত।

হে কর্ণান্ত-বিশ্রান্ত-নয়ন, নরপাল! আমরা রাত্রিকালে সেইখানে যখন উপস্থিত হইব, তখন গগনোদ্ভাসিনী তারকাবলী তাহাদের পতি পূর্ণচন্দ্রের সহিত একযোগে সমুদিত হইয়া আমাদের বিবাহ-মহোৎসব পরিদর্শন করিবেন। তাই বলিতেছি, রাজন্! চলুন, এখান হইতে গাত্রোত্থান করুন; আমরা বিবাহ নির্ব্বাহের জন্য যথাসম্ভব পুষ্পচন্দনাদি ও মণিরত্নাদি সংগ্রহ করিয়া লই। কুম্ভ এই কথা কহিয়া তৎকালে শিখিধ্বজ-রাজের সহিত পুষ্পাদি চয়ন ও রত্ন প্রভৃতি সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। সুন্দর সমতল গিরিতটে পুষ্প চয়ন করিয়া করিয়া অল্প-কালমধ্যেই তাঁহারা রাশি রাশি পুষ্প সংগ্রহ করিলেন এবং অসংখ্য মণিমাণিক্য ও বসন-ভূষণাদিও সংগ্রহ করিয়া সে গিরির তটান্তরে রাখিয়া দিলেন। সে দৃশ্য দেখিয়া মনে হইল, মন্মথ যেন পুণ্য-লব্ধ সৌভাগ্যপুঞ্জ একত্র সঞ্চয় করিয়া রাখিল।

অনন্তর পরস্পর সৌহৃদ্য-সম্পন্ন সেই কুম্ভ ও রাজা শিখিধ্বজ উভয়ে বিবাহোচিত দ্রব্য সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া তত্রত্য কনক-কন্দরে স্থাপনপূর্ব্বক মন্দাকিনীর জলে স্নান করিতে গেলেন। তথায় কুম্ভ আপন ভাবী স্বামী গজস্কন্ধ মহারাজ শিখিধ্বজকে বহু সমাদর করিয়া স্বয়ং স্বহস্তে স্নান করাইলেন এবং শিখিধ্বজও তাঁহাকে সমাদরে স্নান করাইয়া দিলেন। তাঁহারা উভয়েই কর্ম্মফল বা কর্ম্মত্যাগ কোন

কিছুতেই ইচ্ছা-সম্পন্ন নহেন। তথাচ তাঁহারা স্নান করিয়া দেব, পিতৃ ও মুনিগণকে অর্চ্চনা করিলেন। অনন্তর সতত জ্ঞান-রসতৃপ্ত সেই দুই তাপস জাগতিক নিয়মের অধীনতায় স্ব স্ব যোগবলোপনীত সুরস খাদ্য বস্তু ভক্ষণ করিলেন। ফল মূল ভোজন করিয়া পরে কল্পতরুজাত শুভ্র দুকূল পরিধানপূর্ব্বক বিবাহক্ষেত্রে আসিয়া উপনীত হইলেন। অনন্তর পরস্পর বিবাহ-সমুৎসুক সেই বন্ধুযুগলের সন্তোষ সাধনের জন্যই দিবসকর অস্তাচলে আরোহণ করিলেন। অনন্তর সন্ধ্যাকাল আসিল। তাঁহারা অঘমর্ষণ মন্ত্রাদি জপ করিলেন। তাঁহাদের বিবাহ-ব্যাপার দেখিবার নিমিত্তই নক্ষত্ররাজি যেন আকাশে আসিয়া প্রকাশ পাইল। রজনী পরস্পর-মিলিত পতি-পত্নীর প্রীতিকরী সখীরূপিণী; তিনি এখন কুমুদ-কুসুমরূপ হাস্যচ্ছটা বিচ্ছুরিত করিয়া হিমবিন্দু বিকিরণ করিতে করিতে আসিয়া উপনীত হইলেন। ব্রহ্মা যেমন গগনতলে প্রদীপবৎ চন্দ্র-সূর্য্যাদি জ্যোতিষ্কনিচয় প্রদান করিয়াছেন, তেমনি সেই কুম্ভ তখন তত্রত্য পর্ব্বতপ্রদেশে রত্নদীপ আনিয়া স্থাপন করিলেন। ক্রমে রাত্রি হইল। কুম্ভ রমণীত্ব প্রাপ্ত হইলেন। তখন তিনি চন্দন, কস্তুরী, কুঙ্কুম ও কর্পূর প্রভৃতি গন্ধ দ্রব্য দ্বারা রাজাকে বিভূষিত করিয়া দিলেন। চূড়ালা অদ্য বহুদিনের পর মনের সাধ মিটাইবার অবকাশ পাইলেন। তিনি হার, কেয়ূর, মাল্য, মস্তকভূষণ, কল্প-লতোৎপন্ন পট্ট-বসন, নানাবিধ কুসুমমালা, কল্পলতিকার পুষ্পগুচ্ছ, ও পারিজাত-নন্দন প্রভৃতি পুষ্পস্তবক, চন্দ্রসন্নিভ চূড়ামণি এবং বিবিধ মণি-মাণিক্যাদিময় অলঙ্কারনিকর দ্বারা রাজাকে বিশেষরূপে সুসজ্জিত করিলেন এবং সেই মুহূর্ত্তেই স্বয়ং পীন স্তনশালিনী বিলাসিনী বধূ হইয়া উঠিলেন। কুম্ভ বধূরূপে পরিণত হইয়া চিন্তা করিলেন,—আমি তো সম্পূর্ণ বধূ হইলাম। মদীয় কাম চরিতার্থ করিবার জন্য ইহাঁকে এখন আত্মদান করিব। সুতরাং এ সময়ে আমার যাহা করা উচিত, তাহা করিতে থাকি। এইরূপ চিন্তা করিয়া পরে মনে মনে বলিলেন,—হে স্বামিন্! আমি তোমার কান্তা হইলাম; তুমি আমার পতি হইলে। অতএব আমায় গ্রহণ কর। এই বলিয়া পরে কামকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন,—

কাম! তুমি আমার সমীপে আগমন কর। হে হৃদয়াধিদেব! এই ত তোমার আসিবার সময় উপস্থিত। এইরূপ বলিয়া তিনি সম্মুখস্থিত উদীয়মান দিবাকর-তুল্য ভর্ত্তার সমীপে গমন করিলেন। মনে হইল, রতি যেন কামের প্রান্তে সমাগতা হইলেন। তিনি আসিয়া স্বামীকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন—অয়ি, মানদ! আমি তোমার পত্নী হইলাম। আমার নাম মদনিকা; আমি প্রেম-পরিপ্লুত-চিত্তে তোমার পদে প্রণিপাত করিতেছি। এই বলিয়া সেই অনিন্দ্য সুন্দরী কামিনী লজ্জানম্রশিরে পতিকে প্রণাম করিলেন। প্রণামকালীন তাঁহার মস্তকস্থ অলকাবলী ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইল। তিনি প্রণামান্তে কহিলেন—হে নাথ! তুমি আমায় বিবিধ ভূষণে ভূষিত কর এবং অগ্নি সাক্ষী করিয়া মদীয় পাণি-গ্রহণ কর। রাজন্! আপনি অধুনা অতীব সুশোভিত হইতেছেন এবং যতই সময় যাইতেছে, ততই আমায় কামাতুর করিয়া তুলিতেছেন। বিবাহকালে কামদেব যেমন সৌন্দর্য্যশালী হইয়া রতির আনন্দ উৎপাদন করিয়াছিলেন, আপনিও তেমনি তদপেক্ষা সমধিক সৌন্দর্য্য-মণ্ডিত হইয়া আমার আনন্দ জন্মাইতেছেন। হে রাজন্! ভবদীয় এই সকল মাল্যদাম চন্দ্রকরবৎ প্রতিভাত হইতেছে। আপনার বক্ষঃ-স্থলে এই যে হারগুচ্ছ দুলিতেছে, ইহা আকাশগঙ্গার প্রবাহবৎ অতীব স্বচ্ছভাব ধারণ করিয়াছে। হে ভূপ! ভবদীয় কুন্তলপ্রান্তে মন্দার-পুষ্প গ্রথিত রহিয়াছে, তাহাতে পরাগ-রঞ্জিতাঙ্গ চঞ্চল মধুকরের সংসর্গবশে কনককমলের যেমন শোভা হয়, দেখিতেছি—আপনারও তেমনই শোভা হইয়াছে। হে প্রভো! তোমার অঙ্গসংলগ্ন রত্নরাজির কিরণে, কুসুমসমূহের সৌন্দর্য্যে, দেহের নৈসর্গিক শোভা-সম্পদে, তেজে এবং ধৈর্য্যগুণে—মনে হয়, তুমি রত্নের আকর সুমেরুগিরিকেও তিরস্কৃত করিয়াছ।

সেই ভাবী নব পতি-পত্নী পরস্পর এইরূপ আলাপ-ব্যবহার করিয়া সন্তুষ্টমনে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের সেই পূর্ব্ব দাম্পত্য এখন প্রায় প্রচ্ছন্ন হইয়া গেল। মহারাজ এইবার মণি-কাঞ্চনালঙ্কৃত পালঙ্কোপরি উপবেশনপূর্ব্বক মদনিকানাম্নী নূতন মহিষীকে

স্বহস্তে নানা মণিরত্নালঙ্কার, বিচিত্র পুষ্পমালা, গন্ধ দ্রব্য, মস্তকভূষণ, ও বসনাদি দ্বারা সুসজ্জিত করিলেন। পতি মদনিকাকে নানালঙ্কারে অলঙ্কৃত করিলে মদনিকা এক অপূর্ব্ব রূপ ধারণ করিল। সে রূপের ছটায় কৃশাঙ্গী কামিনী তখন রাজাকে মদনোন্মাদনায় উন্মাদিত করিয়া তুলিল। বিবাহোৎকণ্ঠিতা মদনিকা এইবার গিরিনন্দিনীর ন্যায় অথবা কামকান্তা রতির ন্যায় প্রতিভাত হইতে লাগিলেন।

মহারাজা শিখিধ্বজ স্বীয় মহিষীকে নিজের হস্তে সুসজ্জিত করিয়া কহিলেন,—অয়ি মৃগাক্ষি! তুমি নবাবতীর্ণ লক্ষ্মীর ন্যায় শোভা ধারণ করিতেছ। যেমন শচীর সহিত সুরেন্দ্রের, লক্ষ্মীর সহিত নারায়ণের, ও গৌরীর সহিত শঙ্করের শুভ-বিবাহ হইয়াছিল, তেমনি তোমার সহিত অদ্য আমার শুভ-বিবাহ সম্পন্ন হউক। তুমি কমল-কোরকের ন্যায় কোমল-হৃদয়া; তোমার এই বিলোল নীলোৎপল-লোচনে তুমি আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ভ্রমর-ঝঙ্কারবতী সৌরভময়ী সরোজিনীর ন্যায় প্রতিভাত হইতেছ। মনে হইতেছে, তুমি যেন কাম-কল্পতরুর বহু ফলপ্রসবিনী লতিকা। তোমার আরক্ত করযুগ্ম রক্তাভ পল্লববৎ প্রতিভাত এবং স্তনদ্বয় পুষ্পস্তবকবৎ সুশোভন। এই তোমার কোমলাঙ্গ তুষারবৎ সুশীতল এবং সুনির্ম্মল। এই যে তোমার মধুময় হাস্যবিকাশ, ইহা যেন চন্দ্রের কিরণ বিচ্ছুরিত করিতেছে। পূর্ণচন্দ্রের শোভা দেখিয়া যেরূপ আনন্দ উপভোগ করা যায়, তোমার দর্শনেও আজ সেইরূপই আনন্দ প্রাপ্ত হইতেছি। অতএব হে বরবর্ণিনী সুন্দরি! এস, উঠ, বিবাহ-বেদীতে আরোহণ কর।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—ঐ কথার পর তাঁহারা উভয়ে বিবাহ-বেদিকায় উপবেশন করিলেন। বেদীর চারিদিকে চারিটী গঙ্গাজল-পূর্ণ কুম্ভ আছে। সেই কুম্ভচতুষ্টয়ের উপর চারিটী নারিকেল ফল বিরাজমান। উহা নানা-বিধ পুষ্পগুচ্ছে সুশোভন। এতদ্ভিন্ন কত মুক্তামালা ঐ বেদিকায় দোদুল্যমান; সে সকল, সুন্দর সুন্দর পুষ্পস্তবকবৎ উদ্ভাসমান। অনন্তর সেই বেদিমধ্যে উপবেশনপূর্ব্বক তাঁহারা চন্দনকাষ্ঠ-যোগে বহ্নি প্রজ্বালিত করিলেন। ঐ বহ্নির শিখা দাক্ষিণাবর্ত্তভাবে প্রজ্বলিত হইতেছিল।

নবদম্পতি সেই উজ্জ্বল অনল প্রদক্ষিণ করিয়া অগ্নির অভিমুখে পল্লবাসনে উপবিষ্ট হইলেন। পরে শিখিধ্বজ উঠিয়া উঠিয়া পাবকমধ্যে তিল ও লাজাহুতি প্রদানপূর্ব্বক কান্তাকে পাণিযুগলে গ্রহণ করিলেন। তখন সেই নব দম্পতি শঙ্কর ও শঙ্করীর ন্যায় সুশোভিত হইতে লাগিলেন। তাঁহারা অগ্নিকে প্রদক্ষিণ করিলেন। অনন্তর ঈষৎ হাস্যরেখায় তাঁহাদের উভয়ের মুখশ্রী উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তাঁহারা পরস্পর স্ব স্ব জ্ঞানসর্ব্বস্ব প্রেমচঞ্চল হৃদয় পরস্পরকে প্রদান করিলেন। পরে পুনরায় অনলে লাজাহুতি দিলেন এবং বারত্রয় অগ্নি প্রদক্ষিণ করিলেন। সেই দম্পতি এইরূপে যুক্তকরে পাণিপীড়ন-ব্যাপার সমাধা করিয়া পরস্পর পরস্পরের কর পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহাদের উভয়ের হৃদয়ই আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। অনন্তর সম্ভোগ কাল সমীপবর্ত্তী হইলে নবোদিত সুধাকরের ন্যায় তাঁহারা উভয়েই স্মিত-বদনে বিরাজ করিতে লাগিলেন। অভিনব পুষ্প পল্লব দ্বারা তাঁহাদের সম্ভোগশয্যা পূর্ব্বেই প্রস্তুত হইয়াছিল। নব দম্পতি প্রেমপুলকিত-মনে এইবার সেই শয্যায় গিয়া উপবেশন করিলেন। তখন নিশাপতি যেন তাঁহাদের সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিবার নিমিত্তই নভোমণ্ডলের চতুর্দ্দিকে সমুদিত হইলেন। তিনি তথাকার লতানিকুঞ্জে স্বীয় কিরণদৃষ্টি প্রসারিত করিলেন। মনে হইল, চঞ্চলচিত্ত চন্দ্র যেন নব দম্পতির তাৎকালিক সেই রহস্য-ব্যাপার দেখিবার জন্যই সমুৎসুক হইলেন। কমনীয়-মূর্ত্তি কুমুদিনীকান্তের কিরণচ্ছটায় চতুর্দ্দিক্ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। কান্ত দম্পতি তখন মুহূর্ত্ত মাত্র অভিনব প্রেমগর্ভ মধুরালাপে যাপন করিলেন। তাঁহারা নিজেদের সম্ভোগের জন্য পূর্ব্ব হইতেই কনককন্দরের অভ্যন্তরে গুপ্ত শয্যা প্রস্তুত রাখিয়াছিলেন। এবার তাঁহারা সেই গুপ্ত কন্দরে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন—সেই কাঞ্চন-কন্দরে রত্ন প্রদীপ প্রজ্বলিত হইতেছে এবং কুসুম-কল্পিত নূতন শয্যা, তন্মধ্যে বিস্তৃত আছে। চারি দিকে স্থানে স্থানে কনকময় কমল সকল উৎকীর্ণ রহিয়াছে। মন্দার ও পারিজাত প্রভৃতি অম্লান পুষ্পরাজি দ্বারা সেই গুহাগৃহ সুসজ্জিত আছে। ঐ সকল পুষ্প প্রমাণে অতি বৃহৎ। উহারা রাজমহিষী চূড়ালার সত্য সঙ্কল্প-বলে কল্পিত। ঐ পুষ্পগুলি প্রত্যেকে

এক একটী চন্দ্রবিম্বের ন্যায় বিশাল এবং তুষারস্থলীর ন্যায় সুশীতল। তাঁহাদের সেই পুষ্প-পরিব্যাপ্ত সুখশয্যা দেখিতে এতই শুভ্র, যেন মনে হয়—ক্ষীরোদ-সাগরের জলধারা একত্র সম্মিলিত; অথবা যেন পুঞ্জীভূত জ্যোৎস্নার ন্যায় সে শয্যা সুশোভিত। সে তো শয্যা নয়, এক একবার মনে লয়, উহা যেন ভিত্তি-নিহিত কন্দর্পের প্রতিবিম্ব। বহুদিনের পর সেই বন্ধুযুগল এখন আবার সম্পূর্ণ নূতন দম্পতি হইয়াছেন। তাঁহাদের অঙ্গ পুষ্পামোদে সুবাসিত হইতেছে। তাঁহারা সেই সুনির্ম্মল পুষ্পশয্যায় উপবেশন করিলেন। সে দৃশ্য দেখিয়া মনে হইল, মন্দরাদ্রি যেন নিজানুরূপ সুবিস্তৃত ক্ষীরাব্ধি মধ্যে সংলীন হইল।

এইরূপে সেই কান্ত দম্পতি কুসুমশয্যায় শয়ন করিলেন; পরস্পর প্রণয়-পেশল বাক্যালাপ করিতে লাগিলেন এবং তৎকালোচিত সুন্দর প্রণয়োপহার পরস্পরকে প্রদান করিলেন। এইভাবে সেই দম্পতির সেই সুখযামিনী মুহূর্ত্ত মধ্যে মহাসুখে অতিপাতিত হইল।

ষড়ধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১০৬ ॥

সপ্তাধিক শততম সর্গ

বশিষ্ঠ কহিলেন,—অনন্তর এই ভুবন-তল রবি-রূপ রঞ্জনদ্রব্যে রঞ্জিত হইয়া উঠিল। শিখিধ্বজ-মহিষী মদনিকা দিবসে আবার কুম্ভরূপ ধারণ করিলেন। এইরূপে সেই কুম্ভ ও শিখিধ্বজ উভয়ে বিবাহসূত্রে সম্বদ্ধ হইয়া দেব-দম্পতিরূপে পরিণত হইলেন এবং প্রত্যহ সেই মহেন্দ্রাচলের কনক-কন্দরেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। তাঁহারা প্রত্যহই পুষ্পপল্লব-পরিশোভিত পক্ক ফলময় বিচিত্র বনসমূহে ভ্রমণ করিতেন। তাঁহাদের পরস্পরের প্রতি পরম প্রীতিসদ্ভাব ছিল। তাঁহারা দিবসে বন্ধুভাবে এবং রাত্রিযোগে প্রিয় দম্পতিরূপে বাস করিতে লাগিলেন। প্রদীপ ও প্রদীপপ্রভা যেমন ক্ষণেকের জন্যও বিশ্লিষ্ট হয় না, তেমনি সেই দম্পতি কিঞ্চিৎ কালের তরেও বিযুক্ত হইতেন না।

তাঁহারা নানাবিধ বনকুঞ্জে, গিরিগুহায়, তমাল-তরুবনে ও মন্দার-কাননে এবং মহ্য, দর্দ্দুর, কৈলাস, মহেন্দ্র, মলয়, গন্ধমাদন, বিন্ধ্য ও লোকালোকাদি শৈলশ্রেণীর তটে তটে বিহার করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। চূড়ালা স্বামী শিখিধ্বজের নিদ্রাবস্থায় তিন চারিদিন অন্তর স্বীয় রাজধানীতে যাইয়া যাইয়া রাজকার্য্য করিয়া আসিতেন। তাঁহারা দিবসে সুহৃদ্ভাবে এবং রাত্রিকালে দম্পতিরূপে বিবিধ পুষ্পমালায় সমলঙ্কৃত হইয়া সানন্দ-মনে কাল কাটাইতে লাগিলেন। মহেন্দ্রাচলের সুরম্য সরল-তরু-সঙ্কুল গুহাগৃহে থাকিয়া সেই দেবদম্পতি সুর-কিন্নরগণের নিকট পূজিত হইতেন। এইভাবে তাঁহাদের সেখানে এক মাস কাল কাটিয়া গেল। অনন্তর তাঁহারা শুক্তিমান্ শৈলের কোন এক কল্পলতাময় কন্দরগৃহে গমন করিলেন। ঐ শৈল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্দারপাদপে পরিপূর্ণ; সেই সকল পাদপ আবার হস্তপ্রাপ্য অমোঘ ফলে অন্বিত। দেবদম্পতি সেই রম্য শৈলে এক পক্ষ কাল যাপন করিলেন। পরে সেইখান হইতে তাঁহারা পঙ্কবান্ পর্ব্বতে গমন করিলেন। ঐ পর্ব্বতের দক্ষিণদিকের তটপ্রদেশে পারিজাত-বনের অভ্যন্তরে এক দেবভোগ্য পুষ্পস্তবক-মণ্ডপ বিরাজিত। সেই দম্পতি সেই মণ্ডপের মধ্যে দুই মাস কাল কাটাইয়া দিলেন। অনন্তর সুমেরুশৈলের পাদদেশে জম্বুনদীর তটে জাম্বুনদময় জম্বুখণ্ড-তলে জম্বুফলের রস পান করিয়া তাঁহারা এক মাস কাটাইলেন। পরে উত্তরকুরুদেশে দশ দিন এবং উত্তর কোশল দেশে সপ্তবিংশতি দিন যাপন করিলেন। এইরূপে সেই দেবদম্পতি অন্যান্য গিরিসমূহের সুদৃশ্য সুরম্য স্থলসমূহেও কিছু দিন করিয়া বাস করিলেন।

এইরূপে বহুদিন, বহু মাস অতিবাহিত হইলে চূড়ালা একদা দেব-কুমারবেশে মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন,—ভাল, একবার পরীক্ষা করিয়া দেখি না কেন, এই শিখিধ্বজ মহারাজের এখনও বিষয়-ভোগে প্রকৃতই আসক্তি আছে কিনা! যদি দেখি, ইহাঁর বিষয়াসক্তি একেবারেই গিয়াছে, তাহা হইলে বুঝিব—ইনি আর কস্মিন্ কালেও বিষয়াসক্ত হইবেন না। এইরূপ চিন্তা করিয়া চূড়ালা সেই বনের মধ্যে মায়াবলে দেবরাজ ইন্দ্রকে অন্যান্য দেব ও অপ্সরাদিগের সহিত অবতারিত

করিলেন। বনবাসী শিখিধ্বজ দেখিলেন—পরিবারবর্গ সহ দেবরাজ সেই বনে আগমন করিয়াছেন। তাঁহাকে দেখিয়া তিনি যথাবিধি অর্চ্চনা করিলেন এবং বলিলেন,—হে সুরাধিপ! কি নিমিত্ত আপনি এখানে বহুদূর হইতে আগমন-জনিত কষ্ট স্বীকার করিলেন, তাহা আমার নিকট অনুগ্রহপূর্ব্বক প্রকাশ করুন;

ইন্দ্র কহিলেন,—বনের বিহঙ্গ গগনে উড্ডীন হইলেও হৃদয়লগ্ন সূত্রের আকর্ষণে আবার যেমন সে সেই বনের দিকেই প্রত্যাবর্ত্তন করে, আমরাও তেমনি ভবদীয় গুণসমূহে সমাকৃষ্ট হইয়া সেই সুদূর স্বর্গ হইতে এখানে আগমন করিয়াছি। অতএব গাত্রোত্থান করুন; আসুন, আপনিও আমাদের সঙ্গে স্বর্গে যাইবেন। আপনার অপূর্ব্ব গুণরাশি শ্রবণ করিয়া স্বর্গীয় দেবাঙ্গনাগণ মুগ্ধ হইয়াছেন। তাঁহারা আপনার আগমন প্রতীক্ষায় এতক্ষণ উৎকণ্ঠিত হইয়া রহিয়াছেন। আপনার স্বর্গ-গমনার্থ এই পাদুকা, গুটিকা ও বসনাদি সিদ্ধি উপস্থিত। আপনি এই সকল সিদ্ধির যে কোন একটীর সহায়তায় স্বর্গে গমন করুন। স্বর্গে সুর-সদনে গমন করিয়া এই বর্ত্তমান জীবন্মুক্ত-অবস্থাতেই আপনি বিবিধ ভোগসুখ উপভোগ করিতে পারিবেন। আমি এই নিমিত্তই আপনার এখানে আগমন করিয়াছি। ভবাদৃশ সাধু পুরুষেরা উপস্থিত সম্পদে অবজ্ঞা বা অলব্ধ বস্তুর আকাঙ্ক্ষা কদাচ করেন না। অতএব এই উপস্থিত সম্পদ এক্ষণে আপনার পরিত্যাগ করা সঙ্গত হয় না। ভগবান্ হরি যেমন এই ত্রিভুবনের পবিত্রতা সম্পাদন করিতেছেন, আপনিও তেমনি অদ্য নিরাপদে স্বর্গলোকে সুখে বিহার করিয়া সে স্থান পবিত্র করুন।

শিখিধ্বজ কহিলেন,—হে দেবাধিনায়ক! আমি সকল স্থানই স্বর্গ বলিয়া জানি। সর্ব্বত্রই আমার স্বর্গসুখ অনুভব-গোচর হয়। কিন্তু নিয়ত স্বর্গ আমি কোথাও দেখি না। অর্থাৎ এই স্থানটুকুই স্বর্গ, আর অন্য কোথাও ইহা নাই; এরূপ ধারণা আমি করি না। হে প্রভো! আমি সকল স্থানে সকল বিষয়েই সন্তুষ্ট আছি। সর্ব্বত্রই সুখে বিহার করিয়া বেড়াইতেছি। আমার অন্তরে কোন কামনা বা বাঞ্ছা নাই। তাই সর্ব্বত্রই আমি আনন্দানুভব করি। হে শক্র! আপনি যে স্বর্গের

বর্ণনা করিলেন, যথায় গিয়া আমার প্রচুর সুখানুভব করিতে উপদেশ দিলেন, তথাবিধ একত্র অবস্থিত পরিচ্ছিন্ন স্বর্গে আমি যাইতে চাহি না। কাজেই আপনার আদেশ আমি পালন করিতে পারিলাম না।

ইন্দ্র কহিলেন,—যাঁহারা বেদ্য বস্তু বিদিত হইয়াছেন, যাঁহাদের বুদ্ধি পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে, তথাবিধ মহাপুরুষেরা বিষয় ভোগ করুন আর নাই করুন, তাঁহাদের নিকট উভয়ই তুল্যমূল্য। তথাচ আমি মনে করি, প্রারব্ধ ভোগ ক্ষয় করিবার নিমিত্ত বিষয়ভোগ করা তাঁহাদের পক্ষে অকর্ত্তব্য নহে। ভোগেই বাসনা ক্ষয় হয়, তাহাই করা উচিত।

ইন্দ্র এই কথা কহিলে, রাজা আর কোনই উত্তর দিলেন না; তিনি মৌনী হইয়া রহিলেন। অনন্তর ইন্দ্র আবার কহিলেন,—রাজন্! আপনি এস্থান হইতে যাইতে চাহেন না কেন? এ কথার উত্তরে শিখিধ্বজ কহিলেন,—এখন নহে; কালান্তরে যাইব। এই কথার পর ইন্দ্র কুম্ভকে কল্যাণবচনে আশীর্ব্বাদ করিয়া অন্তর্দ্ধান করিলেন। ইন্দ্র অন্তর্হিত হইলে তাঁহার সমভিব্যাহারী অন্যান্য দেবগণও ক্ষণমধ্যেই অদৃশ্য হইলেন। মনে হইল, বারিধিগত বায়ু প্রশান্ত হওয়ায় তাহার সঙ্গে সঙ্গে কল্লোল, ফেন, ফণীন্দ্র ও মকরাদিও শান্ত হইয়া গেল।

সপ্তাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১০৭ ॥

অষ্টাধিকশততম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! ইন্দ্রাদির আগমনরূপ মায়ার উদ্ভাবন ও উপসংহার করিয়া চূড়ালা মনে মনে চিন্তা করিলেন—এই নরপাল ভোগের প্রলোভনে আকৃষ্ট হইলেন না; ইহা বড়ই সৌভাগ্যের কথা। ইন্দ্র দেবসমাজের রাজা; তিনি আসিয়া অমন করিয়া যখন ইঁহাকে প্রলোভন বাক্য বলিতে ছিলেন, তখন ইনি শান্ত, সম, পূর্ণভাবে অবস্থান-পূর্ব্বক বিশেষ ধীরতা ও বিজ্ঞতার সহিত উপেক্ষা দেখাইয়া তাঁহার কথার উত্তর দিতেছিলেন। যাহা হউক, যাহাতে রাগদ্বেষের প্রাধান্য আছে,

এইরূপ একটা বুদ্ধিবিমোহিনী প্রপঞ্চরচনার উদ্ভাবন করিয়া আমি আর একবার ইহাঁকে পরীক্ষা করিয়া দেখিব।

চূড়ালা এইরূপ চিন্তা করিয়া রাত্রি-সমাগমে চন্দ্রোদয় হইবা মাত্র কাননে কামিনীরূপ ধারণ করিলেন। তিনি সেই মদনিকার বেশেই সুশোভিতা হইতে লাগিলেন। তখন বিবিধ কুসুমসমূহের সৌরভ বহন করিয়া মৃদু মন্দ সমীরণ বহিতেছিল। রাজা শিখিধ্বজ নদীর তীরে বসিয়া সায়ংকালীন সন্ধ্যা বন্দনা করিতেছিলেন। এই সময় মদনিকা মদগর্ব্বিত হইয়া বনদেবীগণের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। ঐ অন্তঃপুর নিবিড় পুষ্পগুচ্ছে পরিবৃত্ত এবং বহুল সন্তানক-লতায় নির্ম্মিত। মদনিকা কুসুমের মালা ধারণ করিয়া সেখানে প্রবিষ্ট হইলেন এবং সঙ্কল্প-কল্পিত জনৈক কান্ত উপপতিকে কণ্ঠে লইয়া তথায় কল্পনাকলিত শয্যাতলে শয়ন করিলেন। এদিকে শিখিধ্বজ সান্ধ্য জপাদি সমাপনান্তে ইতস্ততঃ মদনিকাকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। তিনি অনুসন্ধান করিতে করিতে ক্রমে সেই লতাকুঞ্জে আসিয়া দেখিলেন,—মদনিকা সুন্দর এক উপপতি লইয়া শুইয়া আছেন। উপপতির স্কন্ধদেশ দিয়া তাঁহার কুন্তল এলাইয়া পড়িয়াছে। তাঁহার গাত্র চন্দন-চর্চ্চিত, শয্যাসংঘর্ষে শিরোভূষণ কুসুমদামাদি বিপর্য্যস্ত হইয়াছে। উপপতির কর্ণ, কপোল, অঙ্গ, ও কুণ্ডল মদনিকার কনককান্তি ভুজোপধানে ন্যস্ত রহিয়াছে। যুবক-যুবতী উভয়েরই বদনে ঈষৎ হাস্যরেখা প্রস্ফুট। তাহারা পরস্পর-পরস্পরের মুখে মুখার্পণ করিয়া কামাতুর ভাবে শয়ান রহিয়াছে। তাহাদের পরস্পরের অঙ্গসংঘর্ষে পরস্পরের কণ্ঠ, মাল্য ও শয্যা ম্লান হইয়া গিয়াছে। তাহারা অঙ্গ-সঙ্গব্যপদেশে পরস্পর পরস্পরকে যেন আত্মানুরাগ অর্পণ করিতেছে।

শিখিধ্বজ নির্ব্বিকার-চিত্তে এই দৃশ্য দেখিলেন,—দেখিয়া পরম সন্তোষ লাভ করিলেন। তখন আপনাপনি বলিতে লাগিলেন—আহা, এই দুইটী মিথুন মহাসুখে শয়ন করিয়া রহিয়াছে।

ইতিমধ্যে সেই যুবক-যুবতী রাজাকে দেখিয়া ভীত চকিত হইল। রাজা তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—হে লম্পটযুগল!

তোমরা স্বেচ্ছায় সুখে এখানে অবস্থান কর। আমি তোমাদের কোনই বিঘ্নাচরণ করিব না। এই বলিয়া শিখিধ্বজ সেস্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর মদনিকা মুহূর্ত্ত মধ্যেই সেই মায়াপ্রপঞ্চ ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন এবং তথা হইতে বহির্গত হইয়া সেই ক্ষণেই—সেই সম্ভোগ-বিশ্লথ-দেহেই স্বামীর সমীপে গিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন—তাঁহার স্বামী শিখিধ্বজ একান্তে সুবর্ণময় শিলাতলে সমাধি-অবস্থায় অবস্থিত আছেন। তাঁহার নয়নদ্বয় ঈষৎ বিকসিত হইয়া উঠিয়াছে। মদনিকা তৎসমীপে আগমনপূর্ব্বক প্রথমতঃ লজ্জাবনত-বদনে কিঞ্চিৎ কাল মৌনাবলম্বনে ম্লানভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। কিঞ্চিৎ পরেই রাজার ধ্যান ভঙ্গ হইল। তিনি অক্ষুব্ধ-হৃদয়ে মধুর সম্ভাষণে মদনিকার প্রতি বলিলেন—অয়ি কৃশোদরি! তুমি সহসা কেন তোমার সেই আনন্দে বিঘ্ন জন্মাইয়া আসিলে? দেখ, এ জগতের জীবমাত্রেই আনন্দলাভের জন্য লালায়িত। তুমি সেই লব্ধ আনন্দের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া কেন হেথায় আগমন করিলে? যাও যাও, সেইখানেই আবার গিয়া সেই কান্ত জনকে প্রণয়-কার্য্যে পরিতুষ্ট কর। এ জগতে পরস্পরের ঈপ্সিত প্রেম একান্তই দুর্লভ। অয়ি মানিনি! আমি তোমার ঐরূপ আচরণে কিছুমাত্র উদ্বিগ্ন হই নাই। যিনি জ্ঞান লাভ করিতে পারিয়াছেন, তিনি স্বীয় ইষ্টতম বস্তুমাত্রকেই এই প্রকারে পরের ভোগযোগ্য করিয়া দিয়া থাকেন। তাই বলিতেছি,—অয়ি তন্বঙ্গি! আমি জানি, কুম্ভ এবং আমি আমরা উভয়েই বীতরাগ। কিন্তু তুমি একজন অন্য ব্যক্তি—দুর্ব্বাসা মুনির শাপ-জনিতা কামিনী; তোমার যাহা ইচ্ছা হয়, এক্ষণে করিতে পার।

মদনিকা কহিলেন—মহাশয়! স্ত্রী জাতির স্বভাবই এইরূপ চঞ্চল। শাস্ত্রেও শুনিতে পাই, স্ত্রীলোকের কাম পুরুষ অপেক্ষা অষ্টগুণ অধিক। অতএব এ বিষয়ে আপনি কোপ করিবেন না। যৎকালে সন্ধ্যা-সমাগমে আপনি জপোপাসনায় নিরত ছিলেন, তখন আমি সেই নিবিড় বনে একাকিনী বাস করিতেছিলাম। এই সময় ঐ ব্যক্তি আমার নিকটে

আসিয়া উহার কামাকাঙ্ক্ষা জানাইল। আমি অবলা, কি করিব, তাহার প্রস্তাবে সম্মতি দিলাম। বলা বাহুল্য, রমণী বিবাহিত হইয়া স্বামীর অধীনতায় থাকুক, কিম্বা অনূঢ়াবস্থাতেই অবস্থান করুক, নির্জ্জনে উপপতি প্রাপ্ত হইলে তাহার ইষ্ট-সাধনে সে কখনই বাধা জন্মাইতে পারে না। বরং বাঞ্ছিত বিষয়ে যদি কোন বিঘ্ন সম্ভাবনা হয়, তবে তাহাতে সে একান্ত অস্থিরই হইয়া উঠে। যে পর্য্যন্ত পুরুষসমাগম না ঘটে, স্ত্রীলোক ততদিনই পবিত্র থাকে। তাহা ভিন্ন পতির ক্রোধ, নিষেধ, বা তাড়ন, কোন কিছুতেই রমণীর সতীত্ব রক্ষা হইবার নহে। আমি অবলা বালা, আমার বিবেক কিছুই নাই। মোহের বশে আপনার কাছে আমি বড় অপরাধ করিয়াছি। হে নাথ! আমার প্রতি ক্ষমা করুন; ক্ষমাই সাধু জনের স্বভাবসিদ্ধ গুণ।

শিখিধ্বজ কহিলেন—অয়ি বালে! আকাশে যেমন বৃক্ষোৎপত্তি হয় না, আমারও তেমনি অন্তরে ক্রোধোদ্রেক হইবার নহে। কেবল সাধু-গণের নিন্দার বিষয় বলিয়াই আমি তোমাকে আর বধূরূপে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি না। হে কামিনি! তুমি পূর্ব্বে বনান্তে আমার সহিত যাদৃশ বন্ধুভাবে অবস্থান করিতেছিলে, এক্ষণেও সেইরূপ ভাবেই থাক। আমরা বিষয়বিরক্ত হইয়া তেমনই বন্ধুভাবে সতত সুখে বিহার করিতে থাকি।

বশিষ্ঠ কহিলেন—রাজা শিখিধ্বজ ঐ কথা কহিয়া পূর্ব্বের ন্যায় সমভাবে অবস্থিত হইলে, তদীয় তাদৃশ ভোগবাসনা ও রাগ-দ্বেষাদির একান্ত বিরহ বুঝিয়া চূড়ালা নিতান্ত হৃষ্ট হইলেন এবং মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, আহা, এই মহারাজ বাস্তবিকই পরম সাম্য প্রাপ্ত হইয়া স্বয়ং ভগবৎস্বরূপ হইয়াছেন। ইহাঁর বিষয়ানুরাগ কিছুমাত্রই নাই। ইনি ক্রোধ-বিরহিত জীবন্মুক্ত হইয়া বিরাজ করিতেছেন। বিষয়-ভোগই হউক, মহতী সিদ্ধি আসিয়াই উপস্থিত হউক, অথবা সুখ-দুঃখ, সম্পদ-বিপদ, যাহা কিছুই আসুক, এতৎসমুদায়ের কোন কিছুতেই ইনি আর সমাকৃষ্ট হইবার নহেন। আমি বুঝিতেছি, দ্বিতীয় নারায়ণের ন্যায় ইহাঁর এখন কোন সমৃদ্ধিরই অভাব নাই। ভাবনা মাত্র সর্ব্বসমৃদ্ধিই

ইনি প্রাপ্ত হইতে পারেন। আমি এই অবকাশে নিখিল আত্ম-বৃত্তান্ত ইঁহার স্মৃতিপটে অঙ্কিত করিয়া দেই। আমার এই কুম্ভরূপ এখন আমি পরিত্যাগ করি এবং আমি যে চূড়ালা, সেই চূড়ালাই এখন হই।

এইরূপ ভাবিয়া চিন্তিয়া চূড়ালা মদনিকা-মূর্ত্তি পরিত্যাগ করিলেন এবং নিজেই সেই অক্ষত চূড়ালা দেহ দর্শন করাইলেন। তিনি যোগ-ধারণায় যুক্ত হইয়া মদনিকার দেহ হইতে আপনার সেই চূড়ালা-দেহ বহিষ্কৃত করিলেন, তিনি তৎকালে পেটিকা হইতেই নির্গতার ন্যায় প্রতিভাত হইতে লাগিলেন। তখন শিখিধ্বজ দেখিলেন,—সেই কমনীয়মূর্ত্তি মদনিকাই তাঁহার সেই প্রণয়পেশলা অনিন্দ্যাঙ্গী প্রিয়তমা চূড়ালা হইয়া অবস্থান করিতেছেন! তিনি স্বীয় প্রিয়তমাকে দেখিয়া ভাবিলেন,—ইনি যেন বসন্তকালের কমলিনী কিম্বা ভূতলোত্থিতা সাক্ষাৎ লক্ষ্মী অথবা রত্নপেটিকা হইতে নির্গতা রত্নরাজিই আমার সমীপে প্রতিভাত হইতেছেন।

অষ্টাধিক শততম সর্গ ॥ ১০৮ ॥

নবাধিক শততম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাজা শিখিধ্বজ ঐ সময় প্রিয়তমা চূড়ালাকে দেখিতে পাইয়া বিস্ময়-বিস্ফারিত-নেত্র হইলেন এবং বিস্ময়বিজড়িত-কণ্ঠে কহিলেন,—অয়ি পদ্মপলাশাক্ষি সুন্দরি! কে তুমি, কোথা হইতে আসিয়া উপস্থিত হইলে? কি জন্য কত কাল হেথায় অবস্থান করিতেছ? তোমার অঙ্গসৌষ্ঠব, ব্যবহারপ্রকার, স্মিতসৌন্দর্য্য ও বিনয়-বিলাস সকলই আমার কাছে মদীয় পত্নীরই অনুরূপ বলিয়া বোধ হইতেছে। তুমি অবিকল আমার পত্নী চূড়ালার আকারেই প্রতিভাত হইতেছ।

চূড়ালা কহিলেন—হে প্রভো! আপনার অনুমান মিথ্যা নহে। আমাকে আপনি নিঃসন্দেহে চূড়ালা বলিয়াই জানিবেন। অনেক দিন গিয়াছে, এখন আমি নিজের এই অকৃত্রিম-কলেবরে আপনার নিকট

আসিয়াছি। পূর্ব্বে যে কুম্ভাদি কলেবর দেখিয়াছেন, সে সকল দেহ-রচনা আপনাকে প্রবোধিত করিবার নিমিত্ত আমিই করিয়াছি। অরণ্যের মাঝে এতকাল ধরিয়া এই যে কিছু করা হইয়াছে, ঐ সকলেরই মূল আমি; আপনাকে প্রবোধ প্রদানের উদ্দেশ্যেই আমি ঐ সমস্ত করিয়াছিলাম। যেদিন আপনি রাজ্যৈশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া মোহের বশে তপস্যার্থ বনে আগমন করেন, সেই দিন হইতে আপনার বোধ-উদ্ভাবনের উদ্দেশে আমি সচেষ্ট হইয়াছি। কুম্ভদেহ ধারণ করিয়াই আপনাকে প্রবোধিত করিবার চেষ্টা করিয়াছি। কুম্ভাদি কলেবর-রচনা করায় আমার উদ্দেশ্য—কেবল আপনাকে বোধ প্রদান করা বৈ আর কিছুই নহে।

হে মহীপাল! উক্ত কুম্ভাদি দেহ সকলই মায়ার খেলা; ইহাতে সত্যের অংশ কিছুই নাই। বলা বাহুল্য, আপনিও তো এখন বিদিতবেদ্য হইয়াছেন; যদি ধ্যান করিয়া দেখেন, তবে সকলই আপনার প্রত্যক্ষ হইতে পারে। তাই বলিতেছি,—হে তত্ত্বদর্শিন্! আপনি একবার ধ্যান-নয়নে সকলই সত্বর দেখিয়া লউন।

চূড়ালা এইরূপ কথা কহিলে রাজা ধ্যানের উপযোগী আসন-বন্ধনাদি প্রক্রম সকল করিয়া ধ্যানপ্রভাবে সমস্ত আত্মবৃত্তান্তই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রত্যক্ষ করিলেন। রাজ্যৈশ্বর্য্য পরিত্যাগ হইতে আরম্ভ করিয়া চূড়ালার সাক্ষাৎকার পর্য্যন্ত এই দীর্ঘ দিনে যে যে ঘটনা ঘটিয়াছে, মুহূর্ত্ত মাত্র চিন্তা করায় সে সকল ঘটনাই রাজার প্রত্যক্ষ হইল। কিছুই তাঁহার অপরিজ্ঞাত রহিল না। যখন সর্ব্ব ঘটনা প্রত্যক্ষ হইল, তখন তিনি সমাধি হইতে নিরস্ত হইলেন। সমাধিভঙ্গের পর তাঁহার নয়ন-যুগল আনন্দে উৎফুল্ল হইল। তিনি পুলকোজ্জ্বল বাহুযুগল প্রসারিত করিলেন। তাঁহার ইচ্ছাস্ফূর্ত্তি হইল। তিনি হর্ষবাষ্পাকুল-নয়নে প্রগাঢ় স্নেহে কান্তাকে আলিঙ্গন করিলেন। সে দৃশ্য দেখিয়া নকুল-নকুলীর আলিঙ্গন-ব্যাপার মনে হইতে লাগিল। আলিঙ্গনকালে রাজার অঙ্গ যেন দ্রবীভূত হইল। সে দশায় তাঁহাদের পতি-পত্নীর অন্তরে যে অনুরাগের ভাব অভ্যুদিত হইয়াছিল, বুঝি বা বাসুকির সহস্র মুখও তাহা বর্ণন করিতে

সক্ষম নহে। যাহা হউক, তাঁহারা পরস্পর আলিঙ্গনাবদ্ধ হইয়া বহু-কাল অবস্থান করিলেন। মনে হইল, অমাবস্যায় রবিশশী যেন এক-যোগে মিলিয়া রহিল, অথবা দুইটী পর্ব্বত যেন একত্র খোদিত হইল। তাঁহাদের পতিপত্নীর অঙ্গ-পরম্পরা পঙ্কলেপে যেন দৃঢ়ভাবে বদ্ধ হইয়া গেল। পুলকোদ্গমে তাঁহাদের বাহুযুগল স্বস্থ ও ঘর্ম্মাক্ত হইয়াছিল। মুহূর্ত্ত পরে ধীরে ধীরে সেই বাহু-দুইটী ঈষৎ শিথিল হইয়া গেল। পরস্পরের অপূর্ব্ব সমাগমে দম্পতির হৃদয় পীযূষরসে পূর্ণ হইল। তাঁহারা পরস্পরের সম্যক্ সংশ্লিষ্ট বাহু দুইটী উন্মুক্ত করিয়া স্থিরনেত্রে শূন্য-হৃদয়ে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

নরপতি কিঞ্চিৎকাল প্রগাঢ় স্নেহের ঘনানন্দে মগ্ন হইয়া মৌনী রহিলেন। পরে কান্তার কমনীয় চিবুকে করার্পণ করিয়া কহিলেন,—অয়ি কৃশাঙ্গি! কুলাঙ্গনাদিগের বাঞ্ছনীয়—সুধা হইতেও সুমধুর, শুদ্ধ প্রেমরস তুমি যে কতই বিকিরণ করিয়াছ, তাহার পরিমাণ আমি করিতে পারি না। অয়ি সুন্দরি! তুমি নবোদিত শশাঙ্কের ন্যায় কোমলাঙ্গী; তোমার অঙ্গে ক্লেশ লেশ সহ্য হইবার নহে। তথাচ তুমি যে স্বামীর জন্য কঠোর ক্লেশ ভোগ করিয়াছ, ইহা তোমার অসীম গুণেরই পরিচয়। তুমি যাদৃশ বুদ্ধির সহায্যে এ দুস্তর ভবাব্ধি হইতে আমায় উদ্ধার করিয়াছ, তোমার সেই অতিপূত বুদ্ধির উপমাস্থান কুত্রাপি দেখা যায় না। অয়ি প্রিয়ে! তোমার এই অসাধারণ গুণগৌরবের কাছে অরুন্ধতী, শচী, গৌরী, লক্ষ্মী, বা সরস্বতীর নাম উল্লেখ-যোগ্যই নহে। ফলে তাঁহারাও তোমা হেন গুণবতী নহেন। অয়ি সুন্দরি! ধী, শ্রী, কান্তি, ক্ষমা, মৈত্রী ও করুণা প্রভৃতি দক্ষনন্দিনীরা সৌন্দর্য্যে সুন্দরীসমাজে প্রসিদ্ধা; তুমি সে সকলের মধ্যেও শ্রেষ্ঠা সতীর ন্যায় লক্ষিত হইতেছ। তুমি অশেষ অধ্যবসায় অবলম্বন করিয়াছিলে; তাহারই ফলে আমায় প্রবুদ্ধ করিয়াছ। তোমার কৃত এই উপকারের কিরূপ প্রত্যুপকার করিলে তোমার মনস্তুষ্টি হইতে পারে, তাহা এক্ষণে আমায় বলিয়া দাও। অনাদি অনন্ত মোহারণ্যে পতিত হইলে কুল-রমণীরাই পরম অধ্যবসায়ের বলে তাহাদের পতিকে উদ্ধার করিয়া থাকে। তুমি তাহাই করিয়াছ। স্নেহশালিনী কুল-

কামিনীরা পতিকে যেরূপে উদ্ধার করিতে পারে, আমার বিশ্বাস—গুরূপদেশ, শাস্ত্র-সমালোচনা বা মন্ত্রাদি সাধনা, এ সকল দ্বারা সেরূপে উদ্ধার হওয়া সম্ভব নহে। কুল-কামিনীরা ভর্ত্তার একমাত্র সখা, সুহৃৎ, মিত্র, ভৃত্য, ভ্রাতা, গুরু ও ধনস্বরূপ। যাবতীয় গৃহকৃত্য তাহারাই সম্পাদন করিয়া থাকে। সুতরাং কুলকামিনীরা সর্ব্বথা পূজার পাত্রী। ইহ-পরকালের যাবতীয় সুখ তাহাদের উপরই প্রতিষ্ঠিত। অয়ি প্রিয়ে! তুমি সংসারসাগর পার হইয়া গিয়াছ; কোন প্রকার বিষয়সুখেই তোমার এখন স্পৃহা নাই; কাজেই তোমার কৃত উপকারের আমি কি প্রত্যুপকার করিব, বুঝিতে পারিতেছি না। তুমি আমার মতে সর্ব্বজন-মান্যা কুলাঙ্গনা। নিজের গুণেই নিখিল কুলমহিলাদিগকে তুমি পরাজয় করিয়াছ। রমণীজনের সৌজন্যাদি গুণ বিচার করিতে বসিলে মনে হয়, এখন হইতে তুমিই সকলের প্রথম বলিয়া নিরূপিতা হইবে। মনে লয়, বিধাতা তোমায় রমণীকুলের শিরোমণিরূপে নির্ম্মিত করায় অরুন্ধতী প্রভৃতি প্রথিতকীর্ত্তি কামিনীগণের তিনি কোপের পাত্র হইয়াছেন। হে সৌজন্য-সৌন্দর্য্যাদি-গুণসমূহের আধাররূপিণী সতীলক্ষ্মী! আমি তোমার গুণে এতই মুগ্ধ হইয়াছি যে, তোমায় আবার আমার আলিঙ্গন করিতে ঔৎসুক্য হইতেছে। এস, পুনর্ব্বার আমায় তুমি আলিঙ্গন দাও।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাজা শিখিধ্বজ এই কথা কহিয়া হরিণ-নয়না চূড়ালাকে পুনর্ব্বার গাঢ়ালিঙ্গন প্রদান করিলেন। চূড়ালা কহিলেন,—হে দেব! আপনি যখন ব্যাকুলভাবে নীরস ক্রিয়া-কলাপে তৎপর ছিলেন, তখন আপনার জন্য আমি বারম্বার অতীব দুঃখিত হইয়াছিলাম; তাই আপনারই জ্ঞানাত্মা আপনাতে উপপাদিত করিয়াছি। তাহাতে আমারও স্বার্থ আছে। অতএব দেব! আমি আর এ বিষয়ে বিশেষ কি করিলাম যে, আপনি আমার এত গৌরবের কথা প্রকাশ করিতেছেন?

শিখিধ্বজ কহিলেন,—হে বরাঙ্গনে! তুমি যেরূপ শুভ স্বার্থ সম্পাদিত করিয়াছ, এখন হইতে সমস্ত কুলাঙ্গনারা তাদৃশ স্বার্থই সাধন করিতে থাকুন।

চূড়ালা কহিলেন,—প্রিয়তম! আপনি অধুনা বোধশালী হইয়াছেন।

এই জগৎ-জঙ্গলের তটে আপনার বিশ্রান্তি লাভ ঘটিয়াছে। এখনও কি আপনার আর সেই পূর্ব্বের মত মোহ রহিয়াছে? ইহা করিতেছি, ইহা করি না, ইহা পাইয়াছি, ইহা পাই নাই, বুদ্ধির অপক্ক অবস্থায় এবম্বিধ চঞ্চলতা ঘটিয়া থাকে। আপনি ঐ প্রকার বুদ্ধি-চাঞ্চল্যের প্রতি অন্তরে উপহাস করিতেছেন তো? হে দেব! আকাশে যেমন শৈলাবস্থান দৃষ্ট হয় না, তেমনি সেই তুচ্ছ তৃষ্ণা—সেই সেই সঙ্কল্পাকার কুকল্পনা, সে সকল এখন আর আপনাতে লক্ষ্য হইতেছে না তো? হে বিভো! অদ্য আপনি কিরূপ হইয়া গিয়াছেন, কাহাকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছেন, কিরূপ বাসনা পোষণ করিতেছেন এবং পরেই বা আপনার দেহের দশা কিরূপ হইবে, কি দেখিতেছেন?

শিখিধ্বজ কহিলেন,—অয়ি কুসুমান্তরযুত-নীলাব্জবৎ বিলোচন-শালিনি! তুমি আমার প্রত্যগাত্মরূপিণী। এ হেন তুমিও যাহার যাহার অন্তরে প্রকাশরূপে বিরাজ করিতেছ, আমিও তাহার তাহারই অন্তরে পরম সন্নিহিত প্রত্যগাত্মরূপে অবস্থান করিতেছি। আমি নিরীহ হইয়াছি, নিরংশ হইয়াছি, নিস্পৃহ হইয়াছি এবং নভোমণ্ডলের ন্যায় অতীব স্বচ্ছ-ভাব ধারণ করিয়াছি। কোনওরূপ মালিন্যেরই আর আমাতে স্থান নাই। আমি নিতান্ত নির্ম্মল হইয়াছি। যাহা শান্ত, পরমার্থস্বরূপ, সৎ-পদার্থ, আমি এক্ষণে তাহাই হইয়াছি। বহুকালের পর আমি অদ্য আবার 'আমি' হইতে পারিয়াছি। যে দশার উচ্ছেদসাধনে হরি-হরাদিও সক্ষম নহেন, আমি এক্ষণে সেই দশাই প্রাপ্ত হইয়াছি। যাহা একমাত্র প্রত্যক্-প্রবণ চিত্তপথ, আমি সেই পথেই অবস্থান করিতেছি। কিঞ্চিন্মাত্র চিন্মাত্রেও আমি অবস্থিত নহি; আমি মাত্র স্বস্থ হইয়াই রহিয়াছি। অয়ি অলিনিভ-নয়নে! সংসার হইতে আমার যে মুক্তি হইল, ইহা ক্রম-ক্রমেই ঘটিল। ফলে, ইহা নূতন কিছুই হইল না। আমি স্বস্থ; স্বস্থ হইয়াই আছি। হে শোভনে! আমি তুষ্ট নহি, খিন্ন নহি, ইহা নহি, তাহা নহি, স্থূল নহি, সূক্ষ্ম নহি; এক কথায় বলিতে কি, যাহা সত্যস্বরূপ, আমি তাহাই হইয়া রহিয়াছি। আমি জ্যোতিস্তোম হইতেই নিঃসৃত হইয়াছি; কোন ভিত্তিতেই আমি পতিত হই নাই। যাহা নিরাধার অক্ষয় আলোক,

আমি তাহারই সমান হইয়াছি। আমি শান্ত হইয়াছি; জগতের বৈষম্য বিদূরিত করিয়া সমস্তের সংস্থাপক হইয়াছি। আমি স্বস্থ ও বিগতচিত্ত হইয়াই বিরাজ করিতেছি।

অয়ি পতি-পরায়ণে! আমি পরি-নির্ব্বাণ হইয়াছি। তুমি যাহা, আমি তাহারই তুল্য হইয়া রহিয়াছি। আমি যাহা সত্য, তাহাই হইয়া আছি। তদ্ভিন্ন অন্য যে কি হইয়াছি, তাহা আমি বলিতে পারিতেছি না। অয়ি তরঙ্গ-তরলাপাঙ্গি! তুমিই আমার গুরুস্থানীয়া; আমি তোমারই প্রসাদে সংসার-সাগর পার হইতে পারিয়াছি। তোমায় আমি নমস্কার করি। বহ্নিযোগে শতধা বিশোধিত সুবর্ণের ন্যায় আমার মন আর কলুষিত হইতেছে না। আমি এখন শান্ত, স্বস্থ, মৃদু ও বীতরাগ হইয়াছি। আমার বুদ্ধি নিরংশ হইয়াছে। আমি অধুনা আকাশবৎ সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বাতিবর্ত্তী হইয়া স্বস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছি।

চূড়ালা কহিলেন,—হে মহাসত্ত্ব, হৃদয়-প্রিয়, প্রাণপতে! এইরূপ অবস্থায় আপনার এখন রুচিকর কি, তাহা প্রকাশ করিয়া বলুন।

শিখিধ্বজ কহিলেন,—অয়ি তন্বি! আমি প্রতিষেধও জানি না, অভীষ্টও জানি না। তুমি যাহা যেরূপ করিতেছ, আমি ব্যুত্থান কালে তাহা সেইরূপই জানিতেছি। হে প্রিয়ে! তোমার যাহা যাহা অভিপ্রায়, এক্ষণে অবিকল সেই সকলই হউক। আমি তো অম্বরের ন্যায় স্বচ্ছ ও সুন্দর হইয়াছি। সুতরাং কোন অনুসন্ধানেই আমি অভিজ্ঞ নহি। হে সুন্দরি! এক্ষণে তুমি যাহা জান, তাহাই কর। মণি যেমন প্রতিবিম্ব গ্রহণ করে, আমিও তেমনি তাহা গ্রহণ করিব। আমার চিত্ত এখন বাসনানির্ম্মুক্ত হইয়াছে। এই অবস্থায় আমি যথালব্ধ সাধু বা অসাধু বিষয়ের প্রশংসা বা নিন্দা কিছুই করি না। তোমার যেরূপ অভিমত, তাহাই তুমি কর।

চূড়ালা কহিলেন,—হে মহাভুজ! আপনার অভিপ্রায় যদি এইরূপই হয়, তবে আমার অভিমত শ্রবণ করুন। ইহা শুনিয়া—হে জীবন্মুক্তস্বরূপ! ইহার আপনি অনুষ্ঠান করুন। যে একত্ব-বোধ মূর্খতাকে নাশ করে, আমরা এক্ষণে তাহা প্রাপ্ত হইয়া স্বেচ্ছায় আকাশবৎ বিমল

হইয়াছি। আমাদের ও সেই পরমাত্মার ইচ্ছায় কোন ভেদ-ভিন্নতা নাই। তাঁহার ইচ্ছা ও আমাদের ইচ্ছা এখন একই প্রকার হইয়াছে। কেন না, আমাদের চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়বর্গের স্ব স্ব বিষয়ে অনিচ্ছায় পরমাত্মার বিশেষত্ব কি হইতে পারে? তিনি তো সর্ব্বাবস্থায় সমভাবেই অবস্থিত। অতএব হে পুরুষবর! বিষয় ভোগের আদি, মধ্য ও অন্তে আমরা যেরূপ আছি, তেমনই থাকিয়া কেবল মাত্র শেষ পরিহারপূর্ব্বক অবস্থিত আছি। এক্ষণে আমার মত এই যে, হে বিভো! আমাদের অবশিষ্ট আয়ুষ্কাল বর্ত্তমান রাজ্যৈশ্বর্য্য-ভোগেই অতিক্রমপূর্ব্বক যথাকালে বিদেহমুক্তি প্রাপ্ত হইব।

শিখিধ্বজ কহিলেন,—অয়ি প্রিয়ে! আমরা আদি, মধ্য ও অন্তে কিরূপ রহিয়াছি। অপিচ একমাত্র শেষটুকু পরিত্যাগ করিয়া আছি, ইহাই বা কিরূপ কথা? ইহা তুমি এখন বর্ণন কর।

চূড়ালা প্রত্যুত্তরে বলিলেন,—রাজন্! আমরা তো আদি, মধ্য বা অন্ত কোন কালেই রাজা নহি। সর্ব্বদা অসঙ্গ আত্মস্বরূপেই আমাদের অবস্থিতি। আমরা রাজা, এইরূপ মোহই পূর্ব্বে আমাদের অধিক ছিল, বর্ত্তমান কালে আমরা সেই মোহমাত্রই পরিত্যাগ করিয়াছি। এক্ষণে আপনি নিজ নগরে রাজা হইয়া সিংহাসনে উপবেশন করুন। আমি আপনার মহিষী হইয়া বিরাজ করিতে থাকি। আমাদের রাজপুরী পতাকাসমূহে পরিশোভিত হইয়া তূর্য্যনাদে নিনাদিত হউক; চারিদিকে পুষ্পরাজি বিকীর্ণ হইতে থাকুক। রাজ্যবাসীরা আনন্দে উন্মত্ত হউক। সুন্দরী নর্ত্তকীকুল নৃত্য করুক। এইরূপে আমাদের রাজধানী ভ্রমর-গুঞ্জিত মঞ্জরী-মণ্ডিত নবলতা-বিতান-বিভাত বসন্ত-লক্ষ্মীর পরম শোভায় সুশোভিত হউক।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—চূড়ালা এই কথা কহিলে বিগতজ্বর শিখিধ্বজ হাস্যপূর্ব্বক মধুর অনাবিল বাক্যে বলিলেন,—অয়ি বিশাল নয়নে! যদি এইরূপই হয়, তবে স্বর্গীয় সিদ্ধসমূহের ভোগসম্পত্তি তো আমাদের আয়ত্ত আছে। আমরা তাহাই কেন ভোগ করি না? তাহাতে আমাদের ক্ষতি কি আছে?

চূড়ালা কহিলেন,—রাজন্! ভোগে আমার স্পৃহা নাই; ঐশ্বর্য্যেও আকাঙ্ক্ষা নাই। কেবল স্বভাবের বশে যথালব্ধ বিষয় লইয়াই আমার অবস্থান। রাজ্য বা স্বর্গ কিছুই আমার নিকট সুখকর নহে এবং কোন প্রকার কার্য্যও আমার সুখজনক হয় না। আমি স্বগত চেষ্টায় যথাস্থিত রূপে অক্ষুব্ধভাবেই অবস্থান করি। এইটা সুখের আর এইটা অসুখের, এইরূপ দ্বন্দ্ব ভাব আমার নাই। যাহা শান্ত, সৌম্য পরমপদ, তাহাতেই আমি যথাসুখে অবস্থিত রহিয়াছি।

শিখিধ্বজ কহিলেন,—প্রিয়ে! তুমি সর্ব্বত্র সম-বুদ্ধি-সম্পন্ন হইয়াছ। তোমার যাহা যোগ্য কথা, তাহাই তুমি কহিয়াছ। আমরা রাজ্যত্যাগ করি, বা গ্রহণই করি; তাহাতে আমাদের ক্ষতি বৃদ্ধি কি আছে? সুখ-দুঃখ দশার ভাবনা আমরা পরিত্যাগ করিয়াছি। আমাদের বিদ্বেষ-বুদ্ধিও নাই; যথাস্থিত স্বচ্ছভাবেই আমরা অবস্থিত রহিয়াছি।

সেই প্রাচীন দম্পতিযুগল এইরূপ আলাপ ব্যবহার করিতেছিলেন, ইতি মধ্যে দিবসের অবশেষ হইল। অনন্তর তাঁহারা গাত্রোত্থানপূর্ব্বক যথাপ্রাপ্ত দিনকৃত্য সম্পাদন করিলেন। সেই দম্পতিদ্বয় কার্য্যাকার্য্যে অভিজ্ঞ, পরিপূর্ণ-চিত্ত ও জীবন্মুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহারা স্বর্গভোগে অবজ্ঞা প্রদর্শনপূর্ব্বক একই শয্যায় শয়ন করিয়া যথোচিত প্রণয়-ব্যবহারে সে রাত্রি যাপন করিলেন। সেই দীর্ঘ যামিনী প্রণয়ীদিগের উৎকণ্ঠা-জননী; সপ্রণয়ে ভোগ ও মোক্ষসুখের কথা কহিতে কহিতে তাঁহাদের সে যামিনী মুহূর্ত্ত কালের ন্যায় কাটিয়া গেল।

নবাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১০৯ ॥

দশাধিক শততম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—অনন্তর দিবসকর সমুদিত হইলেন। নভোমণ্ডল হইতে অন্ধকারপুঞ্জ অপসারিত হইল। বিশ্ব-বিকাশক দিনমণি যেন একটা পেটিকার মধ্যে এতক্ষণ আবদ্ধ ছিলেন; এখন তিনি তথা হইতে

বহির্গত হইয়া পড়িলেন। সুপ্ত ব্যক্তিবর্গের নেত্রোন্মীলনের সঙ্গে সঙ্গে কমলকুল উন্মীলিত হইতে লাগিল। এই সময় সেই রাজ-দম্পতি গাত্রোত্থান-পূর্ব্বক সন্ধ্যা-বন্দনাদি সমাপন করিয়া তত্রত্য কনক-কন্দরের অন্তরালস্থ কোন এক স্নিগ্ধ মসৃণ পত্রাসনে উপবেশন করিলেন।

অনন্তর চূড়ালা উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার সঙ্কল্প-বলে রত্ন-কলস সম্মুখে আসিল। তিনি সঙ্কল্পবলেই ঐ কলস সপ্ত সাগরের বারি দ্বারা পূর্ণ করিলেন। চূড়ালার স্বামী পূর্ব্বমুখে অবস্থিত ছিলেন। চূড়ালা সেই মঙ্গলকলসের জল দ্বারা তাঁহাকে নিজ রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। পরে তাঁহার সঙ্কল্পবলে এক সুবর্ণ সিংহাসন সমানীত হইল। চূড়ালা রাজাকে সেই সিংহাসনে উপবেশন করাইয়া কহিলেন,—রাজন্! অধুনা আপনি মুনিজনোচিত শান্ত তেজঃ পরিহার করিয়া অষ্টলোকপালের তেজঃ ধারণ করুন।

চূড়ালা এই কথা কহিলে, রাজা শিখিধ্বজ প্রত্যুত্তরে বলিলেন,—প্রিয়ে! তুমি যাহা বলিলে, আমি তাহাই করিতেছি। এই বলিয়া তিনি সেই কাননমধ্যেই মহারাজ্য ভার গ্রহণ করিলেন। মানিনী চূড়ালা তাঁহার দৌবারিকের পদে অবস্থিতা হইলেন। মহারাজ শিখিধ্বজ তাঁহাকে কহিলেন,—অদ্য তোমায় আমি দেবীপদে অভিষিক্ত করিতেছি। এই বলিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে সরোবর-সলিলে স্নান করাইলেন এবং স্বীয় মহাদেবী পদে অভিষিক্ত করিয়া কহিলেন,—অয়ি প্রিয়ে, পদ্মপলাশ-লোচনে! তুমি এক্ষণে সঙ্কল্পবলে মহান্ বিভব সমভিব্যাহারে প্রবল সৈন্যদল আহরণ কর। বরাঙ্গী চূড়ালা স্বামীর ঐ কথা শ্রবণ করিবা-মাত্র সঙ্কল্পবলে তৎক্ষণাৎ বিপুল সৈন্যবল সৃজন করিলেন। মনে হইল, বর্ষাঋতু যেন মেঘজাল বিস্তার করিল। অনন্তর তাঁহারা দেখিতে পাইলেন,—সহসা গজাশ্ব-সঙ্কুল প্রবল সৈন্যদল অসংখ্য ধ্বজপতাকা ধারণপূর্ব্বক কানন-প্রান্তর পরিব্যাপ্ত করিয়া আসিতে লাগিল। সেই সেনাদলের তূর্য্যনাদে গিরিগুহা ও বনাভ্যন্তর প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। তাহাদের মস্তকস্থ রত্নরাজির কিরণচ্ছটায় চারিদিকের অন্ধকারপুঞ্জ ছিন্ন ভিন্ন ও অপসারিত হইতে লাগিল। ঐ সময় এক মহামত্ত গন্ধহস্তী

মণ্ডলাকার-গমনে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। হৃষ্টচিত্ত সামন্তগণ তাহার রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত ছিলেন। রাজদম্পতি সেই হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন।

অনন্তর প্রবল প্রতাপান্বিত মহারাজ শিখিধ্বজ প্রিয়তমা চূড়ালার সহিত চলিতে লাগিলেন। রথ-পদাতিসঙ্কুল বিপুল সেনাদল তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিল। রাজা শিখিধ্বজ পর্ব্বতাকার বিশাল সেনাদল লইয়া যেন প্রবল বাত্যায় গিরি-দরী ভেদ করিয়া তত্রত্য কানন-ভূমি হইতে চলিতে লাগিলেন। মহেন্দ্রাচল হইতে যাত্রা করিয়া চলিতে চলিতে পথিমধ্যে মহীপতি কত পর্ব্বত, কত দেশ, কত নদী, কত গ্রাম, কত জঙ্গল অবলোকন করিলেন। তিনি যাইতে যাইতে প্রিয়তমা চূড়ালাকে কত আত্মবৃত্তান্ত শুনাইতে লাগিলেন। এইরূপে মহারাজ শিখিধ্বজ অল্পকাল মধ্যেই স্বর্গবৎ শোভা-সমৃদ্ধিশালিনী স্বীয় রাজধানীতে আসিয়া উপনীত হইলেন। সামন্তরাজগণ সেখানে তাঁহার আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া মহোল্লাসে জয়ধ্বনি করিতে করিতে রাজপুরী হইতে নির্গত হইলেন। এইবার অত্যুচ্চ তূর্য্যনাদ করিয়া উভয় সৈন্যদল মিলিত হইল। রাজা শিখিধ্বজ সেই সকল সৈন্য-সমভি-ব্যাহারে নিজ নগরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। পুরবাসিনী ললনাকুল রাজার মস্তকোপরি লাজ ও কুসুম বর্ষণ করিতে লাগিল। রাজপথের উভয় পার্শ্বে বণিকদিগের বিপণীশ্রেণী দেখিতে দেখিতে রাজা তাঁহার পুরীমধ্যে প্রবেশ করিলেন। রাজপ্রাসাদ ধ্বজ-পতাকায় সমলঙ্কৃত হইয়াছিল। উহার স্থানে স্থানে মনোরম মুক্তামালা দুলিতেছিল। রাজার অভ্যর্থনার জন্য নর্ত্তকী-দল তন্মধ্যে নৃত্যগীতে মত্ত হইয়াছিল। ধ্বজ-পতাকা-পরিশোভিত রাজ-প্রাসাদ তখন কৈলাস-শৈলবৎ সমুন্নত ও সুশোভিত বলিয়া প্রতীত হইতে লাগিল। প্রজামণ্ডলী রাজার আগমনকালের উপযোগী মাঙ্গলিক দ্রব্য-সম্ভার সুসজ্জিত করিয়া রাখিয়াছিল। রাজা রাজভবনে প্রবেশ করিবা-মাত্র প্রজাবর্গ সসম্ভ্রমে তাঁহাকে প্রণাম করিল। তিনিও তাহাদিগকে যথেষ্ট সমাদর করিলেন। পুরীপ্রবেশের পর রাজা সপ্তাহ পর্য্যন্ত মহা-মহোৎসবের অনুষ্ঠান করিলেন। অনন্তর উৎসবান্তে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া যথাবিধি রাজকার্য্য করিতে লাগিলেন।

হে রাম! শিখিধ্বজ ঐরূপে এ ভূমণ্ডলে চূড়ালা সহ দশ সহস্রবর্ষ রাজত্ব করিলেন। অনন্তর তাঁহারা পতিপত্নী দেহত্যাগে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। সঙ্কল্পমাত্র দেহ পরিত্যাগ করিয়া সেই রাজ-দম্পতি তৈল-বিরহিত প্রদীপের ন্যায় সম্পূর্ণ নির্ব্বাণ লাভ করিলেন। পুনর্ব্বার তাঁহাদিগকে আর জন্ম লাভ করিতে হইল না। তাঁহারা সমদৃষ্টিশালী হইয়া দশসহস্র বর্ষ পর্য্যন্ত সুখে বিহার ও রাজ্য পালনপূর্ব্বক একই সঙ্গে নির্ব্বাণপদে লীন হইলেন। শিখিধ্বজ রাজার ভয় ছিল না, বিষাদ ছিল না, কোন অভিমান বা বিদ্বেষ ছিল না। তিনি সর্ব্বদা অনাসক্ত-চিত্তে অবস্থান করিয়া মৃত্যুকে জয় করিয়াছিলেন। তাঁহা দ্বারা যথালব্ধ কর্ম্মই অনুষ্ঠিত হইত। এই ভাবে দশ সহস্র বর্ষ যাবৎ তিনি পৃথিবীর উপর একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। শিখিধ্বজ সত্ত্বমাত্রে অবশিষ্ট ছিলেন। পৃথিবীস্থ সমস্ত ভোগই তৎকর্ত্তৃক আস্বাদিত হইয়াছিল। তদবস্থায় এই দীর্ঘ কাল তিনি সমস্ত রাজন্যবর্গের চূড়ামণিরূপে বিরাজ করিয়া অবশেষে মোক্ষধাম লাভ করিয়াছিলেন।

হে রঘুনন্দন! তোমায় বলি, তুমিও ঐরূপে যথালব্ধ কর্ম্মের অনুকরণ করিয়া যাও এবং শোকশূন্য হইয়া সমাধি-ব্যাপারে নিরত হও। অথবা তুমি ভোগ, মোক্ষ বা জ্ঞানাদির অনুসরণপূর্ব্বক ব্যুত্থিতভাবে অবস্থান কর। তোমার সমাধি ও সমাধি হইতে ব্যুত্থান উভয়ত্রই তুল্যাবস্থা হউক।

দশাধিক শততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১১০ ॥

একাদশাধিক শততম সর্গ

বশিষ্ঠ কহিলেন—রামচন্দ্র! এই আমি তোমার নিকট শিখিধ্বজরাজের নিখিল বৃত্তান্ত বর্ণন করিলাম। ঐ রাজা যে পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন, তুমি যদি সেই পথের অনুসরণ করিয়া চলিতে পার,

তাহা হইলে তোমাকে আর কস্মিন্‌কালেও ক্লেশ ভোগ করিতে হইবে না। সেই রাজার ন্যায় রাগ-দ্বেষ-বিনাশিনী দৃষ্টি অবলম্বন করিয়া তুমি অনাসক্ত-মনে অবস্থান করিতে থাক। শিখিধ্বজ যে ভাবে রাজ্য পালন করিয়াছিলেন, তুমিও তেমনি ভাবে রাজকর্ম্ম করিয়া যাও এবং তাঁহারই ন্যায় ভোগ ও মোক্ষভাগী হইয়া অবস্থান কর। হে রঘুবর! পূর্ব্বে বৃহস্পতিনন্দন কচ উল্লিখিত শিখিধ্বজ-রাজের পথানুসরণেই বোধ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তুমিও সেই পথ ধর এবং তেমনই ভাবে প্রবুদ্ধ হও।

রামচন্দ্র কহিলেন—ভগবন্! বৃহস্পতিনন্দন ভগবান্ কচ যে প্রকারে প্রবুদ্ধ হইয়াছিলেন, তাহা সংক্ষেপতঃ আমার নিকট ব্যক্ত করুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাজনন্দন! শ্রবণ করুন। শ্রীমান্ কচ শিখিধ্বজের ন্যায়ই পরম প্রবোধ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কচ বাল্যকাল অতিক্রম করিয়াই পদ ও পদার্থ-তত্ত্বে অভিজ্ঞ হইয়া সংসার হইতে সমুত্তীর্ণ হইবার বাসনায় পিতা বৃহস্পতির নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে নিখিল ধর্ম্ম-তত্ত্বের মর্ম্মাভিজ্ঞ, ভগবন্ পিতৃদেব! এই সংসার-বন্ধন হইতে কিরূপে জীব স্বীয় জীবনসূত্র ছেদন করিয়া বহির্গত হইতে পারে, তাহা আমার নিকট প্রকাশ করুন।

বৃহস্পতি বলিলেন,—বৎস! এই সংসার-সাগর অনর্থরূপ মকর-পরম্পরায় সমাকুল; জীব সর্ব্বত্যাগ করিতে পারিলেই ইহা হইতে অনায়াসে উদ্ধার পাইতে পারে।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—পিতার মুখে ঐ পবিত্র বাক্য শ্রবণ করিয়া কচ সমস্ত পরিত্যাগপূর্ব্বক বিজন বনের আশ্রয় লইলেন। নিজের একমাত্র পুত্র কচ এইভাবে বনগমন করিলেন দেখিয়া, বৃহস্পতি কিঞ্চিন্মাত্রও উদ্‌বিগ্ন বা বিচলিত হইলেন না। কেন না, মহৎলোকেরা সংযোগ-বিয়োগ উভয়ই সমান দেখেন এবং উভয় অবস্থাতেই অচলের ন্যায় অবিচলভাবে অবস্থান করেন। যাহা হউক, হে অনঘ! পরে চারি পাঁচ বর্ষ কাটিয়া গেল। একদা কচ কোন এক নিবিড় কাননে পিতার সাক্ষাৎকার লাভ

করিলেন। দেখা হইবামাত্র কচ পিতৃপদে প্রণাম ও তাঁহাকে অর্চ্চনা করিলেন। পিতা বৃহস্পতিও পুত্রকে স্নেহভরে আলিঙ্গন দিলেন। তখন কচ পিতা বাচস্পতিকে সবিনয় মধুর বাক্যে জিজ্ঞাসা করিলেন,—পিতৃদেব! অদ্য প্রায় আট বর্ষ হইল, আমি সর্ব্বত্যাগী হইয়াছি, কিন্তু বিশ্রান্তি লাভ এখনও তো আমার ঘটিল না।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! কচের ঐ প্রকার কাতরোক্তি শুনিয়া বৃহস্পতি এই মাত্র বলিলেন যে, তুমি সর্ব্বত্যাগ কর। ঐ কথা কহিয়াই তিনি সে স্থান হইতে স্বর্গে গেলেন। পিতা চলিয়া গেলে তাঁহার উপদেশে কচ নিজ দেহ হইতে বল্কলাদি পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিলেন। পরে অর্দ্ধে দিবাকর ও অর্দ্ধে নিশাকরের যুগপৎ উদয়াস্তময় শারদাকাশের ন্যায় তিনি সুশোভিত হইতে লাগিলেন। অর্থাৎ জলবর্ষাদির সম্পর্ক তাঁহার সহিত রহিল না। তিনি পুনরায় কোন কাননমধ্য-গত গুহাগৃহে গিয়া আশ্রয় লইলেন। সেখানে শারদ নভোমণ্ডলের ন্যায় মেঘ ও রবিসম্পর্ক-বিরহিত হইয়া তিন বর্ষ পর্য্যন্ত বাস করিলেন।

এইরূপে কচ শান্ত ও শূন্যদেহে কখন কখন দিগ্‌দিগন্তে বাস করিতে লাগিলেন; কিন্তু সে অবস্থাতেও বিশ্রান্তি লাভ ঘটিল না দেখিয়া তিনি মনের দুঃখে দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। ইষ্ট লাভ না হওয়ায় মনে তাঁহার কষ্ট হইল। তিনি পুনর্ব্বার পিতা বৃহস্পতির নিকট গমন করিলেন। সেখানে গিয়া ভক্তিপূর্ব্বক পিতাকে যথোচিত বন্দনাদি করিলে, পিতা বৃহস্পতি তাঁহাকে আলিঙ্গন দিলেন। তখন কচ খেদ-গদ্‌গদ-বাক্যে পুনরপি পিতার প্রান্তে নিবেদন করিলেন,—তাত! সকলই আমার পরিত্যক্ত হইয়াছে। এমন কি কন্থা এবং বেণুলতাদিও আমি পরিত্যাগ করিয়াছি! তথাচ এখনও আমার আত্মপদে বিশ্রান্তি লাভ ঘটিল না; সুতরাং এখন আমার কর্ত্তব্য কি?

বৃহস্পতি কহিলেন,—বৎস! চিত্তই সকল; তাহাকে ত্যাগ করিতে পারিলেই সর্ব্বত্যাগ সিদ্ধ হইয়া থাকে। অতএব তুমি তাহাই কর; সেই সর্ব্বময় চিত্তকেই পরিত্যাগ কর। এই চিত্তত্যাগ সিদ্ধ হইলেই তুমি প্রকৃত সর্ব্বত্যাগী নামের যোগ্য হইবে এবং চিত্ত ত্যাগেই তোমার প্রকৃত

স্বাস্থ্য লাভ ঘটিবে। চিত্তত্যাগই সর্ব্বত্যাগ, ইহাই তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতবর্গের অভিমত।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! বৃহস্পতি কচকে ঐ কথা কহিয়া দ্রুতগতি শূন্যপথে প্রয়াণ করিলেন। এদিকে কচ পিতার উপদেশে চিত্তত্যাগেই কৃতসঙ্কল্প হইয়া অক্লিষ্ট-অন্তঃকরণে চিত্তের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। অনন্তর বহু প্রয়াস ও বহু চিন্তা করিয়াও চিত্তকে যখন পাইলেন না, তখন স্বীয় পিতৃদেবকেই মনে মনে চিন্তা করিয়া তাঁহারই নিকট যাইতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে ভাবিলেন,—চিত্ত কি? এই যে পদার্থ-পরম্পরা দেখা যাইতেছে, ইহাকে তো চিত্ত নামে নিরূপিত করা যায় না, আর এই যে কর-চরণাদি-বিশিষ্ট দেহ আছে, ইহাও তো চিত্ত নহে; সুতরাং এই নিরপরাধ দেহকেই বা আমি পরিত্যাগ করি কিরূপে? অনর্থক এই দেহাদিকে ত্যাগ করা আমার কোন ক্রমেই উচিত হয় না। যাই—পিতার নিকটেই যাই; গিয়া সেই মহাশত্রু চিত্ত কে?—তাহা জিজ্ঞাসা করি। তাঁহার নিকট ঐ চিত্তের স্বরূপ জানিয়া লইয়া পরে উহাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক আমি বিজ্বর হইয়া রহিব।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—কচ ঐ প্রকার চিন্তা করিয়া স্বর্গলোকে গমন করিলেন। পরে পিতার প্রান্তে উপস্থিত হইয়া ভক্তিভরে তদীয় চরণ-বন্দনা ও প্রণাম করিলেন। অনন্তর কচ একান্তে পিতার নিকট জিজ্ঞাসিলেন,—ভগবন্! আপনি আমাকে চিত্ত পরিত্যাগ করিবার উপদেশ দিয়াছিলেন; কিন্তু ঐ চিত্তের স্বরূপ কি, তাহা আমাকে বলেন নাই। অতএব চিত্ত কি? তাহার স্বরূপ কি প্রকার? কাহাকে চিত্ত বলা যায়, ইহা আমার নিকট প্রকাশ করিয়া বলুন। আমি উহা বিদিত হইয়া পরে উহাকে পরিত্যাগ করিব।

বৃহস্পতি কহিলেন,—চিত্তবিৎ বুধগণ বলিয়া থাকেন,—অহঙ্কারই চিত্ত। জীবের অন্তরে যে অহম্ভাব বা 'আমি' ইত্যাকার জ্ঞান বা অভিমান আছে, তাহারই নাম চিত্ত। ঐ অহঙ্কারকে পরিত্যাগ করিতে পারিলেই চিত্ত ত্যাগ করা হয়।

কচ কহিলেন,—হে ত্রয়স্ত্রিংশৎকোটি-দেবগণের গুরো! মহামতে!

পিতৃদেব! আপনি যাহা বলিলেন,—তাহা কি প্রকার, আমাকে বিশেষরূপে বুঝাইয়া বলুন। আমি মনে করি, এই চিত্ত পরিত্যাগরূপ কার্য্য বড়ই কঠিন। এ বিষয়ে কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারিয়াছেন বলিয়া আমার মনে হয় না। অতএব হে যোগিবর! এই চিত্ত কিরূপে পরিত্যাগ করা যাইবে? ফল কথা, এই অহঙ্কারই তো লোকে আত্মরূপে প্রসিদ্ধ। ইহাকে পরিত্যাগ করিলে তো আত্মাকেই পরিত্যাগ করা হয়। যিনি আত্মা, তিনি তো আমি বৈ আর কেহই নহেন। অতএব আমাকে পরিত্যাগ করিব, ইহা সম্ভব হয় কিরূপে?

বৃহস্পতি কহিলেন,—বৎস! অহঙ্কারের পরিহার অতি সহজ কার্য্য। ইহা এতই সহজ যে, একটা পুষ্পমর্দ্দন বা চক্ষুর নিমীলন অপেক্ষাও অনায়াস-কর। সুতরাং ইহার পরিহারে ক্লেশ কিছুই নাই। হে পুত্র! যেরূপে এই চিত্ত পরিত্যাগ সিদ্ধ হয়, তাহা বলিতেছি,—শ্রবণ কর। যে বস্তু অজ্ঞান হইতে উদ্ভূত, তাহা জ্ঞানোদয়েই নাশ পাইয়া থাকে। বৎস! অহঙ্কার বাস্তব পক্ষে নাই। উহা একটা মিথ্যা ভ্রমমাত্র। কিন্তু যদিও মিথ্যা ভ্রম, তথাচ বাল-কল্পিত বেতালবৎ উহা সত্যরূপেই প্রতিভাত হইয়া থাকে। রজ্জুতে যেমন মিথ্যা ভুজঙ্গভ্রম এবং মরুস্থলীতে যেমন অসত্য জলভ্রম, তেমনি ঐ অহঙ্কারও মিথ্যা ভ্রমেরই বিজৃম্ভণ। দৃষ্টিদোষে একমাত্র চন্দ্রকেও যেমন দুই বলিয়া বোধ হয়, তেমনি ভ্রমক্রমেই অহঙ্কারের প্রতীতি হইয়া থাকে। বাস্তব পক্ষে অহঙ্কারকে সৎ বা অসৎ কিছুই বলা চলে না। অনাদি অনন্ত অদ্বিতীয় চৈতন্যই সত্য পদার্থ; তিনিই আছেন, আর কিছুই নাই, সমস্তই মিথ্যা। ঐ চৈতন্য অম্বর অপেক্ষাও সুনির্ম্মল এবং উহাই সর্ব্বত্র জ্ঞানস্বরূপে বিরাজমান। যেমন চঞ্চল তরঙ্গসমূহের সর্ব্বত্রই একমাত্র জল বৈ আর কিছুই নয়, তেমনি ঐ একমাত্র চৈতন্যই নিয়ত নিখিল পদার্থে প্রকাশমান। তিনি ভিন্ন কিছুই নাই। সুতরাং ইহাতে অহম্ভাবই বা কি? আর তাহার উৎপত্তিই বা কোথা হইতে কি প্রকার? ফলতঃ কে দেখিয়াছে—জলমধ্যে রজোরাশি ও অনলে জল উৎপন্ন হইয়াছে? তাই বলিতেছি, বৎস! এই দেহাদিই আমি; এই প্রকার ভ্রমের কার্য্য পরিত্যাগ কর। এইরূপ

ভ্রমজ্ঞান অতি তুচ্ছ পরিচ্ছিন্ন এবং উহা দিক্-কালাদির বশীকৃত। এ জ্ঞানকে কখনই বাস্তব বলা যায় না। বাস্তব পক্ষে বিচার করিয়া দেখিতে গেলে দেখা যাইবে—তুমি দিক ও কালাদিরূপে অপরিচ্ছিন্ন এবং নিত্যোদিত, বিস্তৃত, সর্ব্বব্যাপী, একমাত্র সুনির্ম্মল চৈতন্যস্বরূপ।

হে কচ! ফল, কুসুম ও পল্লবসমূহের সার যেমন একমাত্র রস, তেমনি তুমিই এই নিখিল জগতের সারভূত নিরতিশয় আনন্দমূর্ত্তি চৈতন্যরূপে বিরাজিত। তুমিই সেই সদা সুনির্ম্মল অনন্ত চিদাত্মা। তুমি সত্তাস্বরূপে বিরাজমান; তোমার আবার এই অহম্ভাব জ্ঞান কি, বা কিপ্রকার?

একাদশাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১১১ ॥

দ্বাদশাধিকশততম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! বৃহস্পতিনন্দন কচ পিতার নিকট ঈদৃশ উত্তম উপদেশরূপ পরম যোগ প্রাপ্ত হইয়া ক্রমশঃ জীবন্মুক্ত হইয়াছিলেন। ঐ প্রশান্তবুদ্ধি কচ যেরূপে মোহবন্ধন ছেদনপূর্ব্বক নির্ম্মম ও নিরভিমান হইয়াছিলেন, তুমিও তেমনি ভাবে নির্ব্বিকার হইয়া অবস্থান করিতে থাক। রাম! ঐ অহঙ্কারকে তুমি অসৎ বলিয়া নিশ্চিত হইয়া আপনাতে উহাকে আর অবকাশ প্রদান করিও না। যেমন অসৎ শশশৃঙ্গের আদান ও বর্জ্জন হইতে পারে না, তেমনি এই অসৎ অহঙ্কারের ত্যাগ বা গ্রহণ কিছুই সম্ভব নহে। অহঙ্কারের যখন সম্পূর্ণই অসম্ভাবনা, তখন তোমার জনন-মরণই বা কৈ? ফলে শূন্যক্ষেত্রে বীজ বপন করিয়া কে তাহার ফল সংগ্রহ করিতে পারে? তুমি নিরংশ, নিঃসঙ্কল্প, সর্ব্বভাবময় ও বিশাল; তোমার স্বরূপ পরমাণু অপেক্ষাও সূক্ষ্ম চৈতন্যময়। জলের যেমন তরঙ্গভাব এবং কনকের যেমন কটকাদি-ভাবে পরিণাম, তেমনি অহংভাবনার ফলে উল্লিখিত চৈতন্যের স্বরূপাবস্থা হইতে ভিন্নাবস্থায় অবস্থান। এই নিখিল জগৎ অজ্ঞানের বশেই মায়াময়রূপে বিরাজিত।

হে নিষ্পাপ! যখন জ্ঞানের উদয় হয়, তখন এই সমস্তই ব্রহ্ম হইয়া যায়। তাই বলিতেছি, তুমি দ্বিত্ব বা একত্ব বোধ পরিহারপূর্ব্বক চৈতন্ত-মাত্রে অবশিষ্ট হইয়া থাক। মিথ্যা পুরুষের ন্যায় বৃথা দুঃখের আক্রমণে অভিভূত হইও না; যথার্থ সুখী হইয়া অবস্থান কর। এই যে অতি তৃষ্ণার ঘনীভূত সংসারমায়া ক্রমেই ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছে, ইহা শরদাগমে মিহিকার ন্যায় জ্ঞানবলেই ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

রামচন্দ্র কহিলেন,—ভগবন্! অনাবৃষ্টির আশঙ্কায় আকুলচিত্ত চাতক যেমন সহসা বর্ষার ধারা প্রাপ্ত হইলে পুলকিত হইয়া উঠে, আমিও তেমনি ভবদুপদিষ্ট জ্ঞানপীযূষ পান করিয়া অন্তরে পরমানন্দ প্রাপ্ত হইয়াছি। আমার অন্তর যেন অধুনা পীযূষ-পরিষিক্ত হইয়া শীতল হইয়াছে। আমি সর্ব্ব সম্পদের অধিকারী হইয়া অদ্য যেন সর্ব্বোপরি বিরাজ করিতেছি। তৃষিত চকোর যেমন বারম্বার চন্দ্রমরীচি পান করিয়াও তৃপ্তির সীমায় উপনীত হয় না, পরপর কেবল তাহার পিপাসাই বৃদ্ধি পায়, আমিও তেমনি আপনার অমৃতায়মান উপদেশ সকল পুনঃপুন শুনিয়াও তৃপ্তিশেষ পাইতেছি না। উহা যত শুনি, ততই আমার শ্রবণা-কাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠে। অথবা হে প্রভো! আমি সম্পূর্ণ তৃপ্ত হইয়াছি; তথাচ পুনরপি আপনাকে প্রশ্ন করিতেছি। বস্তুতঃ তৃপ্ত হইয়াও কে না অরাহুগ্রস্ত সুধাকরের সুধা পান করিতে সমুৎসুক হইয়া থাকে? যাহা হউক, প্রভো! আমি জিজ্ঞাসা করি, আপনি পূর্ব্বে যে মিথ্যা পুরুষের কথা কহিলেন,—কে সেই মিথ্যা পুরুষ? শুনিলাম, অবস্তুকে বস্তু এবং বস্তুকে অবস্তু করিয়া তোলা ঐ পুরুষেরই কার্য্য। অতএব উহার বিবরণ আমার নিকট ব্যক্ত করুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রঘুবর! ঐ মিথ্যা পুরুষ কে? তাহা বুঝাইবার নিমিত্ত তোমার নিকট একটী মনোমদ উপাখ্যান কীর্ত্তন করিতেছি। শ্রবণ কর,—এই উপাখ্যান তত্ত্ববেদিগণের নিতান্তই হাস্য-জনক। হে মহাভুজ! কোন এক মায়াযন্ত্রময় পুরুষ আছে। তাহার বুদ্ধি বালকের ন্যায় সরল। সে অতি মূর্খ জন। শূন্যে তাহার উৎপত্তি, এবং শূন্যেই তাহার স্থিতি। আকাশে যেমন কেশগুচ্ছ কিম্বা মরুদেশে যেমন মরীচিকা

তেমনি শূন্যই সেই পুরুষের স্থান। সেখানে সে মিথ্যা-পুরুষ ভিন্ন অন্য কিছুই নাই; যে কিছু আছে বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তাহা সেই পুরুষই; তদ্ব্যতিরিক্ত কিছুই নয়। সে পুরুষ সেখানে যাহা দেখে, তাহা তাহারই ভ্রমাভাস। সে দুর্ম্মতি; তাই দেখিতে পায় না যে, আমিই এই দৃশ্যাদৃশ্য সকল বস্তু। সে মিথ্যা-পুরুষ সেই স্থানে বৃদ্ধি পায় এবং বর্দ্ধিত হইয়া এইরূপে স্থিরসঙ্কল্প হয় যে, আমি আকাশ, আমার আকাশ; আমিই আকাশের স্থির রক্ষক। আকাশ আমার প্রিয়; তাই তাহাকে আমি সযত্নে রক্ষা করিয়া থাকি। সে পুরুষ এইরূপ চিন্তা করিয়া আকাশ রক্ষার নিমিত্ত গৃহ প্রস্তুত করিল; গৃহ-নির্ম্মাণের পর সে সেই গৃহমধ্যে থাকিয়া ভাবিল,—আমি এ গৃহে আকাশ রাখিলাম। এই গৃহ-মধ্যগত আকাশ আমার; এ আকাশ কখনই যাইবে না।

হে রাঘব! এইরূপে সেই মিথ্যা-পুরুষ সেই গৃহাকাশ লইয়াই তুষ্ট রহিল। কিয়দ্দিন এই ভাবে কাটিল। অনন্তর আকাশ-মধ্যগত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মেঘের ন্যায় তাহার সেই গৃহ শারদ সমীরণে ধ্বংস প্রাপ্ত হইল। তখন সে পুরুষ সেই গৃহাকাশের উদ্দেশে শোক করিতে লাগিল; বলিল,—হা! আমার গৃহাকাশ! তুমি এখন ধ্বংস পাইয়া গেলে! এই ক্ষণেকের মধ্যে কোথায় লুকাইলে? হা আমার স্বচ্ছাকাশ! তুমি এখন ভাঙ্গিয়া গেলে। এইরূপে সেই দুর্ব্বোধ পুরুষ বহু বিলাপ করিল। অবশেষে সে আকাশ-রক্ষার নিমিত্ত এবার একটী কূপ খনন করিতে লাগিল। কূপ-নির্ম্মাণের পর মিথ্যা পুরুষ সেই কূপাকাশ লইয়াই তুষ্ট রহিল। কালক্রমে তাহার সেই কূপও লোপ পাইল এবং কূপাকাশও নষ্ট হইল। তাহাতে সেই পুরুষ পূর্ব্বের ন্যায় আবার শোকাকুল হইয়া বিলাপ করিতে লাগিল। অনেক বিলাপ করিয়া অবশেষে সে এক কুম্ভ নির্ম্মাণ করিল এবং সেই কুম্ভাকাশ লইয়া সসন্তোষে কাল কাটাইতে লাগিল। হে রঘুনাথ! কালক্রমে তাহার সেই কুম্ভও ভাঙ্গিয়া গেল। ফল কথা, হতভাগ্য যে দিকেরই আশ্রয় লয়, সেই দিকই নষ্ট হইয়া যায়। যাহা হউক, ঐ মিথ্যা-পুরুষ কুম্ভাকাশের জন্য পূর্ব্ববৎ বিলাপ করিয়া পরে আকাশ-রক্ষার্থ একটী কুণ্ড নির্ম্মাণ করিল। অনন্তর সেই কুণ্ডাকাশ লইয়াই তাহাকে

সসন্তোষে কালাতিপাত করিতে হইল। কিন্তু কি বিড়ম্বনা! কিয়ৎকাল পরে সেই কুম্ভও তাহার নষ্ট হইয়া গেল। তখন সে সেই কুম্ভের জন্য শোক করিতে লাগিল। কুম্ভাকাশের নিমিত্ত অনেক শোক করিয়া আকাশ-রক্ষার্থ তখন সে একটা চতুঃশাল মহাগৃহ নির্ম্মাণ করিল। অনন্তর সে সেই গৃহাকাশ লইয়া সন্তুষ্টচিত্তে কাল যাপন করিতে লাগিল। কিন্তু মিথ্যা-পুরুষের দুর্ভাগ্য; তাই সে গৃহও তাহার রহিল না। প্রবল বায়ু যেমন জীর্ণ পর্ণ হরণ করে, তেমনি প্রজাধ্বংসী কাল সেই মহাগৃহ নষ্ট করিয়া ফেলিল। অনন্তর ঐ পুরুষ সেই গৃহাকাশের জন্য শোকাকুল হইল। কিন্তু আকাশ-রক্ষায় বিরত হইল না। কিঞ্চিৎ পরেই আকাশ রাখিবার জন্য সে একটা অম্বুদ-প্রতিম কুশূল নির্ম্মাণ করিল। কিন্তু বায়ু যেমন বারিধরকে বিতাড়িত করে, তেমনি কাল তাহার সেই কুশূলটীও হরণ করিল। অনন্তর কুশূল-নাশে তাহার অত্যন্ত সন্তাপ হইল।

এইরূপে সেই মিথ্যা-পুরুষ গৃহ, কুপ, কুণ্ড, কুম্ভ, চতুঃশাল ও কুশূল প্রভৃতি লইয়াই কাল কাটাইতেছে এবং ঐ সমুদায়ের মধ্যে আকাশ গ্রহণে এবং সেই আকাশের গমনাগমন-ব্যাপারে বিমূঢ় হইয়া কদাচিৎ গভীর দুঃখে এবং কদাচিৎ অপার সুখে মগ্ন হইতেছে।

দ্বাদশাধিক শততম সর্গ ॥ ১১২ ॥

ত্রয়োদশাধিক শততম সর্গ।

রামচন্দ্র কহিলেন,—ভগবন্! আপনি মিথ্যা-পুরুষের প্রসঙ্গে মায়াপুরুষের কথা কীর্ত্তন করিলেন কেন? আর যে আকাশ-রক্ষার কথা বলিয়া আসিলেন, তাহাই বা কি?

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! শ্রবণ কর,—আমি ইহার যথাযথ বৃত্তান্ত প্রকাশ করিতেছি। হে রাঘব! ঐ যে মায়াযন্ত্রময় পুরুষের কথা বলিয়া আসিলাম, তুমি উহাকে অহঙ্কার বলিয়াই জানিবে। ঐ অহঙ্কার

শূন্যাকাশ হইতেই সমুৎপন্ন। হে সাধো! এই জগৎপ্রপঞ্চ যাদৃশ আকাশকোষে অবস্থিত, সৃষ্টির আদিতে উহা অনন্ত শূন্য অসদাকারে বিদ্যমান ছিল। কিন্তু ঐ আকাশ নিরধিষ্ঠান নহে; ব্রহ্ম অলক্ষ্যভাবে উহার অধিষ্ঠানরূপে অবস্থিত। বায়ু হইতে স্পন্দ ও আকাশ হইতে শব্দ সমুৎপত্তির ন্যায় ঐ আকাশ হইতেই অহঙ্কারের আবির্ভাব। এই অহঙ্কার আত্মা না হইলেও ভ্রমের বশে আত্মভাবে ভাবিত। ইহা আকাশে উপচয় প্রাপ্ত হইয়া সহস্র সহস্র কল্পনাবলে 'ইহা ইষ্ট, আর ইহা ইষ্ট নহে' এইরূপ ভাবনায় ব্যাপৃত হইতে থাকে। পরে 'আমি' 'আমার' ইত্যাদি কল্পিত নামে প্রথিত হইয়া ইষ্ট ও অনিষ্ট বস্তুর প্রাপ্তি ও অনবাপ্তি বিষয়ে প্রযত্ন প্রকাশ করে। ঐ অহঙ্কার স্বয়ং আত্মা নহে, তথাচ আত্মরক্ষার নিমিত্ত এইরূপে অশেষ প্রয়াস পায়, নানা দেহ ধারণ করিয়া সেই সেই পরিগৃহীত দেহের বিনাশের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে এবং কাম, কর্ম্ম ও বাসনানুসারে পূর্ব্ব পূর্ব্ব দেহের নাশে পর পর দেহ সৃজন করিতে থাকে। ঐ অহঙ্কারই মায়াপুরুষ; উহাই মিথ্যা-পুরুষ। মায়ার মাহাত্ম্যে ঐ অহঙ্কার বৃথাই সমুদিত হইয়া থাকে। আকাশের উপর কূপ কুম্ভাদি দেহ ধারণ করিয়া ঐ অহঙ্কারই আপনাপনি ভাবিতে থাকে যে, আমি আমার আত্মরক্ষা করিলাম। হে রাঘব! জগদাকারে বিলসিত যে সমস্ত নাম দ্বারা ঐ অহঙ্কার সকলকেই মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, এক্ষণে উহার সেই সমুদায় নাম শ্রবণ কর। জীব, বুদ্ধি, মন, চিত্ত, মায়া, প্রকৃতি, সঙ্কল্প, কলনা, কাল ও কলা ইত্যাদি বহুবিধ নাম ঐ অহঙ্কারের প্রখ্যাত। উহা বহুবিধ আকার কল্পনা করিয়া সহস্র সহস্ররূপে বিখ্যাত হইয়া থাকে। এই বিশাল বিতত ভূতাকাশে এ জগৎ ভিত্তি-বিরহিত-ভাবে অবস্থিত; ইহাই নিশ্চিত। ঐ মিথ্যা-পুরুষ বৃথা সুখ-দুঃখের অনুভাবক। হে রাম! আকাশে আত্মাশঙ্কা করিয়া ঘটাকাশ ও গৃহাকাশাদি রক্ষা করিবার জন্য ঐ পুরুষ যেমন অনর্থক ক্লেশ প্রাপ্ত হয়, দেখিবে—তুমি যেন তাদৃশ ক্লেশে নিপতিত হইও না। যিনি অণু হইয়াও আকাশ অপেক্ষা বিতত এবং যিনি শুদ্ধ শিব শান্তিময় নামে অভিহিত, তথাভূত আত্মাকে কে বল গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়? আর কেই বা তাঁহাকে রক্ষা করিতে

পারে? অতএব জীবগণ এই বলিয়া যে শোক প্রকাশ করে—'আহা দেহগৃহ বিনষ্ট হইল, আত্মা নাশ পাইল', এরূপ শোক তাহাদের বৃথা। দেখ, ঘটাদি নষ্ট হইয়া যায়, আর তাহার মধ্যগত আকাশ সেই একই অখণ্ড ভাবে থাকে, তাহার কোন কিছুই নাশ পায় না, এইরূপ দৃষ্টান্তে বুঝিবে—দেহ নষ্ট হইলে দেহীর কিছুই নষ্ট হইবার নহে। তিনি সর্ব্বদা নির্লিপ্তভাবেই অবস্থিত। যিনি বিশুদ্ধ চিদাকার আত্মা নামে নির্দ্দিষ্ট তিনি আকাশ হইতেও অতি সূক্ষ্ম; তাঁহাকে স্বীয় অনুভূতিস্বরূপেই প্রথিত করা হয়।

রামচন্দ্র! যেমন আকাশ, তেমনি আত্মা অবিনাশ। বস্তুতঃ কোথাও কখন কিছুই জাত বা মৃত হয় না। একমাত্র ব্রহ্মই এই বিশাল জগদাকারে বিবর্ত্তমান। তুমি সেই ব্রহ্মকেই সত্য, শান্ত, আদি-অন্ত-বিরহিত ও ভাবাভাব হইতে নির্ম্মুক্ত বলিয়া বিদিত হও এবং এইরূপে তাঁহাকে জানিয়া প্রকৃত সুখী হইয়া থাক। রাম! যাহা নিখিল বিপদের আস্পদ, এবং যাহা অনিত্য, অস্বতন্ত্র, আসন্ননাশ, অবিবেক, অনার্য্য ও অজ্ঞ, সেই অহঙ্কারকে তুমি বর্জ্জন কর। অনন্তর বিশুদ্ধ চিন্মাত্রে সুদৃঢ়ভাবে বিরাজিত হইয়া যাহা সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম ভাব, তাহাই প্রাপ্ত হও।

ত্রয়োদশাধিক শততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১১৩ ॥

চতুর্দ্দশাধিক শততম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—পূর্ব্বে পরব্রহ্ম হইতে মনই প্রথম উৎপন্ন হয়। ঐ মন মননাত্মক বলিয়া বিখ্যাত। উহা বিশাল পরব্রহ্মেই স্থিত এবং তাঁহাতে থাকিয়াই স্থায়িত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। যেমন কুসুমে সৌরভ, সাগরে ঊর্ম্মি ও দিবাকরে কিরণরাজি বিরাজিত, তেমনি পরব্রহ্মে ঐ মন অবস্থিত। মন আত্মতত্ত্ব দেখে না, তাই তাহা ভুলিয়াছে এবং আত্ম-তত্ত্বের বিস্মরণেই উহার স্থায়িত্ব লাভ ঘটিয়াছে।

হে রাম! এ জগৎ অন্য কোথা হইতে আসে নাই। ইহা রজ্জুগত ভুজঙ্গের ন্যায় পরমাত্মাতেই ভ্রান্তিবশে বিভাত। হে রাঘব! যে জন সূর্য্য ভাবনা না করিয়া রশ্মিরূপে একটা পৃথক্ ভাবনা করে, তাহার নিকট রশ্মি ও সূর্য্য এই দুই পৃথক্ বস্তু বলিয়াই প্রতীত হয়। যাহার কেয়ূরে কনকবুদ্ধি নাই, কেয়ূর একটা পৃথক্ বস্তু, এইরূপই যাহার ধারণা; তাহার নিকট কনক কেয়ূররূপেই প্রতীতিগোচর হয়। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কিরণরাজিকে সূর্য্য হইতে অভিন্নভাবে ভাবনা করে, তাহার জ্ঞানে কিরণসকল সূর্য্যরূপেই প্রতিভাত হয়। তদীয় জ্ঞানে তখন আর কিরণভেদ-বিকল্পের অস্তিত্ব থাকে না। জলের তরঙ্গ জলই; এই বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া তরঙ্গকে জল হইতে একটা পৃথক্ বস্তু বলিয়া যে ব্যক্তি মনে করে, তাহার নিকট উহা তরঙ্গাকারেই প্রতীয়মান হয়; সে আর উহাকে জল বলিয়া বুঝে না। আবার যে ব্যক্তি জল ও তরঙ্গ অভিন্ন বলিয়াই ধারণা করে, তাহার নিকট তরঙ্গ জলসামান্যরূপেই প্রতীত হইয়া থাকে। তাহার ঐ প্রকার জ্ঞানই নির্ব্বিকল্প জ্ঞান হইয়া দাঁড়ায়। অপিচ কেয়ূরকে কনকরূপে জ্ঞান করিলে, কেয়ূর কনকাকারেই প্রতীত হইতে থাকে। এইরূপ প্রতীতিই নির্ব্বিকল্প প্রতীতি নামে নিরূপিত। বহ্নিশিখাকে বহ্নি বলিয়া না ভাবিয়া যদি শিখারূপে পৃথক্ একটা কিছু ভাবনা করা যায়, তাহা হইলে তাহাতে আর বহ্নিবুদ্ধি থাকে না; উহা শিখাকারেই প্রতীয়মান হইতে থাকে। ফল কথা, বুদ্ধিবৃত্তি যেমন যেমন আকার ধারণ করে, উহা অবিকল সেই সেই দশাই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। উহা বহ্নিশিখা বা মেঘমালা, যে কোন আকারই ধারণা করুক, সেই সেই ভাবই প্রাপ্ত হইবে। অন্যদিকে বহ্নিশিখাকে বহ্নিরূপে ধারণা করিলে, উহা বহ্নি বলিয়াই প্রতীয়মান হইবে। এই প্রতীতিই নির্ব্বিকল্প প্রতীতি। যাঁহার বিকল্পবৈধ নাই, যিনি ঐরূপ নির্ব্বিকল্প ভাব লাভ করিতে পারেন, তিনিই মহৎ ব্যক্তি; তাঁহার বুদ্ধিই অক্ষয় মহত্ত্বশালিনী। তিনিই প্রাপ্তব্য বিষয় প্রাপ্ত হইয়াছেন। বৈকল্পিক পদার্থে তাঁহার আর কখনই আসক্তি জন্মে না। তাই বলিতেছি, রামচন্দ্র! তুমি সমস্ত দ্বৈধ ভাব পরিত্যাগপূর্ব্বক যাহা সম্বেদ্যাতীত বিশুদ্ধ চিত্ত, তাহাতেই তুমি অবস্থান কর।

পবন যেমন স্বতই স্পন্দশক্তির উদ্ভাবক, আত্মা নিজেই তেমনি আত্মশক্তিতে সঙ্কল্পশক্তির উৎপাদক। সঙ্কল্প-শক্তির আবির্ভাবে আত্মা ভিন্নাকারে প্রতীত হইয়া সঙ্কল্প-কল্পনাময় মনের আকারে বিবর্ত্তমান হন এবং ঐ অবস্থায় নিজাকার ভাবনা করিতে থাকেন। ঐ সঙ্কল্পময় মন এ জগৎকে যে ভাবে সঙ্কল্প করে, ক্ষণমধ্যে সেই ভাবেই পরিণত হইতে পারে। মন আপন সঙ্কল্পগুণে অহঙ্কার, বুদ্ধি, জীব, চিত্ত, ইত্যাদি নানা নাম ধারণপূর্ব্বক ব্রহ্মাদি কীট পর্য্যন্ত এবং সুমেরু হইতে মরুভূমি পর্য্যন্ত হইতে পারে। মন সঙ্কল্পের বশেই দ্বিত্ব একত্ব উপগত হইয়া জগৎস্থিতির বিস্তারক হয় এবং সেই জগৎস্থিতিতে নিজেই ভিন্ন ভিন্ন ভাব ধারণ করিয়া থাকে। ফলে এই যে বিশাল বিশ্ব সঙ্কল্পময়রূপে দেখা যায়, ইহা সত্য বা মিথ্যা কিছুই নহে। ইহা অবিকল স্বপ্নপরম্পরার ন্যায় প্রতিভাত। জীবের চিত্তকল্পিত রাজ্য যেমন বিবিধাড়ম্বরে পরিস্ফুরিত হইয়া উঠে, হিরণ্যগর্ভের এই বিশাল মনোরাজ্যও তেমনি ভাবে বিরাজ করে। যখন তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়, তখন এতৎসমস্ত যথাবস্থ ব্রহ্মরূপেই পরিণত হইয়া থাকে। সে কালে আর এ সকলের কিছুরই অস্তিত্ব থাকে না। পরমার্থ দর্শনে এ দৃশ্য প্রপঞ্চ কিছুই দেখা যায় না, আর যদি ভ্রান্ত দৃষ্টিতে দেখা যায়, তবেই উহাকে শত শত শাখায় প্রসারিতরূপে প্রতীত হইয়া থাকে। যেমন আবর্ত্ত ও তরঙ্গাদি নানাকার ধারণপূর্ব্বক একমাত্র জলরাশিই সমুদ্ররূপে প্রতিভাত হয়, তেমনি উল্লিখিত মনও নানাবিধ সঙ্কল্পগুণে নানাকার ধারণ করিয়া থাকে। লোকে সহস্র কর্ম্ম করিলেও যদি চিদাভাসময় মনের স্পন্দ না হয়, তবে আর কোনরূপেই বিকারগ্রস্ত হয় না। তাই বলিতেছি, তুমি ভেদবুদ্ধি বিসর্জ্জন দাও; গমন, শ্রবণ, স্পর্শন, ঘ্রাণ, আলাপ-আপ্যায়ন, নিদ্রা বা অন্যান্য ব্যবহার, সকল প্রকার অবস্থাতেই এইরূপ ভাবনা কর যে, আত্মায় কোনও বিকার নাই। তিনিই সত্য, নির্ম্মল, অদ্বিতীয়। এইরূপ ভাবনা করিতে করিতে তুমি যাহাই করিতে থাকিবে, তাহাকেই নির্ম্মল চিন্মাত্র বলিয়া বুঝিবে। সেই বিশালাকৃতি ব্রহ্মই আছেন, তদ্ভিন্ন আর কিছুই বিদ্যমান নাই। সম্বিৎই যখন জাগতিক সর্ব্ব বস্তুর একমাত্র সার, তখন এই নিখিল

জগৎ সেই এক সম্বিৎ বৈ আর কিছুই নহে। ইহাতে কোনই কল্পনান্তর নাই। এই জগৎপ্রপঞ্চ সেই এক সম্বিদেরই স্ফুরণ মাত্র! অতএব ইহা অন্য, উহা ভিন্ন, এই প্রকার বৃথা অসত্য ভাবনা কি জন্য? যে কিছু পদার্থপরম্পরা পরিদৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে একমাত্র সম্বিৎই প্রমাণসিদ্ধ সত্য পদার্থ। ইহাতে সম্বেদ্য কিছুই নাই এবং বন্ধ বা মোক্ষনামেও কোন কিছুর সম্ভাবনা নাই। তাই বলিতেছি, রাম! তুমি ইহা বন্ধ, ইহা মোক্ষ, এই প্রকার অলীক ভাবনার সমূলে সমুৎপাটন কর এবং মৌনী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া বিরাজ করিতে থাক। তোমার অভিমান-গর্ব্ব তিরোহিত হউক। তুমি নিরহঙ্কার ও মহাত্মা হইয়া সর্ব্ব কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে থাক।

চতুর্দ্দশাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১১৪ ॥

পঞ্চদশাধিক শততম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে নিষ্পাপ রঘুবর! তুমি সর্ব্বাশঙ্কা পরিত্যাগ করিয়া শাশ্বত ধৈর্য্যাবলম্বন কর এবং মহাকর্ত্তা, মহাভোক্তা ও মহাত্যাগী হইয়া বিরাজ করিতে থাক।

রামচন্দ্র কহিলেন,—ভগবন্! কে মহাকর্ত্তা, কে মহাভোক্তা এবং কাহাকেই বা মহাত্যাগী নামে অভিহিত করা হয়? এতৎসমস্ত আমার নিকট যথাযথ ব্যক্ত করুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র! উল্লিখিত ব্রতত্রয় পূর্ব্বে ভগবান্ চন্দ্রশেখর ভৃঙ্গীশের নিকট বলিয়াছিলেন। ভৃঙ্গীশ এই ব্রতত্রয়ের অনুষ্ঠান করিয়া পরে বিজ্বর হইয়াছিলেন। তিনি প্রথমে আত্মজ্ঞান কি, তাহা জানিতে পারেন নাই; তাই একদা কৃতাঞ্জলিপুটে উমাপতিকে প্রণামপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—হে দেব! হে প্রভো পরমেশ! আপনি সর্ব্বতত্ত্বে অভিজ্ঞ; তাই ভবৎসমীপে আমি কিঞ্চিৎ জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি দয়া করিয়া তাহার উত্তরদানে আমায় অনুগৃহীত করুন। হে নাথ!

আমি অদ্যাপি তত্ত্ববিশ্রান্তি প্রাপ্ত হইতে পারি নাই। সুতরাং তরঙ্গ-তরলিত সংসাররচনা দেখিয়া আমি একান্তই মুগ্ধ হইয়াছি। এই জগৎ যেন একটা জীর্ণ ভবন; ইহার উপর কিরূপ ধারণা সুদৃঢ় ভাবে রাখিয়া আমি বিজ্বর ও সুস্থ হইতে পারি, তাহা এক্ষণে আমায় বলিয়া দিন।

ঈশ্বর কহিলেন,—তুমি সকল শঙ্কা পরিত্যাগ ও শাশ্বত ধৈর্য্য অবলম্বন কর। পরে মহাভোক্তা, মহাকর্ত্তা ও মহাত্যাগী হইয়া বিরাজ করিতে থাক।

ভৃঙ্গীশ কহিলেন,—প্রভো! মহাভোক্তা কে? মহাকর্ত্তাই বা কাহাকে বলা হয় এবং কাহাকেই বা মহাত্যাগী নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে? এ সকল আমার নিকট বিশদভাবে বর্ণন করুন।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে মহাভাগ! যিনি শঙ্কাশূন্য হইয়া যথোপস্থিত ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম উভয়েরই অনুষ্ঠান করেন, তাঁহাকেই মহাকর্ত্তা বলা হয়। অপিচ যিনি কোন অপেক্ষা না রাখিয়া রাগ, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম ও ফলাফল একই ভাবে সম্পাদন করিয়া যান, তিনিও মহাকর্ত্তা নামে নিরূপিত। যিনি মৌনাবলম্বন করিয়া অহঙ্কার, বিদ্বেষ বা উদ্‌যোগ-বিরহিত ভাবে কার্য্য করিতে থাকেন, তাঁহাকেও মহাকর্ত্তা বলা যায়। শুভ কার্য্য করিলেই ধর্ম্ম হয় আর অশুভ কার্য্য করিলেই অধর্ম্ম হয়, এইরূপ কদর্য্য আশঙ্কায় যাঁহার বুদ্ধি লিপ্ত নয়, তাঁহাকে মহাকর্ত্তা নামে অভিহিত করা হয়। সর্ব্বত্র যিনি স্নেহরহিত ও ইচ্ছাবর্জ্জিত হইয়াছেন; সর্ব্বাবস্থায় যাঁহার উদাসীনভাবে অবস্থিতি, তিনিই বটে মহাকর্ত্তা। যাঁহার কোন উদ্যোগ নাই, আনন্দ নাই, যিনি সর্ব্বত্র সম স্বচ্ছ বুদ্ধি ধারণ করেন, যাঁহার শোক নাই, অভ্যুদয়ও নাই, তাঁহাকেই মহাকর্ত্তা আখ্যায় অভিহিত করা হয়। যিনি মুনি হইয়াছেন, যাঁহার মতি সত্যপদে নিবিষ্ট হইয়াছে, যিনি কুত্রাপি আসক্ত নহেন, এবং যে কর্ম্ম যখন উপস্থিত হয়, তাহারই অনুরূপ চেষ্টা করিতে থাকেন, তাঁহাকেই মহাকর্ত্তা বলিয়া ব্যাখ্যা করা হয়। যে জন উদাসীনভাবে অবস্থান করেন; অন্যের প্রেরণায় কখন কখন কর্ম্মকর্ত্তা হইয়া সমবুদ্ধি যোগে কর্ম্ম ও অকর্ম্ম উভয়ই করিয়া যান, এবং

অন্তরে অন্তরে সমভাব লইয়াই অবস্থান করিতে থাকেন, তাঁহাকেই মহাকর্ত্তা বলা যায়। যে ব্যক্তি, স্বভাবতঃ শান্তভাবাপন্ন; শুভাশুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠানে সমতা যাঁহার কখনও পরিত্যক্ত হয় না, তাঁহাকেই মহাকর্ত্তা নামে অভিহিত করা হয়। জন্ম, স্থিতি, নাশ, উদয় বা অস্ত, সকল অবস্থাতেই যাঁহার মন সমভাবাপন্ন, তাঁহাকেই মহাকর্ত্তা বলে। যিনি কোন কিছুতেই দ্বেষ করেন না, আকাঙ্ক্ষা রাখেন না; যথালব্ধ সকল বিষয়ই ভোগ করিয়া যান, তাঁহাকেই মহাভোক্তা নামে নিরূপিত করা হয়। যিনি কোন কিছু গ্রহণ করিয়াও করেন না, কার্য্য করিলেও তাহাতে যাঁহার কর্ত্তৃত্ব নাই; বিষয় ভোগ করিয়াও যিনি ভোগ করেন না, তিনিই মহাভোক্তা নামের যোগ্য। যাঁহার বুদ্ধি খিন্ন নহে, যিনি নিরিচ্ছ হইয়া উদাসীনবৎ নিখিল লোকব্যবহার পরিদর্শন করেন, তাঁহাকে মহাভোক্তা বলা হয়। সুখ, দুঃখ, জয়, পরাজয়, ভাব কিম্বা অভাব, কোন কিছুতেই যাঁহার বুদ্ধি কখন বিচলিত হয় না, তিনিই বটে মহাভোক্তা। জরা আসুক, মৃত্যু হউক, বিপদ আসুক, রাজ্যলাভ হউক, অথবা দারিদ্র্য আসিয়া আশ্রয় করুক, সকলই যাঁহার নিকট রমণীয় বলিয়া বোধ হয়, তাঁহাকে মহাভোক্তা বলা যায়। সাগর যেমন ভাল মন্দ সকল স্থানের সকল প্রকার জলই নির্ব্বিকারভাবে গ্রহণ করে, সেইরূপ মহাসুখই হউক, আর মহাদুঃখই আসিয়া উপস্থিত হউক, সকলই যিনি সমান জ্ঞানে গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাঁহাকে মহাভোক্তা নামে নির্দ্দেশ করা হয়। যেমন চন্দ্রমণ্ডলে কিরণ-রাহিত্য নাই, তেমনি অহিংসা, সমতা ও তুষ্টি এই তিনটী পদার্থ যাঁহার নিকট হইতে কোন সময়ের জন্যই চলিয়া যায় না, তাঁহাকেই মহাভোক্তা বলা যায়। খাদ্য বস্তু কটু, তিক্ত, লবণ, অম্ল, মধুর, উত্তম কিম্বা অপকৃষ্ট, যাহাই কেন হউক না, যিনি সমানজ্ঞানে সমাস্বাদে অবাধে সে সকল ভোজন করিয়া থাকেন, তাঁহাকেই মহাভোক্তা বলিয়া অভিহিত করা হয়। কোন কিছু সরস হউক বা নীরস হউক, অথবা কুক্রীড়া বা সুক্রীড়ার বিষয় হউক, সকলই যাঁহার চক্ষে সমানরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে, তাঁহাকেই মহাভোক্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়। লবণাক্ত বস্তুই হউক, কিম্বা শর্করা-সম্বলিত সুরস সুমিষ্ট ভোজ্যই হউক, অথবা শুক্ত

বা অশুভাগমনই ঘটুক, সর্ব্বত্রই যাঁহার সমান রুচি—সমান ব্যবহার, তাঁহাকেই মহাভোক্তা বলা যায়। ইহা খাদ্য, আর ইহা খাদ্য নহে, এই প্রকার কল্পনা পরিত্যাগপূর্ব্বক যে ব্যক্তি নিস্পৃহভাবে সর্ব্ববিধ খাদ্য সামগ্রীই সমজ্ঞানে অম্লান-বদনে গলাধঃকরণ করে, তাহারই নাম মহাভোক্তা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। সম্পদ, বিপদ, আনন্দ, নিরানন্দ, মোহ, কিম্বা দুঃখ—সকলই যিনি সমানভাবে সহ্য করিয়া যান, তাঁহাকেই মহাভোক্তা নাম প্রদান করা হয়। ধর্ম্মাধর্ম্ম, সুখ-দুঃখ, জন্ম-মৃত্যু, এ সমুদায়ের প্রতি মিথ্যাবোধ বদ্ধমূল হওয়ায় ঐ ঐ বিষয়ে যাঁহার আস্থা একেবারেই নাই, তাঁহাকেই মহাত্যাগী নামে নির্দ্দেশ করা হয়। যিনি বুদ্ধিপূর্ব্বক সর্ব্ব-বিষয়িণী ইচ্ছা, সর্ব্ববিষয়িণী শঙ্কা, সর্ব্ববিধ চেষ্টা ও সকল প্রকার নিশ্চয় পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহাকেই মহাত্যাগী নামে অভিহিত করা হয়। দৈহিক ও মানসিক দুঃখের সঙ্গে সঙ্গে যিনি দেহ, মন ও ইন্দ্রিয়াদির সত্তা পরিত্যাগ করিতে পারিয়াছেন, তিনিই মহাত্যাগী নামের যোগ্য হইয়া থাকেন। এ দেহ আমার নয়, জন্মও আমার নাই, শুভ বা অশুভ কোন প্রকার কর্ম্মও আমার নাই, এই প্রকার সিদ্ধান্ত যাঁহার অন্তরে সমুদিত হইয়াছে, তাঁহাকেই মহাত্যাগী বলা যায়। ধর্ম্ম, অধর্ম্ম কিম্বা সর্ব্ববিধ মানসী চেষ্টা যিনি অন্তর হইতে সম্পূর্ণ নিরাকৃত করিয়াছেন, তাঁহাকেই মহাত্যাগী নামে নির্দ্দেশ করা হয়। এই সমস্ত পরিদৃশ্যমান দৃশ্য কল্পনা যিনি সম্পূর্ণ পরিহার করিতে পারিয়াছেন, তাঁহাকেই মহাত্যাগী নামে নিরূপিত করা হয়।

হে নিষ্পাপ! দেবদেব শঙ্কর পূর্ব্বকালে ভৃঙ্গীশকে এইরূপই উপদেশ দিয়াছিলেন। তাই বলিতেছি, রামচন্দ্র! তুমি ঐরূপ যুক্তিরই আশ্রয় লও এবং গতজ্বর হইয়া অবস্থান করিতে থাক। জানিবে—একমাত্র ব্রহ্মই বিদ্যমান। তিনি নিত্যোদিত, অনন্ত, আদ্য ও নির্ম্মল-স্বভাব। সেই ব্রহ্ম ভিন্ন কল্পনান্তর নাই; অন্তরে তুমি এইরূপই ভাবনা করিতে থাক। এই প্রকার ভাবনার প্রাবল্যে তোমার নিখিল স্মৃতি শান্ত হইবে ও নির্ম্মল ভাব গ্রহণ করিবে। এইরূপে তুমি নিরঞ্জন ভাব লাভ কর। অচিরেই নির্ব্বাণ লাভ করিতে পারিবে। নিরাময় ব্রহ্মই সর্ব্বকল্প-প্রসিদ্ধ; তিনিই

পরমার্থ-স্বরূপ। নিখিল কার্য্যকলাপের মূল কারণ বলিতে তাঁহাকেই বলা হয়। তিনি সৃষ্টিভেদে বিবিধ বিশাল ভাব পরিগ্রহ করিলেও বাস্তব পক্ষে তাঁহাকে সর্ব্ববিধ বিকল্প-বিরহিত আকাশ বলিয়াই জানিতে হয়।

হে সাধুশীল! যখন সদেক-রস ব্রহ্ম হইতে অন্য কোনই সৎ বা অসৎ বস্তুর সম্ভাবনা কখনও কোথাও নাই। তখন 'আমিই সেই ব্রহ্ম' অন্তরে তুমি এইরূপ দৃঢ় নিশ্চয়বান্ হও; অন্তঃকরণের সমস্ত ব্যাপার অন্তরেই সদা রাখিয়া দাও। ঐ অবস্থায় সমস্ত বাহ্য কার্য্য তুমি নির্ব্বাহ করিতে থাক। এই প্রকারে অবস্থিত হইলে দেখিবে,—কিছুতেই তোমার খেদ জন্মিবে না; তোমার অহঙ্কার ইহাতেই অপগত হইয়া যাইবে।

পঞ্চদশাধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১১৫ ॥

ষোড়শাধিক শততম সর্গ।

রামচন্দ্র কহিলেন,—হে সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ, ভগবন্! অহঙ্কারাভিধেয় চিত্ত যদি বিগলিত হইয়া যায়, অথবা গলিত হইতে উন্মুখ হইয়া উঠে, তাঁহা হইলে মনের বাসনার অবসান হইল, এরূপ লক্ষণ কিরূপে অনুমান করা যায়?

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! জল যেমন কমলদলে লিপ্ত হয় না, তেমনি লোভ-মোহাদি দোষগুলি পরীক্ষার নিমিত্ত অপর কেহ সবলে সম্পাদিত করিয়া দিলেও যে চিত্ত বিশুদ্ধ, তাহাতে তাহা সংসক্ত হইবার নহে। অহঙ্কারময় চিত্ত যখন গলিয়া যায়, দুষ্কৃত যখন ক্ষয় পায়, তখন যোগীর মুখে মুদিতাদি শ্রীসকল সদাই বিরাজ করিতে থাকে। সে কালে বাসনাগ্রন্থি ছিন্ন হইয়া যায়, ক্রোধ ক্ষয় প্রাপ্ত হয় এবং মোহ মন্দীভূত হইতে থাকে। তখন কাম ক্লান্ত হইয়া পড়ে; লোভ কোথায় পলাইয়া যায়; ইন্দ্রিয়গ্রাম বাহ্য বিষয়ে তেমন আর সদর্পে উল্লসিত হয় না; ক্লেশ-লেশ কিছুমাত্রই রহে না; দুঃখ আর বাড়ে না, কোন সুখও হৃদয়কে আসিয়া অধিকার করে না। তখন শমগুণপরিপোষিণী সর্ব্বসমতার

অভ্যুদয় হয়; সে আসিয়া হৃদয়ে বাস করিতে থাকে। সেই অবস্থায় যোগীর বাহ্যভাবে কখন কখন সুখ-দুঃখাদি আসিয়া উপস্থিত হয়। কিন্তু তাহা অকিঞ্চিৎকর বলিয়া অন্তরে লিপ্ত হয় না। চিত্ত যখন বিগলিত হইয়া যায়, তখন যোগী ব্যক্তি স্বর্গবাসীদিগেরও স্পৃহণীয় হইয়া উঠেন। সে কালে তাঁহার অন্তরে সমতারূপিণী শীতল চন্দ্রিকার অভ্যুদয় হয়। তদীয় দেহ কান্ত, উপশান্ত, সেবার্হ ও অপরের ইচ্ছার অবিরোধী হইয়া উঠে। তিনি বিশুদ্ধদেহ ও বিনীত হইয়া থাকেন। উল্লিখিত যোগী ব্যক্তির আকৃতি দূর হইতে মহৎ বলিয়াই উপলব্ধ হয়। এই দৃশ্যমান সংসারভ্রম কখন ঐশ্বর্য্য, কখন দারিদ্র্য, এইরূপ বিরোধী ভাবে বিষম বিচিত্ররূপেই প্রতিভাত। ইহা সাধুসম্প্রদায়ের আনন্দ বা খেদ কিছুরই উৎপাদক হইতে পারে না। আত্মবস্তু একমাত্র জ্ঞানালোকেই লভ্য; উহাতে বিপদাশঙ্কা কিছুমাত্রই নাই। যে ব্যক্তি মোহের বশে এ হেন বস্তু লাভ করিবার জন্য যত্ন প্রকাশ না করে, তাদৃশ নরাধম ধিক্কারেরই যোগ্য।

রামচন্দ্র! যিনি চির-বিশ্রামলাভের নিমিত্ত এই দুঃখময় ভব সাগর উত্তীর্ণ হইতে সমুৎসুক হন, 'কে আমি? কোথা হইতে আসিলাম? এই জগৎটা কি? কিরূপে ইহার আবির্ভাব? ইহার অবসানই বা কি প্রকার? বিষয়ভোগ করিয়া কিরূপ লাভেই বা লাভবান্ হওয়া যায়?' এই প্রকার বিবেকোজ্জ্বলা বুদ্ধিই তাঁহার পক্ষে বিশিষ্ট উপায় বলিয়া অভিহিত হয়।

ষোড়শাধিক শততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১১৬ ॥

সপ্তদশাধিক শততম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে ইক্ষ্বাকু-বংশ-সম্ভব! ইক্ষ্বাকু নামে জনৈক নরপতি তোমাদের পূর্ব্বপুরুষ ছিলেন। তিনি যেরূপে মুক্তিলাভ করেন, তাহা তোমায় বলিতেছি, শ্রবণ কর। নরপতি ইক্ষ্বাকু নিজ রাজ্যপালনে

ব্যাপৃত ছিলেন। একদা তিনি নির্জ্জনে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে তাঁহার অন্তরে চিন্তার উদ্রেক হইল। তিনি ভাবিলেন,—এই ত দৃশ্য-প্রপঞ্চ,—এই ত সংসার! ইহাতে অনবরত জরা, মরণ, সুখ-দুঃখ আসিতেছে, যাইতেছে। ইহার কারণ কি? ঐ দৃশ্যপ্রপঞ্চের যিনি উদ্ভাবক, কে তিনি?

রাজা ইক্ষ্বাকু নিজে নিজে এইরূপ অনেক ভাবিলেন; ভাবিয়াও জগতের কারণ নির্ণয়ে সক্ষম হইলেন না। একদা প্রজাপতি মনু ব্রহ্মলোক হইতে আসিয়া তদীয় সভায় উপস্থিত হইলে ইক্ষ্বাকু তাঁহাকে যথাযোগ্য পূজা করিলেন। অনন্তর ভগবান্ মনু সংকৃত হইয়া সুখাসীন হইলে ইক্ষ্বাকু জিজ্ঞাসিলেন,—হে প্রভো, করুণানিধে! আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার আলয়ে আসিয়াছেন, ইহাতে আমি বিশেষ গৌরবান্বিত হইয়াছি। আপনার এই অনুগ্রহই আমার ধৃষ্টতা জন্মাইয়াছে; তাই আমি ভবৎ-সমীপে প্রশ্ন করিতে সাহসী হইয়াছি। আমার প্রশ্ন এই যে, এই সৃষ্টি-বিস্তার কোথা হইতে আসিল? ইহার স্বরূপ কি প্রকার? এই সৃষ্ট জগতের পরিমাণ ফল কত? কাহার ইহা? কে ইহার সৃষ্টিকর্ত্তা? কঠিন জালবন্ধনে আবদ্ধ বিহঙ্গেরা যেমন কোনরূপ উৎকৃষ্ট উপায় প্রাপ্ত হইলে সে বন্ধন হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারে, তেমনি আমি কীদৃশ উপায় অবলম্বন করিয়া এ বিষম সংসার-ভ্রম হইতে মুক্তি লাভ করিব?

মনু কহিলেন,—আহা, বড় সুখের কথা! অদ্য অনেক কালের পর তোমার বিবেক বিকাশ পাইয়াছে। তোমার এ প্রশ্ন উত্তম হইয়াছে। এ প্রশ্নের উত্তর শুনিয়া নিশ্চয়ই তুমি এই অনর্থ-সঙ্কট হইতে মুক্তি পাইতে পারিবে। হে ভূপতে! এই যাহা কিছু পরিদৃশ্যমান হইতেছে, ইহার কিছুই কিছু নহে; সকলই মিথ্যা। যেমন গন্ধর্ব্ব নগর অথবা যেমন মরুস্থলী-স্থিত সলিল, তেমনি ইহা প্রতীয়মান। কেহ বলেন,—কার্য্য বস্তু উপাদান-পদার্থে অতি সূক্ষ্মাকারে বিরাজ করে, পরে নিমিত্ত বশতঃ প্রকাশ পাইয়া থাকে। কিন্তু এই প্রকার উক্তি সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না; কেন না, তথাবিধ সূক্ষ্ম অলক্ষিত কার্য্য ইন্দ্রিয়ের গোচরীভূত হয় না। অতএব তাহা যে আছে, এ কথা বলিব কেমন করিয়া? মন ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়; তাহার

অগোচর কোন পদার্থই নাই। যাহা তাহার অগোচরে বিদ্যমান, তাহা একমাত্র অবিনশ্বর সত্য পদার্থ। সেই পদার্থই আত্মা আখ্যায় অভিহিত। এই যে নিখিল দৃশ্য-পরিব্যাপ্ত সৃষ্টি-পরম্পরা বিদ্যমান, ইহা সেই আত্মরূপী মহামুকুরেরই প্রতিবিম্ব বৈ আর কিছুই নহে। সেই আত্মার স্ফুরণ-শক্তিই প্রকাশাকারে প্রাদুর্ভূত হইয়া কিয়দংশ ব্রহ্মাণ্ডভাবে বিভাত হয়, আর কিয়দংশ ভূতভাব ধারণ করিয়া থাকে। আত্মার সেই স্ফুরণশক্তি অগ্রে তাঁহা হইতে ভিন্নভাব লাভ করে;—পরে সেই ভিন্ন ভাব হইতেও ভিন্ন ভাবের বিকাশ হয়। এইরূপেই জগতের আবির্ভাব হইয়া থাকে। যিনি ব্রহ্ম বা আত্মা, তিনি সর্ব্বদাই সেই এক নির্ব্বিকার ভাবেই অবস্থিত। তাঁহার বন্ধন মোচন নাই, একত্ব দ্বিত্ব নাই। কেবল সম্বিৎ-সারই বিরাজমান। যেমন একই জল—তরঙ্গ, বুদ্বুদ ও আবর্ত্তাদি ভেদে ভিন্নাকারে প্রতীয়মান হয়, তেমনি একমাত্র আত্মা আছেন,—তিনিই এই দৃশ্যমান নানাকারে প্রকাশ পাইতেছেন। সেই চিদতিরিক্ত কিছুই নাই। তাই বলিতেছি, তুমি বন্ধ মোক্ষ কল্পনা দূরে পরিহারপূর্ব্বক সংসারশঙ্কা হইতে নির্ম্মুক্ত হও এবং স্বস্থ হইয়া ব্রহ্মরূপেই বিরাজ করিতে থাক।

সপ্তদশাধিক শততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১১৭ ॥

অষ্টাদশাধিক শততম সর্গ।

মনু বলিলেন,—রাজন্! ঐ যে বিশুদ্ধ চৈতন্যের কথা কহিলাম, উহাঁরই অবিদ্যা-বিম্বিত চৈতন্যাংশ সঙ্কল্প-ব্যাপারে উন্মুখ হইয়া উঠে। জলের তরঙ্গাকার ধারণের ন্যায় উক্ত প্রতিবিম্ব-চৈতন্যই জীবভাব ধারণ করে। জীবগণ সেই চিৎপ্রতিবিম্ব হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়া এ সংসারে বিস্তৃত হইয়া থাকে। জীবগত সুখ-দুঃখ দশা সকলই মনের ধর্ম্ম; উহারা আত্মার কেহই নহে। রাহুকে অন্য সময়ে দেখা যায় না, যখন চন্দ্রগ্রহণ ঘটে, তখনই উহাকে প্রত্যক্ষ করা যায়। এই দৃষ্টান্তে বুঝিতে

হইবে—অনুভবস্বরূপ আত্মা প্রকৃত পক্ষে দৃষ্টিগোচর না হইলেও অন্তঃকরণরূপ দৃশ্যপটেই তিনি দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকেন। কি শাস্ত্রালোচনা, কি গুরূপদেশ, কোন কিছুতেই সেই পরমেশ আত্মা প্রত্যক্ষ হইবার নহেন। যখন বুদ্ধি বিশুদ্ধ হইয়া উঠে, আমি আমার ইত্যাকার ভাব বুদ্ধি হইতে অন্তর্হিত হয়, তখনই তিনি স্বতই প্রত্যক্ষ হইয়া থাকেন। পথিক জনের প্রতি লোকের যেমন অনুরাগ বা বিরাগ থাকে না, তেমনি রাগ-দ্বেষহীন বুদ্ধিযোগেই নিজের ইন্দ্রিয়বর্গকে অবলোকন করিতে হইবে। সাধুজন ইন্দ্রিয়গ্রামের প্রতি সমাদর প্রদর্শন করেন না এবং কঠোরতা অবলম্বন করিয়া তাহাদিগকে উৎপীড়িতও করেন না। তিনি মনে করেন,—ইন্দ্রিয়গণ সর্ব্বপদার্থে একই ভাবে আবিষ্ট হউক। ফল কথা, বিষয় সুখজনক বা দুঃখ-জনক যাহাই হউক, সর্ব্বত্রই সমানভাবে সমানসুখে বিরাজ করিতে থাকুক। এতাবতা উপদেশ এই যে, তুমি দেহাদি যাবতীয় বস্তুকে বুদ্ধিবিচারে দূরে পরিহার কর এবং শীতলান্তঃকরণে সতত আত্মময় হইয়া অবস্থিত হও। দেহে যে অহম্ভাববুদ্ধি, তাহাই সংসার-বন্ধনের মূল। কিন্তু মুমুক্ষু পুরুষ এরূপ বুদ্ধি কখনই পোষণ করেন না। আমি আকাশ হইতে সূক্ষ্ম চিন্মাত্রস্বরূপ; এরূপ বুদ্ধি সংসারের কারণ হইতে পারে না। সমুদ্রের অন্তরে বাহিরে সর্ব্বত্রই যেমন জল এবং সৌর কর যেমন সর্ব্বত্রই পতনশীল, তেমনি আত্মা সর্ব্ব বস্তুতেই বিরাজমান। কেয়ূর ও কটকাদি অলঙ্কার ভাব যেমন সুবর্ণেরই একটা সন্নিবেশমাত্র, তেমনি এই যে জগদাদি, ইহাও আত্মারই সন্নিবেশ-বৈচিত্র্য মাত্র বৈ আর কিছুই নহে। এই জগৎরূপ নদীনিচয় প্রাণিরূপ তরঙ্গসমূহে পরিপূর্ণ। ইহা মৃত্যুরূপ বাড়বাগ্নিযুত ভয়ানক কালসাগরে গিয়া পতিত হইতেছে। এইরূপে ঐ কালসাগর জগজ্জাল গ্রাস করিয়া অদ্যাপি অপূর্ণ রহিয়াছে। যিনি এ হেন সাগরকেও পান করিয়া থাকেন, তুমি সেই আত্মস্বরূপ অগস্ত্যাখ্য মহামুনিকে সতত চিন্তা করিতে থাক। দেহাদি দৃশ্য বস্তু সকল আত্মাতিরিক্ত; তুমি ঐ দেহাদি অবস্থায় আত্মবুদ্ধি পরিহারপূর্ব্বক বাসনা-বিরহিতভাবে যথাসুখে বিরাজ কর। অহো, জনসাধারণ কি অপূর্ব্ব মোহাচ্ছন্ন! যেমন কোন

মূঢ় জননী আপনার অঙ্কদেশে শিশু পুত্র থাকিলেও তাহাকে ভুলিয়া গিয়া 'হায় পুত্র কোথায় গেল' বলিয়া অনেক সময় ক্রন্দন করিয়া উঠে, তেমনি এ জগতের লোক সকলও 'আত্মা কোথায় গেল' বলিয়া আত্মার নিমিত্ত হাহারবে কাঁদিয়া বেড়ায়। কিন্তু তাহারা মোহের ছলনায় পতিত হইয়াই বুঝে না যে, সে নিজেও সাক্ষাৎ আত্মা। এই আত্মা অজর, অমর; মূঢ় লোকেরা ইহাঁকে জানিতে পারে না; তাই দেহ-বিরহকালে এই এই রূপে রোদন করিতে থাকে যে, আহা! আমি মরিলাম, আমি অনাথ হইলাম, আমার বলিতে এ জগতে আর কেহই নাই। বায়ুর সংযোগ-ঘটনায় জলের স্পন্দ হয়। সেই স্পন্দবশে জল যেমন নানাকারে লক্ষিত হইয়া থাকে, তেমনি সঙ্কল্পের চৈতন্যস্বরূপও নানাভাবে উপচিত হইয়া থাকেন।

হে বৎস! তুমি সঙ্কল্পরূপ কলঙ্ক শোধন করিয়া তাহাকে সেই একমাত্র আত্মাতেই যোজিত কর। নিজে উপশান্ত হও—মাত্র লৌকিক ব্যবহার নিষ্পাদনের জন্য কখন কখন স্পন্দনশীল হইয়া স্পন্দন-বিরহিত ব্রহ্ম বস্তুর ন্যায় সুখে অবস্থান কর এবং তদবস্থায় এই রাজ্য পালন করিতে থাক।

অষ্টদশাধিক শততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১১৮ ॥

ঊনবিংশত্যাধিক শততম সর্গ।

মনু কহিলেন,—ঐ পরমাত্মা স্বীয় প্রসবধর্ম্মিণী অবিদ্যাশক্তির বৈভবে অজ্ঞদৃষ্টিতে সৃষ্টিরূপ স্পন্দনযোগে বালকের ন্যায় ক্রীড়া করিয়া থাকেন। আবার জ্ঞানীর দৃষ্টিতে তিনি সংহারাত্মিকা শক্তির সাহায্যে আপনাতে সমস্ত সংহার করিয়া বিরাজ করেন। ইহাঁর সৃষ্টিশক্তি আপনা হইতেই আবির্ভূত; আর ইহাঁর যে সংসার-শক্তি, তাহাও আপনা হইতেই সমুৎপন্ন। রবি, শশী, তপ্ত লৌহ ও রত্নাদির কিরণ ভেদ, বৃক্ষের পত্র-পল্লব ও শাখাদির বৈশিষ্ট্য এবং নির্ঝরনীরের ইতস্ততঃ নিক্ষিপ্ত বিন্দুসমূহ যেমন ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া কল্পিত, তেমনি এই বিশাল বিশ্বও সেই বিশাল ব্রহ্মেই বুদ্ধি

প্রভৃতি দ্বারাই কল্পিত। এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্মস্বরূপ হইলেও অজ্ঞদিগের নিকট ইহা ব্রহ্মাতিরিক্ত পদার্থরূপে প্রতীত হইয়া দুঃখ প্রদান করে। বৎস! কি বলিব, চাহিয়া দেখ, কি বিচিত্র মায়ায় এ বিশ্ব আচ্ছন্ন রহিয়াছে! নহিলে মূঢ় জীব আপনার অঙ্গসংলগ্ন আত্মাকেও অবলোকন করিতে পারিতেছে না কেন? এই বিশ্ব সকলই একমাত্র চিদাদর্শময়; এই-রূপ ভাবনা করিয়া যে জন নিস্পৃহভাবে অবস্থান করিতে পারে, ব্রহ্মকবচ ধারণপূর্ব্বক তাহারই সুখাবস্থান হইয়া থাকে। ঐ কবচ ব্রহ্মাস্ত্রেও কখনই ভিন্ন হইবার নহে। 'অহ'-মিত্যাকার, অর্থবিরহিত অভাব-রূপ ভাব দ্বারা এ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সকলই—শূন্য; নিরালম্ব চিৎস্বরূপ বলিয়া ভাবনা করিবে। ইহা প্রিয়, ইহা অপ্রিয়, ইহা রম্য, উহা অরম্য, এবম্বিধ হেয় এবং উপাদেয় জ্ঞানই সুখ-দুঃখের মূলীভূত। যদি সাম্যরূপ অনল জ্বালিয়া উক্ত জ্ঞান দগ্ধ করা যায়, তবে আর কোথাও এ দুঃখ থাকিতে পারে কি? হে রাজন্! আমার উপদেশ শুন। তুমি নিজ পৌরুষ অবলম্বন কর—সমাধি অভ্যাস করিতে করিতে সর্ব্বদৃশ্য ভুলিয়া যাও। এই দৃশ্য-বিস্মৃতিরূপ অস্ত্রের সাহায্যে 'ইহা রম্য, আর ইহা রম্য নহে' এই প্রকার বৈষম্য-কল্পনাকে অন্তর হইতে একেবারেই উচ্ছেদ করিয়া ফেলো। কর্ম্মরূপ কানন বাহ্য-বস্তুর ভাবনাপ্রযোজক। তুমি বাহ্য বস্তুর অভাবনারূপ সমাধির সাহায্যে উল্লিখিত কাননকে উন্মূলন কর,—করিয়া পরমাকাশ হইতেও সূক্ষ্ম হও এবং তদবস্থায় শোক হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া অবস্থান কর।

হে তাত! তুমি প্রথমতঃ বিবেকের আশ্রয় লও। সমাধি সাহায্যে বাহ্য বস্তুর ভাবনা পরিত্যাগ কর। অনন্তর পরিপূর্ণ আত্মস্বরূপে এই বিশাল বিশ্ব ব্যাপিয়া বিরাজ করিতে থাক। যাহা অনন্ত, অপরিচ্ছিন্ন, ব্রহ্মানন্দ, তাহা লাভ করিয়া তুমি সংসার-পীড়া হইতে পরিমুক্ত হও। অখণ্ড ব্রহ্মের সহিত তোমার একীভাব হউক এবং সেই অবস্থায় তুমি পঞ্চমী ও ষষ্ঠী ভূমিকায় আরোহণ কর। অনন্তর তুমি সপ্তমী ভূমিকায় উপনীত হইবে। তোমার বিক্ষেপ-বৈষম্য সম্পূর্ণ অপগত হওয়ায় সে কালে পূর্ণচন্দ্রের চন্দ্রিকাসম স্বচ্ছ শুভ্র চিদাকারে তুমি অবস্থান করিবে।

ঊনবিংশত্যধিক শততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১১৯ ॥

মনু কহিলেন,—অগ্রে সৎসংসর্গে থাকিবে এবং শাস্ত্রালোচনায় বুদ্ধিবৃত্তিকে মার্জ্জিত করত বর্দ্ধিত করিয়া লইবে। ইহাই হইল যোগী পুরুষের যোগানুষ্ঠানের অগ্রিম ভূমিকা। অনন্তর দ্বিতীয় ভূমিকা; তাহার নাম বিচারণা। পরে তৃতীয় ভূমিকা; যাহা অসঙ্গ আত্মার ভাবনা, তাহাই তৃতীয় ভূমিকা নামে নিরূপিতা। পরে বাসনার বিলয়ে তত্ত্বসাক্ষাৎকার হয়; তখন অজ্ঞানাদি প্রপঞ্চের বাধ হইয়া যায়। এই অবস্থাই চতুর্থী ভূমিকা। অনন্তর যে বিশুদ্ধ চিন্ময় আনন্দরূপ অবস্থা, তাহাই পঞ্চমী ভূমিকা নামে অভিহিতা। যোগী পুরুষ ঐ অবস্থায় জীবন্মুক্তভাবে অর্দ্ধসুপ্তের ন্যায় অবস্থান করিয়া থাকেন। তৎপরে অনায়াসেই ব্রহ্মাকার অনুভূতিগোচর হয়। এই ব্রহ্মাকারের অনুভূতি-বৃত্তিই ষষ্ঠী ভূমিকা নামে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। ঐ সময় সুষুপ্ত জনবৎ আনন্দঘন-রূপে অবস্থিতি হয়। সর্ব্বশেষে তাদৃশ বৃত্তিও ক্ষয় পাইয়া যায়; একমাত্র ব্রহ্মই পরিপূর্ণ স্বপ্রকাশরূপে অবশেষে বিরাজ করেন। তখনকার সেই জীবিতাবস্থায় অবস্থানই সপ্তমী ভূমিকা বলিয়া বিখ্যাত। এই সপ্তমী ভূমিকার অবস্থাই তুরীয়াবস্থা। সপ্তমী ভূমিকার যে চরম অবস্থা, তাহারই নাম পরম নির্ব্বাণ। উহা তুরীয়াবস্থার অতীত অবস্থা। এই অবস্থা জীবিত ব্যক্তির পক্ষে ঘটিবার নহে। উল্লিখিত সপ্তবিধ ভূমিকার মধ্যে প্রথম ভূমিকাত্রয় জাগ্রদবস্থা। চতুর্থ ভূমিকা অবিকল স্বপ্নাবস্থা। কেন না, এ অবস্থায় এ জগৎ স্বপ্নবৎ প্রতীত হয়। পঞ্চমী ভূমিকা সুষুপ্তি অবস্থা; কেন না, সে কালে সুষুপ্তিকালের ন্যায় সকলই আনন্দময় বলিয়া অনুভূত হয়। ষষ্ঠী ভূমিকায় কিছুরই জ্ঞান থাকে না। তখনকার ঐ অবস্থা একপ্রকার তুরীয়াবস্থা। উহার পরবর্ত্তিনী অবস্থাই সপ্তমী ভূমিকা নামে নির্দ্দিষ্ট। এই অবস্থায় আত্মা স্বপ্রকাশরূপে বিরাজ করেন। আত্মার তখনকার সেই স্বপ্রকাশ অবস্থা বাক্য এবং মনের অগোচর। তখন সর্ব্বদৃশ্য আত্মায় বিলীন হইয়া যায়।

তাহাতে চৈত্যজ্ঞান সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়া থাকে। সে কালে সমস্তই সমান বলিয়া প্রতীয়মান হয়। যে যোগী ঐরূপ অবস্থায় উপনীত হন, তাঁহাকে নিঃসংশয়ে মুক্ত আখ্যা প্রদান করা যায়। সে কালে যোগীর বুদ্ধি পরিপূর্ণ হয়। তিনি ভোগে, সুখে বা দুঃখে কিছুমাত্র উৎফুল্ল বা বিচলিত হন না। সে অবস্থায় তাঁহার দেহ থাকিতেও পারে কিম্বা না থাকিতেও পারে। সে কালে যোগী পুরুষ না মৃত, না জীবিত, না সৎ, না অসৎ, এইরূপ ভাবেই বিভোর হন এবং আত্মারাম হইয়া বিরাজ করিতে থাকেন। তাঁহার তখনকার সেই অবস্থাকেই মুক্তি বলা যায়। সে কালে তিনি ব্যবহার-কার্য্যে লিপ্ত থাকুন, সমাধি-সাধনায় অবস্থান করুন, পরিজনবর্গে পরিবৃত হইয়াই থাকুন, আর নির্জ্জনে একক হইয়াই বাস করুন, সকল প্রকার অবস্থাতেই 'আমি অন্য কিছুই নহি, আমি একমাত্র চিৎই' এইরূপ জ্ঞান তাঁহার হইয়া থাকে। সুতরাং শোক-সন্তাপ কখনই তিনি ভোগ করেন না। তিনি বুঝিয়া রাখেন,—আমি নির্লেপ; আমার রাগ নাই, বাসনা নাই, আমি অজর, অমল, চিদাকাশ। তখন তাঁহার এইরূপই ধারণা বদ্ধমূল হয় যে, আমার আদি নাই, অন্ত নাই, আমি শুদ্ধ, বুদ্ধ, শান্ত, সম, চিদাকার। ঐরূপ ধারণায় তন্ময় থাকেন বলিয়াই তিনি তখন কিছুতেই শোকসমাকুল হইয়া পড়েন না। দেবে, মনুষ্যে, গজে, সূর্য্যে, আকাশে এবং তৃণাগ্রে সকল পদার্থেই যিনি বিরাজ করেন, সেই নিত্য চিন্ময় বস্তু আমিই; যোগী তখন এইরূপ জ্ঞানেরই আশ্রয় লইয়া আর কখনই শোক-সন্তপ্ত হন না। যাঁহার অনন্ত বিলাস; সেই চিন্ময় বস্তুর মহত্ত্বই আমার ঊর্দ্ধ, অধঃ ও পার্শ্বদেশ ব্যাপিয়া বিরাজমান। এইরূপ জ্ঞান যখন লাভ করা যায়, তখন আর কি ক্ষয়প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকে? বাসনার সহিত বিষয় ভোগ করিলে সে ভোগ সুখজনক হইয়া থাকে, আর তাহার অভাব ঘটিলেই দুঃখের কারণ হয়। এই ভাবে সুখের এবং দুঃখের বাসনা সহ অবস্থানই প্রথিত। যদি বাসনারে ক্ষীণ করিয়া অথবা সম্পূর্ণরূপে বাসনাবিরহিত হইয়া বিষয় ভোগ করা যায়, তাহা হইলে সে ভোগ আর সুখজনক হয় না এবং বিষয়ের অভাব ঘটিলেও সে কালে তাহা দুঃখের কারণ হয় না।

তাই বলিতেছি,—হে নিষ্পাপ! তুমি যে কার্য্যই করিবে, তাহা বাসনারে সম্পূর্ণ বিসর্জ্জন দিয়াই করিবে। তোমার বুদ্ধিতে তখন যেন বাসনার সম্পর্ক না থাকে। এইরূপ কার্য্য করিতে পারিলে, দগ্ধ বীজবৎ সে কার্য্যে তোমার আর বাসনাঙ্কুর জন্মিবে না। দেহেন্দ্রিয়াদি-যোগেই কর্ম্ম সম্পাদিত হয়; কাজেই যদি দেহাদির সহিত আত্মার অভিন্ন ভাব কল্পনা করা হয়, তবেই আমি কর্ত্তা, আমি ভোক্তা, এই উক্তি করা যাইতে পারে। কিন্তু আমি যখন এই দেহাদি হইতে সম্পূর্ণই পৃথক্, তখন আর আমার দেহাদি-কৃত কর্ম্মের কর্ত্তৃত্ব হইবে কিরূপে? যাঁহার তত্ত্বজ্ঞানের অভ্যুদয় হইয়াছে, তিনি দেহেন্দ্রিয়াদি বস্তু হইতে অহম্ভাব বা 'আমিত্ব' জ্ঞান দূরে অপসারিত করিয়া শশাঙ্কবৎ শীতল হন এবং স্বীয় পূর্ণ তেজে আদিত্যবৎ দেদীপ্যমান হইয়া থাকেন। দেহ যেন একটা শাল্মলি-তরু; কৃত বা ক্রিয়মাণ কর্ম্মগুলি উহার তূলরাশি; যদি একবার জ্ঞানরূপ পবন, বেগে পরিচালিত হয়, তাহা হইলে ঐ তূলরাশি কোথায়—কোন্ অজ্ঞাত দেশে উড়িয়া যায়। জীবের যত প্রকার জ্ঞানই থাকুক, অনভ্যাসে সকলই নষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু যাহা আত্মজ্ঞান, তাহা যদি একবার উৎপন্ন হয়, তবে আর নষ্ট হইবার নহে। যেমন সুক্ষেত্রে রোপিত ধান্য উপচয় প্রাপ্ত হয়, তেমনি দিন দিন ঐ জ্ঞান বরং বৃদ্ধিই পাইয়া থাকে। কূপ বল, তড়াগ বল, আর সমুদ্রই বল, সর্ব্বত্রই যেমন একমাত্র জল ব্যতীত কিছুই নাই, তেমনি সর্ব্ব পদার্থে এক সেই সর্ব্বগত সুনির্ম্মল আত্মাই বিদ্যমান। তিনিই সর্ব্বত্র স্ফুরণশীল। তাই বলিতেছি, হে তাত! এই সকল্পসম্ভব বহু বৈচিত্র্য একমাত্র ভ্রান্তির বশেই প্রতীয়মান। বস্তুতঃ এ সকলের কিছুই কিছুই নহে। এই যে জগৎ দেখিতেছ, জানিয়া রাখ, —ইহা সেই আত্মসত্তারই একাংশ মাত্র বৈ আর কিছুই নয়।

বিংশত্যধিক শততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১২০ ॥

একবিংশত্যধিক শততম সর্গ।

মনু কহিলেন,—রাজন্! যে পর্য্যন্ত বিষয়ভোগের আকাঙ্ক্ষা অপগত হইয়া না যায়, আত্মা ততদিন জীবনামে নিরূপিত হইয়া থাকেন। ঐ ভোগাশা অবিবেকবশেই জন্মিয়া থাকে; উহা বাস্তবিক নহে। যখন বিবেকের উদয় হয়, তখন ঐ ভোগাশা ক্ষয় পাইয়া যায়। আত্মা তখন জীবভাব পরিহারপূর্ব্বক নিরাময় ব্রহ্মভাবে উপনীত হইয়া থাকেন। তুমি ঊর্দ্ধ হইতে অধোদিকে অথবা অধঃ হইতে ঊর্দ্ধদিকে যথায় ইচ্ছা, যাও; কিন্তু বলিয়া রাখি, এ সংসার একটা আরঘট্ট-যন্ত্র; ইহার চিন্তারূপ রজ্জুযোগে বদ্ধ হইয়া তুমি যেন ঘটের ন্যায় চিরদিন ঘুরিতে থাকিও না। ইহা আমার, আমি উহার, এই এই প্রকার ব্যবহারই প্রগাঢ় ভ্রম; যাহারা মোহের বশে ঐরূপ ভ্রমে পতিত হয়, তাদৃশ শঠ ব্যক্তিরা পরপর অধঃ-পাতেই যাইয়া থাকে। আর যাঁহারা ঐ প্রকার মমত্ববুদ্ধি ও দেহাত্মবোধ পরিত্যাগ করিতে পারেন, তাঁহারা উত্তরোত্তর ঊর্দ্ধদেশেই উপনীত হইয়া থাকেন। অতএব হে নৃপ! তুমি স্বপ্রকাশ স্বীয় আত্মাকে অবিলম্বে অবলম্বন কর এবং এই সমগ্র জগৎকে একমাত্র চিদাকাশেই পূর্ণরূপে দেখিতে থাক। চিত্তের এই প্রকার অখণ্ড স্বরূপ যখনই অবগত হওয়া যায়, জীব তখনই সংসার-সঙ্কট হইতে সমুত্তীর্ণ হইয়া পরমেশ পদে প্রতিষ্ঠিত হয়। জীবের পক্ষে এইরূপ ভাবনা করাই সমুচিত যে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র ও বরুণপ্রমুখ বরেণ্য বিবুধগণ যে যে কার্য্য করিয়া থাকেন, আমি চিদাকাশ —আমিও সেই সেই কার্য্যই করিতেছি। যে যে দর্শনে যে যে মত প্রকটিত হইয়াছে, হে তাত! সেই সকল মতই সত্য; কেন না, চিৎস্বরূপ আত্মার লীলা নিরঙ্কুশ; সে লীলায় সকলই সম্ভবপর। চিত্ত পরিত্যাগের পর চিন্মাত্র-প্রাপ্ত জিতমৃত্যু যোগী ব্যক্তির যে অপার আনন্দ অভ্যুদিত হয়, সেই পরমানন্দের উপমাস্থল কোথায়? তুমি এই জগৎটাকে এমনই ভাবে ভাবনা কর যে, ইহা না শূন্য, না অশূন্য, না চিন্ময়, না অচিন্ময়, না আত্মরূপ, না আত্ম-ভিন্নরূপ। এইরূপ প্রকৃতি যখন স্বীয় পারমার্থিক পরমাত্ম-রূপের সাক্ষাৎকার করে, তখনই প্রশান্ত হইয়া যায়! ফলে, মোক্ষনামে

কোন দেশ নাই, কোন কাল নাই বা কোন ইতর স্থিতি নাই। যখন অহঙ্কার-মোহের ক্ষয় হইয়া যায়, তখন এই বাহ্য বিষয়ের ভাবনাখ্যা প্রকৃতি বিলীন হইয়া থাকে। এইপ্রকার প্রকৃতিবিলয়ই মোক্ষ আখ্যায় নির্দ্দিষ্ট। জীব এইরূপে যখন আত্মসাক্ষাৎকারে সমর্থ হয়, তখন তাঁহার শাস্ত্রার্থ লইয়া বিচারচাপল্য, নানা রসময়ী কাব্য-কৌতুক-কথা বা সর্ব্ববিধ বিকল্প-কল্পনা সকলই অন্তর্হিত হইয়া যায়। জীব সে কালে কেবল সম-শাশ্বতস্বরূপ হইয়া মহাসুখে বিরাজ করিতে থাকে।

একবিংশত্যধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১২১ ॥

দ্বাবিংশত্যধিকশততম সর্গ।

মনু কহিলেন—উল্লিখিত অবস্থায় যোগী যে কোন বসন পরিধান করুন, যাদৃশ বস্তুই ভোজন করুন অথবা যে কোন শয়নেই শয়ন করুন, তিনি সতত সম্রাটের ন্যায়ই বিরাজ করিতে থাকেন। প্রবল সিংহ যেমন পিঞ্জর ভাঙ্গিয়া বহির্গত হয়, তাদৃশী যোগী তেমনি সংসারব্যূহ ভেদ করিয়াই নির্গত হইয়াছেন। কাজেই বর্ণধর্ম্ম, আশ্রমধর্ম্ম, বা শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধ ইত্যাদি সমস্ত নিয়মেরই তিনি তখন বহির্ভূত হইয়া থাকেন। তাঁহার কোনরূপ বিষয়াশা থাকে না। তিনি যে আনন্দ উপভোগ করেন, তাহা কথায় ব্যক্ত করা যায় না। শারদীয় নভোমণ্ডলের যেমন স্বচ্ছ সুরম্য শোভা, তিনি তেমনই শোভা ধারণ করেন। পার্ব্বত্য মহাহ্রদের ন্যায় তিনি গভীর অথচ প্রসন্ন; তাঁহার চিত্ত পরমানন্দ-রসে আপ্লুত হয়। তিনি আপনিই আপনাতে রমণ করিতে থাকেন। সমস্ত কর্ম্মফলই তাঁহার পরিত্যক্ত হয়। তিনি সতত সন্তুষ্ট ও নিরলস হইয়া অবস্থান করেন। কি পাপ, কি পুণ্য, কিছুতেই তিনি লিপ্ত নহেন। যেমন স্ফটিকোপলে কোন কিছুরই চিহ্ন লিপ্ত হয় না, তেমনি কর্ম্মফল-জনিত সুখ বা দুঃখ কোন কিছুতেই সেই তত্ত্বজ্ঞ যোগীর চিত্ত আক্রান্ত হইবার নহে। তিনি জনসমাজে যথেচ্ছ বিহার করেন। কোন রূপে তাঁহার কোন অঙ্গ কর্ত্তিত হইলেও তিনি কখন ক্লেশ

বোধ করেন না, বা কোন স্থানে যদি তিনি পূজা প্রাপ্ত হন, তথাচ তাহাতে তাঁহার হর্ষ বোধও নাই। প্রতিবিম্বিত প্রতিকৃতি যেমন, তেমনই তিনি সর্ব্ব-ভাবে সর্ব্বকালে সমানরূপে অবস্থান করেন। তিনি পূজ্য ; তাই কেহ যদি তাঁহাকে পূজা করে, তবে তাহাতেও তিনি সেই পূজকের সুখ্যাতি করেন না বা বিশেষ একটা প্রীতি অনুভব করেন না, অথবা যদি কেহ তাঁহার পূজা নাও করে, তবে তাহাতেও তিনি মনে বিকার প্রাপ্ত হন না, বা তাদৃশ অসম্মান-কারীর প্রতি কিছুমাত্র অসন্তোষ প্রকাশ করেন না। তিনি সকল প্রকার আচার—সকল প্রকার নীতি পরিত্যাগ করেন, আবার সে সকল পরিত্যাগ করিয়াও করেন না। তাঁহাকে দেখিয়া কাহারও উদ্বেগ হয় না ; তিনিও কাহাকে কোনও শঙ্কা করেন না। তাঁহার আসঙ্গ, দ্বেষ, ভয় বা আনন্দ, এ সকল থাকিয়াও নাই। এমন কোন নিপুণবুদ্ধি লোক নাই, যিনি সেই মহাপুরুষের অগাধ মহিমার পরিমাণ করিতে সক্ষম হন। অথচ অন্য দিকে তিনি এমনই সরলস্বভাব যে, সামান্য বালক জনেরও তিনি বশীভূত হইয়া থাকেন।

হে রাজন্! তথাবিধ যোগী জন নিজের দেহ পরিত্যাগ করুন আর নাই করুন, কিম্বা কোন পুণ্যধামে গিয়া নিজের দেহ পরিত্যাগ করুন অথবা অস্পৃশ্য চণ্ডালের আবাসেই দেহপাত করুন, তাঁহার মুক্তির ব্যাঘাত কিছুতেই হইবার নহে। তিনি প্রথম যে দিন জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, সেই দিন হইতেই মুক্ত হইয়া আছেন। 'আমি' ইত্যাকার ভ্রান্তিই বন্ধনের হেতু ; ঐ হেতুর যদি উচ্ছেদ ঘটে, তাহা হইলেই মুক্তি হয়। উল্লিখিত যোগী পুরুষের তো তাহা পূর্ব্বেই ঘটিয়া আছে। যিনি সুখৈশ্বর্য্য চাহেন, তিনি তথাবিধ মহাপুরুষের পূজা করিবেন,—বন্দনা করিবেন এবং তাঁহাকে দেখিয়া ভক্তিভরে প্রণত হইবেন।

হে ভূপ! যে সকল জীবন্মুক্ত ব্যক্তি ভবব্যাধি হইতে মুক্ত হইয়াছেন, তাঁহারা জ্ঞানের পথ অবলম্বন করিয়া যাদৃশ পরম পবিত্র পদ লাভ করেন, কি যজ্ঞ, কি দান, কি তপস্যা, কি তীর্থযাত্রা, কিছুতেই তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—ভগবান্ মনু মহীপতি ইক্ষ্বাকুকে উক্ত প্রকার

উপদেশ প্রদানপূর্ব্বক ব্রহ্মলোকে যাত্রা করিলেন। এদিকে ইক্ষ্বাকু-নরেশ তদীয় উপদেশ মত আচরণ করিয়া মুক্তিপদ প্রাপ্ত হইলেন।

দ্বাবিংশত্যধিক শততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১২২ ॥

ত্রয়োবিংশত্যধিক শততম সর্গ।

রামচন্দ্র কহিলেন,—ভগবন্, আত্মজ্ঞবর! আপনি জীবন্মুক্ত ব্যক্তির যাদৃশ লক্ষণ বর্ণন করিলেন, তাহাতে একটা অপূর্ব্ব বিশেষত্ব কি বলা হইল? ফল কথা, মণি, মন্ত্র ও ঔষধি প্রভৃতির সিদ্ধিবশে সাধারণত লোকে যেমন খেচরত্বাদি বিশেষ বিশেষ ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়, জীবন্মুক্ত ব্যক্তির সেইরূপ বিশেষত্ব লাভ কিছু হয় কিনা, ইহা দ্বারা তাহা তো বুঝিলাম না!

বশিষ্ঠ কহিলেন,—মণি ও মন্ত্রাদি সাধনায় সিদ্ধ ব্যক্তির বুদ্ধি যাদৃশ উৎকর্ষ লাভ করে, তত্ত্বজ্ঞানীর বুদ্ধি তাহা অপেক্ষা কোন এক বিশিষ্ট অংশে আতিশয্য লাভ করিয়া থাকে। বিশদার্থ এই যে, মণি-মন্ত্র-সাধনায় সিদ্ধ ব্যক্তি আত্মতত্ত্বের দিকে অগ্রসরই হইতে পারে না; পরন্তু যিনি জীবন্মুক্ত, তিনি সর্ব্বদাই আত্মতত্ত্বে পরিতৃপ্ত ও প্রশান্ত হইয়া বিরাজিত। তপস্যা বা তন্ত্রমন্ত্রাদি-যোগে বহু লোকই খেচরত্বাদি বিষয়ে সিদ্ধ হইয়া থাকে। তাহাতে একটা বড় অপূর্ব্বত্ব কিছুই নাই। কেন না, তত্ত্বজ্ঞ জীবন্মুক্ত সাধক যাদৃশ নিত্যানন্দ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, সে আনন্দের নিকট উল্লিখিত খেচরত্বাদি সিদ্ধি অতি অকিঞ্চিৎকর বিষয়। অন্যে যাহা অধিগত হইতে পারে নাই, এমন একটা কোন অর্থ যদি অপূর্ব্ব শব্দে ধরিয়া লওয়া হয়, তবে তাহাতেও মণিমন্ত্রাদি হইতে লব্ধ সিদ্ধিকে অপূর্ব্ব বলিয়া ব্যাখ্যা করা চলে না; কেন না, মণিমন্ত্রাদি-সাধনায় ঐরূপ অণিমাদি সিদ্ধি পূর্ব্বেও অনেকেই প্রাপ্ত হইয়াছে। তত্ত্বদর্শীর পক্ষে তো উক্ত প্রকার সিদ্ধি কিছুতেই দুর্ঘট হইতে পারে না; কেন না, তাঁহারা সকলেরই আত্মভূত; কাজেই তাঁহাদের সে সিদ্ধি অন্যের প্রযত্নেই হইয়া থাকে। তবে এই উভয়বিধ সাধকের মধ্যে তত্ত্ববিদের বিশেষত্ব এই যে, তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি কুত্রাপি আস্থা বন্ধন করেন না; তাঁহার মনে বিষয়াসক্তি নাই, সে মন

সর্ব্বদাই সুনির্ম্মল। সাধারণতঃ মূঢ়বুদ্ধি লোকে যেমন বিষয়ে আসক্ত হইয়া পড়ে, তেমনি তিনি বিষয়াসক্ত হন না। তাঁহার প্রসন্ন পুণ্য বুদ্ধি কোন কালের জন্যই তুচ্ছ বিষয়-ব্যাপারে আকৃষ্ট হইবার নহে। তদীয় বিশিষ্টতার বিষয় এক কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, তাঁহার এই সংসাররূপ চিরন্তন ভ্রম সম্পূর্ণই শান্ত হইয়া গিয়াছে; তাই তিনি সর্ব্বদাই পরম সুখে অবস্থিত। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ও ভয় প্রভৃতি যে কিছু বিপত্তি আছে, তাহা তত্ত্বদর্শীর একেবারেই ক্ষয় পাইয়াছে। তাঁহার স্বরূপ সর্ব্বধর্ম্ম-বিরহিত ব্রহ্ম-চিন্ময়।

ত্রয়োবিংশত্যধিক শততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১২৩ ॥

চতুর্ব্বিংশত্যধিক শততম সর্গ

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! যেমন কোন ব্রাহ্মণ শূদ্রজাতীয়া রমণীর সহবাস ও সম্ভোগাদি গর্হিত কার্য্যের অনুশীলনায় ক্রমশঃ নিজোচিত সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম উপেক্ষা করিয়া চিরদিনের জন্য শূদ্রত্ব অঙ্গীকার করিয়া লয়, তেমনি যিনি ঈশ্বর বা আত্মা নামে নিরুক্ত, তিনিও বুদ্ধি প্রভৃতির সঙ্গগুণে তৎপ্রবুক্ত ভোগাশা নিবন্ধন নিত্য শুদ্ধ পূর্ণানন্দ-স্বভাব উপেক্ষা করিয়া জীবভাব স্বীকার করিয়া থাকেন। মায়াগত অনাদি দ্বিবিধ সংস্কার-পরম্পরার অনুসারী হিরণ্যগর্ভাত্মা আদ্য বিস্পন্দ হইতে উপাধি প্রধান্যবশে ভোগ্য ও উপহিত প্রাধান্যে ভোক্তা এই দ্বিবিধ ভূতই মায়াময় গন্ধর্ব্ব-নগরাদির ন্যায় আবির্ভূত। বস্তুতঃ উহা মিথ্যা; মিথ্যা বলিয়াই কারণহীন।

রামচন্দ্র! ঈশ্বর হইতেই ভূতবৃন্দের আগমন হয়। পরে তাহারা স্ব স্ব কৃত কর্ম্মানুসারেই বারম্বার জন্মান্তর ভোগ করে। ফলে, সাধুকারী সাধু হয় এবং পাপাচারী পাপী হইয়া থাকে। জন্ম-কর্ম্মের কার্য্য-কারণ-ভাব এইরূপই। পরম পদ হইতে জীব সকল যে প্রথমতঃ সমাগত হয়, তাহা কারণ-বিহীন। তাহাদের যে সুখ বা দুঃখ-ভোগ, তাহার প্রতি কারণ তাহাদের স্ব স্ব কর্ম্ম। এইরূপ যদি কারণ-পরম্পরার পর্য্যালোচনা

করা যায়, তাহা হইলে একমাত্র সঙ্কল্পই সংসারবন্ধনের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। এই জন্য বলিতেছি, তুমি সঙ্কল্প পরিত্যাগ কর। জানিবে—সঙ্কল্প-রাহিত্যই মোক্ষ। সুতরাং যাহাতে সঙ্কল্পোদয় না হয়, তাহার উপায়-অভ্যাসে নিরত হও। গ্রাহ্য-গ্রাহকের ভিন্নতা-বর্জ্জনই সঙ্কল্প-পরিত্যাগের উপায়। যাহাতে গ্রাহ্য ও গ্রাহক-ভেদরূপ ভ্রান্তি নিরস্ত হয়, সে পক্ষে সাবধান হও। যে সকল সঙ্কল্প দশা অনবরত চলিতেছে, ধীরে ধীরে তৎসমস্ত পরিহারপূর্ব্বক গ্রাহ্য ও গ্রাহক, এই দ্বিবিধ ভাবনাই তুমি পরিত্যাগ কর। অর্থাৎ তোমার হৃদয়ে যেন কোনও প্রকার ভাবনা বদ্ধমূল হইয়া না রহে, তুমি সকল ভাবনা পরিত্যাগ কর, ভাবনার অভাবে অবশিষ্ট যে সাক্ষি-স্বরূপ, তুমি তদেকরূপ হইয়াই অবস্থান কর।

হে পাপসম্পর্কহীন! ইন্দ্রিয়গণ যে যে বিষয়ে অজস্র আপতিত হয়, অনুরাগবশে তাহাতেই আবদ্ধ হইয়া থাকে। ঘটনাক্রমে তাহাতে যদি বিরক্তির সঞ্চার হয়, তবে তাহা হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। এ সংসারে তোমার যদি কোন প্রীতিকর পদার্থ থাকে, তবে তুমি বদ্ধ হইয়াই রহিবে। আর যদি না থাকে, তবে তুমি যে মুক্ত, এ কথা নিশ্চিতই। তাই বলিতেছি, এ সংসারের সামান্য একগাছী তৃণ হইতে আরম্ভ করিয়া মহান্ দেব-কলেবর পর্য্যন্ত চর কিম্বা অচর, যে কিছু বস্তু বিদ্যমান, তাহার কোন কিছুই যেন তোমার প্রীতির বা আসক্তির কারণ হয় না। এইরূপ হইলে পশ্চাতে তুমি যাহা করিবে, যাহা খাইবে, যাহা আহুতি দিবে, কিম্বা যাহা দান করিবে, ইত্যাদি ইত্যাদি করিয়া যাহাই কিছু করিবে, তন্মধ্যে বাস্তব পক্ষে কোন কিছুরই কর্ত্তা বা ভোক্তা তোমাকে হইতে হইবে না। তুমি শান্ত ও মুক্ত হইয়া রহিবে। দেখ, সাধু-সজ্জন-গণের স্বভাবই এই যে, তাঁহারা অতীত বিষয়ের অণুমাত্র অনুশোচনা করেন না, বা ভবিষ্যৎ বিষয়ের জন্যও চিন্তিত নহেন; মাত্র উপস্থিত বিষয় লইয়াই অবুদ্ধিপূর্ব্বক তাঁহাদের অবস্থিতি।

রাম! তৃষ্ণা, মোহ ও মদ প্রভৃতি ভাব সকল একমাত্র মনেতেই গ্রথিত; সুতরাং তোমার বিজ্ঞ মনোদ্বারা তুমি সেই অজ্ঞ মনের উচ্ছেদ সাধন কর। একখণ্ড অতি তীক্ষ্ণ লৌহদ্বারা যেমন অন্য এক লৌহকে

ছেদন করা যায়, তেমনি তুমি তোমার বিবেক-তীক্ষ্ণীকৃত মনের সাহায্যে অজ্ঞ মনকে ছেদন করিয়া ফেলো। এইরূপ হইলে তখন তোমার সমস্ত ভ্রান্তিরই শান্তি হইবে। যাঁহারা মল-ক্ষালনে নৈপুণ্য লাভ করেন, তাঁহারা মল দ্বারাই মলের ক্ষালন করিয়া থাকেন। অস্ত্র দিয়া অস্ত্র নিবারণ করা হয় এবং বিষপ্রয়োগে বিষের প্রশমন ঘটিয়া থাকে। এইরূপে সজাতীয় বস্তুর সাহায্যে সজাতীয় বস্তুর উচ্ছেদ সাধনের দৃষ্টান্ত যথেষ্টই আছে। স্থূল, সূক্ষ্ম ও পরম, জীবের এই ত্রিবিধ রূপ বর্ত্তমান। উহাদের মধ্যে প্রথম দুইটিকে পরিত্যাগ করিয়া তৃতীয় অর্থাৎ চরম যে রূপ, তাহাকেই ভজনা কর। এই যে দেহ—যাহার কর-চরণাদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিদ্যমান, ইহা কেবল ভোগেরই জন্য নর্ত্তনশীল। জীব ভোগসাধনের নিমিত্তই ঐ স্থূল রূপ ধারণ করিয়া থাকে। আ-সংসার জীবের যে স্বীয় সঙ্কল্পময় আকার চলিয়া আসিতেছে, তাহাকে তুমি, চিত্ত বা আতিবাহিক রূপ বলিয়াই বিদিত হইবে। যাহার আদি নাই, অন্ত নাই, যাহা নির্ব্বিকল্প সত্য, চিন্মাত্র ও বিশ্বের সত্তাস্ফূর্ত্তি-কর, জীবের সেই যে রূপ—তাহাকেই তুমি তৃতীয় বা চরম পরম রূপ বলিয়া জানিবে। ঐ রূপই বিশুদ্ধ বা তুরীয় পদ নামে নিরূপিত।

হে রাঘব! তুমি জীবের ঐ পূর্ব্ব রূপদ্বয় পরিত্যাগ কর এবং এই শেষোক্ত তুরীয় পদে প্রতিষ্ঠাপন্ন হও। কিন্তু ঐ ত্যাজ্য পূর্ব্ব রূপদ্বয়ে কথনই আত্মবুদ্ধি স্থাপন করিও না।

রামচন্দ্র কহিলেন,—হে মুনিশ্রেষ্ঠ! আপনি যে তুরীয়াবস্থার কথা কহিলেন, উহা জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই ত্রিবিধ অবস্থায় রহিলেও স্পষ্টতঃ লক্ষীভূত হয় না; অতএব ঐ অবস্থা যে কি, তাহা আমি বুঝিয়া উঠিতেছি না। আপনি আমায় উহা বিশেষ করিয়া বলুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—অহম্ভাবনা ও অনহম্ভাবনা এবং সৎ ও অসৎ, এই উভয় পরিত্যাগ করিলে যে অসক্ত, সম ও স্বচ্ছ বস্তু অবস্থিত থাকে, তাহাই তুরীয় বা তুর্য্য নামে নিরূপিত। জীবন্মুক্ত ব্যক্তির যাদৃশ দশায় স্বচ্ছ শান্ত সমতার অভ্যুদয় হয় এবং ব্যবহার অবস্থায় যাহাতে সাক্ষিরূপে অবস্থিতি ঘটে, তাহারই নাম তুরীয়াবস্থা। এই অবস্থা না জাগ্রৎ, না স্বপ্ন, কিছুই

নহে; কেন না, ইহাতে সঙ্কল্পাভাব বিদ্যমান। ইহাকে সুষুপ্তি অবস্থাও বলা যায় না; কেন না, সে কালের জড়তাও তুরীয়াবস্থায় অনবস্থিত। যদি ঐ তুরীয় পদে উপনীত হওয়া যায়, তাহা হইলে এই যথাবস্থিত জগৎ-জ্ঞান বাধিত হইয়া সম্যক্ শান্ত হইয়া যায়। জগতের যে ঐ প্রকার বিলয়াবস্থা, তাহা জ্ঞানীদিগের নিকটই ঘটিয়া থাকে। যাহারা অজ্ঞানী, তাহাদের নিকট এ জগৎ স্থির—অচঞ্চল। যে কালে অহঙ্কার-কলার অবসান হয়, চিত্ত বিশীর্ণ হইয়া যায় ও সমতার অভ্যুদয় ঘটে, তখনই উল্লিখিত তুরীয়াবস্থা সমুদিত হয়।

এক্ষণে কথা হইতেছে, ঐ যে তুরীয়াবস্থার বিষয় বলা হইল, ঐ অবস্থাতেও জীবের দেহ থাকে। সে কালে জীব জীবন্মুক্ত আখ্যা লাভ করে। জীবন্মুক্ত ব্যক্তির জাগ্রৎ ও ব্যবহার দশা ঘুচে না। সুতরাং তৎ-কালে চিত্তের বিশীর্ণতা হয় কিরূপে?—তাহা তো কোনরূপেই সম্ভবপর নহে। এ কথার উত্তরচ্ছলে আমি অধুনা এক দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছি, তুমি তাহা শ্রবণ কর। হে বিবুধোপম! ইহা শ্রবণে—ইহার মর্ম্ম জানিতে পারিলে, তোমার বোধ বৃদ্ধি হইবে এবং ঐরূপ অসম্ভাবনার আশঙ্কা নিরস্ত হইয়া যাইবে। শ্রবণ কর—একদা এক ব্যাধ কোন এক নির্জ্জন বনে একটা হরিণকে বাণবিদ্ধ করে। বাণাহত হরিণ পলাইতে থাকে। ওদিকে ব্যাধও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হয়। তখন সেই বনাভ্যন্তরে জনৈক বাহ্য-চেষ্টা-বিরহিত মুনি মৌনাবলম্বনে অবস্থান করিতে ছিলেন। ব্যাধ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল,—হে মুনিবর! মদীয় বাণবিদ্ধ হইয়া একটা হরিণ এদিকে আসিয়াছিল, এখান হইতে সে আর কোন্ দিকে পলাইল, আপনি বলিতে পারেন কি? ব্যাধের এই প্রশ্ন শুনিয়া সেই মুনিবর তাহাকে উত্তর দিলেন,—ওহে সাধো! বনবাসী আমরা; সর্ব্বত্রই আমাদের সম ব্যবহার। যাহা লইয়া বাহ্য কার্য্য নির্ব্বাহ করা যায়, এরূপ অহঙ্কার তো আমাদের নাই। ফলে, বাহ্য কার্য্যে এক্ষণে আমরা অনভ্যস্ত। হে সখে! আমাদের যে মন আছে, সেই মনই সম্প্রতি ইন্দ্রিয়কার্য্য সম্পাদন করে। তবে যাহাকে অহঙ্কারময় মন নামে নিরূপিত করা হয়, সে মন আমাদের একেবারেই নাই। কি জাগ্রৎ, কি স্বপ্ন, কি সুষুপ্তি,

কোন নামের কোন দশাই আমি অবগত নহি। আমি অধুনা তুরীয়াবস্থায় অবস্থিত; কাজেই সে অবস্থায় কোন দৃশ্যই প্রতিভাত নহে।

রামচন্দ্র! মুনিবরের ঐ বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই ব্যাধ তাহার অর্থাবধারণে সক্ষম হইল না। সে তাহার অভিমত দিকে চলিয়া গেল।

হে রাঘব! এখন বুঝিয়া দেখ যে, তুরীয়াবস্থা ব্যতীত আর কোন অবস্থারই অস্তিত্ব নাই। যাহা বিকল্প-বিরহিতা চিতি, তাহাই তুরীয় দশা নামে নিরূপিতা। সত্য বলিতে গেলে, সেই তুরীয় দশাকেই বলিতে হয়, তদ্ভিন্ন আর সকলই মিথ্যা। চিত্তের যে জাগ্রৎ, স্বপ্ন বা সুষুপ্তি-ভাবাপন্ন তিন অবস্থা, তাহা যথাক্রমে ঘোর, শান্ত ও মূঢ় নামে অভিহিত। যে চিত্ত জাগ্রন্ময়, তাহাকে ঘোর, যাহা স্বপ্নময়, তাহা শান্ত আর যাহা সুষুপ্তি-ভাবাপন্ন, তাহা মূঢ় নামে নির্দ্দিষ্ট। উক্ত অবস্থাত্রয়কে অতিক্রম করিতে পারিলেই চিত্ত মৃত হইয়া পড়ে। ঈদৃশ মৃত চিত্তে সত্ত্ব নামে যে একটা বস্তু বিদ্যমান, তাহা পাইবার নিমিত্ত সকল যোগীই চেষ্টা করিয়া থাকেন।

হে রাম! ভেদ-জ্ঞান-বিরহিত মহাত্মা মুনিগণ মুক্তাবস্থায় সর্ব্বদা যেভাবে অবস্থান করেন, সেই সর্ব্ব-সঙ্কল্প-বর্জ্জিত তুরীয় পদে তুমি নিরাময় হইয়া অবস্থিত হও।

চতুর্বিংশত্যধিকশততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১২৪ ॥

পঞ্চবিংশত্যধিকশততম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—সমস্ত অধ্যাত্ম শাস্ত্রেরই সিদ্ধান্ত—সকল পদার্থই ভ্রমময়। না অবিদ্যা, না মায়া, কিছুই কোথাও নাই। যিনি আছেন, তিনি কেবল সেই শান্ত ব্রহ্ম। সর্ব্বত্র তিনিই একমাত্র বিদ্যমান; তিনি সর্ব্বশক্তিযুক্ত, স্বচ্ছ ও সম-সমাত্মা। কেহ কেহ স্ব স্ব বুদ্ধি অনুসারে নির্ণয় করিয়া তাঁহাকে শূন্যরূপে নির্দ্দেশ করেন। কেহ কেহ বিজ্ঞান-মাত্ররূপে ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন এবং কেহ কেহ তাঁহাকে ঈশ্বর আখ্যায়

অভিহিত করেন। এইরূপে নানা মতাবলম্বী বাদিগণ তাঁহার বিভিন্ন রূপ কল্পনা করিয়া পরস্পর বিবাদ করিতে থাকেন।

হে অনঘ! তুমি ঐ সকল বিবাদ বিতর্ক পরিত্যাগ কর, মনন-বিহীন, ক্ষীণচিত্ত ও প্রশান্তবুদ্ধি হও। ঐ ভাবে নির্ব্বাণবান্ হইয়া মহা-মৌনিরূপে অবস্থান কর। তুমি আপনা হইতে অন্তরে পরিপূর্ণ-বুদ্ধি হও এবং মূক, অন্ধ ও বধিরবৎ সতত অন্তর্মুখী বৃত্তি অবলম্বন করিয়া শান্তভাবে আত্মাতেই অবস্থান কর। হে রাঘবেন্দ্র! তুমি জাগ্রদ্ভাবেই সুষুপ্তি-গত হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান কর, অন্তরে সর্ব্বত্যাগী হও, বাহিরে যথালব্ধ কর্ম্ম সম্পাদন করিতে থাক। দেখ, চিত্তসত্তাই পরম দুঃখ এবং চিত্তের অসত্তাই পরম সুখ। সুতরাং অভাবনার প্রাবল্যে চিত্তকে তুমি ক্ষয় কর এবং একমাত্র চিন্ময়াত্মা হইয়া বিরাজ করিতে থাক। বাহিরের যে কিছু রমণীয় বস্তু, সে সকল তুমি অরমণীয় বলিয়া জ্ঞান কর এবং সেই সেই রমণীয় বস্তুর ভাবনা পরিত্যাগ করিয়া পাষাণবৎ নিশ্চলভাবে অবস্থিত হও।

এইরূপে তোমার আত্মযত্নেই সংসারজয় হইবে। সুখ বা দুঃখ, কিছুরই তুমি চিন্তা করিবে না। এইরূপ করিলে তোমার নিজের যত্নেই তুমি দুঃখনাশে সক্ষম হইবে। তত্ত্বজ্ঞ জন অন্তরে পূর্ণ সুধাকরবৎ সুধাময় হইয়া পরম সুখ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ত্রিভুবনের যাহা সারবস্তু, সেই আত্ম-তত্ত্ব তিনি পরিজ্ঞাত হন এবং পরম আনন্দ প্রাপ্ত হইয়া বাহিরের কার্য্য সকল নির্ব্বাহ করিয়াও করেন না।

পঞ্চবিংশত্যধিক শততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১২৫ ॥

ষড়্বিংশত্যধিক শততম সর্গ।

রামচন্দ্র কহিলেন,—ভগবন্! পূর্ব্বে আপনি সপ্তবিধ যোগভূমির উল্লেখ করিয়াছেন; এক্ষণে বলুন—উক্ত ভূমিকাগুলির অভ্যাস হয় কিরূপে? প্রত্যেক ভূমিকায় কি কি প্রকার লক্ষণই বা যোগী ব্যক্তির হইতে পারে? এ সকল আমায় বিশদভাবে বুঝাইয়া বলুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! প্রবৃত্ত ও নিবৃত্ত ভেদে পুরুষ দুই প্রকার; তন্মধ্যে যাঁহার স্বর্গলাভের জন্য ব্যগ্রতা হয়, তাঁহাকে প্রবৃত্ত বলা যায়, আর যিনি একমাত্র মোক্ষফলেরই অভিলাষী, তাঁহাকে নিবৃত্ত বলা হয়। যাহা হউক, আমি ক্রমশঃ উক্ত দ্বিবিধ পুরুষেরই লক্ষণ স্পষ্টতঃ প্রকাশ করিতেছি,—শ্রবণ কর। যিনি মনে করেন যে, নির্ব্বাণ আবার কোন্ বস্তু? এই যে ভোগবহুল সংসার, ইহাই আমার সর্ব্বস্ব—ইহাই আমার যথেষ্ট; এইরূপ মনে করিয়া নিত্য নৈমিত্তিক ও কাম্যকর্ম্মগুলির যথাযথ অনুষ্ঠান করিতে থাকেন, তাঁহাকেই প্রবৃত্ত নামে অভিহিত করা যায়। প্রবল পবনের আন্দোলনে উদ্বেলিত জলধিযুগলের মধ্যে থাকিয়া কূর্ম্ম যেমন ভয়ে ভয়ে স্বীয় গ্রীবা বারম্বার উদরাভ্যন্তরে প্রবেশ করায় ও নির্গত করে, তাদৃশ প্রবেশ ও নির্গমের ন্যায় বহুল জন্ম-পরম্পরার অবশেষে—বহুবার সংসারে যাতায়াত করিবার পর, যে ব্যক্তি বিবেকযুক্ত হইয়া স্থিরচিত্তে আলোচনা করিতে থাকেন যে, অহো! এই সংসার-ব্যবস্থায় সারাংশ কিছুই নাই। ইহা লইয়া থাকিবার আমার প্রয়োজন কি? সকল কর্ম্মই পর্য্যুসিত; অর্থাৎ বহুবার এ সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা হইয়াছে; সুতরাং এই সমস্ত কর্ম্ম করিয়াই বা ফল কি? ইহাতে কেবল অনর্থক দিনক্ষয় মাত্র। কর্ম্মের ফলভূত জন্ম-মরণাদি বিকার যাহাতে নাই, এবম্বিধ পরম বিশ্রাম কি? তাদৃশ বিশ্রাম লাভ করাই এক্ষণে আমার প্রয়োজন। বিশিষ্ট বিবেকের বলে অন্তরে যিনি এইরূপ নিশ্চয় করিতে পারিয়াছেন, তাঁহাকেই নিবৃত্ত নামে নিরূপিত করা হয়। আমি বিরাগী হইয়া কিরূপে এই সংসার-সাগরের পরপারে গমন করিব? বিবেকী মানব সাধু বুদ্ধি-যোগে এইরূপে যখন বিচার করিতে প্রবৃত্ত হন, তখন হইতেই ভোগাভিলাষ হইতে তাঁহার দিন দিন বিরাম ঘটিতে থাকে। যাহাতে চিত্ত-শুদ্ধি সংঘটিত হয়, তথাবিধ সৎকর্ম্মেরই তিনি অনুষ্ঠান করিতে থাকেন। সৎকর্ম্ম করিতে করিতেই চিত্তশুদ্ধি ঘটিয়া থাকে; চিত্তশুদ্ধি হইলেই তৃষ্ণাক্ষয় হয়; তৃষ্ণাক্ষয় হইলেই দিন দিন পরমোত্তম সন্তোষ লাভ হইতে থাকে। ঐ প্রকার পুরুষ গ্রাম্য জড় ব্যবহারে সতত অবজ্ঞা প্রকাশ করেন; পরের মর্ম্মস্থলে কখনই আঘাত প্রদান করেন না। তিনি সর্ব্বদাই পুণ্য

কার্য্য—পুণ্য চেষ্টা করিয়া থাকেন। মনে যাহাতে কানওরূপ উদ্বেগ সঞ্চার না হয়, ঈদৃশ অনায়াসকর মৃদু কর্ম্মই তিনি করিতে থাকেন। পাপ কার্য্য—পাপ কথা হইতে সততই তাঁহার ভয় সঞ্চার হয়। বিষয়ভোগের আকাঙ্ক্ষা সর্ব্বদাই তিনি পরিত্যাগ করেন। যাহাতে কাহারও উদ্বেগ না হয়, যাহাতে কেহ ক্লেশানুভব না করে, দেশ, কাল ও পাত্র বুঝিয়া লোককে তিনি তেমনিই স্নেহময় সমুচিত কথা কহিয়া থাকেন। যে সাধু এই প্রকার অবস্থায় উপনীত হইয়াছেন, বুঝিতে হইবে—তিনি প্রথম ভূমিকা লাভ করিয়াছেন। এই প্রথম ভূমিকাপ্রাপ্ত সাধু পুরুষ কায়মনোবাক্যে সাধুগণের সেবা করিয়া থাকেন। সাধুজনের সেবাশুশ্রূষা হইতে পারে, এইরূপ ধনাদি তিনি যে কোন স্থান হইতে সংগ্রহ করিয়া আনিয়া তাহা দ্বারা সাধুগণের সেবা করেন; এবং সেই সকল সাধুর নিকট জ্ঞানগর্ভ শাস্ত্রীয় কথা শ্রবণ করেন। যিনি সংসার হইতে উদ্ধার পাইবার অভিপ্রায়ে এইরূপ বিচারনিষ্ঠ হন, তিনিই যোগ-ভূমিকায় পদার্পণ করেন। ইহা ভিন্ন অন্যে অধ্যাত্মশাস্ত্রের কথা লইয়া কাল কাটাইতে থাকিলেও তাহাকে স্বার্থান্বেষী লোকপ্রতারক বলিয়াই জানিতে হইবে।

অতঃপর বিচারনামিকা দ্বিতীয় যোগভূমিকা। এই ভূমিকায় উপনীত হইয়া পুরুষ তাদৃশ সুপণ্ডিতের আশ্রয়ে বাস করেন,—যিনি শ্রুতি, স্মৃতি, সদাচার ও ধ্যান, ধারণা প্রভৃতি কর্ম্ম-সমূহের ব্যাখ্যা করিতে থাকেন। উল্লিখিত সুপণ্ডিতের সমীপে অবস্থান করিয়া দ্বিতীয় ভূমিকাপ্রাপ্ত যোগী জন পদ ও পদার্থশাস্ত্র সকলের প্রকৃত তত্ত্ব ও বিভাগক্রম বিদিত হইবেন এবং যে কিছু শ্রোতব্য বিষয় আছে, সমস্তই তাঁহার নিকট হইতে শুনিয়া লইবেন। ঐ সকল বুঝিয়া শুনিয়া উক্ত যোগী ব্যক্তি, নবীন গৃহস্থ ব্যক্তির প্রাচীন গৃহস্থের নিকট হইতে গৃহস্থলীকর্ম্ম সকল জানিয়া লইবার ন্যায় কি কর্ত্তব্য, কি কর্ত্তব্য নহে, সে সমস্ত তথ্যই নির্ণয় করিয়া লয়েন। অন্তর্গত মদ, মান, মাৎসর্য্য ও লোভ প্রভৃতি তাঁহার পূর্ব্ব হইতেই পরিত্যক্ত হয়। একণে বাহ্যিক যে কিছু মান-মদাদি, তাহাও ভুজঙ্গের বাহ্য আবরণ পরিহারের ন্যায় তিনি পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। এইরূপে তিনি বিশিষ্ট বুদ্ধি লাভ করেন; শাস্ত্র, গুরু ও সজ্জনগণের সেবা করেন এবং এইরূপ

সেবার ফলেই নিখিল শাস্ত্রের সমস্ত মর্ম্ম যথাযথ অবগত হইয়া থাকেন।

অনন্তর তৃতীয়া যোগভূমিকা; ইহা অসংসঙ্গ নামে অভিহিতা; কান্ত জন যেমন কোমল পুষ্পশয্যায় শয়ান হয়, তেমনি দ্বিতীয় ভূমিকার পর এই অসংসঙ্গনামিকা তৃতীয় ভূমিকায় যোগী জন পতিত হইয়া থাকেন। এই সময় শাস্ত্র-প্রতিপাদ্য সত্য পদার্থে তাঁহার মতি নিশ্চলভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। তদবস্থায় তিনি শিলাতলে তাপসাশ্রমে বিশ্রাম করেন; অধ্যাত্ম-কথার আলোচনা করেন; সংসারের নিন্দাবাদে প্রবৃত্ত হন এবং বৈরাগ্য অভ্যাস করিতে করিতেই তাঁহার দীর্ঘ জীবন ক্ষেপণ করিতে থাকেন। তিনি এইরূপ নীতিনিষ্ঠ হইয়া বনবাস-বিহারে চিত্তের উপশম আনয়ন করেন, তাহাতেই তাঁহার অসঙ্গ-সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ঘটে। এই সুখের দশাতেই তিনি কালাতিপাত করেন। সাধু-শাস্ত্রের অভ্যাসে এবং পুণ্যকর্ম্মসমূহের অনুষ্ঠানে জীবের আত্মদর্শন-শক্তি প্রসন্ন হয়। বিজ্ঞ মানব উল্লিখিত তৃতীয় ভূমিকায় অধিরূঢ় হইয়া দুই প্রকার অসংসঙ্গ অনুভব করিয়া থাকেন। সেই অসংসঙ্গ-দ্বয়ের ভেদ বলিতেছি,—শ্রবণ কর। সামান্য ও শ্রেষ্ঠ, এই দুই নাম ভেদে অসংসঙ্গ দ্বিবিধ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। আমি কর্ত্তা নহি, ভোক্তা নহি, কাহারও বাধ্য নহি বা বাধকও নহি, ইত্যাদিরূপ স্থির ধারণা করিয়া বাহ্য বস্তুতে যে আসক্তি-রাহিত্য, তাহাই সামান্য অসংসঙ্গ নামে নিরূপিত। অপিচ সুখ বা দুঃখ, যাহাই আসিয়া উপস্থিত হউক, সমস্তই জন্মান্তরের কর্ম্ম-নির্ম্মিত এবং উহা সর্ব্ব রকমেই ঈশ্বরের অধীনতায় অবস্থিত। উহাতে আমার কর্ত্তৃত্ব অণুমাত্র নাই। সংসারের এই সুবিপুল ভোগরাশি—মহারোগ-স্বরূপ; সম্পদ—পরম আপদ্‌ভূমি। প্রিয়জনের সহিত সংযোগ—সে তো কেবল বিয়োগেরই হেতুভূত। কেন না, মিলন-সুখের পর বিয়োগ-দুঃখ ঘটিয়াই থাকে; ইহা এক প্রকার নিত্য-ঘটনা। সুতরাং সংযোগকে সুখ বলিতেই পারি না। ইহা বুদ্ধিরই কোনরূপ ব্যাধি কিম্বা আধি হইতে পারে। কাল তো সমস্ত বস্তুকেই সতত কবল করিতে প্রস্তুত। এইরূপ ধারণার ফলে সমস্তই অনিত্য বুঝিয়া ও কোন বিষয়েই আস্থা না রাখিয়া ভাবনারে সম্পূর্ণ বিসর্জ্জন—সামান্য অসংসঙ্গ।

যোগী যখন পূর্ব্ববৎ ভাবনা করিতে থাকেন, তখন শাস্ত্র-প্রতিপাদিত যে সত্য ব্রহ্ম বস্তু; তাহাতেই তাঁহার মন, সংসক্ত হইয়া থাকে। অসাধু-সঙ্গ পরিত্যাগ এবং সাধুসঙ্গে বাস, এইরূপে ক্রমিক যোগাভ্যাসে অবস্থান-পূর্ব্বক শ্রবণ-মননাত্মক আত্মজ্ঞানোপায় প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। নিজের চেষ্টাসাধ্য ঈদৃশ অভ্যাসযোগ প্রতিনিয়ত প্রয়োগ করিতে করিতে কর-গত আমলক ফলের ন্যায় আত্মবস্তু সম্পূর্ণ করায়ত্ত হইয়া থাকে। যাহা সংসার-সাগরের পরপারে অবস্থিত, তথাবিধ পরম কারণস্বরূপ সার আত্ম-তত্ত্ব এইরূপেই নিজের প্রত্যক্ষগোচর হন। আমি কর্ত্তা নহি, ঈশ্বরই সমুদায়ের কর্ত্তা; পূর্ব্বে যাহা করা হইয়াছে কিম্বা ইদানীং যাহা করা যাইতেছে, এরূপ কোন কর্ম্মই আমার নাই। এই প্রকার শব্দার্থের ভাবনাও পরিহার করিয়া শান্ত ও মৌনভাবে যে অবস্থিতি, তাহাই শ্রেষ্ঠ অসংসঙ্গ নামে নিরূপিত। যে কালে অন্তরে, বাহিরে, কি ঊর্দ্ধে, কি অধোদিকে, কি অন্য কোন দিগ্‌দেশে কিম্বা আকাশে, কি কোন পদার্থ-বিশেষে, কি অপদার্থে, কি জড়ে বা চিদাভাসে, কোন বিষয়েই চিত্ত অবস্থান করে না, কেবল শান্ত, সৌম্য, স্বপ্রকাশ আকাশবৎ প্রকাশান্তর-বিরহিত চিৎস্বরূপে বিরাজ করিতে থাকে; চিত্তের তাৎকালিক সেই অবস্থাই শ্রেষ্ঠ অসংসঙ্গ নামে নিরূপিত হয়। বিবেক যেন একটী কমল; সন্তোষ উহার সৌরভ, সৎকর্ম্ম উহার নির্ম্মল দল, চিত্তরূপ নালাগ্রে উহার অবস্থান, এবং বিঘ্ন উহার নাল-বিলগ্ন কণ্টক। ঐ বিবেক-কমল বিচার-বিভাকরের বিকাশে অন্তরে সমুদিত হইয়া বিকাশ প্রাপ্ত হইলে উক্ত অসংসঙ্গ-নামিকা তৃতীয় ভূমিকারূপ ফল প্রসব করে। শুদ্ধচিত্ত তত্ত্ব-জ্ঞানীদিগের সহিত বাস করিলে, এবং পুণ্য কর্ম্ম সঞ্চিত হইলে কাকতালীয় ন্যায়ে প্রথম যোগভূমিকা আবির্ভূত হয়। উহা সুধাঙ্কুরবৎ আবির্ভূত হইবা মাত্রই বিবেকজল দ্বারা সিঞ্চন করত সযত্নে উহাকে রক্ষা করা কর্ত্তব্য। চতুর্ব্বিধ সাধনের মধ্যে যে সাধন দ্বারা শুভেচ্ছা-নামিকা প্রথমা ভূমিকার আবির্ভাব হয়, জলসেক-দ্বারা কৃষীবল-কৃত বৃক্ষাঙ্কুরাদির বৃদ্ধি সাধনের ন্যায় সেই সাধনকেই বিচারবলে অগ্রে বর্দ্ধিত করিয়া লইবে। এইরূপে একটী ভূমিকার উপচয় ঘটিলে ক্রমশঃ উহা অন্যান্য ভূমিকা-

গুলিরও প্রসবভূমি হইয়া থাকে। সমানভাবে নিয়ত চেষ্টা করিতে থাকিলে প্রথম ভূমিকা প্রাপ্ত হইবার পর ক্রমে ক্রমে তৃতীয় ভূমিকাও প্রাপ্ত হওয়া যায়। পূর্ব্বোক্ত শ্রেষ্ঠ অসংসঙ্গ এই তৃতীয় ভূমিকাতেই হইয়া থাকে। যোগী পুরুষ এই ভূমিকায় আরোহণপূর্ব্বক সর্ব্ব সঙ্কল্প পরিহার করিয়া থাকেন।

রামচন্দ্র কহিলেন,—প্রভো! যে ব্যক্তি অসৎকুলে জন্মিয়াছে, মূঢ়ভাবে প্রবৃত্তিমার্গে নিরত রহিয়াছে, যাহার ভাগ্যে কদাচ যোগিসঙ্গ ঘটে নাই, তাদৃশ অধম জনের সংসার হইতে উদ্ধার লাভের উপায় কি আছে? আমার আরও একটী জানিবার বিষয় এই যে, যদি কেহ প্রথম, দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় ভূমিকায় আরোহণ করিয়া মরিয়া যায়, তবে তাহার কীদৃশ গতি হইয়া থাকে?

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! মূঢ়, দোষদুষ্ট, অধম পুরুষের স্বতই বিচারবলে অথবা ভাগ্য বশতঃ সাধুসঙ্গলাভে যে পর্য্যন্ত না বৈরাগ্যোদয় হয়, ততদিন শত শত জন্ম ভোগে এই বিশাল সংসার-বন্ধন তাহার অনিবার্য্য। কিন্তু যদি কোনও গতিকে জীবের একবার বৈরাগ্যোদয় হয়, তাহা হইলেই ভূমিকারোহণ অবশ্যম্ভাবী। তখন তাহার সংসার নাশ হয়। ইহাই শাস্ত্রের সার-সংগ্রহ। আর যে পুরুষ যোগ-ভূমিকায় আরোহণ-পূর্ব্বক মরিয়া যান, তাঁহার ঐ ভূমিকার অংশানুসারেই অর্থাৎ তিনি যত-টুকু যোগভূমি লাভ করিয়াছিলেন, সেই অনুপাতেই পূর্ব্বকৃত দুষ্কৃতরাশি ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। অনন্তর তিনি দেবযানে আরোহণ করিয়া লোকপালপুরে কিম্বা মেরুগত উপবন-কুঞ্জে রমণীসহ রমণ করিতে থাকেন। ক্রমে তাঁহার পুরাকৃত সুকৃত-দুষ্কৃত ক্ষীণ হইলে এবং ভোগজাল ক্ষয় পাইলে তিনি মর্ত্ত্যলোকে শ্রীমান্, গুণবান্ ও পুণ্যময় সাধু পুরুষের গৃহে যোগী হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন। এতাদৃশ যোগী পুরুষেরা জন্ম লাভের পর তাঁহাদের জন্মান্তরাভ্যস্ত যোগই অবলম্বন করিয়া থাকেন। পূর্ব্ব জন্মে যে-কয়েকটী যোগভূমিকা প্রাপ্তি হইয়াছিল, তাহা স্মরণপূর্ব্বক ক্রমে তাঁহারা পর পর ভূমিকায় আরোহণ করিতে থাকেন।

রামচন্দ্র! পূর্ব্বে যে ভূমিকাত্রয়ের কথা কহিলাম, উহাদিগকে

জাগ্রৎ নামে নিরূপিত করা হয়। জাগ্রৎ বলার তাৎপর্য্য এই যে, ঐ ভূমিকাত্রয়ে আরোহণ পর্য্যন্ত বাহ্য বস্তুবর্গের ভেদজ্ঞান বিলক্ষণই থাকিয়া যায়। ঐ অবস্থায় যোগীদিগের কেবল আর্য্যভাবেরই আবির্ভাব হয়। ঐ আর্য্যভাব দেখিয়া অতি বড় মূঢ়বুদ্ধি ব্যক্তিরাও মুক্তিপথের পথিক হইতে চাহে। যিনি যথাযথ স্বীয় কর্ত্তব্য সমাধা করেন, যাহা অকর্ত্তব্য, তাহার ছন্দাংশেও যিনি থাকেন না, যেমন সাধারণ লোক, তেমনি যিনি ব্যবহার-পরায়ণ হন, তিনিই আর্য্য নামে অভিহিত। যিনি শাস্ত্র জানেন, আপন কুলাচারের অনুসরণ করেন,—করিয়া মনঃপূত কর্ম্ম করিতে থাকেন, তাঁহারই নাম আর্য্য। প্রথম ভূমিকায় আরূঢ় হইলে যোগীর আর্য্যভাবের অঙ্কুর দৃষ্ট হয়। দ্বিতীয় ভূমিকায় সেই অঙ্কুর বিকশিত হইয়া উঠে। অনন্তর তৃতীয় ভূমিকায় তাহা ফলাকারে পরিণত হইয়া থাকে। এই প্রকার আর্য্যভাব লাভ করিয়া যে যোগী মৃত্যুগ্রাসে পতিত হন, তিনি স্বীয় সাধু-সঙ্কল্প-জনিত ভোগরাশি বহুকাল ভোগ করিবার পর পুনর্ব্বার যোগী হইয়া জন্ম লাভ করেন। উক্ত ভূমিকাত্রয়ের অভ্যাসে অজ্ঞান অপগত হইয়া যায়। তখন সম্যক্ জ্ঞানের উদয় হইয়া থাকে। সে কালে যোগীর চিত্ত পূর্ণ সুধাকরের ন্যায় পূর্ণ স্বচ্ছ ভাব লাভ করে।

অনন্তর যোগী পুরুষ চতুর্থী ভূমিকায় উপনীত হইয়া থাকেন। ঐ অবস্থায় যুক্তচেতা যোগী সমস্তই বিভাগ-বিরহিত, অনাদি, অনন্ত, একই বস্তু বলিয়া বোধ করেন। তাঁহাদের নিকট হইতে দ্বৈতভাব তখন একেবারেই দূরীভূত হইয়া যায়; অদ্বৈতভাব উপস্থিত হয়। সেই ভাবই তাঁহাদের স্থিরতর হইয়া রহে। যোগী পুরুষেরা চতুর্থী ভূমিকায় আরোহণ করিয়া লোক সকলকে স্বপ্নবৎ অবলোকন করিয়া থাকেন। প্রথমোক্ত ভূমিকাত্রয় জাগ্রৎ বলিয়া অভিহিত। চতুর্থী ভূমিকা স্বপ্ন নামে নির্দ্দিষ্ট। এই ভূমিকাবস্থায় সমস্তই স্বপ্নবৎ প্রতীত হইয়া থাকে। অনন্তর শারদীয় মেঘখণ্ডের ন্যায় সেই স্বপ্নপ্রায় ভাবও বিলয় পাইয়া যায়। তখন যোগী মেঘমুক্ত শারদাকাশবৎ ক্রমশঃ বিশুদ্ধ চিন্মাত্র ভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যোগী ক্রমশঃ পঞ্চমী ভূমিকায় উপনীত হইয়া চিৎসত্তামাত্রে অবশিষ্ট রহেন। উক্ত পঞ্চমী ভূমিকার নাম সুষুপ্ত-

দশা। ঐ দশায় নিখিল ভেদজ্ঞান প্রশান্ত হইয়া যায়। তখন যোগী পুরুষ কেবল অদ্বৈতভাবেই অবস্থিত হইয়া থাকেন। যখন দ্বৈতভাব চলিয়া যায়, যোগী তখন অন্তরে অশেষ আনন্দ উপভোগ করিতে থাকেন। পঞ্চমী ভূমিকায় উপনীত যোগী সে কালে সুষুপ্ত জনবৎ আনন্দঘন হইয়া বিরাজ করেন। তিনি সর্ব্বদা বাহ্যিক কর্ম্ম করিতে থাকিলেও অন্তরে বৃত্তিশালী হইয়া রহেন। সর্ব্বদা প্রশান্তভাবে অবস্থান করেন বলিয়া তাঁহাকে যেন নিদ্রালু ব্যক্তি বলিয়া বোধ হয়। এই পঞ্চমী ভূমিকায় আরোহণ করিয়াই তিনি অভ্যাসবশে বাসনা ক্ষয় করিয়া থাকেন।

অতঃপর যোগী ষষ্ঠী ভূমিকায় পদার্পণ করেন। এই ভূমিকার অন্য নাম তুরীয়। ইহাতে 'আমি না সৎ, না অসৎ, না অহং না অনহং' এই-রূপই জ্ঞান হইয়া থাকে। এই অবস্থায় মনন ক্ষয় হয়। তাহাতে দ্বিত্ব বা একত্ব বিভাগ হইতে যোগী পুরুষ নির্ম্মুক্ত হইয়া থাকেন। সে কালে হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন হইয়া যায়; সর্ব্ব সংশয় তিরোহিত হয়; কোন ভাবনাই থাকে না—সমস্ত ভাবনার অবসান হয়। যোগী সে কালে জীবন্মুক্ত ভাব লাভ করেন। সম্পূর্ণ নির্ব্বাণ না হইলেও তৎকালে তিনি পট-প্রলিখিত প্রদীপের ন্যায় নির্ব্বাণভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যেমন আকাশস্থ শূন্য কলস, তেমনি তিনি অন্তরে বাহিরে সর্ব্বদিকেই শূন্য-ভাবে বিরাজমান। অন্যদিকে যেমন সাগরাভ্যন্তর-মগ্ন পূর্ণ কলস, তেমনি ভিতরে বাহিরে সর্ব্ব দিকেই তিনি পূর্ণভাবে অবস্থিত। সে কালে তিনি, কি-যেন কেমন এক অভূতপূর্ব্ব রূপে বিরাজ করিতে থাকেন। অথচ তিনি কোন কিছুই হন না, কিছুই বলিয়া তাঁহাকে মনে হয় না।

এইরূপে ষষ্ঠী ভূমিকায় উপনীত হইয়া যোগী ক্রমশঃ সপ্তমী ভূমিকায় আরোহণ করেন। এই ভূমিকায় অধিরূঢ় যোগী জন একেবারেই বিদেহ-মুক্ত হইয়া থাকেন। সপ্তমী ভূমিকায় যে অবস্থা ঘটিয়া থাকে, তাহা বাক্য দ্বারা পরিব্যক্ত করা যায় না। এই অবস্থাই সংসার-ভূমির সীমান্ত। ইহাকে কেহ শিব, কেহ ব্রহ্ম এবং কেহ কেহ বা প্রকৃতি-পুরুষের একীভাবে অবস্থান বলিয়া কীর্ত্তন করেন। এইরূপে স্ব স্ব কল্পনানুসারেই অনেকে ঐ অবস্থাকে অন্যান্য অনেক প্রকারে অভিহিত

করিয়া থাকেন। ফলে, এই অবস্থা অবর্ণনীয়। কোন কথা দ্বারাই উহা বুঝাইবার নহে। তবে যে এ সম্বন্ধে উপদেশ দান, তাহা কোনও প্রকারে হইয়া থাকে।

হে রঘুরাজ! এই আমি তোমার নিকট সপ্তবিধ ভূমিকার বার্ত্তা বলিলাম, এই সকল ভূমিকার অভ্যাসযোগ সংঘটিত হইলে আর কখনই দুঃখ ভোগ করিতে হয় না। শুন রাম! এক মৃদু-মন্দগামিনী করিণীর কথা কহিতেছি। সেই করিণী অত্যন্ত মদমত্তা। সে সর্ব্বদাই বিগ্রহ করিতে ব্যগ্র-চিত্তা। তাহার দুইটা বিশাল দন্ত বিদ্যমান। সে যদি যুদ্ধ করে, তবে ঘোর অনর্থ ঘটাইতে পারে। মানব কোনওরূপে সেই করিণীকে বধ করিতে পারিলেই উল্লিখিত সমগ্র ভূমিকা জয় করিতে সমর্থ হইয়া থাকে। কিন্তু সেই মদগর্ব্বিতা করিণীকে যতক্ষণে না জয় করা যায়, ততক্ষণ সংগ্রামক্ষেত্রে বিশিষ্ট যোদ্ধা বলিয়া খ্যাতি লাভ কেহই করিতে পারে না।

রামচন্দ্র কহিলেন,—প্রভো! কে ঐ মদ-গর্ব্বিতা করিণী? তাহার যুদ্ধভূমিই বা কৈ? কিরূপেই বা ঐ করিণীকে নিহত করা সম্ভবপর হইয়া থাকে? ঐ করিণীর ক্রীড়াস্থল কোথায়? এ সকল আমার নিকট বিশদভাবে বর্ণন করুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! 'ইহা আমার হউক' এইরূপ ইচ্ছাই ঐ করিণীর স্বরূপ। এই ইচ্ছারূপিণী মত্ত করিণী কলেবর-কাননে বিবিধোল্লাসে উল্লসিত হইয়া বিচরণ করে। মত্ত ইন্দ্রিয়গ্রাম উহার কোপনস্বভাব শাবকসকল। বিবিধ বাক্যভঙ্গী উহার বৃংহণ। শুভাশুভ দ্বিবিধ কর্ম্ম উহার দন্তযুগল। সর্ব্বব্যাপিনী বাসনাশ্রেণী ঐ করিণীর মদধারা। মনোরূপ গহন বনেই উহার বাস। হে রাম! এই যে বিশাল সংসার দেখিতেছ, এই সংসারই উহার সংগ্রামস্থলী। মানবেরা এই সংগ্রামক্ষেত্রেই বারম্বার জয় পরাজয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই ইচ্ছারূপিণী করিণী—যাহারা জীবাধম, তাহাদিগকেই দলিত করে। মানবদিগের আশয়-কোষগত বাসনা, চেষ্টা, মন, চিত্ত, সঙ্কল্প, ভাবনা ও স্পৃহা, এই সকল উহার নামনিচয়। ধৈর্য্য যেন তীক্ষ্ণ অস্ত্র; তাহার

সাহায্যে ঐ সর্ব্বত্র লীলা-বিহারিণী সর্ব্বময়ী ইচ্ছা-করিণীকে সর্ব্বথা পরাভূত করা কর্ত্তব্য। যতকাল ইহা এই বস্তু, আর ইহা অন্য বস্তু, এই প্রকার ভেদবুদ্ধি অন্তরে বিরাজ করে, এই কুসংসার-রূপিণী বিষম বিসূচিকা সেই পর্য্যন্তই বিদ্যমান থাকে। 'ইহা আমার হউক' এই প্রকার স-বাসন মন যতদিন রহিবে, এই সংসারেরও অবস্থিতি কাল ততদিন। কিন্তু ঐ স-বাসন মনের উপশমই মোক্ষ; ইহাই অধ্যাত্মশাস্ত্রের মর্ম্মার্থ। যে মনে ইচ্ছা নাই, মল নাই, দর্পণে তৈল-বিন্দুবৎ তাহাতেই নৈর্ম্মল্য-কারিণী নির্ম্মলা উপদেশবাণী কার্য্যকরী হয়। বাহ্য বিষয়ের বিস্মৃতি হইলেই ইচ্ছারূপ সংসারাঙ্কুর সংহার প্রাপ্ত হইয়া যায়। একবার নষ্ট হইয়া পুনরপি যদি ইচ্ছাঙ্কুর উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ ঐ অনর্থকরী ইচ্ছার উচ্ছেদসাধন করা কর্ত্তব্য। বাহ্য বস্তুর অভাবনাই অস্ত্র; সেই অস্ত্র লইয়াই ঐ বিষয়াঙ্কুর-সম ইচ্ছাকে সর্ব্বথা কর্ত্তন করিতে হইবে। ইচ্ছা-বিচ্ছুরিত জীব কখনই দীনতা হইতে মুক্তি পাইতে পারে না। অন্তরে চিত্তের যে নির্ব্ব্যাপারভাবে অবস্থিতি, তাহাই অসংবেদনের চেষ্টা। ফলে, চিত্ত ঐরূপে নির্ব্যাপার হইলেই বাহ্য বস্তুর বিস্মৃতি আপনা হইতেই ঘটিয়া থাকে। প্রথমতঃ সাবধানে চিত্তের ঐরূপ অবস্থা সম্পাদন করিতে হয়। অনন্তর যখন তাহা অভ্যস্ত হইয়া যায়, তখন আর সাবধানতার বিশেষ কোন প্রয়োজন থাকে না। সে কালে স্বতই উহা শবদেহবৎ চিরতরে নিদ্রিত হইয়া যায়।

হে রাঘব! প্রত্যাহার যেন বড়িশ; তুমি তাহার সাহায্যে ইচ্ছা-রূপিণী করিণীকে বাঁধিয়া ফেলো। আমার ইহা হউক, এইরূপে বিষয়ের দিকে চিত্তের যে অনুধাবন, তাহা সাধুগণের মতে কল্পনা নামে নিরূপিত। বাহ্য বস্তুর যে অভাবন, তাহারই নাম কল্পনা-ত্যাগ। রাম! তুমি জানিও—স্মৃতিই সঙ্কল্প এবং বিস্মৃতিই শিব। উক্ত উভয়ের মধ্যে বিশেষত্ব এই যে, যাহা পূর্ব্বানুভূত বিষয়, তাহারই স্মৃতি হয়, আর যাহা পূর্ব্বে অনুভূত হয় নাই, তাহারই সঙ্কল্প হইয়া থাকে।

হে মতিমন্! তুমি অনুভূত ও অননুভূত স্মৃতি ও সঙ্কল্প এই উভয়-কেই বিস্মৃত হইয়া যাও এবং কাষ্ঠখণ্ডের ন্যায় নিশ্চলভাবে অবস্থান করিতে

থাক। আমি ঊর্দ্ধবাহু হইয়া বারম্বার ইহা বলিতেছি, কিন্তু কেহই বোধ হয়, আমার এ কথা শুনিতেছে না। যাহা হউক, আমি ইহা পুনঃপুন সকলকে বলিয়া দিতেছি যে, সঙ্কল্প না করাই পরম মঙ্গল বিষয়। কিন্তু লোকে কেন এই বিষয়টা অন্তরে আলোচনা করিতেছে না? সঙ্কল্পত্যাগ বিশেষ আয়াস-সাধ্য নয়; তূষ্ণীম্ভাবে স্থিরচিত্তে অবস্থান করিলেই উহা সিদ্ধ হইয়া থাকে। এইরূপে সঙ্কল্পত্যাগ করিতে পারিলেই সেই প্রসিদ্ধ পরম পদ অধিগত হওয়া যায়। বলা বাহুল্য, ঐ পরম পদ লাভের নিকট অতি বড় সাম্রাজ্য লাভও তৃণবৎ অকিঞ্চিৎ বিষয়। সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিতে হইলেই যে দেহস্পন্দ পরিহার করিতে হইবে, তাহার কোন অর্থ নাই। দেখ, পথিক যখন বিদেশ গমন করে, তখন তাহার পদস্পন্দ হয়; কিন্তু সে পদস্পন্দে সঙ্কল্প কিছুই নাই। এইরূপ আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্মে যে দেহস্পন্দ, তাহা সঙ্কল্প অসত্ত্বেও সম্ভবপর। অধিক বলিয়া কি হইবে? সংক্ষেপে এই মাত্র বলিয়া রাখি যে, সঙ্কল্পই সুদৃঢ় বন্ধন; আর সঙ্কল্প-রাহিত্যই মোক্ষ। তাই বলিতেছি,—রামচন্দ্র! তুমি এই সকলই শান্ত, অজ, অনন্ত, শাশ্বত, অব্যয়; চিৎস্বরূপ বলিয়া জ্ঞান কর এবং শান্ত হইয়া পরমসুখে অবস্থিত হও। ব্রহ্মবিদ্‌গণ বিদিত আছেন—'অহং' 'মম' ইত্যাদিরূপে অধ্যস্ত সমস্ত ভেদের বিস্মরণই জীবব্রহ্মের ঐক্যযোগ। তুমি বাসনাহীন হইয়া ঐরূপ যোগ অবলম্বন করিয়া কর্ম্ম কর। যদি সমাধিমগ্ন থাক, তবে আর কর্ম্ম করিও না। বুধগণ বিদিত আছেন, বাহ্য বস্তুর বিস্মরণান্তে যথাযথ চিত্তক্ষয়ই যোগ। হে রাম! তুমি একান্ত তন্ময় হইয়া যে ভাবে থাকিতে হয়, তাহাই হইয়া থাক। ভাবনান্তর ছাড়িয়া যিনি শিব, শান্ত, সর্ব্বগত, অজ, জ্ঞান-ময় একাদ্বয় ব্রহ্ম, তাঁহাকে ভাবনা করাই সর্ব্বত্যাগ। তুমি অন্তরে অন্তরে সর্ব্বদা ঐ ব্রহ্মপদেরই ভাবনা করিতে থাক, আর স্বীয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম সমাধা করিয়া যাও। 'আমি' বা 'আমার' ইত্যাকার জ্ঞান যদি চিত্ত মধ্যে রক্ষিত হয়, তাহা হইলে দুঃখ হইতে মুক্তি পাওয়া সম্ভবপর নহে। যদি 'আমি' বা 'আমার' ইত্যাকার জ্ঞান দূরীভূত করা যায়, তাহা হইলেই দুঃখ হইতে মুক্তি লাভ হইয়া থাকে।

এই আমি সমস্ত কথাই কহিলাম,—এখন তোমার যেরূপ ইচ্ছা করিতে পার।

ষড়্বিংশত্যধিক শততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১২৬ ॥

সপ্তবিংশত্যধিক শততম সর্গ।

ভরদ্বাজ বাল্মীকির নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন,—রঘুকুলধুরন্ধর বিমলমতি শ্রীমান্ রাম, মুনিবর বশিষ্ঠ-বর্ণিত ঐ সকল অতি প্রাচীন জ্ঞানগর্ভ সার কথা সতত শ্রবণ করিয়া পরে আরও কি কোন কিছু জানিতে চাহিয়া ছিলেন? না, তাঁহার সেই সেই উপদেশবাক্যেই তিনি সমসুখপূর্ণ পূর্ণজ্ঞানস্বরূপে অবস্থিত হইয়া ছিলেন? বলিতে পারেন, তুমি নিজের দৃষ্টান্তেই বুঝিয়া দেখ না কেন, ইহার পর রামচন্দ্রের আর কোনও কিছু জিজ্ঞাস্য থাকিতে পারে কি না? এ কথার উত্তরে আমার বক্তব্য এই যে, রামচন্দ্র এবং আমি আমরা তো সমান নহি; আমাদের উভয়ের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান। তিনি যদি আমার সমকক্ষ লোক হইতেন, তাহা হইলে অবশ্যই বলিতে পারিতাম যে, অতঃপর তাঁহার আর কিছু জিজ্ঞাস্য থাকিতে পারে কি না? কিন্তু তাহা তো নহে। তিনি রাম পরম যোগী; আমাদের অপেক্ষা অনেক উচ্চ পদে তাঁহার অবস্থান। তিনি এক্ষণে বিশুদ্ধ বোধস্বরূপে অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার জনন-মরণ নাই; তাহা তিনি জয় করিয়াছেন। তিনি বিশ্ববন্দ্য সুরেশ্বর। এ জগতের তিনি আদিভূত। তাঁহাতে সর্ব্বগুণ বিরাজমান। লক্ষ্মীর তিনি নিত্য সহচর। এই ত্রিজগতের সৃষ্টি, রক্ষা ও অনুগ্রহ এই ত্রিবিধ অবস্থার তিনিই একমাত্র কর্ত্তা। আমি তাঁহা অপেক্ষা অল্পজ্ঞ এবং অল্পতর সাধন-সম্পন্ন মুমুক্ষু মাত্র। সুতরাং আমার ক্ষুদ্রবুদ্ধি রামের জিজ্ঞাস্য আছে কি না, তাহার কোন পক্ষ নিশ্চয় করিতে পারে কি?

বাল্মীকি কহিলেন,—কমলাক্ষ রামচন্দ্র মুনিবর বশিষ্ঠের নিকট ঐ

সকল বেদান্ত-বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক সর্ব্ববিজ্ঞান বিদিত হইলেন। তাঁহার চিত্তবৃত্তি অখণ্ড ব্রহ্মাকারে আকারিত হইল। তাহাতে নিত্য নিরতিশয় আনন্দপূর্ণ আত্মতত্ত্বের আবির্ভাব ঘটিল। অবিদ্যারূপ সম্পুট তাঁহার উদ্‌ঘাটিত হইয়া পড়িল। তিনি নিজেই নির্ম্মল চিদ্‌ঘন হইয়া উঠিলেন। সে কালে প্রশ্ন বা উত্তরের উক্ত বা অনুক্ত অংশের বিচার-বিবেচনা করিবার অবসর আর তাঁহার রহিল না। তিনি মুহূর্ত্তমধ্যে উদ্বুদ্ধ হইয়া চিদানন্দময় সাগর-হিল্লোলে ভাসিতে লাগিলেন। প্রাণ তাঁহার আনন্দ-সুধায় প্লাবিত হইয়া গেল; কলেবর কণ্টকিত হইল। তিনি সর্ব্বাধিষ্ঠান-রূপ সত্তামাত্রে অবস্থানপূর্ব্বক সর্ব্বব্যাপী চিৎস্বরূপে বিরাজ করিতে লাগিলেন। অণিমাদি অষ্টৈশ্বর্য্যও তাঁহার নিকট তখন তৃণবৎ অকিঞ্চিৎ-কর বলিয়া বোধ হইল। সেই সেই ঐশ্বর্য্য-বিষয়িণী ইচ্ছাও তিনি পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার শিবপদে পরিণতি হইল। তিনি মৌনী হইয়া রহিলেন; সে কালে আর কোন কথাই কহিলেন না।

ভরদ্বাজ কহিলেন,—অহো! ইহা আমার নিকট বড়ই আশ্চর্য্য বলিয়া বোধ হইতেছে যে, রামচন্দ্র ইতিমধ্যেই পরম পদ প্রাপ্ত হইলেন? হে মুনিনায়ক! আমাদের ভাগ্যে কিরূপে ঐরূপ পরম পদ প্রাপ্তি ঘটিতে পারে? অস্মাদৃশ মূর্খ, স্তব্ধ, অজ্ঞ পাপী জনই বা কোথায়? আর ব্রহ্মাদিরও প্রার্থনীয় দুর্লভ্য রামের অবস্থাই বা কৈ? হে গুরো! হে মুনিবর! কিরূপে আমি বিশ্রাম লাভ করিব? কিরূপে এই দুস্পার ভবাব্ধি হইতে আমার উদ্ধার হইবে? তাহা আমাকে সত্বর বলুন।

বাল্মীকি বলিলেন,—ভরদ্বাজ! তুমি এই রাম-বশিষ্ঠ-সংবাদ আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত স্বীয় বুদ্ধিবলে বিচার করিতে থাক। আমি তোমাকে এখন তদনুসারে কিঞ্চিৎ উপদেশ প্রদান করিতেছি, তুমি তাহা শ্রবণ কর। এই যে অবিদ্যা-প্রপঞ্চ, ইহাতে সত্যাংশ কিছুমাত্র নাই। ইহাই বিবুধগণের ধারণা; কিন্তু অবিবেকী লোকেরা ইহা লইয়াই বিবাদ বিতর্ক করে। দেখ, চিদ্‌ব্যতীত কোন বস্তুই নাই; সুতরাং কেন আর এই প্রপঞ্চ-জালে আবদ্ধ হইয়া থাক। হে বয়স্য! বশিষ্ঠ যে গূঢ় রহস্য

ব্যক্ত করিয়াছেন, আর আমি তোমায় যাহা বলিতে উদ্যত হইয়াছি, ইহা তুমি অভ্যাস করিয়া নির্ম্মলাশয় হও। দেখ, এই প্রপঞ্চ-বিষয়ক বৃত্তি, জাগ্রৎ হইলেও নিদ্রা বলিয়াই নির্দ্দিষ্ট। পরন্তু যিনি প্রবুদ্ধ ব্যক্তি, তিনি ঐ অবিদ্যারূপ তিমির-স্তোমের মধ্যস্থ নিরঞ্জন চিৎপ্রদীপরূপে প্রতিভাত। হে সখে! এই যে জাগ্রৎপ্রপঞ্চ আছে, ইহার মূলে, অগ্রে ও মধ্যে সর্ব্বত্রই শূন্যাকার; সমস্তই শূন্যময়। ইহাতে সারাংশ বলিয়া কোন কিছুই নাই; তাই, সাধু মনীষিগণ ইহাতে আস্থা বন্ধন করেন না। এ সংসার বহু বিলাসময়; ইহা অসৎ হইলেও অনাদি বাসনার দোষে সৎ-স্বরূপে পরিদৃষ্ট হয়। যাহা চৈতন্যরূপিণী কল্যাণদায়িনী পীযূষবল্লী, তাহাকে তুমি পরিত্যাগ করিয়া বাসনারূপিণী বিষবল্লরীর আশ্রয় লইয়া কেন বৃথা মোহাবিষ্ট হইতেছ? যাহাতে চিত্তস্থৈর্য্য সম্পাদন করে, তথাবিধ নিরালম্ব জ্ঞানের অবলম্বনে অগ্রেই এই জাগ্রদ্ভাব দূরীভূত হইয়া যায়, ইহাই নিরালম্ব জ্ঞানী যোগিগণের অভিমত। অনন্তর তুরীয় দশার উপস্থিতি; ঐই দশায় জাগ্রৎ, স্বপ্ন বা সুষুপ্তি, ইহার কোন দশাই থাকিবার নয়। যে পর্য্যন্ত না কৃতিগণ পীযূষ-রসময়ী চৈতন্যরূপিণী মহানদীতে আত্ম-রূপে অবগাহন করিয়া থাকেন, সেই পর্য্যন্তই উহা জগদাকার ভীষণ তরঙ্গ-ভঙ্গময় বলিয়া প্রতীয়মান হয়। হে সখে! যে বস্তু আদিতে নাই, অন্তে নাই, মধ্যেও তাহার অনস্তিত্বই জানিবে—সে বস্তু এই জগৎ, ইহা স্বপ্নপ্রায় মিথ্যা বলিয়াই অবধার্য্য। এই সকল অবিদ্যা-জনিত বিবিধ বস্তু ক্ষণকালের জন্য বুদ্বুদবৎ উদ্ভূত হইয়া জ্ঞানাম্বুধিগর্ভে বিলয় পাইতেছে। তুমি ঐ কালের মধ্যেই সেই চৈতন্যরূপিণী শীতসলিলা নদীকে বিদিত হইয়া তাহাতে অবগাহন করিতে থাক। সেই অবগাহনের ফলে বাহ্যিক ভ্রান্তি-জনক অসুখাবহ নিদাঘ তোমার অপসারিত হউক। একমাত্র অজ্ঞানরূপ অম্বুনিধিই এ জগৎকে প্লাবিত করিয়া অবস্থান করিতেছে। ইহাতে 'আমি' বলিয়া যে একটা জ্ঞান, তাহাই ঐ অজ্ঞানাব্ধির আদি-ঊর্ম্মি। ঐ ঊর্ম্মি অবিদ্যারূপ অনিলের আন্দোলনেই উদ্ভূত হইয়া থাকে। চিত্তের স্খলন ও বিষয়াসঙ্গ প্রভৃতি উহার আরও অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গমালা বিরাজমানা। ঐ অম্বুধির আবর্ত্তের নাম মমতা; উহা আপনা হইতেই আবির্ভূত

হইতেছে। আসক্তি ও দ্বেষ এই দুইটী উহার মধ্যচারী জলজন্তু; উহারা যদি তোমাকে আক্রমণ করে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তোমাকে অনর্থরূপ পাতালতলে প্রবেশ করিতে হইবে। তাৎকালিক সেই পাতাল-পতন কেহই নিবারণ করিতে পারিবে না। সুতরাং তোমায় বলিতেছি,—তুমি ঐ ভীষণ সাগর হইতে উত্তীর্ণ হইয়া অদ্বৈতরূপ অমৃত-সাগরে অবগাহন কর। এ সাগরের পীযূষ-রসময়ী তরঙ্গভঙ্গী সর্ব্বদাই শান্তি-দায়িনী। তুমি এইরূপ সাগর পরিহার করিয়া কেন সেই দ্বৈতজ্ঞানরূপ লবণাম্বুধির ভীষণ তরঙ্গ-ভঙ্গিমায় মগ্ন হইতেছ? দেখ, 'আসা' 'যাওয়া' 'থাকা' এ সকল কেবল মোহেরই খেলা। কে আসিয়াছে? কে গিয়াছে? কে আছে? আর কেই বা কাহার হইতেছে? ফলে এ সমস্তই মহামোহ। যাহা মোহ, তাহাতে তুমি মগ্ন থাকিবে কেন? তুমি বিবেকশালী হইয়া অবস্থান করিতে থাক। ঐ অবস্থায় উপনীত হইয়া আর যেন মহামোহে পতিত হইও না। একমাত্র আত্মাই তত্ত্ব; এ জগৎ আত্মা বৈ আর কিছুই নহে। ইহাই যখন সকলের অভিমত, তখন কি বলিব, সখে! তোমার আর কি গিয়াছে? কে তোমার শোকের বিষয় হইয়াছে? এই জগদাকারে পরব্রহ্মের বিবর্ত্ত, এ কথা বালকের প্রতিই উপদেশ্য; কিন্তু যাঁহারা তত্ত্ববেদী, তাঁহারা অবগত আছেন—ব্রহ্ম আনন্দময়; তিনি সর্ব্বদাই অবিবর্ত্তিরূপে বিরাজমান। যাহার বিবেক নাই, সেই লোকই শোক প্রকাশ করে। অবিবেকী লোকই কোন কিছু ইষ্ট বস্তু পাইলে সহসা হৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু যিনি তত্ত্ববিৎ, তিনি সকলই অলীকবোধে সহাস্য-আস্যে অবস্থান করেন। সত্য বটে, তত্ত্ববিৎ ব্যক্তির কখন কখন মোহ দেখা যায়। কিন্তু তাহা বাস্তব নহে; অজ্ঞচেষ্টার অনুকরণ মাত্র। আত্মতত্ত্ব অতি সূক্ষ্ম বস্তু, তাহা আবার অবিদ্যাবৃত হওয়ায় জলে স্থল ও স্থলে জল ভ্রমের ন্যায় অজ্ঞ জনের চক্ষে বীপরীত বলিয়াই পরিদৃষ্ট হয়। ক্ষিত্যাদি মহাভূত হইতে পরমাণু পর্য্যন্ত নিখিল বিশ্ব একমাত্র ব্রহ্ম বৈ আর কিছুই নহে। সুতরাং ছাড়িয়া গেল বা গত হইল বলিয়া শোক করিবে কাহার নিমিত্ত? ফলে সতের অভাব কখনই ভো নাই।

হে সখে! যাহা অসৎ, তাহার সম্ভব নাই আর যাহা সৎ, তাহারও

কোনই অভাব নাই। তবে আবির্ভাব ও তিরোভাব এ দুইটা কেবল মায়া-বিজৃম্ভিত বস্তুরই ঘটিয়া থাকে। এ জগৎ মায়িক বটে; কিন্তু পূর্ব্বাচরিত পৌরুষ যত্ন—পাপ ও পুণ্যপ্রভাবেই ইহা বিষবৎ অনর্থকর হইয়া পড়িয়াছে। যদি পূর্ব্বাচরিত পাপপুণ্য নষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলেই এই মায়িক জগৎ ঐন্দ্রজালিক ব্যাপারের ন্যায় একটা অলীক বস্তু হইয়া পড়ে। তোমার পূর্ব্বার্জ্জিত পাপ-পুণ্য এখনও বিদ্যমান; তাই উপদিষ্ট বিষয় অবধারণে তুমি অক্ষম। অতএব পূর্ব্বকৃত পাপক্ষয়ের নিমিত্ত জগদ্‌গুরু সগুণ ঈশ্বরের উপাসনা কর। অদ্যাপি তোমার সমস্ত দুরিত ক্ষয়িত হয় নাই। তাই তুমি বদ্ধ রহিয়াছ। দেখ, পরমেশ কর্ম্মপাশ দ্বারাই জীবরূপ পশু-সমূহকে বাঁধিয়া রাখিয়াছেন। তুমি অগ্রে সাকার ঈশ্বরের আরাধনা কর। অনন্তর যখন তোমার চিত্তশুদ্ধি সংঘটিত হইবে, তখন নিরাকার পরতত্ত্বে তুমি সহজেই স্থিতি লাভ করিতে পারিবে। সাকার ব্রহ্মের উপাসনা কর; তাহাতে চিত্ত শুদ্ধি হইবে। চিত্ত শুদ্ধি হওয়ায় প্রবল অজ্ঞান-তিমিরের ব্যামোহশক্তি পরাজয় করিয়া বিশ্বস্ত অন্তরাত্মার সহায়তায় ইন্দ্রিয়-নিগ্রহরূপ যোগোপায় তুমি অবলম্বন কর। অনন্তর ক্ষণমাত্র সমাধি-যোগেই আপনা হইতে প্রত্যক্ আত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারিবে। তাঁহার সাক্ষাৎ ঘটিলে তোমার এই তমসাবৃত বুদ্ধি-বিভাবরীর অবসান হইবে। কেবল মাত্র পুরুষকারের অবলম্বনেই কার্য্য সফল হয় না। যদি মহেশ্বরের অনুগ্রহ লাভ হয়, তবে লোকে প্রাপ্য অর্থ অধিগত হইতে পারে। পরন্তু ঈশ্বরের উপাসনা ভিন্ন তদীয় অনুগ্রহ লাভ সম্ভবপর নহে। বলিতে পার, প্রাক্তন কর্ম্মাপেক্ষা আভিজাত্য, সদাচার বা তপস্যাদি অদ্যতন পুরুষ প্রযত্নের প্রাবল্যই পূর্ব্বে সাধিত হইয়াছে; এখন আবার ঈশ্বরের অনুগ্রহাপেক্ষার কথা বলা হইতেছে কেন? তাহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, প্রবল প্রাক্তন কর্ম্মের নিকট অদ্যতন আভিজাত্য, চরিত্র, নীতি বা বিক্রম কিছুই নহে; এই জন্যই প্রাক্তনেরই প্রাবল্য বলা হইয়াছে। পুরাতন কর্ম্ম সকল অনন্ত আর ইদানীন্তন পুরুষপ্রযত্ন অল্পতর; সুতরাং ঈশ্বরের অনুগ্রহ ভিন্ন তৎসমুদায়ের জয় সিদ্ধি অসম্ভব। তবে কি কেবল ঈশ্বরোপসনাই কর্ত্তব্য? না—তাহার সঙ্গে সঙ্গে যম-নিয়মাদি করাও কর্ত্তব্য। যম-

নিয়মাদি-জনিত অপ্রতর্ক্য জ্ঞান লাভ হইতে তোমার আশঙ্কার কারণ কি আছে? তাহার সাধনায় তো কোনই আশঙ্কা নাই। যম-নিয়মাদির অসকৃৎ অভ্যাসযোগে যে জ্ঞান আসিয়া অতর্কিতভাবে উপস্থিত হইবে, তাহার লাভ ব্যতীত নির্ব্বাণ লাভ কোন ক্রমেই সম্ভবপর নহে। ঈশ্বর স্বয়ং স্বহস্তে কাহারও ললাট-লিপি মুছিয়া দেন না; তাঁহার উপাসনা করিতে হয়, আর সঙ্গে সঙ্গে যমনিয়মাদির অভ্যাস করিতে হয়; তাহা হইলেই ললাটলিপি বা প্রাক্তন কর্ম্ম ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। কর্ম্মক্ষয়েই তত্ত্বজ্ঞান লব্ধ হইয়া থাকে। এ সম্বন্ধে যাহা ঈশ্বরেচ্ছারূপিণী নিয়তি শক্তি, তাহারই সর্ব্বথা উৎকর্ষ বলা যায়। নচেৎ যিনি অবাঙ্মনস-গোচর অখণ্ড চৈতন্য অবগত হইয়াছেন, তাদৃশ উপদেষ্টাই বা কোথায়? আর সেই দুরূহ উপদেশ অবগত হইবার শক্তিই বা কৈ? অপিচ এই যে মোহ-বল্লরী, ইহাই বা কোথায়? ফলে নিয়তিশক্তি অচিন্তনীয়; তাহার প্রভাবেই ঐ সকল অসম্ভবও সম্ভব হইয়া থাকে।

হে ভরদ্বাজ! তুমি বিবেকবলে তোমার মোহজাল ছেদন কর। তোমার মোহ বিনষ্ট হইলে তুমি এইক্ষণেই অসামান্য জ্ঞান প্রাপ্ত হইতে পারিবে। মহাসমর উপস্থিত হইলে যে রাজা প্রবল বলশালী, তিনি অসীম উৎসাহে যুদ্ধ করিয়া থাকেন। আর যাহার বল অল্প, সামান্য বিপদেও তাঁহার যুদ্ধাবসাদ ঘটে। ফল কথা, তোমার বিবেক-বল যথেষ্ট আছে। কেন তুমি শোকাভিভূত হইবে? দেখ, বহু জন্ম অতীত হইলে কদাচিৎ কাহারও ভাগ্যে পুণ্যবশেই তত্ত্বজ্ঞান জন্মিয়া থাকে। এ সম্বন্ধে জীবন্মুক্ত ব্যক্তিই দৃষ্টান্ত স্থল। সেই দৃষ্টান্ত দেখিয়াই পুণ্যরাশি সঞ্চয়ে প্রযত্ন করিতে হয়। দেখ, বৎস! যে কর্ম্ম শত্রুস্বরূপ হইয়া তোমাকে আবদ্ধ করিয়াছে, তাহাই আবার মিত্র হইয়া তোমাকে বন্ধন হইতে মুক্ত করিবে। ফলে, তুমি নিষ্কাম হইয়া পুণ্যার্জ্জন কর; তোমার মোক্ষ-লাভ নিশ্চিত। বর্ষার জলধারা যেমন দাবদাহ নির্ব্বাণ করিয়া ফেলে, সাধু মহাপুরুষদিগের পুণ্য কর্ম্মও তেমনি প্রাক্তন পাপরাশি নাশ করিয়া আধ্যাত্মিকাদি ত্রিবিধ তাপের উপশম করিয়া থাকে। হে সখে! তুমি যদি এ সংসারের চক্রাবর্ত্ত ভ্রম উপশম করিতে চাও, তাহা হইলে সর্ব্ব কর্ম্ম-

ফল পরব্রহ্মে অর্পণ করিয়া তাঁহাতেই নিরন্তর অনুরক্ত হইয়া থাক। যত কাল বাহ্য পদার্থে অনুরাগ, তাবৎ পর্য্যন্তই এই সকল বিকল্প-কল্পনার অভ্যুদয়। দেখ, জলরাশি যদি উদ্বেল হয়, তবে সাগরও প্রতিকূল স্বভাব ধারণ করে। আর জল স্থির হইলে সাগরও স্থৈর্য্যশালী হয়। কি বলিব? কেন তুমি এই অজ্ঞান-জনক শোকের আশ্রয় লইয়াছ? সত্যই যদি শোকান্ধ হইয়া থাক, তবে তুমি অভঙ্গুরা প্রজ্ঞাযষ্টি অবলম্বন কর; তাহাই তোমার পরিচালক হউক। চঞ্চল তরঙ্গভঙ্গে তীরগত তৃণ যেমন অপহৃত হয়, তেমনি যাহারা হর্ষ-বিষাদের বশীভূত, তাহারা কখনই মহাপুরুষদিগের গণনায় গণ্য হইবার নহে। দেখ সখে! এ জগতের সর্ব্ব জীব দিবস-রজনী শোক-হর্ষাদি দশারূপিণী দোলায় আরোহণপূর্ব্বক নিরন্তর দুলিতেছে। কামাদি ষড়্‌বিধ দোলাযন্ত্রে উপবেশন করিয়া কাল কেবলই ক্রীড়া করিতেছে। সুতরাং তোমার এ জন্য খেদের বিষয় কি আছে? কাল কুতূহলী হইয়া একবার এ জগৎ সৃষ্টি করে, আবার সংহার করে; এইরূপে ক্ষিপ্রহস্তে পুনঃপুন সৃষ্টি সংহার করিতেছে। কাল-ভুজঙ্গ সর্ব্ববস্তু আক্রমণপূর্ব্বক অনবরত গ্রাস করিতেছে। ক্ষুদ্র, মহৎ, কোনই বাদ বিচার নাই; নিরপেক্ষভাবে সকলকেই সে গ্রাস করে। এই কালের কবল হইতে দেবগণেরও মুক্তি প্রাপ্তি নাই। সুতরাং স্বল্প নিমেষমাত্র স্থায়ী মানবদিগের কথা আর কি বলিব? বৎস! তুমি বিপদ্‌কালে অধীর হও কেন? আর সম্পৎকালেই বা আনন্দে নৃত্য কর কি জন্য? একবার ক্ষণেকের তরে নিশ্চল হও,—হইয়া সংসার-রঙ্গভূমির অভিনয় অবলোকন কর।

হে ভরদ্বাজ! যিনি মনস্বী—যিনি বিবেকশালী, এই ক্ষণভঙ্গুর জগতের জন্য তিনি কিঞ্চিন্মাত্রও বিষাদসম্পন্ন হইবার নহেন। তাই বলিতেছি, তুমি অমঙ্গল্য শোক পরিত্যাগ কর—যাহা মঙ্গলের হেতুভূত, তাহাই চিন্তা করিতে থাক। যিনি চিদানন্দঘন আত্মা, তাঁহাকেই ভাবনা কর। দেব, দ্বিজ ও গুরুর প্রতি যাঁহারা শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন, এবং শাস্ত্রা-দিষ্ট বিধি-নিষেধ মানিয়া চলেন, মহেশ্বর নিজেই তাঁহাদিগকে অনুগ্রহ করিয়া থাকেন।

ভরদ্বাজ কহিলেন,—গুরুদেব ! ভবৎপ্রসাদে সকলই আমি সম্পূর্ণরূপে অবগত হইলাম। এতদিনে বুঝিতে পারিলাম—বৈরাগ্য অপেক্ষা পরম বস্তু আর নাই এবং সংসার হইতেও প্রবল রিপু নাই। যাহা হউক, মহর্ষি বশিষ্ঠ এ যাবৎ এই নিখিল গ্রন্থে যে সকল জ্ঞানসার উপদেশ প্রদান করিলেন,—আমি অধুনা তাহা শুনিতে সমুৎসুক হইয়াছি। আপনি অনুগ্রহ করিয়া প্রকাশ করুন।

বাল্মীকি কহিলেন,—ভরদ্বাজ ! আমি অধুনা তোমার নিকট এই মুক্তিজনক মহাজ্ঞানের কথা কহিতেছি, তুমি ইহা শ্রবণ কর। ইহা শুনিলে তোমাকে আর এই সংসারসাগরে পতিত হইতে হইবে না, যিনি এক হইয়াও উৎপত্তি, স্থিতি ও সংহৃতি ভেদে অনেকধা অবস্থিত, আমি সেই চিদানন্দমূর্ত্তি পরমেশ্বরকে নমস্কার করি। এই বিশ্বপ্রপঞ্চের বিলয় ঘটিলে যেরূপে আত্মতত্ত্ব পরিস্ফুরিত হয়, শ্রৌত নীতির অনুসরণপূর্ব্বক আমি তোমার নিকট তাহা প্রকাশ করিতেছি। জানি আমি পৌর্ব্বাপর্য্য বিচার বিষয়ে তোমার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ছিল ; তাহা এক্ষণে নষ্ট হইল কিরূপে ? সেই বুদ্ধি যদি তোমার থাকিত, তবে যতটুকু বলা হইয়াছে, তাহাতেই করগত আমলক-ফলবৎ অনায়াসেই তুমি সমস্ত বুঝিতে পারিতে। দেখ, যদি আপনা হইতে অন্তরে বিচারালোচনা করা হয়, তাহা হইলেও যে পদ-প্রাপ্তিতে আর শোক করিতে হয় না, সেই পদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। সাধুসঙ্গ, সাধুশাস্ত্রের আলোচনা ও বিবেকবশে বৈরাগ্য-সম্পন্ন মন দ্বারা ইহা সর্ব্বদাই চিন্তনীয়।

সপ্তবিংশত্যধিক শততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১২৭ ॥

অষ্টাবিংশত্যধিক শততম সর্গ

বাল্মীকি কহিলেন,—ভরদ্বাজ প্রথমে কাম্য ও নিষিদ্ধ কর্ম্মের বর্জ্জন-পুরঃসর বিষয়েন্দ্রিয়ের সম্মিলন-জনিত সুখোদয় হইতে উপরত এবং শান্ত ও দান্ত হইয়া গুরু ও বেদান্ত বাক্যে শ্রদ্ধাযুক্ত হইতে হয়। অনন্তর কোমলাসনে সমাসীন হইয়া চিত্ত ও ইন্দ্রিয়ক্রিয়ার নিরোধ এবং প্রে

পর্য্যন্ত না মনের নৈর্ম্মল্য সাধন হয়, ততকাল প্রণব জপ করিতে হয়। ইহার পরে সাধক স্বীয় অন্তঃকরণের শুদ্ধি সাধনের নিমিত্ত প্রাণায়াম করিতে থাকিবেন। পরে ইন্দ্রিয়গ্রাম যাহাতে বিষয়সমূহ হইতে নিবৃত্ত হয়, তাহার জন্য ধীরে ধীরে চেষ্টা করিবেন। দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও ক্ষেত্রজ্ঞ, এই সমুদায়ের মধ্যে যাহা হইতে যাহার উৎপত্তি হয়, তৎসমস্ত বিদিত হইয়া পশ্চাৎ তাহাতেই তাহাদিগকে বিলীন করিবেন। অনন্তর এইরূপে আধ্যাত্মিক দেহেন্দ্রিয়াদি ভাব পরিত্যাগ করিয়া 'আমিই বিরাট' এইরূপ ভাবনায় প্রথমতঃ তৎকারণভূত দেবতাসমষ্টিরূপে প্রণবের অকারার্থ—বিরাড়াত্মায় অবস্থানপূর্ব্বক পশ্চাৎ উকারার্থ—সূক্ষ্ম লিঙ্গ সমষ্টিস্বরূপ হিরণ্যগর্ভে সেই বিরাটভাব বিলীন করিয়া অবস্থিত হইবে। পরে তৎকারণীভূত মকারার্থ—ত্রিগুণময় মায়োপাধিক অব্যাকৃত ব্রহ্মে ঐ হিরণ্যগর্ভের বিলয় সাধনান্তে উল্লিখিত অব্যাকৃত ব্রহ্মস্বরূপে বিরাজ করিবেন। তদনন্তর সর্ব্ব জগতের মূলকারণ অর্দ্ধ-মাত্রোপলক্ষিত বিশুদ্ধ ব্রহ্মে উক্ত অব্যাকৃত ভাবেরও বিলয় বিধান করিয়া স্বয়ং বিশুদ্ধ ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থিত হইবেন। ক্রমে শরীরের পার্থিবাংশ—মাংসাদি পৃথিবীতে, এবং জলীয়াংশ—রস রক্তাদি—জলে, তৈজস অংশ তেজে, বায়বীয়াংশ মহাবায়ুতে এবং আকাশাংশ আকাশে বিলীন করিবেন।

এইরূপে ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয়সমূহকে তৎকারণ দেবতোপাধিভূত সূক্ষ্ম পৃথিবী প্রভৃতিতে প্রলীন করিয়া জীবের ভোগসিদ্ধির নিমিত্ত শ্রোত্রেন্দ্রিয়-ভাবাপন্ন দিক্‌কে দিকে, স্বীয় শ্রোত্র ও ত্বক্‌কে বিদ্যুতে, চক্ষুকে সূর্য্যবিম্বে, বাসনাকে সলিলে, প্রাণকে পবনে, বাক্যকে বহ্নিতে, হস্তকে ইন্দ্রে, পাদদ্বয় বিষ্ণুতে, পায়ুদেশ মিত্রে, উপস্থ কশ্যপে, মন চন্দ্রমায়, বুদ্ধিকে চতুরানন ব্রহ্মায় এবং অহঙ্কারকে রুদ্রে বিলীন করিবেন। এইভাবে ইন্দ্রিয়সমূহকে ইন্দ্রিয়-দেবতায় লীন করিতে হইবে। শ্রৌত বাক্য প্রমাণের অনুসরণ করিয়াই অগ্ন্যাদি ইন্দ্রিয়-দেবগণ ইন্দ্রিয়-ব্যপদেশে বিরাজিত। বলা বাহুল্য, ইহা স্বকপোল-কল্পিত নহে।

এই প্রকারে আত্মদেহের বিলয় সাধনান্তে 'আমিই বিরাট' এইরূপে চিন্তা করিতে হয়। ব্রহ্মাণ্ডরূপী বিরাটের হৃদয়পদ্মে যাঁহার সর্ব্বদা

অধিষ্ঠান, এবং ব্রহ্মবিদ্যা যদীয় অর্দ্ধনারীশ্বররূপ, সেই সর্ব্বভূতাধার অব্যাকৃত ব্রহ্ম জগতের কারণ বলিয়া নিত্য অভিহিত। তিনি জগদ্‌বাসী সর্ব্বপ্রাণীর পিতা; তাই সমস্তের জীবিকার উপায় উদ্ভাবনে অবহিত হইয়া হবি ও বৃষ্টি প্রভৃতি যজ্ঞ-সৃষ্টিরূপে অবস্থিত। এই ব্রহ্মাণ্ড ক্ষিতিপ্রভৃতি ভূত-পঞ্চকের আবরণে আবৃত হইয়া বিরাজমান। এই ব্রহ্মাণ্ডের বহির্ভাগে দ্বিগুণ পৃথ্বী, তদ্বহির্ভাগে দ্বিগুণ জল, জলের বহির্ভাগে দ্বিগুণ তেজ, তেজের পরবর্ত্তী দ্বিগুণ বায়ু, বায়ুর বহির্ভাগে দ্বিগুণ আকাশ, এইরূপ ক্রমে উত্তরোত্তর প্রত্যেকতঃ অপঞ্চীকৃত ও পঞ্চীকৃত ভাবে এই জগৎ গ্রথিত। এতন্মধ্যে পার্থিবাংশ জলে, জলীয়াংশ বায়ুতে, বায়বীয়াংশ আকাশে এবং আকাশাংশ সকলের মূল কারণ মহাকাশে প্রলীন করিবে। অনন্তর যোগযুক্ত, সাধক লিঙ্গদেহ ধারণপূর্ব্বক ক্ষণকাল মহাকাশে বিরাজ করিবেন। বুধগণের মতে বাসনা, সূক্ষ্মভূত, কর্ম্ম, অবিদ্যা, দশ ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি-সমষ্টি স্বরূপ দেহই লিঙ্গদেহ নামে নির্দ্দিষ্ট। যোগী এইরূপে স্থূল দেহের বিলয়ে অর্দ্ধবৎ সম্পন্ন হইয়া ব্রহ্মাণ্ডভাবের অভিমান পরিত্যাগ-পূর্ব্বক তাহা হইতে বহির্ভূত হইবেন এবং সেই সূক্ষ্ম ভূতাত্মক লিঙ্গ-সমষ্টিদেহে 'আমিই আত্মা হিরণ্যগর্ভ' এইরূপ চিন্তা করিতে থাকিবেন। বলিতে পার, পদ্মোদ্ভব দেহই জগতে হিরণ্যগর্ভ বলিয়া প্রসিদ্ধ। কিন্তু ইনি হইলেন—ভূত সূক্ষ্ম সমষ্টি-স্বরূপ। ইনি তো চতুর্ম্মুখ নহেন; সুতরাং ইঁহাকে হিরণ্যগর্ভ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইবে কিরূপে? এ কথার উত্তরে বলা যায়, ইনি সূক্ষ্ম ভূতে অভিমানিরূপে ব্যবস্থিত হইয়া ব্রহ্মাণ্ডপ্রলয়ের পূর্ব্বক্ষণে ব্রহ্মাণ্ডৈশ্বর্য্যের ভোগ নিমিত্ত পদ্মোদ্ভব দেহ কল্পনাপুরঃসর চতুর্ম্মুখ হইয়াছিলেন। যাহা হউক, পরে সেই বুদ্ধিমান্ যোগী সেই সমষ্টি লিঙ্গদেহকেও অপঞ্চীকৃত ভূতাপেক্ষা সূক্ষ্ম উপাধিরূপে অব্যাকৃত মায়াংশোপহিত চিদাকারে অব্যক্ত-আত্মায় বিলীন করিয়া ফেলিবেন। এ জগৎ যে অবস্থায় নামরূপ হইতে নির্ম্মুক্তভাবে অবস্থিত হয়, স্ব স্ব তর্ক-প্রভাবে কেহ কেহ তাহাকে প্রকৃতি, কেহ কেহ মায়া, কেহ কেহ অবিদ্যা, এবং কেহ কেহ বা অণু আখ্যায় অভিহিত করেন। প্রলয়-কালের অভ্যুদয়ে সমস্ত পদার্থপুঞ্জ উক্ত অব্যাকৃত পদে প্রলীন হইয়া পরস্পর সম্বন্ধশূন্য,

হয় এবং তদবস্থায় উহারা ভোগ্যত্বারূপ আস্বাদ-বিরহিত হইয়া অব্যক্তভাবে অবস্থান করিতে থাকে। পুনঃসৃষ্টি না হওয়া পর্য্যন্ত উহাদের ঐ ভাবেই অবস্থিতি হয়। সৃষ্টিকালে আকাশাদি ক্রমেই সৃষ্টি হইতে থাকে। যখন সংহারকাল উপস্থিত হয়, তখন সংহারকার্য্য সৃষ্টির বিপরীত ক্রমেই ঘটিতে থাকে। যোগী এইরূপে উক্ত বিরাট-হিরণ্যগর্ভাদি স্থানত্রয় পরিত্যাগপূর্ব্বক অব্যয় তুরীয় পদপ্রাপ্তির জন্য তাঁহারই ধ্যান করিতে থাকিবেন। এই প্রকারে লিঙ্গদেহের লয় করিয়া যোগী ব্যক্তি পরমানন্দময় ব্রহ্মপদেই লীন হইবেন। বিশুদ্ধ ব্রহ্ম যখন অজ্ঞানের আবরণে আচ্ছন্ন থাকেন, তখনই সূক্ষ্মভূত, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, বাসনা, কর্ম্ম ও বায়ু এই সকল লিঙ্গদেহ নামে নিরূপিত হয়। এই নিমিত্ত ঐ অজ্ঞানকেই লিঙ্গদেহের মূল বলা যায়। সুতরাং যে কালে অজ্ঞানের লয় হয়, তখন লিঙ্গদেহেরও লয় হইয়া থাকে।

ভরদ্বাজ কহিলেন—ভগবন্! আমি অধুনা লিঙ্গদেহরূপ নিগড় হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়াছি। আমি চিদংশ, তাই চৈতন্যময় সুধাব্ধি মধ্যে প্রবেশ করিয়াছি। সেই সর্ব্বোপাধি-বিরহিত পরমাত্মার সহিত আমি অভিন্ন হইয়াছি। যিনি কূটস্থ, সর্ব্বব্যাপী, কেবল চিৎস্বরূপ, আমি তদাকারেই বিরাজ করিতেছি। আমি চিৎ, চিৎশক্তিমান্ নহি। আমি কীদৃশ অভেদ ব্যবস্থায় পরমাত্মা হইয়াছি, তাহা বলিতেছি। যেমন একই ঘটের ঘট ও কলশাদি নাম ভেদ কল্পনা এবং তদুপহিত আকাশে ঘটাকাশ ও কলশাকাশাদি কল্পনা, তেমনি একই অজ্ঞানের জগদাদি নাম ভেদ-কল্পনা এবং তদুপহিত আমাতে জীব, ঈশ্বর সুর, নর ও কুঞ্জর ইত্যাদি ব্যবপদেশ-ভেদ কল্পনা হইয়াছিল। কিন্তু একমাত্র ঘটের ভঙ্গে যেমন উভয় নিবর্ত্তনে শুদ্ধাকাশরূপ একত্ব হয়, অর্থাৎ ঘটের ভঙ্গে ঘটাকাশ যেমন মহাকাশে মিশাইয়া এক হইয়া যায়, তেমনি একমাত্র অজ্ঞানের নিবর্ত্তনে ও সর্ব্বনামাদি ভেদনিরাসে একাত্ম্য চিতেরই ঐক্য-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এইরূপ ঐক্যের কথা বহু শ্রুতিই সাদরে উল্লেখ করিয়াছেন। যেমন অগ্নিতে অগ্নি নিক্ষেপ করিলে, উভয়াগ্নিই এক হইয়া যায়, তাহাদের বিশেষত্ব কিছুই উপলব্ধি হয় না, আর ক্ষারাত্মক ভূমিতে

তৃণাদি নিক্ষেপে তাহা যেমন ক্ষার হইয়াই যায়, তেমনি এই যে অচেতন জগৎ, ইহাও চৈতন্যে নিক্ষেপ করিলে সেই এক চৈতন্যময় হইয়াই প্রতিভাত হয়। লবণ বা সৈন্ধব যদি সমুদ্রের সহিত মিশ্রিত হয়, তাহা হইলে তাহারা স্ব স্ব নামরূপ হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া যেমন সমুদ্রভাবই উপগত হয়, অপিচ জলে জল, ক্ষারে ক্ষার বা ঘৃতে ঘৃত মিশ্রিত হইলে যেমন একত্ব প্রাপ্ত হয়,—যাহা মিশিল, তাহা অবিনষ্ট রহিলেও বিশেষরূপে যেমন আর গ্রাহ্য হয় না, আমিও সর্ব্বথা চৈতন্যে লব্ধপ্রবেশ হইয়া সেই এক চৈতন্য হইয়াই গিয়াছি। ঐ চৈতন্যই নিত্যানন্দ, সর্ব্বজ্ঞ, পরাৎপর ও পরম কারণ। যিনি নিত্য, সর্ব্বগত, শান্ত, নিরবদ্য, নিরঞ্জন, নিষ্কল, নিষ্ক্রিয়, শুদ্ধ, বুদ্ধ, পরাৎপর, আমিই সেই ব্রহ্ম। ফলে আমাতে ও পর-ব্রহ্মে কোনই ভেদভিন্নতা নাই। যিনি হেয়োপাদেয় ভেদ হইতে নির্ম্মুক্ত, সত্যই যাঁহার রূপ, যিনি নিরিন্দ্রিয়, সত্যসঙ্কল্প, কেবল ও বিশুদ্ধ, আমিই সেই পরব্রহ্ম। যিনি পাপ-পুণ্য হইতে নির্ম্মুক্ত, জগতের যিনি পরম কারণ, যিনি অব্যয়, অদ্বিতীয় আনন্দময়, পরজ্যোতিঃস্বরূপ, আমিই সেই পরব্রহ্ম। যিনি এইরূপে উল্লিখিত গুণসমূহে গুণবান্, সত্ত্বরজঃ-প্রভৃতি গুণগণ হইতে যিনি পরিমুক্ত, সর্ব্ববস্তুর অন্তরে যিনি বিরাজিত, তথাভূত পরাৎপর পরব্রহ্মকে শ্রবণ, মনন ও গুরু-শুশ্রূষাদি কর্ম্মযোগে অতীব তৎপরতার সহিত ধ্যান করিতে হয়, এইরূপ ধ্যানাভাসে তৎপর হইলে ক্রমশঃ পুরুষের মন অস্তমিত—ব্রহ্মলীন হইয়া যায়। মন অস্তমিত হওয়ায় অনস্তমিত আত্মা স্বয়ংই প্রকাশমান হইয়া থাকেন। আত্মার প্রকাশে সর্ব্বদুঃখ দূরীভূত হয় এবং অন্তরে এক অচিন্তনীয় সুখের আবির্ভাব ঘটে।

এইরূপে যোগী আপনাতেই সেই আনন্দময় আত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। তাঁহার অন্তরে যখন আত্মপ্রকাশ হয়, তখন তিনি এইরূপই ভাবনা করেন যে, আমা ব্যতীত চিদানন্দময় ব্রহ্ম অন্য কেহই নাই। সেই একমাত্র পরব্রহ্ম আমিই।

বাল্মীকি কহিলেন,—বয়স্য! তুমি যদি এই সংসারভ্রম দূরীভূত করিতে একান্তই সমুৎসুক হইয়া থাক, তাহা হইলে সর্ব্বকর্ম্ম ব্রহ্মপদেই অর্পণ কর,—করিয়া তাঁহাতেই প্রণয়ী হও।

ভরদ্বাজ কহিলেন,—গুরো! ভবৎকথিত এই নিখিল জ্ঞানগর্ভ কথাই আমি বুঝিতে পারিয়াছি। আমার বুদ্ধি নির্ম্মল হইয়াছে। এই সংসারও এক্ষণে অন্তর্হিত হইবার উপক্রম করিয়াছে; বিলম্ব নাই—এখনই চলিয়া যাইবে। কিন্তু এক্ষণে আমার একটুকু মাত্র জিজ্ঞাস্য আছে। সে জিজ্ঞাস্য এই যে, জ্ঞানীর কর্ম্ম কীদৃশ? অর্থাৎ জীবন্মুক্ত ব্যক্তির কর্ম্ম কর্ত্তব্য কি না? যদি কর্ত্তব্য হয়, তাহা হইলে নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য প্রভৃতি সর্ব্বকর্ম্মই কি যথাপূর্ব্ব কর্ত্তব্য? অথবা কামনানিচয় হইতে নিবৃত্ত স্ব স্ব আশ্রমোচিত কর্ম্মমাত্রই কর্ত্তব্য? হে প্রভো! ইহা এক্ষণে আমায় প্রকাশ করিয়া বলুন।

বাল্মীকি কহিলেন,—ভরদ্বাজ! যাদৃশ কর্ম্মাচরণ করিলে কোন দোষ ঘটিবার সম্ভাবনা নাই, মুমুক্ষুগণ সেইরূপ কার্য্যই করিবেন। কিন্তু কোন নিষিদ্ধ বা কাম্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান তাঁহার পক্ষে একেবারেই অবৈধ। জীব ব্রহ্মগুণ-সম্পন্ন হইয়া নিখিল মনোগুণ পরিত্যাগপূর্ব্বক ইন্দ্রিয়সমূহকে নির্ব্ব্যাপার করিয়া সর্ব্বগামী হইবেন এবং যিনি দেহ, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিরও অতীত, সেই পরব্রহ্মকে 'আমিই সেই ব্রহ্ম' এইরূপে ধ্যান করিতে থাকিবেন। এইরূপ ধ্যান করিতে করিতেই তাঁহার মুক্তিলাভ হইবে। জীব যেকালে কর্ত্তা, কার্য্য ও করণ ইত্যাদি ভাব হইতে নির্ম্মুক্ত হন, যত কিছু উপাধি আছে, তাহা হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া সমস্ত সুখ-দুঃখ হইতে বিচ্যুত হইয়া থাকেন, সেই কালেই তাঁহার মোক্ষলাভ হয়। জীব যে কালে সর্ব্বভূতে আপনাকে এবং আপনাতে সর্ব্বভূতকে সমানভাবে সন্দর্শন করেন, তখনই মুক্ত হইয়া থাকেন। জীব যে কালে জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি, এই ত্রিবিধ অবস্থা পরিত্যাগপূর্ব্বক তুরীয় আনন্দপদে প্রতিষ্ঠা-পন্ন হন, তখনই মুক্ত হইয়া থাকেন। যাহাতে জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থার বীজস্বরূপ বাসনা, কর্ম্ম বা অজ্ঞান কিছুই নাই, তাহাই জীবের পরমাত্মায় তুরীয়-নামিকা অবস্থিতি; ঐ চিৎ-সুখময়ী অবস্থিতিই জ্ঞানযোগের শেষ সীমা এবং উহাই পরম সুখানুভব-স্বরূপা। মানবের মন যখন অস্তমিত হইয়া যায়, তখন আর কিছুই উপলব্ধি-গোচর হয় না। তৎকালে একমাত্র ব্রহ্মই বিরাজ করিতে থাকেন।

ভরদ্বাজ! যাহার কল্লোলমালা পীযূষরসময়ী, এবং যাহা সর্ব্বদাই প্রশান্তাকৃতি, তুমি সেই কৈবল্যময় সুধাব্ধিমধ্যে মগ্ন হইয়া থাক। যাহা দ্বৈতজ্ঞানময় দুঃখসাগর, তাহার তরঙ্গভঙ্গের অন্তরালে কেন বৃথা নিমগ্ন হইতেছ? যিনি এই জগতের বিশালতা পূর্ণ করিয়াছেন, সেই জগদ্গুরু পরমেশ্বরকেই তুমি আরাধনা কর। বৎস! বশিষ্ঠ রামচন্দ্রকে যাদৃশ জ্ঞানমার্গে বা যোগমার্গে উপদেশ দিয়াছিলেন,—আমি তোমার কাছে সকলই বর্ণন করিলাম। হে মহামতে! তুমি যদি গুরুবাক্যের অর্থাব-ধারণ করিয়া এই অধ্যাত্মশাস্ত্রের বিচার করিতে পার, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সর্ব্বজ্ঞ হইতে পারিবে। অভ্যাস করিতে করিতেই সর্ব্ব কার্য্য সুসিদ্ধ হয়। ইহাই বেদের অনুশাসন। সুতরাং তুমি সর্ব্বত্যাগী হইয়া অভ্যাসবলে মনকে সুদৃঢ় কর।

ভরদ্বাজ কহিলেন,—হে মুনে! রামচন্দ্র স্বীয় আত্মা দ্বারা আত্মাতে পরম যোগ প্রাপ্ত হইলে বশিষ্ঠদেব কি প্রকারে তাঁহাকে ব্যবহার-পরায়ণ করিয়াছিলেন? আমি ইহা অবগত হইয়া এরূপ অভ্যাসের জন্য যত্ন করিব, যাহাতে ব্যুত্থানকালে আমারও তেমনি ব্যবহারিক অবস্থা হইতে পারিবে।

বাল্মীকি কহিলেন,—যে কালে প্রশান্তমনা রামচন্দ্র স্বস্বরূপে পরিণত হইয়া অবস্থান করিতেছিলেন, তখন বিশ্বামিত্র মুনি, ঋষিবর বশিষ্ঠকে বলিলেন,—হে মহাভাগ ব্রহ্মপুত্র! আপনি প্রকৃতই মহাত্মা; আপনি শিষ্যোদ্ধারের শক্তি বিস্তার করিয়া সদ্য সদ্যই স্বীয় গুরুত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন; যিনি দয়াপ্রকাশে উপদেশ দিয়া, স্পর্শ করিয়া অধিক কি সাক্ষাৎ মাত্রেই শিষ্য শরীরে শাম্ভবী শক্তি সঞ্চারিত করিতে পারেন, অর্থাৎ শিষ্যকে শম্ভুসদৃশ জ্ঞানী করিয়া তুলিতে সক্ষম হন, তিনিই প্রকৃত গুরুপদ-বাচ্য। এদিকে রামচন্দ্রও আপনার একজন প্রকৃত সৎ-শিষ্য। তিনি প্রথম হইতেই সংসার-বিরত ও বিশুদ্ধ-চিত্ত হইয়া অন্তরে বিশ্রান্তি লাভের লালসা পোষণ করিতেছিলেন। এই জন্যই একণে উপদেশ দিবামাত্র রাম পরম-পদ অধিগত হইয়াছেন। কেবল গুরূপদেশ পাইলেই যে জ্ঞানোদয় হয়, তাহা নহে; এ সম্বন্ধে শিষ্যেরও সদ্বুদ্ধি,

থাকা একান্ত প্রয়োজন। যদি কাম, কর্ম্ম ও বাসনারূপ মলত্রয় বিশোধিত না হয়, তাহা হইলে শিষ্যই বা কিরূপে গুরূপদেশ বুঝিতে সমর্থ হইবে? ফলে গুরু এবং শিষ্য উভয়েই সুযোগ্য হওয়া চাই। উভয়ের যোগ্যতা-তেই শুভ ফল প্রাপ্তি ঘটে। সুযোগ্য গুরু-শিষ্যের সমাগমে যে শিষ্যের ঐরূপ জ্ঞান লাভ ঘটিয়াছে, ইহা অনেক স্থলেই প্রত্যক্ষ করা হইয়াছে। যাহা হউক, এক্ষণে কৃপা করিয়া রামচন্দ্রকে সমাধি হইতে ব্যুত্থিত করুন; রামকে ব্যুত্থাপিত করিবার শক্তি আপনারই আছে। রাম দ্বারা প্রয়োজন আমার যথেষ্ট। আমি যে উদ্দেশ্যে এখানে আসিয়াছি এবং রাজা দশরথকে যে অতিকষ্টে আমার প্রার্থিত বিষয়ে সম্মত করাইয়াছি, তাহা নিশ্চয়ই আপনার এখন স্মরণ আছে। অতএব হে মুনে! আপনি যখন বিশুদ্ধমনা মহাশয় ব্যক্তি, তখন আমার উদ্দেশ্য অবশ্যই আপনা হইতে ব্যর্থ হইবে না। কেবল যে আমারই রাম দ্বারা প্রয়োজন আছে, তাহা নহে; রামচন্দ্র অনেক দেবকার্য্যও নির্ব্বাহ করিবেন। তিনি যে জন্য অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাহাও তাঁহাকে সুসম্পন্ন করিতে হইবে। আমি রামকে সিদ্ধাশ্রমে লইয়া যাইব। তিনি সেখানে রাক্ষস-ধ্বংস ও অহল্যাকে উদ্ধার করিবেন। রাজর্ষি জনকের গৃহে হরধনু আছে, তাহা তিনি ভগ্ন করিয়া তাহার পণস্বরূপ জনকনন্দিনীকে বিবাহ করিবেন। বিবাহান্তে রামচন্দ্র অযোধ্যায় আসিবার পথে জামদগ্ন্যের পরলোক-পথ রুদ্ধ করিয়া দিবেন। অনন্তর তিনি নিস্পৃহ-ভাবে পিতৃ-পৈতামহ রাজ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক নির্ভীকচিত্তে অরণ্যে বাস করিবেন এবং দণ্ডকারণ্যবাসী প্রাণিবর্গের উদ্ধার সাধন করিবেন। তাঁহা হইতে বিবিধ তীর্থক্ষেত্র পবিত্রীকৃত হইবে। অনন্তর রাবণ তাঁহার প্রিয়পত্নী সীতাকে হরণ করিলে, তিনি বহু দুর্গতি-ভোগের পর রাবণাদির বধ-বিধানপূর্ব্বক স্ত্রীসঙ্গীদিগের যে কতদূর শোচনীয় দশা—কত অশান্তি ঘটিয়া থাকে, তাহার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিবেন। অনন্তর তিনি সমরে নিহত ঋক্ষবানরাদিকে উজ্জীবিত করিবেন। রাম জীবন্মুক্ত—সুতরাং নিজে নিস্পৃহ হইলেও কর্ম্মকাণ্ডের বিধিনিষেধে তৎপর হইয়া সীতার চরিত্র শুদ্ধি পরীক্ষা করত পরম্পরাগত শিষ্টাচারপদ্ধতির পালন করিবেন।

জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয়ই মুক্তির কারণ হইয়া থাকে। ইনি তিনি স্বয়ং আত্ম-কর্ম্মের পালন দ্বারা জগৎকে শিখাইবেন। যাহারা ইঁহাকে দর্শন করিবে, ইঁহার নামস্মরণ ও গুণ শ্রবণ করিবে, ইঁহার চরিত্রের অনুকরণ করিবে, কিম্বা ইঁহাকে ভক্তি করিবে, তাহাদের যেরূপ অবস্থাই হউক, তাহাদিগকে ইনি সংসার হইতে মুক্ত করিবেন। এইরূপে এই মহাপুরুষ রামচন্দ্র আমার, তথা নিখিল ত্রিলোকবাসীর অশেষ মঙ্গল সাধন করিবেন। অতএব হে জনগণ! তোমরা এই রামচন্দ্রকে নমস্কার কর। ইঁহাকে নমস্কার করিলেই তোমরা সর্ব্বোৎকর্ষে বিরাজ করিতে পারিবে। তোমাদের আর সাধনান্তরের প্রয়োজন হইবে না। অপিচ আমার এরূপও আশা হয় যে, তোমাদের মধ্যে কোন না কোন ভাগ্যবান্ পুরুষ রামচন্দ্রের ন্যায় জীবন্মুক্ত হইয়া চিরতরে নির্ব্বিকল্প সমাধি-বিশ্রান্তি প্রাপ্ত হইতে পারিবে।

বাল্মীকি কহিলেন,—বিশ্বামিত্র ঐ কথা কহিলেন, তাহা শ্রবণ করিয়া তত্রত্য বশিষ্ঠপ্রমুখ যোগীন্দ্রগণ ও অন্যান্য শ্রোতৃবর্গ সকলেই রামচন্দ্রের ভবিষ্যৎ বৃত্তান্ত সকল জানিতে পারিয়া তদীয় চরণারবিন্দের রজোগ্রহণ-পূর্ব্বক সাদরে তাঁহাকেই চিন্তা করিতে লাগিলেন। মহর্ষি বশিষ্ঠ কিম্বা অন্যান্য সকলে যাহা শুনিলেন, তাহাতে তাঁহাদের শ্রবণলালসা মিটিল না। আরও কিছু শুনিবার জন্য তাঁহাদের স্পৃহা বলবতী হইয়া উঠিল। বিশ্বামিত্রের নিকট গুণনিধি রামচন্দ্রের গুণাবলী শ্রবণ করিয়া ভগবান্ বশিষ্ঠ ঋষি নিজে তাহা মনে মনে আলোচনা করত প্রকাশ্যে বিশ্বামিত্রকে কহিলেন,—হে মুনে! কমলাক্ষ রামচন্দ্র জন্মান্তরে সুর বা নর কে ছিলেন?

বিশ্বামিত্র কহিলেন—হে মুনে! আপনি এই রামচন্দ্রকে পরম পুরুষ ভগবান্ বাসুদেব বলিয়াই বিশ্বাস করুন। এই পুরুষবরই জগতের হিতের নিমিত্ত জলধি মন্থন করিয়াছিলেন। গভীরাগম-গোচর উপনিষদ্ ভিন্ন উঁহার নিগূঢ় তত্ত্ব অন্য কেহই বলিতে সক্ষম নহে। এই পরম পুরুষই পূর্ণানন্দরূপ শ্রীবৎসলাঞ্ছন পর ব্রহ্ম। ইঁহার প্রসন্নতা উৎপাদন করিলে ইনি সর্ব্বপ্রাণীর সমস্ত পুরুষার্থই প্রদান করিয়া থাকেন। ইনিই এই মিথ্যা জগতের মিথ্যা পদার্থপুঞ্জ সৃষ্টি করিয়াছেন এবং

কাপাক্রান্ত হইয়া পুনর্ব্বার সংহার করেন। ইনিই বিশ্বাদি, বিশ্বধাতা, বিশ্বভর্ত্তা ও বিশ্বজনের মহাসখা। যাঁহারা এই অসার অকিঞ্চিৎকর অলীক সংসারবন্ধন ছেদন করিয়া জগতের সঙ্গ পরিহার করিয়াছেন, তাঁহারাই ইঁহার মাহাত্ম্য বিদিত আছেন। ইনিই বিশাল আনন্দসিন্ধু; বীতরাগ মুনিগণ ইঁহাতেই অবগাহন করিয়া থাকেন। ইনি কোথাও আত্মপ্রতিষ্ঠ পুরুষরূপে, কোথাও তুরীয়-পদাখ্যায়, কোথাও প্রকৃতিরূপে এবং কোথাও বা প্রকৃতি-পুরুষরূপে বিরাজিত। ইনিই ত্রয়ীময় এবং ইনিই ত্রৈগুণ্যরূপ অরণ্যাতীত দেবদেব। এই দেবাত্মা পুরুষপ্রবরই সর্ব্ববেদের পরম সার এবং ইনিই শিক্ষা কল্প প্রভৃতি ষড়ঙ্গবিস্তারে বিজয়ী হইয়াছেন। ইনিই চতুর্ব্বাহু বিষ্ণু, ইনিই চতুর্ম্মুখ বিশ্বস্রষ্টা, এবং ইনিই সংহারকর্ত্তা মহাদেব ত্রিলোচন। ইনি অজ হইয়াও যোগরূপে জন্ম গ্রহণ করেন, এই মহাত্মাই সর্ব্বদা জাগরূক রহিয়াছেন। ইনিই সাক্ষাৎ ভগবান্; ইঁহার কোনই রূপ নাই অথবা ইনিই বিশ্বরূপ ধারণপূর্ব্বক সমস্তের পালন করেন। বিক্রম যেমন নিশ্চিত বিজয়, তেজ যেমন প্রকাশ ধর্ম্ম এবং শাস্ত্র যেমন বুদ্ধির উৎকর্ষ বহন করে, বিনতাত্মজ গরুড়ও ইঁহাকে তেমনি বহন করিয়া থাকে। ধন্য এই দশরথ রাজা—যাঁহার পুত্র পরম পুরুষ রামচন্দ্র। ধন্য সেই দশস্কন্ধ, —যাহাকে ভগবান্ রাম প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে ভাবনা করিবেন। হা স্বর্গপুরী! তুমি এখন এই পুরুষবরের স্পর্শসুখে বঞ্চিত। হা পাতাল! অনন্তদেব তোমাকে ছাড়িয়া আসিয়া এক্ষণে ইঁহার অনুজ লক্ষ্মণরূপে আবির্ভূত। ইঁহাদের আগমনঘটনায় এই মর্ত্ত্যলোক অধুনা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইয়াছে। যে মহাপুরুষ অর্ণবশায়ী ছিলেন, তিনি ইদানীং রামরূপে অবতার স্বীকার করিয়াছেন। এই রামচন্দ্রই সেই চিদানন্দঘন অব্যয় আত্মা। জিতেন্দ্রিয় যোগী জনেরাই এই রামচন্দ্রের যথার্থ তত্ত্ব পরিজ্ঞাত আছেন। ইঁহার প্রকৃত তত্ত্ব কি, তাহা আমরা বুঝি না। আমরা ভাবি, ইনি বুঝি সামান্য নর। তবে পরম্পরায় শুনিয়াছি—ভগবান্ পাপভার ঘুচাইবার জন্যই ভূতলে রঘুবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। যাহা হউক, হে ঋষিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ! রামচন্দ্রকে এক্ষণে আপনি ব্যবহার-পরায়ণ করুন।

বাল্মীকি কহিলেন—মহামুনি বিশ্বামিত্র এই কথা কহিয়া তুষ্ণীম্ভাব

অবলম্বন করিলেন। তখন মহাতেজা বশিষ্ঠ রামচন্দ্রকে বলিলেন,—রাম হে! ও হে রাম! হে মহাত্মন্! হে চিন্ময় মহাপুরুষ! তুমি [illegible] হও। এখনও তোমার আত্মবিশ্রান্তি লাভের সময় হয় নাই, তুমি ব্যবহার-পরায়ণ হও এবং জগতের আনন্দবর্দ্ধন কর। যে পর্য্যন্ত না লৌকিক ক্রিয়াকলাপ নির্ব্বাহিত হয়, সে কাল যাবৎ যোগী-জনের ন্যায় সমাধি-অবস্থায় নিবিষ্টভাবে অবস্থান করা কর্ত্তব্য নহে। তাই বলিতেছি, বৎস! কিয়ৎকাল তুমি রাজ্যাদি বিষয়সুখ ভোগ কর, পরে সমাধিমগ্ন হইয়া রহিও। সম্প্রতি শুভকার্য্যাদি সম্পাদন করিয়া সুখে কালাতিপাত কর।

বাল্মীকি বলিলেন,—রামচন্দ্র পরব্রহ্মে লীন হইয়াছিলেন; সুতরাং বশিষ্ঠের কথা শুনিয়াও তিনি কোনই উত্তর প্রদান করিলেন না। তখন বশিষ্ঠদেব রামের সুষুম্নানাড়ীর মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে তদীয় হৃৎপদ্মের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর তাঁহার প্রক্রিয়া প্রয়োগে প্রথমতঃ প্রাণাদি বীজভূতা আধারশক্তিতে প্রাণ ও মনের আবির্ভাব হইল; এইজন্য উহাতে রামাভিধেয় জীব চিদাভাসরূপে অনুপ্রবিষ্ট হইলেন, পরে প্রাণের সাহায্যে সমস্ত নাড়ীরন্ধ্রে প্রবেশানন্তর সমস্ত জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের পরিপোষণপূর্ব্বক শনৈঃ শনৈঃ স্বীয় নয়নযুগল উন্মীলন করিলেন। অনন্তর রামচন্দ্র বশিষ্ঠপ্রমুখ মুনিবৃন্দকে সম্মুখে সমাসীন দেখিলেন, এবং তাঁহারা কি কথা কহিবেন, তাহার জন্য প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন। তিনি স্বয়ং কৃতকৃত্য হইয়াছিলেন; সুতরাং তাঁহার আর কোনও রূপ ইচ্ছা নাই এবং ইহা কর্ত্তব্য, বা ইহা অকর্ত্তব্য, ইত্যাদিরূপ বিচারালোচনার প্রয়োজনও তাঁহার নাই।

অতঃপর বশিষ্ঠ পুনর্ব্বার রামচন্দ্রকে বলিলেন। রাম গুরুবাক্যে শ্রদ্ধা প্রদর্শনপূর্ব্বক নিবিষ্টচিত্তে তাহা শুনিয়া কহিলেন,—ভগবন্! ভবৎপ্রসাদে আমি এখন বিধিনিষেধের অতীত হইয়াছি। তথাপি আপনি গুরু; আপনার বাক্য অবশ্যই করণীয়; কেন না, শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণ সকলেই একবাক্যে ঘোষণা করিয়াছেন যে, গুরুবাক্যই বিধি আর তদ্বিপরীতই নিষেধ।

[illegible]যুগল,

আপনারা [illegible] মাদের মঙ্গল [illegible]

—তত্ত্বজ্ঞান [illegible] হইতে আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া [illegible]পেক্ষা উত্তম কার্য্য নাই। তৎকা[illegible]দি শ্রোতৃবর্গ প্রত্যুত্তরে বলিলেন,—রামচন্দ্র! আমাদের অন্তরে এ ধারণা পূর্ব্ব হইতেই আছে। অধুনা তোমার প্রসাদে সে ধারণা আরও সুদৃঢ় হইয়া রহিল। মহারাজ রাম! তোমাকে আর কি বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিব—তুমি সুখে থাক। তোমাকে আমরা নমস্কার করি। বশিষ্ঠদেবের অনুমতি হউক, এক্ষণে আমরা স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করি।

বাল্মীকি কহিলেন,—তাঁহারা এই কথা কহিয়া রামচন্দ্রের প্রশংসাবাদ করিতে করিতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তখন রামের মস্তকোপরি পুষ্প-বৃষ্টি পতিত হইতে লাগিল। বৎস ভরদ্বাজ! রামচন্দ্র যেরূপে আত্মবিশ্রাম লাভ করিয়াছিলেন, এই আমি তোমার নিকট সেই অমৃতোপম ক[illegible] কহিলাম। এক্ষণে তুমি এইরূপ ক্রমযোগ অবলম্বন করিয়া সুখী হও। যাহা ধারণা করিয়া রঘুকুলতিলক রামচন্দ্র সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, বশিষ্ঠদেবের এই সেই বিচিত্র উপদেশাবলীরূপা রত্নমালা তোমার সম্বন্ধে প্রকাশ করিলাম। ইহা নিখিল কবি ও যোগী জনের সেব্য বস্তু; পরাৎপর পরম গুরুর কৃপাকটাক্ষ-পাতে ইহা মুক্তিমার্গের প্রদানকর্ত্রী। যে জন নিত্য নিত্য এই রাম-বশিষ্ঠ-সংবাদ শ্রবণ করে, সে যেরূপ অবস্থা[illegible] হউক, ইহা শ্রবণ করিলেই মুক্ত—পরব্রহ্মে লীন হইবে, সন্দেহ নাই।

অষ্টাবিংশত্যধিক শততম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১২৮ ॥

নির্ব্বাণ-প্রকরণ পূর্ব্বভাগ সম্পূর্ণ।